# উনিশ শতকে
# বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র
[ ১৮৪৭-১৯০৫ ]

## নবম খণ্ড

মুনতাসীর মামুন

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪০৫ / অক্টোবর ১৯৯৮

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

উৎসর্গ

**আফজল হোসেন**
বাংলা একাডেমী থেকে গত দু'দশকে
প্রকাশিত আমার সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশনার
দায়িত্ব যিনি সুচারুভাবে পালন করেছেন।

# ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ–সাময়িকপত্র কয়েকখণ্ডে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলো বাংলা একাডেমী। বর্তমান খণ্ডটি নবম খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিলো একযুগ আগে, ১৩৯১ সনে (১৯৮৫ সাল)। ঐ খণ্ডে সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলাদেশের সংবাদ–সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাকি এবং বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে ঐ সময়ে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত যেসব সংবাদ–সাময়িকপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও সংবাদ। তাই প্রথম খণ্ডটিকে বাকি খণ্ডগুলির ভূমিকা হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৯৪ সনে (১৯৮৭)। এ খণ্ডটি বিভক্ত দু'টি পর্বে। প্রথম পর্বে সংকলন করা হয়েছে সংবাপত্রসমূহ থেকে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদ–সাময়িকপত্র আর এখন পাওয়া যায় না। সুতরাং যা–ই খুঁজে পেয়েছি তা থেকেই সংকলন করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে সাময়িকপত্র ছাড়া 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ও 'বঙ্গবন্ধু' থেকে সংবাদ/রচনা সংকলিত হয়েছে, 'রিপোর্ট অন দি নেটিভ পেপার্স' থেকেও সংকলন করা হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সংকলন করা হয়েছে মাত্র একটি সংবাদপত্র থেকে এবং তা হলো 'ঢাকা প্রকাশ'। এ পত্রিকাটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার কারণ আছে। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদ–সাময়িকপত্র আজ লুপ্ত। বিদেশে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কয়েকটি পত্রিকার অল্প কিছু সংখ্যা আছে। 'ঢাকা প্রকাশ'ই একমাত্র পত্রিকা যার অধিকাংশ সংখ্যা অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছে। এ ছাড়া 'ঢাকা প্রকাশ'–এর মতো আর কোন পত্রিকা এতো দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়নি। প্রায় একশো বছর টিকেছিলো পত্রিকাটি। শেষের দিকে অবশ্য 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হতো নিলামের ইস্তেহার হিসেবে। পত্রিকাটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন উপাদান। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে মাত্র চল্লিশ বছরের 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে অল্প কিছু সংবাদ/রচনা সংকলন করেছি। তবে, পাঠকদের সুবিধার জন্য চতুর্থ খণ্ডে 'ঢাকা প্রকাশ'–এ প্রকাশিত রচনার একটি সূচি সংযোজিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে সাপ্তাহিক 'হিন্দুরঞ্জিকা' [ ১৮৮৭, ও ১৮৯৯–১৯০০ ] থেকে সংকলন করা হয়েছে। 'হিন্দুরঞ্জিকা'র আর কোন বছরের ফাইল খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ষষ্ঠ এবং অষ্টম খণ্ডটিকে এ সিরিজে ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। অষ্টম খণ্ডে যে পত্রিকা থেকে সংকলন করা হয়েছে সেটি ইংরেজি সংবাদপত্র 'দি বেঙ্গল টাইমস'। ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত 'দি ঢাকা নিউজ'এর উত্তরসূরি। ব্যতিক্রম মনে হতে পারে এ কারণে যে, গ্রন্থের ভূমিকা, টীকা সমস্ত কিছুই বাংলায় কিন্তু সংকলন ইংরেজিতে। তবে, বলতে পারি, এটি আর

এখন ব্যতিক্রম কিছু নয়, বিদেশে এ ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বি-ভাষিক সংকলনও প্রকাশিত হচ্ছে। কারণ, ধরে নেওয়া হয় যারা এটি ব্যবহার করবেন তাদের জন্য মাতৃভাষাসহ ইংরেজিভাষা দূরধিগম্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তা'ছাড়া ঐ সংকলনের জন্য যদি ভূমিকা থেকে শুরু করে সবকিছু ইংরেজিতে করা হতো তা'হলে এটিকে সিরিজ বহির্ভূত বলে মনে হতো এবং নষ্ট হতো ধারাবাহিকতা। তা'ছাড়া ঐ ইংরেজি খণ্ডের জন্য প্রথম খণ্ডটিকেও অনুবাদ করতে হতো ; না হলে, অনেক বক্তব্যই অস্পষ্ট থেকে যেতো। সে কারণে,অষ্টম খণ্ডে 'দি বেঙ্গল টাইমস'-এর ক্ষেত্রে আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি এবং আশা করি এ কারণে পাঠক বা গবেষকদের কোন অসুবিধা হবে না।

সপ্তম খণ্ডে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত দশটি সাময়িকপত্র থেকে সংকলন করা হয়েছে। সেগুলি হলো *সেবক* (১৮৯৬), *অঞ্জলি* (১৮৯৮), *কল্যাণী* (১৯০২-৩) *আরতি* (১৯০১-৩), *আশা* (১৯০৩), *ভারতসুহৃদ* (১৯০৩), *ধূমকেতু* (১৯০৩-৪), *নববিকাশ* (১৯০৪-১৯০৫), *জীবন সহচর* (১৯০৫) ও *বৌদ্ধ পত্রিকা* (১৯০৬)। নয়টি মাসিক পত্রিকার ৮০টি সংখ্যার সূচিপত্র ও উল্লেখযোগ্য অংশ এ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। একদিক থেকে ঐ খণ্ডটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, সংকলিত অধিকাংশ সাময়িকপত্র আগে গবেষকরা দেখেন নি বা ব্যবহার করতে পারেন নি ; অনেক জায়গায় উল্লেখ হয়ত দেখেছিলেন।

বর্তমান খণ্ডটি এ গ্রন্থমালার শেষ খণ্ড। এ খণ্ডটি মূল পরিকল্পনায় ছিল না। কিন্তু, দেখা গেল, 'ঢাকা প্রকাশ'-এর বেশ কিছু সংবাদ রচনা সংগ্রহ করা ছিল যা ব্যবহৃত হয় নি। বর্তমানে পত্রিকাটির অবস্থা দেখে মনে হলো অব্যবহৃত রচনা/সংবাদগুলি ব্যবহার করা উচিত। না হলে এগুলিও পরে হারিয়ে যাবে। 'মিত্র প্রকাশ', 'সেবক' ও 'কৌমুদী'র কিছু সংখ্যা হঠাৎ পেয়ে যাওয়ায় মনে হলো—এগুলিও বাদ থাকে কেন? সে কারণে, বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। ভবিষ্যতে নতুন কোন সংস্করণ হলে আর এর দরকার পড়বে না ।

বর্তমান বা নবম খণ্ড দুট পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে 'ঢাকা প্রকাশ' বা সংবাদপত্র থেকে সংকলন। দ্বিতীয় পর্বে সাময়িকপত্র থেকে সংকলন। সংবাদ/রচনার স্বল্পতা হেতু সংবাদপত্রের সংবাদ/নিবন্ধসমূহকে কয়েকটি মোটাদাগে ভাগ করা হয়েছে—সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংবাদ-সাময়িকপত্র ও বিবিধ। কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার জন্য একই শিরোনামের অধীনে উপ-শিরোনামও করা হয়েছে। তবে, বলে রাখা ভালো, সংবাদপত্রে সংবাদকে কখনও চূড়ান্তভাবে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে ফেলা যায় না। একই সংবাদ একই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দেয়া হয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর মাঝে। সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর ঐ বিষয়ের ওপর সংকলন। এক্ষেত্রে কোনরকম পরিবর্তন করা হয় নি। কোন শব্দের পর... চিহ্ন থাকার অর্থ মূল পাঠ অস্পষ্ট বা বোঝা যায় নি বা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় বাদ দেয়া হয়েছে। অনেক সংবাদের শিরোনাম দেয়া হয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর মাঝে। এর অর্থ মূল পর্বে শিরোনাম ছিল না। সংবাদ/রচনার সেগুলির টীকা দেওয়ার প্রয়োজন আছে সেগুলির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে টীকাসমূহ দেয়া হয়েছে।

বর্তমান খণ্ডটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহে উল্লিখিত যেমন, কোন কোন সংকলন অধ্যায়ের ভূমিকা, টীকার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব যেহেতু সাময়িকপত্র ভিত্তিক সেহেতু এর রচনাসমূহকে সংবাদপত্রের সংবাদ/রচনার মতো বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা যায়নি বরং এগুলিকে সাজানো হয়েছে ভিন্নভাবে। এ পর্বে প্রথমে সাময়িকপত্রের নাম, তারপর প্রাপ্ত সংখ্যা সমূহের সূচি ও সংকলন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে সংখ্যা ও তারিখ, তারপর সূচিপত্র। সূচিপত্র যে বিষয়টি উদ্ধৃত বা সংকলন করেছি তার শিরোনাম দেয়া হয়েছে বোল্ড টাইপে।

'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছিলো একটি কারণে। বর্তমান বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে কিন্তু তাতে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রই গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানত সে অভাব পূরণের জন্যই এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। গ্রন্থের সময়সীমা ১৮৪৭ থেকে ১৯০৫। ১৮৪৭ থেকে শুরু করার কারণ, ঐ সময়ই বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিলো। আর ১৯০৫ সালতো বঙ্গভঙ্গের কারণে বাংলার ইতিহাসে অধিকার করে আছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যদিও এ গ্রন্থে ১৯০০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করেছি তবুও গ্রন্থের শিরোনামে উনিশ শতকই ব্যবহার করা হলো। বর্তমান গ্রন্থে, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা বোঝানো হয়েছে।

২

উনিশ শতকের ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল তার মধ্যে অন্যতম। শুধু তাই নয়, 'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। আরো উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর মতো এত দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে আর কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। উনিশ শতকের ষাট দশকে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি টিকে ছিল প্রায় একশো বছর—এ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত। এ ছাড়া গ্রাহক সংখ্যাকে যদি আমরা জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসেবে ধরি তা'হলেও দেখব 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল ঐ সময়ের একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র। পত্রিকা প্রকাশের পরে এর প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশো[১] এবং নব্বই দশকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আন্দোলনের সময় এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজারে[২]। সরকারও গুরুত্ব দিতেন 'ঢাকা প্রকাশ'-কে। উনিশ শতকে 'রিপোর্ট অন নেটিভ পেপার্স'-এ, পূর্ববঙ্গের পত্র-পত্রিকার মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদ বা মতামত সংকলিত হতো।

'ঢাকা প্রকাশ'-এর সঙ্গে জড়িত 'বাঙ্গালা যন্ত্র'-এর নাম। 'বাঙ্গালা যন্ত্র' ছিল ঢাকার প্রথম বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র। এ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র 'মনোরঞ্জিকা'। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'ও মুদ্রিত হয়েছিল এখানে। বস্তুত এ মুদ্রণ যন্ত্রটি ঢাকার চিন্তা রাজ্যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল। কারণ, 'বাঙ্গালা' যন্ত্র থেকে শুধু 'ঢাকা প্রকাশ'ই নয়, অন্যান্য বইপত্রও মুদ্রিত হতে থাকে এবং এতে উৎসাহিত হয়ে কয়েকবছরের মধ্যে আরো কয়েকজন ঢাকায় স্থাপন করেছিলেন মুদ্রণ যন্ত্র। শুরু করেছিলেন পত্র-পত্রিকার প্রকাশ।

'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে বা কারা? এ সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি তা হলো—'ঢাকা জিলার সদর উপরিভাগান্তর্গত তেতুলঝোড়া গ্রামবাসী স্বনামখ্যাত ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ধামরাই গ্রামবাসী বিদ্যালয়সমূহের ডিপুটী ইন্সপেক্টর ও পরবর্তী ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, এবং বিক্রমপুরান্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামবাসী বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্রের পিতা ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বসু, মালখা নগরবাসী ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রামকুমার বসু প্রমুখ-এর 'উদ্যোগ ও যত্নের ফলেই বিগত ১২৬৬ সনে ইং ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে তৎকালে প্রচলিত একটী মুদ্রণ যন্ত্র (চিলা প্রেস) ও অক্ষরাদি আনীত হইয়া 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে ঢাকা নগরীর বাবুর বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়।'[৩]

উপর্যুক্ত সবাই ছিলেন ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী। নিজেদের মতামত বা বিশ্বাস প্রচারের কারণে হয়ত তারা ভেবেছিলেন নিয়মিত কিছু প্রকাশ করার। যৌথ মালিকানার এই প্রেস থেকে পরিচালকরা প্রথমে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র 'মাসিক মনোরঞ্জিকা'। কিন্তু, '১২৬৭ সনের শেষার্ধে নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে 'মাসিক মনোরঞ্জিকা' উঠিয়া যায়'[৪] এবং 'উহার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগণ একখানি সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ কৃতসঙ্কল্প হন এবং তাহারই ফলে বিগত ১২৬৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার 'ঢাকা প্রকাশ' জন্ম গ্রহণ করে।'[৫]

'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশনার ব্যাপারে পরিচালকের যে ব্রাহ্মমত প্রকাশের ব্যাপারটি উৎসাহিত করেছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম কয়েক বছরের 'ঢাকা প্রকাশ' দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং 'ঢাকা প্রকাশ'-এর, এ ভূমিকা বিরোধিতা করার জন্য গোঁড়া হিন্দুরাও পত্রিকা প্রকাশে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ছাড়া, কলকাতার 'সোম প্রকাশ'ও প্রভাবিত করেছিল পরিচালকদের। 'ঢাকা প্রকাশ' নামকরণ থেকে এর পরিচালনা, রচনা পদ্ধতিতে এ প্রভাব স্পষ্ট।

প্রথমে, 'ঢাকা প্রকাশ' প্রতি সপ্তাহে 'গুরু বারে' অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হতো। সাপ্তাহিকটির প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে-'ঢাকা প্রকাশ' এবং তার নিচে ছোট টাইপে লেখা থাকতো 'সাপ্তাহিক' শব্দটি। এর নিচে মুদ্রিত হতো একটি ঋষি বাক্য—'সিদ্ধি : সাধ্যে সমামস্ত'। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'প্রাসাদাদিহ ধূর্জ্জটে : !' প্রথম বছর পত্রিকা রয়েল আকারে দু'ফর্মা বা আট পৃষ্ঠার ছিল। ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা।

পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ দিকে থাকতো বিজ্ঞাপন। ডান দিকে মাঝে মাঝে থাকতো সম্পাদকীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর বা বিশেষ কোন বিষয়ের ওপর পত্রিকার নিজস্ব মতামত। এরপর ছিল 'সম্বাদাবলী' [ বা সংবাদাবলী ]। এই বিভাগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বা নিজেদের সংগৃহীত সংবাদ ছাপা হতো। এ ছাড়া নিয়মিত ছাপা হতো চিঠিপত্র। সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের জন্য এই বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ।

'ঢাকা প্রকাশ'-এর পরিচালকগণের মধ্যে ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু প্রমুখ।[৬] এবং সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সেই থেকে ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক/মালিকানা অনেকবার বদল হয়েছে কিন্তু এর প্রকাশ ছিল অব্যাহত এবং কালক্রমে পূর্ববঙ্গে প্রধান পত্রিকা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল 'ঢাকা প্রকাশ'। তবে, প্রথমদিকে, বিদ্যালয়সমূহের ডিপুটী ইন্সপেক্টর দীনবন্ধু মৌলিক মহাশয়ের পদোচিত প্রতিষ্ঠার বলেই যে তখন ঢাকা প্রকাশের সমধিক প্রচার সম্ভব হইয়াছিল এরূপ অনুমান একেবারে অসঙ্গত নহে।[৭]

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের পত্রিকায় প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদকের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হতো না। ফলে, কখন কে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর বেলায়ও সে কথা প্রযোজ্য। তবে পূর্ণচন্দ্রের প্রবন্ধের সাহায্যে আমরা 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সম্পাদকদের নাম জানতে পারি।

যেমন, প্রথম সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কথাই ধরা যাক। পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত পত্রিকায় তাঁর নামই দেখা যায়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সম্পাদকের দায়িত্ব মজুমদার মহাশয়ের উপর ছিলনা। 'ঢাকা প্রকাশের' চতুর্থ বৎসর ২২ সংখ্যা পর্যন্ত তাঁহার নাম 'প্রকাশক' রূপেই পাওয়া যায়। যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি 'ঢাকা প্রকাশের' দ্বিতীয় বর্ষের শেষাশেষি কর্ম্মচ্যুত হন।" 'সোম প্রকাশ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন।[৮] কিন্তু আবার এও দেখা গেছে পত্রিকা হেড কম্পোজিটরের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে, অন্যান্য সূত্র অনুযায়ী, প্রথম চার বছর কৃষ্ণচন্দ্রই ছিলেন সম্পাদক।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর সময়ে ছিলেন পূর্ববঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। জন্ম তাঁর ১৮৩৪ সালে, যশোরের সেনহাটিতে। পিতার নাম মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার। ছদ্মনামে লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে কৃষ্ণচন্দ্র লিখেছেন, 'ছেলেবেলায় আমার গুপ্ত নাম রামচন্দ্র ছিল'। এ গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায় যে, তাঁর বয়স যখন ছয় মাস তখন তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর থেকে দশ এগারো বছরের বড় ভাই ছিলেন, পিতার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তিনিও পরলোকগমন করেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের নানা ছিলেন বরিশালের কীর্তিনাশার জমিদার। তিনি তাঁর জমিদারী থেকে একটি বৃত্তি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য। পাঁচ বছব বয়সে হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর। একটু বয়স হতেই তিনি চলে গিয়েছিলেন নানা বাড়ি এবং সেখানে মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে শেখা শুরু করেছিলেন ফার্সী। কিছুদিন পড়াশোনার পর কৃষ্ণচন্দ্র পালিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায় কিন্তু কিছুদিন পর ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময় তার মামাতো ভাই প্রসন্ন থাকতেন ঢাকায় এবং কৃষ্ণচন্দ্রও চলে এসেছিলেন সেখানে। সেই সময় তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিলো হরিশ্চন্দ্র মিত্রের।

কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল কবি হওয়ার। লিখেছেন তিনি আত্মজীবনীতে—"বালক কালে কয়েকখানি গদ্য পুস্তক পাঠ করিয়া রাসের [এ নামে তিনি লিখেছিলেন আত্মজীবনী] কবি কীর্ত্তিলাভে ইচ্ছা হয়।" এর আগে অবশ্য ঢাকা থেকে কলকাতার 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লেখা পাঠাতেন তিনি।

বেকারত্ব, দারিদ্র্য সবকিছু যখন কৃষ্ণচন্দ্রকে বিমর্ষ করে তুলেছে তখন তিনি মাসিক পনের টাকা বেতনে নর্মাল স্কুলের অধীন মডেল স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন হেড পণ্ডিতের।

"আর সেই আশা স্ফূর্তির সহযোগেই এই সময় হইতেই 'সদ্ভাব শতক' লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমার বয়স আন্দাজ ২১/২২ বৎসর।"

'সদ্ভাব শতক' প্রকাশিত হয়েছিলো ঢাকা থেকে ১৮৬১ সালে। এ কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি কবিতাই তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি ফার্সী শিখেছিলেন ছেলেবেলায়, পরবর্তীকালে সহানুভূতিশীল ছিলেন ব্রাহ্মমতের প্রতি। 'সদ্ভাব শতক'-এ, ঐ সবকিছুর প্রভাবই পড়েছিলো।

এই বছরই ঢাকার প্রথম কবিতাপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী' (১৮৬১) প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর সম্পাদনায় বাঙ্গালা যন্ত্র থেকে। 'বাঙ্গালা যন্ত্রে'র পরিচালকরা যখন 'ঢাকা প্রকাশ' বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন হয়ত এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণচন্দ্রকেই তাঁদের কাছে যোগ্য মনে হয়েছিলো। এ ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম মতের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই ১৮৬১ সালে তাঁর সম্পাদনায়ই প্রকাশ শুরু হয়েছিলো 'ঢাকা প্রকাশ'-এর।

নর্মাল স্কুলের পনের টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ পঁচিশ টাকা বেতনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর চাকরি পেয়েছিলেন যশোরের এক স্কুলে ত্রিশ টাকা বেতনে কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ' কর্তৃপক্ষ তাঁর বেতন দশ টাকা বৃদ্ধি করাতে 'ঢাকা প্রকাশে'ই থেকে গিয়েছিলেন।

তবে, কৃষ্ণচন্দ্র বেশীদিন থাকেন নি 'ঢাকা প্রকাশ'-এ। চতুর্থ বছরে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ঢাকার আরেকটি সংবাদপত্র 'বিজ্ঞাপনী'তে পঞ্চাশ টাকা বেতনে। কিন্তু খ্যাতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তিনি ঠিক তাল মেলাতে পারেন নি। সঙ্গদোষ ও সুরাপানে আসক্তি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল বিপর্যয়ের দিকে। ১৮৬১ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামকিংকর সেনের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছিলেন যশোর জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত পদে। এবার স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার নেশাও। জেলা স্কুলে থাকতে তিনি সম্পাদনা করতেন একটি সাময়িকপত্র 'দ্বৈভাষিণী' [ সংস্কৃত ও বাংলায় ]। দীর্ঘ উনিশ বছর সেখানে তিনি জীবন যাপন করেছিলেন সাত্ত্বিক হিন্দুর মতো। ১৯০৭ সালে পরলোকগমন করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র।[৯] এ প্রসঙ্গে লিখেছেন আদিনাথ সেন "সদ্ভাব শতকের উপস্বত্ব নন্দকুমার গুহের নিকট ২৮০ টাকায় বিক্রয় করিয়া নিজ গ্রামে গিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় মারা যান।"[১০]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পর 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সম্পাদক হয়েছিলেন দীননাথ সেন। খ্যাতির মধ্যগগনে তখনও তিনি পৌছান নি বটে, কিন্তু একজন ব্রাহ্ম কর্মী হিসেবে ঢাকা শহরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বেশ প্রভাবশালী। চতুর্থ বর্ষের ২৩ থেকে ৩৬ সংখ্যা পর্যন্ত তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সময় 'ঢাকা প্রকাশ' বৃহস্পতিবারের বদলে শুক্রবারে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পঞ্চম বর্ষ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে রোববার থেকে ।

দীননাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঢাকার দাসরায় ১৮৩৯ সালে। কুমিল্লা জেলা স্কুলে এবং পরে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হন নি। [ বঙ্কিমচন্দ্রও সেবার পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়েছিলেন ] ফলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। এর কিছুদিন পর নিযুক্ত হয়েছিলেন নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পূর্ববাংলার স্কুল সমূহের ইনেস্পেক্টর হয়েছিলেন শেষ অবধি।

যৌবনেই দীননাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ তথা পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও পটুয়াটুলীতে [ ঢাকার ] পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনে পালন করেছিলেন তিনি অগ্রণী ভূমিকা। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়সে অবশ্য তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। দীননাথই খুব সম্ভব সবচেয়ে স্বল্পকাল ছিলেন ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক।[১১]

দীননাথের পর 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার আরেকজন ব্রাহ্ম কর্মী গোবিন্দ প্রসাদ রায় [ মাঝখানে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিলো পত্রিকা ]। পত্রিকার মালিকানাও হাতবদল হয়েছিলো তখন। গোবিন্দ প্রসাদ প্রথমে ছিলেন 'ঢাকা প্রকাশ'-এর বেতনভোগী কর্মচারী। পত্রিকা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করলে তিনিই এর স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। [ খুব সম্ভব বাঙ্গালা যন্ত্র সহ ] মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন তখন এ উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার [ উৎসব ] হয়েছিলো তাতে পূর্ববঙ্গের একমাত্র পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।[১২]

কিছুদিন পত্রিকা চালাবার পর গোবিন্দ প্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তখন পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছিলেন ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনাথ বন্ধু মৌলিক। দু'বছর সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। তারপর গোবিন্দ প্রসাদ সুস্থ হয়ে আবার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন পণ্ডিত বৈকুণ্ঠচন্দ্র নাথকে।[১৩]

১২৮৯ সনে গোবিন্দ প্রসাদের মৃত্যু হলে, 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'বাঙ্গালা যন্ত্র'-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জামাতা যাদবচন্দ্র সেন। দু'বছর চালিয়েছিলেন তিনি পত্রিকা। কিন্তু প্রতিযোগিতায় না পেরে তিনি "মানিকগঞ্জের অধীনে চারিপাড়া গ্রামবাসী তালুকদার বাবু গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরীর" কাছে প্রেস ও 'ঢাকা প্রকাশ'-এর স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ১২৯১ সালে তিন হাজার চারশ পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে গুরুগঙ্গা 'বাঙ্গালা যন্ত্র' ও 'ঢাকা প্রকাশ'-এর স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন।[১৪]

১২৯২ সনের পূজার পর তিনি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন পূর্ববঙ্গের তৎকালীন খ্যাতনামা কবি দিনেশচরণ বসুকে।

দিনেশচরণের জন্ম ১৮৫১ সালে, পূর্ণিয়াতে, পিতা অভয়চরণ বসুর কর্মস্থলে। তবে, পৈত্রিকবাড়ী তাঁর মানিকগঞ্জের শ্রী বাড়ীতে। ভাগলপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। কিন্তু শারীরিক কারণে আর তাঁর মেডিকেল পড়া হয় নি। তিনি চলে এসেছিলেন ময়মনসিংহে এবং শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলে। ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ময়মনসিংহ সভা'র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮১ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিলো ময়মনসিংহ থেকে সাপ্তাহিক 'চারুবার্ত্তা'। কবিতা উপন্যাস মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর আটটি গ্রন্থ।[১৫]

দিনেশচরণ পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েছিলেন সম্পাদক। এ সময় পত্রিকার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছিলো বাবু বাজার থেকে ইসলামপুরে ১৬ নং বাড়িতে। তবে, দিনেশচরণ সম্পাদক ছিলেন মাত্র দু'মাস। এরপর ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ

করেছিলেন এবং তখন স্বয়ং গুরুগঙ্গা নিজে ভার গ্রহণ করেছিলেন পত্রিকার। এবং এ সময়ই বদল ঘটে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ গুরুগঙ্গা ছিলেম গোঁড়া হিন্দু।

১২৯৩ সনের আষাঢ় মাসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—

"এইভাবে কার্য্যারম্ভ করার পর যাদব ও বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সুবুদ্ধিগণ আমার দুর্নাম রটাইয়া ঢাকা প্রকাশের হিতৈষী দলকে শত্রু করিয়া তুলিলেন। বৈকুণ্ঠবাবু শশীবাবুর সাহায্যে ঢাকা গেজেটের সৃষ্টি করিয়া ঢাকা প্রকাশের সমস্ত গ্রাহককে প্রায় বিনামূল্যে যোগাইতে ও তাহাতে আমাকে অশিক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ঢাকা প্রকাশের বিরুদ্ধে যেরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, মানুষের ক্ষমতার সেরূপ ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ঢাকা প্রকাশ দ্বারা বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্যই যেন স্বয়ং বিধাতা আমা দ্বারা এই দুঃসময়ে ঢাকা প্রকাশকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"[১৬]

চৈত্র ১২৯১ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮—এ ষোল বছর ঢাকা প্রকাশ সম্পাদনা করেছিলেন গুরুগঙ্গা আইচ। শেষের দিকে, ঢাকা প্রকাশের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করেছিলেন ঢাকা পৌরসভার সচিব সার্কিস, ঢাকা শহরের প্রভাবশালী নাগরিক রূপলাল সাহা ও 'শাহিন মেডিকেল হলের স্বত্বাধিকারী'। গুরুগঙ্গা প্রথম দুটি মামলা আপোষে মিটিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষটি মেটাতে পারেন নি এবং সে মামলায় তাঁর এক মাসের জেল হয়েছিলো। এসব ও আর্থিক কারণে ১৩০৮ সালে তিনি পত্রিকার স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসে "বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ খাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বিহারী চক্রবর্ত্তী বি. এ. এবং স্বাধীন ত্রিপুরার পরলোক প্রস্থিত মহারাজ নীরদচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অসরপ্রাপ্ত মন্ত্রণা সচিব বাবু রাধারমন ঘোষ বি. এ." ঢাকা প্রকাশের স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন।

পত্রিকার পটভূমিকা হিসেবে পর্ণেন্দু চক্রবর্তী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার অফিসে গেছেন রাধারমণ। সেখানে কথা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"তুমি যাহাই বল না কেন, যেখান হইতে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও পড়িবার যোগ্য একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারে নাই, সেদেশের শিক্ষা-দীক্ষার গৌরব করা যাইতে পারে না।" এ কথায় আহত হয়েছিলেন রাধারমণ। এর পরই তিনি স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন পত্রিকার।

তাঁদের সময়ও 'ঢাকা প্রকাশ'-এর নীতি তেমন পরিবর্ত্তিত হয় নি। 'ঢাকা প্রকাশ' পূর্ব্ববৎ সনাতন ধর্ম্মের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল এবং "রাজনৈতিক বিষয়ে মধ্যম পন্থাই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপনে চেষ্টা করিতেছে। এ নিমিত্ত বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁকে নানাবিধ বিপদে সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।"

পত্রিকা কেনার কিছুদিন পর মুকুন্দ বাবুই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদকও ছিলেন তিনি নিজে। ১৩০৯ থেকে পত্রিকার আকার বদলে গিয়েছিলো—ডাবল বছর। দীর্ঘ ত্রিশ বছর মুকুন্দ বাবুর সহকারী হিসেবে যারা যুক্ত ছিলেন পত্রিকার সঙ্গে তারা হলেন পণ্ডিত রাজকুমার চক্রবর্তী, পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, নিশিকান্ত ঘোষ, গিরিজাকান্ত ঘোষ, উমেশচন্দ্র বসু, হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন চৌধুরী এবং পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।[১৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সর্বশেষ সংখ্যাটির তারিখ ১২.৪.১৯৫৯। সম্পাদক আবদুর রশীদ খান। প্রকাশিত হতো ৫৯/৩ কিতাব মঞ্জিল, ইসলামপুর থেকে। অবশ্য, এর আগে থেকেই পত্রিকাটিতে নিলামের ইস্তেহারই অধিকাংশ জায়গা করে নিয়েছিলো। তাতে মনে হয়, চল্লিশ দশক থেকেই ঢাকা প্রকাশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলো এবং সম্মুখীন হচ্ছিলো প্রতিযোগিতার এবং এ জন্যই পত্রিকাটি পরিণত হয়েছিলো শেষ পর্যায়ে পত্রিকা থেকে নিলাম ইস্তেহারে।

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলে কিছু নেই। সংবাদ-সাময়িকপত্র সবসময় জনগণের একটি অংশের মত প্রকাশ করে মাত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদগুলির এর ব্যতিক্রম নয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদ সাময়িকপত্র সমর্থন করতো একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা দল বা সম্প্রদায়কে। যিনি এর কোনটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তিনি আপন রুচি, ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতেন সংবাদ-সাময়িকপত্রে। কিন্তু, তাঁর সঙ্গেও সম্পর্ক থাকতো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোন আদর্শের। যেমন, 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল প্রথমে ব্রাহ্ম এবং পরে গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সমসাময়িক 'ঢাকা নিউজ' সমর্থক ছিল নীলকরদের, 'বেঙ্গল টাইমস' ছিল ইংরেজদের। সে জন্য বর্তমান সংকলনে একটি রচনা ব্রাহ্মদের এবং তারপরের রচনা হিন্দুদের সমর্থন করলে পাঠকের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তখন ধরে নিতে হবে, ব্রাহ্মদের পক্ষাবলম্বন করলে সে সময় মালিক ছিলেন ব্রাহ্মরা, না হলে, গোঁড়া হিন্দুরা। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে, ১৮৮৫-এর দিকে, যখন গুরুগঙ্গা মালিকানা লাভ করেছিলেন 'ঢাকা প্রকাশ'-এর, তখন থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থক। তাই সংকলিত রচনা/সংবাদগুলিকে ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছিল প্রধানত রচনা ভিত্তিক। অর্থাৎ ছোটখাট সংবাদ ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই যে কোন একটি সংবাদ বা বিষয়কে নিয়ে ছাপা হতো বিস্তারিত আলোচনা বা মতামত। খবরের মধ্যে থাকতো স্থানীয় কিছু খবর আর থাকতো বিদেশী বা উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রকাশিত কাগজ থেকে সংগৃহীত খবর। সাথে সাথে ছাপা হতো মফস্বল থেকে পত্রিকার ভক্ত প্রেরিত সংবাদ। ছিল চিঠিপত্রের কলামও। তবে বিষয়ভিত্তিক রচনা বা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সম্পাদকরা তুলে ধরতেন নিজস্ব মতামত। 'ঢাকা প্রকাশ'ও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজস্ব মতামত থাকতো সম্পাদকদের। তবে, তাঁদের প্রধান সম্পাদকীয় বিষয় ছিল জমিদার রায়ত এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, সমাজ সংস্কার। ইংরেজ শাসন/প্রশাসন নিয়েও মন্তব্য করা হতো অহরহ। তবে, সম্প্রদায় বা দল বা গোষ্ঠীগত কারণে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম গুরুত্ব আরোপ করা হতো। কারণ, সমাজ বা রাজনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্ম, হিন্দু বা মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। কিন্তু, অন্তর্গত মিলও ছিল কিছু এবং সে মিলই ছিল ঔপনিবেশিক আমলের বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র যা ছিল পত্রিকার মূল নীতি নির্ধারণের ভিত্তি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি প্রথম খণ্ডে, তাই এখানে আর তা পুনরুল্লেখ করলাম না।

৪

দ্বিতীয় পর্বে, প্রথমেই সংকলন করা হয়েছে *মিত্র প্রকাশ* থেকে। দ্বিতীয় খণ্ডে *মিত্র প্রকাশ*-এর প্রথম এগারটি সংখ্যা থেকে সূচি ও উল্লেখযোগ্য অংশ সংকলিত হয়েছিলো। বর্তমান খণ্ডে দ্বিতীয় বর্ষের ১১টি সংখ্যা থেকে সংকলন করা হলো।

কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৭০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো 'মিত্র প্রকাশ'। উল্লেখ্য দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদনার সময়ই হরিশ্চন্দ্র পরলোকগমন করেন।

*মিত্র প্রকাশ* কেন প্রকাশ করা হয়েছিল? প্রথম সংখ্যায় [ বৈশাখ, ১২৭৭ ] সম্পাদক এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

'মিত্র প্রকাশ' প্রকাশিত হইতে চলিল। ইহা বঙ্গীয় সমাজে নব-নামে পরিচিত হইতেছে সত্য ; কিন্তু ইহার সম্পাদক বঙ্গীয় পত্রিকা পাঠক এবং গ্রাহক সমাজের পরিচিত পূর্ব্ব। সুতরাং ভূমিকায় তাহার আর এক্ষণে সাড়ম্বর-আর পরিচয় দানের অপেক্ষা করে না। কেবল পত্রখানীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে।

বঙ্গীয় সমাজে নানা বিষয়ে যে সকল পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, এখানীর দ্বারা তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। যে প্রণালীর পত্রিকার সংখ্যা সমধিক এতদ্বারা যথা-কথঞ্চিত তাহার সংখ্যা বৰ্দ্ধন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। প্রভাকর, সোম প্রকাশ বর্ত্তমান সত্ত্বে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রকৃতিকে আলোকিত করিতে যত্নবান হওয়া এবং অমৃতবাজার সমীপস্থ থাকা সত্ত্বে চিটাগুড়ের পসার প্রসারিত করিয়া প্রকতির সন্তোষসাধনে প্রয়াস পাওয়া সেইরূপ অপরিণামদর্শীর কার্য্য। সাম্প্রদায়িক বিষয়ের প্রচারার্থ হিন্দুহিতৈষিণী, হিন্দু রঞ্জিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঢাকা প্রকাশ যৎসামান্য নহে। সুতরাং তত্তৎ প্রণালীর পত্রিকার প্রচার অনাবশ্যকীয়। সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গীয়-সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকপত্রের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রচুর ; যে দুই চারিখানীর সদ্ভাব আছে, তাহাদেরও আয়তন অল্প, বিশেষ তাহাতে সময় ২ অন্যান্য বিষয় বিন্যস্ত হওয়াতে বঙ্গভাষার এবং সাহিত্য সমালোচনার নিমিত্ত প্রয়োজনানুরূপ সদুপায় সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না। আমরা বরাবর বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষপাতী, তদালোচনা ও তদ্রচনায় আমাদিগের সবিশেষ যত্ন আছে, সুতরাং এইবার আমরা এই চিরপ্রিয় বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই পত্রখানীর প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা দেশ, কাল, পাত্র তথা আত্ম অবস্থা এবং বিবেচনা করিয়া এই নবপত্র সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবধারণে বাধ্য হইয়াছি। ইহা সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ইহার আয়তন ৮ ফর্ম্মা, দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, ষট্ খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য আট আনা। প্রদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাশুল পৃথক দিতে হইবে।...

...এতৎপত্র প্রকাশক একমাত্র কারণ প্রণোদিত হইয়া ইহার প্রচারে প্রবৃত্ত হয় নাই। ত্রিবিধ কারণ সমবেত হইয়া তাহাকে এতৎকার্য্যে আকর্ষণ করিয়াছে। তদেকপূর্ব্বক পরিচিত অনুগ্রাহক এবং পাঠগবর্গের উত্তেজনা, দ্বিতীয়, ইহা যে খণ্ডে যন্ত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে তদাধকারী বালিয়াটি নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদার অনুগ্রহের সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রবৃত্তি, তৃতীয় প্রকাশকের সময়াসময় বোধ বিহীনাজীবীকা তৃষ্ণা।"

*মিত্র প্রকাশ* ছাপা হতো ডাবল কলামে এবং শিরোনামের নিচে লেখা থাকতো একটি শ্লোক 'মিত্র প্রিয়ানন্দ—বিধানদক্ষো মিত্রা প্রিয়োল্লাস নিরাস—শূরঃ নানার সৈমির্ত্তগুণ প্রকাশো মিত্র—প্রকাশোয় মুদেতুদারঃ ৷৷' *মিত্র প্রকাশ* প্রকাশের পর *ঢাকা প্রকাশ* লিখেছিল–'ঈদৃশ পত্রিকা এদেশে অতি বিরল।'

দ্বিতীয় বর্ষে 'মিত্র প্রকাশ' অল্প কিছুদিনের জন্য রূপান্তরিত হয়েছিল পাক্ষিকে। ১৮৭২ সালে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর অগ্রজ কালিদাস মিত্র কিছুদিনের জন্য হয়েছিলো '*মিত্র প্রকাশ*'-এর।

*মিত্র প্রকাশ* সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকায়, আনুমানিক ১৮৩৮ বা ১৮৩৯ সালে। পিতা অভয়াচরণ মিত্রের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। হরিশ্চন্দ্রের সারাটা জীবন কেটেছে দারিদ্রে। পড়াশোনা বিশেষ করতে পারেন নি বাল্যকালে, যা শিখেছিলেন তা নিজের চেষ্টায়ই। কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্র হরিশ্চন্দ্রকে কোন কিছুই দমিয়ে রাখতে পারে নি। মনোবল ও দৃঢ়তা ছিল তাঁর যথেষ্ট। বেঁচেছিলেন তিনি মাত্র তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর, কিন্তু এরি মধ্যে লিখেছিলেন বিয়াল্লিশটি বই, সম্পাদনা করেছিলেন সাতটি সংবাদ সাময়িকপত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশে এতোগুলি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে আর কেউ জড়িত ছিলেন বলে জানা যায় নি।

প্রথম জীবনে হরিশ্চন্দ্র ঢাকার এক বাংলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। তারপর কম্পোজিটরের চাকরি নিয়েছিলেন ঢাকার প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র বাঙ্গালা যন্ত্রে। ১৮৬৪ সালে কম্পোজিটরের চাকরি ছেড়ে, ইমামগঞ্জে স্থাপন করেছিলেন একটি মুদ্রণ যন্ত্র ও পুস্তকালয়। তাঁর মুদ্রণ যন্ত্রের নাম ছিল সুলভযন্ত্র। কিন্তু সুলভযন্ত্রও চলে নি বেশী দিন। ফলে, জীবনের বাকিটা সময় কাটিয়েছেন এ পত্রিকায় সে পত্রিকায়। এবং অবশেষে ১৮৭২ সালে পরলোক গমন করেছিলেন 'হা অন্ন হা অন্ন' করে।

হরিশ্চন্দ্র সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা মাসিক *কবিতা কুসুমাবলী*। ১৮৬০ সালে, বাঙ্গালা যন্ত্র থেকে মুদ্রিত পত্রিকাটির আরো দু'জন সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং প্রসন্নকুমার সেন। পত্রিকাটি দু'বছরের বেশী টেকে নি।

১৮৬২ সালে হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল আরেকটি মাসিকপত্র, নাম *অবকাশ রঞ্জিকা*। এর উদ্দেশ্য ছিল, সম্পাদকের ভাষায় "নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকদের অবকাশ রঞ্জন" করা।

*অবকাশ রঞ্জিকা* টিকেছিলো খুব সম্ভব আট'ন মাস। ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে নিজের প্রেস থেকে ছেপে বের করেছিলেন একটি সাপ্তাহিক-*ঢাকা দর্পণ*! এ পত্রিকাটিও টেকে নি বেশী দিন। ১৮৬৪ সালে এক মানহানির মামলায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো পত্রিকাটি। এরপর তিনি প্রকাশ করেছিলেন আরেকটি মাসিকপত্র *কাব্য প্রকাশ* এবং তারপর ১৮৬৫ সালে *হিন্দু হিতৈষীণী*। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি টিকে ছিলো যদিও হরিশ্চন্দ্র এর সম্পাদক ছিলেন প্রথম চার বছর। হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকলে, *সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়* লিখেছিলো—"বিধবাবঙ্গাদনা লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মহাশয় উক্ত পত্রিকাখানি লিখিতেছেন। হরিশবাবু এতকাল চির দুঃখিনী বঙ্গ বিধবাদিগের সপক্ষে লেখনী সঞ্চালন

করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।"

ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, *হিন্দু হিতৈষিণী* ত্যাগ করার পর হরিশ্চন্দ্র কিছুদিন রাজশাহীর বোয়ালিয়া ধর্মসভার মুখপত্র *হিন্দু রঞ্জিকার* সম্পাদকতা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত শেষ সাময়িকপত্র— *মিত্র প্রকাশ*।

সাংবাদিক হিসেবে কেমন ছিলেন হরিশ্চন্দ্র? তাঁর নিজের ভাষায়—

"হরিশের এই পণ যায় যদি এ জীবন
তবু কভু তোষামুদী করিবে না কায়রে।
প্রাণ চিরস্থায়ী নহে যায় যায় গ্রহ রহে
মান গেলে ছার প্রাণ রাখতে কে চায়রে॥"[১৮]

৫

১৮৯০ সাল থেকে শুরু হয়েছিলো পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সম্মেলন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো একটি পত্রিকা প্রকাশ করার।[১৮] এ পরিপ্রেক্ষিতে শশিভূষণ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিলো (আশ্বিন ১২৯৮) *সেবক*। দু'বছর চলার পর পত্রিকাটি কিছুদিন বন্ধ ছিল। তৃতীয় বর্ষে শ্রী নাথ চন্দের সম্পাদনায় আবার প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি।[১৯]

অনেকটা নিউজ লেটারের মতো ছিল *সেবক*। প্রতি সংখ্যায় থাকতো ধর্মবিষয়ক কিছু উপদেশ ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত সংবাদ। পঞ্চম বর্ষের একটি সংখ্যা থেকে অনুমান করা যায়, প্রতি বছর সম্মেলনে *সেবক*-এর একজন সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক নির্বাচন করা হতো। আরেকটি সূত্র অনুসারে দু'জন সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়—নবকুমার সমাদ্দার এবং শশীচন্দ্র ঘোষাল।[২০] শেষোক্তজন ছিলেন ষষ্ঠ বর্ষের সম্পাদক। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারি নবকুমার ছিলেন পঞ্চম বর্ষের। এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চব্বিশ, মূল্য এক আনা দু'পাই। প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশো পঞ্চাশ কপি।[২১]

*সেবক* কতোদিন চলেছিলো জানা যায় নি। তবে বেশিদিন যে চলেনি তা অনুমান করে নেয়া যায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন থেকে—

"সেবকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। গ্রাহকদিগের অগ্রিম মূল্যের উপরেই সেবকের জীবন নির্ভর করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিয়মিত সময়ে অনেকের নিকট হইতেই মূল্য পাওয়া যায় না। গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন যে, অতি শীঘ্র ষষ্ঠ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।"

*সেবক*-এর সাতটি সংখ্যা (১৩০৩-৪) পাওয়া গেছে। সাধারণত সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বর্ষ শুরু হতো বৈশাখ-এ। কিন্তু, *সেবক*-এর বর্ষ শুরু হতো বোধহয় পৌষ থেকে। কারণ, ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা শুরু হয় ফাল্গুন থেকে এবং অগ্রহায়ণ (১৩০৪) পর্যন্ত চলছে একই খণ্ড। সপ্তম খণ্ডে এ ক'টি সংখ্যা থেকে সামান্য কিছু সংকলন করা হয়েছিলো, বর্তমান খণ্ডে তা করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে।

[ উনিশ ]

বৈশাখ ১২৮৫ (১৮৭৮?) সনে, রুক্মিনীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো "বিবিধ সঙ্গীত ও নানা বিষয়কী কবিতা বিকাশিনী মাসিক পত্রিকা"—*কৌমুদী*। মাসিকপত্রটির এক বছরের বাঁধানো ফাইল দেখেছি। তা থেকে সূচিপত্র (যেভাবে ছিল) ও দুয়েকটি কবিতা নমুনা স্বরূপ সংকলিত হলো। কারণ এটি উল্লেখযোগ্য কোন সাময়িকপত্র নয়।

৬

বর্তমান খণ্ডের এই শেষ অনুচ্ছেদটি লেখার সময় নিজেকে অশেষ ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। এ কাজটি শুরু করেছিলাম ছাত্রাবস্থায় ১৯৭৩ সালে। কয়েকবছর পর প্রয়াত শ্রী বিনয় ঘোষের উৎসাহে কাজ শুরু করি। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গত শতকের পত্র-পত্রিকার খোঁজ শুরু করি। এবং ১৯৮৪-এর একটি পরিকল্পনা মাফিক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন শুরু করি। ১৯৮৫ সালে এ গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। আজ ২০০০ সালে নবম খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। উনিশ শতকের বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য। কোন গবেষক/পাঠক যদি উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত কোন সংবাদ-সাময়িকপত্রের খোঁজ দিতে পারেন তা'হলে হয়ত ভবিষ্যতে আরেকটি খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

প্রথম খণ্ডে, উনিশ শতকের বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের যে তালিকা ও সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, বলা বাহুল্য তা সম্পূর্ণ নয়। আরো অনেক পত্র-পত্রিকা হয়ত তখন বেরিয়েছিলো যা এখন হারিয়ে গেছে বা আমার চোখে পড়েনি। ভবিষ্যতে কোন গবেষক হয়ত সুষ্ঠুভাবে এ কাজ সম্পন্ন করবেন। সে আশায়ই রইলাম।

গত এক যুগ ধরে বাংলা একাডেমী এ গ্রন্থমালা প্রকাশ করছে। এর মাঝে অনেক পরিচালক, প্রকাশনাধ্যক্ষ বদলি হয়েছেন, চাকুরি ছেড়ে চলে গেছেন। ছয় সাতজন মহাপরিচালক এসেছেন। শুধু একজন নিজের জায়গায় থেকেছেন-জনাব আফজল হোসেন। গত একযুগে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আমার সমস্ত গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থমালার নয়টি খণ্ডের প্রকাশনার দায়িত্বটি সুচারুভাবে তিনিই সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সহৃদয়তা আমার প্রকাশের কাজকে সহজতর করেছে। গত কুড়ি বছরের এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি দেশ-বিদেশে অনেকের সহায়তা পেয়েছি, বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তারা সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ এ জন্য যে, এ দেশে মৃত্যুর আগেই একটি কাজ যা হাতে নিয়েছিলাম যৌবনে, তা সম্পন্ন করতে পেরেছি।

মুনতাসীর মামুন

৩. শ্রীমদ যোগশ্রমী পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য সম্পাদিত, *বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস,* ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা [ দ্বিতীয় সংস্করণ, সাল উল্লিখিত হয়নি ], পৃ. ৯২।

৪. *ঐ*।

৫. *ঐ,* পৃ. ৯৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বাংলা সাময়িকপত্র* (কোলকাতা, ১৩৪৬-এ লিখেছেন 'ঢাকা প্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২৫-এ ফাল্গুল, ২৪- ফাল্গুন নয়। কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন 'ইহা মুদ্রাকব প্রমাদ'। তাঁর মতে, '... ইহার সপ্তম সংখ্যাব তারিখ ৭ই বৈশাখ ১২৬৮, বৃহস্পতিবার। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে ঢাকা প্রকাশের প্রথম সংখ্যা হয় ২০-এ ফাল্গুন ১২৬৭ (৭ই মার্চ ১৮৬১), বৃহস্পতিবার)।'

৬. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, 'অনুসন্ধান', ৩০ ফাল্গুন, ১২৯৮, উদ্ধৃত, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য,* পৃ. ১৬৬।

৭. পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ঢাকা প্রাশের জীবন কথা' *ঢাকা প্রকাশ,* ৭০ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৭ বৈশাখ, ১৩৩৭।

৮. ব্রজেন্দ্রনাথের *প্রাগুক্ত* গ্রন্থ, পৃ. ২৪৪-২৬৫।

৯. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত,* কলকাতা, ১৯১১। বা. সে, *ইতিবৃত্ত,* ঢাকা ১৮৬৮।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র* (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৯৬৫।

১০. আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ,* কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ৪০।

১১. বিস্তারিত বিবরণেব জন্য দেখুন *উপর্যুক্ত গ্রন্থ*।

১২. পূর্ণচন্দ্রের *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ*।

১৩. *ঐ*।

১৪. *ঐ*।

১৫. বিস্তাবিত বিবরণের জন্য দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচবণ বসু,* (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৩৬২।

১৬. পূর্ণচন্দ্রের *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।*

১৭. পূর্ণচন্দ্রের *প্রাগুক্ত প্রবন্ধ*।
বিস্তাবিত বিবণের জন্য দেখুন : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদাব, হরিশ্চন্দ্র মিত্র* (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) চতুর্থ সং, কলকাতা, ১৯৬৫।
কেদারনাথ মজুমদার *বাংলা সামযিক সাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ময়মনসিংহ, ১৯১৭। মুনতাসীর মামুন, *হরিশ্চন্দ্র মিত্র,* ঢাকা, ১৯৯৪।

১৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৪২।

১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৬২।

২০. *Bengal Library Catalogue,* Calcutta, Jan-June, 1898.

২১. *ঐ*।

# সূচিপত্র

# সমাজ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাংলার সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সময় বিশেষ করে ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত বাংলার সমাজ জীবন ক্রমেই জটিল এবং কলরবমুখর হয়ে উঠেছিল। এ সময় প্রসার ঘটেছিল শিক্ষিত পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণীর এবং সমাজে আধিপত্যকারী শ্রেণী হিসেবে তারা হয়ে উঠেছিল প্রভাবশালী। ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে এই শ্রেণীর সহযোগিতা [ দ্র: তৃতীয় খণ্ড ] এর একটি কারণ। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে কিছু কিছু স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল [ দ্র: তৃতীয় খণ্ড ] যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ভাবধারার। এই সময়ের বিভিন্ন আন্দোলন এর প্রমাণ।

ঔপনিবেশিক কারণেই আমরা লক্ষ্য করি এ সময় সমাজ চিন্তায় প্রবল বৈপরীত্য দেখা দিয়েছিল। ফলে, জাতীয় চেতনা দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক কারণে। যেহেতু, হিন্দু সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ছিল প্রবল, সে জন্য চেতনার প্রধান ধারা গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্যিক হিন্দু ভাবধারাকে আশ্রয় করে।

'ঢাকা প্রকাশ'-এ যেসব বিষয় ঘুরে ফিরে আলোচিত হয়েছে সেগুলি হলো—সমাজ সংক্রান্ত সাধারণ চিন্তা ভাবনা, সমাজে মহিলাদের স্থান, বিধবা, কুলীন, বহু ও বাল্যবিবাহ। এসব বিষয় নিয়ে প্রথম পর্বেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং সরকার আইন করে অনেক বিষয় নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন সংস্কারবাদীদের পক্ষে। প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এগুলি তবে, পূর্ববঙ্গে এর রেশ পৌঁছেছিল। কিন্তু এসব বিষয়ের নিষ্পত্তির পরও, পূর্ববঙ্গে এর আলোচনা থেমে থাকেনি এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এই আলোচনা শুরু হতো কলকাতার কোন পত্রিকার রচনার সূত্র ধরে।

বিদ্যমান সমাজ সম্পর্কে সব সময় আক্ষেপ করা হয়েছে। অবশ্য 'সমাজ' বলতে তারা বুঝিয়েছেন হিন্দু সমাজকে। ব্রাহ্মদের নিয়ন্ত্রণে পত্রিকা থাকাকালীন বলা হয়েছে, প্রাচীন পন্থীদের কারণে অগ্রসর হচ্ছে না সমাজ। রক্ষণশীলদের হাতে পত্রিকা থাকাকালীন জানান হয়েছে, ব্রাহ্ম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের কারণে সমাজ রসাতলে যাচ্ছে। তবে, দুপক্ষই সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে সমাজ নিয়ে চিন্তা করার জন্য।

১৮৮৪ সালে, 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল, বর্তমানে সবাই রাজনীতি নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। তা না করে 'সমাজের সঙ্গে যাহার সংশ্রব আছে, যিনি বর্তমানে বঙ্গীয় সামাজিক প্রথা অবগত আছেন, তিনি জনেন যে, আমাদের বর্তমান সমাজ কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ।'[১] আরো লিখেছিল পত্রিকা, 'বাল্য বিধবার মর্ম্মভেদী মনস্তাপ, বহুবিবাহের বিষময় ফল, কন্যা ও পুত্রপত্রের বিষম উপদ্রব প্রভৃতি সামাজিক পাপসকল সমূলে উৎপাটিত না হইলে, একমাত্র রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিয়া বঙ্গবাসী কখনই সর্ব্বাঙ্গীন সুখ শান্তি ভোগে অধিকারী হইতে পারিবেন না।'[২]

'উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারী জাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা। প্রায় সব সংস্কারই বেদনায় বেদনার্দ্র প্রায় প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা ও নারীর বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এ সময় বাংলার চিন্তানায়করা নারী কল্যাণেই যেন তাদের সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। যার প্রকাশ সতীদাহ নিবারণে, বিধবা বিবাহ আইনে, কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়াসে, পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত এ দেশীয় সংস্কারকদের কাছে স্বদেশীয় নারীর অসহায় লাঞ্ছিত রূপটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।'[৩]

প্রায় একই মন্তব্য করেছেন বিনয় ঘোষ। লিখেছেন তিনি, 'নবযুগের বাঙালীর [ হিন্দু সম্প্রদায় ] সমাজ সংস্কারের ধারার মধ্যে এই সঙ্গতি কি আকস্মিক, না ঐতিহাসিক, না আত্মিক? বাংলাদেশ মাতৃরূপে শক্তি সাধনার দেশ। মাতৃধ্যান, মাতৃচিন্তা ও মাতৃকাতরতার মধ্যে বাঙালী আত্মিক রূপটিই যেমন প্রকট হয়ে ওঠে, তেমন আর অন্য কিছুতে হয় না। 'মা' বাঙালীর মর্ম্মমূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাই দেখা যায়, সমাজ চিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই, বাঙালী শক্তি স্বরূপ মাতৃচিন্তার উৎস থেকেই অনুপ্রাণনা আরোপ করেছেন সবচেয়ে বেশী। হিন্দু সমাজের অন্যায় অবিচার ব্যভিচার ও কুসংস্কারগুলি তাই মনে হয় বাংলার মাতৃমূর্তির মালিন্যের মধ্যে সর্বাগ্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে।'[৪]

গঙ্গাযাত্রা বিষয়ে মন্তব্য করেছিল ঢাকা প্রকাশ—'যখন গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করিলেই গঙ্গাযাত্রার সমান ফল হয় বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তখন দূষিত গঙ্গাযাত্রা প্রথা উঠাইয়া দিলেও হিন্দু দিগের তাদৃশ মনোক্ষোভ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।'[৫] বা ১৮৬৬ সালে ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—বিধবার গর্ভসঞ্চার হলেও ভ্রূণ হত্যা যেন না করা হয়।[৬] তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এসব নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক

বহু বিবাহ নিবারণ, বিবাহের ব্যয় হ্রাস, বাল্য বিবাহ ও কুলীন প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ঢাকা প্রকাশ-এ প্রতিনিয়ত [ দ্র: ৩য় খণ্ড ] প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ করে যখন পত্রিকাটি ব্রাহ্ম নিয়ন্ত্রণে ছিল।

'বহু বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে লেখা হয়েছে— "কুলীন তনয়াগণ! তোমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। বিদ্যাসাগর সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষিত হউন, তিনি যেন মুহূর্তের নিমিত্ত তোমাদিগকে বিস্মৃত না হন। যদি এ সহায় বলেও তোমাদিগের উদ্ধার না হইবে তবে নিশ্চয় জানিবে, তোমাদের এ ঘোর দুঃখ বিভাবরী প্রভাত হইবার অনেক বিলম্ব আছে।'[৭]

বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলন করা যাবে কিনা সে নিয়ে বিতর্ক উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই শুরু হয়েছিল। ভারতীয় আইন কমিশন ১৮৩৭ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও এলাহাবাদের সদর আদালতের বিচারকদের মতামত জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁরা বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছিলেন তবে সরকারী আইন করার বিরোধী ছিলেন।[৮]

বিধবা বিবাহ নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন ১৮৫৪ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার ফলে হিন্দু এলিট সমাজে এ বিষয় নিয়ে বিতর্ক আরো জোরদার হয়ে উঠেছিল।

বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ফলে এটি পরিণত হয়েছিল আইনে। উনিশ শতকের পত্রিকাগুলি বিধবা বিবাহের সমর্থনে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করত তার ভিত্তি ছিল বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'। লিখেছিলেন বিদ্যাসাগর—

'দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা আজীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে ; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।'[৯]

'ঢাকা প্রকাশ' যখন ব্রাহ্মদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তখন উপর্যুক্ত মত সমর্থন করেছে, যখন তা ছিল না তাদের নিয়ন্ত্রণে তখন বিপরীত মত প্রকাশিত হয়েছে। আশীর দশকের মাঝামাঝি থেকে আমরা এসব সংস্কারের বিরোধী মত পাই যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের উত্থানই ইঙ্গিত করে। তাই দেখি ১৮৮৬ সালে মন্তব্য করেছে 'ঢাকা প্রকাশ'—'বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ'। বিধবা বিবাহ–এর বিপক্ষে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের পক্ষ অবলম্বন করে লিখেছিল পত্রিকা, যে, যারা এই ধরনের গ্রন্থকে অবহেলা করে, 'বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিবেন। তাঁহারা নিশ্চয় সতীত্ব হরণের প্রশ্রয় দাতার পাপে নিমগ্ন হইয়া ইহপরকালে সন্তাপিত হইবেন।'[১০]

অথচ এর দশ বছর আগে, ময়মনসিংহের গৃহবধূ বসন্তকুমারী দাসী লিখেছিলেন তাঁর গ্রন্থে যে, বিধবা বিবাহ তিনি সমর্থন করেন এবং 'আমি বোধ করি হিন্দুরা যদি কৌলীন্য মর্যাদা ত্যাগ করিয়া, বাল্য বিবাহ দূর করতঃ কৃতান্ত সদৃশ শুক্র বিক্রয়ে ক্ষান্ত হইয়া, স্বয়ম্বর বিধির বিধান করেন, তাহা হইলে অবশ্যই অচিরে মঙ্গল কামনা সফল হইতে পারে।'[১১]

কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বা কন্যাপণ নিয়ে উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই আলোচনা শুরু হয়েছিল বিদ্বৎজনের মধ্যে। গত শতকের গোড়া থেকেই প্রতিবাদ জানান হয়েছিল কৌলীন্য প্রথা অবসানের জন্য। বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এ নিয়ে পূর্ববঙ্গে প্রবল আন্দোলন শুরু করেছিলেন পুস্তিকা, গান রচনা করে। সংবাদ সাময়িকপত্র ছাড়াও গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে এসেছিল কৌলীন্য প্রথা এবং ১৮৯৫–এর দিকেও দেখি, কৌলীন্য প্রথার রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি। এর একটি উদাহরণ একটি উপন্যাস। লিখেছিলেন প্যারিশঙ্কর গুপ্ত। নাম 'কৌলীন্য মহিমা'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে বগুড়া থেকে।

উপন্যাসের নায়িকা সুশীলা কুলীন ঘরের মেয়ে। নায়ক সুশীল 'শ্রোত্রীয়' পরিবারের। দু'জনেই ভালোবাসে দু'জনকে। কিন্তু সংস্কারের কারণে বিয়ে করতে পারে না। সুশীলের খ্যাতি সাধু পুরুষ হিসেবে। সুশীলারও। সুশীলার কারণে সুশীল বিয়ে করেনি, পরে মৃত্যু হয়েছিল সুশীলার। সুশীলা যখন সুশীলকে বিয়ে করতে মিনতি করেছিল তখন বলেছিল সুশীল—'দুজনে এক পরিবারে এক অবস্থায় পালিত, তোমারও যে ক্লেশ আমারও সেই ক্লেশ,

তুমিও যে মূর্খ পাপ দেশাচারের আহুতি আমিও তাই। তোমার দিকে চাহিয়া কি আমার সুখী হইতে ইচ্ছা করে?'[১২] উত্তরে বলেছিল সুশীলা '... তুমি দেশাচারের সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া আত্মবিসর্জন করিও না। তোমার ন্যায় সাধুর বংশ রক্ষা হইলে কালে দেশাচারকে পরাজিত করিতে পারিবে, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় দেশাচারের উপরে রাগ করিয়া জীবন ক্ষয় করিলে কি হইবে?'[১৩] মৃত্যুর আগে সুশীলা আক্ষেপ করে সুশীলকে লিখেছিল—'...এ মূঢ় বঙ্গদেশে দেবীবর ঘটকের পরে ব্রাহ্মকুলে কোনো পণ্ডিত হয় নাই, আজিও এ মূর্খ জাতি সেই পাপের বোঝা বহিতেছে। তুমি সুশীল, তুমিই এ কথা বুঝিলে না, অন্যের কথা কি?'[১৪]

কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে জড়িত বহু বিবাহের বিষয়টি। তিরিশের দশকে জোরালো বিতর্ক শুরু হয়েছিল বহু বিবাহ নিয়ে, তবে, এ বিষয়ে উৎসাহ হ্রাস পেয়েছিল, কারণ, 'বিদ্যাসাগরের মতো কোন সংস্কারক এই সময় এই আন্দোলনকে সংহত করে তার মধ্যে প্রাণের আবেগ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়েছিলেন!'[১৫] তবুও পঞ্চাশের দশকে দেখি, বিভিন্ন জায়গা থেকে আবেদনপত্র পাঠানো হচ্ছে সরকারের কাছে। কিশোরী চাঁদ মিত্র সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ১৮৫৫ সালের ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ রদের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন আবেদনপত্র, 'ঢাকা প্রকাশ'-এ দেখি, ১৮৬৬ সালে, কন্যাপণ ও বহুবিবাহ রহিত করার জন্য ১৮৬৬ সালে বাংলা সরকার ইংরেজ ও বাঙালী সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু, বিদ্যাসাগর ছাড়া আর সবাই সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। ফলে, সরকার আর এ ব্যাপারে বেশী অগ্রসর হন নি।[১৬] অন্যরাও এ বিষয় নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। এ কারণেই বোধহয় আক্ষেপ করে লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'—

'অদ্যাপি হিন্দু সমাজের উপর প্রাচীন দিগেরই অসাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে। বলিতে কি, হিন্দু সমাজ তাঁহাদেরই করতলস্থ। তাহারা যেরূপ ইচ্ছা করেন, হিন্দু সমাজকে সেই রূপই করিতে পারেন।'

বাল্যবিবাহ নিয়েও তখন শুরু হয়েছিল বিতর্ক। সেই, ১৮৬৩ সালে কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছিলেন—'এই বাল্য বিবাহ যে অতি অনিষ্টের মূল তাহা কাহার না বিদিত আছে, এবং এই বাল্য বিবাহই আমাদিগের হীনাবস্থার এক প্রধান কারণ হইয়াছে, এই বাল্যবিবাহই আমাদিগের দুর্ভাগ্যের সোপান স্বরূপ! হে স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণ! তোমরা অগ্রে এই বিষম অনিষ্টকর বিষয়টী নষ্ট করিয়া সাধারণের কষ্ট দূর কর, পরে অন্য বিষয়ে হস্তার্পণ করিবে। ...আহ! আমাদিগের দেশে যদি এই বাল্য বিবাহ প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের এ দেশে কত সুখজনক হইত তা বলা যায় না।'[১৭]

ঢাকা থেকে ১৮৭০ সালে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'...বাল্যবিবাহ নিতান্ত দূষণীয় ও বিশেষ অনিষ্টের বলিয়াও অনেকে স্বীকার করে; ইহার নিরাকরণও সমাজের নিতান্ত অনভিমত নহে। তবে কি কারণে রহিত হয় না, বলিতে পারি না। বোধ হয় দেশাচার। এই দেশাচারই আমাদিগের সর্বনাশ করিবে। যে দেশে দেশাচারই ধর্ম, সে দেশের মঙ্গল নাই।'[১৮]

পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে নারী স্বাধীনতা বা স্ত্রী শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে ব্রাহ্মরাই চিন্তা শুরু করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তারা কিছু করারও প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে, স্বাভাবিকভাবেই সতর্কভাবে তাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে পত্র-পত্রিকায়

লেখালেখি ছাড়াও নানাবিধ পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল যাতে প্রতিফলিত হয়েছিল নারী স্বাধীনতা বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গী। উদাহরণস্বরূপ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্ত্রী শিক্ষা'র কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

কামাখ্যাচরণ ছিলেন, ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব সহকারী শিক্ষক। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধে। কিন্তু তখনও এই শিক্ষিত শিক্ষক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সবদিক থেকেই স্ত্রীরা পুরুষের অধীন। এ কথা প্রমাণের জন্য মহাভারত, 'মনু' মেডিকেল বিদ্যা থেকে যথেষ্ট উদাহরণ দিয়েছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ পৃষ্ঠা উদাহরণ দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে—'স্ত্রীগণ পুরুষের সমান অধিকার কিছুতেই পাইতে পারেন না। যে স্থলে ভগবান তাহাদের কোনো বিষয়েই সমান ক্ষমতা দেন নাই, সে স্থলে তাহারা কিরূপে পুরুষের সমান ইচ্ছা করিতেছেন?'[১৯]

শুধু তাই নয়, পুরনো ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি থেকেও উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, অবরোধপ্রথা প্রাচীনকালেও ছিল এবং তা থাকা ভালো। বলেছেন তিনি, স্ত্রী লোকের অনেক অসুখ হয় পুরুষদের হয় না। সুতরাং, 'যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণ জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন,—যে প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিয়া আধুনিক ভারতেও কর্ম্মদেবী, কমলাবতী, লক্ষ্মীবাঈ...প্রভৃতি রমণীগণ অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন—যে প্রণালীর শিক্ষালাভ করিয়া, ভারতের প্রতি নগরের, প্রতি গ্রামের, প্রতি গ্রহের অধিকাংশ রমণী দয়া ধর্ম্ম, সতীর, ক্ষমা, বিনয় ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান এই শোচনীয় অবস্থায় সেই প্রণালীর শিক্ষা ভারত রমণীকে প্রদান করা কর্তব্য।'[২০]

তৎকালীন ব্রাহ্মকর্মী, সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কি ধরনের স্ত্রী স্বাধীনতা?—

'...কুলবধূদিগের স্বাধীনতা যেন আবার বিষম পরাধীনতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করে। ইদানীন্তন সময়ের অনেক ব্যক্তি দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া, অন্তঃপুর নিবাসীদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অপরিচিত লোকদিগের সন্নিধানে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের হৃদয়ের নিতান্ত অসহনীয় নানাবিধ কার্য্যেও প্রবর্ত্তিত হইতে অনুরোধ করেন। ঈদৃশ আচরণ যে কতদূর অসামাজিক অনিষ্ট এবং নিষ্ঠুর, তাহা আমরা বাক্য দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ নহি। আমরা কি এইক্ষণে এক কুসংস্কারের আনুগত্য স্বীকার করিব? আমাদিগের সকলেরই ইহাতে বিশ্বাস করা উচিত যে, বিশুদ্ধ লজ্জা অপেক্ষা কুলনারীর প্রিয়তার আভরণ আর কিছুই নাই। ...পুর বধূদিগকে, ন্যায় এবং ধর্ম্মের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া প্রগাঢ় এবং প্রসারিত শিক্ষা প্রাদান কর; সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশও দাও; তাহাদিগের বুদ্ধি এবং মানসিক অপরাপর শক্তি যাহাতে সুন্দররূপে বিকশিত হইতে পারে, তৎপক্ষে হৃদয়ের প্রতি যত্নশীল হও; সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কতদূর স্বাধীনতা তাহারা সম্মানের সহিত ভোগ করিতে পারে তাহারাই তাহার বিচার করিবে।...অপ্রাকৃত স্বাধীনতা স্বাধীনতার বিড়ম্বনা।'[২১]

একই বিষয়ে একজন মহিলার দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করা যাক। বসন্তকুমারী দাসী ১৮৭৫ সালে তাঁর 'যোষিদ্বিজ্ঞান' গ্রন্থে লিখেছিলেন—স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে বেশ তর্ক হচ্ছে। কিন্তু যদি

কর্ত্তব্য জ্ঞানের স্বাধীনতা স্বীকারে স্বাধীনতার বাধা না হয় তবে পুরুষ জাতির অধীন বলিয়া রমণী কুলেরই বা দোষ কি?'[২২] এ ছাড়া স্ত্রী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য তো বটেই মানসিক পার্থক্যও আছে। পুরুষরা নানাবিধ রোজগার করতে পারে এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়, রমণীরা পুরুষের অধীনে থাকবে। 'অতএব স্বাধীনতা লালসার বশবর্ত্তিনী হইয়া তদ্বিপরীতাচরণ করিলে যে নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘনজনিত রমণী সমুচয়ের বিষয় বিভ্রাট ঘটিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'[২৩] সুতরাং, 'অবলাগণের যদি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি থাকে তবে অগ্রে জ্ঞানোপার্জনের দ্বারা সেই ইচ্ছাকে পবিত্র করিয়া তৎপরে স্বাধীনতা সাধন করা উচিত।'[২৪]

গত শতকের শেষের দিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে, সামগ্রিকভাবে আবার উল্লিখিত বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, ১৮৮০ সালে ব্রাহ্মরাই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা শুরু করেছিলেন, তা'হলে 'নব্য হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারকরা তার প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারেন তা সহজেই কল্পনা করা যায়।' ১৮৭৫ সালের ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল 'আমরা স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী'। লিখেছিল সোম প্রকাশ : 'দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যদ্যপি আমরা এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করি, তাহা হইলে পরে আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে।'[২৫] সুতরাং, ঐ সময়কার 'ঢাকা প্রকাশ'-এর দেখি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে সংস্কারকদের। বাল্যবিবাহ প্রশ্নে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমালোচনা করে পত্রিকাটি লিখেছিল,—'১৭/১৮ বৎসর বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া আধুনিক প্রথা, আমরা তাহার সমর্থনকারী নহি। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে উহা ২১ বৎসরের যুবক ও ২০ বৎসরের যুবতীর বিবাহ হইতে হিতকর বটে।'[২৬] এ তর্কবিতর্কের নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর। এই আইনে কনের সর্বনিম্ন বয়স স্থির করা হয়েছিল বারোতে।

ঢাকা প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করেছে মধ্যশ্রেণী। তাই ঐ শ্রেণীর চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে পত্রিকায় স্বাভাবিকভাবেই। তবে, গোঁড়া হিন্দু বা ব্রাহ্মদের যাদের নিয়ন্ত্রণেই পত্রিকাই থাকুক না কয়েকটি বিষয়ে তারা মোটামুটি ঐকমত্য প্রকাশ করেছে। সুরাপান, বিবাহে খেমটা নাচ, বাবুগিরি, পাশ্চাত্যের প্রতি বেশি ঝোঁকের সবসময়ই সমালোচনা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা প্রকাশ মন্তব্য করেছিল, যদিও অনেকে মনে করেন ইংরেজরা আদর্শস্থানীয় আসলে তারা তা নন। মধ্যশ্রেণীর শুধু সরকারি চাকুরিপ্রীতির সমালোচনা করে ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল—'এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজ মানহানির আশঙ্কায় কৃষিকার্য করিতে পারেন না ; শিল্প কার্য্যে হাত দেন না, দিতে চাহিলেও পারিয়া উঠেন না, ইহারা বাণিজ্যও করিতে জানেন না।'[২৭]

'সামাজিক আন্দোলন' উপ শিরোনামে ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে বেশ কিছু সংবাদ/রচনা সংকলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। চতুর্থ খণ্ডে, সামাজিক আন্দোলন শীর্ষক মূল শিরোনামে বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে কিছু রচনা/সংবাদ সংকলিত হয়েছে। তাই এখানে সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করব না। এখানে শুধু ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে কিছু তথ্য সংযোজিত করব।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল সংস্কারমূলক এবং এ আন্দোলন সমাজে একটি গ্রুপের সদস্যদের বিশ্বাস, ব্যবস্থা ও জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এনেছিল। এ আন্দোলনের ছিল একটি

আদর্শ। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মাধ্যমে হলেও ব্রাহ্ম আন্দোলন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সহায়তা করেছিল একটি জনমত গঠনে, খানিকটা পরিবর্তনও ঘটিয়েছিল ঐতিহ্যগত শক্তিসাম্যের।

উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রধান যা ঐতিহ্যগত হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্যের খৃস্ট ধর্মের নীতিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল।[২৮] রেঁনেসার সময়, প্রটেস্টান্ট আন্দোলন ইউরোপের জন্য যা করেছিল, বাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলন অনেকটা তাই করেছিল, অবশ্য, প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের প্রভাব তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু, বাংলার সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর একটি বিশেষ অংশে ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল, সৃষ্টি করেছিল কিছু নতুন মূল্যবোধের, সচলতা এনেছিল অনড় সমাজে বাদ প্রতিবাদ, তর্ক বিতর্ক আলোড়ন তুলে। ব্রাহ্ম আন্দোলন অন্তত সে জন্যে উনিশ শতকের বাংলায়তো বটেই পূর্ববঙ্গের সমাজের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ববঙ্গে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায়। ১৮৪৬ সালে স্থাপিত ঢাকার সমাজ ছিল কলকাতার বাইরে স্থাপিত প্রথম সমাজ। ঢাকার সমাজ গড়ে উঠেছিল কলকাতার সমাজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে। ঢাকা সমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ব্রজসুন্দর মিত্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কখনও দেখা হয়নি বা তিনি কলকাতা সমাজের সভ্যও ছিলেন না। তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা ধরলে বলতে হয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পড়েই ব্রজসুন্দর সমাজ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। খারাপ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং প্রচারকের অভাবে ঐ সময় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের পর অবশ্য কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এবং পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম বিস্তারে কলকাতার সমাজ নানাভাবে সহায়তা করতে থাকে। শুধু তাই নয়, কলকাতার ব্রাহ্মদের জোরের কারণ ছিল ঢাকার এই সমাজ।[২৯]

ঢাকার সমাজ স্থাপনের পর ১৮৭০ এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রধান প্রধান শহরগুলিতে স্থাপিত হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজ। ঢাকার সমাজকে সংহত করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল প্রচারক। এ ব্যাপারে কলকাতা থেকে প্রেরিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রচারকের প্রচার ছাড়াও পূর্ববঙ্গের কোনো ব্রাহ্ম নিজ কর্মস্থল ছেড়ে অন্যকর্মস্থলে গেলে একটি ব্রাহ্ম সমাজ বা স্কুল গড়ার চেষ্টা করতেন সেখানে।

ব্রজসুন্দর মিত্র ও অন্যান্যরা ঢাকায় প্রথম সমাজ স্থাপন করলেও দীননাথ সেন বা পরবর্তীকালে বঙ্গচন্দ্র রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় বা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তরুণ, ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দেয়া পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন, আন্দোলন হয়ে ওঠেনি। কলকাতার মত পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজও ভেঙ্গেছে তিনবার কিন্তু সমাজের তরুণ কর্মীরা ক্ষান্ত দেননি সমাজ সংস্কারে।

এটা ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সংখ্যা বেশী ছিল না। অনেকে হয়ত ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন, সহানুভূতিও দেখাতেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৮৭৭ সালের তালিকা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজের সংখ্যা ছিল ২০টি। ১৮৯২ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সব মিলিয়ে ৪২ টিতে। কিন্তু, উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রাহ্মদের প্রভাব

কমতে থাকে। পূর্ববাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে অজ পাড়াগাঁয়ে সমাজ স্থাপিত হলেও প্রভাবশালী সমাজ ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালে।

পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূত্রপাত ১৮৪৬ সালে হলেও তা বিকশিত হয়েছিল ১৮৬০ এর দিকে। ১৮৬০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত বলা যেতে পারে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের স্বর্ণযুগ। ঐ সময় পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজ এবং ব্রাহ্মরাও বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর দেওয়া তালিকা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে—

ক. ১৮৪০-৫০ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল শুধু ঢাকা ও কুমারখালীতে।

খ. ১৮৫০-৬০ এর ভেতর সমাজ স্থাপিত হয়েছিল চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া ও কুমিল্লায়।

গ. ১৮৩০ থেকে ১৮৮০ এর ভেতর ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়েছিল, যশোর, বরিশাল, দিনাজপুর, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, কুড়িগ্রাম, পিরোজপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে।[৩০]

১৮৬০ এর আগে ঢাকা ও মফস্বলে স্থাপিত সমাজগুলোর শক্তিশালী কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না। সরকারী কার্যোপলক্ষে কোনো ব্রাহ্ম কোথায়ও বদলি হয়ে গেলে তিনি হয়ত সেখানে একটি সমাজ স্থাপন করতেন। প্রধানত তাঁকে কেন্দ্র করেই তাঁর বন্ধু বান্ধবসহ সমাজ গড়ে উঠত। যেমন, ব্রজসুন্দর ঢাকায় থাকাকালীন স্থাপন করেছিলেন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ, পরে কুমিল্লায় বদলি হলে সেখানে স্থাপন করেছিলেন কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ। ভগবানচন্দ্র বসু ময়মনসিংহে কার্যোপলক্ষে গেলে সেখানে সমাজ স্থাপন করেছিলেন। দিনাজপুরে প্রায় একক প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেছিলেন ভুবনমোহন।[৩১] কার্যোপলক্ষে আবার তাঁরা বদলি হয়ে গেলে সমাজের কাজ ঝিমিয়ে পড়ত।

১৮৬০ এর পর দেখা যায়, স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা আগ্রহী হয়ে উঠছেন সমাজ সম্পর্কে। স্থানীয়ভাবে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাও এর কারণ হতে পারে। এঁদের অধিকাংশ নিজ এলাকাতেই থাকতেন। এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর পুরো সময়টা ব্যয় করতেন সমাজের কাজে। এভাবে এ সময় থেকে পূর্ববঙ্গের সমাজগুলি একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এবং তাদের কাজকর্ম সংহত করে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ বছরগুলিতে সবসময়ই কিছু তরুণ ছাত্র শিক্ষক কর্মী পাওয়া গিয়েছিল যারা প্রবীণদের সঙ্গে মতে না মিললেও নিজেদের কাজ করে যেতে কসুর করেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, এ সময় সমাজগুলিতে একক প্রাধান্য লুপ্ত পেয়েছিল এবং বিস্তৃত হয়েছিল যৌথ প্রাধান্য। তবে মনে হয় ১৮৭৮ এর বিভক্তির পর ব্রাহ্ম সমাজের প্রাধান্য কমে আসতে থাকে এবং ১৮৯০ এর পর তা একেবারে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এবং ঐ সময় যে প্রাধান্যটুকু ছিল তা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের, নববিধানের নয়। কারণ ঢাকারতো বটেই, মফস্বলেও অধিকাংশ ব্রাহ্ম ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সমর্থক তবে ঐ সময় ব্রাহ্মদের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুদের পার্থক্য করা মাঝে মাঝে মুশকিল হয়ে উঠত, তাদের গোঁড়ামীর কারণে। ফলে এ সময় থেকে গুরুত্ব হারিয়েছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন।

১৮৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে যারা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছিলেন নিম্নপর্যায়ের সরকারী কর্মচারী। এই নিম্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক এবং ছাত্ররাই ছিলেন পূর্ববঙ্গে ১৮৫০ সাল অব্দি ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। পরে অবশ্য অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল। ১৮৮১-৮৩ সালের পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মদের এক তালিকা অনুযায়ী দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের মোট ব্রাহ্ম সংখ্যা ছিল ৮১ জন, বহিরাগত ১১ জন, মোট ৯৩ জন। এর মধ্যে মধ্যেপর্যায়ের সরকারী কর্মচারী, উকিল ও জমিদার ছিলেন যথাক্রমে ১০, ১৩ ও ১৬ জন। শিক্ষক, ডাক্তার, কেরানী ও অন্যান্যদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬, ৩, ১২ এবং ২০ জন।[৩২]

কৃষি নির্ভর পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন যে সমাজের একটি অংশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা ছিল স্বাভাবিক। এবং এটাও অস্বাভাবিক নয়, বিদ্যমান সামাজিক শৃংখলা যে ভঙ্গ করতে উদ্যত, সমাজ তাকে নিরস্ত করতে চাইবেই। ব্রাহ্মদের প্রতি হিন্দু সমাজের নিপীড়ন নির্যাতন এর প্রমাণ। কিন্তু নিপীড়ন, দারিদ্র সত্ত্বেও ব্রাহ্মরা দমে যায়নি। কারণ কি? কারণ, উৎপীড়ন, দারিদ্র ইত্যাদি তারা অনিবার্য এবং ধর্মের জন্য তা মেনে নেয়া কর্তব্য মনে করেছিলেন। যদিও ছিলেন তাঁরা মুষ্টিমেয়, তাঁদের বিশ্বাস, আদর্শ ও আন্তরিকতা ছিল বাতির অকম্প শিখার মত। আঘোরনাথ গুপ্ত যখন ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে এসেছিলেন তখন ব্রজসুন্দরকে লিখেছিলেন [ ২৬-১২, ১৮৬৪ ], 'আমি সাধারণ শিক্ষকের মত অর্থ উপার্জ্জনের জন্য আসি নাই। আমি কোনো অবস্থা অথবা কোনো সমাজে আবদ্ধ নহি, কিন্তু আমি ঈশ্বরের সত্যে আবদ্ধ এবং তারই দাস যিনি সমুদয় বিশ্বের অধিপতি। আমি তাঁহার জন্য ব্রাহ্মস্কুলে শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করিয়াছি।'[৩৪]

ব্রাহ্ম আন্দোলন সবচেয়ে বেশী অভিঘাত হেনেছিল রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর। এর কারণ, ব্রাহ্ম আন্দোলনকে রক্ষণশীল হিন্দুরা দেখেছিলেন তাদের সামাজিক অধিকার, প্রতিপত্তি খর্ব করার আন্দোলন হিসেবে। যেমন, ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে অথচ এ প্রথা ছিল বর্ণ হিন্দুদের সামাজিক শোষণ ও অধিকারের হাতিয়ার। তাছাড়া ঐতিহ্যগত ধ্যানধারণার প্রভাবতো ছিলই।

ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না, কৌতূহল হয়ত খানিকটা ছিল। আন্দোলনের মূলকথা তারা কখনও উপলব্ধি করতে পারেন নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের আদর্শ তাদের কাছে নির্বস্তুক ঠেকেছে। তাই সাধারণ মানুষ এতে আকৃষ্ট হন নি। সাধাবণ ব্রাহ্মদের তারা জেনেছিলেন খানিকটা অদ্ভূত মানুষ হিসেবে যে না হিন্দু না খৃষ্টান। তারা দেখেছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তাদের মতই দরিদ্র, নিজেদের নিয়ে মেতে থাকেন। কোনো গ্রামে হিন্দু পরিবারের কেউ ব্রাহ্ম হলে মনে করা হত ধর্মনাশ হলো। অন্যদিকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যারা ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল কথা উপলব্ধি করেছিলেন চেয়েছিলেন ব্রাহ্মদের প্রতিরোধ করতে। ধর্মনাশের কথা তারাই তুলেছিলেন নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে।

হিন্দুধর্মের কলুষ, জাঁকালো আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বর্জন করে, ব্রাহ্মরা প্রাথমিকভাবে চেয়েছিলেন সরল, অনাড়ম্বর পৌত্তলিকতা বিরোধী ধর্ম। হিন্দু ধর্মকে কলুষমুক্ত করার জন্য তারা চেয়েছিলেন কুলীন ও যৌতুক প্রথা বর্জন, বিধবা বিবাহ প্রসার ইত্যাদি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বা শেষদিকে, পূর্ববঙ্গে স্কুল কলেজ স্থাপন, জলা–জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি প্রকল্পগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে মনে হয় সামাজিক উন্নয়নের উদ্যোক্তা জমিদার বা সরকার ছিলেন না, ছিলেন মধ্য শ্রেণীভুক্ত উদারপন্থী ব্যক্তি বা সংস্থা, যেমন ব্রাহ্মসমাজ।[৩৫] সেবামূলক কাজ ছাড়া ব্রাহ্মরা যার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন তা হলো শিক্ষা। বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও নারীমুক্তি। এদিক থেকে জেসুটদের সঙ্গে মিল ছিল তাদের। আলোচ্য সময়ে দেখি, ব্রাহ্মরা যে অঞ্চলেই গেছেন সে অঞ্চলেই প্রথম চেষ্টা করেছেন একটি স্কুল স্থাপনের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতা।

এ ছাড়াও ব্রাহ্মরা স্থাপন করেছিলেন কিছু সভা সমিতি যাদের কাজ ছিল সমাজ সেবা। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মদের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিলো মুদ্রণ শিল্প। শুরু হয়েছিলো সাহিত্যের বিকাশ।

ব্রাহ্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সমাজ প্রগতির জন্যে কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে আন্দোলনের সে চরিত্র আর থাকেনি। শুরু হয়েছিলো ক্ষয়। এর একটি কারণ ধর্ম নিয়ে ব্রাহ্মদের অতিরিক্তি উচ্ছ্বাস যা তাঁদের আদর্শ বা বিশ্বাসকে ক্রমেই করে তুলেছিল সংকীর্ণ। যে ব্রাহ্ম একসময় জোর দিয়েছিলো ইহজাগতিকতার ওপর পরে তা রূপান্তরিত হয়েছিল, আধ্যাত্মবাদে। ব্রাহ্ম সমাজের একাংশের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য নিয়ে টানাপোড়েন আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল, অনেকসময় হিন্দু সম্প্রদায় বা ধর্ম থেকে তাদের আলাদা করাও হয়ে উঠেছিল মুশকিল।

ত্রুটি বিচ্যুতি, ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে, ব্রাহ্ম আন্দোলন বাঙালী সমাজে সৃষ্টি করেছিল গতিশীলতার,[৩৬] সমাজকে দিয়েছিল নতুন আদর্শ, জীবন যাপনের এক নতুন শৃংখলাপূর্ণ পদ্ধতি,[৩৭] চেষ্টা করেছিল আধ্যাত্মিক বাঁধন থেকে মানুষের মনের মুক্তির। বাংলার ক্ষেত্রে এ কথা যেমন প্রযোজ্য পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বরং একটু বেশী।

## সূত্র

১. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫.৬, ১৮৮৪।
২. *ঐ*, ১০.৮, ১৮৮৪।
৩. স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস*, কলকাতা; ১৯৭৫, পৃ. ১২০
৪. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, পৃ. ২৮০
৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮.৯.১৮৭২।
৬. *ঐ*, ১৫.৪.১৮৬৬।
৭. *ঐ*, ৫.৭.১৮৭৩।
৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, কলকাতা, ৩ খণ্ড, ১৩৮১ (২ সং), পৃ. ৩৪৩।
৯. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।
১০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৭.১১.১৮৮৬।
১১. বসন্ত কুমারী দাসী, *যোষিদ্বিজ্ঞান*, বরিশাল, ১২৮২, পৃ. ৩৯।
১২. প্যারিসঙ্কর গুপ্ত, *কৌলিন্য মহিমা*, বগুড়া, ১৩৪১, পৃ. ৮।

১৩. *ঐ*।

১৪. *ঐ*, পৃ. ১০।

১৫. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

১৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।

১৭. কৈলাস বাসিনী দেবী, *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, কলকাতা, ১৮৬৩, পৃ. ৩৮।

১৮. সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, *বাল্য বিবাহ*, ঢাকা, ১৮৭০, পৃ. ৩৯।

১৯. কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্ত্রী শিক্ষা*, ঢাকা, ১৩০৪, পৃ. ১৮।

২০. *ঐ*, পৃ. ৮২-৮৩।

২১. কালী প্রসন্ন ঘোষ, *নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব*, কলকাতা, পৃ. ২০৮-২০৯।

২২. বসন্ত কুমারী দাসী, *যোগিদ্বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

২৩. *ঐ*, পৃ. ৩।

২৪. *ঐ*, পৃ. ৭।

২৬. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪।

২৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১.৯.১৮৮৭।

২৭. *ঐ*, ২৩.১১.১৮৮৪।

২৮. Anil Seal *The Emergence of Indian Nationalism*, London, 1968, p. 249.

২৯. Sivnath Sastry, *History of the Brahmo Samaj*, Calcutta, 1911, p. 548.

৩০. *ঐ*, পৃ. ৩৬০-৬১।

৩১. বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ও গিরিশচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে দেখুন, ভবরঞ্জন মজুমদার, *আচার্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা*, ১৯১৩।

৩২. *পূববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* [প্রকাশকাল ও স্থানের উল্লেখ নেই।]

৩৩. ১৮৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সংখ্যা মোট ১১৪জন, এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৩জন।

৩৪. বঙ্গবিহারী কর, *পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, পৃ. ৩৫

৩৫. David Kopf, 'The Brahmo Idea Social Reform and the Problem of Female Emancipation in Bengal.' John R Mclane (ed), *Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Michigan, 1975, p. 42.

৩৬. Bipinchandra Pal, *Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India*. Calcutta, 1926, p. 5.

৩৭. পারিবারিক জীবন বা জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা বোঝা যাবে সমসাময়িক কিছু সাহিত্যকর্ম পড়লে। যেমন, [ লেখকের নাম নেই ], *আদর্শ পরিবার*, ঢাকা, ১৮৯৪।

# সংকলন

**ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ বাবু প্রদত্ত ভ্রূণ হত্যা সম্পর্কে বক্তৃতা।**

"ইহা কামপ্রবৃত্তির অন্তর্গত একটি সুমহৎ দুষ্কর্ম্ম বিশেষ। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই কামরিপুর প্রলোভনে জ্ঞানশূন্য হওত অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া আশু–সুখের নিমিত্ত কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা কোন ২ বিধবা রমণীর গর্ভ সঞ্চার হইলে, অপমান ও কলঙ্ক ভয়ে সেই গর্ভের সন্তান প্রসূত হইলেই নির্জ্জন স্থানে বিনষ্ট করিয়া অথবা নানাবিধ সুতীব্র ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা গর্ভ নষ্ট করিয়া আপনাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা এবং কলঙ্ক ও লজ্জার নিবারণ করে। অকিঞ্চিৎকর লজ্জার বশীভূত হইয়া একটি মহাপ্রাণী হত্যা করা কি মনুষ্যের উচিত কর্ম্ম? না পরমেশ্বরেরই অভিপ্রেত কার্য্য? দেখ যে জননী একটি সন্তানের মৃত্যু হইলে সুকঠিন পাষানোপরি বারম্বার মস্তক নিক্ষেপ করিতে থাকে, শোকেতে মূর্চ্ছাপন্ন ও বিবশা হইয়া ধূলিরাশিতে গড়াগড়ী খাইতে থাকে... হায় সেই জননীই যে নিদারুণ লোক লজ্জার বশীভূতা হইয়া একেবার নির্দ্দয় বাঘিনীর ন্যায় আপনার প্রাণতুল্য সন্তানের প্রাণ সংহার করিতেছে, ইহা কি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে? আহা যে শিশুর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, এ সংসারকে চক্ষে দেখিতে পায় নাই, কে পিতা মাতা তাহাও বুঝিতে পারে নাই, সংসার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া একবার মাত্রও জননীর স্তন্য পান করিতে অবকাশ পায় নাই...সেই অবোধ শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে শুনিয়া কোন ব্যক্তির পাষাণ হৃদয় না বিদীর্ণ হইয়া যায়?...

হে ভাওয়ালবাসিগণ। তোমরা কামবৃত্তির অযথা নিয়মে পরিচালনা হইতে ক্ষান্ত থাক, কোনক্রমেই এ প্রদেশে ভ্রূণ হত্যারূপ মহাপাপ প্রবেশ করিতে পারিবেনা। যদি দৈবাৎ দুর্ঘটনাক্রমে কোন বিধবা রমণীর গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে যথাসাধ্য গর্ভস্থ সন্তানটির রক্ষা করিতে যত্নবান হও অবোধ শিশুর প্রাণসংহার করিতে প্রাণান্তেও তৎপর হইওনা"...।

১৫ এপ্রিল, ১৮৬৬

**প্রেরিত পত্র**

মান্যবর শ্রীযুত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
সসম্মানং নিবেদন মিদং।

১। এখানে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ ইংলণ্ড হইতে সস্ত্রীক একজন নূতন মিশনারী আসিয়াছেন। পরাম্পরা শ্রুত হওয়া গেল শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব্ব খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক, শ্রীযুত রেডেমেণ্ড উইলিয়ম প্রাইজ সাহেব, যিনি এখানে আসিয়া জ্ঞানলোক প্রকাশে জনগণের চিত্তক্ষেত্র হইতে অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন, যিনি অনেক স্থানে ইংরেজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিদ্যোন্নতির সদুপায় করিয়াছেন, এবং কোন ২

বিদ্যালয়ে ২/১টি সভা স্থাপন করিয়া লোক সকলের চরিত্র ও আচারগত কুসংস্কার সংশোধনার্থ নিয়ত যত্নবান ছিলেন, সেই মহাত্মা এমত হতভাগ্য শ্রীহট্ট জেলা পরিত্যাগ করিয়া কাছারে অবস্থিতি করিতেন। এই মহাত্মা হইতে শ্রীহট্টবাসীদিগের বিচ্ছেদ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কারণ এই জিলার যে-কিছু উন্নতি হইয়াছে, মিশনারী রেবেরেণ্ড প্রাইজ সাহেবই তাহার একমাত্র কারণ। এ অঞ্চল গবর্ণমেন্ট হইতেও অদৃশ উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ আদালত কালেক্টরী প্রভৃতি বিচারালয় স্থাপন করিলে কখনই জিলার উন্নতি হয় না। লোকের জ্ঞানোদয়, না হইলে প্রত্যেক জেলায় দূরে থাকুক প্রতি গ্রামে বিচারালয় স্থাপন করিলেও কদাচার দূর হইবার নহে। দেশ মধ্যে সকলে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জ্ঞানবান হইলে ঐ সকল বিচারালয়ের আবশ্যকতাই থাকে না। জ্ঞানই কদাচার দূর করিয়া সদ্যাচার স্থাপনের প্রধান কারণ। যদিও পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট একটি স্কুল স্থাপন পূর্ব্বক জ্ঞান বীজবপন করিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন উত্তমরূপে কার্য্যপ্রণালী চলাতে পরস্পর তাহা অঙ্কুরিত হইতে ছিল, কিন্তু অন্যান্য স্থানের মত সর্ব্বদা উৎসাহ বারি সিঞ্চিত না হওয়াতে অকালেই কালকবলে পতিত হইয়াছে।

উইলিয়ম প্রাইজ সাহেব বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত অধ্যাবসায়ের সহিত সর্ব্বদা অনুসন্ধান করাতে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক এক্ষণ ফল প্রদান করিতেছে। সংস্কৃতি এই মহাত্মার অভাবে কিরূপ কাজ চলিবে, আমরা বলিতে পারি না। ভরসা করি নূতন মিশনারী মহাত্মাও যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বদা লোকের মঙ্গল বিধান করিয়া এখানে অদৃশ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মাগণ কি করিবেন? কেবল নিকটবর্ত্তী কতিপয় প্রধান জিলাতে ধর্ম্ম প্রচার করিলে কখনই প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ, যেস্থানে অনেক প্রধান ২ লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, অধিক কি অন্যান্য লোক সকলকে উপদেশ দিতেও সমর্থ প্রচারকগণ বুনাক্ষেত্রে বীজ বপনের ব্যয় কেবল সেই সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যে স্থানের লোকেরা ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্তও সাতিশয় লালায়িত, প্রচারকগণ তাহাদের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করেন না, ইহা কি প্রচারকগণের উচিত কার্য্য? যদি দূর বিবেচনায় আসিতে বিরত থাকেন তবে উক্ত মিশনারী মহাত্মাদিগের দূরত্ব মনে করুন। সম্পাদক মহাশয়। আমরা অরণ্যেরোদনের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকদিগের সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি না এ পর্যন্ত লিখিয়া শেষ করা গেল।

২২ এপ্রিল, ১৮৬৬

**ময়মনসিংহের সংবাদদাতার পত্র।**

এ নগরে দিন ২ পান দোষের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। যাহাদিগের নিকটে মাতৃভূমি নানা প্রকার উন্নতির প্রত্যাশা করেন ও যাঁহারা ব্রাহ্ম, সুশিক্ষিত বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন, এবং যাঁহাদিগের আত্মোন্নতি বিষয়িনী আকাশভেদী গম্ভীর বক্তৃতায় শ্রুতি যুগল নিস্তব্ধ হইয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যেও অনেক মহাত্মা বোতলে ২ লালজল উদরস্থ করিয়া জন্মভূমি ও ব্রহ্মসমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। সুশিক্ষার ধ্বনি সর্ব্বত্র বিঘোষিত

করিতেছেন। সুরার উপাসক বাবুগণ! সতর্ক হউন। আমি অদ্যও আপনাদের চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষরূপে লেখনী চালনা করিলাম না। আমরা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সকল কীর্ত্তিই দেখিতে পাই। ভবিষ্যতে বাড়াবাড়ি দেখিলে আপনাদের প্রত্যেকের নাম প্রকাশ করিয়া সমুদয় মহিমা বর্ণনা করিব। আপনাদের অভদ্রোচিত দৃষ্টান্তে সমাজের সুমহান অকল্যাণ চিন্তা করিয়া হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়, তজ্জন্যই সানুনীয় চরিত্র সংশোধনের প্রার্থনা করিতেছি।

১৯ আগস্ট, ১৮৬৬

**খেমটাওয়ালীর নাচ।**

অনেকের ন্যায় ইদানীং আমাদিগেরও সংস্কার জন্মিতে ছিল, কুলটা খেমটাওয়ালীদিগের নিতম্ব নিপীড়ন ও সভ্রূভঙ্গী কটাক্ষপাতদর্শনে অনেকেই এখন বীতস্পৃহ হইয়াছেন। কিন্তু সেদিন মস্ত কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি আমাদিগের সে সংস্কার অনেকাংশে দূর করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপাধিবিশিষ্ট একটি প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পরিবারস্থ সকলে কৃতবিদ্য হইয়াও যখন তাহারা বিবাহোপলক্ষে পুংশ্চলীদিগকে না নাচাইয়া পারিবেন না, তখন অন্যেরা পারিবেন, কিরূপে ভরসা করা যাইতে পারে? "না নাচাইয়া পারিলেন না" এই কথাটুকুর অর্থ লইয়া অবিশেষজ্ঞ পাঠকগণ গোলে পড়িতে পারেন। কেহ বিবেচনা করিতে পারেন তাহারা (কৃতবিদদ্যের) মুরব্বির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ঐ অনীপসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কেহ মনে করিতে পারেন, পরিবারবর্গের বা সমাজসহ লোকের মনসন্তুষ্টার্থ ঐরূপ করিয়াছেন। ভিন্ন দেশীয় কোন ২ পাঠক ইহাও অনুমান করিতে পারেন, খেমটাওয়ালীর নাচ এদেশীয় বিবাহের অঙ্গস্বরূপ, এ জন্যই তাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়াও অন্য দশপ্রথার ন্যায় উহার পরিহার করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহার কিছুই নহে, বিবাহ সভায় খেমটাওয়ালী না নাচাইলে সাধারণ্যে নিন্দিত বা সমাজচ্যুত হইতে হয় না, অথবা তদ্বিরাহ বিবাহের অঙ্গভঙ্গও ঘটে না প্রাচীন শ্রেণীসহ কোন ২ মুরব্বির এবং তরলেন্দ্রিয় লম্পটদিগের উহাতে রুচি আছে সত্য, কিন্তু কিঞ্চিত বাক্য ব্যয় করিয়া উহার সদোষতা বুঝাইয়া দিলেই বোধ হয় তাদৃশ লোকের তদনুষ্ঠানজনিত মনঃক্ষোভ নিবারিত হইতে পারে। "তবে কেন" উপরিউক্ত কৃতবিদ্যেরা এরূপ সাধুবিনিন্দত জঘন্য কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন? পাঠকবর্গ যদি এই জিজ্ঞাসা করেন, "তাহাদিগেরই আন্তরিক অভিলাষ ভিন্ন আর কিছু উত্তর দান করিলে কি তাহাদিগের মনঃপূর্তি হইবে? হায়! যাহারা আজিও হিতাহিত বিবেচনা বিমূঢ় মূর্খ বিলাসিজ্ঞন্যেচিত কুৎসিত আমোদ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাহাদিগের দ্বারা আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। যিনি যাহাই বলুন কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ব্যতীত দূষিত স্বভাব খেমটাওয়ালীদিগের নৃত্য দর্শনের আর কোন ফলই কল্পনা করা যায় না। যাহারা নিজের, পরিবারবর্গের এবং প্রতিবেশী তরলম্ব ভাব যুবকাদিগের কুপ্রবৃত্তি সন্ধানে অনিচ্ছুক তাহারাও কি এই দুষ্কার্য্যে সায় দিতে পারেন? ফলত যদি কুদৃষ্টান্ত দর্শনে কুফল সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, প্রলোভনে কুপ্রবৃত্তি বলবতী হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং যদি পিতামাতা ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গ ও স্বজন মণ্ডলী একত্র উপবেশন করিয়া বারাঙ্গনাদিগের কটিকম্পনের সঙ্গে ২ তাহাদিগের হাবভাব হেন লীলা অবলোকন এবং কুৎসিত রসিকতা ব্যঞ্জক আলাপ ও অশ্লীল গীতি শ্রবণ লজ্জার বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে উহা সর্ব্বদা পরিহার্য্য বলিয়া অবধারিত হইবে সন্দেহ মাত্র নাই। খেমটাওয়ালীর

নৃত্যদর্শনের যে কিরূপ ভয়ানক পরিণাম যাহারা তাহা অবগত আছেন তাঁহারা কদাচ তাহাতে উৎসাহান্বিত হইবেন না। কত ভদ্র অবলার এতদ্দর্শনে চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে। কত তরুণ বয়স্ক যুবা পশু প্রকৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া শেষ করা যায় না। অল্পদিন হইল এতৎসম্বন্ধে যে একটি শোচনীয় ঘটনা সংগঠিত হইয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ঢাকার অন্তঃপাতী কোন গ্রাম নিবাসী একটি জমিদার সন্তান অত্রত্য কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ইতঃপূর্ব্বে ছাত্রটিকে প্রখরবুদ্ধি পাঠানুরাগী ও সৎকর্ম্মোৎসাহী দেখা গিয়াছে। যদিও ইহারপার্শ্বচর ও পরিষদদিগের পূর্ব্বাপরই দূষিত স্বভাব ছিল তথাপি অনেকদিন পর্যন্ত ইহার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্কপাত হয় নাই। প্রত্যুত ইহার সংসর্গে ও দৃষ্টান্ত দর্শনে অনেক সৎস্বভাবান্বিতই হইয়াছে। এই নিমিত্তই অনেকে আশা করিয়াছিলেন এই ছাত্রটির দ্বারা সময়ে এতদঞ্চলের সবিশেষ উপকার হইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, সংপ্রতি সে আশায় একপ্রকার নিরাশ হইতে হইয়াছে। এক খেমটালীই তাহাকে একেবারে অধঃপতিত করিবার উপক্রম করিয়াছে। কিছুদিন হইল, উক্ত ছাত্রটির বিবাহোপলক্ষে অনেকগুলি খেমটাওয়ালী গমন করিয়াছিল। শুনিলাম, তাহাদিগের মধ্যে পুংশ্চলীর হাবভাবাদি সংশ্লিষ্ট নৃত্য দর্শনে ঐ যুবকের মনোবিকার উপস্থিত হয় এবং তদবিধিই তাহার তৎসংসর্গ লাভের বাসনা জন্মিয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে ঐ বাসনা অনিবার্য্য হইয়া এখন তাহার অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ঘৃণা ভয় লজ্জা প্রভৃতি কুকর্ম্মের অন্তরায় সমূহকে অপসারিত করিয়াছে। এতনিবন্ধন তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, সহজেই তাহা অনুমিত হইতে পারে। তৎসংসর্গে আরো কতগুলি ছাত্রের চরিত্র দূষিত হইয়া উঠিতেছে। ক্রমশ তাহাদিগের বিদ্যানুরাগ ও সৎকার্যোৎসাহাদি বৃদ্ধি হইবে কি, দিন ২ অসৎপ্রবৃত্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি আরো কিছুদিন এরূপ থাকিয়া যায়, সময়ে তাহারা সম্পূর্ণ পশুত্ব লাভ করিয়া বসিবে সন্দেহ নাই।

যাহারা দেশীয় প্রথা বিবেচনা করিয়া সময়ে ২ পরিজন মণ্ডলী মধ্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে খেমটাওয়ালীদিগকে নাচাইয়া থাকেন, তাহারা তৎপরিণাম স্বরূপ উপরি উক্তরূপ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সাবধান হন, এই আমাদের প্রার্থনা।

১৯ আগস্ট, ১৮৬৬

## বেশ্যা করিবার অভিপ্রায়ে কন্যা ক্রয়-বিক্রয়।

আমাদিগের গবর্ণমেন্টের এমন অনেক আইন আছে, কার্য্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। [অস্পষ্ট] যাহা প্রতিসিদ্ধ, এদেশের সর্ব্বস্থানে [অস্পষ্ট] নির্ব্বিরোধে তাহার অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় প্রথা ইহার অন্যতম জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বহুকাল হইল আইন দ্বারা উহা প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আজিও উহার অল্প প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় না। আজিও অনেক স্থানে সাধারণ দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। আজিও বেশ্যা করিবার নিমিত্ত অল্পবয়স্কা কন্যা ক্রয়- বিক্রয়ের নিয়ম সর্ব্বত্র অতি প্রবলরূপেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ঈদৃশ অবৈধ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে গবর্ণমেন্টের নয়নপাত হইতেছে না। সত্য বটে, এখন সাধারণ দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের তত প্রাদুর্ভাব নাই, অনেক স্থান হইতেই উহা এক প্রকার রহিত হইয়াছে।

এবং উহা অতি সংগোপনে নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া শাসনকর্তৃগণের তদরগতি কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু বেশ্যা করিবার নিমিত্ত অল্পবয়স্কা কন্যা ক্রয়–বিক্রয় সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। বোধ হয় এদেশে এরূপ স্থান পাওয়া অসম্ভব, যেখানে সচরাচর উহা অনুষ্ঠিত না হইতেছে। কে [অস্পষ্ট], সাধারণত বেশ্যাদিগের সন্তান উৎপন্ন হয় না, অথচ তাহাদিগের প্রায় সকলের গৃহেই দুই একটি শিশু বা বালিকা দেখা যায়। ঐ সকল বালিকাদিগকে তাহারা কোথায় প্রাপ্ত হয় [অস্পষ্ট] একমাত্র উত্তর এই তাহারা নীচজাতীয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়া থাকে। বেশ্যারা অর্দ্ধযৌবনা হইলেই তাহাদিগের ভাবিজীবনের প্রতি [অস্পষ্ট] করিয়া দেখিতে পায় শেষাবস্থায় অন্নাচ্ছাদন প্রদান [অস্পষ্ট] তাহাদের এরূপ ব্যক্তি কেহই নাই। এই নিমিত্ত তাহারা বিবিধ চেষ্টা করিয়া এক একটি বালিকা ক্রয় করিয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় ঐ সকল বালিকারা তাহাদিগের ঘৃণিত দুর্বৃত্তি অলবম্বন করিয়া ভরণ–পোষণ করিবে এই প্রত্যাশায়ই তাহারা তাহাদিগকে সন্তানবৎ লালন পালন করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয়, বেশ্যারা যদি অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে ক্রয় করিয়া রাখিয়া তাহাদিগের কুবৃত্তি বজায় রাখিতে চেষ্টাবর্তী না হইত কখনই প্রতি নগরে বেশ্যার সংখ্যা এত অধিক দৃষ্ট হইত না, একটি বেশ্যার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নাম একবারে বিলোপ হইয়া যাইত। ফলত বেশ্যা করিবার অভিপ্রায়ে কন্যা ক্রয়–বিক্রয় প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত থাকাতেই কুলটাকুল নির্ম্মূল না হইয়া দিন ২ বর্দ্ধিত হইতেছে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ফৌজদারি সংক্রান্ত পূর্ব্বতন আইনে এবং ১৮৬১ সনের ৪৫ আইনের ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় উপরি উক্ত কার্য্যের গুরুতর দণ্ডোল্লেখ সত্ত্বেও যে তাহার ফল দৃষ্ট হইতেছে না, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দণ্ডবিধানে যে অপরাধ দস্যুতাপরাধের প্রায় তুল্য দণ্ডার্হ বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অথচ যাহা প্রতি নগরে, প্রতিদিন সকলের [অস্পষ্ট] উপরে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে অপরাধেরও প্রায় দণ্ড প্রয়োগ হইতেছে না, ইহা কি সামান্য বিস্ময়ের বিষয়? যথোচিত দণ্ড প্রযুক্ত হইলে কি উক্ত দুষ্প্রথার এত প্রাবল্য হইত? ঢাকা নগরে এই জঘন্য পাপ কার্য্যের অল্প [অস্পষ্ট] না। তথাপি বোধ [অস্পষ্ট] কেহ এরূপ বলিতে পারিবেন না, অমুক ব্যক্তি বেশ্যা করিবার অভিপ্রায়ে বালিকা ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যথোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সামান্য লোকে এই গুরুতর অপরাধকে অপরাধ বলিয়া পরিগণনা করে না, বলা বাহুল্য। যাহা হউক সংপ্রতি এখানে যে একটা ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তদদ্বারা ভরসা করা যাইতে পারে এতৎসংক্রান্ত অপরাধীদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান হইবে এবং তৎসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে সাধারণত উক্ত অপরাধ অনেক অল্পীভূত হইয়া আসিবে। সে ঘটনাটি এই—

অত্রত্য পাদরি সুপার সাহেব ইতোমধ্যে মুন্সীগঞ্জে যাইয়া জানিতে পান তন্নিকটবর্তী কোন পল্লীবাসী একজন নেটিব খৃষ্টীয়ান তাহার ৯/১০ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকাকে ঢাকাস্থ এক বেশ্যার নিকটে বিক্রয় করিয়াছে। তিনি এই কথা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে (?) জ্ঞাপন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উহা পুলিসে জ্ঞাপন করিলে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সদর ষ্টেশনের পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গোপনে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বলেন। সুদক্ষ সর্ব্বরঞ্জন বাবু এক রাত্রির মধ্যেই সুমদায় অনুসন্ধান করিয়া যে বেশ্যা ঐ কন্যা ক্রয় করিয়া ছিল ও যে একজন কনষ্টেবল তাঁহার

সহায়তা করিয়াছিল, এবং যে মোক্তার ঐ কন্যা বিক্রয়ের লেখাপড়া করিয়াছিল, তাহাদিগের সমুদায়কে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটিতে অর্পণ করিয়াছেন। বিক্রেতারাও ধৃত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটিতে অর্পিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাদিগের সকলেই [অস্পষ্ট] রহিয়াছে। শুনিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মকদ্দমা সেশনে অর্পণ করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ভরসা করি অপরাধীরা বিচারে অবশ্যই সমুচিত শাস্তি পাইবে।

আমরা এতৎপ্রসঙ্গে সর্ব্বস্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা সমুদায় পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট সুদৃঢ়রূপে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিউন, সকলকেই উক্তরূপ কন্যা ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনুসন্ধান দ্বারা যদি চারিজনকে বাহির করিয়া লইয়া যথোচিত দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে এই দুষ্প্রথা অনেক পরিমাণে অল্পীভূত হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই।[১]

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬

## ফরিদপুরের সংবাদদাতার পত্র

সম্পাদক মহাশয়। কুঙ্গনয়নী কুলটাদিগের কুৎসিত নয়নভঙ্গী ও শ্রোণি কম্পন দর্শনে অনেকে বিশেষত (শিক্ষিত) সম্প্রদায়ীরা এক্ষণে বীতস্পৃহা হইয়াছেন বলিয়া আমাদিগের [অস্পষ্ট] সংস্কার জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেদিন এক ব্যক্তির আচার-ব্যবহার দর্শন করিয়া আমাদিগের সে সংস্কার একেবারে অপনীত হইয়াছে। অত্রত্য কোন একজন জমিদারের বাড়ি বিবাহোপলক্ষে খেমটা নাচ হইয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া খেমটা নাচ সভাতে খেমটাওয়ালীদিগের সঙ্গে যেরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছেন, ভদ্রতানুরোধে এস্থলে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। ইনি পুলিসের একজন তরলেন্দ্রিয় ও রসিক অবতার। আমরা এবারও তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছি অতঃপর এরূপ হইলে আমরা তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রদানে বিরত হইব না। জমিদার মহাশয়দিগকেও বলিতেছি বিবাহ সভায় বাড়ির উপর পরিবারবর্গের সম্বন্ধে খেমটা নাচ না দিলে বিবাহের কি অঙ্গ অপূর্ণ ও দোষ ঘটিত হয়?

২৮ মার্চ, ১৮৬৯

## নূতন খৃষ্টাবলম্বিনী

নূতন খৃষ্টাবলম্বিনী গনেশসুন্দরী আজ কাল অপরিচিতা নয়। সকলেই জানেন, অল্পদিন হইল তিনি মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি পুনরায় খৃষ্ট সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বাটীতে প্রতি গমন করিয়াছেন। এই সঙ্গে ২ বোধ হয় যীশু দীক্ষাকেও তিনি বিদায় দিয়াছেন। এজন্য খৃষ্টানগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। বিশেষত পাদরি ভন সাহেব মর্ম্ম বেদনা অনুভব করিবেন। ভন সাহেব ফ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া[২] সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন, গনেশসুন্দরী খৃষ্টধর্মের দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াই খৃষ্টান হইয়াছিলেন। এখনও খৃষ্টধর্মে তাহার অচলাভক্তি আছে। পরে তিনি যাহার নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার সঙ্গে কোন বিষয়ে অনৈক্য ও মনোবাদ হওয়াতে পুনরায় স্বীয়গৃহে গমন করিয়াছেন। মাতার নিকট যাইয়াও তিনি চার্চে আসিবেন বলিয়া ভন সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আর চার্চে আসিতেছেন না। কেন যে

আসিতেছেন না, তাহা ভন সাহেব বুঝিতে পারিতেছেন না। এতৎসম্বন্ধে এডুকেশন গেজেট বলেন, গনেশসুন্দরী মাতৃ সন্নিধানে যাইয়া ভন সাহেবকে এই মর্ম্মে একপত্র লিখিয়াছেন যে "আমাকে বিদায় দাও, পূর্ব্বে খৃষ্টধর্মের উপর আমার যে বিশ্বাস হইয়াছিল, এখন আর সে বিশ্বাস নাই।"

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি এদেশীয় প্রায় লোকই বাস্তবিক ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টান হয় না। ১৫ আনা লোকের খৃষ্টাধর্ম্ম গ্রহণ করার কারণান্তর থাকে' গনেশসুন্দরীও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। অনেক খৃষ্টানই এই ঘটনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, গনেশসুন্দরী খৃষ্টধর্মে গাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খৃষ্টান হইয়াছে। অদ্য আমরা জিজ্ঞাসা করি, এত শীঘ্র সেই গাঢ় বিশ্বাস কেন শিথিল হইয়া গেল? যাহার ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থাকে, এত শীঘ্র তাহার পরিবর্তন অসম্ভব। গনেশসুন্দরীকে রাখার একটি উপায় বোধহয়, ভন সাহেব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহাদি কোন কার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিলে সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন। বাস্তবিক এখনকার মিশনারিদিগের ব্যবহার দেখিয়া বড়ই দুঃখ জন্মে। এদিক সেদিক না চাহিয়া কেবল খৃষ্টান করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমরা আর একটি ঘটনা এস্থলে উপস্থিত করিতেছি। কয়েকদিন হইল, ঢাকার কয়েকজন ইউরোপীয় খৃষ্টান স্ত্রী (কোন মিশনারীর কন্যা প্রভৃতি) অত্রত্য কোন ভদ্র লোকের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। তৎপর গৃহ স্বামীকেও তাহাদের আগ্রহ জ্ঞাপন করেন। গৃহ স্বামী তাহাতে সম্মত হন। অনন্তর তাহারা পরিবার মধ্যে শিক্ষা প্রদান করিতে আইসেন। কিন্তু লেখা পড়া একদিকে রাখিয়া, তাঁহারা সেই যীশুমন্ত্র সুধাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। দইদিন অতীত না হইতে হইতেই বাইবেলের অংশ বিশেষ তাহাদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করেন। গৃহস্বামী ইহা জানিতে পারিয়া বলেন "আপনারা বাইবলাদি শিক্ষা না দিয়া অন্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন। এখন বাইবলাদি পড়াইতে আমার আপত্তি আছে।" উক্ত খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীগণ একথা শুনিয়াই অসন্তুষ্ট হন এবং আর শিক্ষা দিতে আইসেন না। পরে আর তাঁহাদের আগ্রহের নাম জন্মও পাওয়া যায় না। ইহাতে কি স্পষ্ট অনুমিত হয় না যে কেবল খৃষ্টান করাই তাঁহাদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য ছিল? একথা শুনিলে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিবার মধ্যে শিক্ষা প্রদানার্থ নিষেধ না করিবেন? প্রত্যুত মিশনারীগণ ক্রমেই নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছেন এবং এদেশীয়দিগের নানা অনিষ্টের পথে দণ্ডায়মান হইতেছেন ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? উপসংহার কালে বক্তব্য এই, মিশনারিগণ। আপনারা বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য না করিলে ভয়ানক অনিষ্ট হইবে।

২১ আগস্ট, ১৮৭০

## গঙ্গাযাত্রা

সংপ্রতি ইংলিশম্যানে প্রকাশ হইয়াছে, কলকাতার একজন হিন্দু বারেন্দা হইতে পতিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে "কিবর হস্পিটালে" প্রেরণ করা হয়। তৎপর জীবন সংশয় দেখিয়া তাহার কোন আত্মীয় তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করাইতে চায়। হস্পিটলের ডাক্তারগণ বলেন, 'ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ভিন্ন আমরা ইহাকে গঙ্গাযাত্রার নিমিত্ত ছাড়িয়া দিতে পারিনা।' তুমিও ঐ ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন করে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, এরূপ আদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ উহাতে হত্যার সহায়তাপরাধ হয়। এই ধার্ম্মিকবর

মাজিস্ট্রেটের কথা শুনিয়া আমরা যারপর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। গঙ্গাযাত্রা উপলক্ষে অনেক সময়ে যে সত্যই হত্যার সহায়তা করা হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অনেক সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে খাটে করিয়া কন্ধের উপর দুই তিন মাইল অথবা আরো অধিক দূরে লইয়া যাওয়া হয়। তখন হয়ত ঐ রোগীর শরীরে রৌদ্রের তাপ, রাত্রির শিশির বা শীতল বায়ু এবং বৃষ্টির জলও অবাধে লাগিতে দেওয়া হয়। তৎপ্রযুক্ত যে ঐ রোগীর জীবনকাল অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হইতে পারে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহা অবশ্যই অনুভব করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত গঙ্গাযাত্রীদিগের ঘর ও ঘাট এরূপ অপরিষ্কার, দুর্গন্ধ এবং নানারূপ রোগীর আর্তনাদের ও তাহাদের আত্মীয়বর্গের ক্রন্দন ধ্বনিতে এবং কোনহ রোগীর অন্তর্জ্জলকালীন হরিনাম কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ যে কোন রোগী সেখানে মুহূর্ত্তকাল ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেনা, সুতরাং আয়ূর কাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে। ইদানীং—ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে অনেকেরই গঙ্গাযাত্রার ফলের প্রতি বিশ্বাস মাত্র নাই। কিন্তু আক্ষেপ এই, তদ্রূপ রোগীরও কর্ত্তৃপক্ষ অথবা প্রতিবেশী সমাজপতিদিকের অনুরোধে মুমূর্ষাবস্থায় গঙ্গাযাত্রা করা হইয়া থাকে। এরূপও শুনা গিয়াছে যে গঙ্গাযাত্রার নাম নিয়াই রোগী ক্রন্দন করিয়াছে, তথাপি তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহা কি নিতান্তই নিষ্ঠুরতা নয়? কুসংস্কারে হৃদয় পাষাণবৎ না হইলে কোন ব্যক্তি এরূপ কাণ্ডে সায় দিতে পারেন? যে ব্যক্তির এক মুহূর্তকাল বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে, তাচ্ছল্যদ্বারা যদি তাহার ক্ষণকাল পূর্ব্বে প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দেওয়া হয় তাহা কি ভয়ানক নৃশংসতা এবং মহাপাপজনক কার্য্য নয়। এই সমস্ত কারণে আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি, এটি যখন ধর্মের নামে লোকের প্রাণ লইয়া কথা তখন গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার গঙ্গাযাত্রা উঠাইয়া দেওয়া নিতান্তই কর্তব্য। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন মহোদয় আমাদিগের সেই অনুরোধানুসারে গঙ্গাযাত্রার অনিষ্টকারিতা নিবারনোদ্দেশে রাজ নিয়মেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল সর জন লরেন্স সকলের মনসন্তুষ্টির নিমিত্ত কিরূপ ব্যস্ত ছিলেন, তাহা কাহারো অবদিত নাই। তিনি মনে করিলেন গঙ্গাযাত্রা, সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিলে হিন্দুগণ গবর্ণমেন্টের প্রতি বীতরাগ হইবেন। এই নিমিত্ত তিনি সর সিসিল বীডনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সর জন লরেন্স এতৎসম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এখন গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করিলেই গঙ্গাযাত্রার সমান ফল হয় বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তখন দূষিত গঙ্গাযাত্রার প্রথা উঠাইয়া দিলেও হিন্দুদিগের তাদৃশ মনক্ষোভ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা বর্তমান গবর্ণর জেনেরল নর্থব্রুক মহোদয়কে অনুরোধ করি, তিনি এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন।

লর্ড ওয়েলেসলি গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ প্রথা নিবারণ করিয়া এবং লর্ড বেন্টিংক সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিয়া এ দেশীয়দিগের নিকটে যেরূপ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, লর্ড নর্থব্রুকও গঙ্গাযাত্রায় প্রথা রহিত করিয়া চিরস্মরণীয় হন, ইহা একান্ত প্রার্থনা।[৩]

১৯.৯.১৮৭১

## অন্যায় স্বাধীনতা দান চেষ্টা

স্বাধীনতা কি? এটি গুরুতর প্রশ্ন সন্দেহ নাই। সাধারণভাবে এই বলিলেই বোধ হয় ও প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর হয় যে ঈশ্বরের নিয়মাধীন থাকিয়া তৎপ্রদত্ত বৃত্তি সমুদায়কে ইচ্ছানুসারে

বিনিয়োগ করিতে পারাই স্বাধীনতা, কিন্তু যথেচ্ছারিতা স্বাধীনতা বিষয়ে যে নরনারী সকলেই তুল্যাধিকার আছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অমত নাই। আমরা স্ত্রী স্বাধীনতারও বিরোধী। কারণ, আমাদিগের দৃঢ় সংস্কার এই ঈশ্বর যাহাকে যে অধিকার দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপ করিয়া প্রতিবন্ধকতাচারণ ন্যায় সঙ্গত নহে।

পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীরাও ধর্ম্ম, জ্ঞান, মান, ধন ও সম্ভ্রমশালিনী। এবং সর্ব্বাংশে তুল্যসুখাধিকারিণী হইতে পারেন হউন। তৎপ্রতিরোধ করিতে আমাদিগের অধিকার কি? আমরা সকল সুখে সুখী হই, আর স্ত্রীরা তাহাতে বঞ্চিত থাকুন, এ অতি স্বার্থপরের মত সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে যে যাহা মনের সহিত চায়না, বলপূর্ব্বক তাহাকে তাহা দিতেই হইবে এ ও কোন কাজের কথা নহে। তাহা অজ্ঞানতা প্রযুক্তই হউক আর যে কারণেই হউক, বল প্রয়োগ করিয়া তৎসাধনের চেষ্টা যার পর নাই অসঙ্গত এবং যে যাহা লাভ করিবার উপযুক্ত নয় তাহাকে তাহা প্রদান করাও নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। মনে কর এতদ্দেশীয় কোন এক নারী বিদ্যা শিক্ষা করিতে চায়না,—বিদ্যা শিক্ষার উপকারিতা পুনঃ২ বুঝাইয়া দেওয়া হইল,-ভুরি ২ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল তথাপি বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাহার যত্ন হইল না, এখন কি করা উচিত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক কি তাহাকে লেখা পড়ার শিখাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কোন যুবতী বিধবা পুনর্ব্বার পতিংবরা হইতে অসম্মতা, তাহার অভিভাবকদিগের কি উচিত যে তাহারা জোর করিয়া অন্য পতিসাৎ করেন? কোন স্ত্রী প্রকাশ্য সমাজাদিতে যাতায়াত করিতে অনিচ্ছুক-তাহার স্বামীর কি কর্ত্তব্য তিনি জোর করিয়া প্রকাশ্য সমাজে তাহাকে লইয়া যান? এইরূপ কতকগুলি নারীর প্রকাশ্য রাস্তা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ ক্ষমতার প্রয়োজন তাহাও তাহাদিগের নাই, তদীয় আত্মীয় বর্গের উচিৎ যে তাহাদিগকে তাড়না করিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় বাহির করিয়া দেন? ইহারই নাম কি স্বাধীনতা দান? আমরা দুঃখিত হইলাম, ময়মনসিংহস্থিত কোন কোন ব্রাহ্ম নাকি তাহাদিগের পরিবারকে এইরূপ স্বাধীনতা দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একথা সত্য হইলে আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে সাহসী হই যে, যিনি এইরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি স্বাধীনতার অর্থ অবগত নন। স্ববিশেষ অবগত হইয়া বারান্তরে এ বিষয়ে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিতে বাসনা রহিল।

২২ ডিসেম্বর, ১৮৭২

## বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন

দাহ্যমান প্রাণী যত কেন আর্তনাদ করুক না, নিষ্ঠুর স্বার্থপরদিগের অন্তকরণ কিছুতেই আর্দ্র হইবার নহে। স্বার্থসর্ব্বস্বদিগের তাদৃশ স্বভাব বিস্ময়কর নহে। কিন্তু যাহারা একদিকে চক্ষুতে তৈল দান পূর্ব্বক রোদন করেন এবং অন্যদিকে নানা কুযুক্তি প্রদর্শন ও অলীক আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই মুমূর্ষুদিগের উদ্ধারের অন্তরায় হন, তাহারাই ধন্য। সেই 'নব্য প্রামাণিক'দিগের তাদৃশ ব্যবহার দ্বারা যে কেবল ইষ্টনাশ হইতেছে এরূপ নহে। প্রত্যুত অনিষ্টও ঘটিতেছে। তাহাদিগের দ্বারা উক্ত স্বার্থপর নিষ্ঠুরেরা বিলক্ষণ বলবান হইতেছে।

বঙ্গীয় কুলীন কুমারীগণ সহস্র বৎসর বহ্নালি দহনে দগ্ধ হইল। যদিও তাহাদিগের আর্তস্বর প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত দুরাচার কুলীন ও ঘটকদিগের অত্যাচার সর্ব্বদা উদ্যত [অস্পষ্ট] রহিয়াছে, তথাপি নৈসর্গিক প্রকৃতি বলে সেই চীৎকার ধ্বনি মধ্যে মধ্যে এক একবার

উজ্জীবিত হইয়াছে। ২০০ বৎসর হইল সেই রোদনের এক [অস্পষ্ট] খুল্লনাবেননীর নয়ন হইতে [অস্পষ্ট] হইয়া সহৃদয়দিগের অন্তঃকরণ বিগলিত হইয়াছে। তৎপরে ভবানন্দের গৃহবাসিনী অন্নদার মুখেও সে বিলাপের কিয়দংশ ঈশ্বর পাটনীর নিকট বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে নীচ জাতীয় ঈশ্বরী কর্তৃক "আমি বুঝি নু সকল, যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা যে বিষয় যে রূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল আধুনিক সুশিক্ষিতম্মন্যদিগের নিকট তাহা আজিও সেইরূপ উপেক্ষণীয় হইয়াই রহিয়াছে। কারুণ্য বা ক্রোধ উৎপাদন হয় নাই। কুলীনতনয়াদিগের নাম স্মরণে প্রকৃতপক্ষে ব্যথিত অথবা কুলীনজাতির প্রতি সর্ব্বদা রোষাবিষ্ট আছেন, সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে এরূপ লোক কি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয়? কিন্তু তর্ক করিবার সময় স্বদেশের দোষ স্বয়ংই সংশোধন করিব, অন্যের সাহায্য লইব কেন? ইত্যাদি কত আস্ফালনই হইয়া থাকে। যাহা হউক, যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, আধুনিক সভ্যতার বলে, অন্যান্য কুপ্রথার ন্যায় চূর্ণীকৃত হইবার নিমিত্ত ইহাও অল্পদিন যাবৎ আলোচনার যন্ত্রে আরোপিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের ভ্রম নিরসন বিষয়ে বোধহয় মুকুন্দ চক্রবর্তী[৪] ও ভারতচন্দ্র[৫] এককালে অসমর্থ হন নাই। তাহাদিগের প্রমুখাৎ জানা যায়, বহু বিবাহের আলোচনা ও দোষকীর্ত্তন অভিনব নহে, অনেকদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি কিছু ফল ফলিয়াছে? বাস্তবিক কেবল আলোচনায় কিছুমাত্র ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যদিও চক্রবর্তীর সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তাবিত বিষয়ক না হউক কিন্তু রায় গুণাকর যে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কাল মধ্যে বাঙ্গালীদিগের আচার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু দেবীবরের প্রতিষ্ঠা পিতা কুললক্ষী, সেই পিশাচ রূপিনীই আছেন। আজিও কুমারী দাহন, ভ্রূণ মাংসও পঞ্চম মংকার ব্যতীত তাঁহার অর্চনা সিদ্ধ হয় না। ফলতর যে যাবৎ আবৃত্তি, মেল ও পর্যায়চক্র এদেবতার আসন থাকিবে, তাবৎ ইহার মূর্ত্তি বা উপাসনা পদ্ধতির কিছুমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে না। কিন্তু আসনের সঞ্চালন ও সামান্য শক্তি কর্ম্ম নহে। দ্বিতীয় বঙ্গাধিপের শক্তির আবশ্যক। বাস্তবিক কুলীনদিগের পর্য্যায়, মেল, আবৃত্তিগত সম্বন্ধ, যজ্ঞসূত্রের ন্যায় অপরিহার্য্য। উপবীত ত্যাগ যেরূপ সমাজচ্যুতির অদ্বিতীয় কারণ, আবৃত্তি প্রভৃতির পরিহারও সেই রূপ সম্প্রদায়ভ্রষ্টতার একমাত্র হেতু। সুতরাং যে দিন ব্রাহ্মণ কুমার উপবীত বিসর্জ্জন করিয়াও নিজ সমাজভুক্ত থাকিতে পারিবে, বিদ্যাশিক্ষা বা সমাজ শক্তি দ্বারা সেই দিনই বহুবিবাহ নিবারিত হইতে পারিবে বলিয়া সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। জিগীষাবশতঃ যিনি যতই কেন না বলুন, রাজ শাসন ব্যতিরেকে ৪/৫ শত বৎসরের মধ্যে এ কুপ্রথা দূরীভূত হইবার নয়।

অনেকের সংস্কার এই, বহুবিবাহ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। যদিও এ সংস্কার নিতান্ত অমূলক না হউক, কিন্তু যে অত্যাচার উৎপাটন বহুবিবাহ নিবারণ প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহার কিছুই লাঘব হইতেছে না। রোগ অপেক্ষা তাহার উপসর্গই অধিক মারাত্মক, যদি উপসর্গের দৌরাত্ম্যে কুলীন সমাজ অধঃপাতে না যাইত, তবে বহু বিবাহের প্রতি তাদৃশ আপত্তি কখনও উত্থাপিত হইত না। মেল, [অস্পষ্ট] ও আবৃত্তিই সেই উপসর্গসমূহের মূল। ঐ মূলগুলি এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, রাজ–শক্তিব্যতীত উহার একটি পরমাণু ও স্থান পরিবর্তন করিবে না। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বহুবিবাহ আপনা হইতেই হ্রাস পাইতেছে, বোধ হয় তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, কেবল অর্থলোভমূলক বহুবিবাহ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে যে রূপ ছিল আজিও ঠিক তদ্রূপই আছে। কিন্তু উহা হ্রাস পাইবারও নহে। প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে বর্তমান আলোচনা দুই তিন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমত বিক্রমপুরবাসী বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়[৬] মহাশয়ের বক্তৃতা ও লেখনী দ্বারা নিঃসৃত হইয়া কুলীন কুমারীগণের রোদন ধ্বনি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হয়। হিন্দু হিতৈষিনী[৭] ক্রমশ তাহার বিস্তার করিতে লাগিলেন। ফরিদপুর প্রভৃতি নানা স্থানে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ওদিকে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণীর গম্ভীর স্বর-সাহায্যে সংবর্দ্ধিত হইয়া উহা সমুদায় বঙ্গদেশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সদয় ও উদারচিত্ত কুলীন এবং ঘটক মহাশয়েরা ভীত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বেই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষক দুইজন তেজীয়ান নব্য "প্রামাণিক" তাঁহাদের সহায় হইলেন। রাজবিধির প্রতিকূলে অদ্ভুত যুক্তি সকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একজন মিষ্ট২ স্বরে বলিতে লাগিলেন "কুমারীগণের [অস্পষ্ট] নিমিত্ত রোদন করিওনা, আইন অতি শত্রু। এ বিষয়ে আইন হইলে বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। বিবাহ বিষয়ে আইন না থাকা স্বাধীনতার চিহ্ন। পৃথিবীতে জর্ম্মন, ইংরেজ ও ফরাসী প্রভৃতি যত জাতি আছে, বিবাহ বিষয়ে আইন থাকাতেই তাহারা পরাধীন হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বকালে যখন এদেশ পরাধীন ছিল, তখন এদেশেও এ বিষয়ে আইন ছিল। কিন্তু যবনাধিকার অবধি স্বাধীনতা হওয়াতে এখানে তদ্বিষয়েক কোন আইন নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর পুরুষ জাতির স্বাধীনতা বিলোপ করা অনুচিত। বর্ত্তমান ইরোপীয়েরা এবং এদেশের প্রাচীন ঋষিরা যাহাকে পুরুষ জাতির স্বেচ্ছাচারিতা বলেন, বাস্তবিক তাহাই স্বাধীনতা, এআইন হইলে তাহা রক্ষা পায় না। বিশেষতঃ এ আইন হইলে স্ত্রী হত্যার বৃদ্ধি হইবে, হিন্দু সমাজের মূলগ্রন্থি শিথিল হইবে। অতএব চুপ কর। বিদ্যাশিক্ষা ও শাসনপ্রণালীর গুণে তোমাদের পীড়ার উপশম হইবে। তোমাদের মৃত্যু যাতনা উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার নিমিত্ত চিন্তা কি, মৃত্যু হয় হউক ক্ষতি কি? বিদ্যা শিক্ষারূপ ঔষধগুণে একদিন আরোগ্য লাভ করিবে, কেননা কাল নিরবধি।"

আর একজন সদর্পে কহিলেন, "সমাজের দোষ আমরা সংশোধন করিব। আইন কেন? গদিতে বসিয়া গাল গল্প করিয়া সরু তন্ডুলের অন্ন খাইলে এই বুদ্ধিই হয়, আরে কোমর বাঁধ, সভা কর, বক্তৃতা কর, বিজ্ঞাপন দাও, রচনা কর, ইষ্টসিদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ এ বিষয়টি শাস্ত্র [অস্পষ্ট] করিতে হইবে, আবার এটি শাস্ত্রসিদ্ধ সুতরাং আইন হওয়া অনুচিত। বরং [অস্পষ্ট] হউক। আর [অস্পষ্ট] অনুচিত হইলে অগত্যা স্ত্রীলোকগুলি দগ্ধ হউক। কিন্তু তথাপি পুরুষ জাতির স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে।"

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। তারানাথ তর্কবাচস্পতি[৮] মহাশয় যখন মত পরিবর্তন করেন, তখন এক মহাশয় স্বদলপুষ্টি মানসে চাটুকাররূপ উৎকোচ দানার্থ বলিয়াছিলেন, ৫ বৎসরান্তে মত পরিবর্তন করাতেই তাঁহার বল্লালি সংক্রান্ত বিজ্ঞতার পরিচয় হইয়াছে। যদি তাঁহার এইরূপ মত পরিবর্ত্তন না হইত, তবে এ পাঁচ বৎসরে তিনি কি বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় তদুত্তরে একজন বলিয়াছিলেন মত পরিবর্ত্তনই যদি বিজ্ঞতার লক্ষণ হয়, তবে কয়েক বৎসরান্তে বিজ্ঞতা প্রভাবে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এমতও (সমাজ দ্বারা নিবারণ হওয়া) পরিবর্ত্ত করিয়া এইরূপ আর একটি নতুন মত দেওয়া উচিত যে বহুবিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। কথাটি উপহাসরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল বটে,

কিন্তু কৌতূকের বিষয় এই কার্য্যকালে তর্কবাচস্পতি তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যাবদিচ্ছং ভাবদ্বিবাহ স্যোচিতত্বাৎ" অর্থাৎ যত ইচ্ছা বিবাহ করা কর্ত্তব্য। বোধহয় এক্ষণ তাঁহার প্রতি দ্বিতীয় ধন্যবাদ হইবে। যাহা হউক তৎসময়ে রাজশাসন প্রার্থিপক্ষ হইতেও নানা প্রকারে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। [অস্পষ্ট] বাগযুদ্ধের আরম্ভ হইল। বিক্রমপুরে নিরীহ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাক্যতঃ [অস্পষ্ট] প্রকারে উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। প্রহারের ভয়ে পুলিসের নিকট তাঁহাকে সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। আড়ম্বরের সীমা রহিল না। এক সুসিদ্ধান্তকারক "একঃ কপোত পোতকঃ" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এবার আর বহু বিবাহের নিস্তার নাই। কিন্তু আমরা তখনই নিশ্চয় করিয়াছিলাম এ সকল আড়ম্বর শরদ্‌ঘনগর্জ্জনবৎ কেবল শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। কুলীনকুমারী প্রতিনিধিগণ তখনই এই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, রাজশক্তি প্রয়োগোপযোগিনী একতা হওয়া দূরে থাকুক, যেরূপ দলাদলি দেখা যায়, আইন প্রার্থোনোপোযোগিনী সহজ একতাও হইবে না। তর্ক বিজয়ার্থ যাহারা নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্য উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদের সমুদয় কথাই প্রতারণা মাত্র যেই মাত্র আইনের প্রস্তাব রহিত হইবে, অমনি সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ করিবেন। ভবিষ্যদ্বক্তার উক্তির ন্যায় ঐ কথাগুলি সফল হইল। সমাজশক্তির চেষ্টা দূরে থাকুক, কাহারও মুখে একটি শব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না।

ওদিকে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এদেশীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগের চিরপ্রসিদ্ধ পথ অবলম্বন করিলেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ভবশঙ্কর বিদ্যারতন ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই আরম্ভ করিলেন। কুলীনতনয়াগণ ভীত এবং তপোবনোজ্‌ঝিতা জানকীর ন্যায় মলিন ও নিরাশ হইলেন। কিন্তু তদীয় রোদন ধ্বনি কুশেদাহারী মহর্ষির হৃদয় ব্যথিত করিল। স্বকার্য্য চিন্তা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া রাখিতে পারিল না। রত্নাকর স্বতঃপ্রবৃত্ত [অস্পষ্ট] হইলেন। কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস সীতা বনবাস প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন,—

"তামভ্যগচ্ছ রুদিতানুসারী
কবিঃ কুশেদ্বধাহরণায় যাঃ
নিমাদবিদ্ধাণ্ডজ দর্শনোত্থঃ
শ্রোকত্বমাপাদ্যত যস্য শোকঃ"

অর্থাৎ ব্যাধবিদ্ধ বিহঙ্গ দর্শনে যাঁহার শোক সমুত্থিত হইয়া শ্লোকরূপে পরিণত হইয়াছে সমিৎকুশাহরণগামী সেই কবি জানকীর রোদন শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ফলতঃ উপস্থিত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের[৯] উদ্যম সর্ব্বথা মহর্ষি বাল্মীকির অভিনয় স্বরূপ হইয়াছে। পশুবৎ উপেক্ষিতা বিধবাদিগের দুর্দ্দশা দর্শনে "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি বাক্য যাঁহার মুখ হইতে নিগৃত হইয়া নূতনাবতীর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বিখ্যাত হইয়াছে, কুলীন তনয়াদিগের নৈরাশ্য সময়ে সেই বিদ্যাসাগর নৈয়র্গিক স্নেহ প্রণোদিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, রাজদ্বারে যাইয়া নাগরিকদের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ইহাকেও বা উক্ত মহর্ষির ন্যায় অকৃতকার্য্য হইতে হয়। যাহা হউক মহর্ষি বাল্মীকি প্রথমতঃ জানকীকে সাহায্য দান করিতে যাইয়া বিপন্ন হন নাই। কুলীনতনয়াদিগের অদৃষ্টগুণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইতে হইয়াছে। যাঁহার যতদূর শক্তি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি, বিধবা–

বিবাহরূপ মহাসমরবিজয়ী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এসকল অস্ত্র বালকপ্রক্ষিপ্ত ক্রীড়ণকবৎ একান্ত অকর্ম্মণ্য হইবে। কেহ দায়ভাগ হইতে কয়েকটি শঙ্কু কেহ স্থানান্তর হইতে ৩/৪টি সূচী লইয়া মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক বীর পুরুষ "শাশুড়ী বাঘিনী, ননদী নাগিনী সাতনী বিষের ঘর" এটিকেও যত্নপূর্ব্বক আহরণ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে "দ্বিজাতীনাং" ব্রহ্মাস্ত্রের মুখে পড়িয়া তৎসমুদায় যে অস্মীভৃত হইবে সন্দেহ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, যাহা কিছু বিচার তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গেই হইয়াছে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, জয়শ্রী এযাবৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেই আছেন। ইহাতে কি আপত্তি খণ্ডন, কি প্রমাণ প্রদর্শন, কি মীমাংসা সকলই যারপর নাই মনোহর অতিরিক্ত হইয়াছে, কিন্তু পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তির মীমাংসায় আমাদিগের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই, ঐ মীমাংসাটি আরও কিছু পরিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিল। ঐ স্থানে "সর্ব্বাগ্রে দ্বিজাতীনাং" এই বচনের পরিসংখ্যাত্ব পরিহার পূর্ব্বক অপূর্ব্ব বিধিত্বকলি হইয়াছে। সেরূপ কল্পনা করিতে গেলে কামতঃ সবর্ণাবিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ বা বিধি কিছুই থাকিতেছে না, যে বিষয়ে নিষেধ বা বিধি কিছুই থাকে না থাকে, তাহার অনুষ্ঠান যে প্রত্যবায়জনক, তাহার প্রমাণ কি? যদিও ঐ পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠার ১১শ ও ১২শ পংক্তিলিখিত র্তকবাচস্পতি মহাশয়ের উক্তিতেই তাদৃশ প্রমাণের আভাস পাওয়া যায় তথাপি স্পষ্ট বোধনার্থ ৪১ পৃষ্ঠায় যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে জিজ্ঞাসার শেষ হইতে পুস্তকখানি পালি বর্যণ দোষে কলঙ্কিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের তুল্য নির্ম্মাণচিত্ত ব্যক্তির এ দোষ দর্শনে অনেক দুঃখিত হইয়াছেন।

আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে একান্ত মূর্খ সুতরাং উক্ত পুস্তকের দোষগুণ বিচারে অধিকার নাই। সাধারণ বুদ্ধিতে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, এখানি সাগর সমুদ্ধিত দ্বিতীয় রত্ন। গত দুই তিন বৎসর তর্ক সমুদ্র মন্থনে আর কিছুই উপকার হউক বা না হউক, এই এক অপূর্ব্বরত্ন লব্ধ হইয়াছে। অতলস্পর্শ হিন্দুশাস্ত্রাগর্ব্বের "সবর্ণাগ্রে দ্বিওজাতীনাং" এ রত্নের এতাদৃশ মূল্য এতদিন কে জানিতে পারিয়াছিল? কে, ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইত? ধন্য বিদ্যাসাগর। সার্থকক্ষণে তুমি জন্ম ধারণ করিয়াছিলে। শুভক্ষণে তোমার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল।

তোমারই পরিশ্রম ও অধ্যবসার জন্য, এক সময় "গায়ত্রীং দশ ধায়প্তা" ইত্যাদি ব্যবস্থাপয়িতা রঘুনন্দন, যে হিন্দু সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন, বর্তমান পরিবর্তনাবর্ত্তে একমাত্র তুমিই তাহার কর্ণধারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে। আপাততঃ যে রূপই হউক, যদি জগদীশ্বরের অনুগ্রহে হিন্দু সমাজ বিলুপ্ত না হয়, তবে কালক্রমে, বিধবা-বিবাহবিষয়কগ্রন্থ বন্ধনবিমোচন দ্বিতীয় রঘুনন্দন প্রণীত ও বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তক স্বেচ্ছাচারিতানিবারক তাদৃশ ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ বিরচিত বলিয়া বিঘোষিত হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তোমার অস্ত গমন হইলে ভারত ভূমি অন্ধকারময় হইবে। পরিবর্তনোন্মুখ হিন্দুধর্মের মূল এইরূপ স্থিরতর রাখিয়া ক্রমে ইহার বন্ধনের শিথিলতা বিধান ও যথেচ্ছাচারিতানিবারণ করিতে পারে ভবিষ্যতের নিমিত্ত এরূপ একটি... [অস্পষ্ট]।

যাহা হউক প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে তুমি যদি এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাক, তবে আর কুলীনকুমারীগণের উদ্ধার হইল না। [অস্পষ্ট] তাহাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়াছে। [অস্পষ্ট] "নব্য প্রামাণিকেরা" সমাজশক্তি দ্বারা রক্ষা করিবেন বলিয়া আস্ফালন ও দীর্ঘ দীর্ঘ কথা

বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণ সহস্র জন সমস্র অনুযোগ করিলেও তাঁহারা শুনিয়াও শুনিবেন না। হয়ত আবার রাজশ্বাসন প্রার্থনার প্রস্তাব হইলে, উল্লমফন প্রলমফন করিয়া বাহ্বাসেফাটন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন। ফল কথা এই, উক্ত নব্য সম্প্রদায় মধ্যে মুখে যিনিই যাহা আশ্বাস প্রদান করুন, তাঁহাদিগের দ্বারা কার্য্যতঃ কুলীন তনয়াদিগের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। একমাত্র তুমিই তাহাদিগের ভরসার স্থল। তাহাদিগের আশা এই, বিধবাবিবাহ বিষয়ে তুমি যে রূপ বীরের ন্যায় বলপূর্ব্বক রাজবিধি আকর্ষণ করিয়াছিলে, এ বিষয়েও তোমাকর্তৃক সেইরূপ বীর্য্যই প্রদর্শিত হইবে। কুলীনতনয়াগণ। তোমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, বিদ্যাসাগর সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষিত হউন, তিনি যখন মুহূর্তের নিমিত্ত তোমাদিগকে বিস্মৃত না হন। যদি এ সহায় বলেও তোমাদিগের উদ্ধার না হইবে তবে নিশ্চয় জানিবে, তোমাদের এ ঘোর দুঃখ বিভাবরী প্রভাত হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

৫মে, ১৮৭৩

## এতদঞ্চলের উচ্চজাতীয়দিগের সংখ্যার হ্রাস

এতদঞ্চলের পূর্ব্বেকার ভদ্রজাতীয়দিগের সংখ্যা যে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে তাহা কিঞ্চিন্মাত্র অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেই অনুভূত হয়। প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকে সর্ব্বদাই একথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীনেরা পূর্ব্বকালের সকল বিষয়েরই গৌরব করিয়া থাকেন এবং সমাজের ক্রমশঃ উন্নতি স্বীকার করেন না সুতরাং এটিও কেবল তাঁহাদের সেই সংস্কারের অনুগামী বিশ্বাস মাত্র, তাঁহারা নিজে যদি অন্ততঃ বিশংতি বৎসরের অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখিতে পারেন তবে এতদ্বিষয়ে প্রাচীনদিগের কথার যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা অনায়াসেই তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন যে বিশংতি বৎসর পূর্ব্বে গ্রামিক কোন শ্রাদ্ধ বা ব্যাপারে কত লোককে একত্রে ভোজন করিতে দেখা যাইত এবং এখনই বা কত লোক একত্রিত হইয়া থাকেন। এমনকি দশ বৎসর কালের অবস্থায় আলোচনা করিলেও একথার যথার্থতা অনুভূত হইতে পারে।

এতদ্বিষয়ে যেরূপ সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে ইহার কারণ স্থির হইতে পারে, আমরা যদিও সেরূপ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই কিন্তু বাঙ্গালার সীমাস্থান ভিন্ন প্রায় সমুদায় মধ্য প্রদেশটিতে যে এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অনেকের নিকটেই জানিয়াছি।

এখনও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয়েরা এদেশের শিরোভূষণ স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা প্রভৃতি, এ হীনাবস্থ দেশের যাহা কিছু গৌরবের তাহা এখনও ঐ সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যার যেরূপ হ্রাস হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে এই সকল উচ্চজাতির বিলোপ হইবে।

গ্রাম্য উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসী ভদ্রলোকদিগের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন হ্রাস হওয়া যে দৃষ্ট হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন জাতির প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যার আধিক্যের উল্লেখ করিতেছি। স্ত্রীলোকের সংখ্যা অর্দ্ধেকের কিছু অধিক থাকা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা কিন্তু যদি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অত্যন্ত ন্যূনাধিক্য হয় তবে সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা উপস্থিত হয়

এবং সেই তারতম্য যদি থাকিয়া যায় ও তাহার সংশোধনের উপায় না হয় তবে যে সমস্ত সম্প্রদায়ের এইরূপ অবস্থা, পরিণামে তাহাদের বংশলোপ হয়। হিন্দু ভদ্র পরিবার মধ্যে বিধবা সমেত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশঃ অত্যন্ত অধিক হইতেছে, ইহাতে অনায়াসেই অনুভূত হয় যে সেই পরিমাণে পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা খাজুরা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বসতি স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি যদি আমাদের অনুরোধে মনোযোগ করিবেন, তিনি অনায়াসেই দেখিবেন যে, ঐ সকল গ্রামে ব্রহ্মণের সংখ্যা পূর্ব্বে কতছিল এবং এখন কত আছে। এইরূপ অবস্থা ক্রমশঃ চলিলে দেশ শেষে পুরুষ শূন্য হইবে এবং তখনই প্রকৃতরূপে জাতিবিলোপ হইবে।

এই শোচনীয় অবস্থা মনে করিলে এদেশীয় মাত্রেই যে ব্যথিত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। অন্যান্য হিন্দু জাতীয়দিগের মধ্যে ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতীয়দিগের বিলোপ হইলে বাঙ্গালায় হিন্দুনাম যে বিলোপ হইবে, তাহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

এই শোচনীয় অবস্থার অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে বৈবাহিক নিয়মের দোষ প্রধান। হিন্দু জাতীয়দিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই এবং কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীর বালিকা বয়সে বিবাহ হয় এবং বিধবা-বয়সে বিবাহ হয় এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় পরিণত বয়স্ক বা বৃদ্ধ পুরুষের বালিকার সহিত পরিণয় হইয়া থাকে। কৌলীন্যমর্যাদা সম্পন্ন লোকে এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন এবং বৃদ্ধাবস্থা হইলেও তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ হয়, অথচ অকুলীন পুরুষদিগের বিবাহ হওয়া দুর্ঘট। অবিবাহিতা কুলীনকন্যা অনেক থাকিলেও বিবাহিত বৃদ্ধ বা মুমূর্ষু কুলীনের সহিত তাহাদের বিবাহ হয়, কিন্তু অকুলীন অথচ দোযবরের সহিত বিবাহ হয় না। ইহাতে কতকগুলি লোকের বিবাহ হয় না, অথচ সন্তানবিহীনা বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি হয়।

এই সকল কারণে আমাদের হিন্দু সমাজের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। যাঁহারা যুক্তিদ্বারা বিধবা বিবাহের অনৌচিত্য প্রদর্শন করেন, তাঁহারা বলেন যে, সকল সমাজেই অত্যন্ত প্রজাবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম আছে। হিন্দু সমাজে যখন বহু বিবাহ প্রচলিত আছে, তখন বিধবার বিবাহ হইবার নিয়ম থাকা উচিত নহে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে, বিধবার সংখ্যা যত অধিক, বহুবিবাহকর্ত্তা পতির স্ত্রীর সংখ্যা তত নহে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পুরুষের নির্ব্বীর্য্যতা বশতঃ বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের বয়সের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কখনই সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। সমাজের উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থা না হইলে আমরা কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক রীতির উল্লেখ করিতাম না। যাঁহারা আমাদের সমাজের অধিনায়ক তাঁহারা এই সকল বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখুন এবং তাঁহাদের নিকটে আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারা সামান্য মান, মর্য্যাদা ও দেশীয় রীতির পক্ষপাতিতা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে হিন্দুজাতি বিলুপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন। পূর্ব্বে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহার প্রতিবিধান হইবার উপায় নাই। এখন সমাজের উল্লিখিত গুরুতর বিপদ স্মরণ করিয়া আর তাঁহারা নিশ্চেষ্ট না থাকেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

(রাজশাহী সমাচার)
৮ আগস্ট, ১৮৭৫

## বিবাহাদির ব্যয়াধিক্য

বিবাহের ব্যয় এক্ষণ সকল শ্রেণীর মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়াছে। রাজপুতদিগের মধ্যে কন্যা বিবাহে অধিকব্যয় স্বীকার করিতে হইত বলিয়া নিষ্ঠুরেরা কন্যা সন্তান হত্যা করিত। বঙ্গদেশের সকল সম্প্রদায়েই নানাপ্রকার ব্যয়বৃদ্ধি নিবন্ধন বিষম কষ্টানুভব করিতেছে। মুনসী প্যারীলাল বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করণোদ্দেশে নানাস্থান ভ্রমণ ও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে ৫৲ টাকায় যে কার্য্য হইত, আজি অন্ততঃ ১৫৲ টাকার ন্যূনে সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহার উপর বিদেশীয় সভ্যতা, বিলাসিতা এবং লোকানুরোধপ্রিয়তার অত্যাচারে লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যবিত্ত অনেক ব্যক্তি পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বা কন্যাদির বিবাহ ইত্যাদি কোন ক্রিয়াতে লিপ্ত হইলেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন, অনেকেই ঋণ যন্ত্রণায় অধীর হন। এমতস্থলে বিবাহের ব্যয় বলিয়া নহে, সকল ক্রিয়াতেই যত ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে ততই মঙ্গল। কিন্তু মুখে যেরূপ বলা যায় কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠে না। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শেষ আর ব্যয়ের সঙ্কল্পিত সীমাস্থির রাখা দুস্কর হইয়া উঠে। কতকদিন বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ করণার্থ মুন্সী প্যারীলাল স্থানে২ বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছেন, সংপ্রতি অন্তবায় শ্রেণীর বিবাহ ব্যয় লাঘব করিবার মানসে কলিকাতাস্থ বাবু নীলকমল বসাক নাকি বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন। ইনি আবার কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন বলা যায় না। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের কথায় লোকে সাংসারিক কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম ঘটাইতে সম্মত হয় না। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। সমাজের সকলে এক মতাবলম্বী না হইলে এই চেষ্টা কোন মতেই শুভফল প্রদায়িনী হইবে না। সমাজের একতা অতি দেবদুল্লভ বস্ত, বিশেষ বঙ্গসমাজে তাহা কখনই হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ১০/১২ বৎসরের চেষ্টায় এদেশের রাঢ়ীশ্রেণীয় কুলীন সম্প্রদায় এতদিনে সাধারণের ন্যায় সুখী হইতে পারিতেন।

ব্যয় সংক্ষেপটি আবার অন্য কোন প্রকার সামাজিক ঘটনা অপেক্ষাও কঠিন বিষয়। যাহার ১০ টাকার সঙ্গতি আছে, সে কেন ব্যয় না করিবে? সে আবার ব্যক্তি–বিশেষের উপদেশে বাধ্য হইবে কেন? যাহার ৫ টাকার সঙ্গতি আছে সে ব্যক্তি ১০ টাকা সঙ্গতিপন্নের তুল্য ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইলে লোকে তাহাকে নিন্দা করে, আবার তন্নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা সাহসের সহিত উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিয়া থাকে, সম্পূর্ণ না হইলেও বার আনা পরিমাণ না হইলে আর সে সামাজিকগণের কঠোর রসনার নিন্দাবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। অন্যান্য দেশ করিতে গেলে অনেকের বিরাগবাজন হইতে হয়। কোন ক্রিয়ারম্ভ করিয়া আত্মীয়–স্বজনের অসন্তুষ্টি জন্মাইতে কাহারও ইচ্ছা হয় না, বরং নানাপ্রকারের অসুবিধা বা কষ্ট হইলেও সমস্ত সহ্য করিয়া থাকেন। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা এ সকল কথা সমধিকরূপে আন্দোলন করেন, তাহারাই বাধ্য হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া লোককে সমুচিত মিতব্যয়ী হইতে দেন না। তাঁহাদের দৃষ্টান্তেই লোকে ক্ষমতাতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। ফলে বিবাহ বলিয়া নহে, সকল ক্রিয়াতেই ক্ষমতানুসারে ব্যয় করার প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত না হইলে এদেশীয়দিগের আর রক্ষা নাই।

৫ জুন, ১৮৭৯

## উৎকোচ

...বর্তমান সময়ে এদেশে যেরূপ রাজশাসন, আইনের কড়াকড়ি, বোধ হয়, এরূপ আর কোনও সুসভ্য দেশে দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য দেশে অবস্থোন্নতির সঙ্গে২ মামলা মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হয়, কিন্তু এদেশে দিন দিনই উহার আধিক্য হইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল লোকের আদালতে আসিয়া মিথ্যা মকদ্দমা করিবার ভরসা। একজন আমলাকে কিঞ্চিৎ দিলেই যাহা ইচ্ছা তাহা করান যাইতে পারে ; সুতরাং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া সাজাইতে আর কষ্ট কি? কোন বিশেষ কর্ম্মচারীকে হাকিম বিশ্বাস কি স্নেহ করেন সুতরাং মামলাকারীর সুবিধা হইল, সে তাহা দ্বারা হাকিমকে এক কথায় আর কথা বুঝাইয়া মকদ্দমা প্রতুল করিয়া লইল। আদালত প্রতারিত হইল। নিরাপরাধ একজনের সর্ব্বনাশ হইল। হাকিম কিছু একা সকল দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করিতে পারেন না, অথবা এমন অনেক হাকিম আছেন, তাঁহারা নিজে কিছুই বুঝেন না, অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সহায়তা লইতে হয়, সেই সাহায্যকারী কর্ম্মচারীরা যদি দুচার কথা মিছা বলিয়া অন্যথা প্রতীতি লওয়াইতে ইচ্ছা করে, তবে সাধ্য কি যে তিনি প্রতারিত না হইয়া পারেন? সুতরাং আদালতে সত্যের জয় সুদূরপরাহত ; সম্ভবতঃ টাকারই জয় হয়। এক উৎকোচগ্রাহিতা দেশের নানা অনর্থ ঘটাইতেছে। যত এই সকল আভ্যন্তরিত দোষ বিদুষিত না হইবে, ততদিন আমরা দেশের ভদ্রস্থতা মনে করিতে পারিনা।

আদালতে অশিক্ষিত লোকের বাহুল্যই যে শুদ্ধ এই অনিষ্টের কারণ তাহার সন্দেহ নাই। যতদিন না আদালতে শিক্ষিত লোক প্রবেশ করিতেছেন, ততদিনই এই অনিষ্টটি দেশে সংক্রামক হইয়া থাকিবে। জ্ঞান দুষ্প্রবৃত্তির শাস্তী, দুষ্প্রবৃত্তির শাসনই উন্নতি। যাহার জ্ঞান নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, সে কেমন করিয়া আপতমধুর লোভ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। একথা সত্যবটে, কোন কোন স্থানে অনেক শিক্ষিতাভিনী মহাত্মানও উৎকোচের নামে লাফাইয়া উঠেন, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র। পুস্তকের অর্থ করিতে পারিলেই যে শিক্ষা হইল তাহা নহে, আধ্যাত্মিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। সামান্য লাভের প্রত্যাশায় যে ব্যক্তি পরের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত নহে, সেই জঘন্যচেতার সহিত অসভ্য বন্য দস্যুর প্রভেদ কি? অপিচ অবশ্য স্বীকার্য্য যে আজকাল নির্লোভ, ধর্ম্মিষ্ঠ অনেক শিক্ষিত লোকেরও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু দেশের এমনই দুভার্গ্য, লোকের চরিত্রগত এত অপক্কতাই রহিয়াছে যে "আমার কোন অনিষ্ট না করিয়া পরে যে রূপে ইচ্ছা দুই টাকার লাভ করুক, তাহাতে আমার কি?" সুনীতির মূলোচ্ছেদক এই মারাত্মক জ্ঞানটি অনেকেরই হৃদয়কে সাধারণ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই জ্ঞানপ্রভাবে চোকের উপর একজনের সর্ব্বনাশ হইতে দেখিলেও কেহ তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহে না। এই সকল দোষ শীঘ্র সংশোধিত হইবার নহে। এগুলি জাতীয় অনুন্নতির চিরসহচর, জাতীয় উন্নতি না হইলে এদোষগুলিও তিরোহিত হইবে না।

শিক্ষিত লোক যে আদালতে প্রবেশ করিতে চায় না, তাহা নহে। বরং অনেক আদালত সংক্রান্ত চাকুরি পাওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে উৎসুকও দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? আদালতে প্রবেশ করা সামান্য কথা নহে, উহাতে শিক্ষিতা-শিক্ষিতের বিচার হয় না। উহা নামে মাত্র "সন্দেহ নিরসন স্থান" কিন্তু কার্য্যে জগতের যত কিছু প্রতারণা, প্রায় আদালতেই তাহার সংপূর্ণ ছবি পরিলক্ষিত হয়। ভদ্রলোকের প্রবেশ করিতে ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময়ে অকৃতকার্য্য সুতরাং লজ্জিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। প্রধানতঃ নিম্নকর্ম্মচারীদিগকে

প্রমোশন দেওয়ার প্রণালীই আদালতের মূলনীতি। আদালত যুক্তি প্রদর্শন করেন, নকলনবিশি হইতে কার্য্য করিয়া না আসিলে, কেহ আদালতের কার্য্যে পটুতা লাভ করিতে পারে না। একথা অজ্ঞান ব্যক্তি সম্বন্ধে খাটিতে পারে বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত লোকদিগের সম্বন্ধে এই বাক্যের যথার্থ্য স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক এ প্রণালীতে আদালতে কখনই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রবিষ্ট হইবেন না। অপিচ আজকাল অনুরোধ উপরোধ যেরূপ সক্রামক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোন কিছুর উপরই কার্য্য পাওয়ার ভরসা করা যায় না। এইক্ষণ যাহার সহায় বল আছে, তাহারই কার্য্য পাওয়ার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এসব দোষের সংশোধন না হইলে আদালতে শিক্ষিত লোকের প্রবেশ সম্ভাবনা অল্প।...

গবর্ণমেন্ট প্রজার সুবিধার নিমিত্তই আদালতে অজস্র টাকা বর্ষণ করিতেছেন, অথচ প্রজারাও অর্থক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছে না। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? সাধারণত গবর্ণমেন্টের আইনের দোষে নিরর্থক ব্যয় ও কালহরণাদি নিবন্ধন লোকে আদালতকে যমালয় বলিয়া মনে করে। যিনি একবার এক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তাহাকে পরেরটি লইয়া যাওয়াই কষ্টকর হইয়া উঠে। গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেন্ট এই অশিক্ষিত ইতর প্রকৃতির লোকদিগকে দূরীকৃত করিয়া উপযুক্ত সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র লোক নিযুক্ত করিবেন, তাহা হইলে প্রজারও মঙ্গল হইবে এবং আদালতও অনেকাংশে দোষভার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য উজ্জীবিত করিতে পারিবেন।

১৯ জুন, ১৮৭৯

### অস্মদেশীয় দানবীরগণ

আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্যশালীদিগের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে গেলে নিতান্ত বিস্মিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইতে হয়। ইহারা যেভাবে পরিচালিত হইতেছেন তাহা নিতান্ত শোচনীয়। নাসারজ্জু পরিচালিত ভল্লুক ও চালকের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কার্য্য করিবার সময়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া স্বাধীনতার আভাস প্রকাশ করে, কিন্তু আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্যশালীদিগের কোন বিষয়ে স্বাধীনতাই নাই, আবার যাহা থাকিবার সম্ভব, তাহাও ভগ্নকপর্দ্দকে বিনিময় করিতে কুণ্ঠিত হন না। অধিক কি, কেহ ২ ধর্ম্ম স্বাধীনতাও বিনাপণে বিক্রয় করিয়া আপনার অসারতা বিস্তার করেন। কলিকাতায় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার[১০] বিজ্ঞানসভা সংস্থাপন করিয়া তাহার কার্য্যসাধনার্থ দ্বারে ২ প্রার্থনা করিয়াছেন, যাঁহারা সাহায্যদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকে লোভাকৃষ্ট চিত্ত, দেশের উপকারার্থ নিঃস্বার্থভাবে কয় ব্যক্তি দান করিয়াছেন বলিতে পারি না। স্পষ্ট বলিলেও চলে যে, অনেকে দেশের হিতকামনা করিয়া দান করেন নাই। অনেকে এ সভার আবশ্যকতা অনুভব করিতেও সমর্থ হন নাই। যাঁহারা সমর্থ, তাহারা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বাবুর আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সহায়তা করিলে আশানুরূপ যশঃ ও সম্মান পাইবেন না বলিয়া নীরবে রহিয়াছেন। অনেককে দেশের উপকারের নামে পুনঃ ২ অনুরোধ এবং প্রতিবাদ করিতেও ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু অনেকেই সাহস সহকারে নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সভাতে দান করিলে যদি রাজপ্রসাদ লাভের অধিকারী হইবার কোন উপায় থাকিত, ডাক্তার সরকার আশাতীত অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন, সন্দেহ নাই।...

আমাদের দেশের সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের অনেকে যে রাজপুরুষদিগের তুষ্টি সম্পাদনার্থ অপকার্য্যেও যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে পারেন, আর তাঁহাদের নিঃসংসৃষ্ট বিষয়ে কপর্দ্দক প্রদান করাও অপব্যয় মনে করেন, তাহার উদাহরণের অভাব নাই।...

১৮ এপ্রিল, ১৮৮০

**মনের আবেগ**

(১)

ধন্যরে মানব মন ! প্রভঞ্জন প্রতি,
জিনিয়ে তোমার গতি ; ধন্যরে তোমায়।
শত ধন্য সেইজনে যে বিশ্বমাঝারে
স্থাপিল তোমারে যত্নে মান কায়ায়।
যেখানে মানবপদ অথবা নয়ন
নাহি পারে বিচরিতে, সেখানেও তুমি,
দ্রুততর বেগে চল, যথাক্ষণ প্রভা
নিমিষে আকাশ গায় করে বিচরণ।

(২)

কভুবা উড়িয়া যাও ব্যোমপথ দিয়া
স্বর্গের পবিত্রদ্বারে,—যথা মন্দাকিনী
বহে মৃদুমন্দ স্রোতে স্বর্ণকণাসহ।
চির শ্যাম তরুলতা ফলেফুলে নত
নাই যথা অন্ধকার, স্বর্গীয় আলোকে
আলোকিত সব ঠাই ; নিত্য সুখ ধাম।

(৩)

আবার নরক-গর্ভে হইয়া পতিজ
অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ বিধি মনে
স্বর্গের অজেয় রাজা যথা দৈত্যগণে
ফেলাইয়া দিলা কষ্ট অনন্ত নরকে—
তমিস্র বরণ ঘন—যেখানে অনল
গন্ধকে মিশ্রিত হয়ে জ্বলে দিবানিশি।
প্রত্যেক মুহূর্তে তথা নিরাশা দনুজ
পতিত প্রাণীর প্রতি করে অত্যাচার।
প্রসিদ্ধ মিলটন[১১] কবি খুলিয়া যেপুরী
দেখালো মানব বৃন্দে কৃতান্ত আলয়।

(৪)

তাদৃশ নরকে তুমি কখনো ডুবিয়া
সারহে সুখের স্মৃতি স্বপ্নের মতন ;

যথা স্বপ্ন চলে যায় মুহূর্তেক পরে
ভাসায় প্রাণীর প্রাণ দুখের সাগরে।
সর্ব্বস্থানগামী তুমি দুঃখ সুখভোগী
সয়েছ যাতনা কত এভব মাঝারে,
ভুঞ্জিয়াছ কত সুখ কে পারে বর্ণিতে?

(৫)

করিতেছে কত চিন্তা প্রত্যেক নিমিষে
পার কি বলিতে? ভাবিতে কি পারে কভু
নরক নিবাসী নর স্বর্গীয় চিন্তন?
শুনিয়া মধুর রব অদূর কাননে,
বদ্ধ পদ মৃগ তথা পারে কি যাইতে?
তবে কেন আমি চিন্তি স্বপ্নের মতন
যাইতে স্বাধীন ভূমে সমুদ্রের হৃদে,
উপার্জ্জিতে জ্ঞানরাশি, দেখিতে আচার,
শুনিতে স্বাধীন কথা—বজর গভীর
বৈদ্যুতিক স্রোতে যাহা শিরায় শিরায়
হয় সদা বিলোড়িত ব্রীটনবাসীর।

(৬)

সপ্তসিন্ধু পারে সেই সারস্বত ভূমি
ঘুচে যায় একার যাহার পরশে
দাসের দাসত্ব আর মূর্খের মূর্খতা।
দরিদ্র কাঙ্গাল আমি বাঙ্গালী প্রসূন।
অর্থ বিনা ব্যর্থ চেষ্টা অভিলাষ,
আছে সেদেশে হেন মহাত্মা সুজন,
ফেলায় নিঃশ্বাস যেই বিদেশের লাগি।
নেহারি দুঃখের রাশি, বিদ্যার অভাব?
বঙ্গ উদ্ধারিতে তাঁর লয়না কি মনে
.দেখাইয়া আত্মদেশ, জাতির উন্নতি?

(৭)

আছে কি সে দেশে কেহ? আছয়ে যাঁহার
পবিত্র সহানুভূতি বঙ্গবাসী সনে।
যদি কেহ থাকে তুমি দেখাও তাহারে,
বঙ্গদেশ চিতাস্থলী ভীষণ শ্মশান।
শৃগাল গৃধিনী তথা করয়ে বিহার।
বঙ্গদেশ রক্ষভূমি নব্য বিলাসীর,

জয়দেব-রসে মত্ত বঙ্গীয় সন্তান।
ললিতা লবঙ্গলতা মলয় সমীর,
কুকিল কুজ আর বসন্তাগমন,
মধুকর করম্বিত নিকুঞ্জ কুটীর,
চিরকাল প্রিয়বস্তু বাঙ্গালী জাতির।

(৮)

আছে কিহে ধর্ম্মাপলি বঙ্গের ময়দানে?
স্পারটার মাতৃমর্ম্ম জানে কি তোমার
স্নেহময়ী বঙ্গমাতা? স্নেহের দেবতা?
বলিবে কি বীর গর্ব্বে বীরনারী সম?
"অসি ধর, যাও বাছা সমর মাঝারে
করো যুদ্ধ প্রাণপণে যায় যাবে প্রাণ,
কিন্তু রণে ভঙ্গদিয়া আসিওনা ঘরে,
ভীরু ফেরুপাল সম-সিংহের সন্তান"॥
পাও কি একটি লোক বঙ্গ ইতিহাসে।
নিউটন[১২] কিম্বা মিল,[১৩] ক্রামোয়েল সম?[১৪]

(৯)

কি আছে বঙ্গেতে? আছে লেখনীচালক,
মনুষ্যত্ব হীন যত কাপুরুষগণ
গৃহে সিংহ, রণে শিবা কথায় তৎপর,
আহারেতে বক কাক শূকর সদৃশ।
শুনিবে কি? বঙ্গে আরো কত কিছু আছে
শুন যদি যাও তবে মেকলের[১৫] কাছে।
বীর রস পূর্ণ কথা নাই যে ভাষায়,
যে দেশের অধিবাসী মনুষ্যত্ব হীন,
ধরিয়া মানব দেহ স্বাধীন জীবন,
এহেন দাসের দেশে কে থাকিতে চায়?

বংশবদ—
ইংলন্ড গমনাভিলাষী জনৈক বঙ্গীয় যুবক।
১১ জুলাই, ১৮৮০

## বয়স সম্বন্ধীয় আইন

এদেশে যেমন ইউরোপীয় চিকিৎসাপোযোগী অগণ্য ভেষজালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহুল মুদ্রাযন্ত্র হইতে যেমন নিত্য নিত্য অসংখ্য নাটক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের কূট কৌশলেও তেমনি নিত্য, নিত্য অসংখ্যপ্রকার অত্যদ্ভুত বিধানসকল প্রণীত ও প্রবর্ত্তিত হইয়া ভারতে ইউরোপীয় রাজনীতির

ক্ষীণ অঙ্গের পুষ্টিসাধন করিতেছে। বিংশতিবৎসর পূর্ব্বে বহুসংখ্যক ইংরাজ রাজনৈতিক গ্রন্থের যে পরিচ্ছেদ সকল কেবল শুভাপত্রে পরিপূর্ণ ছিল,—যাহাতে তখন একবিন্দুও মসীরক্ষণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই এখন সেই গ্রন্থ অসংখ্য অমানুষিকী ব্যবস্থায় পূর্ণ হইতেছে। বটতলায় বঙ্গীয়নাটক লেখক মহাশয়েরা যেমন "বলদ মহিমা নাটক" "নাপিতেশ্বর নাটক" "বাঙ্গালীর সাহেব হওয়া নাটক" প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা লিখিয়া বঙ্গীয়া সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তেমনি গবর্ণমেন্টের সুযোগ্য সদস্য মহাত্মারা মদের আইন, খবরের কাগজের আইন, রাজকীয়বর্তে প্রস্রাব ত্যাগের আইন, পায়খানায় পুরীষ পরিত্যাগের আইন, গাঁজা খাওয়ার আইন প্রভৃতি নানাবিধান সৃষ্টি করিয়াছেন। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকল পদার্থ সম্বন্ধেই গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হতভাগ্য কুলীকুল এতদিন নিরাপদে ভ্রমণ করিতেছিল, মস্তকের স্বেদ পদতলে নিপতিত করিয়া চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকায় অস্থিমাংসভেদী পরিশ্রমের দুইতিন আনা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতেছিল, গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া "কুলী এমিগ্রেশন আক্ট" নামক আইনপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যযুগে রাজা মানবাতার সমকালীন দুই একখানি জীর্ণ, মলিন ও ভগ্নপ্রায় তরবারী এতকাল কৃষ্ণকায় দেশীয়লোকের পর্ণকুটীরে অবাধে বিরাজ করিতেছিল, করুণাকর প্রবল ব্রিটিশরাজ সেই অচেতন নির্দ্দোষ পদার্থগুলিকেও অস্ত্রবিষয়ক আইনের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ ব্রিটিশরাজনীতি শাস্ত্রে নাম লেখাইতে হয় নাই, এমন দ্রব্য ভারতে অতিঅল্পই আছে। সৌভাগ্যক্রমে এতদিন কেবল একদল মনুষ্যব্রিটিশ–গবর্ণমেন্টের কূটকৌশল সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ ভোগ করে নাই; তাঁহারাও এক্ষণে পিঞ্জরাবরুদ্ধ প্রায় হইয়াছে। একদল শিশু মাতৃদুগ্ধপান করিয়া সুখে জগতে বিহার করিতেছিল, নশ্বর পৃথিবীর অসারতা, কুটিলতা বিভব, দারিদ্র্য প্রভৃতি যন্ত্রণা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া শৈশব দোলায় পরমসুখে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা দর্শন করিয়া ব্রিটিশ রাজের মনে বিষম ব্যথার সঞ্চার হইল। তিনি তাঁহাদিগকেও শৈশব দোলা হইতে তুলিয়া আনিয়া আইনের বিষম সমস্যাপূর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছেন। ঐ আইনের নাম 'বয়স সমন্ধীয় আইন।' গবর্ণমেন্ট বলেন, এই আইন "নাবালকদিগের জন্য বিধিবদ্ধ" হইয়াছে। ব্যবস্থাপক মহাশয় 'নাবালগ' শব্দের পরিভাষা স্থলে লিখিয়াছেন" যাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্তি সমন্ধীয় আইন অনুসারে সাবলেগ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত বলিয়া গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই, তাহারাই নাবালগ নামের উপযুক্ত এবং তাহাদিগকেও অতঃপর নাবালগ বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।" তদনন্তর তিনি বলেন, "দেশীয় রাজপুরুষদিগের সন্তানেরা একবিংশতি বৎসর এবং তদ্ব্যতীত সাধারণ লোকে অষ্টাদশ বৎসরে উত্তীর্ণ হইলেই সাবালগ বলিয়া গণ্য হইবে।" ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, তোমার আমার শ্রেণীর লোক জন্মের তারিখ হইতে অষ্টাদশ বৎসর অতিক্রম করিলেই সাবলেগ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে ও বৈষয়িককার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইবে। ইহাতে একটী বিষম অসুবিধা এই যে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের হিন্দুউইল করণ বিষয়ক ত্রয়োদশ আইনের ৫৩ ধারা অনুসারে নাবালগ ব্যক্তি কখন২ বাল্যাবস্থায় পৈতৃক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া যথেচ্ছা ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। তখন আদালত তাহাকে সাবালগ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। বিচারপতিরা নাবালগের সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে কিংবা ক্রয় করিতে অনুমতি দেন না। কিন্তু শেষোক্ত আইন অনুসারে নাবালগ ব্যক্তির সহিত সাবালগ ব্যক্তির বয়ঃক্রমের এতদুর তারতম্য ঘটিয়াছে যে, নাবালগের বিচারসম্বন্ধীয় কোন উপস্থিত হইলেই

বিচারপতিকে তদঘটিত সম্পত্তি বিষয়ে বিশেষ গোলযোগে পতিত হইতে হয়। এক সময়ে এক রাজার শাসনে এক আইনের দুইপ্রকার অসঙ্গত বিপরীত অর্থ হওয়া সুশাসনের পক্ষে নিতান্ত অন্তরায়স্বরূপ। দ্বিতীয় কথা এই যে, গবর্ণমেন্ট লিখিয়াছেন, যে সকল ভদ্রসন্তান গবর্ণমেন্টকার্য্যালয়ে চাকরি স্বীকার করিতে অভিলাষী হইবেন, তাহারা পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কর্ম্মে যোগ দেন। এইরূপ বিধি নিতান্ত কঠোর ও যুক্তিশূন্য। একটী বালক যদি ১৭ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে ঠিক পঞ্চবিংশতিবৎসরে সে ষ্টুডেন্টশিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নসমাপ্ত করিবে। গবর্ণমেন্ট ঐ বালকের ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কি তাহাকে চাকরি দিবেন না? একটি বালক যদি ঠিক ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ১৮ বৎসর বয়সে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং কোন কারণে যদি দুই তিন বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ থাকে, তদন্তর যদি ২৯ বৎসর বয়সে এম. এ. বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঠ সমাপ্ত করে, তাহা হইলে সে কি ব্রিটিশ রাজ কার্য্যালয়ে কর্ম্ম পাইবার যোগ্য হইবে না? একজন সুশিক্ষিত সুযোগ্য সুধার্ম্মিক ভদ্রলোক ৩০ বৎসর বয়সে গবর্ণমেন্টের চাকরি স্বীকার করিতে চাহিলে কেন যে তাহাকে তাহা দেওয়া হইবে না, ইহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিনা।

এই আইনের তৃতীয় ও শেষ দোষ এই যে গবর্ণমেন্ট বলেন, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কাহাকেও সিবিল সার্ব্বেন্ট করা হইবেনা। ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নাবালগের অবস্থা। ১৯ বৎসর বয়সে কেমন করিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষাত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? এদেশের লোক ১৯ বৎসর বয়সে বালক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে এদেশের পাঠ এবং বিলাতের পাঠ পরিসমাপ্ত করা কি সহজ কথা? দেশীয় রাজাদিগের সন্তানেরা ২১ বৎসর বয়সে সাবলেগ হন। তাহারা সিবিল সার্ব্বেন্ট হইতে চাহিলে, তাঁহাদিগকে কি নাবালগ অবস্থায় পরীক্ষা দিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট বলেন, "নাবালগেরা গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম পাইতে পারে না।" একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজাদিগের সন্তানেরা সিবিল সার্ব্বেন্ট হইতে পারিবেন না। ফলতঃ বয়স সম্বন্ধীয় আইনটী এতদূর কূটমন্ত্রে পরিপূর্ণ যে, আমরা ইহার সরলতা সম্বন্ধে বিশেষরূপে সন্দিহান হইয়াছি। ভরসা করি, গবর্ণমেন্ট এই আইনটী আর একবার আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

২৩ জুলাই, ১৮৮২

## বর্ত্তমান ধর্ম্ম আন্দোলন

আজি কালি ধর্ম্ম লইয়া এদেশে বিলক্ষণ আন্দোলন, আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সভা সমিতিতে, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে ধর্ম্মাবিষয়ক বক্তৃতা, গ্রন্থ পাঠ ও প্রবন্ধ প্রচারের ধুম পড়িয়া গিয়াছে, হিন্দু ও ব্রাহ্ম দলে বিতণ্ডা চলিতেছে, এই নাস্তিক্য প্রধান উনবিংশ শতাব্দীতে ভক্তি বিশ্বাসহীন সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের এরূপ আন্দোলন, আলোচনা দেখিয়া শুনিয়া কেনা আশ্বস্ত ও আহলাদিত হন? নিদ্রিত থাকিয়া শ্মশানের দৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা জাগরিত হইয়া সভিপ্রায়ে কলহ করা ও শ্রেয়স্কর কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও দেশের প্রধান২ মস্তিষ্কগুলি এই ব্যাপারে ঘটিতেছে, তথাপি আমরা সেই চর্ব্বিত চর্ব্বন ভিন্ন প্রায় কোন নূতন কথাই শুনিতে পাইতেছিনা, ব্রজবিহারীর সেই লীলারক্ষ, কুসংস্কারমূলক প্রাচীন কদাচার, অসত্যে ভক্তি ও

বিশ্বাস স্থাপনের চাতুর্য্যময় প্ররোচনা ও স্বার্থসিদ্ধিমূলক ধর্ম্মবিশ্বাসের কথায়ই নব নব রঙ্গ ফলাইয়া সাধারণ্যে উপস্থাপিত করা হইতেছে। যদি এরূপই হইল—যদি "নবজীবনে"[১৬] পুরান কথারই "প্রচার"[১৭] হইতে থাকিল, তবে "বঙ্গবাসী"[১৮] আহলাদে এত উল্লসিত হইবে কেন?

সম্প্রতি যে কোন নূতন পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতেই ধর্ম্ম বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন, পুরাতন, প্রায় সকল পত্রিকাই এখন ধর্ম্মের ধূয়া ধরিয়াছে। আবার অধিকাংশই একটা সিদ্ধান্ত লইয়া বাহির হইয়াছে।[১৯] সিদ্ধান্ত আগে যুক্তি পরে ইহাই এখনকার রীতি, নহিলে বঙ্কিমবাবু পর্ব্বতের মুষিক প্রসরের ন্যায় "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার" ঐরূপ হবজব উপসংহার করিবেন কেন? যাহারা হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতেছেন। লেখার ভাব ভক্তীতে বোধ হয় তাহাদের সকলের উদ্দেশ্য এক নহে। পুরাতনে ভারতবাসীর চিরকালই অচলা ভক্তি ছিল, উহাই বোধ হয় ভারতের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। অনেকে সেই ভক্তি প্রনোদিত হইয়া পুরাতন ভগ্ন মন্দিরাদির ন্যায় পুরাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণে আগ্রহান্বিত। মন্দিরটি বাসের অযোগ্য হইলেও উহা বজায় থাকুক। এটি যেমন তাঁহাদের ইচ্ছা ধর্ম্মটি বর্তমান সময়ের উপযোগী না হইলেও উহা যেন বিনষ্ট হয়না, উহাও তাঁহাদের আকাঙ্খা। ইহাদের উদ্দেশ্য পবিত্র এবং ভক্তিপূর্ণ; কিন্তু সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আর এক শ্রেণী আছেন, ইঁহারা অন্ধ বিশ্বাসী নহেন এবং ভক্তিমানও নহেন। কিন্তু পূর্ব পুরুষগণ পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তি ছিলেন এবং এবম্বিধ মহা পুরুষগণের বংশধর হইয়াও বিদেশীয়ের হস্তে তাহারা এক্ষণে যে ঘৃণা সূচনা ব্যবহার পাইতেছেন, তাহা পাওয়ার অনুপুযুক্ত ইহা ঘ্যাপন করাই এই শ্রেণীর উদ্দেশ্য। ইহারা স্বদেশ বৎসল বটে। ইঁহারা কোন জীর্ণগ্রন্থ হইতে একটি ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ফ্রাঙ্কলিনের কীর্ত্তিতে কালী দেন, ভাস্করাচার্য্যের নাম করিয়া নিউটনকে তস্কর বলেন, "বিষস্য বিষম্যেবধম" শ্লোক উচ্চারণ করিয়া হানিম্যানের উদ্ভাবনী শক্তি অস্বীকার করেন, গৌতমের নাম লইয়া এরিস্টোটেলকে কপিলের নাম লইয়া স্পেনসারকে তিরস্কার করেন, এবং অশ্লীল গোপীলীলায় দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া পবিত্র প্রেম ও ভক্তির আবেশে "আহামরি" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

ইঁহারা যাহা সম্মুখে পান, তাহা লইয়া এইরূপ আস্ফালন করেন, যাহা সম্মুখে না পান, তাহা মুসলমান পুড়িয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহাদের হতভাগ্য মস্তকে দেবতার অভিসম্পাত আহবান করেন। ইঁহারা ধর্ম্মভীরু বলিয়া হিন্দু নহেন, স্বদেশানুরাগী বলিয়া হিন্দু। তৃতীয় এক শেণীর লোক আছেন, ইহারা চৈতন্য অপেক্ষা স্পেনসারকে[২০] মনে মনে অধিকতর ভক্তি করেন ও মনোযোগের সহিত তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা স্পেনসারকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া চৈতন্যচরিত পাঠ করেন নাই তাহাদের নিকট নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনমানসেই ইঁহারা চৈতন্যের নামে আকুল হইয়া পড়েন। ইঁহারা ধর্ম্মভয় ও স্বদেশানুরাগবশে হিন্দু হননা, সাধারণ লোকে পুরাতন হিন্দু শাস্ত্র পড়ে না বলিয়া হিন্দু। যাঁহারা বর্তমান সময়ের ধর্ম্মবিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাহারা পাইবেন যে, তত্তাবতের লেখকগণের উদ্দেশ্য উল্লিখিতরূপ বিভিন্ন প্রকার। কোন একটি প্রবন্ধের ও এই রূপ চিহ্ন দেখা যায় না যে, হিন্দু ধর্মের প্রতি লেখকের অচল ভক্তি ও বিশ্বাস আছে।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সাধারণকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের একটি কথা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ কি? ধর্ম্মের কিগুণ বা প্রকৃতি থাকিলে তাহাকে হিন্দু

ধর্ম্ম বলা যায়? প্রচার কল্পগণ কেহই ইহা বুঝাইয়া দেন নাই। তাঁহারা দুর্গাপূজা, কালীপূজা, কৃষ্ণলীলা ও জাতিভেদ উৎকর্ষখ্যানেই এ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত আছেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম কি, এ কথাটা না বুঝিলে, আমরা হিন্দু আছি, না খ্রিস্টান হইয়াছি, ইহা কিরূপে বলিব? দেখিতে পাই যে, বৈদিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব এবং অক্ষয়কুমার দত্তের অসংখ্য উপাসক সম্প্রদায় সকলেই হিন্দু। কোন গুণে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়েই হিন্দু হইল আর কোন দোষেই বা পরসী ও খৃস্টান হিন্দু হইল না?

যদি আচার, ব্যবহার কুসংস্কার হিন্দুত্বের লক্ষণ হয়, তবে জাতের সকলেই—হিন্দু, যদি সাকারোপসনাই হিন্দুত্বের লক্ষণ হয়, তবে [অস্পষ্ট] অগ্নিউপাসকেরাও হিন্দু ; যদি অবতার কল্পনাই হিন্দুত্বের লক্ষণ হয় তবে খৃস্টান ও হিন্দু। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, "ভক্তজন যে যেরূপে ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে, সেইরূপেই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে" এই বিশ্বাসই হিন্দুত্বের লক্ষণ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, হিন্দুত্বে ধর্ম্ম বুঝায় না। মনের অবস্থামাত্র বুঝায়। বরাহরূপে ঈশ্বরকে ভয় করিলেই কি আমি ধার্ম্মিক হইব? যাহার ধর্ম্ম তাহার নিকটে। আমি বরাহরূপে ঈশ্বরকে ধ্যান করিলে, তাঁহাকে পাইব, এই বিশ্বাসে আমি যদি তাহার ধ্যান করি, সেইটি আমার পক্ষে ধর্ম্ম হইল। কিন্তু ইহা হিন্দুত্বের লক্ষণ হইলে নাস্তিক ভিন্ন পৃথিবীর কেনা হিন্দু? অনেকে বলিবেন, যে সকল ধর্ম্ম হিন্দু নামে অভিহিত হয়, তন্মেধ্যে যাহা সাধারণ এবং যাহা অপরাপর ধর্ম্মে নাই। তাহাই হিন্দুত্ব। কিন্তু তদ্রুপ সাধারণ কি তাহা অল্প লোকেই জানে ; এরূপ সাধারণ আছে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। প্রচারকগণ অগ্রে তাহা না দেখাইয়া দিলে কি বিষয় সম্পর্কে তাঁহারা কথা বলিতেছেন লোকে তাহা কিরূপে উপলব্ধি করিবে?

হিন্দু ধর্ম্ম [অস্পষ্ট] গোল ধর্ম্ম শাস্ত্র লইয়া না জানি আরও কত গণ্ডগোল আছে। [ খৃস্টানদের ] ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল, মুসলমানের ধর্ম্ম শাস্ত্র কুরান। বৌদ্ধের ধর্ম্ম শাস্ত্র [ত্রিপিটক] হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র কয়খানি [অস্পষ্ট] একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে কয়জন [অস্পষ্ট] করিবে? যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত, কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদের মধ্যে সাধারণ প্রচারকগণের তাহা বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাদের মুখের কথা শুনিয়াত আর লোকের তৃপ্তি হইবেনা ; অধ্যয়নের জন্য তাহাদিগকে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে প্রচারকগণ তাহা দিয়াছেন কি? অনেক মনোবিশ্বাস যাহা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে বেদের এক শ্লোক উপনিষদের এক শ্লোক, ভাগবতের এক শ্লোক, কালীপুরাণের এক শ্লোক, মহা ভারতের এক শ্লোক, পঞ্চতন্ত্রের এক শ্লোক, চাণক্যের এক শ্লোক ও শকুন্তলার এক শ্লোক, আওড়াইয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে সকলই শোভা পায় ; কারণ কথা বলিবার লোক নাই। ইউরোপে যদি কেহ খৃষ্ট ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে বাইবেলের এক পঙক্তি, পেরে ডাইজলষ্টের এক পঙক্তি, মিলের এক পঙক্তি ও ওয়াল্টার স্কটের[২১] এক পঙক্তি উদ্ধৃত করেন, তবে তাহার মস্তিকে "চত্বারিংশ নবাধিক" বায়ু আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়। প্রচারকগণের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মাংশ সমর্থন সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা ইহার কুৎসিত আচার ব্যবহারেরও সমর্থন করিতেছেন। কার্য্যভেদ শ্রেণীভেদ ঘটিয়া থাকে, আমরা তাহার বিলোপ কামনা করিনা, ইহা সকল কালে সকল দেশেই বর্ত্তমান থাকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি সুশিক্ষিত ব্যক্তির এই উনবিংশ শতাব্দীতে আভিজাত্যমূলক সেই পুরাতন জাতিভেদ প্রথার

সমর্থন করিতে দেখিয়া আমরা বস্তুতই (লজ্জিত) ও দুঃখিত হইয়াছি। ইঁহাদের অনেকেই জাতিতে ব্রাহ্মণ, হয়ত শুনিয়া থাকিবেন যে বিলাতে একটা অভিজাত সম্প্রদায় আছেন, ইহারাও তাহার অনুকরণে অভিজাত সম্প্রদায় সংরক্ষণ করিতে চাহেন, কেননা বিলাতে যাহা আছে তাহা আমাদের দেশ হইতে লোপ পাইবে [অস্পষ্ট] তাই তাঁহারা নানাবিধ কূটতর্কের আশ্রয় লইয়া অভিজাত সম্প্রদায় ও জাতিদের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছেন। অহো! কি বিড়ম্বনা! কোথায় জেতৃজাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র একে অন্যের স্কন্ধ ধরিয়া দাড়াইবে, বলবান শূদ্র অগ্রে যাইবে, দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ থাকিবে; (আর) কোথায় জেতৃজাতির পদাঘাত সহ্য করিয়া ব্রাহ্মণ, শূদ্রকে পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য শাসন করিতেছে। জাতিভেদ হিন্দুর সহিত আর একটি হিন্দুর সহানুভূতি নাই। একটি হিন্দু একটি মুসলমান বা খৃষ্টানের গাত্র স্পর্শ করিলে, পঙ্গপালের ন্যায় মুসলমান বা খৃষ্টান একটি হিন্দুকে গুরুতর প্রহার করিলেও পার্শ্ববর্তী হিন্দুর অন্তরে একবিন্দু জাতীয় সহানুভূতির উদ্রেক হইবেনা। ইহা হইতে শোচনীয় দৃশ্য আর কি দেখিতে চাও? অগ্রে ব্রাহ্মণ শূদ্র এক প্রাণে মিলিয়া স্বজাতির সম্মান রক্ষা কর, পশ্চাৎ প্রাধান্যের জন্য যুদ্ধ করিও।

কেহ কেহ দার্শনিক ব্যাখ্যা বলে হিন্দুদিগের প্রত্যেক কুসংস্কারের সমর্থন চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তি বলে চিরবৈধব্য, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, খাদ্যো-খাদ্য বিচার, সমস্তই আবশ্যক ও অপরিহার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্ট সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে পুত্র বিসর্জ্জন রহিত করিয়াছেন বলিয়া তাহার জন্য যুক্তির পরিবর্তে দীর্ঘনিঃশ্বাসের অস্ফুট ধ্বনিমাত্র শ্রুত হইতেছে। যদি হিন্দু ধর্ম্মে পরদারগমন, মিথ্যা কথন ও চৌর্য্যের ব্যবস্থা থাকিত, তবে ইহারও দার্শনিক যুক্তি এতদিনে শুনিতাম। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দার্শনিক ব্যাখ্যাবলে আস্তিকতা, নাস্তিকতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, ভূত, অভূত সকলই এক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি কুসংস্কার তদ্দারা সমর্থিত হইবে, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যুক্তির মার্গ লইওনা; সহজজ্ঞানে যাহা বুঝ ও বিশ্বাস কর, তাহারই অনুসরণ কর। সাগরে জল দেখিতে পাইতেছ, তৃষ্ণা হয় উহাই পান করিও; মাটির ভিতরে জল আছে। যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া মাটি কামড়াইওনা। শুনিতেছি, গোপীলীলার বিশেষ গুঢ়ার্থ উহার আদ্যাপান্তই আলঙ্কারিক। উহা বাস্তবিকই যদি গুঢ়ার্থযুক্ত অলঙ্কার হয়, কাব্যে শোভা পাউক; শিষ্যের সরল প্রাণের ধর্ম্মে এ বিড়ম্বনা কেন? যে ব্যক্তি পদের অর্থ বুঝিতে না পারে, সে গানে কি প্রকারের মোহিত হইবে? তবে যদি চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সে কেবল সুরের গুণে। আলঙ্করিক উপসনায় যদি কাহারও মন আকৃষ্ট হয় তবে তাহা শঙ্খ, ঘন্টা ও নৈবেদ্যের আড়ম্বরে, উপাসনার মাহাত্মে নহে। যাহারা উপাসক, তাহারা অগ্রে দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া পশ্চাতে উপাসনা করেনা, তাহারা যেমন দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে। চাষা সরল চক্ষে দেখিল; সম্মুখে চতুহস্ত পরিমিত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি বিরাজমান, তাহার বুদ্ধি আর কতদূর অগ্রসর হইবে? সে কক্ষ হইতে একটি কদলী বাহির করিয়া অকৃত্রিম হৃদয়ে বলিল, "হে দেব! তুমি এই কদলীটি ভক্ষণ কর"। পূজক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকে কদলীটি দেখাইয়া নিজ কুক্ষিগত করিল। দূর হইতে আলঙ্কারিক এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বন্ধুকে বলিল, "ঐ যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি দেখিতেছ, উহার অর্থ ভগবানের অনন্ত প্রেম, আর ঐ যে কদলীটি দেখিলে, উহার অর্থ স্বার্থপরতা। ভগবানের অনন্ত প্রেমের নিকট ঐ চাষা উহার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া গেল, বন্ধু এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া হায় হায় করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িল, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি একি হইল? চাষা স্বার্থ ত্যাগ করা দূরে থাকুক, কদলী দিবার সময় মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছে যে, মিথ্যা মকদ্দমাটিতে যেন সে জয়ী হয়। চাষার অন্তঃকরণে যদি ঐ প্রবোধ জন্মান হয় যে, ঐ মূর্তির অর্থ ভগবানের অনন্তপ্রেম, ভগবান কদলী ভক্ষণ করেন না, তিনি আন্তরিক ভক্তি চান, চাষা বলিবেন "তবে আমার কদলী আমার গৃহে থাকুক, আমি সেই ভগবানের নিকটেই প্রার্থনা করিব।" কার্য্যে যাহা দাড়াইয়াছে, প্রচারকগণ তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ব্যাখ্যার দৃষ্টায় লোকের মনোহরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাদের ঈদৃশ চেষ্টাকে আমরা সাধু বলিতে পারিবনা।

কে কেহ বলেন যে, ধর্ম্ম ও আচার এক নহে; হিন্দু ধর্ম্মের সার ভাগ রক্ষা করিয়া, উহার বহিরাবরণ স্বরূপ আচার ব্যবহারের যেগুলি দূষিত কিংবা অনাবশ্যক, সেগুলি পরিহার করা উচিত। এই প্রস্তাবটি শুনিতে বেশ সরল ও সারবান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা কতদূর কষ্টকর, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত হিন্দুর আচার ব্যবহার হরিতকীর ন্যায় ত্বক মাংসে জড়িত। হরিতকীর বাকল ফেলিয়া দিলে যাইবে কি? যেদিন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল একত্র বসিয়া খাইবে, সেদিন হিন্দুধর্ম্মের কিছুই থাকিবে বলিয়া ভরসা হয় না। এই শুভ পরিণাম আনয়ন করিতে তোমাকে সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র নূতন করিয়া লিখিতে হইবে, সমাজে নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইবে, নূতন দেবতা গড়িতে হইবে, এবং তাহাদের মুখে নূতন কথা বলাইতে হইবে; পুরাতন সমস্ত প্রত্যাখ্যান না করিলে চলিবে না। যাঁহারা এক্ষণ ঐ পরিণাম আকাঙ্খা করেন, তাঁহারা মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের[১১] নববিধান গ্রহণ করুন না কেন?

এক্ষণ সাকার উপাসনা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিব। আমাদের বিশ্বাস যে, সাকারোপসনা জ্ঞানীর পক্ষে কতক পরিমাণে সাজে, কিন্তু অজ্ঞলোকের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টজনক। আমার যদি এতদূর জ্ঞান হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরকে তাঁহার যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থেই দেখিতে পাই, তবে প্রতিমা পূজায় আমার কোন হানি নাই। আমি সেই প্রতিমায়ত ঈশ্বর দর্শন করিব এবং তাহাকেই "ইহাগচ্ছ" বলিয়া আহ্বান করি। কিন্তু অজ্ঞলোক তাহা করিতে পারেনা। সে যখন দূর্গা প্রতিমায় দেবতা প্রতিষ্ঠা করে, তখন সেখানে ঈশ্বরকে আহ্বান করে, এবং তাহাকেই পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা বলা ভ্রম যে, সাকারোপসক ও নিরাকারোপাসক উভয়েরই উপাস্য পর্দাথ এক। যে দূর্গাকে ঈশ্বরের কয়েকটি গুণসমষ্টির কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করে, সে সত্যে বিশ্বাস করে। ব্যক্তি সাকারোপসনা করিতে যাইয়া এইরূপ স্বতন্ত্র দেবতার পূজা করে বলিয়া তাহার পুজা অসিদ্ধ। যাহারা বলেন, সাকারোপসনা ও নিরাকারোপসনার ফল এক, তাঁহারাও ভ্রান্ত। যদি সাকারে ও নিরাকারে একই গুণ আরোপিত হইত। তাহা হইলে তাঁহাদের কথা অনেক পরিণামে সঙ্গত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাকারের গুণ নিরাকারের গুণ হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং তদুপাসকদের জানি, তবে তৎসম্বন্ধে আমার একরূপ কার্য্য হইবে। আমি যদি তাহাকে খল বলিয়া জানি, আমার কার্য্য আর এক রূপ হইয়া পড়িবে।

অতএব যাহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের পক্ষে সাকারোপসনা অনিষ্টজনক না হইলেও তাহারা উহার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। সাকারের প্রয়োজন অনুভব করিলেও, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

সম্মুখে থাকিতে প্রতিমার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাননা, আর যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে সাকারোপসনা অত্যন্ত অনিষ্টকর, কারণ তাহাদের বিশ্বাস শীঘ্রই অসত্যে গড়াইয়া পড়ে।

প্রচারকগণের প্রায় সকলেই অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত। তাহাদের কথায় সমাজের ছোট, বড় অজ্ঞ, বিজ্ঞ অনেক লোকই বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছে। এমন অবস্থায় তাহারা যেভাবে যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায়ই ধর্ম্মবিষয়ক এই গুরুতর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকুন, সত্যই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। (যদি) তাহারা কোন প্রবৃত্তির সাময়িক (গণ্ডুয়নে) সাধারণকে অসত্যে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেন এবং একই গড্ডালিকা প্রবাহে সকলকে অসত্যের দিকে টানিয়া লইতে যত্নবান হন, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা, কেবল অজ্ঞানান্ধকে আবার নূতনতর মোহে অন্ধীভূত করিয়া আরও গাঢ়তর অনুকারে মগ্ন করা হইবে মাত্র। যাহা সত্য নয়। তাহা যে টেকে না, একথা কেনা জানেন?

৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

## প্রাপ্ত বালবিধবা

এই ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় সামাজিক রীতিনীতির পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনার কথা বটে, কিন্তু কুসংস্কার ও দুর্নীতির অভেদ্য তিমিররাশিতে সামাজিক কলঙ্ক সঙ্গোপনপূর্ব্বক তিমিররাশিতে ভীষণ বাত্যায় প্রধাবিত হইলে—বজ্রগম্ভীস্বরে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া গলাবাজী করিলে—জগতীতলে সমুন্নত জীব বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিলে, [অস্পষ্ট] উন্নতি সাধিত হইতে পারেনা ; সামাজিক [অস্পষ্ট] ও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিয়া উন্নত [অস্পষ্ট] ভিত্তিসংস্থাপনপূর্ব্বক উন্নতিসোপান সংগঠন না করিলে, কোন বিষয়ের উন্নতিই চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এ ধ্রুবকথার প্রতি যখন মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তখন শত নিন্দা, সহস্র লাঞ্চনা ভোগ করিয়াও কুরীতি সংশোধনার্থ আন্দোলন, আলোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাই অদ্য আমরা সামাজিক একটী পুরাতন কথার অবতারণা করিলাম—

**প্রথমতঃ** আমরা একটী হৃদয়বিদারক চিত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। ঐ দেখুন, অন্তঃপুরের এক অতি নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাটী বিষন্নবদনে মনে মনে কত কি ভাবিতেছে। বালিকা স্বকীয় দেহভারবহনে অসমর্থ্য হইয়াছে ; তাই আজ অতি কষ্টে বামহস্তে কপোল বিন্যাস করিয়া ভূমিপানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। অবিরল অশ্রুধারা গন্ডদেশ প্লাবিত করিয়া মলিনবসন খানি ভিজাইয়া ফেলিয়াছে। ঘোর মনস্তাপ সন্তপ্ত ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস সাহারামরুর উত্তপ্ত বায়ুর ন্যায় অন্তঃপুরব্যাপী বায়ুরাশিকে দগ্ধীভূত করিতেছে। বালিকা মুহুর্মুহুঃ "হা জগদীশ! হা জগদীশ!" বলিয়া চৈতন্যশূন্যা হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হইতেছে। আজ এই আনন্দের দিন, বাড়ীতে দুর্গোৎসব ; দাস, দাসী পরিজন সকলেই আমোদকোলাহলে মত্ত ; এমন দিনে ঐ অপূর্ব্বলাবন্যময়ী বালিকাটী সাধের চিকুরবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া নিভৃতকক্ষে বিষন্ন বদনে এত বিলাপ করিতেছে কেন? বালিকার আবার দুঃখ কিসের? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গসমাজের নিরপরাধিনী সরলা বালিকার ন্যায় হতভাগিনী ভূমণ্ডলের রমণীকুলে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই উৎসবের-এই আনন্দের দিনে বালিকা বুঝিতে পারিয়াছে, সে এই পৃথিবীতে অনাথিনী, ভিখারিনী। প্রকৃত প্রস্তাবে বালিকাটী অষ্টম বর্ষ বয়সেই অনাথিনী হইয়াছে ; কিন্তু শৈশবলীলায় মুগ্ধ থাকাতে, তাহার কি দশা হইয়াছে, এই চারি বৎসর তাহা বুঝিতে পারে নাই। আজ বালিকা দ্বাদশবর্ষে উপনীতা হইয়াছে—নবীনকলিকা [অস্পষ্ট] হইয়াছে ; সাংসারিক সুখদুঃখ কতক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। বুঝিয়াছে ; —[অস্পষ্ট] তাহাকে দুঃখভোগের জন্যই সৃজন করিয়াছেন। তাহাকে সকল সুখ, সকল আশা ভরসা বিসর্জন দিয়া পরমুখপ্রেক্ষিনী হইয়াই কাঁদিতে [অস্পষ্ট] তাই আজ অনাথিনী বালিকা নিরুপায় ; [অস্পষ্ট] জগদীশ্বরের নিকটে একান্তমনে মৃত্যু কামনা করিতেছে। এখন সুশিক্ষাভিমানী বঙ্গীয় স্বার্থপর পুরুষ সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, শতশত গৃহে এইরূপ নিরাশ্রয় বালিকাদের হৃদয়বিদারক চিত্র প্রতিদিন নিরীক্ষণ করিয়া আপনারা কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন ? পৃথিবীর কোন অসভ্য জাতিও অসহায়া অবলাগণকে এত ঘোরতর অত্যাচারে প্রপীড়িত করেনা। আর আপনারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিমল আলোকে আলোকিত হইয়া, আপনাদিগকে সুসভ্যজাতি বলিয়া জগতে পরিচিত করিয়াও স্বীয় দুহিতা ও ভগিনীদের প্রতি নিষ্ঠুরের ন্যায় অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না ! ধিক আপনাদের সভ্যতায় ! শত ধিক্ আপনাদের শিক্ষাভিমানে ! বলি, এ কলঙ্ক কি বঙ্গসমাজ হইতে আনয়ন করা অসম্ভব ?

সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্গের স্থানে ২ এই পৈশাচ প্রথাদূরীকরণার্থ সবিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে-সভা সমিতি হইতেছে। সেদিন মানিকগঞ্জে প্রায় দুই সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়া এতদ্বিষয়ক ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়াছেন। নলডাঙ্গার অধিপতি এ পাপপ্রথা সমাজ হইতে অপসারিত করিবার জন্য সবিশেষ যত্নবান হইয়াছে। এ সময়ে, এই মাহেন্দ্রযোগে কি পূর্ববঙ্গের রাজধানী নির্বাতনিকম্প তড়াগেরন্যায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া স্বীয়মর্য্যাদা ও পূর্বগৌরব বিসর্জ্জন করিবে ?

ঢাকানগরীর জীবনশক্তি কি অন্তর্হিত হইয়াছে ? আমরা অনুরোধ করি, ঢাকাপ্রবাসী শিক্ষিতসম্প্রদায় একবার সচেতন হইয়া বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বঙ্গের দুঃখিনী নিরপরাধিনী বালবিধবাগণের দুঃসহযাতনা বিমোচন করিবার নিমিত্ত একবার বদ্ধপরিকর হইয়া তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করুন। সে আন্দোলনের স্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া যাউক উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী বঙ্গীয় যুবকগণ যদি একান্তই অসহায়া রমনীগণের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত না হন,—অন্তঃপুরবাসিনী অবলাভিন্ন শৌর্যবীর্য্য প্রকাশের স্থল আর খুঁজিয়া না পান,—তবে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা যেন ভীমবেগে সঞ্চালিত হইয়া ছার বঙ্গদেশকে অতল জলে নিমগ্ন করে, এই আমাদের প্রার্থনা। এরূপ স্বার্থপর পুরুষজাতির বাসভূমি ভূ-মণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেই জগতের মঙ্গল।

এই প্রস্তাব লেখকের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্যমত রহিয়াছে। বিধবা বিবাহসম্বন্ধে চারিদিকে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে ঢাকাপ্রবাসী শিক্ষিতগণের একবারে নির্ব্বাক, নিশ্চেষ্ট থাকা নিতান্তই লজ্জা ও অপমানের কথা। আমরা ভরসা করি, এ বিষয়ে ঢাকাও সজীবতা প্রদর্শন করিবে।

২৩ নবেম্বর, ১৮৮৪

## সাধারণ কোষাগার থেকে পাদরীদের বেতন দান

পার্লিয়ামেন্টের অন্যতম সভ্য যে, বেকষ্টার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যয় বিষয়ে হাউস অব কমন্স সভায় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, খৃস্টান ধৰ্ম্ম যাজকদিগকে ভারতীয় সাধারণ রাজস্ব হইতে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা কি কেবল ইংলন্ডেশ্বরীর নিযুক্ত কর্মচারীগণের না, চাকর, নীলকর এবং গবর্ণমেন্টের সংশ্রববিহীন অন্যান্য ব্যক্তির ধৰ্ম্মোন্নতি নিমিত্ত পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, আপনি তাহার অনুসন্ধান লইয়াছেন কিনা? বেকষ্টার সাহেব আরও প্রশ্ন করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এতৎ সম্বন্ধীয় ব্যয় হ্রাসের প্রতিজ্ঞা স্বত্ত্বেও যে সকল স্থানে গবর্ণমেন্ট কৰ্ম্মচারী নাই তত্তৎস্থলে নূতন ধৰ্ম্মযাজক প্রতিপালনের ব্যয়সম্বন্ধে যাহাতে ভারতবাসীদিগের আপত্তি বিদূরিত হইতে পারে, ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে এরূপ কোন ও কঠিন বিধান করিবার আদেশ প্রদান করেন। প্রশ্নকর্ত্তা এরূপ অনুরোধও জ্ঞাপন করিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারী হর্টিংটন সাহেব ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে "ইংলন্ডীয় চার্চ্চের ধৰ্ম্মযাজক ভারতবর্ষে ১৬০ জন। তন্মধ্যে [অস্পষ্ট] জন এরূপ স্থলে নিয়োজিত যে,—তথায় ইউরোপীয় সৈন্য নাই।" তিনি ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন "খৃষ্ট ধৰ্ম্ম যাজকগণ শুদ্ধ ইউরোপীয় সৈনিক কৰ্ম্মচারীদিগের নিমিত্তই নয়। সিবিল ও সৈনিক এই উভয় বিভাগীয় কৰ্ম্মকারকগণের ধর্মোন্নতি বিধানার্থই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ধৰ্ম্মযাজকদিগের যে কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে অবগতি হইয়াছে চারি পঞ্চমাংশ পাদরি সৈনিক বিভাগীয় কৰ্ম্মচারিগণের নিমিত্ত নিযুক্ত আছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয়ক ব্যয় সম্বন্ধ পুনরালোচনা করিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। এরূপ বোধ হয়না। আমি শীঘ্রই এ বিষয়ে উক্ত গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণের সঙ্কল্প করিয়াছি।"

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধৰ্ম্মাবলম্বীর বাস। খৃষ্ট ধৰ্ম্মের প্রতি ঐ সকল অধিবাসীর অনুরাগ নাই। পক্ষান্তরে বিদ্বেষই রহিয়াছে। এ অবস্থায় ভারতীয় সাধারণ ধনাগার হইতে একমাত্র খৃষ্ট ধৰ্ম্ম যাজকগণের বেতন ও খৃস্টান চার্চ্চের ব্যয়সঙ্কুলান করা কতদূর অন্যায়, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। প্রজাদিগের প্রদত্ত অর্থ তাহাদের ধৰ্ম্মে কৰ্ম্মে ব্যয় না করিয়া অপরের ধৰ্ম্মানুষ্ঠান, সাহায্যে ব্যয় করা অসঙ্গত ও অযুক্ত ব্যবহার আর কি আছে,জানিনা। ঐ ব্যয় সামান্য হইলে, তত ক্ষেভের বিষয় হইত না, কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেখানে খৃষ্ট ধৰ্ম্মযাজক নিয়োজন করিয়া পাদরিদিগের অন্নাচ্ছাদন নিৰ্ব্বাহের উদ্দেশ্যে অনাবশ্যক স্থলেও তাহাদিগকে নিয়োজন করিয়া বিপুল অর্থব্যয়ের দ্বার প্রশস্ত করা হইতেছে। এই ধৰ্ম্মযাজক শ্রেণীর প্রতি আমাদের জাত বিদ্বেষ নাই ; যদি অন্যান্য ধৰ্ম্মাবলম্বী যাজকগণ ও গবর্ণমেন্টের সাহায্যে প্রতিপালিত হইতেন, আমাদের কোনও আপত্তি থাকিত না ; কিন্তু নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের প্রতি দৃকপাতও না করিয়া স্বধৰ্ম্মহিতৈষী পাদরী পরিপোষণেই সাধারণ রাজস্বের—অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন। ন্যায়পর, ধৰ্ম্মভীরু লর্ডরিপন বাহাদুর এখন ভারতের হর্তা কর্তা ও বিধাতা ; সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট এ দুঃখ কাহিনী জ্ঞাপন করিলে এবং ইংলন্ডীয় আন্দোলনের স্রোত তৎসমীপস্থ হইলে, ফলোদয়ের সম্ভাবনা আছে, এজন্য অদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। আমাদের আশা হইতেছে, তিনিও মেজর বেয়ারিঙ্গ এতদ্বিষয়ে সুবিবেচনা করিবেন, সৰ্ব্বসাধারণেই যাহাতে ধৰ্ম্মার্থ প্রদত্ত অর্থের অংশ ভাগী হইতে পারে এবং অনাবশ্যক ব্যয়

হ্রাস হইয়া রাজস্বের অস্বচ্ছলতা বিদূরণের একটি উপায় বিহিত হয় তদ্রূপ বিধান করিয়া ন্যায়পরতা ও পরিতোদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিবেন। সত্য বটে, রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লর্ড রিপন ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে প্রোটেষ্টান্টগণ তাঁহাকে জাঁপাইয়া ধরিবেন, নানারূপ অপবাদে পতিত করিবেন, কিন্তু তিনি সাধারণ হিতৈষী হইয়া কার্য্য করিলে ঐ সকল বাধা বিঘ্নে তাঁহার কিছুই করিতে পারিবেনা। তিনি ইতস্তত করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে তাঁহার মানসিক দৌর্বল্যেরই পরিচয় হইবে এবং যে কার্য্যে সর্বসাধারণের হিত প্রত্যাশা আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না বলিয়া প্রত্যবায়ও ঘটিবে বলা বাহুল্য।

৮ মে, ১৮৮১

## গবর্ণমেন্টের পাদরী পোষণ ব্যয় ও হোপ সাহেব

হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অর্থে খ্রীস্টিয়ান পাদরীর উদর পোষন করা যে কত দূর ন্যায়ানুমোদিত ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা ...পক্ষপাতী রাজপুরুষগণই বুঝিতে পারেন। আমাদের বুদ্ধির ভাণ্ডার নিঃশেষ করিলেও ইহারা কোন সঙ্গত কারণ উপলব্ধি করিতে পারিব, এমন ভরসা করিনা, তবে যদি কোন সূচাগ্র বুদ্ধি রাজপুরুষ আমাদিগকে ইহার উচিত বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তবে আমাদের ভ্রম আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতাম। দুই একজন "বক পরমধার্ম্মিক" গোছের লোক যে আমাদিগকে ইহা বুঝাইতে যত্নশীল হন নাই, এমন নহে। কিন্তু আমরা এমনই নির্ব্বোধ যে, তাঁহাদের অগাধ বুদ্ধি সাগর বিলোড়ন করিয়া যে যুক্তি রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতেছেনা। আমাদের বুদ্ধির দোষেই বোধ হয় আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহাদের যুক্তিতে ন্যায় ও সত্যের যত না সংশ্রব যত না আছে, স্বার্থ ও কপটতার ভাঁজ তাহা অপেক্ষা অধিক আছে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে বাণিজ্যবেশে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসেন, তখন কোম্পানী স্বব্যয়ে আপন কর্ম্মচারীদিগের জন্য পাদরী রাখিবার অনুমতি পান, তৎপর ১৮৪৪ সনে ডাইরেক্টরের নিয়ম করেন, যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় খৃষ্টান কর্মচারীদের ধর্ম্মোপদেশ জন্য সরকারী ব্যয়ে পাদরী নিযুক্ত থাকিবে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বর্তমান রাজগুরু যখন বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকার ব্যয়ভার ভারতীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার উপর চাপাইয়া রাখিয়াছেন। যাহারা ভারতের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া ভারতেরই সর্ব্বনাশের উপায় অন্বেষণ করে, এবং যাহাদের ধর্ম্মের সঙ্গে ভারতবাসীর ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, ভারতীয় প্রজাবর্গ কোন যুক্তিতে তাহাদের ধর্ম্মোপদেশকের ব্যয় ভার বহন করিতে বাধ্য? ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি প্রজাগণ কি সরকার হইতে স্ব স্ব ধর্ম্মের জন্য কোনরূপ আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকে? তাহাদের ধর্ম্মার্থ কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে যখন রাজপুরুষগণ বাধ্য নহেন, তখন তাহাদের প্রদত্ত অর্থে পাদরী দেবতার ভোগ সরান হয় কেন? এই কথার সদুত্তর দেওয়া সহজ নহে। আমাদের বড়লাট লর্ড রিপন[২৩] মেজর বিয়ারিং, এবং ইলবার্ট[২৪] সাহেব এই অনুচিত পাদরী পোষক ব্যয় হ্রাস করার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কৌন্সিলের পাঁচজন সভ্য ইহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ত সচিব হোপ সাহেব যে আশ্চর্য্যমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাকে পুষ্প চন্দনে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। তিনি বলিয়াছেন, পাদরীদের সাহায্যর্থ বৎসরে ২৫ লক্ষ

টাকা যাহার সুদ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপকে একটি মূলধন বরাদ্দ করা গবর্ণমেন্টের উচিত। আহা! বক ব্রতী ধর্ম্ম বিটল মহাশয় কি সদুপদেশটাই দিয়াছেন। চাঁদ মুখের চিনিমাখা কথাটি শুনিয়া আমাদের প্রাণ জুড়াইয়াছে। যাহার সুদ হইতে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। এমন একটা টাকার আবশ্যক, তাহা ধার্ম্মিক প্রবর হোপ সাহেব একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কিন? যে ব্যক্তি অসঙ্কোচে এরূপ অন্যায় মতের অভিব্যক্তি করিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা আর কোন বিষয়ে প্রশংসা না করিতে পারিলেও তাঁহার নির্লজ্জতার জন্য প্রশংসা করিতে পারি।

ভারতীয় সমিতিগুলির এ সময়ে উচিত হোপ সাহেবের অবৈধ প্রস্তাবের যথোচিত প্রতিবাদ করা। সংপ্রতি যখন উল্লিখিত অন্যায় ব্যয় সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে, তখন এই আন্দোলন যাহাতে বাহুল্য রূপে হইতে পারে এবং যাহাতে তাহা বিলাতী বিধাতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তদর্থ আমাদের রাজনৈতিক সভাগুলির যান্ত্রিক হওয়া উচিত।

৮ জুন, ১৮৮৪

## মহাপুণ্য, অতুলকীৰ্ত্তি, অনন্তযশ

প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারের উপকারিতা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তাহারা অনেকেই এবং বুঝেন বলিয়াই স্বতপরতঃ এই কার্য্যের জন্য শত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। এমনকি, স্বদেশীয় বিদেশীয় খৃষ্টান গবর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ উপকারিতা বুঝিয়া প্রতাপ রায়ের ন্যায় সামান্য ব্যবসায়ীকেও সহস্রে সহস্রে টাকা নিয়মিত রূপে দান করিতেছেন। যে কার্য্যের উপকারিতা এতদূর, তাহা যদি সহজে চিরস্থায়ী করা যায়। তবে তাহাতে সমর্থ ব্যক্তি অবশ্যই অগ্রসর হইবেন। বিনা ব্যয়ে চিরস্থায়ী কীৰ্ত্তি ও অনন্তযশ লাভ করিতে নিতান্ত নির্ব্বোধ ভিন্ন কোন সমর্থ ব্যক্তিই পশ্চাৎপদ হইবেন না। ধর্ম্ম শিক্ষা দানরূপ পরোপকারে পুণ্যাত্মগণই ব্রতী হন, যিনি ইচ্ছা করিলে সহজেই সেই পূর্ণ সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি আমাদের নির্দেশিত উপায়টিতে একবার মনোযোগী হ্বিউন।

ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার ব্রত চিরস্থায়ী করিলে মহা পূর্ণ, অতুল কীৰ্ত্তি, অনন্তযশ হইতে পারে। ঐ কার্য্য যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। আমরা নিম্নে রূপে করিয়া দেখাইব, যদি কোন রাজা, মহারাজ বা তত্তুল্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি চিরস্থায়ী রূপে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করনোদ্দেশে মাত্র সাড়ে দশটি টাকা প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট লইতে চাহেন, তবে ধর্ম্ম গ্রন্থ পিপাসু ২৫/৩০ হাজার গ্রাহক যে যুটিয়া যাইবে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। প্রতাপ রায়ের একমাত্র বাঙ্গালা মহাভারতের জন্য সাড়ে ছয় কোটি টাকা হিসাবে দিয়া যদি দশ হাজার গ্রাহক যুটিয়াছে, তবে সাড়ে দশটি টাকা দিয়া মহাভারত, রামায়ণ, বেদ, পুরান সংহিতা দর্শন প্রভৃতি পাইতে গেলে কেনা তাহাতে সম্মত হইবে? যে কোন ব্যক্তি এক থেকে সাড়ে দশ টাকা দিতে পারিবেন। সে প্রতি বর্ষে দুই টাকা হিসাবে ৯ বর্ষে সাড়ে সতরটি টাকা দিলে ঐ ফল পাইতে পারিবে। এখন [কি ডাক] যোগে পঁচিশ ত্রিশ হাজার গ্রাহক যুটিবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সকলগুলি গ্রন্থ পাওয়া ভিন্ন গ্রাহকের আর একটি মহৎ লাভ আছে। এই সামান্য অর্থে তাহারা পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে মাসে মাসে গ্রন্থগুলি পাইতে থাকিলে তাহাদের নামও তাহাদের বংশে চিরস্থায়ী হইবে। সাধারণ ব্যক্তিগণের নামে দুই তিন

পুরুষেই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই কার্য্যে যে টাকা দিবে, তাহার নামের গ্রন্থ পৃথিবীতে যত কাল তাহার ওয়ারিশগণ বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল পাইবে। ইহাতে তাহার নামও চিরস্থায়ী হইবে। এমন মহৎ কার্য্যের জন এক বৎসরে সাড়ে দশটি অথবা ৯ বৎসরে সাড়ে সতরটি টাকা দিতে সাধ্য পক্ষে কেহই পশ্চাদপদ হইবেনা, অতএব এই জন্য আমরা যে ২৫/৩০ হাজার গ্রাহকের অনুমান করিয়াছি, গ্রাহকসংখ্যা তদপেক্ষা বেশি ভিন্ন কম হইবে না।

প্রথমত পাঁচ হাজার গ্রাহকের জন্য আয় ব্যয় নিরূপণ করা যাইতেছে, প্রতি মাসে ছয় ফর্মা করিয়া একখানি বই দেওয়া যায়, তাহার হিসাব :—

পাঁচ হাজার গ্রাহকের জন্য মাসে ত্রিশ রিম কাগজ।

| | | |
|---|---|---|
| মূল্য প্রতি রিম | ২৷৷০ হিসাবে | ৭৫ |
| ছাপাই খরচ প্রতি রিম | ১৷৷০ ,, | ৪৫ |
| দপ্তারি প্রতি রিমে | ।০ ,, | ৭৷৷০ |
| | | ১২৭৷৷০ |

মাসিক ১২৭৷৷ হইলে বার্ষিক ১৫৩০। ইহাকে পাঁচ হাজার ভাগ করিলে জনপ্রতি ১৮ পড়িতেছে। ইহার সঙ্গে ডাক মাসুল বর্ত্তমান নিয়মে আনা যোগ করিলে ৷৷/১৮ জন প্রতি বার্ষিক ব্যয়। আয় প্রত্যেকজনের নিকট সাড়ে দশ টাকা হিসাবে গ্রহণ করিলে উহার বার্ষিক সুদ শতকরা মাসিক দশ আনা হিসাবে দিতে হয় অতএব বার্ষিক আয় হইতে বার্ষিক ব্যয় ৷৷/১৮ বাদ দিলে ১৪ গণ্ডা থাকে। ১৪ গণ্ডার পাঁচ হাজার গুনে ৫৩১।. টাকা হয়। এই টাকাতেই বার্ষিক ৭২ ফর্ম্মাপুস্তকের অনুবাদ করনের জন্য পণ্ডিতের ব্যয়, ম্যানেজারের ব্যয় ও মজুরের ব্যয় চলিতে পারে।

পাঁচ হাজার গ্রাহকের হিসাবে দেখিলাম যে, আসলে কিছু মাত্র লোকসান না গিয়া কেবল সুদে ঐ খরচ পোষাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি ২৫/৩০ হাজার গ্রাহক হয়, তবে নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া প্রচুর অর্থ মজুত থাকিবে। সেই অর্থে উত্তরোত্তর মূলধন বর্দ্ধিত হইবে। ... ঐ মূলধন দ্বারা একটি লোন অফিস চালান যাইবে। লোন অফিস খুলিলে আমরা যে শতকরা দশ আনা হারে সুদের বরাদ্দ করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক হারে সুদ আদায় হইবে। ... এই মহৎ কার্য্যে গবর্ণমেন্টের নিকটে অনেক প্রকার সাহায্য লাভের সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেন্ট ইহাতে সম্ভবতঃ আর্থিক সাহায্য করিবেন। তিনি যদি ১০ পয়সার স্থলে এক পয়সা ডাক মাশুলে ঐ পুস্তকগুলি বিতরণের অনুমতি দেন, (দানে সম্ভবতঃ প্রতি ৫ তোলায় এক পয়সা ডাকমাশুল হইবে) তবে বিস্তর লাভ হয়। এই স্থায়ী কাজ সুনিয়মে চলিতেছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান এবং যাহাতে সুনিয়মে চলে গবর্ণমেন্ট তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে আবশ্য বাধ্য হইবেন। ...।

২৯ মে, ১৮৮৪

**প্রেরিত পত্র**

মহাশয়। সামাজিক কুরীতিগুলি পত্রিকাগুলি পত্রিকাস্থ করিয়া তাহার সংস্কার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। দেশে কি এক হুজুগ উঠিয়াছে, কেবলই সভা সমিতির ঘটা, কাজে "আকাশ কুসুম"।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন সভাসমিতির নাম গন্ধও ছিলনা, তখন সমাজে শান্তি পরিপূর্ণ একতা বিরাজমান ছিল ; আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর গগণভেদী চীৎকারে তাহা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

বহুবিবাহ আর কন্যা পণ এই সমাজ কলঙ্কদ্বয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির প্রত্যাহার ভিন্ন অন্যটির বিলুপ্তি সম্ভব না। কাল সহকারে এই জঘন্য রীতিসমাজ মধ্যে একাধিকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে তাহার বিষময় ফল প্রায় ঘরে২ দৃশ্যমান।

পিতা দারিদ্র নিবন্ধন জীবিকা নির্ব্বাহে অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় জঠর জ্বালা নির্ব্বাপণ আর পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য যদি কন্যাপণ লইতে বাধ্য হন। তবে তাহা কিয়তপরিমাণে সহনীয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যখন কন্যাদাতা গ্রহীতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া স্বীয় ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কেবল ঘন আবর্ত্তনীয়দুগ্ধে কিম্বা মদ্যপান আর জঘন্য কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থ কামনায় কন্যাগণ লব্ধ সহস্রাধিক টাকার শ্রাদ্ধ করিতে থাকেন, আর জামাতা পরিবারের ভরন পোষণে অসমর্থ হইয়া সাংসারিক সুখ জলাঞ্জলি দিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন, তখন সে শোচনীয় দৃশ্যে কাহার না হৃদয় আর্দ্র হয়?

অপর বহু বিবাহ প্রথার মহিমায় কোন কোন মহা প্রভু ওজনে২ পানি গ্রহণ করিয়া অসংখ্য রমনীর মুণ্ডপাত করিতেছেন। কতকগুলি হতভাগিনী ইহজন্মে পরিণীতাই হইতেছেন। আবার অনেক শ্রোত্রিয় বংশজ কন্যাগণ প্রভাবে বিবাহ করিতে অসমর্থ, সুতরাং তাহাদের বংশ উৎসন্ন প্রায়। এই সমস্ত বীপর্য্যায় রীতির সামঞ্জস্য না হইলে কিসে যে সমাজ বলীয়ান হইবে বুঝিনা।

কৌলিন্যাভিমানী মহামহোপাধ্যয়গণ সমাজের একমাত্র নেতা। ইহাদের শক্তি এতই অপ্রতিহত যে দেবীবর ঘটকের বেদবাক্য তাঁহাদের হৃদয় হইতে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলী রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অহরহঃ কেবল বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন। সমাজের হিতকার্য্যে তাহাদের শুভ দৃষ্টি আশা করা যায় না। সুতরাং সমাজ সংস্কারের চিন্তাটুকু পর্য্যন্তও দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সমাজে কুলীনভাঙ্গা এক শ্রেণীর বংশজ আছেন, ইহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যাক কতকটি লোক ভিন্ন অধিকাংশই একপ্রকার কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পরিণয় ও সম্প্রদান কার্য্যে এই শ্রেণীর এক কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সামাজিক সম্মানের আশায় তাহারা স্ব স্ব কন্যাগুলিকে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উচ্চ কুলীন পদবীতে পরিণীতা করিতে যত্নশীল। আবার ইহাদের পক্ষে বিবাহ করা হাজার টাকা সাপেক্ষ। এইরূপ বাহুল্যে অনেক পরিবার এখন নিঃস্ব অবস্থাতে পতিত হইয়া সমশ্রেণীতে আদান প্রদান প্রবর্ত্তিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অতএব প্রধান প্রধান সামাজিদিগের কর্ত্তব্য দেশের বল বৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতিকল্পে হীনাবস্থা প্রাপ্ত বংশজদিগের স্বেচ্ছানুযায়ী আদান প্রদান কার্য্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

৪ঠা, জুন, ঢাকা
১৮৮৪

বংশবদ
শ্রী গুরুচরণ সমাদ্দর
১৫ জুন, ১৮৮৪

[এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজ]

এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজ মানহানির আশঙ্কায় কৃষিকার্য্য করিতে পারেন না ; শিল্প কার্য্যে হাত দেননা ; দিতে চাহিলেও পারিয়া উঠেন না। ইহারা বাণিজ্যও করিতে জানেন না ; যদিও কোন ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী হন, মূলধনের অভাব তাহার সকল আশা ভরসা সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং চাকুরী ভিন আর উপায় নাই। কিন্তু এই চাকুরিয়া জাতির চাকুরীও এখন আর বড় মিলে না। নেটিবের পক্ষে প্রায় সকল দরজাই বন্ধ। ইঞ্জিনিয়ারিঙ বিভাগে যাও। কিছু দূর গেলেই দেখিতে পাইবে, নেটিবের আর প্রবেশের অধিকার নাই। পোষ্টেল বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, রেলওয়ে অফিস, আদালত ও ফৌজদারী যেখানেই যাও নীচের তালায় ধাক্কার উপর ধাক্কা খাইয়া ঘুরিতে ফিরেতে পারিবে বটে, কিন্তু উপরের সিড়ীতে পা ফেলিবারও যো নাই। নেটিবের জন্য এখনও সিবিল সার্ব্বিসের দ্বারা খোলা আছে, কিন্তু সে এমনই কৌশলময় চক্রব্যূহ যে, মাতৃগর্ভে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিলে অভিমন্যুর মত বীর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে, কিন্তু ফিরিয়া বাহির হইতে পারিবে কিনা সন্দেহের বিষয়। সে কঠোর তপস্যার সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, শুকদেবের মত জন্ম মাত্র জননী'কে যোগ শুনাইয়া, তপস্যায় প্রস্থান করিতে না পারিলে আর কোনই ফললাভই প্রত্যাশা নাই। যাহা হউক, এত বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও এই সকল বিভাগে দেশীয় অধিকার আছে, কিন্তু সৈন্য বিভাগীয় উচ্চপদে নেটিবের পক্ষে একবারে বন্ধ। সামান্যপদাতিক অথবা নগন্য অশ্বারোহীর পদ নেটিবের পক্ষে উন্নতির চরমসীমা। বাঙ্গালীর লাঠিখেলা এখন অপ্রচলিত, তীর চালনার নৈপুণ্য প্রকাশের দিনও চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী বন্দুক ধরিতে অভ্যাস করিতেছিল, আর্ম্মস এক্ট আসিয়া তাহাও কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। মালভূম ও বীরভূমের সে পুরাতন গৌরব আর এখন নাই। বাঙ্গালী কাজেই ভীরু, কাজেই জাতি সাধারণের মধ্যে ক্ষীণ প্রাণ ও দুর্ব্বল বলিয়া অবহেলিত হইতেছে। সে অবহেলাও এত দূর যে, বাঙ্গালী সৈন্য বিভাগে সামান্য পদাতিকের কর্ম্ম চাহিয়াও পাইবেনা। এই অবস্থায় সিবিল ও মিলিটারী গেজেট যে দৃঢ়তার সহিত হতভাগ্য নেটিবদিগের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক উহাদিগকে সৈন্য বিভাগীয় উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত রাখা একান্ত অনুচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাতে আমরা বস্তুতই বিশেষ সুখী হইলাম। সিবিল ও মিলিটারী গেজেট বলেন, মোং মারবিন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মেং রমবার্ট কাষ্ট নামক ভারতবর্ষের একজন প্রসিদ্ধ অফিসারও এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। জেনেরল নরিস মেলিকফ বলিয়াছেন, এদিকে ভারতবর্ষে ইংলন্ড, ওদিকে এলজিয়র্সে ফ্রান্স, নেটিবের হাতে সেনানায়কত্ব প্রদান করা স্বপ্নেও একবার চিন্তা করেন না। কিন্তু [অস্পষ্ট] পর্ব্বতবাসীও সৈন্য বিভাগের উচ্চতম আসনে অনায়াসে উপবিষ্ট হইতে পারিতেছে। এদিকে কর্ণেল গ্রে এবং অন্যান্য অনেকে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের সীমারেখা রক্ষা করিবার ভার, দেশীয় রাজগণের সৈন্যের উপর অর্পণ এবং দেশীয় সদ্বংশজাত সৈনিক যুবকদিগকে ক্রমে উচ্চতর পদে উন্নয়ন করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে উত্তেজিত করিতেছেন। ভরসা করি, গবর্ণমেন্ট উল্লিখিত মহাত্মাদিগের কথার সম্মান রক্ষা করিয়া দেশীয়দিগকে এই অধিকার প্রদান করিবেন অনরক্ত প্রজাগণকে বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

২৩ নভেম্বর, ১৮৮৪

## ফিরিঙ্গীদের দুর্ম্মতি কেন?

ফিরিঙ্গী সম্প্রদায় সাহেবী দলে মিলিতেই একান্ত যত্নবান, শ্বেতদলে শ্ব-বৃত্তি করিতেও রাজি কিন্তু দেশীয় সমাজে মিলিয়া সম্মানিত হইতেও নারাজ। ভারতে জন্মিয়া ভারতের ধনধান্যে পুরিপুষ্ট হইয়া, ভারতবাসী নামে পরিচিত হইতে তাঁহাদের বড়ই অনিচ্ছা, নিতান্তই অপমানবোধ! এ জন্য তাঁহারা যে কোনে কার্য্যে, যে কোন আন্দোলনেই সাহেব সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী হন, তাঁহাদের প্রসাদভিখারী হইয়া ফিরেন। অর্দ্ধশ্বেতকায়গণকে এরূপ অনুগ্রহপ্রার্থী, অদৃশ শরণাগত দেখিয়াও সাহেবেরা তাঁহাদিগকে দলে মিশাইতে চান না, বড় একটা গ্রাহ্য করেন না; সুতরাং তাঁহারা পদে পদেই বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকেন। এদিকে দেশীয়গণের সহিত যোগ দিতে চাহেন না বলিয়া তাঁহারাও ফিরিঙ্গী দলের দশা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের ন্যায় হইয়াই দাঁড়ায়। উহারা কোন দলেই পাত না পাইয়া অনেক সময়ে সংসার অন্ধকারময়ই দেখিতে থাকেন। তবে গবর্ণমেন্টের কতকটা বিশেষ অনুগ্রহ আছে বলিয়াই রক্ষা। নচেৎ ফিরিঙ্গীগণ "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া এতদিনে নিতান্ত দুর্গত হইয়াই পড়িতেন, বলাবাহুল্য।

যখন শ্বেতদলে যোগ দিতে যাইয়া ফিরিঙ্গীরা অপ্রতিভ হইয়াছেন, আমরা তখনই তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে বলিয়াছি; কিন্তু রোগী যেমন উপকারী স্বাদু ঔষধ ও পথ্যকে বিস্বাদ মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, উহারাও আমাদের হিতবাণীকে সেইরূপ অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যতদিন না রোগীর আরোগ্যলাভ হন, ততদিন পর্যন্ত আমাদিগকে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া আজিও একটি বিষয় উপলক্ষে ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়কে দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

রুষ সমরের সম্ভাবনা দেখিয়া চারিদিকের শ্বেত, অর্দ্ধশ্বেত ও কৃষ্ণকায়েরা সৈনিক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন। দেখাদেখিই হউক, অথবা উৎসাহ প্রবণতা প্রযুক্তই হউক উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় ফিরিঙ্গীসভাও ব্রিটিশসেনাদলভুক্ত হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট উত্তর দিয়াছেন,—"ব্রিটিশ সৈনিকগণ স্বদেশে যাইয়া রিজার্ভদলে প্রবিষ্ট হন, তাহাদিগকে পেন্সন দিতে হয় না, তাহাদের কার্য্যকালও অল্প। অতএব ব্রিটিশসেনাদলের জন্য কাহারও প্রবেশ করিবার যো নাই"। এই উত্তর পাইয়া ফিরিঙ্গীসভা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের আবদার থামিয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু ইংরাজরাজ যে, ব্রিটিশ সৈন্যদলে অন্যকোনও সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিবেন না, নানা ওজর আপত্তি দেখাইবেন, ফিরিঙ্গীদিগকে পরিণামে নিরাশক্তি দুঃখিত হইতে হইবে, ইহা নিশ্চিতরূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাই বলিতেছি, ফিরিঙ্গীদিগের দুর্ম্মতি কেন? —যাহা পাইবার নয়, তাহা লাভ করিবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিবার প্রবৃত্তি কেন? কোকিলের বাসায় প্রতিপালিত হইয়া কাক যেমন কখনও পিক হইতে পারিবেন না, দূরবংশীয় ব্রিটিশ পিতৃলোকের দোহাই দিয়া ফিরিঙ্গীগণও তেমনই ব্রিটিশ হইতে পারিবেন না, হইতে চাহিলে পদে পদে বিড়ম্বনাই ভোগ করিবেন, ইউরেশীয়ান সমাজ নায়কেরা কি ইহা বুঝিয়াও বুঝিবেন না? আমাদের বিবেচনায় ফিরিঙ্গীদের এই আবদার ছাড়িয়া দিয়া দেশীয়গণের সহিত যোগদান পূর্ব্বক উন্নত প্রণালীয় "ভারত সেনা" প্রস্তুত করিবার প্রার্থনা করাই সব্বর্থা কর্ত্তব্য। ফিরিঙ্গীরা স্বীকার করুন আর নাই করুন, তাহারা ভারত সন্তান বলিয়াই গণনীয়। যাহাতে ভারতীয় প্রজার উপকার ও উন্নতি, তাহাতে তাঁহাদের উপকার ও শ্রীবৃদ্ধি। এই শুভকর পথ

নিষ্কন্টক না করিয়া পথে চলিতে গেলে সাহেব হইতে চাহিলে, ইষ্টের পরিবর্ত্তে বিড়ম্বনাভোগই সার হইবে। মান্দ্রাজের ইউরেশীয়ান সভার সভাপতি হোয়াইট সাহেব আপনাকে ভারতবাসী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। অত্রত্য ফিরিঙ্গীগণ ভারতসন্তানের দলে যোগ দিতে অভিলাষী। তাঁহারা ভারতের সুখসৌভাগ্যকেই আপনাদের সুখসৌভাগ্য মনে করিয়া থাকেন। সর্ব্বস্থানীয় ইউরেশীয়ানগণ যদি এরূপ উদারাশয় হইতেন, ভারতসন্তানকে ভাই বলিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিতেন—উভয়ে একপ্রাণে অভাব, অসুবিধা দূরীকরণ করিয়া লইতে সচেষ্ট হইতেন, তাহা হইলে কেমন সুখের, কিরূপ সৌভাগ্যর দশা হইত, ভাবিয়া দেখ দেখি। মহামতি হোয়াইট ও তাদৃশ উদারচিত্ত ফিরিঙ্গীরা স্বীয় সমাজকে সাহেব হইবার দুর্ম্মতি ছাড়িতে দেশীয়গণের দলে মিশিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দেন, একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১২ এপ্রিল, ১৮৮৫

## ইংরাজ কি সর্ব্বাংশে আমাদের আদর্শস্থানীয়?

আজকাল অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনের ভাব এই যে, 'পাশ্চাত্যশিক্ষার বিমল জ্যোতিতে আমরা উন্নতিসোপানের অনেক দূর আরোহন করিয়াছি এবং শান্তির সুস্নিগ্ধচ্ছায়ায় এইভাবে আর দেড়শত বৎসর কাটিয়া গেলে, আমরা নিঃসন্দেহ শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম আরোহণীতে পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব। ইংরাজ আমাদের আদর্শস্থানীয়, আমরা ইংরাজের তুল্য শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিতে পারিলে জগতীতলে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য বলিয়া সম্পূজিত হইতে পারিব।' অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া উৎকর্ষাপকর্ম্ম ভাবিয়া দেখিলে, এই সংস্কার ভ্রান্তিমূলক বলিয়াই প্রতীত হয়। কোনও বস্তুর বাহ্যচাকচিক্যদর্শনে বিমোহিত হওয়া যেমন সদ্বিবেচনা ও বৈচক্ষন্যহীনতার পরিচায়ক, ইংরাজের জাঁকজমক ও প্রভুত্বাদিদর্শনে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাংশে আদর্শস্থানীয় মনে করাও তেমনই অসারগ্রাহিতা ও স্থূলদর্শিতার দ্যোতক। যাঁহাদিগের উপর সমগ্র জাতির ভাবী শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, সবিশেষ আলোচনাপূর্ব্বক ধীর গম্ভীরভাবে বিচক্ষণতাসহকারে আদর্শ নির্দ্ধারণ করাই সেই নেতৃগণের একান্ত কর্ত্তব্য। তৎপরিবর্তে যদি তাহারা স্থূলদর্শীর ন্যায় একটানেই একদিকে হেলিয়া পড়েন—স্বজাতির পরিণাম কি হইবে, ভাবিয়া না দেখেন, নিতান্তই আক্ষেপের বিষয় হয়, সন্দেহ নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ইউরোপের নগণ্য জাতি সকল হইতে ইংরাজ ও অধিকতর আদর্শ স্থানীয়, আফ্রিকার জুলু অথবা আমেরিকার আদিম নিবাসিগণের তুলনায় দেবভাবাপন্ন, ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতা প্রাপ্ত হইলে, জুলু বা আদিম আমেরিকানেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতে পারে। ইহাও স্বীকরণীয় যে, ইংরাজগণ, অন্তত এঙ্গলোইণ্ডিয়ানগণ জুলু প্রভৃতি হইতে আমাদিগকে অধিকতর সভ্য বলিয়া গণনা করেন না এবং তাঁহাদের মনের প্রকৃত ভাবও এই যে, ইংরেজী শিক্ষার বলে আমরা ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু এজন্যই আর্য্য ঋষির বংশধরগণ আর্য্যশোণিতধারী হিন্দুজাতি, ইংরাজকে আদর্শস্থানীয় না বলিয়া পারিবে না, ইহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। নেতৃত্বাভিমানী খাঁটি ইংরাজ ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগকে যে চক্ষেই দেখুন না কেন—তাঁহাদের ভাব যাহাই হউক না কেন তাঁহাদের মনের ভাব যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমাদের দুঃখসন্তাপ কিছুই নাই কারণ তাঁহারা যখন জেতৃজাতি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, তখন আমাদিগকে অসভ্য না বলিলে চলিবে কেন? নতুবা জগৎসমীপে কিরূপে

বলিবেন যে, অসভ্য ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান, সভ্যতা ও শিক্ষাবিস্তারই খ্রীষ্ট ইংরাজের একমাত্র মহব্রত? সে যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়দৃপ্ত, ইংরাজ ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ানগণের উল্লিখিতভাবে আমাদের দুঃখসন্তাপ কিছুই নাই। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয়, নিরতিশয় লজ্জার কথা এই যে, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত পোনে ষোল আনা লোকেরও ঐরূপ ভ্রান্তিসঙ্কুল অদ্ভুতবিশ্বাস দৃঢ়তর! আমরা একথা বলিতেছি না যে, ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের কোনও উন্নতি হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাই বলিতে হয়, ইংরাজের নিকট ইংরাজীশিক্ষার নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে যখন ভারতবর্ষ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন ইংরাজই সে অন্ধকার দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মুসলমান নিপীড়নে যখন আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানও শিক্ষালুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন ইংরাজই আমাদের সে সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেইজন্য আমাদিগের এই অধঃপতিত জাতির যে সম্পত্তিটুকু আছে, তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজকে সর্ব্বাংশে আদর্শস্থানীয় মনে করিয়া আমরাও ইংরাজ হইয়া যাইব, এভাব বড়ই অসহনীয়, একান্তই অপদার্থতামূলক। বলশালী ইংরাজ জাতি ২৫ কোটি লোককে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ জন্যই কি তাঁহাদের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ ও নীতিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে? ইংরাজ আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছেন বলিয়াই কি দোষগুণ বিচার না করিয়া তাঁহাদের যাহা অবলম্বনীয়, অম্লানচিত্তে তাহাই গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য? জিজ্ঞাসা করি, নানারূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃতি বলে ইংরাজ আমাদের নিত্যকার্য্যের সৌকর্য্যবিধান করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই কি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের আদর্শস্থলীভূত? উন্নতি কি কেবল ভৌতিক জগতেই শারীরিক ব্যাপারেই সংবদ্ধ? আধ্যাত্মিক উন্নতি বলিয়া কি জগতে একটা কিছুরই অস্তিত্ব নাই? যদি নিত্যজ্ঞান অনিত্যজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে শারীরিক উন্নতি হইতে আধ্যত্মিক উন্নতিকে কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় না? শারীরিক শ্রীবৃদ্ধি অপেক্ষা আধ্যত্মিক শ্রীবৃদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলে যে জাতির ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে পারি না, সেই জাতিকে কিরূপে আদর্শস্থানীয় জ্ঞান করিতে পারি? এক একটি করিয়া তুলনা করিলে আমাদের বাক্যের যথার্থ্য পরিলক্ষিত হইতে পারে। বেদের সহিত বাইবেলের-মহাভারতীয় নীতির সঙ্গে বর্তমান সুসভ্যজাতীয় নীতির এবং হিন্দুসমাজের সহিত ইংরাজসমাজের তন্ন তন্ন করিয়া তুলনা করিতে পারিলে, পাঠকবর্গকে দেখাইতে পারি, কোন জাতি আদর্শস্থলে বসিবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আমাদের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সে সুযোগ ঘটিয়া উঠা সুকঠিন। সুতরাং সংক্ষেপতঃ এই কথা বলিয়াই অদ্যকার প্রস্তাবের শেষ করিতে হইতেছে যে, ইংরাজের সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মপ্রথার অনুকরণ করিয়া এখনই আমরা যেরূপ অবনত হইয়াছি, যদি আর দেড় শত বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে আমরা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়া পড়িব। স্বল্পকালীন অনুকরণপ্রসাদেই আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে; আর শতাধিক বর্ম এই দিকেই স্রোত—বহিলে, আমরা ধর্ম্ম ও নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হইয়া মানবনামে কলঙ্ক-কালিমালেপন করিব, সংশয় নাই। এজন্যই বলিতেছি, সমাজের দেশের নেতৃবর্গ যেন এতৎসমন্ধে সবিশেষ সাবধান হইয়া চলেন ভারতের ভবিষ্যৎকে যেন আরও ঘোর তিমিরাব্রত করিয়া না তুলেন।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫

## ঢাকা প্রকাশের আহ্বান

আমরা অতীব কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে ঢাকা প্রকাশের গ্রাহকগণকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ও ব্রাহ্মদিগের কীর্ত্তি প্রকাশ জন্য যে একশত টাকা অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার সাহায্যার্থ তেরশ্রী নিবাসী প্রসিদ্ধ স্বধর্ম্ম নিরত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় মহোদয় আমাদিগকে পচিশ টাকা দান করিয়াছেন। স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু বিশেষতঃ আভিজাত্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ স্বাভাবিক তাহাতে কালীনারায়ণ বাবুর প্রাত্যহিক সৎকার্য্যে বিস্তর দান হইয়া থাকে, এবং আমাদের প্রাপ্ত ঐ টাকা সেই প্রাত্যহিক দানের অতি সামান্য অংশ, কিন্তু কালীনারায়ণ বাবুর এই সামান্য দানে তাহার যে মহানুভবতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও উদারতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অসাধারণ। কি কাজে ব্যয় করিলে ভয়ঙ্কর শত্রুমুখ হইতে স্বধর্ম্ম রক্ষা পাইতে পারে, ইহা যদি কালীনারায়ণ বাবুর ন্যায় অন্যান্য সম্পন্ন হিন্দু সন্তানগণ অনুভব করিতেন, তবে আজ হিন্দুধর্ম্মের এদশা ঘটিত না তাহা হইলে আজ এবিসিডির গুণাক্রান্ত নীচাদপি নীচ লোকের মুখে হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা প্রকাশ পাইত না। স্বধর্ম্ম রক্ষা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা স্বধর্ম্ম নিরত ব্যক্তি মাত্রই জানেন।

কালীনারায়ণ বাবুর তৎবিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয়ও ইহাতে হইতেছে। আর বিনা যাঞ্চায় দান করাটা বিশেষ ঔদার্য্যের পরিচায়ক। আমরা কালীনারায়ণ বাবুর এই সকল মহৎগুণে নিতান্তই আশ্বাসিত হইলাম।

২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৭

## দেশ যে রসাতলে যায়

ইংরাজী শাসনে ও ইংরাজী শিক্ষিতের জাতীয় ভাবের অভাবে দেশে যে ভয়ানক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিয়া নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়। অনেক দিনের কথা নহে ত্রিশ বৎসরও হয় নাই, বর্ত্তমান শাসন প্রণালী ও শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই কালেই বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, এদেশীয় প্রকৃতির ঘোরতর পরিবর্তন হইতেছে। লোকের আর সে বল নাই, সে ধৈর্য্য নাই, সে গাম্ভীর্য্য নাই, সে সততা নাই, সে চিন্তাশীলতা নাই, নাই বলিতে এমন কিছু নাই, যাহা থাকিলে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইতে পারে। শুধু মানুষের নাই, তাহা নহে, মানুষ যে প্রকৃতির স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, সেই প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জল, বায়ু, স্থান, ক্ষেতের শস্য, জলের মাছ, গাভীর দুধ, যে দিকে চাও সেই দিকেই ঘোরতর অবস্থান্তর দেখিতে পাইবে। এখন যুবক ত যুবক, বালকেও ডুডুডুডু খেলে না, ছুতারের লাটিম বিক্রি হয় না। কুমারের ঢেপা চক্ষে দেখা যায় না, বাজারে কড়ি নাই, বটে, দুই একটা স্কুল কলেজে দুই এক প্রস্থ বিলাতী ব্যাট্ বল্ আছে, বিলাতী তাস পুরুষ মহল হইতে রমণী মহল অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তাতে হয় কি? তাতে তা আর সাধারণ ছেলে পিলের গায়ে বল, হাতে নিপুণতা, ও মাংসপেশীয় সতর্কতা জন্মে না। ছেলে পিলেগুলি নিত্য রোগে জড় সর। ঐ অবস্থাতেই পেটের জন্য ধান্ধাবাজী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে ব্যস্ত ভবিষ্যতের দিকে চাহিবে কখন? রোজগারেও প্রলোভনের অভাব নাই। মজুরি হইতে কেরাণী গিরি পর্যন্ত কতিপয় কাজ করিতে পারিলেই চান্দের মত টাকা লাভ হয়। তাই ত? টাকার নামে কাঠের পুতলা হা করে।

টাকায় দেহ বৃদ্ধি-স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না ; এক পয়সায় এক সের চাউল কিনিয়া খাইলে গায়ে যে বল হইত, পাঁচ পয়সায় সেই একসের চাইল কিনিয়া খাইলে তদপেক্ষা অধিক বল হইবে না ; এক পয়সার চিরতার জল এক মাস সেবন করিলে যে স্বাস্থ্য রক্ষা পায়, এক টাকার হাওয়ার্ডস্ কুইনাইন, এক মাস সেবন করিলে তদপেক্ষা স্বাস্থ্যের অধিক্য হইবে না। স্থূল কথা দ্রব্যের মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধিতে পরাধীন দেশে সাধারণের লোকসান বই লাভ নাই। প্রত্যেকেই এক একটি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে একদিকে পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অন্যান্য দিকেও পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পায়, এদেশে তাহা খুব পাইয়াছে সুতরাং এক পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধিতে যতই কেন লাভ হউক না, অন্যান্য ব্যবসায়ের সহিত বিনিময়ে সে লাভ উড়িয়া যায়। মনে কর, পূর্ব্বে মজুরি করিয়া মাসে এক টাকা বেতন পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আট আনার চাউল, দুই আনার মাছ, তরকারী, দুই আনার তৈল লবণ মশল্লা, দুই আনার বস্ত্র ও গৃহ কার্য্যের ব্যয়, এবং দুই আনা বাজার খাজানা যোগাইয়া যাহাদের চলিত, এখন তাহাদের দুই টাকার চাউল, এক টাকার মাছ তরকারী, আট আনার তৈল লবণ মশল্লা, চারি আনা রাজস্ব মোট তদবাদে যে পাঁচশিকা থাকে ইহাতে গৃহ, বস্ত্র, ছাতা জুতা ও নতুন নতুন বর্দ্ধনশীল আকাঙ্ক্ষায় বরং দশগুণ মনপুড়নি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা পঁচিশ বৎসরের একটা হিসাব দিতেছি। ১২৭০ সনের সহিত ১২৯৫ সনের দেশজাত দ্রব্য ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের তারতম্য দেখুন।

১২৭০ সনের দর, ১২৯৫ সনের দর।

| | | |
|---|---|---|
| চাউল (সের) | ৭৷৹ | / |
| ডাউল ,, | ১০ | /১০ |
| তৈল ,, | ৵. | ৶. |
| দুগ্ধ ,, | ১০ | ৶. |
| বড় একটি রুই মাছ | ৷৷ | ২ |

দেখিলাম, সাধারণ খাদ্য সামগ্রীর মূল্য এই পঁচিশ বৎসরে গড়ে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পরে পরণ পরিচ্ছদের ব্যয় ৬/৭ গুণ বাড়িয়াছে। ঐ সময়ে যাহাদের লেঙটি পড়িতে লজ্জা হইত না, এখন লোকের দেখাদেখি এমন হইয়াছে যে, গায়ে পিরান না পড়িলে তাহাদের লজ্জা হয়। সাধারণের মধ্যে ছাতা ও জুতার রেওয়াজ এই অল্প কালে বিস্তর রূপে প্রচলিত হইয়াছে। মজুরের বেতন ঐ সময় বেশীর পক্ষে ২৷৷ টাকা ছিল, এখন কমের পক্ষে চারি টাকা ও বেশির পক্ষে দশ টাকা পর্য্যন্ত। ভূমির খাজনা দুর্ব্বল ভূস্বামীরা কিছু বাড়াইতে না পারিলেও প্রবল ভূস্বামীরা কিছু কিছু বাড়াইয়াছেন। কিন্তু সেইরূপ বৃদ্ধি কোথাও কৃষিজাত উপযুক্ত হয় নাই। কৃষি জাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে, মজুরীর মূল্যও বাড়িয়াছে, কিন্তু শিল্পের মূল্য সে পরিমাণ বাড়া দূরে থাকুক, অধিক স্থলেই কমিয়াছে। তাঁতী পূর্ব্বে যে চারি দিনের পরিশ্রমে একখানি ধুতী প্রস্তত করিয়া চারি আনা লাভ করিত, এখন সেই চারি দিনে আনাও লাভ করিতে পারে না। অথচ পূর্ব্বে যে খাদ্য দ্রব্য চারি দিনে চারি আনার অধিক লাগিত না, এখন সে খাদ্য দ্রব্যে অন্যূন বারআনা লাগে! রোজগার চারি আনা, খরচ বার আনা, চালায় কিরূপে? তাই তাঁতীকূলে হাহাকার উপস্থিত। যদিও অনেকে নাইল ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছে, তথাপি অপর সকলের হাহাকার দূর হয় নাই। শুধু তাঁতী নয়, শিল্পী মাত্রেরই এই দশা। সব

দিকেই হাহাকার। পূর্ব্বেকৃষক, মজুর প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যবসায়ীর লাভ দেখিয়া পাঠক একটু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সে লাভও তাহাদের মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছে। পূর্ব্বে কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পরন পরিচ্ছদ, চাল্ চলতি খুব উচ্চুদরের ছিল বটে, কিন্তু সাধারণের অবস্থা প্রায় একই রূপ ছিল ; সুতরাং কাহারও ঈর্ষাজনিত না, সকলেই আপনাপন অবস্থানুসারে সুখে থাকিত। এখন দেখা যায় যে, কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, সেই রাজার হালতে চলিতে পারে। ঘরে খাবার না রাখিয়া, কালে আকাশে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ পায়, তাহা দ্বারা প্রথমতঃ বিলাস সামগ্রীর আয়োজন করে। তিনদিন উপবাস করিলেও যদি রাজার মত চলাফেরা যায়, তাহা মুখ লোকে চাহিবে না কেন?

এইরূপ বাহির চটকের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। কৃষকের পুত্র কিছু পৈতৃক উপার্জ্জনে নির্ভর করিয়া বাবু সাজিয়াছে ; এখন কৃষি কার্য্য করিতে তাহার লজ্জা হয়। দেশে এখন ব্যবসায় মাত্র তিনটি ; কৃষি, মজুরী ও কেরানীগিরি। দেশে আর যে শত শত ব্যবসায়ী লোক ছিল, তাহারা নিজ ব্যবসার মাথায় পদাঘাত করিয়া ঐ তিনটির কোনটি ধরিতেছে। সুতরাং কোন ব্যবসায়েই কেহ লাভবান, খাটুনি, দুশ্চিন্তা ও অসুদপায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এক পক্ষে কার্য্যভাব, এবং অন্নভাব, অপর পক্ষে কাজের বাহুল্য, অতৃপ্তি ও অভাব রাশি উদ্ভাবিত হওয়াতে সর্ব্বত্রই হাহাকার উঠিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে ঘোরতর অন্ধকার বই আর কিছু লক্ষিত হয় না। দেশ যে রসাতলে যায়। দেশ কেন যে এরূপ দুৰ্দ্দৈবগ্রস্ত হইল, আমরা ভবিষ্যতে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিব।

১৭ জানুয়ারি, ১৮৮৯

## দেশ রসাতলে যাইবার বড় বাকী নাই

ইংরাজ শাসনের মহিমায় ও ইংরাজী শিক্ষিতদিগের অপরিণামদর্শিতাবশতঃ ভারতের অন্য সকল ব্যবসায় নষ্ট হইয়া কৃষি, কেরানিগিরি বা নানাবিধ লিপি ব্যবসায় ও মজুরী, এই তিন প্রকার ব্যবসায়েরই পসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাতে বিশেষ লাভ, তাহাতেই লোকের আগ্রহ যাহাতে লাভ নাই, তাহাতে কে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে? পাশ্চাত্য শিল্পের বাহিরচটকে দেশের সকল প্রকার শিল্প বিনাশ পাইতেছে। দেশীয় কামারের অলঙ্কার বিকে না, বিকে ত হ্যামিল্টনের, দেশীয় ছুঁতারের কারিগরী কাজে লাগে না, গোরা ও চীনা মিস্ত্রীদের পোষাবার, কুমারের হাঁড়ী পাতিল বিকে না, বিলাতী কড়াই, ডেগ প্রভৃতিতে কাজ সারা হয়, দেশীয় তাঁতী জোলার ত কথাই নাই, মাঞ্চেষ্টর সর্ব্বেসর্ব্বা, বরজীর পান ছাড়িয়া বাবুরা খানচা কাফী, মালাকারের শিল্পে আদর নাই, সেখানেও সাহেবী ফ্যাসন, তেলী কলুর তৈলের অন্যান্য জিনিসের হারাহারি মতে মূল্য বাড়ে নাই, তাই তাহাদের অনেকে কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে ; এদিকে কলের বার মিশাল তৈল ও কেরাচিন, বেড়ী, ভেড়ী, বকরী প্রভৃতির তৈল প্রচুর তৈল চলিয়াছে। গোয়ালার দুধ ছাড়িয়া বাবুরা মদ খান, ঘি ছাড়িয়া চার্ব্বি খান, গো বংশ ধ্বংস করিয়া আর কে কি খান, তাঁহারাই জানেন। বিলাতী চূড়ীর জ্বালায় শাঁখারীর শাঁখা বিকে না ; বাবুরা অনেক দাড়ি রাখিয়া নাপীত বেচরাকে ফাঁকি দিয়াছেন ; কেহ কেহ আবার নখ খাইয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি, প্রধান প্রধান দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা তিন গুণ চারি গুণ বাড়িয়াছে। কোন কোন শিল্পের মূল্য যদিও কিছু কিছু বাড়িয়া থাকুক, তথাপি আহার্য্য দ্রব্যের ন্যায় তিনগুণ চারি গুণ বাড়ে নাই, সুতরাং শিল্পীগণ জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া না দিলে সংসার চালায় কি করিয়া? ওদিকে সেই তিনটি ব্যবসায়ের দুইটিতে বিলক্ষণ লাভ, অন্যটিতে বাবুগিরি, রাজত্ব যত কিছু মনে সম্ভ্রম–সমস্তের প্রলোভন, নিতান্ত ব্যাকুব না হইলে এ প্রলোভন ছাড়ে কি করিয়া।

যত ঝোঁক. সব কায়স্থের ব্যবসায়ে, যত দিল্লীকা লাড্ডু, সমস্ত কায়স্থের লিপি ব্যবসায়ে। লিপি ব্যবসায়—রাজকার্য্য পরিচালনা চিরকালই ছিল ; পূর্ব্বে দুই চারিটি ব্রহ্মণ, এক আধটি সুত, অথবা করণ ব্যতীত ইহাতে কায়স্থ বই অন্য কাহারও অধিকার ছিল না ; এখন কিন্তু বিদেশীয় রাজার শাসনে ও বিজাতীয় শিক্ষার গুণে সমস্ত জাতিরই প্রবেশাধিকার হইয়াছে। কায়স্থের ব্যবসায়ে এখন আর ব্রাহ্মণের অধঃপতন হয় না, নিম্নজাতিরা বাধা পায় না, কেবল চারি দিক হইতে হুড় হুড় করিয়া লোক আসিয়া কায়স্থের ব্যবসায়ে ঢুকিতেছে, গবর্ণমেন্ট তাহাদের সহায়তা করিতেছেন ; বিধর্ম্মীগণ তাহাতে উৎসাহ দিতেছেন। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য ব্যবসায়ের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এই জন্য দেশ হইতে সকল গুলি শিল্প বিনষ্ট ও সকল প্রকার উন্নতি–চিন্তা বাধাপ্রাপ্ত হইল, ইহার অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় কি হইতে পারে? সত্য বটে, কোনরূপে ত এখন চলিতেছে, কিন্তু এই চলাই কি চলা? দুইদিন পরের জন্য কি ভাবিতে নাই? কোন দেশও কি কখন ঐ গুটি তিনেক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিয়াছে? উহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? ধরিয়া লও, কামার, কুমার, তেলী, মালী, জোলা তাঁতী, ধোপা নাপীত সকলেই আপনাপন ব্যবসায় ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছে, এখন তাহারা নিজ নিজ বৃত্তি জানে না, এবং সেই বৃত্তিগুলিতে ঘোরতর অপমান বোধ করে, এমন স্থানে আজ যদি ইউরোপে একটি ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হয়, তবে ভারতের কি হইবে? মজুত মাল নিঃশেষ হইতে কয়দিন? তখন উপায়?

তখন পুনরায় এ দেশের লোক এ দেশের ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, সে আশা দুরাশা যে লিখা পড়া শিখিয়া এদেশে ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য হইয়াছে সে কি আর পুনরায় ঐ সকল ব্যবসায় প্রাণান্তেও করিতে চাহিবে? মনে কর, এখন এদেশে মেথরের গুরুতর অভাব, ভূমালী বলিয়া যাহারা পূর্ব্বে ভূমির আবর্জ্জনা ও মলাদি পরিষ্কার করিত এখন তাহারা শাসনাভাবে, সে কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন মেথর অভাবে স্থানে স্থানে ময়লা জমিয়া মেলেরিয়া প্রভৃতি নানা রোগৎপত্তির কারণ হইতেছে, এখন মেথর না হইলে কিছুতেই চলিতেছে না? এ কার্যে রোজগারও ত বিলক্ষণ আছে। তবে বিচক্ষণ পাঠক বলুন দেখি—কোন লিখা পড়া জানা ভদ্রলোক কোথাও কি এ কার্য্যে কখনও গিয়াছে? ব্রাহ্মগণ না জাতিভেদ মানেন না, তাহারা নাকি দেশের হিতৈষী, তাহারা কেন এই কার্য্যটি করিয়া দেশের হিত ও নিজেদের একটা রোজগারের পথ করিয়া লন না? এমন লোক হিতকর রোজগারে যদি তাহারা ঘৃণা করেন, তবে কোন মুখে জাতিবেদের মুণ্ডপাত করিতে তাহার ব্যস্ত?—

সত্য বটে, বিলাত প্রভৃতি যে সকল স্থানে জাতিভেদ নাই, সেখানেও মেথর প্রভৃতি ইতর কাজের জন্য লোক আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিলাত প্রভৃতি দেশ নয়। যে দেশে

স্বাভাবিক খাদ্য সামগ্রী কম, সে দেশে পেটের দায়ে-প্রাণের দায়ে মেথরি ও মেথরি, সদা প্রাণ যায় যে কাজে তাহাও করিতে পারে। এই যে প্রাণের দায়ে বিলাতী শ্রমজীবীগণ পুলিসের সঙ্গে প্রাণপণে লড়িতেছে—পুলিসের সংগ্রামে কত জনের প্রাণ যাইতেছে, তথাপি নিবৃত্তি নাই, এমন লোকেরা মেথরের কাজ করিবে সে কি আশ্চর্য্য ! কিন্তু এ ভারতবর্ষ। এখানে গাছের পাতা খাইয়া লোক বাঁচিতে পারে ; ভিক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে, সে মেথরের কাজ বা রাজনৈতিক সংগ্রাম করিবে কেন? প্রাণের দায়, অন্যের আদর্শ ও পূর্ব্ব-পুরুষের সংস্কার, সাধারণত এই তিন কারণে লোকে তেমন কুৎসিত ব্যবসায় অবলম্ব করে, এই তিনটী কারণই অন্য দেশে প্রচুর আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে পূর্ব্ব পুরুষের সংস্কার বা জাতিভেদ ভিন্ন অপর কারণ নাই ; অতএব যে ব্যক্তি ঐ একটি মাত্র কারণ উপেক্ষা করিয়া কোন সৎব্যবসায়ে প্রবর্তিত হয়, তাহাকে তাহার পূর্ব্ব ব্যবসায়ে পরিবর্তিত করা কঠিন, আর সেই ব্যবসায় যদি কুৎসিত হয় ; তবে অন্য জাতীয় লোকে কখনই সে কার্য্য করিবে না, ও সে ব্যবসায়ের ক্রমে বিলোপ হইবে। এদেশে হইতেছেও তাহাই। শস্তা শিক্ষা পাইয়া ও রাজপুরুষদিগেয়র নিকট লাই পাইয়া যত ছোট লোকের সন্তান ভদ্রলোক হইতেছে, গোলামের সন্তান কায়স্থ হইতেছে, মেথরের সন্তান বাবু হইতেছে, সৎগোপের সন্তান ডাক্তার (বৈদ্য) হইতেছে, নাপীতের সন্তান ডিপুটি হইতেছে, ধোবার সন্তান শিক্ষক হইতেছে, যাহার যে বৃত্তি নয়, সে তাহার উচ্চ জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু উচ্চ জাতীয় লোকেরা জাতীয় ব্যবসায়ের অভাবে খাইতে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে মরিতেছে।

অবশ্য প্রতিযোগিতা করিতে গেলে যাহার যাহা জাতীয় বৃত্তি তাহাতে তাহার উত্তীর্ণ হওয়া অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু একথা ত আর সকলের নহে? যে সুযোগ অভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। বরং প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। বরং প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন সুযোগ শতকরা একটী লোকের হয় কিনা সন্দেহ। এমন স্থলে সেই শতকরা নিরানব্বই জনের জীবনোপায় কি থাকিতেছে? এদেশের কায়স্থ সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত না করেন এমন কঠিন হৃদয় কয় জন? যদিও লিপি ব্যবসায়ী সমাজে অদ্যাপি কায়স্থই অগ্রগণ্য রহিয়াছেন, কিন্তু সহস্র সহস্র কায়স্থসন্তান যে জাতীয় ব্যবসায়ের অভাবে অধঃপতিত জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন দেহে শমনের অতিথি হইতেছেন, পাঠক চলুন একবার সমস্ত প্রাচীন কায়স্থ পল্লী ভ্রমণ করিয়া দেখাই, কি মর্ম্ম বিদারক ঘটনা। সকল গুলি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমাজের অবস্থাই প্রায় তত্তুল্য। এখনও গ্রাম্য ইতর জাতীয় লোকেরা উপযুক্ত রূপ শিক্ষার মহিমা বুঝিতে পারে নাই, যে দিন তাহা পারিবে, সেদিন ভারতের সকল গুলি শ্রেষ্ঠ বংশ বিলুপ্ত হইবে, ভারত রসাতলে যাইবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯

## ঢাকায় অবোধ ধনী-সন্তান ও অর্থ গৃধ্নু মহাজন

ঢাকায় অনেক ধনীর বসতি। প্রাচীন শ্রেণীস্থ ধনীরা সুশিক্ষিত না থাকিলেও চিরপ্রচলিত ধর্ম্মসংস্কার ও চিরাচরিত সংসার নীতিতে বদ্ধ থাকিয়া একরূপ প্রশংসার সহিত কালকর্ত্তন করিয়াছেন এবং স্ব স্ব অবস্থারও যথাসম্ভব উন্নতিই বিধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের সন্তানদিগের আজিকালিকার অবস্থা দর্শন করিলে নিতান্তই দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহাদিগের না আছে সুশিক্ষা, না আছে সৎসংলগ্ন এবং না আছে সদৃষ্টান্ত। ভদ্র শিক্ষিত জন [ অস্পষ্ট ]

ইহাদিগের ত্রি সীমায় গমন করিতেও সঙ্কুচিত হন, ইহাদিগেরও ভদ্র সংসর্গে যাইতে অভ্যাস অভিলাষ নাই। এতদ্বশতই ইহারা দিন দিনই অধিকতর সময়গামী, স্বেচ্ছাচারী ও প্রবল ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া এক [বারে] অধপাতে যাইবার পথে চলিয়া [ছে]।

"ঢাকাই" ধনী সন্তান [ অস্পষ্ট ] নিজের বা সংযোজিত দলের "বৈঠকখানা" বা "বাঙ্গালা" নির্দিষ্ট আছে। রাজ্যের অসচ্চরিত্র বেওয়ারিশ বদমায়েশ যুবকদল উহাতে যাতায়াত ও অবস্থান করে। কুক্রীড়া, কদালাপ, আলোচিত হাস্যপরিহাস, কুপ্রবৃত্তিমূলক নৃত্যসঙ্গীত, মদ্যপান ও বেশ্যা সমাগম বাঙ্গলা বা বৈঠকখানার প্রধান অনুষ্ঠান। চর্ব্ব্যচূষ্য লেহ্য পেয় সমন্বিত অতি ব্যয়সাধ্য প্রীতি ভোজনও উহার অন্যতম কার্য্য। অল্পবয়স্ক ধনী সন্তানদিগের প্রথমই সকল কার্য্যে সমান যোগ না থাকিলেও যাবতীয় ব্যয় ভার বহনে তাহাদিগকেই বাধা হইতে হয়। অন্যথা পার্শ্বচর সহচরদিগের নিকটে উচ্চমুখ থাকে না। ...উল্লিখিতরূপ বজায় রাখিতে ও অপরাপর [ অস্পষ্ট ] আরও অনুষ্ঠান বৃদ্ধি করিতে [ অস্পষ্ট ] উঠে। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়ে ঐ সকল [ অস্পষ্ট ] ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। [ অস্পষ্ট ] কেন গোপনীয় নির্দিষ্ট আয় [ অস্পষ্ট ] অল্পকাল মধ্যেই তাহা অপ্রচুর [ অস্পষ্ট ] উপলব্ধি হয়, অথবা পার্শ্বচরেরা [ অস্পষ্ট ] বোধ জন্মাইয়া দেয়। তখন চতুর পার্শ্বচরেরা [ অস্পষ্ট ] মহাজনদিগের নিকটে গমন [ অস্পষ্ট ] সেই অল্প বয়স্ক নির্ব্বোধ ধনি সন্তানদিগের নামে টাকা কর্জ্জ লওয়ার প্রস্তাব [ করে ]। অর্থৈক পরায়ণ মহাজনগণ প্রথম (২) সে প্রস্তাবে কথঞ্চিত অসম্মতি প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তাহা নাবালক ধনি সন্তাননের অবস্থা চিন্তায় নহে, অসম্মতি প্রকাশ করিলেই সুদের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব হইবে, ইহাই তাহার সুখ্যাতি প্রায় থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবেও ঐ সহচরেরা অনতিবিলম্বেই উক্ত ধনিসন্তানের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া যাইয়া অত্যুচ্চ সুদে টাকা কর্জ্জ করার দৃঢ়াভিলাষ প্রকাশ করে। মহাজন লোভে পরিয়া সম্মতি দান করিলেই দুর্ব্বত্ত সহচরেরা ধনিসন্তানের নিকটে যাইয়া "হুণ্ডী" লিখিয়া দিয়া টাকা লইতে বলে। "হুণ্ডী" কাহাকে বলে অবোধ ধনিসন্তানের সে জ্ঞান না থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে "দস্তখত" করিয়া দিলেই যত ইচ্ছা টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে, এবং সেই টাকা পাইলেই অভিলাষানুরূপ ব্যয় করা যাইবে, সে জ্ঞান আছে, একে নিত্য [ অস্পষ্ট ] বিলাসের প্রয়োজন, ও সেই প্রয়োজনোপযোগী প্রচুর অর্থের অসদ্ভাব [ অস্পষ্ট ] আবার অদূরেই একব্যক্তি সেই [ অর্থ ] প্রদান করিতে প্রস্তত, এরূপ অবস্থায় [ সরল ] মতি অপরিনামদর্শী ধনী সন্তানদের আর অনভিধতি হওয়ার সম্ভা [ অস্পষ্ট ] অগৌণেই হুণ্ডী লিখিত ও [ অস্পষ্ট ] হইয়া অত্যুচ্চচারে তিন মাসের [ অস্পষ্ট ] কাটিয়া দিয়া টাকা লওয়া [ অস্পষ্ট ] বাহুল্য যে সমজে টাকা পরিশোধের [ অস্পষ্ট ] সম্ভাবনা না থাকিলেও মহাজনদের [ অস্পষ্ট ] বাহ্য সম্মান রক্ষার দায়ে প– [ অভিভাবক ] অবশ্যই টাকা পরিশোধ করিবেন। অথবা ঐ ধনী সন্তানেরাই কোনও সম্মতি ধরিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে। প্রায়ই নির্দিষ্ট সময়ের পরে পুনরায় সুদেমূলে বাড়াইয়া নূতন হুণ্ডী লিখিয়া দেওয়া হয়, অথবা অপর মহাজন হইতে অধিকতর সুদে অধিক পরিমাণ টাকা লইয়া পূর্ব মহাজনের টাকা শোধ দেওয়া হইয়া থাকে। পরিশোধাবশিষ্ট টাকাগুলিও দুই চারিদিনে শেষ হইয়া গেলে আবার টাকার প্রয়োজন পড়ে ধূর্ত সহচরেরা দালাল হইয়া নিয়ত মহাজন অন্বেষণ পূর্ব্বক আবার টাকা লওয়ার প্রস্তাব অবধারণ করে ও অভিলম্বে ধনিসন্তানের তাহা হাত করাইয়া দিয়া নানা দুরভি পূর্ণ করে। মহাজনের প্রাপ্য অত্যুচ্চ সুদে তাহাদিগের "বখরা" আছে

কিনা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিনা, কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইহাদিগের অনেকে অনেক মহাজনেরই বিশেষ আদর পাইয়া থাকে। কারণ তাহারাই তাহাদিগের ধন বৃদ্ধির ও রাতারাতী বড় মানুষ হওয়ার প্রধান উপায়। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এই প্রণালীতে ঢাকার অনেক মহাজন শতকরা ৫, ৭, ৮, ১০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক সুদে হাজারে ২ টাকা লাগাইয়া অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে বেশ বড় মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। নির্বোধ ধনিসন্তানগণের অভিভাবকেরা পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় সহকারে টাকা দিতে নিষেধ করাতেও তাহারা তাহা গ্রাহ্য নাই, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় লইলে বিচারকও কত নিন্দা কত তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের অতিরিক্ত ধন লাভের দুর্ল্লালসা বিনিবৃত্ত হয় নাই। সত্য বটে কেহ নিজের ঘরে আগুন লাগাইয়া ভস্মাবশেষ করিতে ইচ্ছা করিলে থামাইয়া রাখা কঠিন। কিন্তু তাই বলিয়াই অপরের তাহাতে ফুৎকার দেওয়া সঙ্গত কার্য্য নহে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, ঢাকার গুলি দুর্ল্লোভ মহাজনের প্রশ্রয়েই অল্পকাল মধ্যে অনেকগুলি ধনিসন্তান সর্ব্বসান্ত প্রায় হইয়াছে। কোন ২ অর্থগৃধ্নু মহাজনের এত লোভ বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা একবারে কাণ্ডকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতাও না কি আরম্ভ হইয়াছে। অমুক ধনি সন্তানকে ভজাইতে পারিলে অত্যুচ্চ সুদে অধিক টাকা খাটাইতে পারা যাইবে, এই ভাবিয়া জেদাজেদি করিয়া এক একজন ধনি বালককে টাকা ধারাইতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাদিগের মধ্য একজন নাকি ১৩/১৪ বৎসর বয়স্ক একজন বালককেও অম্লান চিত্তে কয়েক সহস্র টাকা ধার দিয়া বসিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস, এই মহাজন উক্ত বালককে টাকা ধার না দিলে তাহাকে আর কোনও ব্যক্তি টাকা যোগাইতেন না, সুতরাং তাহার এই অত্যল্প বয়সে দুষ্প্রবৃত্তি তর্পণে অতমতি গতিও হইতনা। যাহা হউক ঢাকাই ধনিসন্তানদিগের এইরূপ অধঃপতন নিবারণার্থ ঢাকাস্থ সদালয় ব্যক্তিরা অচিরে কোনও রূপ সদুপায় বিধান করেন, এই আমাদিগের বাসনা।

১৪ আগস্ট, ১৮৮৯

## মুড়াপাড়ার বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত মঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্ম

ঢাকার অন্তর্গত মুড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ববঙ্গে কেবল যে একজন প্রধান জমিদার বলিয়াই বিখ্যাত এরূপ নহে ধার্ম্মিকতা, সৎকার্য্য প্রিয়তা ও অজস্র দানশীলতার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বথা সম্মানিত। ঢাকার হিন্দুধর্ম্ম সভা তাহারই বিশেষ যত্ন উৎসাহ ও অর্থবলে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। তাঁহার সার্ব্বক্ষণিক দানে এদেশের অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত ও অনেক দৈন্য দশাপন্ন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত উপকৃত হইতেছে। তদ্বিষয়ক সবিস্তর বিবরণ অদ্যতন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। প্রতাপ বাবু গত ২৯শে পৌষ নিজ বাটীতে মঠ প্রতিষ্ঠা, শিবস্থাপন ও তুলা পুরুষ দান প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত যে সমস্ত ব্যয় সাধ্য ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহারই সবিস্তর বৃত্তান্ত প্রকাশ করা অদ্যকার প্রস্তাবের অভিপ্রেত। বস্তুত প্রতাপ বাবু অতি সমারোহে ও মনের উৎসাহে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মগুলি সমাধান করিয়াছেন।

...এই ক্রিয়া উপলক্ষে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া কলকাতা, কাশী, বাকলা, বিক্রমপুর, ফরিদপুর চন্দ্রপ্রতাপ পার জোয়ার, ঢাকা, মহেশ্বরী, স্বর্ণগ্রাম ও ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও আত্মীয় কুলীন শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতি কুটুম্বগণ

নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে পাথেয় সহিত ১৫৬ টাকা, ভাটাপাড়ায় পাথেয় সহিত ১২৫ টাকা বিদায় দেওয়া হইয়াছে। বিক্রমপুর ও ঢাকার পণ্ডিতদিগকে ২০ টাকা ও চন্দ্রপ্রতাপে ১৬ টাকা সহকারে এবং অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতদিগকে সামাজিক নিয়মানুসারে অপেক্ষাকৃত ন্যুন সহকারে বিদায় করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদিগের যাহার যে পাথেয় ব্যয় পড়িয়াছিল, সমস্তই প্রদান করা গিয়াছে। অধিকন্তু বিদায় সময়ে নবদ্বীপ প্রভৃতির পণ্ডিতদিগকে এক একটি কলস ও বিক্রমপুর প্রভৃতির পণ্ডিতদিগকে এক একখানি থাল দেওয়া হইয়াছে। প্রতাপ বাবুর ইহা কর্ম্ম, অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্ম নহে। এই কার্য্যে কর্ম্মে এইরূপ বিদায় লাভ করিয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বস্তুতই বড় প্রীত হইয়া গিয়াছেন। এ দেশে সাধারণ একটা প্রণালী আছে যে, লোকে মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধে যে হারে বিদায় করিয়া থাকে, কার্য্য কর্ম্মে উহার অর্দ্ধহারে বিদায় করিলেই যথেষ্ট হয়। এত দ্বারা এই কর্ম্ম কিরূপ উচ্চাঙ্গে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে।

এই ক্রিয়ায় বিস্তর রবাহুত ব্রাহ্মণ ও বিস্তর দীন দরিদ্র ব্যক্তি অন্নার্থীও বিদায় প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০০ পনর হাজার হইবে। এই পনর হাজার লোককেই লুচি, কচুরী, অমৃতী, লাড়ু, ছানাবড়া, বুঁদিয়া বরকী, সন্দেশ দধি, ক্ষীর প্রভৃতি উপাদেয় আহারীয় দ্বারা ভোজন করান হইয়াছে। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, অন্নার্থী প্রায় ১৫০০০ পনর হাজার লোকের মধ্যে একটি ব্যক্তিও অপরিতৃপ্ত যায় নাই। এই রূপে তাদৃশ বহু সংখ্যক লোককে বিবিধ পক্কান্ন দ্বারা সমভাবে পরিতৃপ্ত করা সামান্য বুদ্ধিমত্তা বা সামান্য কার্য্য দক্ষতার কর্ম্ম নহে। রবাহুত ব্রাহ্মণ, দুঃখী ও দরিদ্রগণ যে কেবল পক্কান্নেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, এরূপ নহে, আশাতিরিক্ত দান লাভ করিয়াও ততোধিক পরিতুষ্ট হইয়াছে।

অলীক ব্রাহ্মণ দিগকে এক টাকা বৈরাগী বৈষ্ণব প্রভৃতিকে আটআনা করিয়া ও প্রত্যেক শ্রেণীর ইন্দ্রিয় বিকলদিগকে উহার দ্বিগুণ দান করা হইয়াছে। দানের পরে আবার উহাদিগকে চিড়া ও চিনি প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন এই মহতী জনতা তিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুড়াপাড়ার জমিদার বাটীর অতিথি শালায় অন্নগ্রহণ করিয়াছে। ঈদৃশ প্রশংসনীয় ব্যাপার, হিন্দুসমাজে বস্তুতই মনোযোগ সহকারে শ্রবণের বিষয় সন্দেহ নাই।—

এই ক্রিয়ায় প্রায় পনর শত সামাজিক ব্রাহ্মণকে বিবিধ পক্কান্নে ভোজন করাইয়া উহাদের প্রত্যেককে এক একটি গেলাস ও চারি আনা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে। নিমন্ত্রিত কুলীনদিগকে বাটীর নিয়মানুসারে বিদায় ও পাথেয় দেওয়া গিয়াছে।...

আজিকালি হিন্দু সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের অনুমোদিত কার্য্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, অনেকে মাতৃপিত্র শ্রাদ্ধকে গলগ্রহ বোধ করেন। ঈদৃশ দুঃসময়ে যিনি বহুব্যয় স্বীকার করিয়া মনের আগ্রহেত্ত উৎসাহে ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদন ও সমাজে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সন্ধুক্ষণের নিমিত্ত, আপনাকে জাজ্বল্য মান দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শন করেন, কে তাহাকে অগন্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বস্তুত প্রতাপবাবু এই ক্রিয়ায় ধর্ম্মভাবে যেরূপ, মাতৃভক্তি প্রভৃতিতেও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া আর এক বিষয়েও দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছেন...।

১৯ জানুয়ারি, ১৮৯০

## মাতালের মাথায় বাড়ি

বোধ হয়, বাঙ্গালার খোলাভাটিগুলি বা উঠিয়া যায়। আমাদের ক্রন্দনে, পাদরি সাহেবদের আন্দোলনে, মি. কেন, মি. স্মিথ প্রভৃতি পার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণের চেষ্টায়, ভারত গবর্ণমেন্ট মদ্যস্রোত মন্দীভূত করণার্থ সম্মত হইয়াছেন। কাজেই তাহার অধীন বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টকেও তাহার অভিপ্রায়ের অনুকূল হইতে হইয়াছে। ইডেন সাহেব[২৫] বাঙ্গালার যে অনিষ্ট সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন। উদার হৃদয় সারষ্টুয়ার্টেকে[২৬] তাহা রহিত করিতেই হইবে। এই সুযোগে তাহার প্রতি আমরা যে ভরসা রাখি এবং তাহারই উপযুক্ত মন্ত্রী সারজন এডগার মহোদয়কে আমরা যেরূপ ভক্তি করি তদনুরূপ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেই হইবে। এরূপ মহত্ত্ব প্রকাশে গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আমাদের নাই। মাজিস্ট্রেট আর সি দত্ত[২৭] পাশ্চাত্য যুক্তি বলে যাহাই কোন প্রবোধ দিউন না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজে মাতালের সংখ্যা বারিবে বই কখনই কমিবে না। শস্তা মদের কাটতি কমিলে শস্তা মাতালদিগের সংখ্যা কমিলেও মাথাল মাথাল মাতালদিগের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। যে দিন চাষা ভুষা রা মহার্ঘতা হেতু মদ ছাড়িবে, সেই দিন শিক্ষিত মহাশয়েরা মদ্যপানকে গৌরবের বিষয়ভূত করিয়া লইবেন।

যাহাদের মদ খাওয়ার অভ্যাস হইয়াছে, এবং যাহারা মদ্যপানকে ঐরূপ গৌরবের বিষয় মনে করিবে, তাহাদের নিকট মদ্যের মূল্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ বৃদ্ধি পাইলেও তাহারা মদ খাওয়া ছাড়িবে না। অতএব যদি খোলা ভাটির শস্তা মদ উঠিয়া যায়, সদয় ভাটির মধ্যে দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য নির্দ্দেশ হয় আর আমদানী মদিরায় মাশুলের হার অত্যন্ত চড়াইয়া দেওয়া হয়। তবে গবর্ণমেন্টের বিশেষ লাভই দাড়াইবে ; সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রধান অবলম্বন শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে মদিরার বিস্তীর্ণ গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করা হইবে। মাতালের সংখ্যা কমিবে, কিন্তু গবর্ণমেন্টের আয় বাড়িবে। যে মাতাল সাজিয়াছে,—সে কখনই পার্য্যমানে মাতলামি ছাড়িবে না। মাদক দ্রব্যের দাম চতুর্গুণ বাড়িলেও তাহা খাইবে। ১০/১৫ দিন ভাত না খাইলে চলে, কিন্তু মদ্য ছাড়িয়া একদিনও চলে না। মাদক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করিলে যে, গবর্ণমেন্টের আয় কমিবে না, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। ১২ বৎসর পূর্ব্বে গাঁজার যে মূল্য ছিল এখন তাহার ৫/৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধিতে গাঁজাখোরের সংখ্যা বিস্তর কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্টের গাঁজার আয় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ১৮৭৬/৭৭ সালে গাঁজার মাশুল ১১৯১১৬ টাকায় দাড়াইয়াছিল, ১২ বৎসর পরে ১৮৮৮/৮৯ সালে দাড়াইয়াছে ২৩১৮৩৫৩ টাকা। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে ১২ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে ৬ মণ গাঁজা বিক্রয় হইত, এখন সেখানে প্রায় ২ মণ গাঁজা বিক্রয় হয়, অথবা পূর্ব্বে যেখানে ৬০০ শত লোকে গাঁজা খাইত এখন সেখানে ২ শত লোকে মাত্র গাঁজা খায়, অথচ গবর্ণমেন্টের প্রায় দ্বিগুণ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল বঙ্গে কোন প্রকাশ মাদক দ্রব্যের কতদূর আয় বৃদ্ধি বা ঘাটতি হইয়াছে, তাহার একটা নির্ঘন্ট নিম্নে দিলাম।

| মাদকের নাম | ১৮৭৫–৭৬ সাল | ১৮৮৮/৮৯ |
|---|---|---|
| দেশীয় সরাব | ২৫১০০৬৪ | ৫০৯০৩১৫ |
| রস ,, | ৩৩৩৮৭৫ | ৭২৮৫১ |
| ব্র্যাণ্ডি ও বিদেশীয়মদ | ৯১০৭৮ | ২১১৪৫৩ |

| | | |
|---|---|---|
| তাড়ি ,, | ৬০৭১৭২ | ৭৮৮৯০১ |
| পচওয়াই ,, | ১০৬৫৭২ | ২১৫১৯১ |
| চরস | ২৫৯৩ | ২৭৫৫ |
| ভাঙ্গ | ১১৯৪৬ | ৪২৬৭১ |
| মজুম | ২২৬১ | ২০৯২ |
| মদত | ৬২৪১০ | ৮৫৭৫৩ |
| চণ্ডু | ১৯৩৬ | ৩৬২৫৪ |
| শিল্পের জন্য স্পিরিট | ৩৫৬৩ | ১১৯ |
| গাঁজা | ১১২০৩৪৯ | ২৩১৮৩৫৫ |
| অহিফেন | ১২১৫৫৬৪ | ২০০৮১৩৪ |
| নানাবিধ | ২০৭ | ৪১৩১ |
| টাকা | ৬০৮৬৯১৯ | ১০৮৮৮৯৭৩ |

পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতাল বাড়িয়াছে। ১২ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার কলেজ ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে প্রায় ১৭২ হাজার ছাত্র পড়িত, গতবার ২১৪ হাজার ছাত্র পড়িয়াছে। যে হউক দেশীয় সরাপী ডবলের উপর বাড়িয়াছে। রসের রমনীয়তা ফিরিঙ্গী ভায়াদের নিকট একটু কমিলেও ব্র্যাণ্ডি সেবি, শ্যাম্পেন প্রভৃতি বিদেশীয় মদ্যের আদর উচ্চ শিক্ষিতদিগের ন্যায় প্রায় সোয়া দুই গুণে বাড়িয়াছে। তাড়ির তার বড় অধিক লোকে বুঝে নাই, কিন্তু পচওয়াই দ্বিগুণ লোকের মন মজাইয়াছে। চরসে কিঞ্চিৎ অধিক লোককে বসিয়া থাকিলেও ভাঙ্গে চতুর্গুণ লোককে টঙ্গ করিয়াছে। মজুমদার মহাশয়ের কিছু অবনতি দেখা যায়। কিন্তু মদতী আদতের উপরে সেওয়া পাঁচ আনা বাড়িয়াছে। চণ্ডুখোরের দ্বিগুণ উন্নতি কাজেই শিল্পীগণ তল্পী বান্ধিয়া প্রস্থান করিতেছে। গাঁজাখোরের পাঞ্জা দ্বিগুণের অধিক বাড়িয়াছে। অহিফেনের মৌতাতীও কাহারও নিকট হার মানে নাই। নানাবিধ বিংশবিধে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ভাগ্য সকল দিকেই সুসম্পন্ন সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা প্রায় তৈয়ার আর কি?

যে হউক এখন মাননীয় সার্‌জন এডগারের মন্ত্রণাগুনে মহামান্য সার ষ্টুয়াট বেলী মহোদয়ের কর্তৃত্বে খোলাভাটি এককালে তুলিয়া দিয়া সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের মাশুল সংবর্দ্ধিত হইলে আমরা নিতান্ত সুখী হইব। যদিও খোলাভাটি বন্ধ হইলে বিদেশীয় মদিরার কাটতি অধিক হইবার আশঙ্কা আছে; কিন্তু গবর্ণমেন্ট যদি সদর ভাটির সুরার মূল্য অপেক্ষা বিদেশীয় সুরার মাশুল চড়াইয়া রাখেন, তবে ততদূর অশিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

৩০ মার্চ, ১৮৯০

## ঢাকায় ধর্ম্মমন্দির

যে ধর্ম্ম স্বয়ং ভগবানের উপদিষ্ট; যাহা পরম যোগীগণের শত সহস্র বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার ফল; যাহার জন্য সাম্রাজ্যাধিপতিগণও অনায়াসে বিষয় ভোগ তুচ্ছ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গলিত পত্রাদি ভক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেয়োবোধ করিতেন; যে সারবান্ ধর্ম্মকে বিনাশ জন্য কত শত দৈত্য রাক্ষস সমুদ্যত হইয়াও কিছু করিতে পারে

নাই ; যাহা অনন্তকাল হইলে অনন্ত লোকের সদগতির একমাত্র নিদান স্বরূপে বিরাজমান, সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিদিগের ভবিষ্যৎবাদিতা সাফল্য করিবার জন্যই যেন এই কলিকালে সেই ধর্ম্মে লোক সমূহ আস্থাহীন হইয়া নানা অসৎপথে বিচরণ করিতেছে। মহাকাল পুরুষ মহাপ্রলয়ের হেতুভূত পাপরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য জীবসমূহকে নিয়তই পাপের দিকে নানা প্রলোভন দ্বারা টানিতেছে, তাহারই কৌশলে সামান্য বদ্ধি আধুনিক মানবের আপাত মনোমুগ্ধকর মত সমহদ্বারা ভ্রান্ত মান সমূহ পারলৌকিক বহু কষ্টের নিদান অসৎপথের পন্থী হইতেছে, জন্মজন্মান্তরীণ অশেষ কল্যাণের হেতুভূত হিন্দুর অবিনশ্বর ধর্ম্ম দুর্ভাগ্য মানবদিগকে অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিতেছে ; ধর্ম্ম সম্বন্ধে শোচনীয় দশা উপস্থিত। এই কঠিন সময়ে উপায় না করিলে কেবল যে ভবিষ্যৎ বংশের অপকার হইবে, তাহা নহে ; যদি পুণ্যবলে পুনরায় মানব জন্ম লাভের আশা কাহারও থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে পরজন্মে তাঁহারও বাধ্য হইয়াই অসৎধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা অসৎগতি লাভ করিতে হইবে। অতএব যাহাতে এ ধর্ম্ম রক্ষা পায়, তাহার উপায় করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

বলা বাহুল্য যে, সদুপদেষ্টবর্গের শাস্ত্রার্থ প্রচার ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ধর্ম্মজ্ঞান লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সদুপদেষ্টার পরিমাণ অতি অল্প, প্রত্যেক গৃহে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে, অতএব সর্ব্বসাধারণের জন্য এক একটি নির্দিষ্ট স্থান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী এই ঢাকা-নগরীতে এমন একটি স্থান নাই, যাহা ঐ উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে সাধারণের সুবিধাজনক। কোন সাধু মহাপুরুষ আগমন করিলে, তাঁহারও আতিথ্য সৎকারের একটি সর্ব্বজন পরিচিত স্থান হয় না। বারোয়ারীর দেবার্চ্চনা মহোৎসবাদি করিতে হইলে স্থানাভাবেই তাহা ঘটেন। অবশ্য ঢাকাতে এমন শত শত মহৎ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহোপযুক্ত স্থান দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন ; কিন্তু সেরূপ ব্যক্তিগত অনুগ্রহের প্রার্থনায় সাধারণ ভদ্রলোকদিগের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আর একটী গুরুতর অসুবিধা। মোকদ্দমাদি নানা কারণে অনেককে ঢাকায় আসিতে হয়, কিন্তু অনেকেই স্থানাভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হয়। অতিথি অভ্যাগতের হিন্দুর অন্যতম কর্ত্তব্য। সাধ্যানুসারে তাহা না করিলে পাপ আছে। কিন্তু ঢাকাবাসী এই পাপে চিরকাঙ্ক্ষিত। পূর্ব্ববঙ্গের শীর্ষস্থান ঢাকার এ কলঙ্কে পূর্ব্ববঙ্গবাসী মাত্রেই সম্পর্কিত এবং সময় সময় অসুবিধাগ্রস্ত। এই সকল কলঙ্ক, অসুবিধা ও ধর্ম্ম কার্য্যের অন্তরায় সমূহ নিরাকরণ জন্য ঢাকায় একটি ধর্ম্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করা স্থির হইয়াছে। এই মহৎকার্য্যে ঢাকার অধিকাংশ গণ্যমান্য লোক সমুৎসাহী হইয়াছেন। সত্বরেই অনুষ্ঠান পত্রপ্রচার হইবে তাহাতেই পাঠক দেখিবেন যাঁহারা একার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পদ মর্যাদা এই কার্য্য সম্পাদনের বিশেষ অনুকূল। এই কার্য্যে প্রায় পঁচিশ সহস্র টাকার প্রয়োজন। শুনিতে যদিও অধিক বোধহয়, তথাপি ইহা হিন্দুসমাজের পক্ষে অতি সামান্য। পূর্ব্ববঙ্গেই এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের একজন ইচ্ছা করিলে এ অশেষ পুণ্যের নিদান অসাধারণ প্রতিষ্ঠার কার্য্যে সমস্ত ব্যয় প্রদান করিতে সমর্থ। কিন্তু যে পর্যন্ত তেমন কোন মহাত্মা আমাদিগের আশা ফলবতী না করিতেছেন, ততকাল হিন্দুমাত্রকেই আমরা অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তৎপক্ষে সকলেই মনে প্রাণে যত্নবান হউক।

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯১

[ ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান ]

ঢাকাতে হিন্দু সাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য উপযুক্ত স্থান নাই। ঢাকেশ্বরীর বাড়ি সহরের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অগম্য। অধিকাংশ লোকের সুবিধাজনক একটিও স্থান কেন নাই, তাহার উত্তর সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত। ঢাকায় বাসিন্দা ভদ্রলোক কেহ নাই। যাঁহাদিগকে ভদ্রলোক না বলিলে হয় ত রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইবেন, এমন মৌখিক ভদ্র হয় ত ঘরে ঘরেই আছে। এই ভদ্র মহাশয়দিগের কার্য্যে শৌণ্ডকের শ্রীবৃদ্ধি, বেশ্যার বাড়ী হর্ম্ম নিকতন, আর বিড়াল কুত্তার বিবাহে লাক টাকা ব্যয় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যাহা করিলে সাধারণের ধর্ম্মলাভ হয়, যদ্দ্বারা ধার্ম্মিক সমাজে চিরস্মরণীয় হওয়া যায়, এমন কার্য্য একটিও দেখিবার উপায় নাই। এই স্থানে এই ৫/৭ শত বৎসর মধ্যে কত সহস্র বড়লোক জন্মিয়াছে, কিন্তু তিন পুরুষ পরে যে, লোকে নাম করিবে, এমন কার কি কীর্ত্তি আছে? যেমন লক্ষ লক্ষ নির্ধন এই ভূমিতে মিশিয়া গিয়াছে, তদ্রূপে সেই অগণিত ধনের ভাণ্ডারিগণও এই মাটিতে অচিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে ; সে প্রচুর অর্থের স্বার্থকতা কি এই? অবশ্য বিদেশ হইতে ভিখাই রাম ঠাকুর আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায় কয়পুরুষ আপনার নাম রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। জন্মাষ্টমীর জন্য রাম সরদার ও কৃষ্ণচন্দ্র সরদারের নামও কিছুদিন থাকিবে, বোধ হইতেছে ; কিন্তু সমস্ত ঢাকাবাসীর পক্ষে ইহাই কি প্রচুর? যাহারা বেশ্যার জন্য বৃথা জেদ বা শক মিটাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারে, তাহারা ১৫/২০ হাজার টাকা ব্যয় বা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া কি সাধারণ ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য একটা বাড়ী করিয়া দিতে পারে না? দেখিতেছি, যেমন মুক্তাগাছার প্রাতঃস্মরণীয় লক্ষীদেব্যা দ্বারা ময়মনসিংহের দুর্গাবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ময়মনসিংহের গৌরব রক্ষা পাইতেছে তদ্রূপ অন্য স্থানের কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি দ্বারা ঢাকায় এইরূপ ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে ঢাকাবাসীর নাম রক্ষা পাইবে। সম্প্রতি আমাদিগকে কোন মহাশয় জনাইয়াছে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে দশ সমস্র টাকা হইবে, তাহা সমস্ত দ্বারা এই ধর্ম্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তিনি অকাতরে অবিলম্বে তাহা দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু এই কার্য্য দশ হাজার টাকায় নির্ব্বাহ হওয়া সন্দেহ স্থল ; ধর্ম্ম সভার বিবেচনায় এ জন্য প্রায় বিশ সহস্র টাকা লাগিবে। অতএব তাঁহার দশ সহস্র টাকা গ্রহণ করিলে তৎসহ অন্যান্য ব্যক্তি হইতে বাকী টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, সুতরাং কেবল তাঁহার নামে ঐ ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা সঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, এমন একটি কার্য্যের জন্য—যাহার ফল ঢাকার ১২০০ অধিবাসী নিত্য ভোগ করিবে, এবং ঢাকায় আগন্তুক অন্যান্য স্থানের লক্ষ লক্ষ লোক উপকৃত হইবে, এমন ধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা আপনার নাম চিবস্মরণীয় করিতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় স্বীকার করা অনেকেই শ্লাঘ্য মনে করিবেন। আমরা আশা করি, এই মহৎ কার্য্যে যাঁহারা সমুৎসুক তাঁহারা অচিরে আমাদিগকে পত্র দ্বারা জানাইয়া বাধিত করিবেন। তাঁহারা অত্রত্য ধর্ম্মসভার হস্তেই টাকা দিউন—অথবা নিজ লোক দ্বারা উপযুক্ত স্থলে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করুন। উভয় প্রকারেই এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। যে সভা বিক্রমপুরস্থ কুলীন সমাজের প্রধান ব্যক্তি নবাব সরকারের দেওয়ান বাবু চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও ভাওয়াল রাজমন্ত্রী বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ[১৮] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে ঐ জন্য অর্থ প্রদানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

৩১ জানুয়ারি, ১৮৯২

## লোকসংখ্যায় হিন্দুধর্ম্মের পরীক্ষা

গতবার ভারতের সমস্ত লোকসংখ্যার তালিকা হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হিন্দুর ধর্ম্মের মহিমায় হিন্দুর ন্যায় দীর্ঘজীবী অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতে নাই। খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি যেমন অপরিণত বয়সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, হিন্দুর অবস্থা তদ্রূপ হইলে যাইট বৎসর ও তদধিক বয়স্ক এখন যত হিন্দু পরিলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ২০৫০১৭৮ জনকে যাইট বৎসরের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। এখন দেখা যাউক, এতদপেক্ষা অল্প বয়সেই বা কত লোককে খৃষ্টানাদি ধর্ম্মের জন্য অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। ভারতে উনচল্লিশ বৎসরাপেক্ষা অধিক এবং যাইট বৎসরাপেক্ষা কম যত লোক আছে তাহার মধ্যে

| | |
|---|---|
| হিন্দু | ৩৩৫২৯৩৮১ জন। |
| মুসলমান | ৮২১৬৪২৯ জন। |
| খৃষ্টান | ৩২৬৮০৯ জন। |

পূর্ব্ববারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মোট হিন্দুর পরিমাণ মুসলমান অপেক্ষা—৩.৬২ গুণ ও খৃষ্টান অপেক্ষা ৯১ গুণ। বস্তুত খৃষ্টান অপেক্ষা পুরা একানব্বই গুণও নহে, ৯০.৯১৭ গুণ। অর্থাৎ নব্বই গুণ ও এককে এক সহস্র ভাগ করিয়া তাহার ৮৩ ভাগ বাদে যত গুণ হয় তত গুণ। গণনার সুবিধার জন্য এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরা হয় নাই। উপরে যে বয়সের হিন্দুর সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, সেই বয়সের মুসলমানের সংখ্যাকে ৩.৬২ দ্বারা গুণ করিলে, এবং সেই বয়সের খৃষ্টান সংখ্যাকে ৯০.৯১৭ দ্বারা গুণ করিলে যাহা হয়, তাহাই স্বভাবতঃ হিন্দুর সংখ্যা হওয়া উচিত। তদনুসারে ঐ বয়সের মুসলমান সমষ্টি ৮২১৬৪২৯ কে ৩.৬১ দ্বারা পূরণ করিলে ২৯৭৮৪৫৫৪ জন হয়, এবং ঐ বয়সের খৃষ্টান সমষ্টি ৩২৬৮০৯ কে ৯০.৯১৭ দ্বারা পূরণ করিলে ২৯৭১৯১৯৪ হয়। এখন হিসাব করিয়া দেখুন, মুসলমান ধর্ম্মের সদৃশ হইলে হিন্দুর সংখ্যা যত হইত, ঐ বয়সের হিন্দুর সংখ্যা তদপেক্ষা ৩৭৪৪৮২৭ টি অধিক, এবং খৃষ্টানের সমধর্ম্মী হইলে যত হইত, ঐ বয়সের হিন্দুর সংখ্যা তদপেক্ষা ৩৮১০১৮৭ জন অধিক।

উনষাটি অপেক্ষা অধিক বয়স্ক যে লোক সংখ্যার হিসাব গতবার দিয়াছি, তাহাতে শুধু হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় অতিরিক্ত দীর্ঘজীবী ১০৩০৬৬১ জনকে ঐ ৩৭৪৪৮২৭ সহযোগ করিলে যে ৪৭৭৫৪৮৮ জন হয়, তাহারা মুসলমান অপেক্ষা এবং গতবারে উল্লিখিত ২০৫০১৭৮ জনকে ৩৮১০১৮৭ সঙ্গে যোগ করিলে যে ৫৮৬০৩৬৫ জন হয়, তাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় হিন্দু-মুসলমান হইলে ঐ অতিরিক্ত দীর্ঘজীবী ৪৭৭৫৪৮৮ জন হিন্দুকে চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই মরিতে হইত, এবং সমস্ত হিন্দু খৃষ্টান হইলে ৫৮৬০৩৬৫ জন ঐ অতিরিক্ত দীর্ঘজীবী হিন্দুকে ঐ চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কাঁচা বয়সে স্ত্রীপুত্র ধন জন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইতে হইত। এতগুলি মহাপ্রাণী, যাহারা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে, যুগপৎ সমস্ত ইউরোপীয় সম্রাট মণ্ডলীকে পরাভব করিতে পারে, খৃষ্টানাদি ধর্ম্মের মহিমায় সেই ততগুলি লোককে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইত।

উল্লিখিত তুলনায় দেখা যাইতেছে, ভারতে খৃষ্টান অপেক্ষা মুসলমানের অবস্থাও অনেক শ্রেষ্ঠ, খৃষ্টান অপেক্ষা মুসলমানও অধিক দীর্ঘজীবী। এরূপ দীর্ঘজীবিতার কারণ খাটি মুসলমান

ধর্ম্ম, কিংবা মুসলমানের হিন্দুর ন্যায় আচার ব্যবহার, তাহা ঠিক করা কঠিন। ভারতীয় মুসলমানের অধিকাংশ ব্যক্তি গোভক্ষণ করে না ; ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি করে ; এবং হিন্দুর অনেক আচারই প্রতিপালন করে ; ইহা দীর্ঘজীবিতার কারণ কিনা, পাঠক তাহা নির্দেশ করুন। বস্তুত ভারতের মুসলমান জাতি যে খৃষ্টান অপেক্ষা ধার্ম্মিক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে বয়সে পাপ কি পুণ্য কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং নিজের পাপ পুণ্যের ফলানুসারে মৃত্যু বা জীবন নির্ভর করে না, সেই শিশু বয়সে হিন্দু ও মুসলমানের মৃত্যু অত্যন্ত অধিক। এতদৃষ্টে রাজ ক্ষমতার অনুবলে খৃষ্টান ও তদীয় শিষ্য আমাদের সংস্কারক ভায়ারা বড়ই আস্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় এই অল্প বয়সে মৃত্যুর কারণ বাল্য বিবাহ। বড় জোর ১৫/২০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা যদি যৌবন বিবাহের ফল হয়, তবে তেমন ফল নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। বাল্যবিবাহ শৈশব মৃত্যুর কারণ হইলে দীর্ঘজীবিতারও কারণ—এমন বিরুদ্ধ অনুভূতি কদাপি বুদ্ধিমানের হওয়া সঙ্গত নহে। পুরুষের পক্ষে বাল্যবিবাহ যে অনুচিত এবং হয় ত তাহাই শৈশব মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তাহা আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু, স্ত্রীর বাল্যবিবাহই যে তাহার নিজের পক্ষে এবং সন্তানের পক্ষে উপকারী, তাহা আমরা লোকসংখ্যার রিপোর্ট হইতেই আগামীতে পরিষ্কার রূপে প্রতিপন্ন করিব। ঐ রিপোর্টের বিবাহ বিষয়ক আলোচনায় এত রহস্যের ভেদ হইবে, যাহা দেখিয়া নব্য ভায়াদিগকে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইতে হইবে।

বাল্যকালে যখন ইহজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ নাই, তখন হিন্দুর শৈশব মৃত্যুর কারণ—অবস্থার হীনতা। গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুগ্রহে, খৃষ্টানেরা বিশেষ স্বচ্ছল। তাহাদের জন্য কার্য্যে প্রায় অবারিত দ্বার, বিশেষ দাতব্য ভাণ্ডার, প্রভৃতি যাহা রহিয়াছে, তাহাতে তাহারা কখনও এমন কষ্টে পড়িতে পারে না, যাহাতে তাহারা গ্রাম্য হীনাবস্থ হিন্দুর ন্যায় আহার ঔষুধাদি অভাবে কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুর অবস্থা এমনই হীন যে শিশুর উপযুক্ত আহার ও ঔষুধাদি তাহাদের দ্বারা সংগ্রহ হইতে পারে না বলিয়া বাল্যবস্থাতেই অধিকাংশ হিন্দুর মৃত্যু ঘটে। বাপের হাজার পুন্য বল থাকিলেও বালক অনাহারে বাঁচিতে পারে না, অতএব তাহাদের মৃত্যু আধিক্যের কারণ কখনই হিন্দু ধর্ম্ম নহে। অনাহারে, অচিকিৎসায় হিন্দু বংশের ক্ষয় হইতেছে ; অতএব হে খৃষ্টান ও খৃষ্টানের শিষ্য মণ্ডলী, দারিদ্র পীড়িত হিন্দুবর্গকে এইরূপে শিশুরক্ষয় অসমর্থ দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মের উপরে দোষারোপ করিও না। রাম রাজ্যে হওয়ার রাজশাসনের দোষই সপ্রমাণ হইয়াছিল। এ কলিকালে আমরা সেই শৈশব মৃত্যুর দোষ রাজশাসনের উপরে দিতেছি না বটে, কিন্তু খৃষ্টানের প্রতি পক্ষপাত দোষে যে খৃষ্টানের তুলনায় হিন্দু বালকের মৃত্যু পরিলক্ষিত হইতে, এ দোষে অন্ততঃ খৃষ্টান রাজা দোষী, ও খৃষ্টানের সমাজ দোষী।

হিন্দুর শৈশব মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে জানা যাইবে, হিন্দু কেবল ধর্ম্ম বলে দীর্ঘজীবী হইতেছে। যে বয়সে কাজ করিবার সময়, যে বয়স হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার সময় সেই সময় উপস্থিত হইলেই হিন্দু স্বধর্ম্ম নির্দিষ্ট কার্য্য পরম্পরা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতেছে, আর খৃষ্টান

প্রভৃতি সম্প্রদায় ঐ সময়ে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মসমূহ করিয়া অল্পকালেই কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহা দেখিয়াও কি লোকের চক্ষু ফুটিবে না?

৯ জুলাই, ১৮৯৩

## পাদরি পোষণ

গবর্ণমেন্ট যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা শত অন্যায় হইলেও কোনক্রমে তাহাতে ক্ষান্ত হইবেন না। গবর্ণমেন্টের অর্থে খৃষ্টান পাদরিদিগের পোষণ যে গুরুতর অন্যায় কার্য্য, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে আমরা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছি। ভারত-গবর্ণমেন্টের টাকা হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির উপকার জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয়। অথচ সেই টাকা খৃষ্টানের উপকারার্থ ব্যয় করা হইতেছে; তদ্বারা হিন্দু-মুসলমানাদি জাতিসমূহের ভয়ানক অনিষ্ট করা হইতেছে।

যে সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান নাই, তাহাদের জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে ধর্ম্মপ্রচার করা অতি আবশ্যক। যৎকালেই ইংলণ্ডাদি দেশে সাধারণে ধর্ম্মের মহিমা বুঝিত না; যাহা মনে হইত, তাহাই করিত, তদ্বারা সমাজের ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও রাজার সর্ব্বদা আশঙ্কা সমুৎপন্ন হইত, তৎকালে রাজার অর্থে সমাপণের ধর্ম্মভাব আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু এখন যাহারা সভ্যতাভিমানিনী, সুতরাং "তাহারা বুঝে না" ইহা বলিলে যাহাদের সভ্যতার উপরে ঘোরতর আঘাত করা হয়, তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার জন্য পাদরি পোষণ করার শুধু টাকাটি জলে ফেলান হয় না, যাহাদের জন্য পাদরি পোষণ, তাহাদিগকে অধার্ম্মিক বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা হয়। কয়জন বা ইংরাজ এদেশে আসিয়াছেন; যদি তাহারাই এমন অধার্ম্মিক হন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব জন্মাইবার জন্য পরের টাকা দরকারী, তবে ত বড় নিন্দার কথা। এমন সকল অধার্ম্মিক লোক কি হিন্দু-মুসলমানের শাসনকর্ত্তা? এই দুর্নাম দূর করিবার জন্যই হয়ত প্রধান মন্ত্রী গলদস্তন [ গ্লাডস্টোন ] সাহেব যত্নপর হইয়াছেন। যেখানে শুধু খৃষ্টানের পালা খৃষ্টানের অর্থেই খৃষ্টানের ধর্ম্ম শিখান হয়, সেখানেই তিনি সরকারি পাদরি পোষণ অন্যায় বলিয়া তাহা রহিতের চেষ্টা করিতেছেন। নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিকপ্রবর পাদরি মহাশয়গণ এই স্বার্থে আঘাত লাগিতেছে দেখিয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন। এখন মিঃ গলদস্তন সাহেব পরাস্ত হন কি পাদরি মহাশয়গণ পরাস্ত হন দেখা যাইবে।

বিলাতে খৃষ্টানের টাকায় খৃষ্টানের বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও যখন প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত আপত্তি করিতেছেন, তখন এদেশে পরের টাকায় পরের ধর্ম্ম পোষণ যে গুরুতর আপত্তিজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডাদি দেশে যে খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারে কোন সময়ে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল, এবং পাদরিদিগের যত্নে এখনও যে হইতেছে, তদ্বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি না। বরং ইহা বলিতে পারি, নব নব বিজ্ঞান ও দর্শন প্রচারের মহিমায় ইউরোপীয় ধর্ম্মভাবের আমূল বিনাশ হইলেও কেবল পাদরিদিগের প্রচার মহিমায় অশিক্ষিত ও অচিন্তাশীল লোকদিগের মধ্যে অদ্যাপি ধর্ম্মভাব অনেকাংশ তিষ্ঠিতেছে। কিন্তু এদেশে পাদরিদিগের ধর্ম্মপ্রচারে যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা পূর্ব্বাপর বিবেচক ব্যক্তিকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানাদি ধর্ম্মের অযৌক্তিকতা আরোপ পূর্ব্বক খৃষ্ট ধর্ম্মের যুক্তি ও প্রমাণ বিরুদ্ধ মহিমা প্রচারে লোক সমূহ কেবল ইহাই বুঝিতে পারিতেছে যে

"ধর্ম্মমাত্রই জুয়াচোরের কার্দ্দানি ইহা না মানিলে কোনই ক্ষতি নাই।" তবে অনেকে খৃষ্টান গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ প্রাপ্তি, মেম বিবাহ, সাহেব সমাজে প্রতিপত্তি, ইচ্ছানুরূপ ভোজন, পাদরিদিগের সাহায্যে দুর্ভিক্ষাদি হইতে রক্ষা, প্রবল শত্রু হইতে পরিত্রান, ও নীচ জাতীয়তা মূলক অসম্মানের পরিবর্তে সম্মান লাভের আশায়, যে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক খৃষ্টান নাহে পরিচিত হয়, তাহা স্বতন্ত্র কথা। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারে এদেশের রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক যে বহু প্রকার অনিষ্ট হইতেছে, তাহা গবর্ণমেন্টকে ঠেকিয়া বুঝিতে হইবে। খৃষ্টানের প্রচারিত সাম্যনীতির নিকটে যে দিন গবর্ণমেন্টকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, সেই দিন তিনি বুঝিবেন, কিন্তু এখন যে, ধর্ম্মভাব লোক হওয়াবশত এ দেশে মিথ্যা মোকাদ্দমা, মিথ্যা সাক্ষী, অবিশ্বাস, মদ্যাশক্তি, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রবণতা, বৃদ্ধি এবং জলাশয় খনন ও অতিথিশালা স্থাপনাদি সৎকার্য্যের অভাব ও অন্য নানাকারণে এ দেশবাসী উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে, তাহা দেখিয়া গবর্ণমেন্টের কখনই চৈতন্য হইবে না।

হিন্দু মুসলমানদিগের অর্থে তাহাদের এইরূপ সর্ব্বনাশকর পাদরি পোষণ করিয়া গবর্ণমেন্ট ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। অধিকন্তু আরও একটা জ্ঞানকৃত মহাপাপে পতিত হইতেছেন। ইংরাজগণ যে ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়ার প্রতি অসাধারণ ভক্তি লোকসমক্ষে প্রদর্শন করেন, হিন্দু মুসলমানের অর্থে পাদরি পোষণ করিয়া সেই মহামান্য ভারতেশ্বরীর আদেশ ও প্রতিজ্ঞাকে অমান্য করা হইতেছে। ভারতেশ্বরী যে জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র খৃষ্টানের ধর্ম্ম প্রচার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা বাক্যকেও লঙ্ঘন করা হইতেছে। দোহাই মহারানী, একবার দেখুন, ভারতীয় গবর্ণমেন্ট আপনার কেমন অনুগত?

২৮ মে, ১৮৯৩

## শিক্ষিতার আক্ষেপ

এ পোড়া দেশের লোকে কত কথা কয়রে,
আমা হেন নারীদেহে এত কথা সয়রে!
শিখিয়াছি ইংরাজ শিখে যাহা পুরুষেরা,—
বিরাজিতে মম নিয়ত আসে তাহারা।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিল বকে বকে ঠকে ঠকে,
সব স্থানে হেনরীতি না বুঝে এ পোড়া লোকে,
শয়নে কাহারো সহ লোকে কত কথা বলে,
না করে বিচার কিছু গায়ের জোরেতে ঠেলে।
ছোট ভাই সহ কিবা শোয়না এদেশী নারী?
নাহি বুঝে ভ্রাতৃভাবে বিরাজে কত মাধুরী।
যদি বল "ছোট ভাই কেমনে তাহারা হয়",
ভাঙ্গিবে মনের ভুল শুন তার পরিচয়।
পুরুষের সব গুণ করিয়াছি অধিকার;
বিশেষত নারীগুণে করিয়াছি অলঙ্কার।

পুরুষের গুণে যারা হয় শুধু বিভুষিত,
নাহি হয় গর্ভবান না জানে জন্মাতে সুত,
কাজে কাজে মম স্থানে শিশুর সমান তারা।
আমার পশ্চাতে যথা গাভীর পশ্চাতে ভেড়া,
আমি আকাশের চাঁদ তারা ছোট ছোট তারা,
আমি ফুল্ল শত দল তাহারা যুথীর বেড়া।
আমি মুকুটের মনি, মুক্তার ঝালর তারা
মজলিসে ময়ূর আমি তাহারা লোটন পায়রা,
তাহারা শিক্ষানবীশ আমি করি ওস্তাদী
ভাব দেখি, হয় কিনা, তারা শিশু, আমি দিদী?—
একই পিতা সবাকার সকলে ভাই ভগিনী,
অভেদ পুরুষ নারী, কিবা পতি কি রমণী।
এ সব তত্ত্ব জ্ঞানেতে নাহি যার অধিকার,
তারা সবে দেয় মোকে মিছামিছি টিটকার।
হায় হায় হায় কতদিনে এদেশীয় জনগণ,
এ সকল তত্ত্বজ্ঞানে হইবেক বিচক্ষণ।
বিদূষী রমণী হবে এদেশী যত ললনা,
ভ্রাতৃভাবে পুরুষেরে করাইবে ভেড়া পনা।
ভেবে ভেবে সেই কথা কি জানি কি হ'ল পেটে;
অধিক বলিতে নারি হাই উঠে বুক ফেটে।

শ্রীমতী শিক্ষিতা রায়।
১১ নভেম্বর, ১৮৯৪

## শ্রীযুক্ত রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিবাহ

যাহা নিত্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা সংবাদপত্রে আলোচ্য বিষয় নহে। বিবাহ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হইতেছে, কিন্তু ঢাকাপ্রকাশে তাহা লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যকতা আমরা অতি কম অনুভব করিয়াছি। তবে আজি কয়েকটি বিশেষ কারণে এ বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া পারি নাই।

১. রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহাতে বড় জোর ৪/৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু গত ২৬শে ফাল্গুন তাঁহার যে দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে তিনি পঁচিশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছেন। দুইটি প্রধান কুলোদ্ভব-মালখা নগরের বসু ও কুমার ভোগের গুহ বংশীয় সুপাত্রের নিমিত্তই তাঁহার ৮/৯ হাজার টাকা লাগিয়াছে। নিজ পুত্রীর বিবাহ কোন রূপে সারিয়া ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহ এরূপ ব্যয় অন্য কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ২৫ হাজার টাকা খুব বেশি নহে, কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতি অসাধারণ।

২. আমরা যে দুইদিন উপস্থিত থাকিয়া ঐ বিবাহোপলক্ষে মহাভোজ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে বেলা ১০/১১টা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অনবরত কত সহস্র লোক আহার করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে রায় অভয়াচরণকে এক মুহূর্তও বিশ্রাম করিতে দেখি নাই। তিনি অনবরত আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় ঘুরিয়া কাহার কোথায় ক্ষীরের প্রয়োজন, কে কোথায় সন্দেশ পায় নাই. প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া দেখিয়াছেন ও জিজ্ঞাসা করিতেছেন। লুব্ধ লোকেরা এই সুযোগে যদি অভাব জানাইয়াছে, তবেই তাহার আশার অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে, এবং সে তাহা স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত বান্ধিয়া লইয়াছে। সহস্র সহস্র লোককে এরূপভাবে পরিতৃপ্ত করিতে আমরা আর কুত্রাপি দেখি নাই।

৩. মফস্বলে সামান্য আতসবাজী অথবা সঙ্গীতাদির নাম শুনিলে বহুদূর দূরান্তর হইতে লোক সমূহ আসিয়া থাকে, রায় অভয়াচরণের বাড়িতে বিবাহ ঘটার শব্দ শুনিয়া দুপ্রহরের পথ হাটিয়াও যে লোক আসিয়াছে, তাহা আমরা নিজে দেখিয়াছি। লোকে লোকে নদীর তীরভূমি হইতে তদীয় বাটী পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ হইতে নিমন্ত্রিতদিগের সঙ্গে যে ষ্টীমার, বজ্রা, পিনিস প্রভৃতি গিয়াছিল, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের নিমন্ত্রিত ও তামসগিরিদিগের নৌকা সমূহে প্রায় অর্দ্ধ মাইল জলপথ সমাবৃত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিয়া আহার করিতে চাহিয়াছে, সে অনায়াসে আহার পাইয়াছে। প্রার্থীদিগের আহার সমাপ্ত হইবার পরে নৌকায় নৌকায় জনতার মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া আহার করিবার নিমিত্ত সকলকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এরূপভাবে যাচিয়া আহার দেওয়া সহজ কথা নহে।

এইরূপ বহু কারণেই এ বিবাহের কথা উল্লেখ করিতে হইল। রায় অভয়াচরন দিল্লী অথবা কলকাতা হইতে বাই খেমটা আনাইবার নিমিত্ত ব্যয় বাহুল্য করেন নাই ; সাহেবদিগের ভোজেও সহস্র সহস্র টাকা ঢালেন নাই ; ঢাকার সামান্য বাই খেমটা দর্শনার্থী অসংখ্য লোকের স্থানও তাঁহার সুবৃহৎ আঙ্গিনায় দিতে না পারিয়া তিনি হয়ত অনেকের আশা মিটাইতে পারেন নাই ; অতএব এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় কুণ্ঠতা প্রকাশ পাইয়াছে ; কিন্তু তিনি যেভাবে প্রচুর অর্থ ঢালিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। তিনি নাম জাঁকাইবার নিমিত্ত কাশীকাঞ্চী হইতে পণ্ডিত আনেন নাই ; কিন্তু স্বদেশের যতদূরে পণ্ডিত নিমন্ত্রণ হওয়ার নিয়ম আছে, ততদূরের সমস্ত পণ্ডিতকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলের নিমন্ত্রণ জন্য সকল পণ্ডিত উপস্থিত হইতে না পারিলেও নবদ্বীপ, কোন্নগর, পূর্ব্বস্থলী, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণসহ বিক্রমপুরের ১১৭ জন অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ যে অন্য ক্রিয়ার অনুরোধে তাঁহার বাড়িতে না যাইয়াও বিদায় পাইয়াছেন, তাহা আমরা জানি। এই ঢাকা শহরের বড় বড়লোকদিগের নাম ডাকের পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধেও যে ১১৭ জন পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হয় না তাহাও আমরা জানি। এই বিবাহে সমাগত বরিশাল–বানরীপাড়ার বাদ্যকরগণ দর্শকগণকে বড়ই সন্তুষ্ট করিয়াছে। তদ্ভিন্ন বহুরূপী, হরবোলা প্রভৃতি কর্তৃকও অল্প দর্শকের চিত্তরঞ্জন হয় নাই।...

১৭ মার্চ্চ, ১৮৯৫

## খৃষ্টানের বাড়াবাড়ি

স্বভাবত লোকের মন অধর্ম্মের দিকে। ধর্ম্মের অনুরোধে লোকের স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়িতে হয়। লোকে স্বভাবত চুরি করিতে ইচ্ছা করে, পরস্ত্রীভোগের ইচ্ছা করে, পর–পীড়ন করিয়া নিজ ক্ষমতা দেখাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ধর্ম্মের ভয়ে তাহা করিতে পারে না। যদি সেই ধর্ম্মের অস্তিত্বে অথবা দণ্ড পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস জন্মে, তবে ঐ ভয় উড়িয়া যায়। তখন যে কোন পাপ করিতে লোকে প্রবৃত্ত হয়। সামাজিক দুর্নাম ভয়ে ও রাজদণ্ড ভয়ে প্রকাশ্যে তাহারা পাপ করে না বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই তাহারা যে কোন পাপ করিতে পারে।

যে খৃষ্টান ধর্ম্মের অসারতা বুঝিতে পারিয়া খৃষ্টান দেশের শিক্ষিত অধিবাসীরা দিন দিন নাস্তিক হইয়া পড়িতেছে, সর্ব্বদা রাজদ্রোহ ও সমাজদ্রোহ ঘটাইতেছে, সেই খৃষ্টান ধর্ম্মে এদেশবাসীকে ভুলাইবার নিমিত্ত মিশনারী সাহেবেরা ও গবর্ণমেন্টও সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। সেই চেষ্টায় প্রধান সাধন তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার মহিমায় ছাত্রগণ পৈতৃক হিন্দু ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে ; তাহাদের কেহ কেহ প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বনও করিয়াছে। খৃষ্টান রাজ্যে খৃষ্টানের অনেক রকম সুবিধা। সেই সুবিধার প্রলোভনেই কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি খৃষ্টান হইয়াছে ; প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মভাবে কেহ খৃষ্টান হয় না। খৃষ্টানদিগের মধ্যে মামলা মোকাদ্দমা ও ব্যভিচারাদি পাপ কত বেশি, তাহা হিন্দু অধিবাসির সঙ্গে হারাহারিতে তুলনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। কয়েকদিগের জাতির তালিকা দেখিলেও কতকটা বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে যদি ধর্ম্মভাবের জন্য তাহারা স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইত, তবে তাহাদের মধ্যে মামলা মোকাদ্দমা ও পাপের পরিমাণ নিতান্তই কম পরিলক্ষিত হইত। তাহাদের পাপ কার্য্যাদি দেখিয়াই বুদ্ধিমানের মীমাংসা করা উচিত যে, তাহারা ধর্ম্মভাবে খৃষ্টান হয় না। তাহাদের অধিকেই দুরভিসন্ধি চরিতার্থের জন্য খৃষ্টান হয়। অতএব এমন খৃষ্টান ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রচার দ্বারা গবর্ণমেন্ট ও মিশনারীরা দেশে পাপ বৃদ্ধি করিতেছেন, ও ধর্ম্মবিশ্বাস নাশ করিয়া এদেশের এবং ভবিষ্যতের পক্ষে নিজেদেরও সর্ব্বনাশের পথ করিতেছেন। তবে পাদরী সাহেবদিগের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জ্জন ও আধিপত্য বৃদ্ধির অনুরোধে তাঁহারা এ ব্যবসায় ছাড়িতে পারিতেছেন না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছেন।

খৃষ্টান পুরুষেরা এতদিন ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন ; কিন্তু ঐ কার্য্যে যত অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছেন, তাহার ফল আশানুরূপ পান নাই। এমন কি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও একজনকে খৃষ্টান করিতে পারেন নাই। পুরুষ হদ্দ হইলেন, এখন মেয়ে মিশনারীরদল দেশে বিস্তার করিতেছেন। বিলাতের লাল টুকটুকা রমণীদিগকে দেখিয়া এদেশের পুরুষেরা ভুলিবে ; রমণীরা অন্তঃপুরে যাইয়া অশিক্ষিতা রমণীদিগকে শিক্ষা দ্বারা ভুলাইবে, হিন্দু রমণীর পরাধীনতা ও বৈধব্য প্রভৃতি যন্ত্রণার ব্যাখ্যা করিয়া এবং খৃষ্টান রমণীদের নানারূপ সুবিধা দেখাইয়া তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিতে পারিবে, রূপ মোহে মুগ্ধ পুরুষেরা আদর করিয়া মিশনারী রমণীদিগকে স্বগৃহে লইয়া যাইবে ; সুতরাং কার্য্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবে ; এই সকল আশায় মিশনারী বহু খৃষ্টান রমণীকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বরণ করিয়াছেন ও ক্রমেই খুব বেশি পরিমাণ রমণী প্রচারিকা আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমরা

অতিশয় আতঙ্কিত হইয়াছি। বিবি বিবাহের প্রলোভন, বড় ভয়ানক প্রলোভন ; এই প্রলোভন বহু যুবককে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পস্তাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু বিবির সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া এখনও যুবক খৃষ্টান হয় নাই, এইবার বুঝি হয়।

১৭ নভেম্বর, ১৮৯৫

## সংবাদাবলী

গ্রেজুয়েটের দুর্দশা। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, মাণিকগঞ্জের অধীন নবগ্রামের মৃত ডিপুটি বাবু দ্বারকানাথ রায়ের পুত্র ও প্রসিদ্ধ ডিপুটী মৃত পার্ব্বতীচরণ রায়ের জ্ঞাতিপুত্র প্রসিদ্ধ মৃত উকিল বাবু কালীমোহন দাসের নাত্নীজামাতা শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, পাশ করত : অনন্যোপায় হইয়া কিছু ঔষধ ও কয়েকখানা বহি খরিদ করিয়া সম্প্রতি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতেও কুলাইল না। নবগ্রাম চৌকিদারী ইউনিয়নের তৌহশীলকারী পঞ্চায়তের কাজ খালি হওয়াতে সেই কাজ লওয়ার আশায়, স্বয়ং একছার দরখাস্ত করিতে কিছু অপমান বোধ করিয়া গ্রামবাসী একজন লোকের দ্বারা সেই কাজের জন্য মানিকগঞ্জের ডিপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। তৌহশীলকারী পঞ্চায়ত আদায়ী চৌকিদারী টেক্সের শতকরা ১০ দশ টাকা ফিস পাইয়া থাকে। দেশের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা উপস্থিত। ইহার পর পেটের দায়ে বি, এ, পাশ করিয়া যুবকগণ চৌকিদারী ও দফাদারী লইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

৪ঠা জুন, ১৮৯৯

## সংবাদদাতার পত্র

সাহা জাতির ব্রাহ্মণ এবং ভাণ্ডারীদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্যান্য জাতি নিয়াও সেইরূপ গোল। শূদ্রেরাও কায়স্থ লিখাইয়াছে ; আপত্তি কি? এই লিখার জন্য কিছু আদান-প্রদান চলিবে না, কিংবা সম্মানের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। পরাশর দাসকে "মাহিষ্য" লিখা হইয়াছে। ইংরাজি জাতিমালা মতে মাহিষ্য এবং চাষী কৈবর্ত্ত এক জাতি। সকল শ্রেণীর মধ্যেই ভাণ্ডারী আছে। এক্ষণ পদস্থ পরাশর দাস মহাশয়েরা আপত্তি করিলেন "আমরাও মাহিষ্য আর আমাদের ভাণ্ডারীরাও মাহিষ্য ; তবে আর পার্থক্য রহিল কি?" তাঁহাদের আপত্তি টেকে নাই, সকলকেই মাহিষ্য লেখা হইয়াছে। কিন্তু ৯ম ঘরে প্রধান পেশা লিখিয়া ভাণ্ডারী শ্রেণীর মাহিষ্যেরা কোন মতে ১০ম গৌন পেশার ঘরে ভাণ্ডারী লিখিতে দেয় নাই। ইহা নিয়াও বিভ্রাট কম ছিল না।

একদিন কয়েকজন বস্ত্র বয়নকারী মুসলমান কারীকর (জোলা) মানিগঞ্জের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট আফিসের একখানা সহিমোহরের নকল নিয়া আসিয়া বলিল "মহাশয়! গতবার (১৮৯১ সনে) গণনায় আমরা আপত্তি করায় আমাদিগকে 'কারীকর' লিখা হয় ; এবার কেন আমাদিগকে জোলা লিখা হইতেছে? দেখুন দুঃখের কথা কি বলিব? লোকে অন্যকে গালি মন্দ বলিতে বেটা 'জোলা নাকি রে? বলিয়া থাকে, আর আমাদিগকে সেই জোলা লিখা হইতেছে।' লোকগুলি এতই দুঃখের সহিত বলিল যে শুনিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইল।

মুসলমানেরা জাতিভেদ মানে না, একত্রে আহার করে ; তবে পরস্পর আদান প্রদান নাই। এজন্য তাহাদের মনে বৃথা কষ্ট দিয়া গবর্ণমেন্টের কি সুসার হইল, বুঝিলাম না। ইহাতে গণনাকারী এবং সুপারভাইজারদের প্রতি তাহাদের বিজাতীয় বিদ্বেষ হইয়াছে ; যে এই বেটারাই আমাদিগকে জোলা লিখিতেছে। সাধারণ মুসলমানদিগকে ৮-ম জাতির ঘরে 'সেক' লিখিলে কি দোষ হইত?

গণনার পর দিন দুইজন নযুগীর ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল আমাদিগকে 'বর্ণবিপ্র' লিখায় আমাদের বড়ই অপমান বোধ হইতেছে ; অন্ততপক্ষে আমাদিগকে যুগী লিখা হউক। মহিম বাবু বলিলেন তাহা হইতে পারে না। লোক দুইটি নিতান্তই ...। দুইপ্রহর তিনটা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া কাশীবাবুকে বলিল, যদি আমাদিগকে 'যোগী' না লিখা হয় তবে আর আহার করিব না ; এখানে প্রাণ ত্যাগ করিব। আমাদিগকে যুগী লিখিবেন না। নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া তিনি কোনমতে গোজামিল করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

আমাদের নাপিত মহাশয় আসিয়া বলিলেন সকল জাতি নাপিতদের সহিত যদি আমাদিগকেও "নাপিত" লিখা হয়, তবে আর আমাদের সম্মান রহিল কি? আর আপনারাই বা তাহা কেন লিখিতে দেন? আমাদিগকে শ্রে-ত্রীয় নাপিত লিখিতে বলুন। যাহাদের জাতি ফুৎকারে উড়িয়্যা যায় তাহাদের কি জাতি লিখিল? বলিয়া চিন্তা। গবর্ণমেন্টের হুকুম যে জাতি তাহাকে সেই জাতি লিখা হইবে, তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি না, বলিলাম। নাপিত ভায়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। বিচার্য্যের ১৭ নং সার্কেলের ৭নং গণনাকারী বেবতীমোহন সাহা অন্য জাতির নাপিতদিগকে 'বর্ণ নাপিত' লিখিয়াছিল। তাহার বর্ণটা কাটিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ওরূপ শিখিলে মন্দ ছিল না। সাহা জাতির ব্রাহ্মণ এবং নাপিত অন্য জাতির দান গ্রহণ এবং জাতিকে ক্ষৌরী করে না, ইহা তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রশংসার বিষয়।

"কঠুরা"দের নাপিত, ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র, পূর্ব্ববঙ্গে কঠুর জাতি বলিয়াই পরিচিত। জাতিমালা মতে তাহাদিগকে "চুনারী" বা "বৈটী" লিখিতে হইয়াছে। প্রথমত কঠুরা লিখা হইয়াছিল ; গণনার ২/১ দিন পূর্ব্ব "চুণরী" করা হইয়াছে। কঠুরাগণ এ বিষয় অজ্ঞাত।

দেশীয় বাঙ্গালী বেহারাগণ নমশূদ্রের ন্যায় জাতি। বেহারা বলিলে জাতি মালনুসারে মুসলমান পাল্কী বাহকদিগকে বুঝায় ; সুতরাং হিন্দু বেহারাদিগকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে "নমশূদ্র" লিখা হইয়াছে।

নমশূদ্রের এবার কোন আপত্তি নাই। তাহাদিগকে নমশূদ্র লেখা হইয়াছে। জাতি মালায় নমশূদ্র বা চণ্ডাল যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখার উপদেশ আছে।

নানা জাতীয় লোক "ভেক" গ্রহণে বৈষ্ণব বা বৈষ্টম হয়, তাহাদিগকে বৈষ্ণব এবং 'বাউল' লিখা হইয়াছে।

বেশ্যাগণ কুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে ; তাহাদিগকে জাতির ঘরে বেশ্যা এবং সধবা অবস্থায় বাহির হইয়া আসিয়া থাকিলেও 'বিধবা' লিখিতে হইয়াছে।

যে সকল ব্রাহ্ম জাতি স্বীকার করেন, তাহাদিগকে সেই জাতি লিখিবে ; জাতি যাঁহারা মানেনা না, তাহাদিগকে ধর্ম্ম এবং জাতি উভয় ঘরেই ব্রাহ্ম লিখিত হইয়াছে।

চামার তাহারা, যাহারা পশু চর্ম ছাড়াইয়া লয় এবং তাহা পাকা করে ; আর মুচী বলিলে চৰ্ম্ম পরিষ্কারক ও বিনামা ইত্যাদি নির্মাতাকে বুঝায়। সুতরাং জাতি মালানুযায়ী এখনায় চৰ্ম্ম পরিষ্কারক না থাকায় ঋষিদগকে চামার লিখা হইয়াছে। অবশ্য এ লেখা তাহারা জানে না।

অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ হয় নাই, সাহার ব্রাহ্মণ এবং তাহার ভাণ্ডারী নিয়াই এখানে বিশেষ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম তাঁহাদের ব্রাহ্মণদিগকে সকল স্থানেই "বর্ণ বিপ্র" বা "বর্ণ ব্রাহ্মণ" লিখা হইয়াছে, তবে সাহা গণনাকারীগণ ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন। তাহা ধরার যে নাই ; এবং তাহাতে জাতি সম্বন্ধ ক্ষতি বৃদ্ধি বা কি? ঠিক গণনাই যখন হয় না, তখন ঠিক জাতির বিবরণ পাওয়াও সম্ভবপর নহে।

১৭ মার্চ, ১৯০১

**[ সহমরণ ]**

'সহমরণ'–ধাইয়ের পাড়া বিক্রমপুরের একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। সুধন্যচন্দ্র দাস দেঘুর বাড়ী উক্ত ধাইয়ের পাড়া গ্রামে। সুধন্য ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ মৃত্যু–মুখে পতিত হয়। সুধন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পূৰ্ব্বে তাহার পুণ্যবতী পত্নীরও ওলাউঠার ন্যায় ভেদ হইতে থাকে। কালের শাসনে সুধন্যের জীবন বায়ুটুকু অনন্তে মিলিয়া গেলে, তদীয় সাধ্বী পত্নী আত্মজীবনে হতাশ হইয়া পড়িল। হৃদয়ের দেবতার অনুগমন করিবার নিমিত্ত অভাগিনীর অন্তরাত্মা বুঝিবা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। তাই পতিব্রতা রমণী আপন ৫/৬ ক্ষুদ্র শিশুসন্তানটিকে জনৈকা আত্মীয়ার হাতে সমর্পণ করিয়া সকলের নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করিয়া লইল। পতির মৃতদেহ তখনও প্রাঙ্গণে শায়িত ছিল। সাধ্বী কম্পিত কলেবরে ধীরে লইয়া তৎপার্শ্বে শয়ন করিল। ক্রমে রমণীর নয়নযুগল স্থির নিশ্চল হইয়া আসে, যেন পতির চিরবাঞ্ছিত চরণযুগলতন্ময়চিত্তে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সতী চিরশান্তি লাভ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সকল ফুরাইয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে পতিপ্রাণা পত্নীর জীবনকণিকা পতির অনুগমন করিয়া সেই, চির সম্মিলনক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে। দম্পতির আত্মীয়বর্গ ইহাদের এই যুগল শব একই শ্মশানে ভস্মীভূত করিয়া সতী সাধ্বীর শেষ বাসনাপূর্ণ করিয়াছে। আজি কালিকার এই অধঃপতনের দিনেও সমাজ পট হইতে সতীর চিত্র একেবারে অৰ্হিত হয় নাই বলিয়াই আজিও হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১০ মে, ১৯০৩

## ক. সামাজিক আন্দোলন

**সংবাদাবলী**

অদ্য ঢাকা বংশীবাজারস্থ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের বাটিতে ব্রাহ্মেরা সমস্ত দিন ব্রাহ্মপসনা ও সঙ্কীৰ্ত্তনাদি করিবেন। অনেকে তাহার দর্শনার্থী হইতে পারেন যাঁহারা তাহাতে যোগ দিবেন তাহারা যেন গম্ভীর ও শান্তভাবে যোগাদান করেন। কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে কেবল যে উৎসবকারীরা বিরক্ত হইবেন এমন নয় তাঁহারা উৎসব জনিত বিমলান্দ সম্ভোগেও বঞ্চিত হইবেন।

২১ মার্চ, ১৮৬৯

## সংবাদাবলী

বিগত শুক্রবার সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গলা ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। 'ধর্ম্ম সাধন" বক্তৃতার বিষয় ছিল। পাপ বোধ, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মের সাধন সমূহ কখন কিভাবে উদিত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে কিরূপ কার্য্য করে, কেবল জ্ঞানে, ধর্ম্মের শুষ্কতা বোধ করিয়া লোকে কি প্রকার নিরাশ হয়, বিশ্বাস কেমন অটল অচল হিমালয়ের ন্যায় লোককে ধর্ম্মের পথে স্থিরতর রাখে, ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাতেও বিচলিত করিতে পারে না ; ভক্তি ধর্ম্মরাজ্যে লোককে কেমন মাধুর্য্য প্রদান করে, গভীর অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় হইয়া অমৃত বারি প্রদানপূর্ব্বক তাপিত মনুষ্য হৃদয়কে কেমন শীতল করে, এসকল তিনি অতি সুন্দর রূপে লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। প্রায় সকলেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মোহিত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন বক্তৃতার উৎকৃষ্টতার বিষয় লেখা দ্বারা কোন মতেই ব্যক্ত করা যায় না। সংক্ষেপে এই বলিতে পারি বক্তৃতা শুনিতে ২ অনেকবার আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল ইহাতে প্রায় ৫ শত লোক উপস্থিত ছিল।

২৮ মার্চ, ১৮৬৯

## ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক

আমরা অনেক দিন যাবত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারকদিগের বিষয়ে অনেক প্রকার কথা শুনিয়া আসিতেছি। কেহ বলেন সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় হইতে সম্পর্ক শূন্য হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারার্থ কয়েকজন লোকের নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য, ইহারা দেশীয় লোকের অর্থ সাহায্য জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কেহ বলেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারকদিগের কোন প্রকার বিষয় কার্য্য অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ব্যয় জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করা কর্ত্তব্য। প্রথমোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন বিষয় কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মপ্রচারের অনেক অসুবিধা হয় এজন্যই প্রচারকদিগের বিষয় কার্য্যে সম্পর্ক শূন্য থাকা উচিত। পক্ষান্তরে অন্যান্যেরা বলেন লোকের মুখপেক্ষী হইয়া থাকা প্রচারকদিগের নিতান্ত অন্যায়। এতদুপলক্ষে কেহ ২ বলেন, যদি অর্থ দান করিয়া প্রচারদিগকে পোষণ করা যায়, তবে তাহারা নিতান্ত অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবেন এবং পরপ্রত্যাশিতা তাহাদের অভ্যাস পাইয়া যাইবে। আর সাধারণ লোকের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে গেলে বিষয় সম্পর্ক শূন্য পরপ্রত্যাশা ও গৃহত্যাগী হইতে হয়।

অতএব প্রচারকদিগের বিষয় সৃষ্ট হইয়া থাকা বিধেয়। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনেকে বর্ষে ২ ধর্ম্ম প্রচারার্থ যে দান করিতে তাহা রহিত করিয়াছেন আমাদের এ স্থলে একপক্ষ অবলম্বন করিয়া কয়েকটা কথা বলিতে হইল। দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তিসমূহ অসার বলিয়া আমাদের বোধ হয়না বটে কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের পোষকতা করাই আমাদের অভিমত।...কেবল ধর্ম্ম প্রচারার্থ কতকগুলি বিশেষ লোক নিতান্তই আবশ্যক। অথবা যুক্তিমূলক কথার প্রয়োজন কি? সকলেই চিন্তা করিয়া দেখুন, কয়েকজন ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রচারক কত কষ্ট সহ্য করিয়া শরীরের রক্ত জল করিয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া যদি ধর্ম্মপ্রচার না করিতেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের কি অবস্থা থাকিত? অদ্য পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের নামও বহুতর শিক্ষিত লোকের মধ্যে অজ্ঞাত থাকিত কিনা। আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি আজি

কালি এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা কিছু উন্নতি, তাহা কেবল কয়েকজন দরিদ্র প্রচারকের যত্নেই হইয়াছে। যাহারা তাহাদিগের নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া ধর্ম্ম জগতে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাহারাও বোধ হয় আমাদের এই কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ফলতঃ প্রচারকগণ যে দেশের কতদূর কৃতজ্ঞতার ভাজন, বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন অবস্থায়ও যে কেহ ২ ব্যঙ্গ করিয়া গরিব প্রচারকদিগের প্রতি নানা প্রকার তীক্ষ্ণ বাক্যবান নিক্ষেপ করেন, ইহা সামান্য কৃতঘ্ন হৃদয়ের কার্য নয়। আর যাহারা কোন প্রকারে তাঁহাদের সহায়তা করিতে বীতরাগ হইতেছেন, তাহাদেরও বড় ভ্রম। দেশীয় লোকেরা প্রচারকদিগের জন্য যাহা ব্যয় করেন তাহা বৃথা যায় না। সকলের অর্থ ভোগ করিয়া প্রচারকদিগের যে বল ও রক্ত উৎপন্ন হয় তাহা প্রচারকেরা দেশেরই নিমিত্ত ব্যয় করেন। প্রচারকদিগকে পোষণ করিতে প্রচারকদিগের বিশেষ উপকার করা হয় না, দেশেরই উপকার করা হয়। ধনীরা বিবেচনা করিয়া দেখুন দেশের হিতের নিমিত্তই ঈশ্বর তাহাদের হস্তে ধন প্রদান করিয়াছেন। অতএব আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বলিতেছি, প্রাণপনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের সহায়তা করুন। প্রচারকদিগকে বিষয়ী হইয়া থাকিতে আর যেন উপদেশ না দেন।

৪ এপ্রিল, ১৮৬৯

**কেশবচন্দ্র**

বিগত মঙ্গলবার রাত্রিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় এ স্থান পরিত্যাগ [করিয়া] কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে শান্তিপুরে যাইবেন, তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পরে কলিকাতায় গমন করিবেন। এবার তিনি ঢাকায় ২৩ দিন অবস্থিতি করিয়া গেলেন। এই কয়েকদিনের মধ্যে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এখন আবার ক্রমে সমুদায় কার্য্য বিবরণ পাঠকবর্গের গোচর করা কর্তব্য বোধ হইতেছে।

২৬শে ফাল্গুন সোমবার উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করেন।

২৭শে ,, মঙ্গলবার ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ আলোচনা করা হয়।

২৮শে ,, ঈশ্বরের পবিত্রতার আলোচনা হয়।

২৯শে ,, প্রকৃত শান্তি লাভের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়।

৩০শে ,, ধর্ম্ম সংক্রান্ত অভাবের আলোচনা করা হয়।

১লা চৈত্র সঙ্গত সভায়[২৯] নানাপ্রকার উপদেশ দান করা হয়।

২রা ,, অহঙ্কার বিষয়ক আলোচনা হয়।

৩রা ,, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের[৩০] ছাত্রগণের চরিত্র ও কর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ দেয়া হয়।

৪ঠা ,, ঈশ্বরের বিশেষ করুণার বিষয়ে আলোচনা হয়।

৫ই ,, ঈশ্বরোপাসনায় প্রণালী নির্দ্ধারণ বিষয়ক আলোচনা করা হয়।

৬ই ,, 'মিশন অবদি ব্রাহ্মসমাজ' বিষয়ে ইংরোজী ভাষায় বক্তৃতা করা হয়।

৮ই ,, আগামীদিনের ব্রহ্মোৎসবের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়ার উপদেশ দেয়া হয়।

৯ই ,, ব্রহ্মোৎসব হয়।

১০ই ,, রমনার মাঠে যাইয়া কোন ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে উপদেশাদি প্রদান করা হয়।

১১ই ,, সামাজিক একতার আবশ্যকতা বিষয়ক কথোপকথন হয়।

১৩ই ,, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহসংক্রান্ত সভায় উৎসম্বন্ধীয় আলোচনা হয়।

১৪ই ,. ব্রহ্ম সাধন বিষয়ক বাঙ্গলা বক্তৃতা করা হয়।

১৫ই ,, নবাবপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করা ও উপদেশ দেওয়া হয়।

১৬ই ,, কোন সম্ভ্রান্ত লোকের পরিবারের দুইজন স্ত্রীলোকের প্রতি উপদেশ প্রদান এবং বিকালে সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দেন।

১৭ই ,, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ৫টার সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে ছাত্রদিগের চরিত্র বিষয়ক উপদেশ প্রদান, তৎপর রাত্রিতে অত্রত্য কোন ব্রাহ্মের [গৃহে] উপাসনা হয়।

১৮ই ,, নর্ম্মাল বিদ্যালয়[৩১] এবং কলেজ[৩২] দর্শন করিয়া রাত্রি ২টার সময় জাহাজে আরোহণ করিয়াছেন।

কেশব বাবুর আগমনে অত্রত্য বৃদ্ধ, প্রবীণ, যুবক, বালক প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মই অত্যন্ত আহ্লাদিত ও উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। তিনিও পূর্ব্ববার অপেক্ষা এবার ব্রাহ্মদিগের অধিক উৎসাহ দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি কোন প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌সের মধ্যে যেমন স্কটলণ্ড ধর্ম্ম বিষয়ে প্রধান, সেইরূপ সময়ে পূর্ব্ববাঙ্গলার ঢাকা ধর্ম্মবিষয়ে প্রাধান্য যে এত দিন নানা আন্দোলন এবং অপবাদ উদ্ভাষিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে ঢাকার সর্ব্বসাধারণের হৃদয়েই পরিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে তাহার চরণে লুণ্ঠিত হউক তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করুক এই সকল বিষয় যে তিনি অনুমোদন করেন না, ইহাতে অত্রত্য সকলেই বিগতসংশয় হইয়াছেন। যাহা হউক আমরা ঢাকাস্থ ব্রাহ্মদিগকে এই বলিতেছি, কেশব বাবুর নিকট হইতে নানাপ্রকার সত্য ও উপদেশ যিনি যতদূর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা যেন রক্ষা করিতে সযত্ন হন, নতুবা তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ প্রভৃতি ক্ষণকাল মধ্যে ধূম্রবৎ উড়িয়া যাইবে। আবার সেই নিরানন্দ সেই নিরুৎসাহ হইয়া জীবন কর্ত্তন করিতে হইবে।

৪ঠা এপ্রিল, ১৮৬৯

### প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

চট্টগ্রামস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের প্রতি।

হে ব্রাহ্ম মহোদয়গণ। যেরূপ শরীর রক্ষার জন্য নানামত পুষ্টিকর বস্তু আহার করিতে হয় এবং পরিষ্কৃত থাকার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টিত থাকিতে হয়, সেইরূপ আত্মরক্ষার জন্যও ঈশ্বরোপসনা এবং পাপ প্রক্ষালন করার জন্য ইন্দ্রিয় দমন ও নানাপ্রকার কৌশল করিতে হইবে। যেমন আফিস ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যশো লাভ করিতেছেন। সেইরূপ ঈশ্বরের নিকটও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা প্রীতি লাভ করা উচিত।

সেসব দূরে থাকুক, কি প্রকার সর্ব্বসাধারণে আপনাদের যশো ঘোষণা করিবে তজ্জন্যই তৎপর। ভ্রাতৃগণ? বিদেশ হইতে কোন ধর্ম্মপ্রচারক আগমন করিলে আপনাদের সমাজ প্রতি (এক সপ্তাহের অধিক নহে) এত প্রীতি লক্ষিত হয় কেন? না, তাঁহাদের প্রীতিভাজন হওয়ার জন্য? হে ভ্রাতৃগণ! ধর্ম্ম কি লোক রঞ্জন জন্য না আত্মারক্ষার জন্য? কোন মহর্ষি বলিয়াছেন। "দেখিও মানবকে দেখাইবার জন্য যেন ধর্ম্ম এবং দান না হয়। তোমার দক্ষিণ হস্ত যে কাজ করে তাহা যেন তোমার বাম হস্ত জানিতে না পারেন, অতএব ধর্ম্ম সাধন জন্য লোকের প্রীতিলাভ ও তজ্জন্য বিপদকে বিপদ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নয়।" ধর্ম্মের জন্য পীড়িত ব্যক্তিরা ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই। যত বাধা বিপদ আগমন করুক না কেন তৎসমুদায়কেই বীর্য্যসহকারে মঙ্গলজ্ঞানে বহন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ! আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। কারণ একবার চিরজীবনের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন কিনা সন্দেহ। আমার কেহ ২ "টেম্পারেল সোসাইটি" সংস্থাপনের জন্য উদ্যোগী আছেন। কিন্তু ইহা দেখিতেছি না, যে তাঁহারা তদনুসারে চলিতেছেন কিনা। তুমি অন্যের চক্ষের আরকাটা খুলিতে গেলে দেখিবা তোমার স্বীয় চক্ষে আরকাটা আছে কি না। প্রথমতঃ আপন চক্ষু পরিষ্কার কর। পরে অন্যের চক্ষু পরিষ্কার করিতে যাইও।" হে চট্টগ্রামস্থ ভ্রাতৃগণ। আর বৃথা সময়াতীত করিয়া কাজ নাই। আপনারাই চট্টগ্রামের আদর্শ। আপনাদের হস্তেই এই স্থানের সমুদয় মঙ্গল ভার অর্পিত আছে। অতএব সকল ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া সেই দয়াময় নাম চট্টগ্রামস্থ দীন দুঃখী সকলের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের চির দুঃখ দূর করুন।

চট্টগ্রাম
ইং ১৮৭০ সন।
২৫শে এপ্রিল

৭ মে, ১৮৭০

## ত্রয়শ্চত্বাবিংশ সাম্বৎসরিক মাঘোৎসব

৪৩ বৎসর অতীত হইল দয়াময় ঈশ্বর যে ১১ই মাঘ তারিখে তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবাসিগণের মুক্তির জন্য স্বহস্তে স্থাপন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অন্ধকারের উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ১১ই মাঘ তারিখে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইয়া উদ্বহস্তে উৎসব হিল্লোলে মগ্ন হইয়াছে। সকলের ন্যায় আমরাও সেদিন কৃতজ্ঞচিত্তে দয়াময়ের নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে অচিন্তি-পূর্ব্ব শান্তিলাভ করিয়াছি। যিনি কিছুমাত্র ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি কখনই সেদিন শূন্যমান অতৃপ্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই।

১০ই মাঘ অপরাহ্ন ৬ষ্ঠ ঘটিকার পর উপাসক ব্রাহ্মমণ্ডলী নগরে ২ ব্রাহ্মনাম—দয়াময় নাম উদ্‌ঘোষিত করিবার জন্য আগামী পবিত্র দিবসে দয়াময়ের উৎসবানন্দ ভোগে নগরবাসীদিগকে প্রস্তুত হইতে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবসহ সমবেত হইয়া বাংলাবাজার, একরামপুর, নবাবপুর, তাঁতিবাজার ও পাটুয়াটুলীর মধ্য দিয়া মৃদঙ্গ করতাল সহকারে নাম সঙ্কীর্তন করিতে ২ পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক সংযত হৃদয়ে সেই

পরমপিতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেদিনের রজনী অবদানের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ১১ই মাঘের উদয় সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন নহবৎখানা হইতে টম্‌টম্ রব উত্থিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মগণ সেই শ্রুতি সুখকর রবে জাগরিত ও আহুত হইয়া প্রাভাতিক উপাসনায় ধ্যান নিবিষ্টইত্তত উৎসবভোগ করিতে লাগিলেন। এবং অপরাহ্নে ধর্ম্মোপদেশ গর্ভ্ভ গ্রন্থ পাঠ ও ব্রাহ্মধর্মের গভীর সত্যের সমালোচিনান্তে নগরবাসী অন্ধ আতুর ও দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল ও পয়সা বিতরণ করিয়া উৎসবের বিমলানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। দানান্তে ব্রাহ্মমন্দিরের পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগে মৃদঙ্গ ও করতাল সহকারে নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল ; এই সংকীর্ত্তনে উপস্থিত সমুদায় ব্রাহ্মের হৃদয়ই বিগলিত হইয়াছিল, ছয় ঘটিকার পর "ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে ও কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার বর্ত্তমান গতিইবা কিরূপ এবং ভবিষ্যতে ইহা কি পরিনামের অধীন হইবে" এতদ্বিষয়ের একটি দীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতান্তে সায়ং কালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। এই উৎসবে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ পুত্র কন্যা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যোগদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে একদিনের জন্য স্বর্গীয়ভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোমল হৃদয়া ব্রাহ্মিকাগণ সরলসহৃদয়ে সময়োচিত একটি সুমধুর গান করিয়া সমুদায় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণকে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন করিলেন। এখানকার ব্রাহ্মগণের ব্রাহ্মৎসব কেবল ১১ই মাঘেই পর্য্যবসিত হয় নাই। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা ও রাত্রিতে "প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। গত কল্য শনিবারও সঙ্গতে এবং সমাজমন্দিরে উপাসনা ও নামকীর্ত্তন হইয়া অদ্য সমুদায় দিন ১১ই মাঘের ন্যায় উৎসব ঘটা তরঙ্গে ব্রাহ্মগণ ভাসমান হইতেছেন। যতদিন ব্রাহ্মসমাজ থাকিবে ততদিন ভারতবর্ষ ১১ই মাঘ তারিখে পবিত্র ব্রহ্মানন্দের মগ্ন হইবে।

(১২-৪১-১৪ই মাঘ, ১২৭৯)
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৩

## ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা

আমরা ক্রমাগত কয়েকদিন এই সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা সমাজে যাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে অল্প বয়স্ক যুবকই অধিক। অধিক বয়স্ক পক্কমতি বিবেচনাশীল ব্যক্তির সংখ্যা অল্পই। এই অবস্থার কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া যাহা অনুমান করিলাম, এস্থলে তাহা ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের দৃঢ় প্রতীতি এই, উপাচার্য্যের অনুচিতরকমের বক্তৃতায়—এমন কি উপাসনায়ও বিরক্ত হইয়া অনেকে সমাজে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন! স্পষ্ট নিষেধ আছে, উপাচার্য্য ধর্ম্ম বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের নিন্দাসূচক বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। অথচ প্রায় সর্ব্বদাই এই নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির নিন্দা করা হইয়া থাকে। উপাসনা সমাজে নিন্দা শুনিতে কাহার প্রবৃত্তি জন্মে? আমরা সকল দিবসের সকল কথা স্মরণ করিয়া রাখি নাই, সুতরাং দৃষ্টান্তস্বরূপে কোন কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না ; কিন্তু যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি যদি প্রকৃত অবস্থাজ্ঞ বিবেচনাশীল ও নিরপেক্ষ হন, অবশ্যই আমাদিগের উক্তির পোষকতায় সাক্ষ্য দান করিবেন। গত রবিবার যাঁহারা উপাসনাসমাজে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগের প্রায় সকলেই কি যার পর নাই বিরক্ত হইয়া আসেন নাই? আমরা বিশ্বাস করি, বর্ত্তমান উপাচার্য্য একজন বিলক্ষণ সাধক, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ও আলোচনা আছে, তাহার সচ্চরিত্রতায়ও

কাহারো সংশয় নাই। কিন্তু তিনি যেভাবে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া থাকেন, সাধারণ সমাজের পক্ষে তাহা অনুমোদনীয় নহে। উপাসক সাধারণের মন যাহাতে ধর্ম্মভাবে বিগলিত, আকৃষ্ট এবং অনুরক্ত হইতে পারে, উপাচার্য্যের উচিত, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ সমাজ উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। কিন্তু ক্ষোভ এই আমাদিগের বর্ত্তমান উপাচার্য্যের সে দিকে দৃষ্টি অতি অল্প। সেদিন প্রার্থনারত এরূপভাবের কথার উল্লেখ করা হইয়াছিল যে "ঈশ্বর অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিশেষ ধর্ম্মভাব প্রেরণ করুন।" ইহার কি ইহাই মর্ম্ম উপলব্ধি হইতেছে না যে অল্পবয়স্ক উপাসকেরা আপনা হইতেই ধর্ম্মভাবপূর্ণ, সুতরাং তাহাদিগের জন্য ধর্ম্মভাব, প্রেরণের নিমিত্ত ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার প্রয়োজন নাই? পক্ষান্তরে অধিক বরস্ক ব্রাহ্মেরা সংসারাসক্তিনিবন্ধন ধর্ম্ম বিষয়ে অনুৎসাহী-বিবিধ পাপাসক্ত, অতএব তাহাদিগকেই ধর্ম্মপথে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত উপাচার্য্যের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে? মধ্যে মধ্যে সাধারণ সমাজে এরূপ ভাবেও বক্তৃতা করা হয় যে, "হে উপস্থিত সভ্যগণ! তোমরা পাপী, জঘন্য, দুশ্চরিত্র ও ঈশ্বরবিদ্রোহী। তোমাদিগের উচিত নিজ নিজ স্বভাব সংশোধন করিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরপরায়ণ হও।" এতচ্ছবলে কাহার না বিরক্তি উপস্থিত হয়? যদিও উপাচার্য্য মহাশয়ের নিজকে নিষ্পাপ ও ধার্ম্মিকাগ্র গণ্য বলিয়া বিশ্বাস না থাকুক, তথাপি অন্যকে পাপী বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক উক্তরূপ বক্তৃতা দান করিলে লোকের এরূপ অর্থ গ্রহণ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, আমাদিগের উপাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিজের আত্মাভিন্ন সমাজাধিষ্ঠিত যাবতীয় ব্যক্তির আত্মাকেই পাপ দূষিত মনে করিয়া থাকেন! উপাচার্য্য মহাশয় যদি ঐ ভাবে বক্তৃতা না করিয়া "আমরা সকলেই পাপী, আমরা সকলেই অধার্ম্মিক, অতএব আমাদিগের সকলেরই নিষ্পাপ ও ধার্ম্মিক হওয়া কর্ত্তব্য, এইভাবে বক্তৃতা দান করেন, তাহা হইলে আর কোন কথা হইতে পারে না। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, এই বিষয়টির পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হওয়াতেও এমন কি কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকর্ত্তৃক এতৎপ্রতিষেধক নিয়মবিধান হওয়াতেও উপাচার্য্য মহাশয়ের এ বিষয়ে চেতনা হইতেছে না। অনেক সময় তিনি অনেক ঘরোয়া কথাও সাধারণ সমাজে ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। তাহা যে, অনেকের অসন্তোষকর মনে হয়, ইহা বলাবাহুল্য। পরন্তু তৎকৃতউপাসনা ও বক্তৃতাদিতে অনেক সময়ে এরূপ দ্বিরূক্তি ও বাহুল্ল্যোক্তি থাকে এবং উহা এত দীর্ঘ হইয়া উঠে যে, সাধারণ সভ্যগণ তচ্ছ্রবণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না। সাধারণ সমাজ সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই উপাসনা ও বক্তৃতাদি করা কর্ত্তব্য। উপাচার্য্য মহাশয় এই বিষয়টি স্থিরচিত্তে বিবেচনা কবিয়া দোষ সংশোধন করেন, এই আমাদিগের বাসনা। উল্লিখিত ক্রটিতে যদি ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্য বীতরাগ হইয়া উঠেন, সমাজের অকল্যাণ ভিন্ন কখনই কল্যাণ হইবে না।

১৫ আগস্ট, ১৮৭৫

### প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পূর্ব্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহাশয়ের পরলোক গমনে, সুযোগ্য সম্পাদক বাবু অভয়চন্দ্র দাস[৩৩] মহাশয়কে কার্য্যনির্ব্বাহকসভা, তৎপদে বরণ করিয়াছেন; এটী নিতান্ত সুখের বিষয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাঁহার এই উন্নতি নিতান্ত দুঃখের কারণ

হইয়াছে। এতকাল তাঁহার কার্য্য দক্ষতা ও বুদ্ধির চতুরতাতে পূর্ব্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাইতেছিল কিন্তু বুঝি বা তাঁহার এই সম্পাদকীয় পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সেই আশঙ্কাটী উপস্থিত হইতে চলিল, তজ্জন্যই আমরা দুঃখিত হইতেছি।

সকলের প্রতি লোকসাধারণের সমান শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না। যে সকল লোকের প্রতি সাধারণ শ্রদ্ধা রাখিতে পারিয়া উঠিতেছেন না এরূপ ব্যক্তিদিগকে সমাজের উপাচার্য্যের পদে বরণ করা যে সাধারণের মনঃপীড়াদায়ক বলা বাহুল্য। বিগত নির্ব্বাহক সভা বাবু কালীনারায়ণ রায়[৩৪] মহাশয়কে (বাবুর অনুপস্থিতিতে) উপাচার্য্যের পদে বরণ করেন। উৎসবের ২ দিবস পর্য্যন্ত তিনিই কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ৩য় দিবস পূর্ব্বহ্লে মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সেই ভাবেই আমরা উৎসব সম্ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তৎপরে একি দেখি। কালীনারায়ণ বাবুর বাম পার্শ্বে এ মূর্ত্তি কেন? (সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকলের প্রতি সাধারণের সমান ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে না) ইনি কে? ইনি যে বেদীতে উপবেশন করিবেন পূর্ব্বেই আমরা জানি না? ইনি কি বেদীতে উপবেশন করিবার অনুমতি লইয়াছেন? না, শ্বশুর জামাই এক পরামর্শী হইয়া হইয়া একার্য্য করিলেন? যাহা হউক কতকক্ষণ পরে শুনিলাম বাম পার্শ্বোপবিষ্ট বাবু তার স্বরে উদ্বোধনের স্থানে একদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা আকাশকে নিনাদিত করিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল কাঁপাইতেছেন। কি করি দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলাম। মনোদুঃখে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি, বারেন্দায় দেখি আমাদিগের মত আরও অনেকে ব্যক্তি প্রত্যাগমনশীল হইতেছেন, কেহ কেহ বা পরিবার বর্গ লইয়া প্রস্থান করিতেছেন এবং কেহ বা উদ্যোগী হইতেছেন।

এখন জিজ্ঞাসা করি পাঠক .. বাবুটির এভাব কেন? আপনার প্রতি সাধারণের ভাল ভাব নাই তবে কেন আপনি খুড়ে ২ সেই সকল আবার ঝালাইতেছেন? এক কর্ম্ম করুন- বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিতে ইচ্ছা থাকিলে এক কর্ম্ম করুন ; যে কারণবশতঃ সাধারণে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট সেই কারণটিকে দূর করুন আগামী বৎসর মাঘোৎসবে আপনি বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিতে পারিবেন।

একান্ত বাধ্য
একজন
উপাসক।

ঢাকা
১৭৯৭ ১৫ই মাঘ।

৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬

## পূর্ব্ববাঙ্গলা সমাজ

ইতঃপূর্ব্বে ঢাকাপ্রকাশে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণের প্রতি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুচিত ব্যবহার শীর্ষক যে প্রস্তাব প্রকটন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে "ইষ্ট"[৩৫] আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সত্য, যুক্তি ও প্রমাণের সম্পর্ক অতি অল্প, সুতরাং আপ্তবাক্যবৎ বিশ্বাস করিয়া না লইলে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারেন না। আমরা ঐ সকল কথার উত্তর দিতে যাইয়া তাঁহার ন্যায় বালকতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি যে অসত্য, অযুক্ত ও অপ্রামাণিক কথা দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনে চেষ্টা পাইয়াছেন উপাসকমণ্ডলীর

জনৈক সভ্যের স্থানান্তর প্রকাশিত পত্রেই তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইষ্ট বলেন, "পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীতে স্পষ্টভাবে ও দ্বিধাশূন্যরূপে লিখিত আছে, যাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান ও [ অস্পষ্ট ] নির্দ্ধারিত অনুসরণ না করিবেন তাহারা সমাজগৃহে স্বতন্ত্র সময়ে উপাসনা করিতে পারিবেন না।" কিন্তু আমরা [ অস্পষ্ট ] সমাজের নিয়মাবলী পুস্তক তন্ন২ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, বাস্তবিক তাহাতে এরূপ নিয়ম নাই। ষ্ট্রাষ্টিগণ পরে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা লইয়া কথা হইলে "পূর্ব্বাগরয়োঃ পরবিধির্ব্বলবান্" এবং "সামান্য বিশেযয়োর্বিশেয বিধির্ব্বলবান্" এতন্ন্যায়ানুসারে পূর্ব্ব ও সামান্য নিয়মাপেক্ষা পরের ও বিশেয নিয়মেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ইষ্টের কথার সমর্থন হইতে পারে না। তিনি আরো বলিয়াছেন, "উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ আধ্যাত্মিক গুরুগণের বিশেযতঃ কেশব বাবুর অভ্রান্ততা ও মধ্যবর্ত্তীতা প্রভৃতি বিশ্বাস করেন ; সুতরাং কর্ত্তব্যানুরোধে কার্য্যনির্ব্বাহকসভা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য"। ইষ্টের স্মরণ করা উচিত, উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা কেশব বাবু প্রভৃতিকে অভ্রান্ত ও মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করেন না,—কোনও ব্রাহ্মের ঐরূপ বিশ্বাস করাও পাপ মনে করেন। কার্য্যনির্ব্বাহকসভা ও সেই হেতুবাদে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র সময়ে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে নিবারণ করেন নাই। তবে তিনি [ অস্পষ্ট ] এই আকাশজাত কথা লইয়া এত আস্ফালন করিতেছেন?' যদি তাঁহার সত্যানুরাগ থাকে,—যথার্থ বিচার করিবার অভিলায থাকে, উভয় পক্ষের প্রকাশিত পত্রগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন। তাহা হইলে ভরসা করি, আমাদিগের মীমাংসা ভিন্ন কখনই তিনি অন্য মীমাংসায় পৌছিতে পারিবেন না।

২৫ জুলাই, ১৮৮০

## ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব

আজি চৌত্রিশ বৎসর গত হইল ঢাকা নগরে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সকল মহাত্মার প্রযত্নে ও কষ্টাতিশয্যে এই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল, বিখ্যাত ডেপুটি কালেক্টর মৃত মহাত্মা বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র[৩৬] তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আমরা জানি, যে সময়ে ঢাকার প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই "ব্রহ্মসভার" ঘোরতর বিরোধী ছিলেন,—ঐ সভায় গতায়াত করিলে জাতিচ্যুত হয় বলিয়া বিশ্বাস সেই সময়ে ব্রজসুন্দর মিত্র অনেক সুখ সুবিধায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং সামাজিক জনগণের অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়া ঐ সভ্য প্রতিষ্ঠিত ও বিবিধ বিষয়ে ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক উহা জীবিত রাখিয়াছিলেন। তখন সভার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বাটী ছিল না। নিজ আবাস ভবনের কিয়দংশও অদর্থ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হায় ! যে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন ও পালনাদি সম্বন্ধে বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র এত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই চতুস্ত্রিংশ সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অধুনাতন ব্রাহ্মগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, প্রায় সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া বিবিধরূপে উৎসব সম্ভোগ করিয়াও সেই মহাত্মার নাম পর্যন্ত স্মরণ করেন নাই। ধর্ম্ম সমন্ধীয় উৎসবে লৌকিকী প্রশংসা যদিও আমরা প্রয়োজনীয় বোধ করি না, প্রত্যুত বর্জ্জনীয় বলিয়াই মনে করিয়া থাকি, তথাপি ধর্ম্মসভা সংস্থাপন সমন্ধীয় ইতিহাস বর্ণন সময়ে যাঁহার যে প্রশংসা অবশ্য প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে প্রদান না করা নিতান্তই প্রত্যবায় জ্ঞান করি। বস্তুতঃ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপলক্ষে তৎসংস্থাপয়িতা বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের কি

সাধারণভাবে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বর্ণনে বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ না করা কখনই সঙ্গত কার্য্য নহে। লোকে ইহাকে ঘোরতর অকৃতজ্ঞতাভিন্ন আর কি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন? যদি বিস্মৃতি প্রযুক্তই এ দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, তথাপি আমরা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না যে, এরূপ বিস্মৃতিও মার্জনীয় নহে।

· গতবর্ষে আমরা পূর্ব্বাবাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের এই উৎসবে যেরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, এবার সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। অনেকে ইহার দুইটি কারণ অনুমান করিতেছেন। এক কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠনজনিত নূতন দলাদলীর নবোৎসাহ, দ্বিতীয় তখন পর্য্যন্ত ব্রহ্মপরায়ণ প্রকৃত উৎসাহশীল সভ্যগণের সমসংশ্রব। সময় স্রোতে এখন সেই উৎসাহ অনেকাংশে ভাসিয়া গিয়াছে;—প্রকৃত উৎসাহশীল আগ্রহ বান্ ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে স্বতন্ত্র হইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। তৎপ্রযুক্তই এখন উহার পূর্ব্ববৎ উৎসাহ প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে না। এবার যেন উহার সভাদিগের প্রায় কোন বিষয়ে সেরূপ উদ্যম, উৎসাহ ও জীবন্তভাব নাই। অনেক বিষয়েই অনেকের মৃতভাব অনুমিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয়শাখা ব্রাহ্মসমাজ, (ইতঃপূর্ব্বে যাহা উপাসকমণ্ডলী সভা নামে অভিহিত হইত) সংখ্যায় অল্পতর, অর্থ, পদ, ও ক্ষমতাদি পার্থিব বলে হীনকল্প এবং অধিকাংশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াও এই উৎসব উপলক্ষে অধিকতর উদ্যম, উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা তিনদিন, কিন্তু ইহারা সাতদিন ভরিয়া এই উৎসবে উপাসনা, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন ও আলোচনাদি করিয়াছেন। ইহারাই এবার উপাসনালয়টি সুন্দরতর রূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, শুদ্ধ ইহারাই বাহিরে প্রকাশ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দান, নগরসঙ্কীর্ত্তনে বহির্গমন এবং ভিন্নস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ বারুনী মেলায় গমন করিয়া গীতি ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মবিস্তার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে যেমন ধর্ম্মার্থে জীবনসমপর্ণকারীর সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, অপর দলে তদ্রূপ লোকের তত আধিক্যদৃষ্টিগোচর হয় না। ... বোধ হয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রায় যাবতীয় কার্য্যেই প্রকৃত উৎসাহের সবিশেষ তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সংসার ও ধর্ম্ম উভয়েই সমান মনোযোগ সহকারে সম্পাদন করা যাইতে পারে; একদিগে ঝুঁকিলে অপরদিগে ত্রুটি সংঘটিত হয় না, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস নাই। অতএব আমরা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের পরিচাকলগণকে নিব্বর্ন্ধ সহকারে অনুরোধ করি, যাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত দেখিয়া যথার্থ ধর্ম্মসাধনা শিক্ষা করা যাইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই যত্ন করুন। আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, উপদেষ্টা উপাচার্য্য প্রভৃতিকে কুণ্ডলী মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, স্বাধীনভাবে সীমার বাহিরে বিচরণ করিতে না দিলে কখনই তাঁহারা যথার্থ কার্য্যসাধক ব্যক্তির সদ্ভাব দেখিতে পাইবেন না। এবং তাদৃক লোকসদ্ভাব না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি দর্শনও সুদূরপরাহত থাকিবে।

১২ ডিসেম্বর, ১৮৮০

## লর্ড রিপণের নিকট বগুড়ার সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের আপীল

খ্যাতনামা শার্প সাহেব বগুড়ার ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারীদিগের প্রতি অযথোচিত অত্যাচার করিয়াও সার আসলি ইডেনের বিচারে যেরূপ অক্লেশে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন পাঠকবর্গ তাহা

অনবগত নহেন। বলিতে কি, উক্ত বিচারে শুদ্ধ অভিযোগকারীরা নহেন, সর্ব্বসাধারণই যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। পরম বন্ধু ইডেন সাহেব শার্প সাহেবকে কেবল মুক্তিদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অতঃপর তাঁহার নামে ঐ বিষয়ে দেওয়ানী মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, সরকার হইতে তাঁহার পক্ষীয় ব্যয়প্রদান করা হইবে, এরূপও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু নিগার বাঙ্গালীদিগকে অপমানিত করার পুরস্কারার্থই যেন অচিরে শার্প সাহেবের পদোন্নতিও বিধান করিয়াছেন। ইডেন সাহেবের ঈদৃশীক্রিয়া পরম্পরার পর্য্যালোচনা করিয়া সকলেই অবাক হইয়াছেন বলাবাহুল্য।

ইডেন সাহেব যে তিনটি কথায় উল্লেখপূর্ব্বক শার্প সাহেবকে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন বগুড়ার পূর্ব্বোক্ত সংকীর্ত্তনকারিদলের আবেদনগণ তৎসমুদায়ের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকটে নিম্নলিখিতরূপে আপীল করিয়াছেন।

ইডেন সাহেব বলেন (১) "শার্প সাহেব যখন সংকীর্ত্তনকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেন, তখন জানিতেন না যে, তাঁহারা পুলিস হইতে পাশ লইয়াছেন" (২) "সংকীর্ত্তনকারীদিগের প্রজ্বালিত মশালের আগুন লোকের ঘরে লাগিবার আশঙ্কা করিয়াই শার্প সাহেব সংকীর্ত্তন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"। (৩) "যখন শার্প সাহেব জানিতে পারিলেন যে, সংকীর্ত্তনকারীদিগের দলে অনেক ভদ্রলোক রহিয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।" প্রথম কথা সম্বন্ধে আবেদনকারীরা বলিয়াছেন, সব ইনস্পেক্টর রাধাকান্ত কর্ম্মকার তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, তিনি পাশ থাকার কথা শার্প সাহেবকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও শার্প সাহেব গ্রেপ্তার করিবার আদেশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। দ্বিতীয় কথাসমন্ধে আবেদনকারীরা বলেন, শার্প সাহেব যে গৃহদাহের আশঙ্কায় সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছিলেন একথা নিতান্ত অসম্ভাবিত। তাঁহারা যখন তাঁহার আলয়ে আনীত হন, তখন তিনি "কি বাবুরাও এই ঘৃণিত নৃত্যাদিতে মত্ত হইয়াছেন?" এই মাত্র উক্তি করিয়াছিলেন, মশালের কথা বলেন নাই। পরে যখন পুনরায় তাঁহাদিগকে সংকীর্ত্তন করিতে দেওয়া হইল, তখনও মশালের কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন নাই। ফলতঃ মশালের আগুন ঘরে লাগার আশঙ্কার কথা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিষ্পত্তি পূর্ব্বে আর তাঁহারা শ্রবণ করেন নাই। এতদ্বারা উপলব্ধি হইতেছে, উহা ইডেন সাহেবের কল্পিত উক্তিমাত্র, শার্প সাহেবের মনে উহা ছিলনা। তৃতীয় কথা সম্বন্ধে আবেদনকারীরা বলেন, "সংকীর্ত্তনকারীদলে অনেক ভদ্রলোক থাকার কথা শুনিবার মাত্র শার্প সাহেব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন"। বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নহে। সংকীর্ত্তনকারিদলে ভদ্রলোক দেখিয়াও তিনি সকলকে লাইনে লইয়া যাইবার আদেশ করিতে বিরত হননাই। পরে যখন মুন্সেফ, ডেপুটী বাবু প্রভৃতি শার্প সাহেবের নিকট হইতে লিখিত পরওয়ানা আনিতে পাঠাইয়া দেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হওয়াতে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

আবেদনকারীরা লর্ড রিপন বাহাদুরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, হয় তিনি উল্লিখিত বিষয়ের প্রাকাশ্য নুসন্ধান হইবার ব্যবস্থা করুন, না হয় তাঁহাদিগকে শার্প সাহেবের নামে আদালতে অভিযোগ করিবার অনুমতি দিউন। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট যে আদেশ করিয়াছেন, সরকার হইতে শার্প সাহেবের নামীয় মকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে তাহা রহিত করিয়া ফেলুন এবং শার্প সাহেবের উক্ত আচরণ বিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের বাহাদুরের অভিপ্রায় কি,

তাহাও ব্যক্ত করুন। এই প্রার্থনা কেবল নিগৃহীত সংকীর্ত্তনকারি দলের আবেদকদিগের নয়, এদেশীয় সর্ব্বসাধারণেরই বলিতে হইবে। এদেশীয় সাধারণ মতে মহাত্মা লর্ড রিপনের উপেক্ষা নাই, প্রত্যুত সম্মাননাই আছে। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভায় ইহা তিনি ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অতএব ভরসা করি সাধারণ মতানুমোদিত উল্লিখিত প্রার্থনায় তিনি অবশ্যই মনোযোগ করিবেন। যে শার্প সাহেব গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিগৃহীত হইবেন বলিয়া সর্ব্ব সাধারণেরই সংস্কার জন্মিয়াছিল, ইডেন সাহেবের বিচারে অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটি হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটি পদে সমুন্নতি হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা বিসদৃশবিচার আর কি হইতে পারে? উদারচিত্ত সমদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ লর্ড রিপণ বাহাদুর এ বিষয়ের যথাযথ বিচার করিয়া লোকের মনঃক্ষোভ নিবারণ করেন, একান্ত বাঞ্ছনীয়।

২১ মে, ১৮৮২।

## পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণ

২৬ শে, ১২৯১ সন।

উপস্থিত সভ্যগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন, হারাণ চন্দ্র সরকার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়[৩৭], রামসুন্দর বসাক, দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত[৩৮], উমাপ্রসাদ বিশ্বাস, শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাকান্ত নাগ, অযোধানাথ চৌধুরী, সারদাচরণ ঘোষ, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রনাথ রায়, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ[৩৯], অমরচাঁদ লাহা, শ্যামাচরণ বক্সি, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়।[৪০]

যে সকল সভ্য প্রতিনিধি অথবা পত্রদ্বারা মতপ্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম–বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ শীল, জগদ্বন্ধু লাহা, রোহিনীকুমার বসাক, শরচন্দ্রগুপ্ত, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ প্রসাদ দাস, শ্রীযুক্তা মতঙ্গী মজুমদার, গোলাপসুন্দরী বক্সী, ভুবনমোহিনী ঘোষ।

১. বাবু অক্ষয়কুমার সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রস্তাবক, বাবু অযোধ্যানাথ চৌধুরী পোষক।

২. সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাবু রজনীকান্ত ঘোষ[৪১] ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করেন।

৩. সভাপতির অনুরোধক্রমে সম্পাদক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব পাঠ করেন।

৪. বাবু চন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাব করেন যে সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত কার্য্যবিবরণ পরিগৃহীত হউক।

(ক) বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করেন যে, গত বর্ষের আয় ব্যয় হিসাবের সহিত ১২৮৯ সনের হিসাবও থাকা আবশ্যক। কেননা তদ্দারা উভয় সনের আয় ব্যয় তুলনা করা যাইতে পারে। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন যে, কার্য্য বিবরণ মধ্যে ১২৮৯ সনের আয় ব্যয় হিসাবও সন্নিবেশিত করা হউক। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

(খ) বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী আরও প্রস্তাব করেন যে, উৎসব সমূহের বিবরণ ও তাহাতে যে বক্তৃতা ও উপদেশ হইবে তাহার সারমর্ম্ম বর্ত্তমান সনের কার্য্যবিবরণ মধ্যে সন্নিবেশিত থাকিবে। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল।

(গ) সম্পাদক প্রকাশ করেন যে, ১৮৭২ সনের ৩ আইন অর্থাৎ বিবাহ বিধির কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মসাধারণের একটা সভা আহূত হয়। ঐ সভার কার্য্যবিবরণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় নাই। সভার অনুমতি হইলে তাহা উক্ত রিপোর্ট মধ্যে সন্নিবেশিত করা যায়। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সম্পাদকের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ঘ) গত বার্ষিক সাধারণ সভার গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে বাবু অভয়চন্দ্র দাস[৪৩] ও রাধিকামোহন রায়ের নামে যে, সমাজ ভূমির পাট্টা আছে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজের ট্রষ্টিগণের নামে লিখিয়া লওয়া সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কি করিয়াছেন তাহা সম্পাদক কার্য্যবিবরণে উল্লেখ করিবেন। তৎপরে কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫. বাবু উমাপ্রসাদ বিশ্বাসের প্রস্তাব ক্রমে সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন— পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী অন্যতম সভ্য ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক বাবু গোবিন্দ প্রসাদ রায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ শোক প্রকাশ করিতেছেন।

৬. বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন গত বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মসমাজের সভ্যগণ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে উপকার লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

৭. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে ও বাবু শ্যামাকান্ত নাগের পোষকতায় এই স্থিরীকৃত হইল যে, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাধানে যে সমুদয় পুস্তক আছে তাঁহার একখণ্ড তালিকা মুদ্রিত করিয়া /০ আনা মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

৮. বাবু রজনীকান্ত ঘোষ, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার যে, সমাজের উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৯. ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু কেদারনাথ রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ ভৌমিক ও কৃষ্ণকুমার মিত্র[৪৫] পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ গ্রন্থাধানে পুস্তক উপহার প্রদানে করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১০. কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণ যে, গত বৎসর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবার প্রদান করা হইল।

১১. গত বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণ রীত্যনুসারে স্বকীয় পদ পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য মনোনীত হন—

ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, জগদ্বন্ধু লাহা, অক্ষয়কুমার সেন, রজনীকান্ত ঘোষ, কালীনারায়ণ গুপ্ত, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

৩১ আগস্ট, ১৮৮৪

## ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নামে

চার্ব্বাক দর্শনের অনেক উপদেশের সঙ্গে "ধন করিয়াও ঘৃত ভোজন কর" এই মহৎ বাক্যটি অনেক ব্রাহ্ম মহাত্মার হৃদয়ে পরিগ্রহীত হইয়াছে। তাহারা এই মহৎ বাক্য অবলম্বন ঋণ করিয়া ঘৃতাদিভোজনের চূড়ান্ত করিতেছেন। এই বকধার্ম্মিকদিগকে লোকে বিশ্বাস করিয়া অর্থাদির কারবার চালায়, ইহারা এই সুযোগে রোজগার করিয়া বাবুয়ানার হদ্দ করেন। ইহাদের কৃপায় কত সরল বিশ্বাসী যে পথের ভিখারী হইয়াছে, তাহা আমরা ক্রমে দেখাইয়াও সারিতে পারিনা। অপরের কথায় কাজ কি? এই ঢাকা প্রকাশ কার্য্যালয়েই দেওলিয়া খাতায় অনেকের নাম আছে। সত্বরেই তাহাদের কাহারও নামে নালিস করা হইবে।...যে হউক ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে চার্ব্বাকের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া আমরা বস্তুতঃই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

৩০ নভেম্বর, ১৮৮৭

## ব্রাহ্মিকা মিসন

(প্রকৃত ঘটনা)

সাহেবী অনুকরণে হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিল। বিলাতে মেইড্‌স্‌গণ লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পরোপকার ব্রত পালন করেন। এদেশেও খৃষ্টান মিশনরী স্ত্রীগণকে অনেক সময়ে লোকের বাড়িতে বাড়িতে যাইতে দেখা যায়। এইসব দেখিয়া আমাদিগের ভ্রাতার দল ভাবিলেন আমরা কেন ছুট যাই। তাই তাঁহারাও মেযে পুরুষে আসরে নামিয়াছেন। কুলবধূ, ভদ্রলোকের স্ত্রী, অন্দরমহলেই শোভা পাইয়া থাকে, এবং অন্দরমহল তাঁহাদিগের বসতি স্থান বলিয়া উহার সম্মান ও এত। কিন্তু এখন দেখি, ভগ্নীগণ অন্দরমহলের শিকলি কাটিয়া সদর রাস্তায় বাহির হইতে শিখিয়াছেন। পিঞ্জঁরার পাখী পিঁজরা ভাঙ্গিয়া সচ্ছন্দে ইতঃস্তত বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তবিকও তো যাহার স্বাধীন প্রাণ দেশ শুদ্ধ লোকের লালায়িত, সে প্রাণের তৃষ্ণা কি অন্দরমহলে মিটিতে পারে? তাই তাঁহারা বেড়ি ভাঙ্গিয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানি না, এ শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে। পাঠকবর্গ বিশ্বাস করিবেন না, বাস্তবিকই এই ঢাকার শহরের উপর এইরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে। নিম্নলিখিত বিবরণটি শুনুন।

"অনাথের ঝুলি" নামক পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটি ফণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। কতিপয় উৎসাহী নব্যযুবক ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। দস্তরমত খণ্ড যেরূপ হয় এও তাই। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, টাকা ও কড়ি উঠিতেছে, সাধারণত ফণ্ড দ্বারা যেরূপ কাজ হয়, আমাদের বিশ্বাস এই ফণ্ড দ্বারাও তাহাই হইবে। যাক, এ একটা কাজও বড় না, ইহাতে আমাদিগের কথা কহিবারও কিছু নাই। কিন্তু ভ্রাতাগণ এই ফণ্ডে টাকা তুলিবার জন্য কেমন অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাই শুনুন।

সেদিন একটি যুবতী অত্রত্য এক ধনী লোকের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত। স্ত্রীলোকের কোথায়ও যাইবার নিষেধ নাই, তাই ইনিও বরাবর অন্দরমহলে যাইয়া উপস্থিত। যাইয়াই বাড়ির কর্ত্তৃঠাকুরানীকে খুঁজিয়া লইলেন। যুবতী মধ্যমাকৃতি, বয়স ২২/২৩ হইবেক, গায়ে জ্যাকেট, হাতে সোনার চুরী। যুবতী কর্ত্তৃঠাকুরানীকে অনাথের ঝুলির বিবরণ বুঝাইলেন। তৎপর একটি গান গাইতে গাহিলে কর্ত্তৃঠাকুরানীতো দেখিয়া শুনিয়া অবাক। তিনি চক্ষু লজ্জায় ঠেকিয়া গাইতে বলিলেন। তখন যুবতীর সেই বীনানিন্দিত স্বর পরদায় উঠিতে

লাগিল, একটি দুইটি করিয়া অনেকটি গান হইল। যুবতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কর্ত্তাঠাকুরানী তাঁহাকে আশানুযায়ী ভিক্ষা দিলেন। কর্ত্তাঠাকুরানী যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবতীবলিলেন, তিনি ব্রাহ্মিকা, তাহার স্বামী পুত্র সবই আছে। তবে সম্প্রতিক তিনি পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। কয়েকদিন পর পুনরায় আসিবেন সে যুবতী বিদায় লইলেন।

ঘটনা তো এই। এখন জিজ্ঞাসা করি, ভায়া তোমরাই তো আড়েহাতে লাগিয়াছ। আবার ঘরের মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি কেন? দুপুর রৌদ্রের সময় একলাটী বেচারী রাস্তায় ২ ঘুরে ২ বেড়াচ্ছে। যখন মনে করি একুলবধূ, তখন মনটা যেন বড় কেমন করে। প্রাণে বড় ব্যথা পাই। ভাই, মিনতি করে বলি, ধর্ম্মের নামে গাওনা বাজনার সক আর কতকাল মিটাবে? যা কর নিজেরাই কর, মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি কেন? ছি! একি!

২২ জানুয়ারি, ১৮৮৮

## বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

উদ্ধৃত স্তম্ভে তত্ত্ববোধিনী[৪৬] হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পত্র প্রেরক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে[৪৭] যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান লোকের নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইলেও ভবিষ্যতের পক্ষে বড় গুরুতর। ব্রাহ্মগণ এমন কতগুলি মিথ্যাকাহিনী প্রচার করিতেছেন যাহা শুনিলে ভবিষ্যতের লোকেরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। অসাধারণ ভায়ারা নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, তাহার শ্রীমুখের বাণী শুনেন, এ মিথ্যাবাদিতা যেন সকল কালের লোকেই বুঝিবে, কিন্তু বিজয় বাবু নিরাকারে বের না পাইয়া এখন সাকার ঈশ্বরকে লইয়া বুজুরকি প্রকাশ করিতে থাকিলে বড় কঠিন কথা হয়। বিজয় বাবুর মুখে প্রকাশ যে, এখন তিনি যে ধর্ম্ম মানিতেছেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত পথ। তদ্ভিন্ন সাধারণ, অসাধারণ, আদি প্রভৃতি কিছুই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। তিনি এতকাল ঐ সকল সমাজের গুরুরূপে নিজে যে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, এখন তিনি নিজেই সে গুলিকে অসার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাতে অন্তত ইহা বলা যায় যে, তিনি এতকাল যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন, তাহা অসার। তিনি এতকাল ভ্রান্ত ধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়া প্রকৃত ধর্ম্মে কিছুই অগ্রসর হইতে পারেন নাই বলা যায়। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িয়াছেন মাত্র এক বৎসর, এই সময়টুকুই বোধ হয় তাঁহার মতে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময়। এই সময়টুকুর মধ্যে তিনি যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন, এবং সাকার ঈশ্বর পর্যন্ত দেখিয়া পেলিয়াছেন। বলি, রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রহলাদ চরিত্র দেখার পরে স্বপ্নে নৃসিংহ মূর্তি দেখিয়াছিলেন তো?

১ জুলাই, ১৮৮৮

## ব্রাহ্ম থেকে হিন্দু

গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত যিনি ঢাকাস্থ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার, উপদেষ্টা বা শিক্ষাগুরু ছিলেন, সেই বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সেই ব্রাহ্মলোক হইতে হিন্দুধর্ম্মের অন্ধকারে আসিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। তাই আমরা সহযোগী সোম প্রকাশ[৪৮] ও গৌরব[৪৯] প্রভৃতির নিকট [ অস্পষ্ট ] পূর্ব্বে উহা শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি নাই কিন্তু এই দীর্ঘকালেও যখন উহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতেছি না, এবং ঐ সমাজের

প্রত্যেকটি অবতারেরই মত যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল তাহাতে উহা বিশ্বাস না করিয়াই বা চলে কিসে? যদি সত্যই বাবু মন্মথনাথের এইরূপ সৎ পথে মন ফিরিয়া থাকে, তবে তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দেই। ছেলে বেলায় লোকে কতবিধ অসৎ কার্য্যই করিয়া থাকে, তা বড় হইলেই ক্রমে শুধরিয়া যায়। দুই একটা নিতান্ত ব্যাকুব অবথা মতলবী লোক ছাড়া যখন অনেক অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পূর্ব্বভ্রম পরিহার করিছেন, তখন মন্মথ ঐ কার্য্যই উত্তম হইয়াছে।

২৯ জুলাই, ১৮৮৮

# শিক্ষা

[ শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে গত দুশো বছর ধরে যে পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে, এখনো তার অবসান হয়নি। অন্তত বাংলাদেশে। ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রথমদিকে বাংলা শিক্ষার ব্যাপারে কোন মনোযোগ দেন নি। প্রচলিত ছিল তখন সেই পুরনো আমলের পদ্ধতি—মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা বা টোল-চতুস্পাঠী। সরকারি ভাষা ছিল ফার্সী। পাশ্চাত্য কোন ভাষা শিক্ষার কথা তখনও কেউ তেমনভাবে ভাবেনি। ক্রমে ফার্সী অবলুপ্ত হয়ে ইংরেজি দখল করে নিয়েছিলো প্রধান ভাষার স্থান। কিন্তু উনিশ শতকে যখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হচ্ছিলো তখনও কিন্তু সমান্তরালভাবে এসব প্রতিষ্ঠান টিকেছিলো।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ভাষা, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে সূত্রপাত হয়েছিলো বিতর্কের। তা ছাড়া শিক্ষার ভার বহন করবে কে—এ নিয়েও দ্বন্ধ ছিল। ইংরেজ সরকার প্রথমদিকে এ ভার এড়িয়ে চলতে চাইলেও অন্তিমে অনেকাংশে তাকে বাধ্য করা হয়েছিলো শিক্ষার ভার বহন করতে।

ভাষার প্রশ্নে আসা যাক। বাঙালি এক আধটু ইংরেজি শিখেছিলো সেই আঠার শতক থেকে যখন প্রয়োজনে তাকে আসতে হয়েছিলো ইংরেজদের সংস্পর্শে। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পরই বলা যেতে পারে শুরু হয়েছিলো প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার। লিখেছেন বিনয় ঘোষ, 'ব্রিটিশ আমলে নবযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর (Bengali intelligentia) প্রথম ও প্রধান উৎপত্তিস্থল হিন্দু কলেজ।'[১] বাংলার জাগরণে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো প্রবল। পাশ্চাত্য সভ্যতা রোধে প্রধান আক্রমণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো পাশ্চাত্য ভাষা। এমনকি বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো ইংরেজ প্রশাসকদের মধ্যেও। যারা গ্রহণ করেছিলো পাশ্চাত্য ভাষা বা শিক্ষা, সামাজিক সম্মান বা বিত্তের ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রদায়গতভাবে এর সুফলটা পেয়েছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু, হিন্দু সমাজেও এর প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। কারণ, এ শিক্ষা কুলবৃত্তি বা অনেক ক্ষেত্রে বর্ণ আর সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারছিলো না। অন্যদিকে, মুসলমানরা সম্প্রদায়গতভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষা, সভ্যতা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান নিয়ে যে দ্বন্দ্ব অন্তিমে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বাংলার একটি সম্প্রদায়ের উত্থান ও অপর একটি সম্প্রদায়ের অবনতির প্রধান কারণ যা পরে ইন্ধন যুগিয়েছে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বিনাশে। তবে, এও উল্লেখ্য যে, ইংরেজি ভাষা নিয়ে উন্মাদনা কেটে যাওয়ার পর শিক্ষিত সমাজ এর পাশাপাশি বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করারও আহ্বান জানিয়েছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি নির্ধারণে অনেকটা সাহায্য করেছিলেন মেকলে। তিনি প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষপাতীদের [ যার মধ্যে অনেক ইংরেজ সিভিলিয়নও ছিলেন]

বক্তব্য খণ্ডন করে বলেছিলেন এ দেশের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন একটি মধ্যশ্রেণী গড়ে তোলা—'Who may be interpreters between us and millions whom we ...—a class of persons Indian in colours and blood, but English in taste, in opinons, in morals and in intellect.' ফিল্টারেশন থিয়োরি বা বিদ্যা ওপর থেকে চুঁইয়ে আসবে নিচে-এ তত্ত্বেরও প্রবক্তা ছিলেন তিনি। বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে উইলিয়াম অ্যাডামের নামও উল্লেখ্য। লর্ড বেন্টিংক অ্যাডামকে ১৮৩৫ সালে নিয়োগ করেছিলেন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে তার ওপর রিপোর্ট প্রদান করতে। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ এর মধ্যে অ্যাডাম তিনটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এতো তথ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট পরবর্তীকালে খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাডামও ছিলেন চুঁইয়ে পড়া তত্ত্বের সমর্থক।

১৮৫৪ সালের পর বলা যেতে পারে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি একটি সংহত রূপ ধারণ করেছিলো। এ নীতির ভিত্তি ছিল ১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ। নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা কি হবে তার একটি রূপরেখা প্রদান করেছিলো এ ডেসপ্যাচ। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন রমেশচন্দ্র মিত্র—

"Education was ostentatiously recognised as one of the sacred duties of the government. The neglect of vernacular was deplored. The filtration theory was repudiated. at least, in its extreme form. It was toned down to one of concession and liberal compromise. The higher classes were called upon to bear a considerable part or the cost of their education, so that the funds thus released could be devoted to the hitherto neglected task of spreading "useful practical knowledge suited to every station of life, to the great man of the people who are utterly incapable of obtaining any education worth the name by their own unaided effort." The broad principle of "English for the select few and vernacular for the masses" was adopted."[২]

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথাও বলা হয়েছিলো এ ডেসপ্যাচে। এর ফলেই ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়েছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যার ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ভিত্তি হয়েছিলো আরো জোরদার। 'গ্রান্ট ইন এইড' প্রচলনের কথাও বলা হয়েছিলো এই ডেসপ্যাচে।

পরবর্তী পঞ্চাশ বছর উডের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই কমবেশি পরিচালিত হয়েছে সরকারি নীতি। সরকার শিক্ষা পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন বটে কিন্তু শিক্ষার ব্যয়ভারের বেশ খানিকটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালির ওপর। এবং তা পালিতও হয়েছে, বাংলার বিভিন্ন মফঃস্বল শহরের বনেদি স্কুল কলেজগুলি এখনো তার সাক্ষী।

সরকারি শিক্ষা কাঠামোটাও দেখা যাক। উচ্চতর শিক্ষা বিভক্ত ছিলো দুভাগে—মাধ্যমিক ও কলেজ। শেষোক্তটির শেষ পর্যায় ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মাধ্যমিক পর্যায়কে বিভক্ত কবা যায় দুভাগে—মিডল এবং হাইস্কুলে। বাংলায় মিডল স্কুল বিভক্ত ছিল আবার দুভাগে—মিডল ইংলিশ এবং মিডল ভার্নাকুলার। মিডল স্কুলের এক ধাপ উঁচুতে ছিল হাই ইংলিশ স্কুল যা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য তৈরি করতো ছাত্রদের। প্রায়

প্রত্যেকটি জেলা সদরে ছিল এ ধরনের স্কুল যেগুলিকে সাধারণভাবে অভিহিত করা হতো জেলা স্কুল বলে। সাধারণত ইংরেজিতেই এসব স্কুলে শিক্ষা দেয়া হতো। কলেজের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কলেজে চালু ছিলো বি. এ ও এম. এ কোর্স। দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে শুধু ফার্স্ট আর্টস। এখানে উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা আগ্রহের সৃষ্টি করেছিলো। কারণ, এ পর্যায়টি শেষ করলে অন্তত একটি নিম্ন পর্যায়ের চাকরির আশা ছিলো।

এ প্রসঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কারণ, বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তারা।

আগেই উল্লেখ করেছি, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানরা আগ্রহ দেখাননি এবং তাদের অনাগ্রহ তৎকালীন অনেক মুসলমান নেতার চোখ এড়িয়ে যায়নি। সর্বভারতীয় পটভূমিকায় সৈয়দ আহমেদ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ, মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্প্রীতি সহযোগিতা গড়ে তোলা যাতে সম্প্রদায়গতভাবে সুযোগ সুবিধা লাভ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ যার ফলে ঐ সব সুবিধা লাভে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।[৩] বাংলার পটভূমিকায় একই ভূমিকা পালন করেছিলেন আবদুল লতিফ। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং এ কারণে অনেকে তাঁকে কাফের আখ্যা দিতেও দ্বিধা করেনি।[৪] সম্প্রদায়গতভাবে যাতে মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় এবং নিজেদের উন্নতি করতে পারে সে জন্য আবদুল লতিফ দু'ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। সরকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং সে প্রভাব খাটিয়ে ও মতামত সৃষ্টি করে তিনি সহায়তা করেছিলেন কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ–ফরাসি বিভাগ খুলতে, বাঙালি মুসলমানের উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করতে যাতে মুসলমানরা সেখানে অধ্যায়নের সুযোগ পান। অন্যদিকে, যাতে এসব উদ্দেশ্য সফল হয় তার জন্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি মহামেডান লিটারেরি সোসাটি। ভারতীয় মুসলমানদের এ ধরনের সংগঠন ছিল প্রথম, এ সমিতির লক্ষ্য ছিল 'আলোচনা ও রচনা পাঠের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় দান এবং নিজেদের চিন্তাধারার উন্নতি ও বিকাশ সাধন, আর উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সরকারকে নানা পরামর্শ দান।[৫]

এর বিপরীতে ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন। মূল উদ্দেশ্য এক থাকলেও সংগঠন দুটিতে খানিকটা পার্থক্য ছিল, প্রথমোক্তটি সম্পূর্ণভাবে সরকারের আশ্রয়ে থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে চেয়েছে। শেষোক্তটি 'বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে ইংরেজবিরোধী চেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে যেসব সভাসমিতি গঠিত হয়', তার সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা করেনি।

তাদের এ প্রচেষ্টার ফলে, মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে সরকার গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে যে সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয় তার সব কটিতেই মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনে সুপারিশ করা হয়েছিলো।[৬] এবং এর সুফলও মুসলমানরা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমগ্র মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানের হার এতো স্বল্প ছিল যে উল্লেখ

করার মতো নয়। তবুও বলা যেতে পারে, এ সময়ই বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের ভিত্তিটি মাত্র স্থাপিত হয়েছিলো এবং আরো প্রায় অর্ধ শতক লেগেছিলো তা বিকশিত হতে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে, বলা যেতে পারে, আমার আলোচ্য সময়ে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছিলো এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে এটিই স্বাভাবিক হয়ে উঠছিলো। জমির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে না পেয়ে মধ্যস্বত্বের অধিকারীর সন্তানরা বিভিন্ন হাইস্কুলে ভিড় জমিয়েছিলো এবং সরকারি চাকুরি পাবার আশায় শিখছিলো ইংরেজি। এ জন্য তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছিলো, বিভিন্ন জেলা স্কুল বা কলেজিয়েট বা পোগজ স্কুলের মতো কিছু স্কুল এবং ঢাকা কলেজ। এক হিসাবে জানা যায়, ঢাকা বিভাগে ১৮৮১ সালে হাইস্কুলে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৫৯১ জন এবং ১৮৯১ তে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিলো ১০,৩৭১ জনে।[৮]

ঔপনিবেশিক সরকারের চাকুরি পাওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিলো শিক্ষা। ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষার ধাঁচ আবার এমন করেছিলেন, যার ফলে এ শিক্ষা মাধ্যম থেকে যারা এসেছিলেন তারা হয়েছিলেন অনুকরণকারী, সিভিল সার্ভিসের যে কোনো পদের আকাঙ্ক্ষী যা তাদের অর্থ ও ক্ষমতা দেবে। পূর্ববঙ্গের ইংরেজি শিক্ষিতরা পেশা হিসেবে, আমার আলোচ্য সময়ের শুরুতে কি বেছে নিচ্ছিলেন তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে, ঢাকা কলেজের ছাত্ররা কোন কোন পেশা বেছে নিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করে। এখানে উল্লেখ্য, কলেজের পড়া শেষ করে যে অনেকে চাকুরি নিয়েছিলেন তা নয়। ফোর্থ থেকে ফার্স্ট ক্লাস— এই চারটি শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই অনেকে পেশা বেছে নিয়েছিলেন। ১৮৪৮-১৮৫২ পর্যন্ত— এ চার বছরের এক তালিকায় দেখা গেছে অধিকাংশই (৪৪ জন) নিযুক্ত হয়েছিলেন ছোটখাট সরকারি চাকুরিতে। এসব চাকুরির মধ্যে ছিল কেরানি, সেরেস্তাদার, মুনসেফ, দারোগা (১০ জন) প্রভৃতি। চাকুরির বেতন ছিলো চল্লিশ থেকে একশ টাকা পর্যন্ত। তারপরে স্থান ছিল শিক্ষকতার। ১৫ থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত বেতনে ৩৫ জন নিযুক্ত হয়েছিলেন বিভিন্ন সরকারি বেসকারি স্কুলে। আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন চৌদ্দজন। একজন হয়েছিলেন একাউনটেন্ট। চারজন কলেজ পাস করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন এবং এদের মধ্যে একজন ছিলেন অন্নদা চরণ খাস্তগীর, যিনি পরে পূর্ববঙ্গের এক প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।[৯]

'ঢাকা প্রকাশ'—এ মূলত এসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত ও আগ্রহী-পত্রিকার পাতায় এ বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং ছাত্র বা তরুণরা যাতে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে আক্ষেপ করা হয়েছে, অনুযোগ করা হয়েছে এ কথা বলে যে ইংরেজ সরকার যথেষ্ট সহায়তা করছে না শিক্ষা বিষয়ে। যেমন, ১৮৬৩ সালে ক্ষোভ করে লেখা হয়েছে, মাত্র নয়লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে শিক্ষাখাতে। বিদ্যালয় ত্যাগীদের বিদ্যাশিক্ষা না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে "অবস্থার অপকৃষ্টতা, কাজকর্মের অতি ব্যাপৃতি, সামাজিক নিয়মের বিশৃঙ্খলা, অসুযোগ অনুচিত আত্মাদর বা আত্মাভিমান, বিলাস প্রিয়তা এবং আলস্য"—এর কারণ (৮.৭.৬৬)। স্কুলের অভাবের কথা, শিক্ষকদের স্বল্প বেতনের কথা উল্লেখ করে এ আবেদনই জানানো হয়েছে যে, "এতদঞ্চলীয় ছাত্রদিগের উচ্চ শিক্ষালাভের অসুবিধা দূরীকরণ নিতান্ত কর্তব্য।" (১৮,২,১৮৭৭)

স্ত্রী শিক্ষা স্বভাবিকভাবেই গত শতকে পিছিয়ে ছিলো। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ত্রী শিক্ষার বিপক্ষাচরণ করেছে ধর্মীয় কারণে। এ ছাড়া প্রবল পুরুষ শাসিত সমাজ, মহিলাদের দেখতে চেয়েছে অন্তপুরের নিভৃতে। তার মনের দিগন্ত প্রসারিত হোক শিক্ষার মাধ্যমে তা স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ সমাজ চায়নি। মিশনারি, বা ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকেই স্ত্রী শিক্ষার কথা বলেছেন, কিছু স্কুলও খোলা হয়েছিলো কিন্তু প্রবল ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের কারণে তা ফলবান হতে পারেনি। তবে, ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে, তারা এ ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতিতে সহায়তা করেছিলেন।

ব্রাহ্ম বা উদারপন্থী সংস্কারকরা স্ত্রী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন এ কারণে যে, তারা মনে করতেন, বাংলার সমাজ সংস্কার শুরু হতে হবে নারী মুক্তির মাধ্যমে কারণ আগামী দিনের নাগরিক তৈরি করবে মেয়েরাই। তবে, এ কথাও উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মরা মনে করতেন স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন আছে তবে ঝোঁক ছিলো নীতি শিক্ষার দিকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মরা বিশেষভাবে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও আত্মীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন। এ জন্য তারা অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা জাতীয় কিছু সভাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১০] 'ঢাকা প্রকাশ' যখন ব্রাহ্মদের নিয়ন্ত্রণে তখন খেদ করে পত্রিকায় লেখা হয়েছিলে— বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি হয় না। কারণ, 'যেন তেন প্রকারে' তা চালানো হয়। (১৮৬৯)

এ অধ্যায়ে একটি উপশিরোনাম—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি আলাদা শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাস রচনার জন্য তা আলাদাভাবে ব্যবহার করা যাবে। আমাদের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রূপরেখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত সংবাদসমূহ দেখলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন বিষয়ে যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় সে ব্যাপারে মধ্যবিত্ত আগ্রহ দেখাচ্ছিলো। [ শুধু তাই নয়, ঢাকা বা বাংলাদেশের আদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছিলো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা সম্মিলিত উদ্যোগে [ চাঁদার মাধ্যমে ]। এ ক্ষেত্রে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও পালন করেছিলেন বিশেষ ভূমিকা। ]

১. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৯০।

২. Ramesh Chandra Mitra, 'Educations', N. K. Sinha (ed) *The History of Bengal*, Calcutta, 1966, PP. 442-43.

৩. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, Dacca. 1974, PP. 48-49.

৪. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৮৪।

৫. ঐ।

৬. ঐ, পৃ. ৮৯।

৭. এ প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আহমদের পুত্র সৈয়দ মাহমুদের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

'In Bengal the percentage of Muhammadans in Arts Colleges, was 3.8 in 1882 and rose to 4.3 in 1887, sharing an increase of only 5 or $\frac{1}{2}$

percent ; but in the next quinquennial period ending in 1892 it rose from 4.3 to 5.7. showing an increase of 1.4 percent which would have been satisfactory had not the deficiency still remaining been so great as 27.2, which at the rate 1.4 percent. Progress in five years cannot be expected to be filled up in less than 61 years to bring up the percentage of Muhammadan students to the level of the percentage of Muhammadans in the population of Bengal.' S. A. Mahmood, 'A History of English Education in India.' quoted in Sufia Ahmed, *Ibid*, P. 50.

৮. F. H. B. Skrine, *Memorandum on the Material Condition of the Lower orders in Bengal during the ten years from 1881-82 to 1891-92.* Calcutta, P. 15.

৯. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, *Annual report of the College of Hadi Mohammod Mohsin with it subordinate schools and of the colleges of Dacca and Kishnaghus.* ৩ বছরের রিপোর্ট, ১৮৪৭-৪৮-১৮৫১-৫২।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৮৫।

# সংকলন

## শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট

১৮৬১–৬২ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ডিরেক্টর সাহেবের রিপোর্ট অবগতি হইল, বঙ্গদেশে ৯৬৫টি বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে, ৫৭,২০০ জন ছাত্র তাহাতে অধ্যয়ন করিতেছে। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৪৬৬টা ছাত্র বাড়িয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের নিমিত্তে ১১,০১,৪৬৬ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ২,২০,৬৮৮ টাকা ছাত্রগণের বেতন ও সাধারণের দান প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট ৮,৮০,৭৮৮ টাকা রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, পূর্বাপেক্ষা এদেশের বিদ্যাশিক্ষার সবিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট প্রজাগণের শিক্ষাদানে বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়াছেন। ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নয় যে, ইতঃপূর্বে যমালয়স্বরূপ গুরুমহাশয়দিগের কতিপয় পাঠশালা ব্যতীত একটা মাত্র উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল না। ... এ নিমিত্তে আমরা অতি কৃতজ্ঞ চিত্তে আমাদিগের করুণাময় বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে শতসহস্রবার ধন্যবাদ প্রদান করি। কিন্তু আবার যখন আমরা এদেশের লোকসংখ্যা এবং আয় চিন্তা করিয়া দেখি, তখন অন্তঃকরণ নিতান্ত পরিতাপিত হইয়া উঠে। তখন বোধহয়, এদেশে বিদ্যাশিক্ষার অদ্য পর্যন্ত কিছুমাত্র উন্নতি লাভ হয় নাই। গবর্নমেন্ট অদ্যপি প্রজাগণের শিক্ষাদান বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ করেন নাই। পাঠকবর্গও বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দেশের লোকসংখ্যা ৪ কোটি সেদেশে কেবল কিঞ্চিদধিক ৫৫ সহস্র লোক শিক্ষা পাইতেছে। এবং অন্যূন ১৪,১৩,২৩৫০০ টাকা যে দেশের বার্ষিক আয়, তত্রত্য গভর্নমেন্ট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ৯ লক্ষ টাকাও ব্যয় করিতেছেন না। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? ...

উডেন সাহেব অন্য এক স্থলে বলেন, এক্ষণে নর্ম্মাল স্কুলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার শিক্ষিতগণের তদুপযুক্ত কর্ম্মের নিতান্ত অসম্ভব দৃষ্ট হয়। অতএব তাঁরা অভিপ্রায় এই যে নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষার খর্ব্বতা করা হউক, নতুবা ইংরেজি শিক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া শিক্ষিতদিগকে ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকের উপযুক্ত করা যাউক। তিনি আরো বলেন, 'গত বর্ষের পরীক্ষার নম্বর দ্বারা দেখা যায়, সাধারণত হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের ১ম শ্রেণী কলকাতা নর্ম্মাল স্কুলের ২য় শ্রেণী এবং ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের ৩য় শ্রেণী উত্তম। এতদ্বারা বোধহয় ঢাকা জেলার বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হুগলি ও চব্বিশ পরগণার ছাত্রগণ হইতে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইয়া নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করে। ...

... মার্টিন সাহেবের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ব দক্ষিণ বিভাগে ২৫৯টা বিদ্যালয় আছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা ১৩,৪৮৯ জন। পূর্ব্বাপেক্ষা ঢাকা কলেজের ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্টিন সাহেব বলেন আমি যে কয়েকটি জেলা স্কুল দেখিয়াছি তন্মধ্যে বরিশালের স্কুল[৫০] সর্বোৎকৃষ্ট পোগস স্কুলকে[৫১] গভর্নমেন্টের উৎকৃষ্ট জেলা স্কুলের তুল্যকক্ষ বিবেচনা

করা যাইতে পারে। এবারে পোগস স্কুলের যতো অধিকসংখ্যক ছাত্র ১ম শ্রেণী পরীক্ষাত্তীর্ণ হইয়াছেন কলেজিয়েট স্কুল[৫২] কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্কুল এবং ময়মনসিংহ ও বরিসাল স্কুল ব্যতীত আর কোন স্কুলের ৯ম শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা তত দৃষ্ট হয় না। অথচ এই পোগস স্কুলের ছাত্রগণের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের মাসিক কেবল ৯৪ ব্যয় পড়ে। পূর্ব্বে একজন সাহেব বহুদিন পর্য্যন্ত পোগস স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন।[৫৩] তাহার আমলে আমরা একজন ছাত্রকেও প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে দেখি নাই। তিনি স্থানান্তরিত হইলে প্রথমতঃ আমাদিগের বর্তমান ডেপুটী ইনেস্পেক্টের শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়[৫৪], তৎপরি ঢাকা কলেজের সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন[৫৫] তৎস্থানাভিষিক্ত হন। ইহাদিগের পরিশ্রম ও শিক্ষা নৈপুণ্যেই পোগস স্কুলের এইরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ হইয়াছে। ... আশ্চর্য্যের বিষয় এই কর্ত্তৃপক্ষ একজন সাহেব শিক্ষককে যত বেতন দেন, তাহার তুল্য পদস্থ একজন বাঙালী শিক্ষককে প্রায়শঃ তাহা প্রদান করেন না। কুমিল্লা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ২০০ টাকা বেতন পাইতেছেন, কিন্তু এ বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরিসাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ১৫০ টাকার অধিক পান না। আবার আজি যদি একজন হতভাগ্য বাঙ্গালী কুমিল্লা স্কুলের শিক্ষক হন তবে অমনি ৫০টা টাকা সরকারে জব্দ করিয়া তাঁহার ১৫০ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? ...

ঢাকা বিভাগে এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিলক্ষণ বদ্ধমূল হইয়াছে। অদ্য পর্যন্ত এখানে অনেক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিবাহিতা স্ত্রীগণের শিক্ষার্থেও এ স্থলে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষাদাত্রীর অভাব না হইলে এখানে আরো অধিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইত।'

রিপোর্টের আর একস্থলে লিখিত হইয়াছে, 'ছাত্রগণ' পুরাবৃত্ত উত্তম রূপে জানে। কিন্তু আধুনিক বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারে না। এই—নিমিত্ত আমি (মার্টিন সাহেব) আমার সমুদয় সার্কেল বিদ্যালয়ে ৬ মাস পর্য্যন্ত একই খণ্ড ঢাকা প্রকাশ প্রদান করিয়াছি। সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছি, এক্ষণ অবধি ঐ সকল বিদ্যালয়কে নিজ মাশুলের ব্যয় দিতে হইবে। এতদ্বারা দেখা যাইবে, ছাত্রগণ সংবাদপত্র পাঠ করিতে কতদূর পর্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছে। ...

কাশী বাবুর রিপোর্টেরও কিয়দংশ গৃহীত হইল।

'গত বৎসর ঢাকা বিভাগে ৭টা ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয় ছিল এ বৎসর ১টা হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেন্টের মাসিক দাতব্য ২৬২ টাকা। এতদ্দ্বারা ৯৮০ জন বালক (গত বৎসর ৮০৭ জন ছিল) শিক্ষা পাইতেছে। প্রত্যেক বালকের নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের মাসিক ৩ পাই ব্যয় হইয়া থাকে।

'বঙ্গ বিদ্যালয়।—গত বৎসর ১১টা বঙ্গ বিদ্যালয় ছিল। এ বৎসর ১৫টা হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের মাসিক দাতব্য ১৭৮ টাকা। ইহাতে ৭৯৫ জন ছাত্র (গত বৎসর ৫৭২ জন ছিল) গড়ে ৬ পাই ব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছে। অনেক বঙ্গ বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা হইতেছে। এবং কোন ২ সার্কেল বিদ্যালয়তে ও স্থানীয় লোকেরা স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ছাত্র দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেছেন।'

'সর্কেল স্কুল—এক্ষণে ১৭টা সর্কেল এবং ৪৯ টা পাঠশালা আছে। তাহার ছাত্র সংখ্যা ২২৩০ জন। প্রত্যেক ছাত্রের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের মাসিক ৮৷১০ পাই ব্যয় হইয়া থাকে, গত পরীক্ষার তৃতীয় স্থলই সর্কেল স্কুলের একজন বালকপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

'বালিকা বিদ্যালয়।—যে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশের অবলাগণ সুশিক্ষিত না হইবে, যে পর্য্যন্ত আমাদিগের অন্তঃপুরে বিদ্যালোক প্রবেশ না করিবে, সে পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় লোকের অবস্থা প্রকৃত উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারিবে না। সৌভাগ্যের বিষয় এই এক্ষণে স্থানে ২-ই বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে।

ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের[৫৬] প্রধান শিক্ষক এরাটুন সাহেবের রিপোর্টের ও কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম।

'গত বৎসর এই নর্ম্মাল স্কুলে হইতে ৯৯ জন শিক্ষক প্রেরিত হইয়াছেন। ডিরেক্টর সাহেব ইহার কার্য দর্শন করিয়া নিতান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বৎসর অন্যান্য নর্ম্মাল স্কুল হইতে বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল উৎকৃষ্ট নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা ও হুগলীর বালকগণ পূর্ব্বদেশীয় বালকগণ অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় অধিকতর পটু বলিয়া আমাদিগের যে সংকার ছিল, এতদ্বারা তাহার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

৯ এপ্রিল, ১৮৬৩

## বিদ্যালয় ত্যাগী এদেশীয়দিগের আর বিদ্যোন্নতি হয় না কেন?

পঠদ্দশায় এদেশীয় ছাত্রগণ প্রায় কোন বিদেশীয় ছাত্রের সহিত প্রতিযোগিতা সংরক্ষণে অপারগ হয়েন না। প্রত্যুত বিষয় বিশেষে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কি শ্রেণীর দৈনিক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, কি উপাধি পরীক্ষা, কোন পরীক্ষায়ই কেহ এরূপ বলিতে পারিবেন না, সাধারণতঃ এদেশীয় ছাত্রগণ বিদেশীয়দিগের নিকট হীনতর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত ক্ষোভ, লজ্জা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া একবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে ইহাদিগের সেই উৎকর্ষ আর লক্ষিত হয় না। পঠদ্দশায় পর আত্মচেষ্টায় দিন দিন ইহারা উন্নত হইবেন কি, সমগুণোপেত তুল্যবিদ্যা ইউরোপীয় প্রভৃতির নিকটে একান্ত হীন ও অপকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন ইহাদিগের শিক্ষা প্রবৃত্তি উদ্যম উৎসাহ সকলই লুপ্ত হইয়া যায়। আমরা কল্পনার বশবর্তী হইয়া এরূপ বলিতেছিনা।

... কিন্তু এদেশীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে সবিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বিদ্যালয় পরিত্যাগান্তর আর বিদ্যালোচনা না করাতে তাহারা এক প্রকার লুপ্ত বিদ্যা ও লুপ্তনামা হইয়া বসিয়াছেন। এরূপ হইবার অনেকগুলি গুরুতর কারণ আছে, আমরা এক এক করিয়া তাহার কতিপয় কারণ প্রকাশ করিতেছি।—

আমাদিগের বিবেচনায় অবস্থার অপকৃষ্টতা, কাজ কর্ম্মের অতি ব্যাপৃতি, সামাজিক নিয়মের বিশৃংখলা, অসুযোগ অনুচিত আত্মাদর বা আত্মাভিমান, বিলাস প্রিয়তা এবং আলস্য, প্রধানতঃ এই কয়েকটি কারণে বিদ্যালয়ত্যাগী এদেশীয় ব্যক্তিদিগের শিক্ষোন্নতি হয় না। ইহার সকল কারণ সকলের সম্বন্ধে লক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু কোন এক বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিদ্যোন্নতির প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই। ...

... বিদ্যালয় ত্যাগী ব্যক্তিদিগের শিক্ষোন্নতির যে সকল অন্তরায়ের কথা উল্লেখিত হইল, এক জ্ঞানতৃষ্ণার সমুচিত সদ্ভাব থাকিলে উহার সকলই অতিক্রান্ত হইতে পারে। সত্য বটে, উহার কোন কোন অবস্থায় বিদ্যোন্নতি সংসাধন নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে, কিন্তু বলবতী জ্ঞান-তৃষ্ণানুযায়িনী সুদৃঢ় চেষ্টা থাকিলে কিঞ্চিন্মাত্র ও উন্নতি করা যায়না ইহা শ্রোতব্য কথা নহে। দিন২ বুভুৎসাকে বলবতী কর এবং তাহার তৃপ্তি সাধনে আন্তরিক চেষ্টাবান হও, অবশ্যই কোন না কোনরূপ সুবিধা হইওয়া উঠিবে। নিশ্চয় বিশ্বাস রাখিতে অধিকতর উন্মাতিপথে অগ্রসর না হইলে সত্বর অবনত হইয়া পড়িবে। জ্ঞান ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সীমানাই,. যত ইচ্ছা কর, ততই উপার্জ্জন করিতে পারে। অতএব জীবনের একদিন অবশিষ্ট থাকিতেও তল্লাভে সযত্ন হওয়া উচিত।—

৮ জুলাই, ১৮৬৬

## বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অভিপ্রায়।

আমাদিগের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন[৫৬] বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে সংপ্রতি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ পূর্ব্ববৎ স্বভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, তিনি ইউনিবার্সিটি পরীক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি পরিপক্ক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইউনিবার্সিটি সভা যদি তদনুসারিনী হইয়া নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। অপেক্ষাকৃত অনেক অনেক উৎকৃষ্টতর ফল লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বলেন, "বিগত বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৫০০ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ৫১০ জন, অর্থাৎ শতকরা ৩৪ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ৫৯ জন অর্থাৎ শতকরা ৪ জন প্রথম শ্রেণীতে, আর ৪৫১ জন বা শতকরা ৩০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থিরকৃত হইয়াছে তিন ২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন অনুত্তীর্ণ রহিয়াছে? অনুত্তীর্ণ ৯৯০ জনের মধ্যে ২৯ জনই পরীক্ষাকালে অনুপস্থিত ছিল। অবশিষ্ট ৯৬১ জনের মধ্যে অন্যুন ৭৩৩ জন ইংরেজী সাহিত্যে এবং ১৩৩ জন গনিতে অকৃতকার্য হইয়াছে। ইতিহাস ভূগোল ও দেশীয় ভাষায় অতি অল্প সংখ্যক লোকই ফেইল হইয়াছে। ১৬০টি স্কুল হইতে পরীক্ষার্থ ছাত্র প্রেরিত হয় তন্মধ্যে ৫০টি স্কুল হইতে যে ১৬০ জন ছাত্র পরীক্ষা প্রদান করে তাহাদের একটিও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। বাঁকুড়া স্কুলেই সর্ব্বাপেক্ষা অকৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। ১৮ জন ছাত্র ঐই স্কুল হইতে প্রেরিত তন্মধ্যে একজন উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।—

... পরীক্ষার এইরূপ ফল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সকল ব্যক্তি পরীক্ষাদানে অনুপযুক্ত, বহু সংখ্যক সেইরূপ লোক পরীক্ষার্থী হইয়া থাকে। অতএব পরীক্ষার্থী গ্রহণ বিষয়ে কোন সুনিয়ম বিধান করা আবশ্যক। যাহারা যোগ্যতা ও উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা সূচক শিক্ষকের সার্টিফিকেট প্রদর্শন না করিতে না পারে তাহাদিগকে পরীক্ষার্থী গ্রহণ করা উচিত নয়। যে সকল শিক্ষক সবিশেষ বিবেচনা করিয়া না করিয়া ঐরূপ সার্টিফিকেট দেন, তাহাদিগের বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। বিদ্যাধ্যাপন সংক্রান্ত ডিকেকটরের এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। যে সকল স্কুলের পরীক্ষার ফল দ্বারা দেখা যায়। কেবল শিক্ষা প্রণালীর দোষ ও পরীক্ষার্থী নির্ব্বাচনের ত্রুটি বশতঃই ফল অসন্তোষজনক হইয়াছে, ডিরেকটর সাহেবের তাহার অনুসন্ধান করিয়া যথোচিত নিয়ম করা বিধেয়। বাস্তবিক

এই দোষাপনয়নের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তেই আছে। আমার বিবেচনায় যাহাদিগের যাহাদিগের পরীক্ষা দিয়া কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে পরীক্ষার্থী হইতে দেওয়া না হয় এ জন্য সুদৃঢ় নিয়ম করা আবশ্যক। এ জন্য পরীক্ষার ফিস বর্দ্ধিত করা অনুচিত নয়"। ৪৪৬ জন, এল. এ. পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২০২ জন অথবা শতকরা ৪৫ জন সমুত্তীর্ণ। তন্মেধ্যে ২৮ জন বা শতকরা ৬ জন মাত্র প্রথমশ্রেণী। ২৪৪ জন অনুত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ৭ জন পরীক্ষাকালে অনুপস্থিত ছিল। অবশিষ্ট ২৩৭ জনের মধ্যে ২০৪ জনই ইংরাজী সাহিত্যে অকৃতকার্য্য হইয়াছে।—

... যাহা হউক এইরূপ ফলদর্শনে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যাহাদিগের কৃতকার্য্যতা লাভের কোন সম্ভাবনা ছিলনা, তাদৃশ বহুসংখ্যক ছাত্রও পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। বি. এ. পরীক্ষার ফল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। ১২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৯ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মেধ্যে ২০ জন অর্থাৎ শতকরা ১৬ জন প্রথম শ্রেণী। ইংরাজী সাহিত্য নীতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানেই অধিকাংশ মাত্র অকৃতকার্য হইয়াছে। গনিতে ১৫ জন মাত্র অনুত্তীর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন এম. এ. পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ। এই পরীক্ষায় কতজন অকৃতকার্য্য হইয়াছে অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই। যাহা হউক এম. এ. পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে"। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অভিপ্রায়পাঠে স্পষ্টপ্রতীয়মান হইতেছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অপেক্ষা অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা অধিক দেখিয়া তিনি নিতান্ত অসন্তোষ লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে অযোগ্য ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া অনুচিত বলিয়া অবধাবন করিয়াছেন।

... অতএব অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের পরীক্ষার্থী হইতে দেওয়া সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। বীডন বাহাদুর এতৎ প্রতীকারার্থ প্রধানতঃ দুইটি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—এক পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের যোগ্যতা সূচক শিক্ষকের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তন, আর পরীক্ষার ফিস অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া। প্রথম উপায়টি আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। শিক্ষকগণের এরূপ সার্টিফিকেট দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে এবং অন্যায় সার্টিফিকেট দেওয়া না হয় এজন্য সমুচিত শাসন থাকিলে অযোগ্য ব্যক্তির পরীক্ষার্থী হওয়া সম্ভাবিত নয়। এক্ষণ সচ্চরিত্রতা সূচক সার্টিফিকেট প্রদর্শিত হইয়া থাকে সত্য। কিন্তু তদ্বিষয়ে তত আঁটাআঁটি নাই। কোন শিক্ষক যদি কোন ২ ছাত্রকে, এইরূপ সার্টিফিকেট দিতে অসম্মত হন তাহারা অনায়াসে স্কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁর তাঁর একখানি ঐরূপ সার্টিফিকেট লইয়া অন্ততঃ প্রাইবেট ছাত্র স্বরূপ পরীক্ষা দিয়া থাকে। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের প্রস্তাবানুরূপ সার্টিফিকেট প্রদর্শনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে আর এরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না। দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে আমাদিগের সবিশেষ আপত্তি আছে। এক্ষণ যে পরিমাণে পরীক্ষার ফিস গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহাতেই অনেকের বিলক্ষণ কষ্ট হয়। এতদপেক্ষাও যদি উক্ত ফিস বর্দ্ধিত করা হয় অনেকেরই পরীক্ষা দেওয়া সুসাম্য হইবেনা। প্রবেশিকা পরীক্ষা কেবল শিক্ষা সংসারের নয় আজি কালি কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবারও প্রথম দ্বার স্বরূপ। যদি পরীক্ষার ফিস বর্দ্ধিত করিয়া অনেকের সম্বন্ধে সেই দ্বার রুদ্ধ করা হয়, যার পর নাই অন্যায় করা হইবে। পূর্ব্বে ওকালতী পরীক্ষণ দানে প্রায় সকলেরই অধিকার ছিল। কিন্তু এক্ষণ প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ না হইলে কেহ তাহাতে অধিকারী হইবেনা। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বারাও যদি সাধারনের দুষ্প্রবেশ্য হয়, ভবিষতে সম্পন্ন লোকের সন্তানগণ

ব্যতীত ওকালতী প্রভৃতি উচ্চপদ অন্যের অধিগম্য হইবেনা। লেপ্টেনেন্ট গভর্নর যদি অনুসন্ধান করেন, দেখিতে পাইবেন, এ পর্যন্ত.এদেশে যত লোক সুশিক্ষিত হইয়া পদস্থ হইয়াছেন, তন্মেধ্যে আঢ্য সন্তান অপেক্ষা অসম্পন্ন লোকের সংখ্যাই অধিক। এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বেও যদি শিক্ষা এতব্যয় সাধ্য ব্যাপার হইত কদাচ তাহারা কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইতেন না। সংপ্রতি উহা আরো বহু ব্যয়সাধ্য সুশিক্ষা ও উচ্চ পদাদি লাভে বঞ্চিত রাখা কি ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য। উপসংহার কালে আমরা আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রের সমুত্তীর্ণ না হইবার যিনিই যে কারণ নির্দ্দেশ করুন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় অধুনাতন শিক্ষা প্রণালীর দোষে ও পরীক্ষকদিগের ক্রুটিই প্রধান। ইংরাজী সাহিত্যে অনেকগুলি ছাত্রকে অনুত্তীর্ণ দেখিয়া বীডন সাহেবও একথা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন, যে প্রণালীতে এখন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে বাস্তবিক ব্যুৎপত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক কয়েকখানি মুখস্থ করিয়া কোন প্রকারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে, ইহাই এক্ষণকার শিক্ষার মুখ্যোদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু যদি পরীক্ষকগণ পুস্তক ছাড়িয়া বা একটুকু এদিক ওদিক করিয়া প্রশ্ন দেন, সাধারন বুৎপত্তি না থাক্যতে তদুত্তর দানে কৃত কার্য্যতা লাভ দুরূহ হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ইহা কি শিক্ষা প্রণালী সংক্রান্ত গর্হিত দোষ নহে? গত পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যে যে এত ছাত্র ফেইল হইয়াছে, এইরুপ প্রশ্ন দেওয়া তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। যাহা হউক পরীক্ষকদিগের দোষেও ঐরূপ ফল লক্ষিত হইয়া থাকে। একথা বোধ হয় অনেকে স্বীকার না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, যেরূপে পরীক্ষার কাগজ দর্শন করা উচিত অনেক পরীক্ষকই সেরূপ করেন না। আমরা শুনিয়াছি গত প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয় বিশেষের পরীক্ষক নম্বর দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইয়া যাওয়াতে কয়েকজন মিশনরিকে তাঁহার সহকারী স্বরূপ ঠিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা (তাড়াতাড়ি) করিয়া পরীক্ষা করাতেই ফল অতি অসন্তোষজনক হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে পরীক্ষকদিগের বিদ্যা বাহির হইয়া পরে, আমাদিগের প্রত্যক্ষ গোচর হইতেও তাহা অবশিষ্ট নাই। গত পূর্ব্ব প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে ঢাকা কলেজের একজন ছাত্র কেবল ফিস মাত্র দাখিল করিয়াছিল পীড়াবশতঃ পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু পরীক্ষকদিগের গুণে সে অনায়াসে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইল।—

### এতদঞ্চলের সংস্কৃত টোল সমূহে গবর্ণমেন্টের সাহায্য দান

পাঠকবর্গ অদ্যতন ঢাকা প্রকাশের একটি বিজ্ঞাপন জানিতে পাইবেন, গবর্ণমেন্ট এতদঞ্চলের সংস্কৃত টোলসমূহের উন্নতি সাধন জন্য বর্ত্তমান বর্ষে ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। গত বর্ষে এতদর্থে ৩৫০ টাকা প্রদান করা হয়। এবারে পাঁচশত টাকা প্রদান করা হইল ভবিষ্যতে আরো অধিকদান করা হইবে এরূপ ভরসা কবা যাইতে পারে। ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় গবর্ণমেন্ট অস্মদ্দেশীয় মৃত কল্পা সংস্কৃত ভাযার জীবন রক্ষণে সযত্ন হইয়াছেন, ইহা গবর্ণমেন্টের অল্প উদারতা ও আমাদিগের অল্প আনন্দের বিষয় নয়। এদেশীয় সকলেরই কৃতজ্ঞচিত্তে গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। গত ৩১ শে বৈশাখের ঢাকা প্রকাশে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। বিগত বর্ষে এতদঞ্চলস্থ সংস্কৃত টোলের ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়দিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহার কতক টাকা এ পর্যন্ত বিক্রমপুরের স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত

আছে। অদ্যাপি তাহাদিগের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই। অত্রত্য হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার কোন২ সভ্য অধ্যাপক গণকে উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই তাহারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। আমরা কোন প্রামানিক লোক প্রমুখাও শুনিয়াই এরূপ লিখিয়াছিলাম। এক্ষনে শুনিতে পাইলাম, স্কুল ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবও ঐরূপ রিপোর্ট করিয়াছিলেন। যাহা হউক স্থানীয় কোন পত্রিক সম্পাদক আমাদিগের কথায় প্রতিবাদ করিয়া লিখেন, "হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিনী সভার[৫৭] সভ্যগণ অধ্যাপকদিগকে উক্ত টাকা লইতে নিষেধ করিয়া দেন নাই। তাহারা আপনা হইতেই গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মত।" যে কারণেই হউক বিক্রমপুরস্থ কোন২ প্রধান অধ্যাপক যেমন—গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত টাকা গ্রহণে সম্মত হইতেছেন না, তখন অন্যান্য অধ্যাপকেরা সাহস অবলম্বন করিবেন আমাদিগের অন্তঃকরণে স্থান পাইতেছে না। অতএব গবর্ণমেন্ট যে উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ সংস্কৃত টোলের সাহায্য দানে উম্মুখ হইয়াছেন, সে উদ্দেশ্য বৃথায় যাইবে। সুতরাং গবর্ণমেন্ট উত্তরোত্তর টোল সমূহে অধিকতর সাহায্য দিবেন থাকুক। এক্ষণ যাহা দান করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহাও স্থগিত করিয়া দিবেন। ইহা কি সামান্য লজ্জা ও দুঃখের বিষয় হইবে? যে কার্য্যের উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী নাই, সে কার্য্যে যদি গবর্ণমেন্ট আগ্রহ পূর্ব্বক উৎসাহ প্রদর্শন ও সাহায্য দান করেন, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তৎপ্রত্যাখ্যান নি আমরা অধ্যাপকগণকে সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যদি সংস্কৃত ভাষা ও টোলের জীবন রক্ষা করিতে চান, বৃথা মান অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কখনো যেন রাজকীয় উৎসাহে উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন। রাজাকে হীন জাতি বিবেচনা করিয়া তৎসাহায্য গ্রহণে অসম্মত হওয়া কোন শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য? আমরা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভ্যগণকেও বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতে যথার্থই যদি তাহাদিগের উক্ত কার্য্যে অমত না হয়, তাহারাও একবার সভার পক্ষ হইতে অধ্যাপকগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করুন। ভরসা করি হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণীসভা প্রযত্ন প্ররায়ণ হইলে টোল ধারী পণ্ডিতগণ এ পর্যন্ত অসম্মত থাকিলেও সম্মত হইতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাধ্যাপন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষকে একটি কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাব উপসংহার করিতেছি। গতবর্ষে বিক্রমপুর ও পারজোয়ার ব্যতীত অন্যান্য স্থানের টোল সমূহে পরীক্ষার সংবাদ বড় প্রচার হইয়াছিল না। সুতরাং কেবল উক্ত স্থান হইতে কয়েকটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এবার যেন সেরূপ না হয়। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর, পারজোয়ার, চাঁদপ্রতাপ ভাওয়াল ও সোনার গাঁ, প্রভৃতি প্রত্যেক পরগনার টোল সমূহেই যেন সবিশেষরূপে পরীক্ষার সংবাদ প্রচার করা হয়। তাহাতে যেমন কর্তৃপক্ষের সমদর্শিতা প্রকাশ পাইবে, সেইরূপ পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা উপরিউক্ত আশঙ্কাও ক্রমে বিদূরিত হইবে।

১২ আগস্ট, ১৮৬৬

## বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি হয় না কেন?

বিদ্যাধ্যাপনার ডিরেক্টর ১৮৬৮ সনের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট নিতান্ত অসন্তোষ সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, বালিকা বিদ্যালয়ের অত্যন্ত অনুন্নতি লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এবার (১৮৬৮ সনে) বালক বিদ্যালয় ও তত্রস্থ ছাত্রীসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

আমরা এখন ডিরেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, বালিকা বিদ্যালয়ে এরূপ অনুন্নতির কারণ কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন? কেবল অনুন্নতি দর্শনে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বসিয়া

থাকিলে চলিবে না। ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতি বিধান চেষ্টায় তৎপর হইতে হইবে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে বালিকা বিদ্যালয়ের অনুন্নতির অনেকগুলি কারণ দৃষ্ট হয়। যতদিন না তাহার কোন প্রকার প্রতিবিধান করা হইবে তত দিন বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নতির আশা করা বৃথা। কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেন্ট কত দূর মনোযোগী হইবেন বলিয়া আশা করা যায় না। এখন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি গবর্ণমেন্টের বিশেষ একটা যত্ন দেখা যাইতেছে না। বালক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রভৃতির প্রতি গবর্ণমেন্টের যে প্রকার যত্ন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি সেইরূপ যত্ন থাকিলে বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি হইত। এখন যে প্রণালীতে বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতে বিশেষ ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বরং মধ্যে২ মহৎ অনিষ্টই সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এরূপ অনুন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এখন প্রায়ই যেমন তেমন একজন শিক্ষকের দ্বারা বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিন্তু সেরূপ শিক্ষকদিগের দ্বারা যে বালিকাদিগের বিশেষ শিক্ষা হইতে পারে আমাদের এরূপ বিশ্বাস নাই। কারণ স্ত্রীলোকের প্রকৃতি স্ত্রীলোকে যত বুঝিতে পারেন, পুরুষের তত বুঝিবার শক্তি নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় শিক্ষকই অতি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত লোক নন। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ... [ অস্পষ্ট ]

১১ এপ্রিল, ১৮৬৯

### উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষা

গবর্ণমেন্টের কলেজ ও স্কুল সমূহে ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করা হইতেছে, চতুর্দ্দিক হইতে এই জনশ্রুতি আসিয়া লোক সমস্তকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যেরূপ একগুঁয়ে, সময়ে এই জন শ্রুতি সর্ব্বত্র সফল হওয়া বিচিত্র নয়। গবর্ণমেন্ট কাহারো কথা শুনেনা। যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, সহস্র২ লোকের এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের পর্য্যন্ত অমত হইলেও তাহা করিবেন। এবারকার ইন্‌কামটাক্স তাহার এক দৃষ্টান্ত। উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষাতেও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। সাধারণ লোকে যে ইহার প্রতিবাদী, তাহারত কোন কথাই নাই। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ও শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ডিরেক্টর সাহেব পর্যন্ত ইহাতে সায় দিতেছে না। এদ্বিষয়ের অনৈক্য নিবন্ধন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর স্বীয়পদ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট কিরূপ দুর্ম্মন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়া এতদনুষ্ঠানেকৃত সংকল্প হইয়াছেন বলিতে পারিনা। ইহার অভিসন্ধি কোন অংশেই সৎ নহে।

ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করিলে মধ্যবিত্ত লোকের উচ্চশিক্ষা একবারে রহিত হইয়া যাইবে। যাঁহারা নিতান্ত ধনী তাঁহারা ব্যতীত কেহই কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। কিন্তু বড় লোকে শিক্ষার জন্য অতি অল্পই চিন্তা করেন। কারণ তাহারা অর্থের অভাব বোধ করেননা। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও উদরান্নের জন্য ব্যস্ত। সুতরাং শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বিধান করিতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, উন্নত ইংলণ্ডেও তাহা অদ্যপর্য্যন্ত হইতেছে না। ভারতবর্ষের সে অবস্থার অনেক বাকি আছে। আজিকালি ইংলণ্ডে আলোচনা হইতেছে, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা। যখন এত উন্নত দেশেই নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা লইয়া এত গোলযোগ, তখন ভারতবর্ষে তাহা কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে, সহজেই অনুমিত হয়। লাভ এই হইবে, শিক্ষা এক প্রকার উঠিয়া যাইবে।

এরূপ হইলে গভর্নমেন্টের অভীষ্ট সিদ্ধি হইল, তাঁহারা মুখে বলেন, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষায় অধিক যত্ন করার জন্য উচ্চ শিক্ষা খর্ব্ব করা হইতেছে। ইহা যে নিতান্ত অযৌক্তিক ও অন্যায় কথা সকলেই বুঝিতে পারে না। নিম্ন শ্রেণীর প্রতি এত দয়া হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা হ্রস্ব করার আবশ্যক কি? ছাত্র বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চ শিক্ষার বিনাশ হইবে। হয়ত দুইটী একটী লোক এত অধিক বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিবেন। আমরা যত কেন চীৎকার না করি, গবর্ণমেন্টের দুর্ম্মতি বিদূরিত হইবার নয়।

৭ মে, ১৮৭০

## বিদ্যাধ্যাপন সম্বন্ধে নতুন গবর্ণর জেনারেলের অভিপ্রায়

অনেকগুলি দুরাশয় লোকের আন্তরিক অভিপ্রায় এই, এতদ্দেশীয়রা চীরকাল নিকৃষ্টাবস্থ থাকিয়া শ্বেত কান্তি ইউরোপীয়দিগের পদতলশায়ী থাকে। অধিক পরিমাণে জ্ঞান শিক্ষা পাইলে ইহাদিগকে ঠকাইয়া উঠা সুকঠিন হইবে, ক্রমে২ স্বাধিকার বুঝিয়া অনেক প্রলোভনীয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া বসিবে। এবং রাজকীয় উচ্চ উচ্চ পদ ও মানসম্ভ্রম লাভ করিয়া সাধারণ ইংরেজ প্রভৃতিকে আমলে আনিবে না, এই সকল মান করিয়াই উক্ত দুরাশয়েরা এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূল চেষ্টা করিয়া থাকেন এই মহাপুরুষ দিগের মুখেই মধ্যে মধ্যে এই উক্তি বিশ্রুত হইয়া থাকে, এদেশীয়েরা অধিক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিলে (সমুদয়) শক্তিশালী হইয়া ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা স্বাধীন হইয়া বসিবে। অতএব ইংরেজ গবর্ণমেন্টের উচিত, এতদ্দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা না দিয়া যৎসামান্য শিক্ষাদান পূর্ব্বক ইংরেজ জাতির বাহ্য সভ্যতা মাত্র প্রদর্শন করেন। এবংবিধ মত যে উদার প্রকৃতি সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিতান্তই ঘৃণিত তাহা বলা বাহুল্য। আমাদিগের নবাগত গবর্ণর জেনেরল আরমেল মেয়[৫৮] বাহাদুর সংপ্রতি এতৎসম্বন্ধে সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে। "একদা এমন সময়ও ছিল, তখন ভারতবর্ষীয়দিগকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা হইত। তখন অনেক বিজ্ঞ২ পদস্থ ব্যক্তিরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন, এদেশীয়দিগকে সমধিকরূপে শিক্ষা দান হইলে গবর্ণমেন্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন এবং সম্ভ্রান্ত ধনীরা দুর্ব্বল দিগের প্রতি অধিকতর অত্যাচারী হইবে। কিন্তু এখন আর সেরূপ আশঙ্কা নাই। পরে যাহারা এদেশে আগমন করিয়াছেন, তাহারা এদেশে সাধারনরূপে শিক্ষাদান করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। যদিও সেই প্রণালী এখন পর্য্যন্ত শৈশবাবস্থ রহিয়াছে তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে সেই প্রণালী দ্বারাই তোমরা সবিশেষ উপকৃত হইয়াছ। যাহারা উক্ত প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, এতদ্বারা—ইংলিশ গবর্ণমেন্ট দুর্ব্বল হইবে কিনা তাহারা সে বিষয়ে সংশয় মাত্র করেন নাই। গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিয়াই করিয়াছেন। গ্রেটব্রিটেনের প্রজাবর্গও শিক্ষা দান বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক যেরূপ উপকৃত হইতেছে এখানকার প্রজাবর্গও ঠিক সেইরূপ। তোমাদিগের কর্ত্তারা সেই সর্ব্বফল প্রদাতা ঈশ্বরের হস্তে ফল রাখিয়া এতদ্বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য সমাধান করিতেছেন। আমি সরলভাবে ব্যক্ত করিতে পারি আমাদিগের যে কোন কার্য্য করা হয় তাহার প্রকাশ্যরূপে সাধারনের সমক্ষেই করা হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদিগের কোন আশঙ্কা নাই। এক্ষণ তোমরা যেরূপ রাজনিয়ম দ্বারা শাসিত হইতেছ তাহার সহিত অন্যান্য দেশের অন্যান্য

জাতির এবং অন্যান্য কালের বিজ্ঞজন সম্মত রাজনিয়মের তুলনা করিলে ইহাকে উৎকৃষ্টতর বোধ হয় না? ইতিহাস অধ্যয়ন কর এবং শত ২ বৎসরের পূর্ব্বতন শাসন প্রণালীর সহিত এক্ষণকার শাসনপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখ তাহাতে কি বর্ত্তমান শাসন প্রণালীকে নিকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়? তোমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রধান২ কার্য্য হইতেছে তাহা নিরীক্ষণ এবং বিবেচনা করিয়া দেখ বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা তোমাদিগের সুফল সমুৎপন্ন হইতেছে কিনা যদি হয় তবে তোমাদিগের ইহা আদরনীয় না হইবে কিনা? আমাদিগের সর্ব্বোপরি অহঙ্কার এই, আমরা যে সময় হইতে একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি, তদবধিই সকল স্থানেই সভ্যতা ও উন্নতির দূত স্বরূপ হইয়াছি। এতাদৃশ জাতিও কি জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিদ্যোন্নতিতে ভয় বা আশঙ্কা করিতে পারে। কখনই নহে। আমরা তোমাদিগকে জ্ঞান লাভের সকল সুবিধা করিয়া দিতেছি। তোমরা আমাদিগের সঙ্গে আগমন কর। এ বিষয়ে আমরা তোমাদিগের নিকটে কোন একবার চাইনা, স্বাধীনরূপে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিঃসন্দেহ ও অকুণ্ঠিতভাবে আগমন কর। আমার ইহাও ভরসা আছে, যে এই সকল স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা আমরা মহারানীর কি শ্বেত কি কাল সকল প্রকার প্রজাবর্গকে পরস্পর বাঙ্গলা শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন। এতদ্বিষয় প্রতিপাদনার্থ গবর্ণমেন্ট যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কতদূর সারগর্ভ তাহাও আমাদের আলোচনীয়। এই বিষয় উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট দুইটী কথা বলিয়াছেন।

**প্রথমতঃ** ইংরাজী শিক্ষাকে এদেশীয় লোকে এত উপকারী দেখিতে পাইয়াছেন, এবং তন্নিমিত্ত তাহারা এমত ব্যগ্র যে তাহার সম্যক ব্যয় তাঁহাদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতে পারে, অথবা হওয়া উচিত। তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের অর্থ তজ্জন্য ব্যয়িত না হইয়াও কার্য্য চলিতে পারে।

**দ্বিতীয়তঃ** এদেশীয় লোকে ইংরাজী শিক্ষার যে এত আদর করেন, সে কেবল ঐ বিদ্যার অর্থাগম বিষয়ক উপকারিতার জন্য এদেশীয় ভাষার শিক্ষালাভ করিতে অনিচ্ছুক ইহাকে এইরূপপই অনুভূত হয়, যে এদেশীয় লোকে শিক্ষার প্রকৃত ফল লাভের জন্য ব্যগ্র নহেন। অতএব দেশীয় ভাষার শিক্ষা দ্বারা লোকের যে মানসিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা, সেই উন্নতির জন্য এই শিক্ষাই গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত বিষয়।

গবর্ণমেন্টের এই যুক্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, যে শ্রেণীস্থ লোক এইক্ষণ ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিলে এরূপ প্রতীতি হইবে কিনা যে ইংরাজী শিক্ষা হইতে গবর্ণমেন্ট সাহায্য এককাবলে উঠাইয়া লইলে অশেষবিধ মন্দফল উৎপন্ন হইবে।

আমাদিগকে ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে দেশের সাধারণ হিত সম্বন্ধে বাঙ্গলা শিক্ষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষা অশেষ পরিমাণে কার্য্যকর কিনা। এবং ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা যে আমাদিগের মানসিক উন্নতি এবং অর্থাগমের সুবিধা এই উভয়বিধ সুফল উৎপন্ন হয় তাহাই অধিক প্রয়োজনীয় এবং উপকারী, না যাহা দ্বারা কেবল মানসিক উন্নতি হইতে পারে; সেই বাঙ্গলা শিক্ষাই অধিক প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিলে সেই কার্য্যের ফল দৃষ্টি করিয়াই ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা দুইটী ফল উৎপন্ন হয়, এক তদ্দ্বারা আমাদিগের

মানসিক উন্নতি সংসাধিত হয়, আর অর্থাগমের অতিশয় সুবিধা হয়। কেবল এই দ্বিতীয় ফলটীর জন্যই আমরা ইংরাজীতে শিক্ষালাভ করি এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। আমরা যে ঐ উভয় ফলের জন্য ইংরাজী বিদ্যা লাভ করিতে যত্নবান নই তদ্রুপ সিদ্ধান্ত কেন করা হয়?

এই সমুদয় বিবেচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য। গবর্ণমেন্টের কোন নির্দ্দিষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরা এ সভার উদ্দেশ্য নহে। গবর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডে এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার পূর্ব্বে আমাদিগের মত প্রকাশকরা প্রজাজনোচিত অনুগতভাবের বিরুদ্ধে নহে।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভু চন্দ্র নাগ মহাশয় এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন—

এস্থানে অদ্য আমাদের সমবেত অভিপ্রায় সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতা দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। বিষয়টী যে অতীব গুরুতর তৎপ্রতি কাহারও সন্দেহ নাই।

সভাপতি মহোদয় যে ৩১ মার্চ্চের রিজলিউসনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বসাধারণেই অবগত আছেন। ঐ রিজলিউসন দ্বারা এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষার্থে গবর্ণমেন্ট যে সাহায্য করেন, তাহা ক্রমে২ রহিত করা হইবে। এই প্রস্তাবটী যে সর্ব্বসাধারণের দুঃখজনক ও ভয়ের কারণ হইয়াছে, তাহা অমূলক নহে। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমাদের মনের ও দেশের যে উন্নতি হইতেছে, তৎপ্রতি যখন এই প্রস্তাবের দ্বারা হস্তক্ষেপ করা যাইতেছে, তখন তাহা মনে করিয়া সর্ব্বসাধারণে দুঃখিত ও ভয় ব্যাকুল হইবে আশ্চর্য্য কি? সত্য বটে এতদ্দেশীয় দিগের মন অতীব উন্নতিশীল; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা দ্বারাই সেই মন রীতিমত চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছে।

পূর্ব্বকাল অবধি, আমাদের দেশে নানারূপ বাণিজ্য স্রোত বহিতেছিল; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমরা ধনের ও পরিশ্রমের যথার্থ উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছি। সত্য বটে, সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায় প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নব২ আবিষ্কার আমরা কেবল ইংরেজী ভাষার শিক্ষা দ্বারাই অবগত হইতেছিলাম। সুতরাং যে প্রস্তাব দ্বারা আমাদের সেই উন্নতির রোধ করা হইতেছে; তাহা শ্রবণে যে সর্ব্বসাধারণের মনে দুঃখের উদ্রেক হইবে, তাহা আশচর্য্যের বিষয় নয়। এই প্রস্তাবদ্বারা যে সর্ব্বসাধারণের শুদ্ধ দুঃখের উদ্রেক হইয়াছে এমন নহে। যাঁহারা এই বিষয়টি চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহার ফল চিন্তা করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়াছেন। এই প্রস্তাব দ্বারা যখন আমাদের গবর্ণমেন্ট সেই উপায় কার্য্যতঃ রোধ করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিয়া যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ভয়াকুল হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম এই—

ইংরাজদিগের অধিকার হওয়া অবধি অদ্যপর্য্যন্ত ক্রমে তাহাদিগের সাহায্য আমাদিগের যেরূপ উন্নতি হইয়া আসিতেছে তাহাতে কতই যে আশা করা গিয়াছিল বলিয়া শেষ করা যায় না প্রথম যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিতেন কেরানীগিরিই তাঁহাদিগের লক্ষ্য থাকিত। ক্রমে অধিক শিক্ষা হইতে লাগিল এবং ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী প্রভৃতি কার্য্য পাইয়া উৎসাহিত হইতে লাগিল, তাহার পর হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বাঙ্গালী প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষণ মনে২ আশা করিতেছিলাম,

ক্রমে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরী ও গবর্ণর জেনেরলী পর্য্যন্ত পাইয়া বাঙ্গালী কৃতার্থ হইবেন। দেশের শাসন ভার বাঙ্গালীর প্রতিই অর্পিত হইবেক। এই আশার সময় উক্ত শিক্ষা হইতে গবর্ণমেন্ট হস্ত উত্তোলন করায় একেবারে আমাদিগের সকল আশায় মস্তকে আঘাত হইয়াছে। যদি এইরূপ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ছিল, তবে নিরর্থক কতকদিন আমাদিগকে বিদ্যার আলোক লইয়া, পথ দেখাইয়া পুনরায় অন্ধকারে ফেলিয়া আমাদিগের বিড়ম্বনা করিলেন কেন? যাহারা অনবরত অন্ধকারে থাকে তাহাদিগের অন্ধকারে থাকিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু একবার আলোকে আসিয়া পুনর্ব্বার অন্ধকারে যাইতে হইলে যে কতদূর কষ্ট হয় তাহা সহজেই অনুভূত হয়। অতএব গবর্ণমেন্টের এইরূপ সংকল্প পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১০ জুলাই, ১৮৭০

## ঢাকার শিক্ষা সংক্রান্ত সভার বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন ডাক্তার[৫৯] মহাশয়ের বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই—

আমাদের বড় কর্ত্তা লর্ড মেয়ো বর্ত্তমান উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার ব্যয়ের ভার আমাদের দেশীয় লোকের স্কন্ধে দিয়া ঐ ব্যয়ে সাধারণকে বাঙ্গলা শিক্ষা দেওয়ার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মনের ভাব কি, তাহা অদ্যকার সভায় বলিতে ইচ্ছা করি না, আপনারা সকলেই মনে মনে এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি তিনি ইহা ভাবিয়া থাকেন যে ইংরাজী ভাষার বিজ্ঞানসাহিত্য শিল্প ও রাজকীয় ব্যবস্থা সকল কেবল বাঙ্গলায় শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদের দেশীয়দিগকে উন্নত করিবেন, তবে একথা আমি সাহস সহকারে বলিতেছি লর্ড মেয়ো নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ রাজনীতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজী ভাষার বিজ্ঞান শিল্পাদি শিক্ষাদিলে বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা আমাদের দেশীয়েরা মনের যে রূপ তেজস্বিতা লাভ করিয়া আপন আপন গৌরব ও স্বত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন ; বাঙ্গলা শিক্ষা হইতে কোন প্রকারেই মনের সেইরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপলক্ষে আমার একটী গল্পের কথা মনে পড়িল আমি একবার কোন এক নর্ম্মাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভূগোল শিক্ষার সময় পৃথিবীর গোলকারের বিষয় শিক্ষা দিতে দিতেছিলেন। একটী ছাত্র পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ বুঝিতে না পারিয়া বড়ই বিরক্ত হইতেছেন। অন্য একটী ছাত্র তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিতেছে ভাই মুখে বল না যে পৃথিবী গোল, তিন বৎসরকাল এইরূপ গোলই বলিবে। "পরে, যে চেপ্টা সে চেপ্টাই থাকিবে" আমাদের গবর্ণমেন্টের কেবল বাঙ্গলা শিক্ষার রাজনীতির ফল কিছু কাল পর উক্ত ছাত্রের পৃথিবী গোল বুঝার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা উদ্ধত ভাবে গবর্ণমেন্টের কোন দোষকীর্ত্তন করিতে এখানে উপস্থিত হই নাই।— কেবল গবর্ণমেন্ট ভ্রমবশতঃ বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিতে তাহাতে আমাদের বহু প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকাতে আমাদের মনের দুঃখের কথাগুলি শান্তভাবে আমাদের রাজ্ঞীর নিকট জানাইবার জন্য আমরা এই সভায় সকলে একত্রিত হইয়াছি।

১৭ জুলাই, ১৮৭০

## উচ্চশিক্ষার লোপ সম্বন্ধে এদেশীয় সাধারণ লোকের সংস্কার

আমাদের কোন বন্ধু গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকতা করেন। তিনি ঐ দিবস কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, এখন বিদ্যালয়ে গ্রাম্য লোকে আর ছাত্র প্রেরণ করিতে চায় না, বরং যে সকল ছাত্র এখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদিগকে স্কুল ছাড়াইয়া লওয়ার উদ্যোগে আছে। এরূপ গোলযোগ অকারণ সম্ভূত নয়। গবর্ণমেন্ট উচ্চ শিক্ষা রহিত করিবেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, উহাই ঐ গোলযোগের নিদান। তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য যেরূপই থাকুক, উচ্চ শিক্ষা লোপের আশঙ্কাই তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতেছে। কেবল ঐ এক ব্যক্তির নিকট হইতেই যে আমরা এরূপ সংবাদ পাইয়াছি, এমত নয়। মধ্যে২ অনেকেই উচ্চ শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যদি উচ্চ শিক্ষাই রহিত হইল, তবে বড় চাকরী পাওয়ার আশা গেল। সুতরাং স্কুলে পড়িয়াও কোন লাভ নাই। অতএব এখন হইতেই বালকদিগকে অন্য কার্যে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। যদি টাকা পয়সা খরচ করিয়াও বড় চাকুরী না পাওয়া গেল, তবে বৃথা অর্থ ব্যয় করিব কেন? সাধারণ লোকের মনে এরূপ ভাব হওয়া বিচিত্র নয়। এখনও উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা রহিবে কি উঠিয়া যাইবে, কিছুই স্থিরতর হয় নাই, তাহাতেই লোকের এরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে। যদি গবর্ণমেন্ট প্রকৃত পক্ষেই উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা রহিত করেন, তবে যে আরো কি হইবে বলা যায় না। তখন লোকে স্বীয়২ বালকদিগেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে একবারেই অনিচ্ছুক হইবে। বিশেষ লাভের আশা না থাকিলে এদেশীয় লোক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায় না। উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারাই তাহার প্রমাণ হইতেছে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট তাহা বুঝেন না। উচ্চ শিক্ষা রহিত করিলে শিক্ষা বিভাগ কি অদ্ভুতরূপ ধারন করিবে, সহজেই বোধগম্য হয়। তাঁহারা মনে করেন, উচ্চশিক্ষা রহিত করিলেও লোক বহুলপরিমাণে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রম। বাস্তবিক উচ্চ শিক্ষা রহিত হইলে অল্পকাল মধ্যে আর বিদ্যালয়ের এরূপ শ্রী থাকিবে না। অতএব গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান শিক্ষা সংক্রান্ত সংকল্প পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উপসংহারকালে দেশীয় সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা স্ব স্ব অধীনস্থ বালিকদিগকে ঐ আশঙ্কায় বিদ্যালয় ছাড়াইয়া না লন, কারণ শিক্ষা সংক্রান্ত যে গোলযোগ শুনা যাইতেছে, অদ্যপি তাহার স্থিরতা হয় নাই।

২৪ জুলাই, ১৮৭০

## মিশনারিগণ ও উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা

খৃষ্টান মিশনরিগণ কটিবন্ধন করিয়া ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদের গবর্ণমেন্টের সংকল্পিত শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির অনুমোদন করেন। কেবল মনে২ অনুমোদন করেন, এমত নয়। অনুমোদন করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট আবেদন পর্যন্ত করিতেছেন। গতবারেও আমরা ইহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। মিশনরিগণের এই কুমতি কেন হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বোধ নয়। প্রথমে দেখ, তাঁহারা ভারতবর্ষের হিত কামনা করিয়াই একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, না ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ কোন স্বার্থ আছে? স্বার্থ সাধনই যে তাঁহাদের ঐকার্যের উদ্দেশ্য, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কেবল এদেশীয়দিগের হিত কামনায় পরিচালিত হন, এদেশে এখন এরূপ মিশনরি অতি অল্প আছেন। যদি অনেক থাকিতেন, তবে এদেশের অনেক বিপদে তাঁহাদের পরিচয় পাইতাম। প্রকৃতহিতৈষিলোক গুপ্ত থাকেন

না। কোন কুলবধূ পর্য্যন্ত মহাত্মা লঙ্ সাহেবকে[৬০] না চিনেন? কোন বালকইবা উক্ত মহাত্মার নামে পুলকিত না হয়? ক্রমে আমাদের রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক বিপদ উপস্থিতও অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহাতে আমরা আধুনিক মিশনরিদিগের দর্শন পাই নাই। অদ্য শিক্ষা সংক্রান্ত গোলযোগে তাঁহারা উদগ্রীব হইয়া আসিয়াছেন। কেন আসিয়াছেন? স্বার্থের ব্যঘাত সম্ভাবনা হইয়াছে। সমুদয়কে খৃষ্টান করাই তাহাদের এক মাত্র লক্ষ্য। সম্প্রতি তাহারা বিবেচনা করিয়াছেন, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষায় সে উদ্দেশ্য যথোচিত সিদধ হইতেছেনা। প্রত্যুত ইহা মিশনরিদিগের বিজাতীয় ভ্রম। ইহাতে ত এদেশের ভয়ানক অনিষ্ট হইবেই, কিন্তু মিশনরিদিগেরও মঙ্গল এবং উদ্দেশ্য সুসিদধ হইবে না। হয়ত কয়েক বৎসর পরে বুঝিতে পারিবেন, ইচ্ছা করিয়া তাহারা অমঙ্গল আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করেন অশিক্ষিত মূর্খ লোককে প্রলোভনাদি দ্বারা সহজে খৃষ্টান করা যায়। একথা নিতান্ত সত্য। কিন্তু সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন শিক্ষিত লোককে খৃষ্টান করা শত গুণে শ্রেয়। কোন্ প্রকার খৃষ্টান দ্বারা তাঁহাদের অধিক উপকার হইতেছে? কাহারা কোন্ শিক্ষা বলে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে অধিক দক্ষতা প্রকাশ করিতেছেন? কাহারা যুক্তিতর্ক ও সাধুতায় লোকের মতিও বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত করিতেছেন? ইহা কি শিক্ষিত খৃষ্টানদিগের কার্য্য নয়? আর কাহারাইবা ব্যভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও নানা প্রকার জঘন্য আচরণ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মকে কলঙ্কিত মিশনরিগণ উচ্চ শিক্ষার বিরোধী হইতেছেন। তাঁহারা বলেন, উচ্চ শিক্ষার ব্যয় কমাইয়া নিম্ন শিক্ষার প্রতি তাহা ব্যয় করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই নিম্নশিক্ষার বাহুল্য প্রচার হইবে। ইহাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল নহে। এখনও অনেক মূর্খ লোক ধরিয়া২ খৃষ্টান করিতে পারিতেছেন; কিন্তু নিম্ন শিক্ষার বাহুল্য প্রচার হইলে আর তাহাও পাইবেন না। কারণ লোকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষিত হইলেই খৃষ্টধর্ম্মের মোট ভ্রম বুঝিতে পারে। খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রম বুঝিতে অনেক বিদ্যার আবশ্যক করে না। অতএব সাধারণ লোক কিছু২ শিক্ষিত হইলে খৃষ্টান করার জন্য লোক পাওয়া ভার হইবে। তখন আর প্রলোভনেও লোকের মন তত বিচলিত হইবে না। এখন মিশনরিগণ দেখুন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান তাহাদেরই অহিতের জন্য হইতেছে কি না। তাহাদের একার্য্যে বিপরীত ফল ফলিয়া উঠিবে। অতএব যাহাতে এদেশে গবর্ণমেন্টের সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা অধিক পরিমাণে হইতে পারে, মিশনরিগণ তাহার চেষ্টা করুন। তাহাতে আমাদেরও অনেক মঙ্গল হইবে এবং মিশনরিগণও অপেক্ষাকৃত কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন।

এতৎসম্বন্ধে আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট কিছু বক্তব্য আছে। অভিলাষিত বিষয়ের জন্য সকলেরই আবেদন করিবার সমান ক্ষমতা। যৌক্তিক কি অযৌক্তিক হউক, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে কিছুমাত্র বাধা নাই। কিন্তু কর্ত্তা যদি ন্যায়বান, সদাশয় ও বুদ্ধিমান হন তবে অবশ্যই অযৌক্তিক বিষয় উপেক্ষিত হয়। লর্ড আর্গাইল বাহাদুর, মিশনরিদিগের আবেদন সম্বন্ধে কতদূর ন্যায় বিচার করিবেন, বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় মিশনরিদিগের উক্ত আবেদন নিতান্ত অযৌক্তিক ও অনুচিত হইয়াছে। এ আবেদন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল মিশনরি সভা করিয়া আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা অন্যান্য ইংরাজ অপেক্ষা এদেশের অবস্থাজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদেশের বিশেষ কিছুই জানেন না। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কথা ও মত গ্রহণ করিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হইবে না। মিশনরিদিগের এই আবেদনে পদে২ ভ্রম রহিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এই ব্রতেব্রতী হইয়াছেন। স্বার্থের চক্ষে হিতাহিত,

উচিত অনুচিত কিছুই দৃষ্ট হয় না। অতএব তাঁহাদের মতগ্রাহী হইতে গেলে নিশ্চয়ই এদেশের মহা বিড়ম্বনা ঘটিবে। লর্ড আর্গাইল বাহাদুর যদি নিঃস্বার্থভাবে উচিত পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত থাকেন, যদি যথার্থ বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার নিকট আমাদের বাক্যব্যয় সফল হইবে, নতুবা বলা না বলা উভয়ই সমান। আমাদের স্থূল কথা এই, মিশনরিদিগের স্বার্থমূলক বাক্যে তিনি বিমুগধ না হন, অথবা উহা স্বাভিপ্রায়ের অনুকূল বলিয়া ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ না করেন।

২৪ জুলাই, ১৮৭০

## শিক্ষকদিগের উন্নতি

শিক্ষকদিগের দুভার্গ্য বোধ হয় এ সংসারে দূর হইবার নয়। সকলেই জানেন, সময়ে গবর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অনেকদিন হয় প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় অনেক শিক্ষক আকাশ মণ্ডলে সৌভাগ্য মেঘ সজ্জিত দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাহা আকাশেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। শিক্ষকগণ বোধ হয় আর ঐ মেঘ দর্শন করিতে পাইবেন না—

ডাইরেক্টরের এক স্যরকুলারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তিনি শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া বরং প্রকারান্তরে কমাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাহার প্রণালী এই এখন গবর্ণমেন্ট স্কুলে যে সকল শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন না থাকে এবং যাহাদের বিশেষ দাবীও নাই সেই সকল শিক্ষককে দীর্ঘবিদায় দেওয়া হইবে। আর ঐ সকল স্কুলে যে সকল পদশূন্য হইবে, নিতান্ত ঠেকা না হইলে তাহাতে নতুন লোক আনা হইবে না। নীচের শিক্ষকদিগকে ঐ পদে প্রমোশন দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহারা ঐ শূন্য পদের বেতন পাইবেন না। স্বীয়২ বেতনেই উপরিস্থ পদে প্রমোশন পাইবেন। মনে করুন দেড়শত টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হইল, তাহাতে ৮০ টাকা বেতনের দ্বিতীয় শিক্ষককে প্রমোশন দেওয়া গেল, কিন্তু প্রমোশন পাইয়াও বেতন ঐ ৮০ টাকাই রহিল। এইরূপ সমুদয় শিক্ষককে প্রমোশন দিয়া আবশ্যক হইলে কেবল নিচে ১০/৫ টাকা দিয়া একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। সুতরাং ৬০/৭০ টাকা বাঁচিয়া গেল। এই কার্য্যটি দ্বারা যে শিক্ষকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন লোকে কেবল উচ্চপদের লোভে লালায়িত নয়। টাকা বৃদ্ধির আশা না থাকিলে কেবল উন্নত পদে শিক্ষকগণ থাকিবেন না। যত শিক্ষক যত পরিশ্রম করেন সকলেই টাকা বৃদ্ধির জন্য যাহাদের টাকার লোভ নাই তাহারা কখন চাকুরী করিতে আইসেন না। অতএব আমরা বলিতেছি, এই নিয়মদ্বারা শিক্ষকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। সুতরাং প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া কোন শিক্ষক স্কুলের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। বিশেষ পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই মনোযোগী হইয়া কার্য্য করিতে চায় না, ইহা মানব প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম। এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে গবর্ণমেন্ট স্কুলের উন্নতির আশা বৃথা। স্কুল কলেজের প্রতি গবর্ণমেন্টের কি কোপদৃষ্টি পতিত হইয়াছে বুঝিতে পারি না। নানা প্রকারে তাহারা স্কুলের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার উপক্রম করিয়াছেন।

৭ জুলাই, ১৮৭২

**ঢাকা জনসাধারণ সভা ও সিবিল সাৰ্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজ এবং দেশীয় ডাক্তারগণ**

কিছু দিন হইল ঢাকা জনসাধারণ সভার[৬১] সভ্যগণ ঢাকায় একটী মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন জন্য গবর্ণমেন্টে আবেদন করেন। গবর্ণমেন্ট ঐ আবেদনপত্র চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া জনসাধারণ সভার সভ্যগণকে জ্ঞাপন করেন যে তাহাদিগের আবেদনপত্র চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল। জনসাধারণ সভার সভ্যগণ গবর্ণমেন্ট হইতে ঐ সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া অত্রত্য কমিস্যনর সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে আর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন যে তিনি ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন প্রস্তাবে নিজের অভিপ্রায় গবর্ণমেন্টে জ্ঞাপন করেন। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব একটি সিবিল সার্জ্জন জনসাধারণ সভাকে আশ্বাস দেন, তিনি ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে সহায়তা করিবেন। যাহা হউক, অত্রত্য কমিস্যনর সাহেব জনসাধারণ সভা হইতে আবেদনপত্র পাইয়া স্থানীয় সিবিল সার্জ্জনের মত জিজ্ঞাসু হন। তদনুসারে ডাক্তার ওয়াইজ ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপনবিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট লিখিয়াছেন। কমিস্যনর সাহেব ডাক্তার ওয়াইজের ঐ রিপোর্ট জনসাধারণ সভার সভ্যদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, আমরা ডাক্তার ওয়াইজের[৬২] রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিস্মিত হইলাম।

"ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপিত হইলে ভালরূপ শিক্ষা হওয়া অসম্ভব, তাহাতে ইষ্ট ফল না হইয়া অনিষ্ট হইবার ভূয়সী সম্ভাবনা, অতএব ঢাকাতে মেডিকেল স্কুল সংস্থাপিত না করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যে নেটিব ক্লাশ আছে তাহারই শিক্ষার উন্নতি করা উচিত।" ডাক্তার ওয়াইজ যদি কেবল এইমাত্র মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় প্রয়োজন বোধ করিতাম না। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে গিয়া প্রথমতঃ ঢাকার জনসাধারণ সভার অস্তিত্ব অস্বীকার, পরে ঢাকার স্বাধীন দেশীয় ডাক্তারদিগকে নিতান্ত মূর্খ ও অপদার্থ ইত্যাদি গালি দেওয়াতে আমরা এতৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

ডাক্তার ওয়াইজের মতে ঢাকার জনসাধারণ সভা, কেবল কয়েকজন শিক্ষিত বাবুর বাগ্‌বিতণ্ডার সভামাত্র, এই সভাতে এ নগরের প্রধান হিন্দু মুসলমান একজনও সভ্য নাই, যে কয়েকজন আছেন তাহাদিগের অধিকাংশই গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী, তাহার পূর্ব্ব বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন না, জনসাধারণসভার সভ্যগণ সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হন নাই, কেবল আপন ২ সন্তান ও আত্মীয়দিগকে অল্প ব্যয়ে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছেন, অতএব তাহাদের এই প্রস্তাব অকিঞ্চিৎকর।

জনসাধারণ সভা সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজের মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং তিনি যে ঐ সভার বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ঢাকার জন সাধারণ সভায় ঢাকার ও অন্যান্য স্থানের প্রধান ২ ধনী, জমীদার ও সম্ভ্রান্ত লোক সভ্য নিযুক্ত আছেন এবং সংপ্রতি একজনও গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী নাই। স্বাধীন ব্যবসায়ী সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোক এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদিগকে কোন মতেই এইরূপ [ অস্পষ্ট ] বলিয়া সভা হইতে কোন বিষয়ে প্রস্তাব করেন। ডাক্তার ওয়াইজ বলেন, ঢাকায়

২০/৩০ জন ডাক্তার স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকজন সব আসিষ্টান্ট সাৰ্জ্জন শ্রেণীভূক্ত আর অনেকেই নেটিব ডাক্তার। এই নেটিব ডাক্তারদিগের মধ্যে কয়েকজন কলকাতার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ আর কয়েকজন অনুত্তীর্ণ ছাত্র ডাক্তার ওয়াইজের মতে উপরি উক্ত সকল ডাক্তারই চিকিৎসা বিদ্যায় অনভিজ্ঞ। ইহারা বঙ্গদেশের রোগাদির লক্ষণ ও চিকিৎসা কিছুই অবগত নহেন, কেবল এক একটি চিকিৎসালয় অর্থউপাৰ্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার ওয়াইজের এই সকল কথায় আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। আমরা স্বীকার করি, ডাক্তার ওয়াইজের ন্যায় দেশীয় ডাক্তারদিগের পুস্তকগত বিদ্যা না থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কয়েকজন দেশীয় ডাক্তার স্বাধীন চিকিৎসা দ্বারা ঢাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় ডাক্তার ওয়াইজ কেমন করিয়া বলিলেন যে, ঢাকায় দেশীয় কোন ডাক্তারই বঙ্গদেশের রোগাদি নির্ণয় ও চিকিৎসা করিতে পারেন না, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বোধ করি দেশীয়রোগ দেশীয় ডাক্তারগণ যেমন সহজে বুঝিতে পারেন, ভিন্ন দেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসক হইলেও দেশীয়দিগের আচার, নিষ্ঠা ও প্রকৃতি অবগত না থাকাতে তত সহজে বুঝিতে পারেন না। ডাক্তার ওয়াইজ যে বলিয়াছেন দেশীয় ডাক্তারগণ এক একটি ঔষধালয় খুলিয়া কেবল অর্থ উপাৰ্জ্জনেই সৰ্ব্বদা ব্যস্ত আছেন তাহা অবশ্য স্বীকাৰ্য্য। কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি না উপাৰ্জ্জন চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে? তবে ঢাকার দেশীয় ডাক্তারদিগের অর্থ উপাৰ্জ্জনে ব্যস্ত থাকা দোষের বিষয় হইল কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঢাকায় এ পৰ্য্যন্ত যতজন সিবিল সাৰ্জ্জন আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রায় সকলেই চিকিৎসা দ্বারা অর্থ উপাৰ্জ্জন করিয়াছেন। ডাক্তার সিমসন একমাত্র চিকিৎসা দ্বারা এখানে বহুল পরিমাণ অর্থ উপাৰ্জ্জন করিয়াছিলেন, অনেকেই অবগত আছেন। ডাক্তার সিমসন লোকের নিকট আট আনা গ্রহণ করিয়াও চিকিৎসা করিতেন তবে আমরা একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে, ডাক্তার ওযাইজ চিকিৎসা করিয়া কাহারও নিকট অর্থ গ্রহণ করেন না। ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসার বিষয়ই বটে। কিন্তু তাঁহার ঘরে ঢাকার রাশি ২ অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে তিনি চিকিৎসা দ্বারা অর্থগ্রহণ করিয়া আর কি করিবেন? আমাদিগের সন্দেহ আছে ডাক্তার ওয়াইজ অর্থ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিলে তাঁহা দ্বারা সৰ্ব্ব সাধারণে চিকিৎসা করাইত কিনা? ডাক্তার ওয়াজের অন্যান্য অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু তিনি ৬/৭ বৎসর ঢাকায় থাকিয়াও ডাক্তার সিমসন বা কটক্লিবসাহেবের ন্যায় চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।—

ডাক্তার ওয়াইজ বলেন, ঢাকায় মেডিকেল স্কুল না করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যে বাঙ্গলা শ্রেণী আছে তাহারই শিক্ষোন্নতি করা উচিত, একথা আমরাও অস্বীকার করি না। আমরাও বলি কেবল বাঙ্গলা শ্রেণীর কেন সকল শ্রেণীরই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার যতদূর উন্নতি হইতে পারে, তৎপক্ষে যত্ন করা কর্ত্তব্য ডাক্তার ওয়াইজ আরো বলিয়াছেন, কলকাতার মেডিকেল কলেজের নেটিব ডাক্তারগণ দ্বারা দেশের কোন উপকার না হইয়া বরং ইংরেজী ঔষধের অপমান হইতেছি। ডাক্তার ওয়াইজের এই মত যে ভ্রান্তি মূলক। তাহাতেও সন্দেহ নাই বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট ও অনেক [ অস্পষ্ট ] সিবিল সাৰ্জ্জন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন "যেসকল স্থানে পূর্ব্বে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক ২ জন সিবিল সাৰ্জ্জন কি সব আসিষ্টান্ট সাৰ্জ্জন পাঠাইতে হইত, কলকাতা মেডিকেল কলেজে বাঙ্গলা শ্রেণী সংস্থাপিত হওয়াতে সেই

সকল স্থানে অল্প অর্থব্যয়ে এক ২ জন নেটিব ডাক্তার দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় সবডিবিজনের চিকিৎসা নেটিব ডাক্তার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, কয়েক বৎসর হইল সুপ্রসিদ্ধ সিবিল সার্জন ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মেডিকেল কলেজের থিয়েটারে প্রকাশ্যরূপে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, নেটিব ডাক্তারদিগের দ্বারা ইংরেজী ঔষধের উপকারিতা বঙ্গদেশ বিশেষ উপলব্ধি করিতেছে। যখন বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লিগ্রামে কলিকাতার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ নেটিব ডাক্তারগণ প্রবেশ করিয়া চিকিৎসা করিতে থকিবেন, তখন বঙ্গদেশে ইংরেজি ঔযধ দ্বারা আরো উপকৃত হইবে। মহামান্য সিবিল সার্জন ডাক্তার গুডিব সাহেব ও সার ওশানেসি সাহেবেরও এই মত ছিল। আমরাও অবগত আছি, বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত প্রায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার অধিকাংশ নেটিব ডাক্তারদিগের উপর অর্পিত আছে, এমত অবস্থায় ডাক্তার ওয়াইজ একজন জেলার সিবিল সার্জ্জন হইয়া কেমন করিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে, নেটিব ডাক্তারগণ দ্বারা দেশের কোন উপকার না হইয়া বরং ইংরেজী ঔযধের অপমার্ন হইতেছে। ইহার মর্ম্ম তাহার ন্যায় নেটিব ডাক্তার বিদ্বেষী দুই এক জন জেলার সিবিল সার্জন ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না। ডাক্তার ওয়াইজের আর একটি প্রস্তাবে তাহার বিলক্ষণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, দেশীয় কবিরাজদের ছাত্রদিগকে আনিয়া ২/১ বৎসর ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটালে[৬৩] [ অস্পষ্ট ] বিদ্যা শিক্ষা দিলে তাহারা উভয়াবিধ চিকিৎসা প্রণালী অবগত হইয়া নেটিব ডাক্তারদিগের অপেক্ষা দেশের উপকার করিতে পারিবে। ওয়াইজ সাহেব যখন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ভাল হইতেছে না, তখন তিনি দেশীয় কবিরাজদিগের ছাত্রদিগকে ২/১ বৎসর মিটফোর্ড হস্পিটালে শিক্ষা দিয়া কিরূপ উৎকৃষ্ট ডাক্তার ওয়াইজ মনে ২ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন তাহার অধীন মিটফোর্ড হস্পিটালে যেরূপ ফোঁড়া কাটা ইত্যাদি শিক্ষা হয়, মেডিকেল কলেজে সেরূপ শিক্ষা হইতেছেনা। না হইবে কেন। তিনি যে হস্পিটালের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং এ পথিকেরি মেঃ বেরণ যে হস্পিটালের হাউজ সার্জ্জন সেখানে ২/১ বৎসর কেন ২/৪ মাস শিক্ষা দিলেই নেটিব ডাক্তারদিগের অপেক্ষা এক ২ জন উৎকৃষ্ট ডাক্তার প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

উপসংহারকালে আমরা ঢাকার জনসাধারণ সভাকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা আপনাদিগের সভার গুরুত্ব মনে করিয়া ডাক্তার ওয়াইজের ভ্রমাত্মক মতের প্রতিবাদ করুন।

৬ জুলাই, ১৮৭৩

### উচ্চশিক্ষা ও গবর্ণমেন্ট

ইংরেজী জাতি বড় উদার, মহৎ কার্য্যে ইহাদের স্বার্থ থাকেনা। এমনকি বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্র্যশাসন বিষয়েও ইহাদের কোন স্বার্থ নাই। ভারতবর্ষীয়দিগকে সুশিক্ষিত, উন্নত ও সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরূঢ় করাই ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণের প্রধান লক্ষ্য। ইংলিশ গবর্ণমেন্ট যখন দেখিবেন, আমরা নিজে নিজের ভারবহনক্ষম হইয়াছি। আমরা অন্যের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষণোপযোগী বললাভ করিয়াছি এবং বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে উন্নত হইয়া স্বদেশে শাসনে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছি, তখন উদার গবর্ণমেন্ট আমাদিগের এই আশা বাস্তবিক ঘটনায় কতদূর পরিণত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গভীর নিম্নতম প্রদেশের গর্ভস্থ। আমরা এই

মাত্র বলিতে পারি, মহদাশয় ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের প্রতি এই অসামান্য ও অভূতপূর্ব উদারতা প্রদর্শন করিবেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে।

শাসন বড় বিস্তীর্ণ ও গুরুতর কার্য্য। ইহার কয়েকটি ভাগ আছে। শাসিত দেশের অবস্থা ও আচার ব্যবহারোপযোগী সুব্যবস্থা প্রণয়ন, প্রচলিত ব্যবস্থা ও ন্যায়ানুযায়ী বিচার বিতরণ, প্রজামণ্ডলী মধ্যে বিমল বিদ্যালোক বিস্তার, তাহাদের হিতজনক ও সংসার যাত্রা নির্ব্বহানুকূল নানাবিধ সুবিধা সম্পাদন শাসন কার্য্যের অন্তর্ভূত। শাসন কার্য্যের সমুদয় ভার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইলে উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের ভারই আমাদের হস্তে দিতে হইবে।

আর কিছু করুন বা না করুন, গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি বিদ্যা বিতরণ কার্য্য ভারটি আমাদের স্কন্ধে এক রকম সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এখন হইতে আমাদের লেখা পড়ার খরচটা আমরা চালাই, তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের মুখপ্রেক্ষী না হই ইহাই গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা। গবর্ণমেন্টের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, উচ্চ শিক্ষক ভারতবর্ষে এরূপ দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কিছুতেই উহা উৎপাটিত হইবার নহে। প্রজাগণ উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার সুমিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, গবর্ণমেন্ট সাহায্য করুন বা না করুন, প্রজারা স্বীয় সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নির্মিত্ত সাধ্যানুসারে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক যত্নের সহিত উচ্চ শিক্ষার পোষণ করিবে। স্বাবলম্বন উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।

গবর্ণমেন্টের এই মত কেবল আজিকালির নহে। ১৮৫৪ সনের ডিস্পেচের মর্ম্মও এই। তাহার এক স্থানে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, "ভারতবর্ষের শিক্ষা কার্য্য দৃঢ়তর ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়া তজ্জন্য আর অধিক কাল গবর্ণমেন্টের সাহায্য আবশ্যক না করে ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন এইরূপ সতর্কতার সহিত করিতে হইবে যেন তদ্বারা দেশের শিক্ষা বিভাগ কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়"। গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা বিভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া কত দিনে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে শিক্ষাকার্য্যকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিতে পারিবেন, এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য বিষয়। শিক্ষা বন্ধু লর্ডনর্থ ব্রুক[৬৪] আশা করিতেছেন সেদিন অতি নিকটবর্ত্তী। আজিকালি কলিকাতার অবস্থা দর্শন করিয়াই গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের এই আশা আরো বদ্ধমূল হইয়াছে। তথায় খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কলেজ শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মিট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন,[৬৫] মৃত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের[৬৬] দানশৌণ্ডতার ফল স্বরূপ ব্যবস্থাধ্যাপকের পদ স্থাপন দেখিয়া লর্ড নর্থব্রুক বুঝিতে পারিয়াছেন, অল্পদিনের মধ্যেও তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ প্রজাবর্গের স্কন্ধে শিক্ষা বিভাগের গুরুভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিবেন। আমাদের উদার গবর্ণমেন্টের এই আশা সফল হউক ইহা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা সেই আনন্দের দিন অতি দূরবর্ত্তী দেখিতেছি। কলিকাতার অবস্থা আমরা বিশেষ বলিতে চাই না, কিন্তু ২০/২৫ বৎসরে মফঃস্বলের ধনী ভূম্যধিকারিবর্গ স্বহস্তে শিক্ষা বিভাগের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন, এমন দুরাশা মনেও স্থান দান করিতে পারা যায় না। গত বিদ্রোহ ঘটনার পর হইতে প্রজামণ্ডলী নানাপ্রকার কর ভারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তাহাদের সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয় রাজপুরুষগণের শোষণ স্বত্বে ও দেশের সম্পত্তি ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। যতদিন ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ সমধিক সম্পত্তিশালী না হইবে, কর ভারের যন্ত্রণা হইতে সম্যক মুক্ত না হইবে,

ততদিন তাহাদিগ হইতে বড় একটা আশা করা যায় না। মনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য না জন্মিলে মনুষ্য কিছুতেই বর্হিবিষয়ের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিতে পারে না।

২৩ মার্চ, ১৮৭৩

## প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

...আমরা অনেকদিন হইল, এখানকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের আচার, ব্যবহার ও রী নীতি দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি। ইহাদিগকে সকল কার্য্যেই উদ্ধত অবিনীত ও মন্দবিষয়ে উৎসাহী দেখিতেছি। সদালোচনা প্রভৃতির লেশ মাত্র নাই। আমরা বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি। কোন কোন শিক্ষকের অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি কোন কোন শিক্ষকের অশাসন, অনুচিত প্রশয়দান এবং ঔদাসীন্যই ইহার মূল কারণ.। অন্যান্য বহু কারণ আছে বটে কিন্তু আমরা ঐ কারণ গুলিকেই অধিক গুরুতর মনে করি। পূর্ব্বে ইংরেজী স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে একটি নীতি শিক্ষার সভা ছিল এবং অন্যান্য বিষয়েও ইহাদিগকে সমূৎসাহী দেখিতাম, এইক্ষণ সে সকলের চিহ্নও দেখা যায় না। এমনি কি আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, শনিবার দিন ছাত্রদিগের যে একটি সভা হইত [ অস্পষ্ট ] তাহাও বন্ধ হইয়াছে। [ অস্পষ্ট ] অমনোযোগিতাই যে ইহার মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগের অনেকেই কেবল টাকার খাতিরে কাজ করেন ; ছুটি পাইয়া বাড়িতে গেলেই বাঁচেন। সেখানে তাস দাবা দ্বারা অবকাশরঞ্জন ও সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন উভয় কার্য্যই একত্র নির্ব্বহ করেন।...

১ আগস্ট, ১৮৭৫

## প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়।

...আপনার ১৪ই ভাদ্রের ২৫শে সংখ্যক ঢাকা প্রকাশে আমাদের সুযোগ্য প্রতিনিধি ইন্‌স্পেক্টর ডাক্তার রবসন্ সাহেবের সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা অতীব প্রীত ও আশান্বিত হইলুম। যদি প্রত্যেক বিভাগের উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণ অধীনস্থদিগের কার্য্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে কেবল যে কার্য্যগুলি শৃঙ্খলার সহিত সূচারুরূপে সম্পন্ন হয় এমন নহে, ছোট বড় সকলেই যথোপযুরক্তরূপ যশোভাজনও হইতে পারেন। যখন ডাক্তার রবসন্ সাহেবের ন্যায় সুযোগ্য লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে তখন তাঁহার পরিদর্শনাধীন বিভাগের সর্ব্বত্রই সুনিয়ম সংস্থাপিত ও সমস্ত অভাব নিরাকৃত হইবে, এরূপ আশা করা দূরাশা নহে।

রামায়ণে লিখিত আছে, যখন শ্রীরামচন্দ্র সাগরে সেতু বন্ধন করান, তখন বড় বড় বানরেরা বৃক্ষ প্রস্তর ইত্যাদি বহন করিয়া আনিয়া দেয় এবং তাহাদের সাহায্যে নল সেতু নির্ম্মাণ করিতে থাকে। কিন্তু নির্ম্মাণ সময়ে মধ্যে২ যে সকল ফাঁক (অসংলগ্নতা) থাকিয়া যাইতেছিল, বড় দলের কেহ তাহা দেখিতে পায় না, অথবা দেখিয়াও গ্রাহ্য করেনা। কাষ্ঠ বিড়ালেরা ক্ষুদ্র প্রাণ, সুতরাং বড় দলের নিকট যাহা ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষিত হইল তাহারা

তাহাই বৃহৎ দেখিতে লাগিল ও তাহারা বালিতে গড়াগড়ি দিয়া বাঁধের উপর আসিয়া অঙ্গঝাড়া দিতে লাগিল। এইরূপে সেতুর সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ হইয়া উহা আরও দৃঢ়ও কার্য্যোপযোগী হইল।

আমরা শিক্ষা বিভাগের "কাঠ বিড়াল", কেবল বিশেষের মধ্যে এই যে ফাঁক গুলি দেখিয়া আমাদের গায়ে বালি মাখাই সার। গা ঝাড়া দিয়া রন্ধ্রে বন্ধ করিবার আমাদের অধিকার নাই। যাহা হউক আমরা ছিদ্র (অপূর্ণতা) গুলি দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতেও অনেকে আপত্তি করিতে পারেন ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিতে পারেন যে, যাঁহারা কলিকাতার চৌরঙ্গীস্ত মনিউমেন্টের ন্যায় উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে তাঁহাদের দৃষ্টি যখন নিম্নস্থ কাঠ বিড়ালের অপেক্ষা সুদূরব্যাপিনী তখন কাটবিড়াল আর অধিক কি [ অস্পষ্ট ] সমর্থ হইবে? এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, নিম্নস্থ লোকেরা বস্তু সকলের যেরূপ প্রকৃতাবস্থা দেখিতে পায়, যাঁহারা অতি উচ্চ স্থানে আরোহণ করেন তাহারা সেরূপ পান না। উচ্চ স্থানের লোকেরা নিম্নস্থ লোকেরা নিম্নস্থ মনুষ্যদিগকে পিপীলিকার ন্যায় অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকলকে গুল্মের ন্যায় ও বড় বড় ঘর অথবা অট্টালিকাগুলিকে গোবরের গাদার ন্যায় অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাপিও বস্তু সকলের স্বরূপ দেখিতে পান না। যাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে সেই তাহা ভালরূপ দেখিতে পায়, সুতরাং তাহার দোষগুণ বিচারেও অধিক সক্ষম হয়।

ডাক্তার রবসন্ সাহেব বাঙ্গলা জানে, যদি তিনি আমাদের লিখিত বিষয়গুলি একবার পড়িয়া দেখেন তাহা হইলে আমাদের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে কেননা আমরা আমাদের সংকীর্ণ অপরিপক্কবুদ্ধি দ্বারা যাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইতে অক্ষম হইব, তাঁহার উন্নত বুদ্ধি পরিপক্ক জ্ঞান ও বহুদর্শিতা ইঙ্গিত মাত্রেই তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে।

সাহায্যকৃত মধ্যম শ্রেণীর স্কুলগুলির দুই একটি অভাব দেখাইয়াই অদ্য আমরা লেখনীকে বিশ্রাম দিব, কেননা প্রস্তাব অতি দীর্ঘ হইলে আপনি ছাপাইবেন কিনা সন্দেহস্থল।

গ্রাম্যস্কুলের শিক্ষকদিগের বেতনের অল্পতা,—এই জন্য অধিকাংশ স্কুলে কৃতবিদ্য শিক্ষকের অসাদ্ভাব। যদি অদৃষ্ট চক্রের অলঙ্ঘ্য আবর্তনে দৈবাৎ কোন শিক্ষিত লোক গ্রাম্য স্কুলে আসিয়া [ অস্পষ্ট ] তাঁহাকেও প্রায়ই অধিক পরিশ্রম করিতে দেখা যায় না। পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়? পরিদর্শকের সংখ্যা না বাড়াইয়া সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করত শিক্ষকদিগের বেতন বর্দ্ধিত করিয়া দিলে কি অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ও কর্ম্মঠ শিক্ষক পাওয়ার সম্ভাবনা হয় না?

শিক্ষকের অল্পতা—অনেক গ্রাম্য স্কুলেই দুই জনের অধিক শিক্ষক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরেজী ও বাঙ্গলাতে এই দুইজনকে অন্যূন ১০/১২ টি শ্রেণী পড়াইতে হয়। স্কুলের নিয়মিত সময় (৫ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর পড়া লইয়া) প্রথম শ্রেণীতে অধিক সময় দেওয়া যায় না, সুতরাং এই শ্রেণীর ছাত্রদিগের উপযুক্তরূপ শিক্ষা লাভও হয় না। পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে কি অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা হয় না?

শিক্ষকদিগের উন্নতির স্থলাভাব, সাহায্যকৃত স্কুলের মাষ্টার মহাশয় ১৫ হইতে ৩০ এবং পণ্ডিত মহাশয় ১০ হইতে ১৫ টাকা বেতনে উন্নত হইতে পারিলেই জানিলেন যে, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন। এখন আর তাঁহারা কি আশায় পরিশ্রম করিবেন? কি প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া শরীরের রক্ত জল করিবেন? যদি শিক্ষাবিভাগে কোন

নূতন পদের সৃষ্টি হয়, তাহাতেও বাহিরের লোক আসিয়া প্রবেশ করে। শিক্ষক বেচারারা চিরকাল খাটিয়াও উন্নত পদে যাইতে অধিকারী হয় না।—ইহাদের জন্য কোন প্রকারের উন্নতির দ্বার মুক্ত করিলে কি ইহাদের উৎসাহবৃদ্ধি হয়না ও তদ্বারা কি অধিক উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না? যদি নূতন নিয়ম মতে স্কুলে সব ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হয়, তবে সাহায্যকৃত স্কুলের উচ্চবেতনধারী শিক্ষকদিগকে ঐ সকল পদ দিয়া অপেক্ষকৃত অল্প বেতনের শিক্ষকদিগকে তাঁহাদের পদে নিযুক্ত করিলে বোধ হয় শিক্ষকদিগের আশা ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে। প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি আমাদের কথায় সায় দিবেন না?

সবাইল
১২৮২ সন
২৪শে ভাদ্র।

একান্ত বশংবদ
শ্রী শিক্ষাবিভাগের কাঠ-বিড়াল,
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫

## এতদঞ্চলীয় ছাত্রদিগের উচ্চশিক্ষালাভের অসুবিধা দূরীকরণ নিতান্ত কর্ত্তব্য

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধাননগরী ঢাকার উচ্চশিক্ষালাভের একমাত্র স্থান ঢাকা কলেজের উচ্চতর ছাত্র বেতন হার নির্দ্ধারিত হওয়াতে এতদঞ্চলীয় কয়েকটি জেলার উচ্চশিক্ষালাভার্থি ছাত্রদিগের সবিশেষ অসুবিধাই পরিলক্ষিত হইতেছে। বলিতে কি, দ্বিতীয় উপায় না থাকাতে অনেকে উচ্চ শিক্ষালাভের আশা বিসর্জ্জন দিতেও বাধ্য হইতেছেন। স্থূলদর্শীরা বলিতে পারেন, ঢাকার ন্যায় শহরে একটি মাত্র কলেজ বর্ত্তমান থাকাই যথেষ্ট, এখানে এক্ষণ যে পরিমাণ উচ্চশিক্ষালাভার্থি ছাত্রসংখ্যা দৃষ্ট হয়, তাহাতে একের অধিক কলেজ বা হাই স্কুল থাকার আবশ্যকতা নাই। একশ্রেণীর অধিক বিদ্যালয় হইলে বরং নানা দোষ ঘটিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু যাঁহারা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, বোধ হয় না তাঁহারা ঐরূপ উক্তি করিতে পারেন। আমরাও স্বীকার করি যে, এক শ্রেণীর অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের বিদ্যামানতায় নানা কারণে নানা দোষ ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা কলেজে যে পরিমাণ ছাত্র অধ্যায়ন করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা বিবেচনায় উচ্চ শিক্ষালাভার্থ ঢাকায় স্বতন্ত্র—কলেজ বা হাই স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা নাই, আমরা ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালার এতগুলি এন্ট্রেন্স স্কুলে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যায়ন করিতেছে, দিন দিন আবার এন্ট্রেন্স স্কুল ও তাহার ছাত্র সংখ্যা পরিবর্দ্ধিতই হইতেছে, অথচ উচ্চ শিক্ষালাভার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না কেন, যখন মনোমধ্যে এ প্রশ্নের উদয় হয়, তখন এতদঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার অসুবিধাই তৎকারণ স্বরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। আমরা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি সমস্ত পূর্ব্ববাঙ্গলার উচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র স্থান ঢাকা কলেজের অত্যুচ্চ ছাত্রবেতনহারই এতদঞ্চলীয় উচ্চশিক্ষার্থি ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের প্রধানতম কারণ। পূর্ব্বে ঢাকা কলেজে ছাত্র বেতন হার ৫ টাকা ছিল, এক্ষণ ৬ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুর্ব্বে ৫ টাকা বেতন দিয়াও যাহাদের উচ্চশিক্ষালাভ অদৃষ্টে ঘটে নাই, তৎসদৃশাবস্থ ছাত্রদিগের ৬ টাকা বেতন দিয়া অধ্যায়ন যে সবিশেষ কষ্ট সাধ্য হইয়াছে, বলা বাহুল্য। পরন্তু যাঁহারা পূর্ব্বে ৫ টাকা বেতন দিয়া ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন, এক্ষণ তুল্যাবস্থ ছাত্রদিগের ৬ টাকা বেতন দিয়া অধ্যায়নও এদেশীয়দিগের ক্রমবর্দ্ধনশীল সাম্প্রতিক আর্থিক অনুন্নতি-বিবেচনায় সামান্য অসুবিধাজনক হয় নাই। এদেশীয়দিগের

উচ্চশিক্ষার প্রতি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ বিরূপ বলিয়া হউক, আর কারণান্তর প্রযুক্তই বা হউক, বৃত্তির সংখ্যা হ্রাস হওয়াতেও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তির অসুবিধা আরো অধিকতর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে ; বৃত্তির সংখ্যান্যূনতাপ্রযুক্ত এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পতর ছাত্রের ভাগেই বৃত্তিলাভ ঘটিতেছে ; সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ অবৃত্তিক ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়াতে এবং তাহাদের অনেকেরই কলেজের উচ্চ বেতন চলিয়া না উঠিতে এন্ট্রেন্স পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া পয্যান্তই শিক্ষার শেষসীমা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এন্ট্রেন্স পরীক্ষার পর প্রতিবৎসরই উচ্চ শিক্ষার সুবিধা হইল না, বলিয়া অনেক ছাত্রের বিদ্যালয় পরিত্যাগ দর্শন করিয়া দুঃখিত হইতেছি। এতদঞ্চলীয় প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ অবৃত্তিক ছাত্রগণের অনেককে জানুয়ারী মাসে ঢাকায় আসিয়া সম্পন্ন লোকের সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাসে "ভো ভো" করিয়া ঘুরিতে দেখিয়াও আমাদের কষ্ট হইতেছে। সত্য বটে রাজধানীস্থিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র বেতন হারও অত্যুচ্চ, কিন্তু তথায় এরূপ অনেক বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে যে, তাহাতে অনেকেরই প্রবেশ লাভে সামর্থ্য রহিয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, এতদঞ্চলীয় ছাত্রেরা তথায় যাইয়াই অধ্যায়ন করেন না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সকল ছাত্রের অল্প ব্যয়বিধান করিয়া ঢাকায় থাকিবার সামর্থ্য নাই, বহু ব্যয় বিধান সাধ্য কলিকাতায় অবস্থান কি তাহাদের ন্যায়ে লোকের সাধ্যায়ত্ত? ফলত ইত্যাকার নানা অসুবিধা প্রযুক্তই এতদঞ্চলীয় অধিকাংশ ছাত্রের উচ্চ শিক্ষালাভেচ্ছা অন্ধের চিত্রদর্শনস্পৃহার ন্যায় বিফল হইতেছে। সমধিক দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ উচ্চশিক্ষার আস্বাদ দিয়া এদেশীয়দিগের উচ্চশিক্ষালাভাশা বলকী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দিন দিন সুবিধাগুলি উঠাইয়া লইয়া ইহাঁদিগকে নিরাশ ও অসুখীই করিতেছেন।

আজি ঢাকায় যদি একটি ফ্রি কলেজ বা হাইস্কুল বর্ত্তমান থাকিত, কিংবা অল্প বেতন দিয়াও ছাত্রেরা কোন বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি এতদঞ্চলীয় অসম্পন্ন ছাত্রগণের দূর্গতিভোগ দেখিয়া আমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে হইত? আজিকালি যখন এম, এ, বি, এ উপাধি ধারীদিগেরই অন্নসংস্থান করা এক প্রকার কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদিগকেই অত্যল্প বেতনে কর্ম্ম স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে, তখন এতদঞ্চলীয় অধিকাংশ ছাত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়াই বিদ্যার চরম সীমা হইতে তাঁহাদের ও তৎসঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববাংলার কি দূর্গতি ঘটিবে, ভাবিলে অবসন্ন হইতে হয়। এ জন্যই আমরা পূর্ব্ববাঙ্গলার দেশহিতৈষি মহোদয়গণের নিকটে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গলার প্রধান নগরী ঢাকায় হয় একটি ফ্রি কলেজ অন্তত হাইস্কুল স্থাপনের উপায় করিয়া এল এ ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিবার চেষ্টা পাউন ; এরূপ হইলেও ঢাকাবিভাগের দরিদ্র ছাত্রগণ পেটের ভাত করিয়া খাইবার উপযুক্ততা লাভ করিতে পারিবেন। একটি ফ্রি কলেজ বা হাইস্কুল স্থাপন সমধিক অর্থব্যয়সাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদঞ্চলে যে সকল ধনীব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের একার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না, এমন নয়। অদ্য আমরা ঢাকার সদাশয় নবাব খাজে আবদুল গনি[৬৭] ও তৎপুত্র নবাব আসানুল্লা সাহেবের[৬৮] নিকটেও একটি বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ফ্রি স্কুলটির যেরূপ অপকৃষ্টাবস্থা তাহাতে তদ্বারা কোনও উপকার দর্শিতেছে বোধ হয়না অথচ মাস মাস তাহাতে তাঁহাদের কতগুলি অর্থব্যয়িত হইতেছে। ঢাকায় এন্ট্রেন্স স্কুলের অভাব নাই এবং তত্তৎ স্কুলে অধ্যয়ন ও সমধিক কষ্ট সাধ্য নয় ; সুতরাং তাঁহাদের ফ্রি স্কুলটি

উঠিয়া গেলেও সাধারণের তত অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, নবাব খাজে আবদুলগনি মিঞার কীর্ত্তিমন্ পুত্র ঢাকার কোন স্থায়ী উপকারার্থ ২০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারা গবর্ণমেন্ট কাগজ ক্রয় করিয়া রাখুন এবং উক্ত ফ্রি স্কুলটিতে মাসিক যে ব্যয় হয়, তাহা উঠাইয়া লইয়া উহার সহিত একত্রকরণানন্তর একটি এল, এর ক্লাস স্থাপন করুন্। উল্লিখিত অর্থদ্বারা তদ্রুপ স্কুলের কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে অল্প পরিমাণ স্কুলিং ফিজ নির্দ্ধারণ করিলেও হইতে পারে। আর না হয় কার্য্যের জন্য নবাব সাহেবের আরো কিয়ৎপরিমাণ অর্থই বা ব্যয়িত হইল। ঢাকায় নবাব সাহেবের যেরূপ প্রাধান্য রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার নামে দূরবস্থাপন্ন একটি ফ্রি স্কুল প্রশংসনীয়ও নয় ; এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে তদীয় সম্মান ও নামের অনুরূপ কার্য্য হয় তৎপ্রতি তাঁহার মনোযোগবিধানই একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। আমরা আশা করি, নবাব খাজে আবদুলগনি মিঞা সাহেবও তদীয় সদাশয় পুত্র আমাদের প্রস্তাবানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পুন্য প্রতিষ্ঠা লাভ কুণ্ঠিত হইবেন না।

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭

## সংবাদাবলী

অত্রত্য কলেজ ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমাজনীতি ও রাজনীতি শিক্ষা কল্পে "ছাত্র সাধারণ সভা" নামে একটি সভা সংস্থাপন করিতেছেন। তাহারা পূর্ব্ববঙ্গীয় সমস্ত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরই সহানুভূতি প্রার্থী হইয়াছেন। প্রত্যাশা হইতেছে, তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। কলেজ ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রগণ শুদ্ধ অধীত পুস্তকেই নিবিষ্টচিত্ত না থাকিয়া সমাজনীতি এবং রাজনীতি বিষয়েও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অনেকেরই ইহা বাঞ্ছনীয়। এই নির্মিত্তই তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে ছাত্র সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া সুখী হইয়াছেন।

২৭ এপ্রিল, ১৮৭৯

## ছাত্র সাধারণ সভার সঙ্কল্পপত্র

ভ্রাতৃভাব ও জ্ঞানবর্দ্ধন এবং যথাশক্তি হিতানুষ্ঠানার্থ পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইতে পারেন এইরূপ কোন একটি সাধারণ সম্মিলন ভূমির আবশ্যকতা ঢাকার ছাত্রগণ বহুকাল যাবৎ অনুভব করিয়া আসিতেছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বর্ত্তমান ভারতে যাঁহারা সমাজের নেতা, তাঁহাদিগেরই অধিকংশ ব্যক্তি এতদূর অপূর্ণশিক্ষিত যে, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে একথা বলিতে লজ্জিত নহেন যে ছাত্রগণ অহোরাত্র বিদ্যামন্দিরের নির্ব্বাচিত গ্রন্থই অধ্যায়ন করিবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও একতার বন্ধন সংস্থাপন চেষ্টা, সমাজনীতি ও রাজনীতির পর্য্যালোচনা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কার্যে সংযোগদান তাহাদিগের পক্ষে ঘোরানিষ্টকারী ও দুর্ব্বিষহ ধৃষ্টতার কার্য্য। তাঁহারা মনে করেন, কেবল বিদ্যামন্দিরে অধ্যাপিত সাহিত্য, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে হইলেই নিয়মিত শিক্ষার প্রয়োজন ; সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি একমনে বহু পরিশ্রমে শিক্ষা করিতে হয়, একথা তাঁহারা অবগত নহেন। যাঁহারা রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের আদ্যক্ষরও পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন যে ইহারা দুরুহত্বে

সর্ব্বথা অতুল্য ; অক্লান্ত অধ্যাবসায় ও বহুকাল ব্যাপিনী শিক্ষা ব্যতীত ইহাদিগকে কেহ অধিকৃত ও আয়ত্ত করিতে পারে না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সৌভাগ্যশালী দেশবাসিগণ একথা বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত দেশসমূহে বহুসংখ্যক সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি সমালোচনী সভা রহিয়াছে। প্রতি বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ নিয়মিতরূপে সমবেত হইয়া সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন : এতদ্বিষয়ক মৌলিক ও সাময়িক প্রশ্নসমূহের মীমাংসা চেষ্টা করেন। এই উপায়ে বিদ্যালয়স্থ যুবকমাত্রই রাজনীতি ও সমাজনীতির মূলতত্ত্বসমূহ এবং স্বদেশীয় শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষাপকম বিষয়ে সাধারণভাবে পরিষ্কার উত্তর প্রদান করিতে পারেন। এই কারণেই ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতিদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং সুখবিষয়ে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সই শিক্ষার কাল। এই সময়ে যে দেশের অধিবাসীগণ রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষা না করিল, সে দেশ উক্ত বিষয়দ্বয়ে ধরণীতলে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, নীচ হইতেও নীচ রহিল। পণ্ডিতমাত্রই স্বীকার করেন, প্রথম বয়সেই মনুষ্যের রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ; কেননা সংসারে প্রবেশ করিতেই উহাদিগের সহিত সংস্পর্শে আসিতে হয় ; যে ব্যক্তি সংসার প্রবেশের পূর্ব্বেই উক্ত বিষয়দ্বয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন ; তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সংসার-প্রবেশমাত্রই বহুদর্শী ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে পারেন। অস্মদেশে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও যে সাধারণতঃ সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতি বিষয়ে এত অজ্ঞ এবং শিথিল প্রযত্ন, প্রথম বয়সে উক্ত শাস্ত্রদ্বয় শিক্ষার উপায়াভাবই তাহার প্রধান হেতু। এই সমস্ত কারণে ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় যে ভারতের সর্ব্বত্র ছাত্রগণ সমবেত হইয়া সামজতত্ত্ব ও রাজনীতির পর্য্যালোচন, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও একতাবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে বহুসভা সংস্থাপন করেন এবং তৎসমুদায় হইতে সম্মিলিতভাবে যথা শক্তি হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ঢাকার ছাত্রগণ বহুকাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রকার একটি সভার অভাব অনুভব করিতেছেন। এই অভাব যথাসম্ভব দূরীকরণাভি প্রায়ে তাঁহারা ছাত্রসাধারণ সভা নামে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির আলোচন, ছাত্রসাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন ও একতাবর্দ্ধন এবং যথাশক্তি হিতানুষ্ঠান চেষ্টাই এই সভার উদ্দেশ্য। কার্য্যক্ষেত্র অতিবিস্তৃত করিলে এই সভার পক্ষে কর্ত্তব্যসম্পাদন অসম্ভব হইয়া উঠিবে আশঙ্কায় ইহার কার্য্যক্ষেত্র পূর্ব্ববঙ্গেই নিবদ্ধ থাকিবে। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়মাত্রেরই ছাত্রগণ ইহার সহিত যোগদান করেন, ইহা ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠাতৃগণের আন্তরিক কামনা এই সভার কি পরিণাম হইবে, কেহ বলিতে পারে না। সম্ভবতঃ অন্যান্য বহুসভার ন্যায় কিয়ৎকাল প্রতিকূলঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ববঙ্গীয় ছাত্রসাধারণের ঔদাসীকারণে ইহা প্রাণ ত্যাগ করিবে। তবে ইহার মৃত্যু যতক্ষণ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, ততক্ষণ আমরা তাহাকে অগ্রে আহ্বান করিয়া আনিয়া এই শুভোদ্যম হইতে বিরত হইব না। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রসাধারণকে স্বার্থের নামে, মাতৃভূমির নামেও সর্ব্বশেষে ধর্ম্মের নামে আমাদিগের সহিত যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। যদি এ আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা আমাদিগের সঙ্কল্প নিষ্ফল করেন, আমরা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে পারিব-আর আমাদিগের সধ্যায়ত্ত কি? তাই বলিতেছি, ভাই। এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিও না। জ্ঞানাভিমানী লোকেরা তোমাকে উপহাস করিবে, তুমি তাহাদিগের উপহাসে কর্ণপাত করিও না। আইস আমরা সমবেত হইয়া সে বীজবপন করি এবং বপনান্তে সে বীজোপরি জলসেচন করি, যাহা কালক্রমে এরূপ বিপুলকায় বিশালচ্ছায় বৃক্ষে পরিণত

হইবে যাহার নিম্নদেশে বসিয়া আতপদগ্ধ ভারতভূমি একদা তাহার বর্ত্তমান দুঃসহ সন্তাপ বিস্মৃত হইতে পারিবে।

ঢাকা।
৮ই বৈশাখ।
১২৮৬ সাল।

শ্রী শ্যামাকান্তনাগ, এম, এ।
শ্রী শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
শ্রী নবকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ।
শ্রী প্রসন্নকুমার সেন।
শ্রী বসন্তকুমার ঘোষ।
শ্রী সারদাচরণ ঘোষ।

৪ মে, ১৮৭৯

## ছাত্রসাধারণ সভার বিবরণ

বিগত রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি[৬৯] গৃহে অত্রত্য ছাত্র সাধারণ সভার এক সুমহদধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সোমপ্রকাশের[৭০] মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশ ও সমালোচনার আবশ্যকতা প্রতিপাদনই এই সভাধিবেশনের মুখ্যোদ্দশ্য ছিল। আমরা ঢাকায় আর কখনো এরূপ অত্যধিকলোকপূর্ণ সভা সন্দর্শন করি নাই, সভাসংসৃষ্ট ব্যক্তি মাত্রের এরূপ জ্বলদুৎসাহও প্রত্যক্ষ করি নাই। সভাস্থলে সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। অনেকেই গৃহমধ্যে স্থান না পাইয়া বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ একটি সঙ্গীত হইলে পর সম্পাদক চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ফরিদপুর, বরিশাল, গোয়াইল প্রভৃতি নানাস্থানাগত সহানুভূতিমূলক পত্র পাঠ করিলেন। তৎপর বাবু চন্দ্রকিশোর রায়, শিবেন্দ্রনাথ সেন, প্রসন্নকুমার বসু ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃগণ এক একটি প্রস্তাব এবং তৎপোষকতা উপলক্ষে বক্তৃতাদান করিলেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইলে সভাপতি বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও একটি সঙ্গীতের পর সভাভঙ্গ হইল। ঢাকা জনসাধারণ সভা সোমপ্রকাশের মৃত্যুজনিত শোকপ্রকাশার্থ যে সকল প্রস্তাবাধারণ করিয়াছেন, এই সভার প্রস্তাবগুলিও প্রায় তদনুরূপ, সুতরাং অনাবশ্যক তত্তাবতের পুনরুল্লেখ করা গেলনা।

বাবু শিবেন্দ্রনাথ সেন, প্রসন্নকুমার বসু ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা এরূপ উৎকৃষ্ট, যুক্তিযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সকলেই তচ্ছ্রবণেবিস্মিত হইয়াছিলেন। বিংশ, দ্বাবিংশ বা চতুর্ব্বিংশ বর্ষদেশীয় যুবকদিগের মুখ হইতে এরূপ শুদ্ধভাষায় অনর্গল সারগর্ভ বক্তৃতা রোধ হয় অনেকেই এই প্রথম শুনিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কেহই এরূপ আশা ও ভরসা করেন নাই যে, বিদ্যালয়ের যুবক ছাত্রগণ রাজনৈতিক বিষয়ে এতাদৃশ যুক্তিযুক্ত মনোহর বক্তৃতা করিতে পরিসমর্থ। বলিতে কি, অনেকেই ঐ দিবসীয় সভা হইতে এই মত পরিগ্রহ করিয়া গিয়াছেন যে, বিদ্যালয়স্থ অপরিজ্ঞাত ছাত্রদিগের মধ্যেও এরূপ অনেক লোক রহিয়াছেন যে, তাঁহার প্রধান ২ বক্তাদিগ হইতে কোন বিষয় ন্যূন নহেন ; ইহারা যদি এক্ষণ হইতে রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে মনঃসন্নিবেশ করেন,—পাঠ্যাধ্যয়ণের সঙ্গে ২ দেশের উন্নতি সাধন কল্পেও কিছু ২ চেষ্টা করেন, ভবিষ্যতে এক একটী রত্ন স্বরূপ হইয়া দেশের হিত সাধনে সমর্থ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি, ইহারা উৎসাহ ও উদ্যম পরিত্যাগ না করিয়া–বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে ২ লেখাপড়ার চর্চ্চা

বিসর্জ্জন না দিয়া অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব স্বাভাবিকী বক্তৃতা শক্তির পরিচালনে সযত্ন থাকুন; কালে অবশ্যই বড় লোক বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবেন। ছাত্র সভা সোমপ্রকাশের মৃত্যুতে যে যে রূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ নূতন কথা অধিক ছিল না সত্য, কিন্তু যে দেশীয় সংবাদপত্রের উপর রাজকীয় নিগ্রহ সাধারণ শিক্ষিতবর্গের উপেক্ষাগ্রাহক মণ্ডলীর নির্দ্দয়তা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই জন্য যে দেশের ভাবী আশা ভরসাস্থল যুবকগণ যে, সমবেত হইয়া এক–হৃদয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত ও আশ্বস্ত হইয়াছি। নিয়মিতরূপে কোন না কোন সংবাদপত্র পাঠ না করিলে আজিকালি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করা সুকঠিন হয়—অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বিজ্ঞসমাজে মুখব্যাদন করিতেই পারা যায় না—কোন রাজ্যের বর্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা পরিজ্ঞাত না থাকাতে অনেক বিষয়েই অন্ধকার অন্ধকার বোধ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কোন দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ না করিলে, দেশের প্রকৃতাবস্থাভিজ্ঞই হওয়া যায় না–দেশীয় সংবাদপত্রের প্রতি সমাদর প্রদর্শনে দেশের প্রতিই সমাদর প্রদর্শন করা হয়, এতদঞ্চলীয় ছাত্রবর্গ যে এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ঢাকার ছাত্রসভা ছাত্রগণের রাজনৈতিক আলোচনার আবশ্যকতা বিষয়েও সেদিন বিলক্ষণ আন্দোলন করিয়াছেন। কোন ২ সংবাদপত্র ছাত্রদিগের রাজনৈতিক আলোচনার দূষণীয়তা প্রতিপাদন করাতেই বোধহয় ছাত্রসভা এতদ্বিষয়ক আন্দোলনে সঙ্ক্ষুব্ধিত হইয়াছেন। তাহারা বহুল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করিতে ত্রুটি করেন নাই যে, কোন ব্যক্তিই অশৈশব সমালোচনা ও শিক্ষা ব্যতিরেকে রাজনীতি ও সমাজ নীতি বিষয়ে বড়লোক হইতে পারেন নাই। বালকদিগের রাজনীতি সমালোচনায় প্রতিষেধই বা কি? যদি পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণের রাজনীতির আন্দোলন দুষণীয় না হয়, তবে শিক্ষার্থি যুবকদিগের পক্ষে তাহা কেন দূষণীয় হইবে? বালকের রাজনৈতিক আলোচনার আস্বাদ পাইলে উচ্চ ২ বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যকোনও বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্তিমান হইবে না অল্পকাল মধ্যে "জেঠা" হইয়া উঠিয়া অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িবে, রাজনীতির কূটিল পরিচ্ছেদ বিশেষ পাঠ করিয়া বিদ্রোহ প্রবৃত্তি প্রশমিত রাখিতে পরিসমর্থ হইবে না, আমাদিগের বিবেচনায় একথার কোনও অর্থ নাই। যখন তাহাদের অনেকেই যুগপৎ বহুলবিষয় শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছে, তখন তৎসঙ্গে রাজনীতিও অন্যতম শিক্ষনীয় বিষয় মধ্যে পরিগণিত থাকিলে তাহাদের অপরাপর বিষয়ে অকৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা কি? যাহারা সাধারণত বখা হইয়া উঠিয়া অকর্ম্মন্য হয়, তাহারা রাজনীতির ধার অল্পই ধরিয়া থাকে। শুদ্ধ রাজনীতি কাহাকেও বখা করিয়া তুলিতে পারে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। ছাত্রেরা রাজনীতির আলোচনা করিলে বিদ্রোহীই বা হইবে কেন? ছাত্র জীবনে কোনও বিষয়েরই কার্য্যকারিতা থাকে না, শুদ্ধ কেবল আলোচনা ও জ্ঞানলাভের ক্ষমতামাত্র থাকে, তন্নিবন্ধন তাহারা সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। যদি পরিণতবয়স্ক কার্য্যক্ষম ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক আলোচনা করিয়া রাজবিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে আলোচনৈকপরায়ণ কর্ম্মক্ষম যুবকবৃন্দের সম্বন্ধে রাজবিদ্রোহিতার আশঙ্কা কি? যিনি যাহাই বলুন, যুবকেরা ভালরূপ রাজনীতির সমালোচনা করিলে তাহাদিগের অধিকতর রাজভক্তি জন্মিবারই ভূয়সী সম্ভাবনা। সাধারণ অজ্ঞলোকে রাজকীয় যে বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব অনবগত

থাকাতে রাজার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, রাজনীতির গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ হইলে যুবকদিগের তদ্রূপ অভক্তি প্রকাশ করিবার কারণমাত্র থাকে না। ফলতঃ অজ্ঞতা ও অন্ধকার রাজভক্তির যেরূপ বিরোধী, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানালোক রাজানুরক্তির তদ্রূপ পরিপন্থী নহে। প্রত্যুত রাজনীতি বিষয়ক বহুজ্ঞতা ইংরাজদিগের ন্যায় সুসভ্য রাজগণের প্রতি প্রকৃত ভক্তি উৎপাদনের সহায়তাই করিয়া থাকে।

১৮ মে, ১৮৭৯

## ছাত্রসাধারণ সভা

গত রবিবার অপরাহ্ন ৪॥ টার সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিগৃহে অত্রত্য ছাত্রসাধারণ সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সবর্ডিনেট জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার[৭০] সেই সভায় সভাপতির কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছেন। সভাস্থলে পদস্থ ভদ্র সম্ভ্রান্ত অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সাফল্যে প্রায় সহস্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমিত হইল। সভাপ্রারম্ভে সম্পাদক বাবু শ্যামাকান্ত নাগ এম, এ, রিপোর্ট পাঠ করিলেন এবং গ্রীষ্মাবকাশ সময়ে বাবু শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহে ও বাবু শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরে যে ২ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্বিবরণ পাঠ করিতে বলিলেন ; তদনুসারে শীতলাকান্ত বাবু ও শিবেন্দ্রনাথ বাবু নিজ ২ কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। ইহাদের কার্য্যবিবরণ শ্রবণে অবগতি হইল, ময়মনসিংহে ইতঃপূর্ব্বে যে দুইটি ছাত্রসভা ছিল, তন্মধ্যে তত সদ্ভাব ও একতা ছিল না ; সংপ্রতি সেই অসদ্ভাব ও অনৈক্য দূরগত হইয়া সেখানেও একটি মাসিক ছাত্রসাধারণ সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে— বিক্রমপুরস্থ যপশা, লোনসিংহ ও কৌয়রপুর গ্রামেও ঢাকা ছাত্রসাধারণ সভার এক একটি শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ইতঃপূর্ব্বেই সন্তোষ ও রোয়াইল গ্রামে দুইটি শাখাসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল।

যখন ঢাকা ছাত্রসাধারণ সভার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সোমপ্রকাশের মৃত্যুবিষয়ক কর্ত্তব্যবতা নির্দ্ধারণ ও আন্দোলনেই ব্যাপৃত ও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া সভা নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই, অধিকন্তু সভার প্রথমাধিবেশনের অব্যবহিত পরেই কলেজ ও স্কুলসকল বন্ধ হওয়াতে এতদিন ঐ বিষয়ে সভা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। প্রোক্ত দিবসীয় সভায় ছাত্রসাধারণের সভার এই অভাব বিমোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্কুলের এক একটি ও কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটি ছাত্র লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক রচিত হইয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় স্থায়ী সভাপতি ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন সহকারি সভাপতি-পদে বরিত হইয়াছেন। বাবু শ্যামাকান্ত নাগ এম, এ সম্পাদক, বাবু আশুতোষ সরকার বি, এ সহকারি সম্পাদকতাপদে নিয়োজিত হইয়াছেন। ১৪ বৎসরের অধিকবয়স্ক স্কুলের ছাত্রমাত্র এবং উৎসাহ প্রদর্শক অপরাপর পদস্থ ব্যক্তিগণও এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আরো অনেক অবান্তর নিয়ম নিরূপিত ও কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইয়াছে, বাহুল্য বিবেচনায় তত্তাবতের উল্লেখ করা হইল না।

নিয়মাবলী নির্দ্ধারণের পর "শ্রমোপজীবিগণের মধ্যে বিদ্যালোক বিস্তরার্থ নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হউক" এই প্রস্তাব করিয়া বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় একটি সুদীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সভাস্থ সকলেই সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক বলিয়া শীতলাকান্ত বাবুর প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদান করিলে, ঢাকায় একটি রজনী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হইবে, নির্দ্ধারিত হইল। গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও উপলব্ধি হইল। শাখাসভাগুলির উদ্যোগে বোধ হয় সত্বরই তাহারই অনুষ্ঠান করা হইবে। ফলত যে উদ্দেশ্যে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ২/১ টি মাত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়া সুদূর পরাহত। বাবু গঙ্গাচরণ সরকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, "শ্রমজীবিসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোকে বিস্তার" বিষয়টি বড়ই গুরুতর, সুতরাং তৎসমাধানার্থ অসাধারণ যত্ন চেষ্টা ও অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন দুই একটি নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তবে উদ্যোগ, উৎসাহদিদর্শনে আমাদের প্রত্যাশা হইতেছে, সভা সময়ে এই গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী উপায় বিধান করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বাবু শিবেন্দ্রনাথ গুপ্তও শীতলাকান্ত বাবুর প্রস্তাবের পোষকতা উপলক্ষে একটি বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন ও বাবু গঙ্গাচরণ সরকার উৎসাহ প্রদানার্থ দুই চারিটি কথা বলিলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

আমরা ছাত্র সাধারণ সভার যেরূপ যত্ন চেষ্টা, উৎসাহ, অধ্যবসায়াদি প্রত্যেক্ষ করিতেছি,—অত্যল্পকাল মধ্যে যেরূপ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ইহাদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে সুফল ফলিবে, প্রতীত হইতেছে। কেহ কেহ ছাত্রসভার কার্য্যকে "ছেলে খেলা"—বলিয়া উপহাস করিতেছেন ; কিন্তু আমরা পদস্থ সম্মান্য ব্যক্তিগণকে এই সভার পৃষ্ঠপূরক, উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী দেখিয়া কখনই তদ্রুপ সংস্কারাপন্ন হইতে পারিতেছিনা ; ফলত ভাল ভাল লোক যখন ইহার উন্নতিকামুক ও সহায় হইয়াছেন, তখন ভাবি সুফল দর্শনে নিরাশ হইবার কারণ দেখা যায় না। এক্ষণ ছাত্র সাধারণ সভা কর্ত্তব্যব্রত পালনে সবিশেষ মনোযোগী হন,—ঢাকাস্থ অপর কোন ২ সভার ন্যায় নামমাত্র পর্য্যবসিত না হন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

২০ জুলাই, ১৮৭৯

## সাধারণ শিক্ষা ও লর্ড রিপণ[৭১]।

ধার্মিক শ্রেষ্ঠ কেরি,[৭২] ডফ,[৭৩] উইলসন[৭৪] প্রভৃতি খৃষ্ট মিশনরীদের প্রসাদাৎ আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছি। তাঁহাদেরই যত্নে স্থানে ২ কলেজ, হাইস্কুল প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল ভারতহিতৈষী মহাত্মাদের নাম স্মরণ হইলে, এক্ষণও ভারতবর্ষ কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইয়া পড়েন। কিন্তু ১৮৫৪ সনের পূর্ব্বে সাধারণ লোকদের শিক্ষার কোন সুবিধা করা হইয়া ছিল না। লর্ড বেন্টিঙ্ক,[৭৫] লর্ড হার্ডিঞ্জ[৭৬] প্রভৃতি মহাত্মাগণ সাধারণ শিক্ষার দ্বার খুলিয়া যান বটে, কিন্তু লর্ড ডেলহোসীর[৭৭] রাজত্বকালে তৎকালীন ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী সরচালস উড (লর্ড হালিফাকস্)[৭৮] যে ডিষপ্যাচ প্রকাশ করেন, তাহাতেই ভারতবর্ষে, দেশীয় ও পাশ্চাত্যজ্ঞান শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার হইতে থাকে। লর্ড হালিফাক্সের প্রধান ইচ্ছা ছিল, যাহাতে সাধারণ লোকদের শিক্ষার বহুল প্রচার ঘটে। কার্য্যতঃ তাঁহার সেই প্রধান অভিমতিটি ক্রমে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কার্য্য করিতেছিল। এমন কি উচ্চ শিক্ষার প্রচারাধিক্যে, পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ১৫টি কলেজ, অধিক প্রসূত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশীয় লোকেরা কলেজাদির সংরক্ষণে সাহায্য করিতেন, এক্ষণ স্বয়ং গবর্ণমেন্ট সেই সকল উচ্চ শিক্ষার ব্যয় ভারবহন করিতেছেন। কলেজাদির ব্যয়ই, বৎসর গবর্ণমেন্ট,

এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের $\frac{১}{৪}$ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। আর সাধারণ লোকদের শিক্ষার জন্য, মাত্র $\frac{১}{১২}$ টাকা ব্যয়িত হয় কিনা সন্দেহ। অথচ, সাধারণ লোকদিগ হইতেই ভারতবর্ষের অধিক পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হয়। সুতরাং তাহাদের শিক্ষার বহুল প্রচারেই ন্যায় পরতার সমধিক কার্য্য হইতে পারে। ইংলণ্ডেও সাধারণ লোকদের শিক্ষার জন্য, সময়ে সময়ে সমূহ আন্দোলন উপস্থিত হয়। আমাদের নব গবর্ণর জেনেরেল লর্ড রিপন আন্দোলনের, এক প্রধান পক্ষপাতী লোক ছিলেন। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডে প্রায় ৬০ সহস্র বিদ্যালয় আছে, তাহাতে প্রায় ৩ লক্ষ বালক অধ্যয়ণ করিয়া থাকে। তথাপি সাধারণ লোকদের শিক্ষার নির্মিত তেমন সুবিধা নাই, বলিয়া সময়ে ২ প্রগাঢ় আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে। লর্ড হ্যালিফাকস্ একজন সাধারণ শিক্ষার প্রধান অভিভাবক। ভারতবর্ষে সেই শিক্ষার বহুল প্রচার তাহাতে ঘটে, সে বিষয়ে তিনি অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু ডেলহোসীর পর আর কোন গবর্ণর জেনেরেলই সে বিষয়ে সমধিক মনোযোগ প্রদান করেন নাই। লর্ড মেয়োর সময় সর জর্জ্জ কাম্বেল সাধারণ শিক্ষার বিস্তারে কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। যাহাতে দরিদ্র কৃষক সন্তানগণ অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে এজন্য স্থানে ২ প্রাইমারী শিক্ষার সৃষ্টি করেন। এবং জেলায় ২ কতগুলি নর্ম্ম্যাল স্কুলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।—

বর্ত্তমান নব গবর্ণর জেনেরেল, লর্ড রিপন সাধারণ শিক্ষার পক্ষাশ্রয়ী। কলেজাদিতে ধনি ও বড় লোকের সন্তানরাই, অধ্যয়ণ করিতে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে সরজর্জ্জ কাম্বেল ও লর্ড হালিফাক্সের ন্যায় তাঁহারও সংস্কার রহিয়াছে। এবং তিনি যখন ভারতবর্ষ অভিমুখে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাকে এক ডেপুটেশন দেন। লর্ড রিপন সে বিষয়ে সমধিক সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার যে সকল গুরুত্ব কার্য্য করিতে হইবে, তন্মধ্যে ইহাও তিনি কর্ত্তব্য শ্রেণীর অন্তর্গত রাখিয়াছেন।

সাধারণ শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার হয়, ইহা আমাদের অভিলক্ষণীয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া লর্ডমেয় কি সর সর্জ্জ কাম্বেলের মত কলেজাদিতে উচ্চ শিক্ষার মূলদেশে কুঠার প্রক্ষেপ ; লর্ড রিপনের ন্যায় ধার্ম্মিক খৃষ্ট মিশনরীর উচিত হইবে না। উচ্চ শিক্ষাও সাধারণ লোকেদের শিক্ষা, এক শ্রেণীর অন্তর্গত না হইলেও উচ্চ উভয়ের আবশ্যকতা সমধিক রহিয়াছে। একের অভাবই দেশের অমঙ্গল। বোধ হয়, লর্ড রিপন উচ্চ শিক্ষার আততায়ী হইবেন না।

১৪ জুন, ১৮৮০

## পূর্ব্ব বাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগ

ইতঃপূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গালা শিক্ষা বিভাগে যাঁহারা ইন্‌স্পেক্টর হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই প্রথমে কলেজ আদির অধ্যাপনা কার্য্যে অভিজ্ঞতা মাত্র ছিল, সুতরাং কি প্রণালীতে কার্য্য পরিচালন করিলে শিক্ষাবিভাগের বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বড় বহুজ্ঞতা থাকিত না। কাজেই স্বাধীনভাবে ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য সম্পাদন করিতে যথোচিত সাহসী হইতেও প্রায় দেখা যাইত না। অনেক বিষয়ে প্রধান ২ কর্ম্মচারীগণের সাহায্য গৃহীত হইত। শুনা যায়, কোন কোন ইনস্পেক্টর কর্ম্মচাররী সাহায্যগ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া কার্য্য বিশেষে সবিশেষ লজ্জাও পাইয়াছেন। [ অস্পষ্ট ] আফিসের কর্ম্মচারিগণ কার্য্যক্ষম ও বহুদর্শী না থাকিলে তৎকালীন ইনস্পেক্টরগণকে মহাবিপদেই পতিত হইতে হইত। ইতঃপূর্ব্বে

বাঙ্গলা ও মাইনার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাইতে প্রায়ই বৎসরের চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হইত ; নূতন পাঠনির্ব্বাচন সম্বন্ধেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা ছিল, পরীক্ষার্থিগণকে বৎসরের মধ্যে প্রায় তিনমাস কালই খেলিয়া বেড়িয়া কাটাইতে হইত। ইত্যাকার বিবিধ বিশৃঙ্খলায় পূর্ব্ববাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগের যে বহু অনিষ্ট সম্পাদিত হইয়াছে, সুদক্ষ কর্ম্মচারীগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তৎসমুদায় তিরোহিত করিতে সক্ষম হন নাই। আফিসের বহুবিধ কার্য্যভার কর্ম্মচারি বিশেষের উপরই অর্পিত থাকিত, সুতরাং তাঁহার সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া সুশৃঙ্খলা সম্পাদন বিষয়ে চিন্তা করিবারও অবকাশ হইত না। এতদ্বশতই এ যাবৎ পূর্ব্ববাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগে এতদূর বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়াছে।

আমরা সবিশেষ আহলাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের নবাগত স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন সাহেব অত্যল্প কাল মধ্যেই পূর্ব্ববাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগের কার্য্যপ্রণালীর বহুতর প্রশংসনীয় পরিবর্তন সম্পাদন করিয়াছেন। অনেকেই [ অস্পষ্ট ] করিতেছেন, তন্নিবন্ধন অচিরেই এতদঞ্চলীয় শিক্ষাবিভাগের সবিশেষ উন্নতি প্রত্যক্ষীভূত হইবে। বস্তুতঃ মার্টিন সাহেবের কার্য্যাভিজ্ঞতা, অনলসতা ও অনন্যনির্ভরতা প্রত্যক্ষ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি কিছু অধিকদিন এখানে থাকিয়া গেলে, পূর্ব্ববাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগের বাসনানুরূপ সমুন্নতিই পরিলক্ষিত হইবে। এ বৎসর বাঙ্গলা এবং মাইনার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা নিয়মিত সময়ে গৃহীত হইয়া তাহার এক মাস পরই পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করিবার নিয়ম হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রথম ও দ্বিতীয়শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক স্বতন্ত্র ২ রূপে নির্ব্বাচিত হইত। পরীক্ষার্থীদিগকে সাহিত্যাদিবিষয়ক পুস্তক এক বৎসর কালমাত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। এক বৎসরকালমাত্র সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে অল্পবয়স্ক বালকদিগের সমুচিত শিক্ষালাভের সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই পরীক্ষার্থিগণও কোনরূপ অর্থ পুস্তকাদি কণ্ঠস্থ করিয়া উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হইত না। এই নিমিত্ত সম্প্রতি মার্টিন সাহেব প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একই রূপ পাঠ্য নির্বাচিত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর সহিত সম্যক্ সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগের কার্য্যপ্রণালী প্রবর্তিত করা তাঁহার অভিপ্রেত। আমাদের ন্যায় অনেকেরই বিশ্বাস যে, তিনি অচিরেই সমস্ত অসুবিধা তিরোহিত করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগে এক অনির্ব্বাচনীয় সুশৃঙ্খলার স্রোতঃ প্রবাহিত করিতে পরিসমর্থ হইবে না।

পূর্ব্বে বাঙ্গলা, মাইনার ও ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষকতা ঢাকাস্থ শিক্ষকগণেরা একরূপ একচেটিয়া তালুক ছিল। কিন্তু এ বৎসর নানা স্থান হইতে পরীক্ষক নির্ব্বাচনের প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় অল্প বেতনভোগী গ্রাম্য পণ্ডিতগণের বিশেষ আয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে অত্রত্য শিক্ষক ও পণ্ডিতসমাজের কোন কোন ব্যক্তির মনঃক্ষোভ হইবার সম্ভাবনা বটে, কারণ তাঁহাদের বাৎসরিক আয়ের এক প্রশস্তপথ রুদ্ধ হইয়া পড়িল ; কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই নুতন নিয়মের পক্ষপাতী। শুনিতে পাওয়া যায়, মার্টিন সাহেব নাকি পূর্ব্ববাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগে অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রবর্ত্তনেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এখন বলা যায় না ঢাকার ভাগ্য তিনি স্বকীয় সঙ্কল্প সকল সংসাধনে কি পরিমাণ সময় পাইয়া উঠিবেন। কেবল শিক্ষাবিভাগে নয়, জুডিসিয়েল বিভাগেও যোগ্য ২ কর্ম্মচারীগণের যেরূপ অচির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে যে তিনি বহুকাল এখানে স্থায়ী হইবেন, তাহার প্রত্যাশা অল্প। তাই সর্ব্বান্তঃকালে প্রার্থনা

করি, মার্টিন সাহেব অচিরে স্বকীয় সুসঙ্কল্প সকল সংসাধনে কৃতনিশ্চয় ও কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণ ও উৰ্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সমীপে যশবান হউন।

৭ নভেম্বর, ১৮৮০

## বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণ দিন ২ অধিকতর উন্নয়নগামী হইতেছে। ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি অনাস্থা, পিতামাতা ও শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি অভক্তি, তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত উপকারজনক শাসনাদিতে উপেক্ষা এবং সাধারণ সামাজিক বন্ধনাদিতে অদৃঢ়তা ইহাদিগের অজাগ্রত দোষ হইয়া উঠিতেছে। সত্বর এ দোষের নিরাকরণ না হইলে, জানি না পরিণামে ইহাদিগের দ্বারা দেশের কিনা শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইবে। আধুনিক কৃতবিদ্য সম্প্রদায় আমাদিগের প্রধান [ ভরসা ] স্থল, তাহাদিগেরই যদি দশা [হইল] তবে আমাদিগের আশার অবলম্বন [ কি ] ? আমাদিগের ন্যায় অনেকেই সমুদায়২ অধুনাতন শিক্ষার্থিমণ্ডলীর [ অস্পষ্ট ] পরতাদির উল্লেখ করিয়া আরোও [ প্রকাশ ] করিতেছেন। কেবল এদেশীয়েরা নহেন চিন্তাশীল পরিণামদর্শী প্রবীণ ইউরোপীয়দিগেরও মধ্যে ২ চিন্তা পথে এই বিষয়টি সমুদিত হইতেছে। অনেকেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। এদেশীয় ছাত্রদিগের সুনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিধান কর্ত্তব্য। আমরা যার পর নাই আহলাদিত হইলাম, আসামের শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় সংপ্রতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তৎপ্রদেশীয় পাঠ্যপুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপদেশ থাকা আবশ্যক :—

১) ঈশ্বর, জনক জননী, শিক্ষাগুরু, শাসনকর্তা ও প্রাচীন লোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

২) ধর্ম্মনীতি ও সংসার প্রীতি।

৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, মিষ্টভাষী হওয়া, ইতর জন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করা।

৪) কায়িক পরিশ্রমের উপকারিতা ও গৌরব এবং কৃষি বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি ব্যবসায়ের প্রয়োজনীতা।

৫) অঙ্গচালনার উপকারিতা।

৬) বৃক্ষলতাদির বিশেষ ২ গুণ।

৭) ধাতু ও খনিজদ্রব্যের ব্যবহার।

৮) পশুদিগের ও প্রাকৃতিক পদার্থের প্রকৃতি, সাধারণ মানবজাতির ইতিহাস, প্রাচ্য ইতিবৃত্ত এবং এত [ ৎসম্বন্ধীয় ] দিগের জীবন বৃত্তান্ত। [ অস্পষ্ট ] আসামের মহানুভাব স্কুল ইনস্পেক্টর যেরূপ করিয়াছেন। যদি এদেশের [ প্রত্যেক ] বিভাগের শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কগণ [ এরূপ ] করেন অন্ততঃ সাধারণ ধর্ম্ম [ অস্পষ্ট ] মূলক পুস্তকাধ্যাপনে দৃঢ়যত্ন হন। [ তাহা ] হইলে নিম্নশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগের মধ্যে সুনীতি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সন্দেহ নাই। অতএব শিক্ষা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ বিধান করেন, একান্ত বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য যে, অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকেরা প্রথমাবিধি প্রকৃত প্রস্তাবে সুনীতি শিক্ষা পাইলে অপক্ক মৃৎ পাত্রের রেখার ন্যায় তাহা চিরবদ্ধ হইয়াই থাকিবে। প্রত্যুত আম পাত্রের রেখা অগ্নিপরিপক্ক হইলে যেমন অধিকতর উজ্জ্বল ও অমোচ্য হয়,

অভিজ্ঞতাপূর্ব্বক অন্তঃকরণেও সেইরূপ শৈশব শিক্ষিত নীতিগুলি সমুজ্জ্বলও সুদৃঢ় হইয়া থাকে। অতএব বিদ্যালয়ে প্রথমাবধি সুনীতি শিক্ষার উপায় বিহিত হইলে, চিরকাল তাহা বদ্ধমূল থাকিয়া ফলদায়ক হইবে অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি উচ্চশিক্ষার্থি যুবকদিগের সম্বন্ধে উচ্চ ২ নীতি শিক্ষার একান্তই প্রয়োজন। বালকদিগের নীতি একবিধ, যুবকদিগের নীতি অন্যবিধ। বাক্যাবস্থার সুনীতি শিক্ষার অনেক ফল যৌবনে, প্রোঢ়াবস্থায় অথবা বার্দ্ধক্যেও উপভোগ করা যায় সত্য, কিন্তু বয়সের আধিক্য বা পরিণতি না হইলে যেরূপ নীতি অবলম্বন এমনকি ধারণাই করা যায় না, অধিক বয়স্ক উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রবর্গকে, তাদৃশী উচ্চ [ অস্পষ্ট ] নীতি, অবশ্যই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনা হইতে এদেশীয় শিক্ষিতগণের [মধ্যে] যখন তাদৃক সুনীতি সমায়ত্ব হয় [ অস্পষ্ট ] তখন যত্ন ও দৃঢ়তা সহকারে তৎশিক্ষা প্রবর্ত্তন নিতান্তই বিধেয় হইতেছে।

অল্পদিন হইল কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড গার্থ মহোদয় এক সভায় প্রসঙ্গক্রমে এদেশীয় যুবকদিগের নীতি সম্বন্ধে যে যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতিশয় সারবান এবং একান্ত মঙ্গলদায়ক। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, বাঙ্গালীরা বহুসংখ্যক পুস্তক অধ্যয়ন করে সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডের বিদ্যালয়স্থ যুবকেরা যেভাবে শিক্ষিত হইয়া যে ২ অমূল্য ফল লাভ করে, বঙ্গীয় যুবকেরা সেভাবে শিক্ষিত হইয়া সেরূপ ফললাভ করিতে পারে না। কেবল পুস্তক অধ্যয়ন এক, আর প্রকৃত শিক্ষা অন্যপ্রকার। ইংলণ্ডের যুবকেরা মনুযত্ব, নম্রতা, অভ্যাস, আত্মশাসন, উদ্যম, আনুগত্য, বিশ্বাস মার্জন এবং সংসৃষ্ট মনুষ্যদিগের প্রতি ব্যবহার শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে যায়। কিন্তু এদেশীয় যুবকেরা কেবল পুস্তক অভ্যাস করিবার নিমিত্ত, বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে যায়। সর রিচার্ড গার্থের এই উক্তি সম্পূর্ণই সত্য। এদেশীয় যুবকদিগের প্রকৃত প্রস্তাবেই কেবল পুস্তক শিক্ষা মাত্র হয়। যে ছাত্রের স্মরণ শক্তি অধিক ; পুস্তক মুখস্থ করিয়া সেই ছাত্রই পরীক্ষোত্তীর্ণ ও খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা যাহা, তাহা কিছুই আয়ত্ত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা কেবল তাহাদিগেরও দোষ নহে, শিক্ষা প্রণালীর এবং শিক্ষকদিগের দোষেও ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে। যদি উচ্চ২ বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্যই উপরি উক্তরূপ হইয়া দাঁড়ায়, সাধারণভাবে সুনীতি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়,—শিক্ষকগণ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সুনীতি পরায়ণতার অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে অবশ্যই এদেশীয় সুশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যেও অচিরে ইংলণ্ডের সুশিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর সদগুণ পরম্পরা পরিলক্ষিত হইতে পারে সন্দেহ নাই। অতএব কর্তৃপক্ষ বিশেষ মনোযোগী হইয়া শিক্ষা প্রণালীর সংশোধন, সুনীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং সর্ব্বত্র সচ্চরিত্র সুনীতিপরায়ণ অধ্যাপক নিয়োজন করেন, এই আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

৭ আগস্ট, ১৮৮১

## বঙ্গদেশীয় ভাষা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও আলোচনা ব্যতীত পৃথিবীর কোন জাতিই সভ্যতার সুপবিত্র ও সুপ্রশস্ত বর্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। জগতের যে জাতি সজাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সঙ্কল্পে বীতস্পৃহ, সে জাতির উন্নতি যে সুদূর পরাহত, ইহা জ্যামিতি শাস্ত্রের সংজ্ঞার ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণীভূত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতি যেদিন হইতে

জাতীয়ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই দিন হইতে বঙ্গদেশের জাতীয় উন্নতির রুদ্ধ দ্বার সর্ব্বপ্রথমে আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলো দেশের ন্যায় "জাতীয় জীবন বিহীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরাজিত জাতির" ভাষা সত্বরে উন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে না ; তথাচ গত অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়া ইহার অঙ্গ পুষ্ট হইয়াছে, তাহাই আশ্চর্য্য এবং প্রশংসার্হ। পৃথিবীর আর কোনও পরাজিত জাতির ভাষা এত অল্পকাল মধ্যে এতদূর আশ্চর্য্য উন্নতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। ভাষার উন্নতির সহিত জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সংসাধিত হয়। গত অর্দ্ধশতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, বাঙ্গালীর ক্ষুদ্রহৃদয় যে এক্ষণে চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। এরূপ উন্নতি দেশের অবস্থা পক্ষে নিতান্ত শুভকর বলিতে হইবে।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, পরাজিত জাতির ভাষা সহজে বা স্বল্পসময়ে যে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এইরূপ ভাষার উন্নতি পক্ষে দুইটি কারণ প্রবল সহায়। (১ম) রাজা (২য়) প্রজা। যাহাদের ভাষা তাহারা যদি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনকল্পে ইহার আলোচনা না করে কিংবা বিশেষ যত্নস্বীকার না করে তাহা হইলে ভাষার উন্নতি হইতে পারে না। অপরদিকে দেশের রাজা যদি শাসিত জাতির সাহিত্যের উন্নতি কল্পে উৎসাহ প্রদান কিংবা সাহায্যদান না করেন, তাহা হইলেও প্রজার সাহিত্য উন্নত হইতে পারে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি জন্য যত্ন-স্বীকার তজ্জন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিব। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় বিচারালয়সমূহ হইতে পারস্যভাষার প্রচলন বন্ধ করিয়া তৎস্থলে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত করিবার আইনবিধিবদ্ধ করিয়া, ইংরেজগবর্ণমেন্ট বঙ্গবাসীদিগের যথার্থ উপকারসাধন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বলিতে হইলে, ইং ১৮৩৮ অব্দ হইতেই বঙ্গভাষার উন্নতির প্রথম সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বে যে স্থলে পারস্যভাষার লিখন কথন প্রভৃতি হইত, এক্ষণে সেই স্থলে বাঙ্গলাভাষা ব্যবহৃত হইতেছে। এখন আর বিচারালয়ে তদ্রূপ পারস্য ভাষার প্রচলন নাই ; এখন ব্যবহারাজীবগণ বাঙ্গালায় কথা কহিলে বিচারককে বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে হইবে। সুতরাং কেবল এই একমাত্র ঘটনায় বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি পৃথিবীর অপরাপর পরাজিত জাতির সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকে তুলনক সমালোচনায় পরাস্ত করিয়া তুলিল।

ইং ১৮৩৮ অব্দের পর হইতে যদিও নানা কারণে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, যদিও ইহা এক্ষণে একটি অনতিপ্রসর খাতসীমা ভেদ করিয়া দেশের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত হইতেছে, যদিও ইহা বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবার স্পৃহা ও গৌরবের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে, তথাচ কয়েকটি কারণে ইহার উন্নতিরগতি প্রবলা হইয়া উঠিতেছেনা। বিস্তার করিয়া লিখিতে গেলে কারণের সংখ্যা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, আমরা অদ্য কেবল একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশের শিক্ষার ভাণ্ডারস্বরূপ, আমাদের সুশিক্ষা, সুনীতি, জাতীয় স্বভাব, এই সকল বরণীয় গুণ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবাসীর সাধারণ জননী স্বরূপ। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমাদের বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির পথে একটি কন্টকবৃক্ষরাপিত হইতেছে একটি দূরপণেয় কলঙ্ক নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমরা নিশ্চয় বলিতে

পারি তাঁহাদের দ্বারা যদি বাস্তবিক বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যদবংশীয়দিগের নিকট তাঁহাদিগকে এ জন্য দায়ী হইতে হইবে। এরূপ ক্ষতি হইলে বাঙ্গালীর সুশিক্ষার পথে কন্টক পড়িবে, বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব লঘুতা প্রাপ্ত হইবে এবং দেশাবাৎসল্যের নামমাত্রও থাকিবে না।

এডুকেশন কমিশনের কোন কোন সভ্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়[৭৯] হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা উঠাইয়া দিলেও কোন ক্ষতি হইতে পারে না। কিরূপ যুক্তির আশ্রয়ে তাঁহারা একথা বলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। যাহা হউক তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি অপরিণামদর্শী এবং উদ্ধত প্রকৃতির "ফেলো" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদিগকে ইংরেজী ভাষায় "ফেলো" কহা গিয়া থাকে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে বি, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য ছাত্রদিগকে সকল পুস্তকই ইংরাজীভাষায় পড়িতে হয়। উহার সঙ্গে 'দ্বিতীয়ভাষার সাহিত্য"ও অধ্যয়ন করিতে হয়। "দ্বিতীয় ভাষা" অর্থে ইংরাজী ভিন্নসমুদায় ভাষাকে বুঝায়। ইংরাজীর সহিত উর্দ্দুপারস্য, আরব্য, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, লাটিন, গ্রীক–এই কয়েকটি ভাষার অন্যতমকে ধরিয়া লইতে হয়। কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা চলে, তাহার পরবর্ত্তী আর কোনও পরীক্ষায় বাঙ্গলাভাষা চলে না। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, মুসলমানেরা আরব্য, পারস্য ও উর্দ্দু এই তিনটির অন্যতমকে এবং বঙ্গজহিন্দুরা হিন্দী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং উড়িয়া এই চারিটির অন্যতমকে দ্বিতীয়ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবে। এখন এই নিয়ম চলিতেছে যে, যাহার যেটি ইচ্ছা সে সেইটিকে দ্বিতীয়ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। ল্যাটিন সহজ বলিয়া অনেকে সংস্কৃত পড়ে না ; এবং সংস্কৃতভাষা ইউরোপীয়ভাষা নহে বলিয়া অনেক বালক ইহার আদরও করে না।

সংস্কৃতভাষা ভারতীয় সকল মহাভাষার মাতামহী। পৃথিবীর সমুদয় সভ্যজাতির ভাষাই সংস্কৃতের নিকট ঋণী। বাঙ্গালাভাষার সহিত সংস্কৃতের যত সম্বন্ধ, অন্য কোনও ভাষার সহিত তত নহে। ক্রিয়া ও বিভক্তিমাত্রের ভেদ দেখা যায়। এদেশের তরলমতি বালকেরা কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পড়ে ; আজি যদি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা "দ্বিতীয়ভাষার" মধ্যে পরিগণিতা না হয়, তাহা হইলে আর কোনও বালক সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গলা পুস্তকের নাম পর্যন্ত মুখে আনিবে না। সুতরাং বাঙ্গালা ও সংস্কৃতভাষার সবিশেষ ক্ষতি হইবে। এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্যজাতির একমাত্র ভরসা যুবকদল ; আমরা যুবকদিগের নিকট হইতে অনেক মঙ্গল প্রত্যাশা করি। কিন্তু ইহারাই যদি স্বজাতীয় স্বদেশীয় সাহিত্য পড়িতে না পাইল, তবে আর দেশের উন্নতি কোথায় ? মনের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে সম্বন্ধ, স্বদেশীয় সাহিত্যের সহিত স্বজাতীয় উন্নতিরও সেই সম্বন্ধ।

২২ এপ্রিল, ১৮৮২

## ক্রপ্ট সাহেবের বক্তৃতা

নবাবগঞ্জের শ্রীধরবংশীয় বিদ্যালয় খুলিবার সময়ে আমাদিগের সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্রপ্ট সাহেব একটি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছেন।

১৮৫৪ অব্দের ডিস্পেচ সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ বলেন কিন্তু আমি এইমাত্র বুঝি যে ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এদেশের শিক্ষার নিমিত্ত যত ব্যয়ের প্রয়োজন রাজকোষ হইতে তাহার সমুদয় প্রদান করা অসম্ভব। লোকে আপনা হইতে বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং সাধারণ রাজস্ব হইতে তাহার সাহায্য করা হয়, এই অভিপ্রায়েই উক্ত ডিস্পচ তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। যেখানে লোকেরা সাহায্য লইয়া বিদ্যালয় চালাইতে পারে তথায় নূতন গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত করিতে ডিরেক্টরদিগের অনভিপ্রায় ছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন "আমরা আশা করি যে, কালে গবর্ণমেন্ট শিক্ষাকার্য্য হইতে হস্তোত্তোলন করিবেন।" ২৫ বৎসর হইল, সাহায্য দানপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এযাবৎ কালমধ্যেই কি ডিরেক্টরদিগের আশাতিরিক্ত ফল ফলে নাই? গবর্ণমেন্টকে সম্পূর্ণরূপে ব্যয় ভার বহন করিতে হয়, এখন এদেশে এমন একটি বিদ্যালয়ও নাই। গবর্ণমেন্টের কলেজ স্কুলসমূহের অর্ধেকেরও অধিক ব্যয় এখন এদেশীয়েরা প্রদান করিতেছেন। "তিনি আরও বলিয়াছেন" একদিকে যেমন গবর্ণমেন্টের ১১টি কলেজ, অপরদিকেও আবার সংখ্যক প্রাইভেট কলেজ লক্ষিত হইতেছে। ক্রমেই এগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতেছে। এন্টেনা ক্লাস স্কুল গবর্ণমেন্টের ৫০টি, কিন্তু ঐরূপ প্রাইভেট স্কুল ১৮০টি রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয় অপেক্ষা দেশীয়দিগের গোপনীয় ঐরূপ স্কুলের সংখ্যা ৮ গুণ অধিক। প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রায় ২০০০ গুণ অধিক হইবে। ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরগণ আশা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এত হইতে তাঁহারা এরূপ মনে করেন নাই। অতএব ১৮৫৪ অব্দের ডিস্পাচের ফল সম্পূর্ণরূপে ফলিয়াছে কিনা, সকলেই একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। অধিকাংশ কৃতবিদ্যাগণ দ্বারাই এদেশের বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা স্বয়ং যেমন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, দরিদ্র স্বদেশীয়দিগের নিমিত্তও সেইরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। আমি আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি, এদেশীয়কৃতবিদ্য জমিদারগণ এ বিষয়ে অগ্রগণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

উপরিউক্ত বক্তৃতারভাবে অনেকেই মনে করিতে পারেন, এদেশীয়দিগের শিক্ষানুরাগিতার আধিক্য প্রদর্শন করিয়া ডিরেক্টর ক্রপট্ সাহেব প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে যে, এদেশীয়দিগের উপর শিক্ষাসমন্ধয়ি কার্য্যভার নিক্ষেপ করিয়া গবর্ণমেন্টের হস্তোত্তোলন করা কর্তব্য। কিন্তু তৎসম্বন্ধে ও তিনি তাঁহার মত বিষদরূপে ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বড় ২ কলেজের সহিত গবর্ণমেন্টের সংশ্রব ত্যাগ করা উচিত কিনা যদিও এখন তিনি এ বিষয়ে কোনও কথা বলিতে প্রস্তুত নহেন, তথাপি ইহা বলিতে পারেন যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের ভার ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অর্পণ করার উপযুক্ত সময় আজিও অনেকদূরে রহিয়াছে; কবে আসিবে, তাহাও তিনি বলিতে পারেন না। শিক্ষাকমিশন ক্রপ্ট সাহেবের উল্লিখিত উক্তিগুলি তাঁহাদিগের নথির সামিল করিয়া সময়ে সবিশেষ উপকার পাইতে পারিবেন বলা বাহুল্য।

১৪ মে, ১৮৮১

## ঢাকার ৩ জন ছাত্রকে বেত্রাঘাত

ঢাকার ছাত্রদিগকে যে অযথোচিত বেত্রাঘাত দণ্ড করা হইয়াছে, তাহা লইয়া দেশবিদেশীয় সংবাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এডগার, টমসনের রিপোর্ট, রিজলিউশন বাহির

হইয়াছে। সংপ্রতি মহাসভা পার্লিয়ামেন্টেও ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। ভারতবন্ধু উদারাশয় ওডনেল কমন্স হাউস অণ্ডার সেক্রেটরি ক্রস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—পুলিসের সহিত সামান্য কলহ করাতে ঢাকার কোনও উচ্চশ্রেণীর স্কুলের ৩টি ছাত্রকে যে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল, আপনি কি সে বিষয়ে অবগত হইয়াছেন? ঐ সকল বালক সম্ভ্রান্তলোকের সন্তান কি না, তাহার কি কোনও অনুসন্ধান লইয়াছেন? ক্রস সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—ষ্টেট সেক্রেটরি ভারতবর্ষীয় একখানি সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন মারপিটের মকদ্দমায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ৩টি ছাত্রের বেত্রাঘাত দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটিকে বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে। ছাত্রেরা সম্ভ্রান্তলোকের সন্তান কি না, অফিসে পৌঁছে নাই। এখন তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে।

মাননীয় ওডনেল সাহেব যে, [ অস্পষ্ট ] টরি বা অণ্ডার সেক্রেটরির কৌশলময় উত্তর দিয়া সারিয়া যাইবার উপায় রহিত হইলে, একদিন না একদিন সুফল ফলিবে, ভরসা হইতেছে।

ঢাকার ছাত্রদিগকে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করা হইয়াছে; কোন ছাত্রের বেত্রাঘাতদণ্ডেই স্কুলে শাসননীতি রক্ষিত হয় নাই; ছাত্রত্রয় সুসম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান: এ সকল কথা বাবু লালমোহন ঘোষের অবিদিত নাই। তিনি যদি ইহা মহাসভার ওডনেল প্রমুখ উদারাশয় সভ্যগণকে জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিয়া শুনিয়া যদি পুনরান্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এদেশীয় ছাত্রাশাসনবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী বিচারপতিগণের অবিচারের পথ বন্ধ হইতে পারে। সুতরাং আমরা বাবু লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন উল্লিখিত প্রশ্নোত্তরকে বায়ুতে বিলীত হইতে না দিয়া, মহাসভার ভারত হিতৈষী সভ্যগণ দ্বারা এ বিষয়ে পুনরান্দোলন উপস্থিত করিবার সমুচিত যত্ন বিধান করেন।

২০ এপ্রিল, ১৮৮৪

## ঢাকার ছাত্র-মকদ্দমার দ্বিতীয় পৰ্ব্ব

ঢাকার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যারিয়ট সাহেব যে, অত্রত্য মেডিকেল স্কুলের ছাত্র কামিনীকুমার দাসকে ঘাড়ে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দেন, সপাদুক পদাঘাত করেন—ঐ বিষয়ে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেব সাক্ষীর জোবানবন্দী লইয়া, পূর্ব্বে আসামীর নামে শমন করিবার আদেশ দিয়া, পরে বাদী ও তাহার উকিলের অসাক্ষাতে হঠাৎ মকদ্দমাটি ডিস্‌মিস্ করিয়া যে, স্বজাতি বাৎসল্য ও বিধানশাস্ত্রীয় সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করেন, এবং জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ ম্যারিয়ট ভদ্রতানুরোধেই হউক, অথবা ভাবী গোলযোগ ভয়েই হউক, ক্ষমাপ্রার্থী হওয়াতে যে, ছাত্রটি উর্দ্ধতন বিচারালয়ে প্রতীকারার্থী না হইয়া, অতিকষ্টে চুপ করিয়া থাকিতে সম্মত হয়, পাঠকবর্গ তাহা জ্ঞাত আছেন। সংপ্রতি অবগতি হইল, বিষয়টি বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের বর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় ঘটনাটি পাঠ করিয়াছেন এবং পেন্সিলের চিহ্ন দিয়া ঐ পত্রিকাখানি আমাদের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণপূর্ব্বক তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। তদনুসারে কমিস্যনর আলেকজাণ্ডার সাহেব, মকদ্দমার নথি ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নথি ও কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কিরূপ কৈফিয়ৎ প্রদত্ত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত

তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। তবে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেব স্বজাতিপ্রেমে প্রণোদিত হইয়া প্রথমে যেরূপ কাণ্ড করিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হইতেছে, কৈফিয়তে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যারিয়টের দোষ-সংগোপনে ত্রুটি হয় নাই। সে যাহা হউক, ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আত্মত্রুটি ক্ষালনোপলক্ষে কি কি কথা বলিয়াছেন জানিবার নিমিত্ত সকলেরই একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। বাদী, বিবাদী গোলযোগের মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না, সুতরাং বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিয়া ফলোদয় নাই, এই মনে করিয়াই আমরা নির্ব্বাক ছিলাম ; কিন্তু ব্যাপারটি যখন এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে, তখন আর মৌনাবলম্বন করা উচিত বোধ হইতেছে না ; দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কামিনীকুমার দাস ভর্ৎসিত ও প্রহৃত হইয়া অভিযোগ করিল, যোগ্য যোগ্য উকিলেরা তাহার পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন, সাক্ষীর জোবানবন্দীতে আসামী জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের দোষ প্রমাণিত হইল, ম্যাজিষ্ট্রেট দেখিলেন, জেতুজাতীয় একজন রাজকর্ম্মচারী, জিত নেটিভের গাত্রে হস্ত তুলিয়া দণ্ডীয় হইতে চলিলেন, বড়ই বিভ্রাট উপস্থিত, তাই তিনি আইন খুঁজিয়া বাহির করিলেন—সরকারি কার্য্যোপলক্ষে যে কোন অপরাধ করিলে, গবর্ণমেন্টের অনুমতি ভিন্ন অভিযোগ চলিতে পারে না।" আরও লিখিলেন, "অপরাধ সত্য হইলেও অতি সামান্য, এ জন্য গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ করি না। অতএব মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম।" আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট মহামতির এই আদেশ আইনসঙ্গত সদ্বিচারকোচিত হয় নাই। কেননা বিধানের তাৎপর্য্য এই শাসনকর্তৃপক্ষ কোনও স্থলে যাইয়া সরকারি কার্য্যনির্ব্বাহার্য ভৎসনা বা প্রহরাদি করিতে বাধ্য হইলে (আসামী গ্রেপ্তার প্রভৃতি স্থলে) তাহা সরকারি কার্য্যকালীন অপরাধ বলিয়া ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে এবং সেস্থলে অভিযোগ করিতে হইলে, গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কাছারি গমনকালে, বিহারাদি সময়ে, ক্রীড়াকালে, অথবা সরকারি কার্য্যস্থলে বিনাকারণে কাহাকেও ভর্ৎসনা বা প্রহার করিলে, তাহা আর সরকারি কার্য্যকালীন অপরাধ বলিয়া ধর্ত্তব্য হয় না এবং তৎসম্বন্ধে অভিযোগ করিতে হইলে আর গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। জেলা ও উপবিভাগের শাসকেরা বিচারক ও শান্তিরক্ষক দ্বিমূর্ত্তিতে বিরাজমান। তাঁহারা ঘাটে, মাঠে, পথে, গৃহে আমোদাগারে সর্ব্বত্রই সরকারি কর্ম্মচারিরূপে অবস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার মহোদয় আইনের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহাই হয়, তবে শাসকদিগকর্ত্তৃক যেখানেই সেখানে, যে কোন কারণে [ অস্পষ্ট ] বিনাকারণে যেকোন দূষণীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে গবর্ণমেন্টের অনুমতি ভিন্ন [ অস্পষ্ট ] কোনটিরইত অভিযোগ হইতে পারে না [ অস্পষ্ট ] নিরীহ, গরীব বেচারাদিগকে শমনসদনে পাঠাইয়া শাসনকর্তৃগণের অব্যাহত থাকিবার পথ বড়ই পরিষ্কৃত। ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়, কৈফিয়তে ও উক্তরূপ বিধানজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন কিনা, জানি না। যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের উচিত যে, তাঁহারা আরও কিছুকাল তাঁহাকে (ওয়েয়ার সাহেবকে) বিধানাশাস্ত্র পাঠ করিবার অনুজ্ঞ করেন। অন্যথা তদ্বারা বিচার বিড়ম্বনা হওয়া বড় আশ্চর্য্যের হইবে না। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যাঁহাদের হস্তে আইন কানুনের মর্য্যাদা রক্ষার ভার অর্পিত, প্রজার সুখ-শান্তি যাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য মধ্যে পরিগণিত, তাঁহারাই যদি বিধিব্যবস্থার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহ না করিলেন, অথবা তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াও জাতিভাষাদিগকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ২ স্থলে স্বেচ্ছানুসারে পৃথক ২

অর্থব্যাখ্যা করিয়া অক্ষতদেহে অব্যাহতি পাইতে পারিলেন, —স্বয়ং অত্যাচারী বা অত্যাচারীর প্রশয় দাতা হইয়া দাড়াইলেন, তবে আর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও বিচারালয়ের কার্য্যপরিচালনের প্রয়োজন কি? জেতৃজাতীয় শ্বেতপুরুষ, জিত কালা আদমীকে প্রহার করিলে, অতি সামান্য অপরাধ হয়, আত্মাভিমানী ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার যদি পুনরায় একথার উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাহাকে সমদর্শিতা শিক্ষা দিতে কি সিবিলিয়ানবৎসল টমসনের প্রবৃত্তি হইবে?

এইত গেল বিচারপতিদিগের কথা। পাঠক। মেডিকেল স্কুলের ধুরন্ধরগণের কাহিনীও শুনুন,—কামিনী কুমার দাস যখন বড়কোমর বাঁধিয়া লাগিল, উচ্চ আদালতের আশ্রয় লইবার যোগাড় দেখিতে থাকিল, তখন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার হয়ত অন্ধকার দেখিলেন এবং তজ্জন্যই মকদ্দমা আপোসের কথা উত্থাপিত হইল। আপোসমীমাংসায় জয়েন্ট ম্যারিয়টের উদারসহৃদয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। তিনি কামিনী কুমারকে মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কামিনীকুমারকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে মেডিকেল স্কুলের নেতৃপুরুষদের কেহ কেহ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। কামিনীকুমার আপোস করিতে অসম্মত হইলে উক্ত স্কুলের দুইজন অধ্যাপক ও নায়ক পপ্রবর নানারূপ বলিয়া কহিয়া নাম কাটিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াও নাকি তাহাকে স্বীকৃত করাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। উহাদের একজন নাকি কামিনীকুমারের হস্ত টানিয়া লইয়া মীমাংসাপত্রে তাহার নাম স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন। কামিনীকুমার তখন কি করে? অধ্যাপকগণের অনুরোধে উপেক্ষা করিলে, তাহাদের বিরাগভাজন হইতে হইবে, ভবিষ্যতে বিপদ ঘটাত আশ্চর্য্যের হইবে না, এই ভাবিয়া সে অগত্যা মীমাংসাপত্রে নাম দস্তখত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে যখন মকদ্দমার উকিল ব্যয় প্রার্থনা করে, তখন কোন কোন অধ্যাপক নাকি একবারে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠেন এবং এই মর্ম্মে কামিনীকুমারকে ভর্ৎসনা করেন যে, তুমি একটা সামান্য লোক, তোমার নিকটে যে ত্রুটি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, ইহার উপরে আবার মামলা খরচ? অধ্যাপক বাবুদ্বয়ের ছাত্রস্নেহের ইহাই শেষ সীমা নহে। কামিনীকুমার প্রহৃত হইয়া যখন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহারা নির্ব্বাক থাকিতে বলিয়া রাজপুরুষের "খয়েব খাঁ গিরী" প্রদর্শন করেন; "ছাত্র বিনাকারণে অপমানিত হইয়াছে, ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত, অন্যাথা স্কুলের—স্কুলকর্তৃপক্ষের বড়ই নিন্দার কথা।" এভাব তাঁহাদের মনেও উদিত হয় না। এরূপ শিক্ষকগণের বালাই লইয়া মরিতেই ইচ্ছা হয়। বলি, উক্ত অধ্যাপকদ্বয় কি চাকুরি এতই ধার ধারেন—শাসনকর্তৃপক্ষের এতই খয়ের খাঁ হইতে চাহেন যে, তাঁহাদের খাতিরে ন্যায়ানুমোদিত কর্তব্য কার্য্য করিতেও ভীত হইয়া থাকেন? একরূপ জোর করিয়া মীমাংসাপত্রে ছাত্রের স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া বাহাদুরী লওয়া কি তাঁহাদের চিকিৎসাজীবিগণের পক্ষে শোভা পায়? আমাদের বিশ্বাস, সরকারী কার্য্য না থাকিলেও তাঁহারা বাহিরের চিকিৎসায় মাসিক ৩/৪ শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া অক্লেশেই জীবিকানির্ব্বাহে সক্ষম। তবে আর এ বিড়ম্বনা কেন? সাহেব তুষ্টির নির্মিত এত আগ্রহ কেন? রাজপুরুষের তোষণার্থ ছাত্রমহলে ভীরু, কোপনস্বভাব ও মমতাহীন বলিয়া পরিচিত হইতে যাওয়া কেন? ফলতঃ উহাঁদের যেরূপ ব্যবহারের কথা শুনা যায়, তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। উঁহারা যদি ধরিয়া বাঁধিয়া মীমাংসা করাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যথেষ্ট কৈফিয়ৎ দিলেও

তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতে পারিত না। উৰ্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও ঘটনার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত পরের অন্ন চাকিতে হইত না। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, মফস্বলে শ্বেতশাসকেরা কিরূপ আচরণ করিতেছেন ; কেমন লীলাখেলা করিয়া তাহা ঢাকা দিবার চেষ্টা পাইতেছেন। মেডিকেলস্কুলের নেতৃপ্রবর যে, মীমাংসার চেষ্টা পাইয়াছেন; তাহাতে আমরা তাঁহার বড় একটা দোষ দেখিতে পাইতেছি না, কারণ স্বজাতি স্নেহ লোককে এইরূপে প্রণোদিত করিয়াই থাকে।

৪ আগস্ট, ১৮৮৪

## ঢাকার ছাত্র-মকদ্দমার তৃতীয় পৰ্ব্ব

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, ঢাকার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মেডিকেল স্কুলের ছাত্র কামিনীকুমার দাসকে সপাদুক পদঘাত [ অস্পষ্ট ] লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর বিভাগীয় কমিস্যনর আলেকজান্ডার সাহেবের নিকটে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেবের নিকট হইতে মকদ্দমার নথি ও কৈফিয়ত তলব হয়। সংপ্রতি বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, কমিস্যনর আলেকজান্ডারও ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ারের কৈফিয়ত ও মন্তব্যদর্শনের রহস্য অবগত হইয়া, টমসন বাহাদুর নিম্নলিখিত মৰ্ম্মে অভিপ্রায় লিপি প্রেরণ করিয়াছেন।—

যেরূপ অবস্থা জানা গিয়াছে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর আছে, বোধ হয়না। পূৰ্ব্বে এরূপ অবস্থাবগতি হইলে, ম্যারিয়ট সাহেবকে হঠাৎ ফার্লো বিদায় লইয়া দেশে যাইতে দেওয়া হইত না। যাহা হউক, যে পৰ্য্যন্ত তিনি উত্তর দিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহাকে ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসে পুনঃপ্রবিষ্ট হইতে দেওয়া যাইবে না। মকদ্দমাটি তাড়াতাড়ি ডিস্‌মিস্ করা ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ারের পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই।

যে শাসনকর্তার আমলে খামখেয়ালী শাসক ও বিচারকদের তিরস্কার ও অবনতিভোগের পরিবর্ত্তে প্রায়শই পদোন্নতি লাভ উৎকৃষ্টতর স্থানে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যাইতেছে—ষ্টেলি, ম্যাগোয়ার, লাউইস, সার্প, টেইলর, লয়েড, জাৰ্ব্বো, বীম্‌স প্রভৃতি যাঁহার শাসনকালে আদুরে ছেলের ন্যায় কার্য্য করিয়া উত্তরোত্তর প্রশয়ই প্রাপ্ত হইতেছেন— বিদ্যালয়ের বালকভীতি যাঁহাকে ছাত্রশাসনমন্তব্য লিখিত প্ররোচিত করিয়াছে, চট্টগ্রাম, বহরমপুর, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও কলকাতার অপূর্ব্ব ছাত্রপীড়ন যাঁহার শাসনকালীন স্মরণীয় ঘটনা,—রাজপুরুষেতর শ্বেতকায়ের অকার্য্য পরম্পরায় সাহেব পক্ষপাতী বিচার-বিড়ম্বনা দেখিয়াও যাঁহার ঔদাসীন্য দূরগত হয় নাই, তিনি জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যারিয়টের সম্বন্ধে উক্তরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, প্রহৃত ছাত্রের মনোবেদনায় সহানুভূতি [ অস্পষ্ট ] স্বজাতিস্নেহের, অনুগত বাৎসল্যের দৃঢ়বন্ধন সহজে ছেদন করিবেন, সহসা ইহা বিশ্বাস হয় না ; তাই কয়েকদিন হইতে কানাঘোষা শুনিয়াও আমরা উহার সত্যতায় সন্দিহান ছিলাম, ইতস্তত করিতেছিলাম ; কিন্তু সংপ্রতি যে গূঢ় সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, বিশেষত যে সূত্রে সংবাদটি আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তাহাতে শোত্রমনের বিবাদ দূর হইবারই কথা। সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান সিমলা হইতে গুপ্তসংবাদ পাইয়াছেন, তথাকার বড় বড় লোকদের মধ্যে রামসে ও টেইলরের উদ্ভাবিত কৃষ্ণনগরী ছাত্রবিরুদ্ধ মকদ্দমা লইয়া বড় তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার সম্যক্

পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক, একথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ছাত্রদিগকে অপরাধী ঠাওরাইবার নিমিত পুলিশকে তাহাদের পিছনে লাগাইয়া দেওয়াতে যে, অকারণ বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা লইয়াও অনেক টীকা টিপ্পণী হইয়াছে। ষ্ট্রেটস্‌ম্যান ইহাও শুনিতে পাইয়াছেন। যে, সকলের অনুভব হইয়াছে, এ বিষয়ে উদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক খোঁজ খবর না লওয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের পক্ষে একান্ত অনুচিত হইয়াছে ; যদি তিনি কিছু না করেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরই সম্ভবত এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন।

সিমলার এই গুপ্তসংবাদে প্রবোধিত হইয়া হউক, অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, টমসন বাহাদুর যে পদাঘাতকারী ম্যারিয়টের প্রতি কড়া হুকুম করিয়াছেন মঙ্গলেরই অনুচিত প্রশয় পাইয়া বঙ্গের অনেক সিবিলিয়ান প্রভুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অবিচার, অত্যাচারে দেশ জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে উপরিওয়ালার তীব্র কটাক্ষপাত হইলে অনেকটা হিত প্রত্যাশ্য করা যাইতে পারে।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর যদি ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ারকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া ক্ষান্ত না হইতেন, পুনরায় মকদ্দমাটির [ অস্পষ্ট ] করিবার অনুজ্ঞ করিতেন, তাহা হইলেও আরও রহস্য ভেদ হইতে পারিত মেডিকেল স্কুলের কোন কোন ধুরন্ধর যে, আপোসমীমাংসা করিতে যাইয়া একে আর করিয়াছেন—কর্তৃপক্ষের খয়ের খাঁ গিরী করিতে যাইয়া যে, সত্যের অপলাপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সে বুজরকীও প্রকাশ পাইত। সাধারণের বাসনা, এখানেই যেন এ নাটকের যবনিকাপাত হইয়া না যায় ; ম্যারিয়ট যে কোনরূপ কৈফিয়ত দিলেই যেন তাহা সন্তোষজনক বলিয়া পরিগৃহীত না হয় এবং প্রকৃত রহস্য জানিবার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিয়া নিরাপেক্ষভাবেই যেন কর্তব্যানুসরণ করা হয়।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪

## শিক্ষা বা অপশিক্ষা

মেকলে[৮০] সাহেবের পরামর্শে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার জন্য এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা হয়। এই শিক্ষাদান কার্য্য পূর্ব্বে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারকদিগেরই একচাটিয়া ছিল ; কিন্তু বিশেষ লাভ দেখিয়া গবর্ণমেন্টও প্রত্যক্ষভাবে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। দেশীয়দিগকে চাকরি শিক্ষা দান ও নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য প্রথম যোগে গুটি কত স্কুল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে অশিক্ষিতদিগের কুসংস্কারবশতঃ বিলক্ষণ শিক্ষা পাওয়ার পর হইতেই এদেশে গবর্ণমেন্ট স্কুল কলেজের ছরাছরি আরম্ভ হইয়াছে। একথা কাহাকেও বলিতে হইবে না যে, বাল্যকাল হইতে যে প্রকার শিক্ষা হয়। লোকের সংস্কার সাধারণতঃ সেই প্রকারই হইয়া থাকে। ইংরেজের প্রকৃতি অনুসারে, অথবা ইংরাজের হিতানুসারে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিতগণ যে ইংরাজ রীতিনীতির পক্ষপাতী হইবে, একথা বলা বাহুল্য। ইংরাজী শিক্ষায় দেশীয় প্রকৃতির কিরূপ বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, তাহার প্রমাণ নিয়ত শত সহস্র পরিলক্ষিত হইতেছে, আমরা গুটিকতক বিশেষ কথার উল্লেখ করিতেছি।

১) হিন্দুধর্ম্ম অন্যকোন ধর্ম্ম অপেক্ষা নিপুণীয়, বোধহয়, একথা এ পর্যন্ত কেহই যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু আজ শিক্ষিত নামের ধুরন্ধরগণ সেই হিন্দুধর্ম্মে এত আস্থাহীন ও অবিশ্বাসী হইতেছেন কেন? আর দলে দলে লোক খৃষ্টান অথবা

খৃষ্টানের পদাঙ্কনুসারী ব্রাহ্ম হইতেছে কেন? আর প্রকৃতই যদি তাহারা হিন্দুধর্ম্মকে নিন্দনীয় বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তবে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ না করিয়াই বা তাহারা খৃষ্টানাদি হয় কেন? খৃষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূলাংশে এক। স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে। খৃষ্টানেরা প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম অনুসারে কোন কাজই করে না।

আজকালি ইউরোপের যত গৌরব, তাহার অধিকাংশ প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্যাবলী দ্বারা ঘটিয়াছে, কিন্তু মুসলমানগণ ধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা রাখিয়াই উন্নতির সাথে অগ্রসর হইয়াছে। অতএব যদি ধর্ম্মের জন্য ও উন্নতির জন্য অপর ধর্ম্মগ্রহণ করা আবশ্যক হয়, তবে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করাই উচিত। কিন্তু লোকে লিখাপড়া শিখিয়া বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নামে প্রখ্যাত হইয়া কেন খৃষ্টান ব্রাহ্ম অথবা নাস্তিক হয়? আর বলিতে হইবে না। ইংরেজী শিক্ষাই তাহাদের এইরূপ মতিভ্রংশ করিবার কারণ।

২) হিন্দুর চক্ষে দেখিলে, হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার যোগ্য অধিক কিছু পাওয়া যায় না। নব্যমতেও অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর যে সকল কার্য্য করিয়া হিন্দু সমাজ গৌরবের সহিত চলিয়াছে, তাহার অপকারিতা সাব্যস্ত করিতে যাওয়া বাতুলতা বই আর কিছু নহে। নব্য সভ্যজাতি সমূহের অস্তিত্ব অল্প কালের। তাহাদের কার্য্যসমূহ দ্বারা তাহাদের সমাজ অধিকাল টিকিবে কিনা তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। অতএব এই পরীক্ষিত কার্য্য দ্বারা পরীক্ষিত কার্য্যকে নিরসন করা, কদাপি দুরদর্শী সুবুদ্ধি লোকের কাজ নহে। পক্ষান্তরে যে সকল সমাজ সংস্কারের জন্য কখনও সমাজ ভঙ্গ করা হয় না; অথচ আমাদের শিক্ষিত নামে অভিমানীগণ দেশহিতৈষী নামের নিশান ঘাড়ে করিয়া হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া হিন্দুসমাজ সংস্কার করিতে চান, এমন দুর্বুদ্ধির কারণও সেই ইংরেজী শিক্ষা।

৩) ধর্ম্মবলে এতকাল হিন্দুর অস্তিত্ব, ধর্ম্ম বলে মুসলমানের অভুত্থান; ইউরোপের প্রাথমিক উন্নতিও ধর্ম্মবলেই বটে, ধর্ম্মের জন্য শিবাজীর অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের জন্য সিপাহী-বিদ্রোহ, শিক্ষিতগণ সেই ধর্ম্মে অবিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অপধর্ম্ম প্রচার দ্বারা। আর হিন্দুরশাস্ত্র আচার, ব্যবহার প্রভৃতির নিন্দা দ্বারা অথবা শাস্ত্রের অযথা ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে অনভিজ্ঞ লোকের অবিশ্বাস জন্মাইতেছেন; এতদ্বারা তাহারা দেশের যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাহা তাঁহাদের সেই বিদ্যাবুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, অথবা প্রবেশ করিলেও তাহারা ঘোর স্বার্থের তাড়নে তাহা উপেক্ষা করিতে বাধ্য হন।

৪) শিক্ষিতাভিমানীদিগের ঔদ্ধত্যের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের অপধর্ম্ম প্রচারের মহিমায় এবং নব্য শিক্ষার মহিমায় লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস বিচলিত হওয়াতে মিথ্যাসাক্ষ্য ও প্রতারণা প্রভৃতির এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এখন অর্থের একটু প্রলোভন পাইলে ঐ সকল কার্য্যে কেহই বড় একটা ইতস্ততঃ করে না। ইহাঁদেরই মহিমায় নাম লেখান বেশ্যা, সভ্যাবেশ্যা খুব্দিদলের সর্ব্বত্র ছরাছরি। ইহাদের মহিমায় দেশে সুরাস্রোত এত প্লাবমান। সত্য বটে, নব্য ধর্ম্মপ্রচারকগণ বারাঙ্গনা ও সুরার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা যেমন নিষ্ফল, উহাদের সেই যুক্তি প্রদর্শনও সেইরূপ নিষ্ফল।

পূর্ব্বে লোকে ধর্ম্ম অথবা যমের ভয়ে পাপ কার্য্যে নিরস্ত থাকিত; কিন্তু তাহারা হিন্দুধর্ম্মে লোকের অবিশ্বাস জন্মানে, ধর্ম্মভয় উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা কখনও কখনও

নিরাকার ঈশ্বরের ভয় দেখান বটে ; কিন্তু তাহারাই যেভাবে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে নিতান্ত বোকা ভিন্ন কাহারও ভয় হইতে পারে না। পাপকার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি সহজ, রাজভয়, সমাজভয় ও ধর্ম্মভয়ে লোকে সেই প্রবৃত্তিকে দমন করে। প্রচ্ছন্ন পাপ দমন একমাত্র ধর্ম্মভয়েই হয়। ধর্ম্মের পরে সমাজ ভয় খুব প্রবল।—

রাজভয়কে ভয় না বলিলেও চলে, কেননা কৌশলী ও প্রবল ব্যক্তিরা রাজার ন্যায় বিচারে ক্বচিৎ শাস্তি পায়। তবেই দেখা যায়, ধর্ম্ম ও সমাজভয় ভিন্ন পাপদমনের উপায় নাই। কিন্তু নব্যগণ ধর্ম্মভয় তো করেই না ; সমাজকে ও তাহারা নিয়ত পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।...

৫) শিক্ষার মহিমায় ধর্ম্ম ও সমাজ ঐভাবে যাইতেছে বটে, কিন্তু আর এক প্রকারের ঐ কুকার্য্যের প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে ফলিতেছে। স্বাস্থ্যের ন্যায় প্রিয় বস্তুবোধ হয় খুব কম আছে। কিন্তু আজ চতুর্দ্দিক পরিদর্শন কর কেবল দেখিবে নানা ব্যধি পীড়নে লোকসমূহ (ম্রিয়) মান। ইংরাজ রাজত্ব এদেশে অতি অল্পকাল। এই অল্পকাল মধ্যেই এদেশে অভূতপূর্ব্ব কলেরা, ডেঙ্গুজ্বর, কালাজ্বর, ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ব্যাধি পীড়াতে একরূপ লোকক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৯শে ভাদ্রের ঢাকা প্রকাশে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। এবং সেই লোক ক্ষয়ের ক্রমিক হার গণনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইয়া এরূপভাবে মৃত্যু হইলে ১২৯ বৎসরে বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যা মানুষ শূন্য হইতে পারে। সত্য বটে রাজার পাপেই প্রজা ক্ষয় হয়।

কিন্তু রাজ্য প্রজারই সমষ্টি। প্রজাসমূহের পাপ পুণ্যে রাজার ইষ্টানিষ্ট, এবং রাজার পাপ পুণ্যে প্রজাসমূহের ইষ্টানিষ্ট সর্ব্বদা নির্ভর করে। এই লোকক্ষয় রাজা প্রজা উভয়েরই পাপই প্রযুক্ত হইয়াছে। দেশ, কাল ও পাত্রের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্যকরাকে পাপ বলা হয়। যে কার্য্য ইংলন্ডের পক্ষে পুণ্যজনক, তাহাই হয়তো ভারতের পক্ষে পাপজনক হইতে পারে, অতএব ইংলণ্ডের আচরিত কার্য্যকে যাহারা ভারতীয় আচরণের বিরুদ্ধে চালাইতে পাপ মনে করেন না ; তাঁহাদের জন্যই আমাদের একথা বলিতে হইল।

শিক্ষার ব্যভিচারে দেশের যে ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে ; তৎসম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আজ যদিও তৎসমস্ত বলা না হউক। কিন্তু ইহা দ্বারাই পাঠক বুঝিবেন।

বর্ত্তমানের শিক্ষা অপশিক্ষা কিনা? শিক্ষিতদিগের উন্নতিতে সর্ব্বনাশের সুচনা হইয়াছে কি না?

প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তির নিকট অর্থোপার্জ্জন নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়। প্রকৃত বিদ্বান মুনি ঋষিরা অর্থোপার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতেন বাজীকর, বৈজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল জাতি বিদ্যার অপব্যবহার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। ঋষিরা তাহাদিগকে নিতান্ত ঘৃণাই করিয়াছিলেন। প্রকৃত বিদ্যায় অর্থের সঙ্গে লোষ্ট্রের বিভিন্নতা থাকে না, সুতরাং তাহা লাভের জন্য ধর্ম্মের অতিক্রম করে না। কিন্তু এখানকার দৃশ্য দেখিয়া বিস্মৃত হইতে হয়। শুনিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে চুরি শিক্ষার জন্যও স্কুল আছে ; আমরা একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাই, এখনকার স্কুল কলেজগুলি বিদ্যালয় হইলেও কাজে তাহা যেন চুরি, প্রতারণা লাম্পট্য, বা যে কোন প্রকার বদমাইসীর সুযোগ শিক্ষার স্থল মাত্র।

দেশের অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বনাশ করিয়াও অর্থোপার্জ্জন। শরীর ক্ষয় করিয়াও ইন্দ্রিয় চরিতার্থকরণ এখন শিক্ষাভিমানীদিগের যেন নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এ সকল বিষয়ে এখনও বরং অশিক্ষিতেরা অনেকটা ভাল আছে। তাহাদের স্বাস্থ্য আছে। কার্য্যক্ষমতা আছে বলবীর্য্য আছে, তাহারা যাহা তাহা খাইয়া জীর্ণ করিতে পারে, দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে ; শিক্ষিতদিগের ন্যায় অশিক্ষিতদিগের স্ত্রীরা বন্ধ্যা, মৃত বৎসা কি রুগ্নবৎসা হয় না। পাঠক এখন দেখুন ; এমন শিক্ষিতকে অপশিক্ষিত বলা যায় কিনা ? আমরা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, এমন শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই। অথবা অল্পদিনেই ভারত ছারখার হইবে।

৩০ অক্টোবর, ১৮৮৭

## বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা

বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ত্রুটিতেই শিক্ষিত সমাজে ভয়ানক ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এই যে শিক্ষিতগণ দ্বারা দেশের যত প্রকার পাপ কার্য্য আচরিত হইতেছে,—শিক্ষিতদিগের দেখাদেখি অশিক্ষিতেরাও ধর্ম্মে আস্থাহীন হইতেছে, এ কেবলই বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার অভাবে হইতেছে। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করান গেলে কখনই শিক্ষিতদিগের দুর্দ্দশা ঘটিত না। এজন্য আমরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদানের বড়ই পক্ষপাতী, কিন্তু আমাদের কেমন দূরদৃষ্ট-আমরা যাহার এতদূর পক্ষপাতী তাহাই কিনা কারণ বিশেষে আমাদের ঘোর আপত্তিজনক হইয়াছে। কারণ আর কিছু না, কারণ রাজার ভয়। রাজা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ খৃষ্টান ধর্ম্মের পোষকতা করেন, অথচ প্রকৃত খৃষ্টান ধর্ম্মেও রাজা কি রাজার জাতি তেমন দৃঢ়তর নহেন। ইহারা খৃষ্টের কি খৃষ্টের প্রভু ঈশ্বরের সদুপদেশগুলি নিজেরাই মানেন না। যে ত্যাগ স্বীকার খৃষ্টের পরম উপদেশ, ইহারা সেই পরম উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীতে কাজ করিয়া পৃথিবীকে ঘোর অশান্তিতে পরিণত করিতেছেন। খৃষ্ট মহম্মদ এব্রাহিমের প্রভু ঈশ্বরের আদেশে ইহাদের আস্থা থাকিলে কদাপি হিন্দুর সঙ্গে ধর্ম্মবিরোধ বাঁধিত না। বরং হিন্দু ধর্ম্মকেই ইহারা ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে বাধ্য হইতেন। ইঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ ভালমন্দ হিন্দুধর্ম্মেরই পরিপোষক। প্রকৃতপক্ষে যে সকল উপদেশ সকলের হিতজনক, তাহা অবজ্ঞা করিয়া আপনাপন মনগড়া মতে নির্ভর করাতেই খৃষ্টসমাজ এত ভীতিজনক হইয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্ম মত এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে গঠিত হওয়াতেই আজ খৃষ্ট সমাজে নাস্তিক, নিহিলিষ্ট, কমনিষ্ট, ফেনিয়ান প্রভৃতি ঈশ্বরদ্রোহী, রাজদ্রোহী, বিশ্বদ্রোহী সম্প্রদায় সমূহের আবির্ভাব হইয়াছে।

হিন্দুসমাজ হিন্দু রাজার অভাবে এই যে অধঃপাতে দাঁড়াইয়াছে, তথাপি নবোদিত খৃষ্ট সমাজের মত দুর্দ্দশাপন্ন হয় নাই। ইহারা এখনও সর্ব্বভূতে ঈশ্বরাস্তিত্ব ভাবিয়া পূজা করে, রাজাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করে, সুতরাং কখনও রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, যাহারা দাঁড়ায় তাহারা হিন্দুধর্ম্ম জানে না বলিয়া। এই হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় ইহারা এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে যে, বিদেশীয় দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতেও তাঁহাদের উচ্চবাচ্য নাই। স্বতঃ হিন্দুধর্ম্মের মহিমাতেই এদেশে বিদেশীয় আধিপত্য চলিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। নব্য সমাজ ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া বিদেশীয় আধিপত্য বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা খৃষ্টানি শিক্ষার ফল। অতএব, আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে বিদ্যালয়ে হিন্দুর

ধর্ম্মনীতি শিক্ষা না হইলে অচিরেই নব্যগণের মনস্কামনা সিদ্ধি হইবে ; ব্রিটিশ সিংহকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া রুষ ভল্লুককে পৃথিবীতে একাধিপত্য দেওয়ার উপায় করা হইবে ?

ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার অভাবে ভারতে যে শিক্ষা বিভ্রাট চলিয়াছে, তাহা ষ্টেট সেক্রেটরি অবগত হইয়াছেন। এবং তিনি ভারতের বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা করান যায় কি না, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে ভারত গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিয়াছেন। ভারত–গবর্ণমেন্টও সকলের মত চাহিয়াছেন এবং আমরাও ষ্টেট সেক্রেটারির অভিপ্রায় সম্বলিত ভারত গবর্ণমেন্টের একখানি চিঠিপ্রাপ্ত হইয়াছি। এখন এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে সৎ পরামর্শ দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ব্যাপার খানা বড়ই কঠিন। বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতেই আপত্তি প্রকাশ করিতে, এ বস্তুতঃ কঠিন সমস্যা। আমরা বলিলেই কিছু খৃষ্টানদিগের পরিচালিত গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে হিন্দুর ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা করিতে দিবেন না। হিন্দু ধর্ম্ম–নীতিতে গবর্ণমেন্টের যদিও সম্পূর্ণ লাভ, কিন্তু খৃষ্টান গবর্ণমেন্ট কদাপি তাহা বুঝিবেন বলিয়া বোধ হয় না ; আমরা সে জন্যই তাঁহাকে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার পাঠ্য প্রচলন জন্য উপদেশ দিতে পারি না। অবশ্য আমরা এতদূর মনে করি না যে, প্রথম হইতেই গবর্ণমেন্ট হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মবিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতি স্কুলে শিক্ষা দিবেন। কিন্তু একবার যদি ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়ার নিয়ম হয়, তবে ক্রমে যে রাজপুরুষদিগের মনোমত হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে না ; তাহা সম্ভবপর বলি না। কাজেই আমরাও নিয়ম চালাইতেই নারাজ। তবে আমরা এরূপ আশা করিতে পারি যে গবর্ণমেন্ট হিন্দু বালকের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ হইতে প্রস্তুত অথবা অনুমোদিত ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক ইংরাজীর সংস্পর্শবিহীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা পড়াইবেন, আর মুসলমান বালকের জন্য মুসলমান মৌলবিদিগের প্রণীত ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ মৌলবিদিগের দ্বারা পড়াইবেন। আর এই পাঠ্য পুস্তক ও অধ্যাপকদিগের পরিবর্ত্তন ও সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী অধিক লোকের মতানুসারে করিবেন। অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দু অথবা প্রকৃত মুসলমানের অধিকাংশের মত যাহাতে পাঠ্য সম্বন্ধে গৃহীত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। যদি এরূপ হয়, তবে আমরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া বিরোধী নহি।

২৯ জানুয়ারি, ১৮৮৮

## পাঠ্যপুস্তক ও হিন্দুজাতি

খৃষ্টান দ্বারা প্রবর্ত্তিত শিক্ষা, যাহা হইতে খৃষ্টানের স্বদেশেই নাস্তিকতা প্রবাহিত হইতেছে, সেই শিক্ষা হইতে এদেশীয় হিন্দু–মুসলমান শিক্ষিতগণের ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, বরং না হওয়াই বিচিত্র। এইরূপ বিজাতীয় শিক্ষা পাইয়াও যদি কেহ বিধর্ম্মী না হইয়া থাকেন ; তবে তাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া থাকি ; বলা বাহুল্য, সেরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লোককে এইরূপ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে দেখিয়াই এদেশীয় হিন্দু–মুসলমান পার্য্যমানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মাথা গুঁজিতে যায় না। ইহার ফলাফল আমরা গতবারেই বলিয়াছি, যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সন্তানগণের লিখাপড়া শিক্ষা ব্যতীত কোনক্রমেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তাহারাও যে কোন উপায়ে ঘরে ঘরে যে কিছু শিক্ষা পাইয়াই তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তবে পেটের দায়ে যাহারা পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের সন্তানগণ দ্বারা আজ ছাত্র সংখ্যার লিষ্টপুষ্ট হইয়াছে বটে। যাহারা এরূপ ফলাফল দেখিয়াও

শিক্ষা প্রণালী সংশোধনের আবশ্যকতা মনে করেন না, তাঁহারাও কদাপি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী নামের বাচ্য নহেন।

আমরা বহুকাল হইতে ওরূপ শিক্ষা সংশোধনের জন্য আন্দোলন করিতেছি। একমাত্র রমেশ দত্তের ইতিহাস পাঠ্য হইতে তুলিয়া দিলেই যদিও আমরা পরিতৃপ্ত না হই, তথাপি যথালাভ মনে করিয়া বরিশাল ধর্ম্ম সভার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুস্তক পাঠ্য তালিকা হইতে পরিত্যাগ জন্য আমরা প্রার্থী ছিলাম। নিতান্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে আমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। কলিকাতার পাঠ্য নির্ব্বাচনী সভা রমেশ বাবুর ইতিহাস পাঠ্য তালিকা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সভার সভ্য শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন এম, এ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,[৮১] শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত[৮২] এম, এ, এবং পাদরীকে, এস ম্যকডোনাল্ড এই কয়জন সভ্যেই এক বাক্যে ঐ গ্রন্থ পাঠ্য তালিকায় থাকার অনুপযুক্ত দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করাতে আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের ভরসা আছে। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন, তবে হিন্দুর সমাজও ধর্ম্মের বিরোধী অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকগুলিও অপাঠ্য করিয়া গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা রক্ষার সহায় হউন। এবং হিন্দুগণের শিক্ষা বিস্তারের উপায় বিধান করুন। আমরা হিন্দু সমাজকেও অনুরোধ করি, তাঁহারা হিন্দুর সমাজ ধর্ম্মে আঘাত লাগে এরূপ কথা যে সকল পুস্তকে আছে, তাহা পাঠ্য নির্ব্বাচনী সমিতিকে জ্ঞাপন করুন। খৃষ্টান দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেন্টকে হিন্দুর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আপত্তি রিপিজ্ঞাপনে ফল অপ্রাপ্তির আশঙ্কায় যাহারা নির্ব্বাক নিশ্চেষ্ট হইয়া এতকাল হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন, এইবার তাঁহারা ওরূপ আশঙ্কা ভ্রম মনে করিয়া হৃদয়ের দুঃখ খুলিয়া বলুন। আশা আছে : গবর্ণমেন্টের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিলে যদিও সকল স্থানে সুবিচার না হউক, তথাপি মাঝে মাঝে যে সুবিচার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিরাশ থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের এই পাঠ্য বিষয়ক আন্দোলন উপলক্ষে কতকগুলি সহযোগী যেরূপ বুদ্ধি বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুধু উপহাসস্পদ নহে—গুরুতর পরিতাপের বিষয়। আমাদের বহুবার উল্লিখিত, বরিশাল ধর্ম্মসভার উত্থাপিত, রংপুর, রাজসাহী প্রভৃতির ধর্ম্মসভাসমূহে অনুমোদিত রমেশ বাবুর ইতিহাস পাঠ্যতালিকা হইতে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া বঙ্গবাসী আন্দোলন করতঃ কি অপরাধ করিয়াছেন, তাহা কোন বুদ্ধিমানেরই মনে আইসে না অথচ বঙ্গবাসীর গ্রাহক সংখ্যায় চির ঈর্ষান্বিত সহযোগীগণ বঙ্গবাসীর প্রতি নানা অপরাধ আরোপ করিতেছেন। সহযোগীদিগের যুক্তি এই যে, "রমেশ বাবুর ইতিহাসে হিন্দু ধর্ম্মবিরুদ্ধ যে সকল কথা আছে, অন্যান্য অনেক পাঠ্যগ্রন্থেই সেরূপ কথা আছে ; তবে সে সকলের প্রতিকূলে আন্দোলন না করিয়া রমেশ বাবুর ইতিহাসের প্রতিকূলে আন্দোলন দূরাভসন্ধি মূলক।" এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ধর্ম্মসভার ও আমাদের চক্ষে প্রথমে রমেশ বাবুর ইতিহাসের দোষ পরিলক্ষিত হওয়াতেই তৎবিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি, যখন অন্য পুস্তকে ওরূপ দোষ পরিলক্ষিত হইবে, তখন তাহারও বিরুদ্ধে আন্দোলন করিব।

এক সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যের লক্ষ লক্ষ পুস্তক ঘাটিয়া দোষগুণ অনুসন্ধান করা কখনও সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমাদের অতি বুদ্ধি সহযোগীদিগের মতে একই দমে সেই লক্ষ লক্ষ পুস্তকের দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক তবে সমস্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ পুস্তকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কর্ত্তব্য হইয়াছিল।

ঐ সহযোগীদিগের আর একটি অদ্ভুত যুক্তি এই যে, "গ্রন্থকারদিগকে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে না দিলে সাহিত্যের উন্নতি হয় না।" বলা বাহুল্য যে, রমেশ বাবুর পুস্তকখানি ইতিহাস। ইতিহাস কখনও জল্পনা–কল্পনার বিষয়ীভূত নহে। যাহা সত্য ঘটনা তাহারই নাম ইতিহাস। রমেশ বাবুর পুস্তকখানি ইতিহাসরূপে বালকের মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া যদি দর্শনরূপে জ্ঞান বৃদ্ধদিগের সমালোচনার বিষয়ীভূত হইত, তবে আমরা স্বাধীন মত প্রচারের জন্য ঐ পুস্তকখানিকে আদর করিতে পারিতাম। কিন্তু কল্পিত বিষয় কখন ইতিহাসের বাচ্য ও সত্যরূপে বালকের শিক্ষণীয় হইতে পারে না।

কোন কোন সুবুদ্ধি সহযোগী বলেন, "মতামতে ধর্ম্ম নির্ভর করে না ; খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানা মত প্রচার হইলেও খৃষ্টধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় নাই ; ইত্যাদি", চক্ষু থাকিতে যাহারা অন্ধ, তাহাদিগকে দেখান বড় মুস্কিল। যাহারা খৃষ্টান দেশে নব নব বিজ্ঞানের সহিত সংবর্দ্ধিত নাস্তিকতা দেখিতে পায় না তাহারা কিরূপ চক্ষুন, বুঝিয়া উঠা কঠিন।

জিজ্ঞাসা করি, এই দেশে খৃষ্টান জাতি তাহাদের মত প্রচারের পূর্ব্বে কেহ কি কখনও খৃষ্টান কি ব্রাহ্ম হইয়াছে? উনিশশত বৎসরের খৃষ্টধর্ম্ম কেবল দেড়শত বৎসরের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিল কেন? যে যেরূপ শিক্ষা পায়, তদনুসারেই তাহার মত গঠিত হয়, এই সহজ কথা যাহারা বুঝে না, তাহাদিগের বুদ্ধি বিবেচনা নিশ্চয়ই অদ্ভুত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মাহাত্মে রমেশ বাবুর ন্যায় শত সহস্র ব্যক্তি নতুন নতুন মত প্রচার করিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের মত লইয়া বিচার করা, আর সুবিস্তৃত মরুভূমির বালু মুখিতে যাওয়া সমান কথা। এ জন্য আমরা যে গুরুকূল হইতে রমেশগণের গুরুকূলের মত খণ্ডন সময়ে তাহারা কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হন নাই। যে হউক, তাঁহাদের অনুরোধে যখন আমরা রমেশ বাবুর মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইব, তখন তাঁহারা গা ঢাকা না হয়েন ইহাই তাহাদের প্রতি আমন্ত্রণ থাকিল।

৮ জুন, ১৮৯০

## জনৈক অধ্যাপকের অত্যাচার

ছাত্রে প্রফেসারে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া গেল। ঢাকা কলেজের প্রফেসর মণ্ডী সাহেবের অত্যাচার আমরা অনেক শুনিয়াছি। তাহার ইংরাজী আবদার রক্ষার্থই ঢাকার ঘাটে নৌকা রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি নিজে চাবুক হাতে করিয়া অনেকদিন অনেক নাবিককে দৌড়াইয়াছেন, তজ্জন্য অনেকদিন অনেক পুলিস পাহরাকেও নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। যে হউক, সম্প্রতি তাহার মহিমাতে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। দিন কতক হয়। পোগোজ স্কুলের নিকটে বাসা করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্রেরা স্কুলে গোলমাল করে, তাহা তাহার কানে সহ্য হয় না ; তিনি তজ্জন্য শাসন চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তারপরে গত মঙ্গলবার তাহার একজন আরদালী একটি স্কুলের ছাত্রকে জুতাচোর বলিয়া গ্রেপ্তার করে। বালকের পায় যে জুতা ছিল, আরদালী তাহার অপহৃত জুতা বলিয়া বালককে যন্ত্রণা দিতে থাকে। বালকের চিৎকার শুনিয়া আর কতকগুলি ছাত্র সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান স্বরূপ আরদালীকে ধরিয়া কিছু যন্ত্রণা দেয়। পরে সমাগত মণ্ডী সাহেবকে দেখিয়া ছাত্রগণ পলায়ন করে। যে ছাত্রটিকে জুতা চোর বলা হইয়াছে, সে গোপীমোহন বাবুর ইনষ্টিটিসনে পড়িত,

কিন্তু মণ্ডী সাহেব আরদালী–প্রহারকগণকে পোগোজ স্কুলের ছাত্র সন্দেহ করিয়া পোগোজ স্কুলে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করেন।

কিন্তু একটি ছাত্রকে তিনি পরিচিত করিতে না করিয়া ঐ স্কুলের মাষ্টারগণ প্রতিতাম্বি করেন, তাহারা ছাত্রদিগকে গোপন করিয়াছেন, সন্দেহে, রেজেষ্টরী বহি দেখিতে চাহেন, কিন্তু তাহারা সাহেবের অনধিকার চর্চার সহায়তা না করাতে সাহেব তাঁহাদিগকে অনেক তর্জ্জন গর্জন করিয়াছেন।

১৭ আগস্ট, ১৮৯০

## গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গা হয় নাকি ?

এতকালওত এদেশে শিক্ষা ছিল ; চানক্য ও কনিক প্রভৃতির কুটনীতি হইতে ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্র পর্য্যন্ত নানাবিধ শিক্ষাইত এদেশে লোকে শিখিত। মুসলমান সম্রাট হইয়া পারসী আরবী চালাইলেন, তাহাও ত হিন্দুর ছেলেরা অকুণ্ঠিত চিত্তে পড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহা পড়িয়া কেহ কি কখন খৃষ্টান, ব্রাহ্ম অথবা ধর্ম্মহীন হইয়াছে? তবে আজ যাহারা পাশ্চাত্য মতে ইংরাজীতে অথবা দেশীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের মধ্যেই বা কেন এত খৃষ্টান ব্রাহ্ম বা বিধর্ম্মী হওয়ার ধূম? দোষ তবে কি পাশ্চাত্য শিক্ষার নহে? যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানকালে অধীত হয় এ দোষ কি তাহারই নহে? সেই গ্রন্থ যাহারা পাঠ্য করেন, তাহারাই কি সেই দোষের নিদান নহে? বলুন পাঠক, এখন সেই সকল ব্যক্তি কিরূপ ক্ষমার যোগ্য। গবর্ণমেন্ট ত পুনঃ পুনঃই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি প্রজার জাতি ধর্ম্মে আঘাত করিবেন না। সে দিন যে শিক্ষা কমিশন বসিয়াছিল, তাহা হইতেও বিধান হইয়াছে, যে সকল পুস্তকে জাতি ধর্ম্মে আঘাত হয়, তাহা পাঠ্য করা হইবে না। তবে বলুন, এই যে হিন্দু–মুসলমান শিক্ষিতেরা স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি ভ্রষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ সেই পাঠ্য গ্রন্থগুলির কোন ব্যক্তি বালকদিগকে পড়াইতে বাধ্য করে? যাহারা তাহা করে, তাহারা গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কিনা? গবর্ণমেন্টের সেই পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন দ্বারা গবর্ণমেন্টের যে গুরুতর অনিষ্টের সূচনা করা হইতেছে, তজ্জন্য তাহারা দণ্ডনীয় কিনা? এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের মীমাংসা প্রার্থনা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। এক বরিশাল ধর্ম্মসভার উপর নির্ভর করিয়া এক রমেশ দত্তের ভারতবর্ষের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিত থাকা কাহারও কর্ত্তব্য হইতেছে না। ভবিষ্যত বংশধরদিগকে শিক্ষিত করিতে সকলেরই প্রয়াস আছে, কর্ত্তব্যও বটে ; কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষায় যেরূপ কুফল ফলিতেছে, তাহা দেখিয়া কেঁ না আশঙ্কিত হইতেছে? নিজের পুত্র, ভ্রাতস্পুত্র ভাই ভাগিনারা যখন শিক্ষার নামে স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া নানাবিধ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। পিতৃলোককে নরক গামী করে, পিতামাতার হৃদয়ে আঘাত করিয়া পরেরটি হইয়া বসে, স্বসমাজকে বিশৃঙ্খল ও দুর্ব্বল করিয়া পরের সমাজ পরিপুষ্ট করে, তখন কোন ব্যক্তির কষ্ট না হয়? কোন ব্যক্তির হৃদয় তুষানলে দগ্ধীভূত হয় না? তখন কোন ব্যক্তি শিক্ষার নামে সত্তধিক্কার দিয়া শিক্ষার পরিচালকদিগকে অভিসম্পাত দ্বারা ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত না হয়? তখন এরূপ হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইলে ওরূপ হইতে হয় না। আমরা জানি, অনেকে এরূপ কুশিক্ষার ভয়ে আপনাপন ছেলেদিগেকে চিরকাল মূর্খ রাখিয়া থাকেন, কিন্তু নির্দোষ শিক্ষার জন্য কেহই চেষ্টা করেন না। কেন? সকলে গবর্ণমেন্টকে এই অপপাঠ্যগুলি পরিত্যাগ জন্য প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেন্ট কি তাহা না শুনিয়া পারেন? আমাদের বিশ্বাস যে

গবর্ণমেন্টকে ভালরূপ বুঝাইয়া দিলে তিনি কদাপি প্রজার ধর্ম্ম হানিকর পাঠ্য পড়াইতে দিবেন না।

২৫ মে, ১৮৯০

## পাঠ্যক্রম সম্পর্ক

পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের দোষে যে সকল বালক বিধর্ম্মী হয়, তাহাদিগকে দেখিয়াই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ পুত্রদিগকে মূর্খ করিয়া রাখে, তথাপি পাঠামানে স্কুলে পড়িতে দেয় না। যাহারা নিতান্ত চাকুরীর কাঙ্গাল, কেবল সেই কতিপয় লোক সন্তানদিগকে স্কুলে পড়াইয়া থাকে। আজ যদিও হাজার হাজার বালকের নাম স্কুল কলেজে দেখা যায় কিন্তু তাহাদের পরিমাণ ঐ কারণেই সমুদ্রে গোস্পদ বাবির মত। বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা ছোট নাগপুরে স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত বালক সংখ্যা ১১৬০৭৭২৬ জন। (এখানে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক পরিমাণ গৃহীত হইল, এতন্মধ্যে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ২২ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠের বয়স ধরিয়া লইলেও প্রায় এরূপ সংখ্যা হইবে)। তন্মধ্যে মাত্র ২০৭৯৮৮ জনে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার স্কুলসমূহে পড়িয়া থাকে, তাহারাও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় স্কুলে পড়ে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি যে সকল জাতি কখনও নিরক্ষর থাকে না। তাহারা জাতি নাশের ভয়ে আপনাপন সন্তানদিগকে নিজেরাই ঘরে ঘরে কোন প্রকার শিক্ষা দেয়। অন্যান্য জাতির অন্যান্য ব্যবসায় আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির কোন প্রকারেই লিখা পড়া না শিখিয়া চলিবার উপায় নাই। এই বঙ্গদেশে সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের বালক সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ। ইহাদের এক লক্ষ স্কুলে পড়ে কি না সন্দেহ।

অবশিষ্টগুলিকে বাধ্য হইয়া স্কুলের সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। যে জন্য এই সকল ছাত্র স্কুলে পড়ে না, সে কারণে দূরীকরণে তাঁহার কিছুই মনোযোগ নাই। গবর্ণমেন্ট নিজে ধর্ম্ম ও সমাজে হস্তক্ষেপ না করা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞারূঢ় বটেন। কিন্তু তিনি যাহাদের প্রতি শিক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাহারা যে কুপাঠ্যাদি দ্বারা শিক্ষার্থীগণের প্রতি ধর্ম্মের হন্তারক হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতেছে, এবং প্রজাদিগকে মূর্খ করিবার কারণ হইতেছে, তৎপ্রতি গবর্ণমেন্ট কিছু দৃষ্টি করেন না। যদি তাহার তাহাতে দৃষ্টি থাকিত, এবং পাঠ্য শিক্ষক ও উপদেষ্টা নির্দ্দেশকারী কর্ম্মচারীদিগের প্রতি উপযুক্ত শাসন থাকিত, তাহা হইলে আজ শিক্ষিত সমাজে ভিন্ন মূর্তি পরিলক্ষিত হইত। তাহা হইলে আজ জাতি ধর্ম্মের আশঙ্কায় প্রজাগণ গবর্ণমেন্টকে জুজুর মত ভয় করিত না।

১ জুন, ১৮৯০

## ঢাকা সম্পর্কিত-জনৈক অধ্যাপকের অত্যাচার

ছাত্রে প্রফেসারে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া গেল। ঢাকা কলেজের প্রফেসার মণ্ডী সাহেবের অত্যাচার আমরা অনেক শুনিয়াছি। তাঁহার ইংরাজি আবদার রক্ষার্থই ঢাকার ঘাটে নৌকা রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি নিজের চাবুক হাতে করিয়া অনেকদিন অনেক নাবিককে দৌড়াইয়াছেন, তজ্জন্য অনেকদিন অনেক পুলিস পাহারাকেও নাস্তা নাবুদ করিয়াছেন। যে উহক, সম্প্রতি তাঁহার মহিমাতে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। দিনকতক হয়, পোগোজ

স্কুলের নিকটে বাসা করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্রেরা স্কুলে গোলমাল করে, তাহা তাঁহার কানে সহ্য হয়না ; তিনি তজ্জন্য শাসন চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তার পরে গতমঙ্গলবার তাঁহার একজন আরদালী একটি স্কুলের ছাত্রকে জুতা চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করে। বালকের পায় যে জুতা ছিল, আরদালী তাহার অপহৃত জুতা বলিয়া বালককে ধরিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে। বালকে চিৎকার শুনিয়া আর কতকগুলি ছাত্র সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান স্বরূপ আরদালীকে ধরিয়া কিছু যন্ত্রণা দেয়। পরে সমাগত মণ্ডী সাহেবকে দেখিয়া ছাত্রগণ পলায়ন করে। যে ছাত্রটিকে গোপন করিয়াছেন, সন্দেহে রেজেস্টেরী বহি দেখিয়া চাহেন। কিন্তু তাঁহারা সাহেবের অনধিকার চর্চার সহায়তা না করাতে সাহেব তাঁহাদিগকে অনেক তর্জ্জন করিয়াছেন।

১৭ জুন, ১৮৯০

### ছোটলাট ও পাঠ্যনির্ব্বাচন সমিতি

পাঠ্য নির্ব্বাচন সমিতি কর্ত্তৃক পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গবাসী গ্রন্থকারগণ যে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ; সমিতির মেম্বরগণের বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী পক্ষপাতিতার জন্য যে এই দূরস্থিত গ্রন্থকারগণ সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াও ভাল গ্রন্থকে পাঠ্য তালিকায় স্থান দিতে অসমর্থ হইতেছে, এ বিষয় আমরা ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। বিশেষতঃ ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকটেও এ বিষয়ে ২/৩ খানি দরখাস্ত গিয়াছে সম্ভবতঃ এতদিনে ডিরেক্টর বাহাদুর তাঁহার অভিমত অবশ্যই প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তাহা হইলে এখন ছোটলাট বাহাদুরকে সে বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে। কিন্তু ছোটলাটের চতুর্দ্দিকে কলিকাতাবাসী যে বহুসংখ্যক স্বতঃপ্রবৃত্ত মন্ত্রীসমাসীন, তাঁহাদের জন্য ছোটলাট পূর্ব্ববঙ্গের স্বার্থে সুবিবেচনা প্রদর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস হয় না। যে প্রধান রাজপুরুষদিগের নিকটে অবস্থান জন্য, কলকাতাবাসী সকল প্রকারে গবর্ণমেন্টের আদৃত ও বিশেষ বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত ; যে জন্য কলিকাতায় রাজা, মহারাজ ও নাইট প্রভৃতির অবধি নাই ; অথচ মফস্বলের অনেক অপ্রাপ্ত উপাধি ব্যক্তির নিকটে সেই সকল রাজা মহারাজ ও নাইটগণ কি ধনে, কি জনে কি সৎকার্য্যে, কি বিদ্যাবুদ্ধিতে কোনক্রমেই তুলনীয় নহেন ; যে জন্য ছয় লক্ষ লোকের বসতি স্থান এক কলিকাতার যত লোক বড় বড় রাজকার্য্যে অভিষিক্ত, ৭ কোটি ৭ লক্ষ বঙ্গবাসীর মধ্যে তাহার সমান লোকে রাজপদ লাভ করিতে পারে না, সেই প্রধান রাজপুরুষদিগের নিকটাবস্থানই কলিকাতাবাসীর সৌভাগ্যের নিদান। বস্তুত কলিকাতাবাসীর অনুরোধ উপরোধকে গবর্ণমেন্ট কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারেন না, সুতরাং কলিকাতাবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধে মফস্বলবাসীর কোনরূপ ন্যায়োপেত দাবীই গবর্ণমেন্টের নিকটে গ্রাহ্য হওয়া বড় কঠিন।

এক দেশবাসীর নিকটে অপর দেশবাসীর প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা সর্ব্বত্রই আছে। যে ইংরাজ জাতি আজিকাল দিনে সকল বিষয়ে সভ্যসমাজে অগ্রগণ্য, তিনিও ফরাসী প্রভৃতি দেশবাসীর নিকটে জনবুল বলিয়া ঘৃণিত। নিজ বৃটনেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী পরস্পরকে ভাষা ও রীতি নীতির জন্য নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে কলিকাতার যেমন একচেটে অধিকার, সে দেশে তাহা নহে। সে দেশে যেমন লণ্ডনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তদ্রূপ কেম্ব্রিজে ও অক্সফোর্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। লণ্ডন রাজধানী হইলেও ঐ ঈর্ষা ঘৃণা ও

আত্মীয় পক্ষপাতিতার জন্য কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থান বাসীর কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কলিকাতাবাসী এতদঞ্চলবাসীর প্রতি ঈর্ষা ও ঘৃণা প্রভৃতির অনুরোধে প্রধান রাজপুরুষদিগের সাহায্যে ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছেন।

যদিও এক দেশবাসী অন্য দেশবাসীকে স্বভাবতঃ ঘৃণা করে, কিন্তু এদেশবাসীর প্রতি কলিকাতাবাসীর ঘৃণা খুব অনুচিত। সত্য বটে, কলিকাতার ভাষার সুর এতদঞ্চলের সুর অপেক্ষা অনেকটা মিষ্ট। কিন্তু মিষ্ট সুরের জন্য ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না। একটা চাষা সুন্দর গান গাইতে পারিলে কি বেসুরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে তাহার ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়? বস্তুত যদি কোন ভাষা-শাস্ত্র-বিৎমধ্যস্থ ব্যক্তি উভয়ভাষার তুলনা করেন, তবে কলিকাতার ভাষাপেক্ষা ঢাকার ভাষাকে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত দেব ভাষা ; সংস্কৃত হইতে যে ভাষা যত অপভ্রংশ হইয়াছে, সেই ভাষা তত ম্লেচ্ছভাষা বলিয়া গণ্য। ঢাকা ও কলিকাতার সাধারণ ভাষায় বড় গেলে যোগ নাই, ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া "মু" এবং "কে" লইয়াই কিছু বেশী মারামারি। সত্য বটে, "বো" কথাটী শুনিতে বড় মধুর। যে বোর মধুরতায় ভুলিয়া কতজন মাতা পিতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেছে, সেই বোর জন্য "মু"টাকে পরিত্যাগ করা অবশ্যই কঠিন নহে। কলিকাতাবাসীরা মিষ্টতার অনুরোধেই যে মুকে পরিত্যাগ করিয়া বোকে জপমালা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, "মু" কথাটী আদি, কেননা ইহা সংস্কৃতের করিষ্যামি দাস্যামি প্রভৃতি শব্দের "মি" স্থানে অপভ্রংশ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে অপভ্রংশ হইবার কালে "মি" স্থানে "মু" হওয়াই সম্ভবপর "বো" হওয়া সম্ভবপর নহে। লিখিত ভাষায় কলিকাতাবাসীরা বো স্থানে "ব" করিয়াছেন দেখিয়া ঢাকাবাসীরাও "মু" স্থানে "ব" করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে প্রথম যোগে কলিকাতা অঞ্চলে যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছাপা হইয়াছিল, গবর্ণমেন্টের শিক্ষানীতির অনুরোধে তাহা দেখিয়াই এতদঞ্চলবাসীকে শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছে। কলিকাতাবাসী অনেক শব্দেই "ম" স্থানে "ব" করিয়া ফেলিয়াছেন। ঢাকাবাসী যাহাকে "আম" বলে, তাঁহারা তাহাকে বলেন, "আঁব"। সংস্কৃত শব্দ অম্রকে সহজে বলিতে গেলেই আমই হইয়া থাকে ; বরং অন্য অপভ্রংশ শব্দের প্রকৃতি অনুসারে "ম" স্থানে চন্দ্র বিন্দু করিলে "আঁর" হইতে পারে, কিন্তু যে "ব" কোন সম্পর্কে নাই, তাহাকে আনিয়া অম্রস্থানে আঁব করা নিতান্ত অযুক্ত। বস্তুতঃ মকারের উপরে তাঁহাদের বড়ই আক্রোশ ; আর কিছু বলিলাম না।

কলিকাতা পূর্ব্বে পুণ্ড্র দেশ—অর্থাৎ অসভ্যপোদের মুল্লুক ছিল (অদ্যাপি কলিকাতার চতুর্দ্দিকে যত পোদবাগদীর আড্ডা। পক্ষান্তরে এই বঙ্গদেশ (পূর্ব্বকালে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও যশোহর বঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য ছিল) সেই মহাভারতের কাল হইতে সভা রাজ্য মধ্যে গণ্য। পাল বংশ, সেন বংশ ও মুসলমান জাতীয় নরপতিগণ বহু সহস্র বৎসর এই ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অবস্থান করিয়া সমস্ত দেশ শাসন করিতেন। এইরূপ চিরন্তন রাজ ক্ষমতার অনুবর্ত্তী সভ্যতায় ঢাকার সমান দাবী দেড় শতাব্দীর কলিকাতা কেন, বঙ্গের অপর কোন স্থানের নাই। রাজধানীর জন্য ঢাকার অনেক লোক এখন কলিকাতার অধিবাসী, তাহাদের এবং আরও নানা স্থান হইতে সমাগত লোকসমূহ দ্বারা কলিকাতা দেড় শতাব্দী মধ্যে বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সভ্যোচিত রীতি নীতিতে ঢাকাকে পশ্চাতে ফেলিতে কোনক্রমেই কলিকাতা সমর্থ হয় নাই।

অথচ রাজ সাহায্য লাভে স্পর্দ্ধিত কলিকাতাবাসী ঢাকাবাসীর প্রতি অসভ্য প্রভৃতি নানা অসদুক্তি করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কলিকাতাবাসী কর্তৃক বঙ্গেশ্বর পরিকৃত ; পাঠ্যনির্ব্বাচন সমিতি সম্বন্ধে আমাদের প্রবন্ধাবলী ও পূর্ব্ববঙ্গবাসীর আবেদন হয় ত ছোটলাট গ্রাহ্য করিবেন না। যদি গ্রাহ্য না করেন, তবে ব্রিটিস জাতির সমদর্শিতার প্রতি ঘোর কলঙ্ক অর্শিবে।

৮ই অক্টোবর, ১৮৯৩

## ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অযোগ্য প্রশ্রয়

ইংরাজ রাজপুরুষেরা যদ্যপি স্থানীয় ভাষায় পরীক্ষা দিয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন, তথাপি তাঁহাদের অধিকাংশ স্থানীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাদের মনোগত বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে ভুলাইবার জন্য যে কেহ কিছু ইংরাজী শিখিয়া তাঁহাদের নিকটে গিয়া খোসামোদী করিতে পারে, সে যদি নিতান্ত অপদার্থও হয়, তথাপি তাঁহারা তাহাকেই উপযুক্ত মনে করেন। শুধু মনে করিলেই ক্ষতি ছিল না, তাহাকে রাজকীয় কার্য্যভার প্রদান করেন, রেজিষ্টার করেন, স্বায়ত্তশাসনে গবর্ণমেন্টের মনোনীত সভ্য করেন, শ্রেষ্ঠ উপাধি–ভূষণে ভূষিত করেন, চোরের নায় সাধুর নিশান তুলিখা দেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের খোষামোদী না করিলে এদেশের প্রকৃত বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক ও কর্ম্মক্ষম মহাত্মাদিগকে তাঁহারা মিষ্ট কথাতেও সন্তুষ্ট করিতে জানেন না। মহতের পুরস্কার ও দূরাশয়ের পুরস্কার হয় দেখিয়া নীচাশয় লোকদিগের ক্রমেই দল পুরু হইতেছে, দেশ হইতে মহত্ত্ব চলিয়া যাইতেছে, নীচতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

যাহারা ইংরাজী ভাষায় ইংরাজের তোষামোদ করিয়া পদলাভ করে, তাহারা সকলেই যে মন্দ তাহা বলিতেছি না। এ দলে খুব উচ্চশ্রেণীর মহৎ লোক না থাকিলেও মাঝামাঝি গোছের ভাল লোক অনেক আছেন। যদ্যপি অনেক অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়মিতরূপে ঘুষ লইয়া বিচার নিষ্পত্তি করেন, এবং এই ঘুষের লোভেই নানা যোগাড়যন্ত্র করিয়া অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট পদলাভ করেন, তথাপি এমন কোন কোন অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমরা জানি, যাঁহারা কিছুই লন না। তাহারা কিন্তু ঐ পদলাভের জন্য বেশী কোন যোগাড়যন্ত্র ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের তোষামোদীও করেন না। অনেক রুরাল সবরেজিষ্টার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে ঘুষ ব্যতিরেকে রেজিষ্টরি করেন না বটে, কিন্তু এমনও রুরাল সবরেজিষ্টার আছেন, যিনি ঘুষ গ্রহণ করেন না। অবশ্য গবর্ণমেন্ট–মনোনীত মেম্বর ও কমিশনরদিগের মধ্যেও যোগ্যলোক বিস্তর আছেন। উপাধি প্রাপ্তদিগের মধ্যেও অযোগ্য সংখ্যা বেশি নহে ; কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের উপাধি প্রাপ্তিতে অনেক যোগ্য ব্যক্তির অপমান হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সমস্ত দেখিয়া রাজপুরুষদিগের তোষামোদ প্রিয়তা জন্য দেশের লোক তাঁহাদের প্রতি বড়ই বিরক্ত হইতেছে। রাজ অর্থাৎ শাসন শক্তিসম্পন্ন রাজ্যাধিপতি হিন্দুর নিকটে সর্ব্বদেবতা স্বরূপ মাননীয়। সেই রাজার প্রতিনিধি স্বরূপে যাঁহারা দেশের অহিতকরকার্য্যে দ্বারা রাজার প্রতি প্রজার ঘৃণা জন্মান, তাঁহাদের অচিরে শাসন হওয়া আবশ্যক।

৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

## পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারতের অধঃপতন

খৃষ্টানগণ শুধু বক্তৃতা দিয়া হিন্দু-মুসলমানকে যখন স্বধর্ম্মে আনিতে পারিলেন না ; সেইকালে দূরদর্শী খৃষ্টানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। মেকলে নামক একজন প্রধান পুরুষ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন ; যদি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার কর, তবে দেখিবে ত্রিশ বৎসর মধ্যে সমস্ত ভারতবাসী খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। বস্তুত শিক্ষার এমনই মহিমা। শিক্ষার মহিমায় ব্যাঘ্রপালিত মানব শিশু বাঘ হইয়া যায়। চেহারা ঠিক বাঘের মত হয় না বটে, কিন্তু হামাগুড়ী দিয়া লম্ফে মম্ফে হাটা, কাচা মাংস কামড়াইয়া খাওয়া, মনুষ্যাদি দেখিলে কট্‌মট্ দৃষ্টি ও জঙ্গলে পলায়ন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাঘ্ প্রকৃতি শিক্ষা দ্বারা মানুষের আয়ত্ত হয়। একথা কাল্পনিক নহে ; এরূপ ব্যাঘ্রপালিত কয়েকটি মনুষ্য শিশু সাহেবগণ কর্তৃক ধৃত হওয়ায় ঐ কথা প্রমাণিত হইয়াছে। যে শিক্ষায় মানুষকে বাঘ করিতে পারে, তাহাতে হিন্দুর ছেলে খৃষ্টান হইবে, সে কিছু বিচিত্র কথা নহে। এই জন্য বহুদর্শী মেকলে সাহেব ঐ পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই খৃষ্টানগণ বহু অর্থ ব্যয় স্বীকারে নিজ এবং গবর্ণমেন্ট দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহ চালাইয়া আসিতেছেন।

শিক্ষা দ্বারা অবশ্যই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে তাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টাধর্মটি এমন সঙ্কীর্ণ ও এমন অসার যে, ইহাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির আস্থা কোনক্রমেই তিষ্ঠিতে পারে না। যে ধর্ম্মের অসারতার জন্য ইউরোপের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নাস্তিক নামে অভিহিত হওয়াকেও শ্লাঘা মনে করিয়াছেন ; এবং কমনিষ্ট, নিহিলিষ্ট, ফেনিয়ান, সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি রাজদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী সম্প্রদায়সমূহ যে খৃষ্টধর্ম্মের ফল, তাহাতে হিন্দুর ছেলে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইতে পারিবে কেন? মানুষের শিশু উল্লিখিত কয়েটিরূপে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিতে পারে বলিয়া ব্যাঘ্রাচিত দণ্ড নখরাদির অভাবে যেমন সম্পূর্ণ ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিতে পারে না, এবং মনুষ্যোচিত মস্তিষ্কাদি থাকাবশতঃ পুনর্মনুষ্যত্ব লাভে যেমন ব্যাঘ্রের ন্যায় বঞ্চিত হয় না, তদ্রূপ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু বালকগণ খৃষ্টানের রীতিনীতি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও খৃষ্টানের ধর্ম্ম কোনরূপে মানিতে পারে না। ইহার ফল এইরূপ দাঁড়াইল যে, খৃষ্টানের শিক্ষায় হ্যাট কোটাদি পরিধান, মদ্য মাংসাদি ভোজন, ইংরাজীতে কথোপকথন, ইংরাজী রুচির অনুকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবই প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং দেশীয় সমস্ত রীতিনীতির বিরোধী হইলেন, পক্ষান্তরে প্রকৃতি দত্ত বিবেকের বলে পাশ্চাত্য ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া সম্পূর্ণ নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। পাশ্চাত্য সারত্ব অভাবে তাহা মানিতে পারে না। সুতরাং তাহারা সমাজ ভয়ে প্রকাশ্য নাস্তিক না হইলেও এবং লোক ভুলাইবার জন্য কোন একটা ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও অন্তরে ঘোর নাস্তিক অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসী থাকিয়া যায়।

এই কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানগণ অধিকাংশে ঘোরতর নাস্তিক। তাঁহারা টাকা এবং নিজের ও নিজ প্রিয়পাত্র স্ত্রী পুত্রাদির সুখের জন্য না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। তাঁহারা ভূমিতে শুধু বুদ্ধিমান লোকেরাই খৃষ্টধর্ম্মের অবিশ্বাসী হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা ধর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা মনে খৃষ্টধর্ম্ম না মানিলেও ধর্ম্মবন্ধন রক্ষার অনুরোধে খৃষ্টান নামে পরিচিত হন, এবং যাহারা দর্শন ও বিজ্ঞানের চক্ষে ধর্ম্মকে দেখিতে অসমর্থ, তাহারা স্বভাবতই খৃষ্টান থাকিয়া যায় ; পক্ষান্তরে হিন্দু বালক খৃষ্টানগণ নিকটে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী হয়

বটে, কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষিত, সুতরাং রাজনীতির মহিমায় তাহারাই সর্ব্বপ্রকার পদস্থ ; অর্থোপার্জনের সকলগুলি উপায় বৈদেশিক রাজা তাহাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন ; সুতরাং দেশের অশিক্ষিত লোকেরাও তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের পথ করিতেছে। পণ্ডিত যদি কোন পাপ কার্য্যকে পুন্য জনক বলিয়া পাতি দেন, তাহা যেমন অশিক্ষিতের মান্য, তেমন ঐ সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় পণ্ডিতাভিমানীদিগের স্বার্থক অনুকরণও অশিক্ষিত দিগের কতক পরিমাণে মান্য। বিশেষতঃ শিক্ষিতগণ গবর্ণমেন্ট হইতে এত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের উপদেশ না মানিলে অনেকের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। এই কারণে ভারতে দিন দিন নাস্তিকতা, ধর্ম্মে অবিশ্বাস, মামলা মোকদ্দমা বৃদ্ধি, আতিথ্য উৎসবাদি ও দীঘী পুষ্করন্যাদি লোক হিতকর কার্য্যের হ্রাস, হিন্দুচিত রীতিনীতির অভাবজনিত নানাবিধ অভিনব পীড়া ইত্যাদি নানা কারণে ভারতভূমি জর্জরীভূত হইতেছে। শুধু ভারতবাসীর পরিণামে ভয়াবহ অশুভলক্ষণ উপস্থিত হয় নাই, পাশ্চাত্য শিক্ষার মহিমায় হিন্দু-মুসলমানের স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস ও সুখ সাম্যে আগ্রহ হওয়াতে পরিণামে ভয়ানক রাজবিদ্রোহিতা হওয়ারও সূচনা উঠিয়াছে। অচিরে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিলোপ করিয়া দেশীয় ধর্ম্ম শিক্ষা—যে শিক্ষায় হিন্দুরা রাজার প্রতি সর্ব্ব দেবতার ভক্তিপ্রাপ্ত হয়, সেই শিক্ষার প্রচার ও রাজকর্তৃক উৎসাহ প্রদত্ত না হইলে অচিরে ভারতবাসী রসাতলে যাইবে।

১০ জুন, ১৮৯৪

## সংবাদাবলী

যে সকল স্কুল কলেজের অধ্যক্ষেরা নিজে অধ্যাপনাকার্য্যে সক্ষম, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া অধীনস্থ শিক্ষকদিগকে অসন্তুষ্ট করিলেও তত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। তথাপি অকারণে অধীনস্থ শিক্ষকদিগকে কর্ম্মচ্যুত এবং কোনরূপে অসন্তুষ্ট করিলে লোকনিন্দা ও অধর্ম্ম হয় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর অত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তদীয় কলেজের অধ্যাপকগণ প্রতি অতিশয় বিনীত ব্যবহার করিতেন ; কাহাকেও কখন অযথা অসন্তুষ্ট করেন নাই ; এই হেতু অধ্যাপকগণ মনেপ্রাণে নিজস্বের মত কলেজকে দেখিতেন ; এই হেতু তাঁহার কলেজ ও স্কুল ভারতে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল।

২৪ নভেম্বর, ১৮৯৫

## ঢাকার শিক্ষা

যে সকল স্কুল কলেজের অধ্যক্ষেরা নিজে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ নহেন ; যাঁহাদিগকে ঐ কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরের উপরে নির্ভর করিতে হয়, তাঁহাদিগকে অধ্যাপকদিগের সঙ্গে বিশেষরূপে ভদ্র ব্যবহার করিতে হয় ; অধ্যাপকেরা ক্রটি করিলেও ক্ষমা এবং ভবিষ্যতে সে রূপ না হওয়ার নিমিত্ত মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করিতে হয়। একেই পেন্সনের আশা ও বিশেষ উন্নতির আশা নাই দেখিয়া ক্ষমতাপন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পার্য্যমানে গবর্ণমেন্টের চাকরি ছাড়িয়া বেশি বেতনের লোভেও প্রাইভেট স্কুল কলেজের চাকরি লইতে অনিচ্ছুক ; তাহার উপরে যদি চাকরির স্থায়িত্বে বিশ্বাস না থাকে, স্বত্বাধিকারী সামান্য দোষ ক্রটি ধরিয়া ফেরেন, তাহার হইলে সেই স্কুল কলেজে সক্ষম ভদ্রলোকেরা নিতান্ত পেটের দায়ে চাকরি লইলেও মনোযোগী হইয়া কাজ করিতে পারে না।

২৪ নভেম্বর, ১৮৯৫

## ঢাকার শিক্ষা

ছাত্রগণ স্বভাবতই শিক্ষকের অনুগত। অধীনস্থ শিক্ষকেরাও কিয়ৎ পরিমাণে প্রধান শিক্ষকের অনুগত না হইয়া পারে না। এরূপ স্থলে প্রধান শিক্ষকদিগের ক্ষমতা স্বভাবতই স্কুল কলেজের পক্ষে স্বত্বাধিকারীদের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। যদি স্বত্বাধিকারীরা তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অনুচিত ব্যবহার করেন, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে সেই স্কুল ভাঙ্গিয়া অন্য একটা স্কুল করিতে খুব সহজে সহজে পারেন। অবশ্য, ইহার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত না আছে, তাহা নহে। এই ঢাকা সহরেই বাবু গোপীমোহন বসাককে তাড়াইয়া কিশোরী বাবু অনায়াসে নিজ স্কুল রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ভিতরে একটা বিশিষ্ট কারণ ছিল। গোপীমোহন বাবুর কর্কশ ব্যবহার জন্যই হউক, অথবা আভিজাত্যহীনতা জন্যেই হউক, কিংবা খুব বড় বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়াই হউক, তৎপ্রতি অধিকাংশ শিক্ষক বিরক্ত ছিলেন ; তাহার উপরে তিনি গরলি দেওয়াতে অধিকাংশ ছাত্র একেবারে ক্ষেপিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। ছাত্রাদিগের অনুরোধেই কিশোরী বাবু গোপীমোহন বাবুকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এরূপ অবস্থায়ই গোপী বাবু জুবিলী স্কুলের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। তথাপি অনেক ছাত্র তৎপ্রতি গুরুভক্তি ছাড়িতে না পারিয়া তদীয় নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্তি হইল। কিশোরী বাবুর বিশেষ ক্ষতি না হইলেও ঐ স্কুলের জন্য অনেক পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল। কিশোরী বাবু যদি সেই সময়ে অধিকতর উপযুক্ত শিক্ষক না পাইতেন, তবে হয়ত পূর্ব্ববঙ্গ স্কুলের অস্তিত্ব লোপ না হইয়া একটা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আড্ডা হইয়া থাকিত।

২৪ নভেম্বর, ১৮৯৫

## ঢাকার শিক্ষা

প্রাইবেট এন্টেন্স স্কুলগুলির অযথোচিত অপ্রতিহত স্বাতন্ত্রে অনুচিত সর্ব্বাধিকারত্বে ও অর্থাগমের দূরাকাঙ্ক্ষামূলে সদস্য বস্তু বিবেক রহি(ত) ঢাকা নগরীতে পথ ক্রমশঃ প্রশস্তত হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা এখন এমন দাড়াইয়াছে যে শীঘ্র কোন প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবিত ও কার্য্যে পরিণত না হইলে, এই সকল বিদ্যালয় কেবল অবিদ্যা ও অনাচারের আশ্রয় স্থানমাত্রে পর্যবসিত হইবে। এ অবস্থার পর্যালোচনায় আমরা অনেকদিন হইতেই দুঃখ প্রকাশ ও প্রতিকারের ভরসায় চিৎকার করিয়া আসিতেছি। প্রত্যাশিত ফল লাভ কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারি, অন্যায় দেখাইয়া চীৎকার করিতে পারি। কিন্তু প্রতিকার ব্যাপারে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কোনই হস্ত নাই। যদি কেহ শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠারূপ ব্যবসায়ে লাভের দূরাশায় অথবা শিক্ষায় লক্ষ্য না রাখিয়া নামের ভিখারীরূপে কেবল প্রতিপত্তির প্রত্যাশায় স্কুল খুলিয়া থাকেন। তিনি তাহার মনোগতভাবের বিরুদ্ধবাদে কর্ণপাত করিবেন কেন? তিনি সুশিক্ষা চাহেন না, তিনি চাহেন নাম, অথবা তিনি চাহেন অর্থ ; তিনি আমাদের চিৎকার শুনিয়া বিচলিত হইবেন কেন? তাঁহার অধ্যাসিত পথ প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্যের প্রদর্শিত পথ সদূদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও তাহাতে পাদচারণা করিতে রাজী হইলে কেন? সৎপ্রসঙ্গে ও সাধু কার্য্যে আন্তরিক অভিপ্রায় না থাকিলে অথবা তাহাতে বাধ্যবাধকতার কোন সংস্রব না থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই কাহারও হইতে এ সংসারে

নিঃস্বার্থে সদনুষ্ঠানের প্রত্যাশা দুরাশা বই আর কিছুই নহে। অমন লোক এ সংসারে আজকাল বড় বিরল।

আমরা ত আমরা ইনস্পেক্টার যে ইনস্পেক্টার অথবা ডিরেক্টার যে ডিরেক্টার যাহাদিগকে সর্ব্বময় কর্তা বলিলেই চলে, তাঁহারাও নাকি গবর্ণমেন্টের বিধান বশে সিণ্ডিকেটের অনভিমতে প্রাইভেট স্কুল কর্তৃক সমনুষ্ঠিত অপকারিতার প্রতিবিধানে সক্ষম নহেন। ইহাঁরাও নাকি প্রাইভেট স্কুলের কর্তৃপক্ষকে কোনও বিশেষ কার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিমান ও বাধ্য করিতে ক্ষমবান নহেন। আমরা শুনিয়াছি ইঁহাদেরও সদুপদেশ অনেক স্থলে উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে ও হইয়াছে। অথচ তজ্জন্য কেহ তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

তহবিলে হাত পড়িবার দুশ্চিন্তায় অধিকাংশ প্রাইবেট স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ বার্ষিক পরীক্ষান্তে বালকগণকে যেভাবে প্রমশন দিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কোন কোন স্কুলে "সেকেণ্ড ক্লাস টুদি সেকেন্ট ক্লাস" এইভাবে প্রমশন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে যে কত ছেলের মাথা খাওয়া হয়, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। অনেক স্থলেই এসব বিষয় অভিভাবকগণ জানিতে পারেন না সুতরাং কাহারও কোন আপত্তি করিবার কারণ উপস্থিত হয় না। বিশেষ অনেক অভিভাবক সমীচীন দূরদর্শনের অভাবে ইহার পরিণামের বিষময় ফল অনুভবই করিতে পারেন না বরং আপন স্বজন প্রমশন পাইয়াছে ভাবিয়া তাঁহাদের মনে সন্তোষেরই উদ্রেক হইয়া থাকে। আমরা জানিতে পারিয়াছি লাভের লালসায় ও অর্থগত ক্ষতির আশঙ্কায় অনেক স্কুলে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বালক প্রেরণ সম্পর্কেও এই কদাচার ও কুপ্রথাই অবলম্বিত হইয়া থাকে তাই আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে, স্কুল হইতে শতের অধিক বালক প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হয়ত ২৫/৩০ জন উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহা হইতে ৫০ এর অনধিক বালক প্রেরিত হয়, সেখানে ৫/৭ জন উত্তীর্ণ হইলেই কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে বুক ফুলাইয়া বাহাদূরী লইয়া থাকেন। কবে ন ভাবের তিরোভাব হইবে ভগবান জানেন। যতদিন এ আবর্জ্জনা প্রক্ষালিত ও বিদূরিত না হয়, ততদিন এই ঢাকাতে সাধারণ শিক্ষার সমুন্নতর প্রত্যাশা দূরাশা মাত্র। দায়িত্ব জ্ঞান শূন্য অনুন্নতমনা লোকের হস্তে গুরুতর কার্য্যের ভার পড়িলে প্রায়শঃ এই রূপ অবস্থা দাড়াইয়া থাকে। যে জন জানে না, লজ্জায় শিখে না, অথচ জানায় যে জানি কিংবা অভিমান ভরে অন্যের পরামর্শে গ্রহ যে কুণ্ঠিত হয়, তাহার মুর্খতা কদাপি ঘোচে না, তাহার দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা।

২ মে, ১৮৯৭

**শিক্ষক সমিতি**

শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে গতকল্য অপরাহ্ন ২/১৫ মিনিটের সময় অত্রত্য সরকারি কলেজগৃহে স্থানীয় সরকারি ও বে-সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং দিব্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে লইয়া এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে বর্ত্তমান কালের শিক্ষাজীবী ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত, বিভাগীয় স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত হেড্‌মাষ্টার রায় সাহেব দূর্গাকুমার বসু, বাবু মোহনচাঁদ বসাক, বাবু গোপীমোহন বসাক, বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তিও উপস্থিত

ছিলেন। ঢাকা কলেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল ড. পি, কে, রায় মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, প্রথমে সভাপতি মহোদয় ডিরেক্টর বাহাদুরের আদেশ পত্র পাঠ করিয়া উপস্থিত শিক্ষকবর্গকে সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। বর্ত্তমানকালের শিক্ষকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানপ্রণালী শিক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্পেই ডিরেক্টর মহোদয় কলিকাতা, ঢাকা ও পাটনা এই তিন সহরে তিনটী চিরস্থায়ী সভা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। গতকল্য সভায় স্থানীয় প্রায় ৬০জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নেসভার কার্য্যবিবরণী সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১। চিরস্থায়ী সভার জন্য সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি নির্ব্বাচন এবং সভার অধিবেশন স্থান ও কার্য্যকাল নির্ণয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের[৮৩] প্রিন্সিপ্যাল কিংবা ঢাকা কলেজের কোনও সিনিয়ার প্রফেসার বা জগন্নাথ কলেজের কোনও সিনিয়ার প্রফেসার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ঢাকা কলেজের প্রফেসার বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এই সভার স্থায়ী সম্পাদক ও উকীল ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড্‌মাষ্টার বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুহ এই সভার স্থায়ী সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম ও তৃতীয় সপ্তাহে এই সভার দুইটী অধিবেশন হইবে। স্থানীয় সরকারী কলেজ কি কলেজিয়েট স্কুল কিংবা অন্য কোনও সুবিধাজনক স্থানে এই সভার স্থান নির্ণীত হইবে।

২। রচনা পাঠ—গতকল্য সভায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের বর্ত্তমান হেড্‌মাষ্টার বাবু রাজকুমার দাস, শিক্ষাদানপ্রণালী সম্বন্ধে, এক সুদীর্ঘ সারগর্ভ রচনা পাঠ করিয়াছেন। আগামী সভায় ঢাকা কলেজের সুযোগ্য প্রফেসার গণিতশাস্ত্রবিশারদ বাবু কালীপদ বসু ও ঢাকা ট্রেনিং স্কুলের সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন মহোদয়দ্বয় "পাটীগণিত শিক্ষা" সম্বন্ধে দুই খানি রচনা পাঠ করিবেন।

সভাপতি ডাক্তার রায় মহাশয় বক্তৃতাকালে, এইরূপ সভাস্থাপনের উদ্দেশ্য, সভার উপকারিতা এবং এদেশের শিক্ষকদিগের জন্য এইরূপ সভার আবশ্যকতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সভা কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হইয়া যদি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদানপ্রণালীর উন্নতিকল্পে যত্নবান হ'ন, তবে ইহার নিকট অনেক উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভরসা করি, ডাক্তার রায় মহাশয়ের ন্যায় কর্ম্মবীরের কর্ত্তৃত্বাধীনে সভার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। বারান্তরে এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার বাসনা রহিল।

৭ আগস্ট, ১৯০৪

### প্রতিবাদ সভা

গত রবিবার স্থানীয় জগন্নাথ-কলেজগৃহে, নিম্নশিক্ষার পুস্তকসমূহ প্রাদেশিক ভাষায় বিরচিত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদার্থ ঢাকার জনসাধারণের এ সভা আহূত হইয়াছিল। সভাস্থলে সর্ব্বশ্রেণীর অন্যূন তিন সহস্র ব্যক্তি যোগদান করিয়া উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গের অদ্বিতীয় লেখক, তীক্ষ্ণ-ধী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সভাপতি পদে বৃত হ'ন। ঢাকার নবাব মাননীয় সলিমুল্লা[৮৪] বাহাদুর সভায় উপস্থিত

হইতে না পারিয়া সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলেন। জয়দেবপুরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রায় যোগেশ চন্দ্র মিত্র বাহাদুর, রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর, বাবু আনন্দচন্দ্র রায়,[৮৫] বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু, বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ; বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বাবু কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত এম, এ, বাবু কালীপদ বসু এম, এ, বাবু বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ সাগ্রহে সভায় সমাগত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবের সমালোচনা ও উহার অনিষ্টকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, উকিল বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল, মুন্সী হেদায়েত বক্স প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। অতঃপর রায় বাহাদুর বিবিধ যুক্তির সহিত মীরগম্ভীরস্বরে, উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাখিয়া, আপন স্বাভাবিক মধুর শব্দবিন্যাস ও ওজস্বিতার সহিত প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তৃতি এবং সংস্কৃতের সহিত উহার নৈকট্য প্রদর্শন পূর্ব্ববক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভার বিবরণ কলিকাতার প্রধান ২ সংবাদপত্রেও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে সকল মন্তব্য পরিগৃহীত হইয়াছে, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা অবিকল মুদ্রিত হইল।

**RESOLUTIONS**

That this meeting while thanking the Govt. For its intention to give ususal training to the Children of the agricultural population of bengal in easy and common Bengali, would respectfully point out that the object can be attained is thout resorting to the local dialects, the text books being written in a simple form of the standard Bengali, understood all over the country.

Proposed by Rai Chandra
Kumar Datta Bahadur
Seconded by Kazi Rajiuddin.

2. That while there are no less than fifty Bengali dialects spoken in different parts of the country and widely different from one another, there is one standand Bengali—the universally acknowledged written language of the country which is actually used in correspondence by all classes of people, including even petty shopkeepers and agriculturists, and which may therefore form a general medium of instruction.

Proposed by Rai Jogesh Chandra
Mitra Bahadur.
Seconded by Babu Bisvesvar Banerji M. A.
Supported by pandit Prosanma
Chandra Vidyaratna.

3. That the writing of text books in the local dialects will tend to vulgarise and injure the nicety and punity of the Standand Bengali language which steadily growing in power and beauty and has aiready produced an important literature.

Proposed by Babu Ananda Chandra Roy.
Seconded by Babu Gobinda Chandra Bhowal.
Supported by Munshi Hadayet Bux.

4. That a copy of these resolutions be submitted to the Government. under the signature of the president of the meeting as a prayer, that the Governnent may in consideration of the opinion of all classes of the people of Bengal, be graciously pleased to use till now the common standard of written Bengali in all text books to be introduced inits primary schools.

Proposed by Babu Trailokya
Nath Bose M.A., B L.
Seconded by Babu Sarat Chandra
Chakravorty B.L.
Supported by Dr. Raj Kumar
Chakrovorty.

৯ এপ্রিল, ১৯০৫

## সংবাদাবলী

'শিক্ষক সমিতি' গতকল্য ২।। ঘটিকার সময় স্থানীয় সরকারী কলেজ গৃহে শিক্ষক-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম সভার তুলনায় গত কল্যের সভায় প্রাচীন কি নব্য শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম হইয়াছিল। পুরাতন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের মধ্যে ২/১ জনের বেশী সভায় উপস্থিত হ'ন নাই; নব্য শিক্ষকের সংখ্যাও ৪০/৪৫ জনের বেশী হইবে না। সভায় প্রথমতঃ গতপূর্ব্বসভার কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়; তৎপরে স্থানীয় ট্রেনিং স্কুলের হেড্‌মাস্টার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন এম, এ ও ঢাকা কলেজের স্বনামখ্যাত গণিতাধ্যাপক বাবু কালীপদ বসু এম এ্ মহোদয়দ্বয় পাটীগণিত শিক্ষা বিষয়ে ২ খানি সুদীর্ঘ রচনা পাঠ করেন। বিশ্বেশ্বর রচনা বড়ই দীর্ঘ হইয়াছিল। কালীপদ বাবুর রচনা আয়তনে তত দীর্ঘ না হইলেও, কিরূপে গণিত শিক্ষা শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক কৌতুকপূর্ণ উপায়াদির বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মোটের উপর, উভয়ের রচনাতেই শিখিবার অনেক নতুন বিষয় ছিল। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সভাপতি ডা: পি, কে, রায়, ও গণিতশাস্ত্র বিশারদ বাবু রাজকুমার সেন এম, এ মহোদয়দ্বয় সংক্ষেপে রচনা দুইখানির সমালোচনা করিয়াছিলেন। সভায় শিক্ষকের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। শিক্ষকগণ এত শীঘ্রই এ ব্যাপারে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলেন কি? স্বকীয় উন্নতি সাধনে বাঙ্গালী বাবু এমনই

উদ্যোগী বটে। আগামী সভায় স্থানীয় শিক্ষকগণের এইরূপ শৈথিল্য দেখিতে পাইলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এ সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় কথার আলোচনা করিতে হইবে।

২১ আগস্ট, ১৯০৪

## প্রাদেশিক মুসলমান-শিক্ষা-সমিতি

বিগত ৯ই ও ১০ই বৈশাখ লাকশ্যামের অন্তর্গত পশ্চিমগাঁয়ের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী নওয়াব চৌধুরী খাঁ বাহাদুর সাহেবের বাটীতে প্রাদেশিক মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পার্শিয়ান্ কন্‌সল্ মির্জা সুজাতালী বেগ খাঁ বাহাদুর সাহেবের সভাপতির কার্য্য করিবার কথা ছিল, এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিমগাঁও আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার শ্বাশুড়ী মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম সাহেবা নিতান্ত পীড়িত বলিয়া টেলিগ্রাম আসায় তিনি সমিতির কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বরাত্রিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নবি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি পশ্চিম গাঁয়ের জমিদার মৌলবী মহম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরী খাঁ বাহাদুর সাহেব উর্দ্দু ভাষাতে ডেলিগেট, মেম্বর ও দর্শকবৃন্দকে সাদর সভাষণ করিয়া তাহার নানা স্থানে ও দূরদেশ হইতে আসিয়া সমিতির কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

সতাধিক ডেলিগেট ২৩ শত মেম্বর ও প্রায় ১০০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে নোয়াখালীর উকিল মৌলবী বজলল বহিম বি, এল, খাঁ বাহাদুর ও জিলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত মাহিপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ চৌধুরী খাঁ বাহাদুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এতদিন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক জিলা হইতে জমিদার তালুকদার ও সম্ভ্রান্তলোক অনেকেই আসিয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীযুক্ত মির্জ্জা হবিব হোসেন ও তাঁহার ভ্রাতা মিঃ আজিজ ব্যারিষ্টার সাহেবের মেম মিসেস আজিজও সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মির্জা হবিব হোসেন বি, এ ও মেম সাহেব সুললিত ইংরাজী ভাষায় বিষয়ে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন।

কুমিল্লাতে একটি মুসলমান বোর্ডিং হাউস (ছাত্রাবাস) স্থাপন জন্য কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ছৈয়দ হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী সাহেব ৫০০০ টাকা, পশ্চিমগাঁয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ আলীনওয়ার খাঁ বাহাদুর সাহেব ২০০০ টাকা, শ্রীযুক্ত ছৈয়দ আবদুল জব্বর জমিদার সাহেব ১০০০ টাকা ও চাঁদপুরের সুপ্রসিদ্ধ আমজাদ পাটারী সাহেব ২৫০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সভাস্থলে প্রায় ৯৫০০টাকা দস্তখত হইয়াছে তন্মধ্যে কতক টাকা সেই সময় নগদ আদায় হইয়াছে।

### প্রথম প্রস্তাব

সম্প্রতি পঞ্জাবে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য পঞ্জাববাসীর যে বিপৎপাত হইয়াছে, তাহাতে এই সমিতি আপন গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং সেন্ট্রাল কমিটির ধনাধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হউক যে, ঐ সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত পঞ্জাববাসীর উপকারার্থ এই সমিতি উপলক্ষে এখানে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা যথাস্থানে তিনি যথা সময়ে পাঠাইয়া দিবেন।

### দ্বিতীয় প্রস্তাব

এই সমিতি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য মফস্বলবাসীকে উৎসাহিত করিয়া স্থানীয় সমিতি সংগঠনের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে শীঘ্র সচেষ্ট হওয়া এবং সাহায্যের উপযুক্ত স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি ও ছাত্রগণকে সাহায্য করিবার জন্য "জেলাস্থ শিক্ষা তহবিল" নামে ধনভাণ্ডার স্থাপন করা শীঘ্র আবশ্যক বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

### তৃতীয় প্রস্তাব

এই সমিতি জেলাস্থ শিক্ষা তহবিলের স্থায়িত্ব বিধান এবং পুষ্টি সাধনের জন্য "মুষ্টি ভিক্ষা" গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার এবং তাহা হইতে উৎপন্ন আয় উক্ত তহবিলে প্রদান করিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

### চতুর্থ প্রস্তাব

সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৬৫৮ রেজলিউশানে কৃষক সন্তানের শিক্ষা বিধানের জন্য যে ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল স্থানীয় কথোপকথনের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও ইংরেজী আদর্শ পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা বাদ দিয়া এই সমিতি মোটের উপর উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছেন এবং ইহাও অভিপ্রায় জানাইতেছেন যে বঙ্গদেশের সরল সহজ ও বিশুদ্ধ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করাইবার ব্যবস্থা করিলে, গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য সাধন হইবে।

### পঞ্চম প্রস্তাব

মুসলমান ছাত্রগণকে একালের প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিষয়ে উপযোগী করিয়া শিক্ষিত করিতে হইলে, আবরী ভাষায় মাদ্রাসাগুলির উচ্চশ্রেণীতে ইংরাজী এবং নিম্নশ্রেণীতে বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সমিতি বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।

### ষষ্ঠ প্রস্তাব

মুসলমান বালকের ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখী এই সমিতির মতে বিশেষ আবশ্যক এবং প্রত্যেক মুসলমান অসাহায্যকৃত প্রাইমেরী ও সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে প্রত্যহ, অভাব পক্ষে এক ঘন্টা, ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিপালক, অধ্যক্ষ বা ট্রাষ্টী দ্বারা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়, তাহা করা এই সমিতি অতীব সমীচীন বলিয়া মনে করেন।

### সপ্তম প্রস্তাব

মুসলমান ছাত্রবর্গকে অধিকতর শৃঙ্খলাসম্পন্ন এবং তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি স্থিরচিত্ত করিবার জন্য এই সমিতি, গবর্ণমেন্টের স্থাপিত বা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে পরিচালিত মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিতে স্কুল কলেজের ন্যায় ট্রানস্ফার সার্টিফিকেট লইবার প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন এবং এ বিষয়ে যে শিথিল নিয়ম প্রচলিত আছে তৎপ্রতি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহেন। (উদ্ধৃত)

৩০ এপ্রিল, ১৯০৫

**সংবাদাবলী**

'ছাত্রসভা' বঙ্গবিভাগ[৮৬] ব্যাপারে ব্যথিতহৃদয়ে অধ্যয়নার্থী বালকবৃন্দ গত সপ্তাহে ক্রমে ৩টী প্রকাশ্য সভার অনুষ্ঠান করিয়াছে। একটী জগন্নাথ কলেজে উক্ত কলেজ ও তৎসংসৃষ্ট ছাত্রদিগকর্ত্তৃক, একটী কলেজিয়েট স্কুলে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক, এবং অপরটী ছাত্রগণ সকল বিদ্যালয়ের বালকগণের সমবেতযত্নে স্থানীয় উকিল-ইনষ্টিটিউশনগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। সকলেরই একমাত্র কথা, একমাত্র প্রতিজ্ঞা, বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত, কেহই সাধ্যমত বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিবে না ; পরিচিত এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে স্বদেশীয় সামগ্রী ব্যবহারে প্রবৃত্তি লওয়াইতে হইবে।" কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিবে, তাহার নিদর্শনস্বরূপ নাকি তাহাদিগকে একটী বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে বলিয়া তাহারা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। উল্লিখিত সভাত্রয়ের শেষোক্ত সভায়, বিশিষ্টভাবে আর একটী সভাধিবেশনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা বিদ্যার্থিবৃন্দের স্বদেশহিতৈষনরূপ এই সাধু সংকল্পের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিতেছি। জগন্নাথ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিমোহন বসাক এম এ, এ ব্যাপারে বালকগণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রবর্ত্তকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির প্রবর্ত্তনায় ও কর্ত্তৃত্বে আশা করি উদ্যোগী ছাত্রগণ এই পবিত্র ব্রত উদযাপনে সমর্থ হইবে।

১৩ আগস্ট, ১৯০৫

## ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

**ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল**

আজকাল আমরা উক্ত নর্ম্মাল স্কুলের এই একটি দুর্ণাম শুনিতে পাইতেছি যে তাহার আধুনিক শিক্ষিতেরা উত্তম বাঙ্গলা লিখিতে জানেন না। যথারীতি ১০টা ছত্র শুদ্ধ করিয়া লিখিতেও অনেকে গলদঘর্ম্ম কলেবর হন। ব্যকরণ অশুদ্ধির কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের লিখিত পত্রাদিতে সচরাচর এত বর্ণশুদ্ধি ঘটে যে, তাহা দেখিয়া কেহ এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন না, তাঁহারা কোনদিন কোন স্কুলে যথানিয়মে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।...

৯ জুলাই, ১৮৬৩

**ঢাকা ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুল**

নানা কারণে অনেককেই ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের প্রতি বড় অনুরাগ সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এতৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের অযথোচিত নিয়ম বিধানই এই ... প্রধান কারণ। নিয়ম আছে, ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ষ্ট্যাম্প কাগজে এই মর্ম্মে এক এ:বার লিখিয়া দিতে হইবে, "এই বিদ্যালয়ে এক বর্ষকাল অধ্যায়ন করিয়া আমি অন্যূন তিন বৎসরকাল শিক্ষকতা করিব। কর্ত্তৃপক্ষ যখন যে স্থানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়া পাঠান, বিনা আপত্তিতে সেই স্থানেই গমন করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞাস্বরূপ কার্য্য না করি, গবর্ণমেন্টকে দুইশত টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিব।" কিন্তু শিক্ষিত ছাত্রদিগের কর্ম্ম দেয়ার বিষয়ে কোন সুদৃঢ় নিয়ম নাই। গত বর্ষে যে সকল ছাত্র নিয়মিত কাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণ বহির্গত

হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই আজি পর্যন্ত কর্ম্ম পাইতে পারেন নাই। প্রতিজ্ঞা অনুরোধে তাহারা কর্ম্মান্তরও গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ইহা কি তাহাদিগের পক্ষে সামান্য ক্ষতি? কর্ত্তৃপক্ষ যেমন গবর্ণমেন্টের কাজ বুঝিয়া নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহাদিগেরও যাহাতে হানি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল ছাত্র শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে অক্ষমতাহেতু কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যয়ন করিতে না পারেন, সাধারণত তাঁহারাই বৃত্তিলাভ ও সত্বর চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশায় ইংরেজী নর্ম্মাল স্কুলে ভর্তি হইয়া থাকেন। এখানে যদি তাঁহারা সেই প্রত্যাশানুরূপ কাজ পাইতে না পারিলেন, একবর্ষকাল কথঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই যদি তাঁহাদিগকে হাতপা গুটাইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হইল, ভবিষ্যতে আর কাহারও ইহাতে প্রবেশ করিতে আগ্রহ জন্মিবে কেন? আমরা কেবল অনুমান করিয়া এরূপ বলিতেছি না। গতবর্ষের ভাবগতি দেখিয়া এবার অতি অল্প ব্যক্তিই ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছেন। নিয়ম করা হইয়াছে, এই স্কুলে অনেকেই বেতন দিয়া পড়িতে পারিবেন, ১২ জন ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া এবং তদতিরিক্ত কয়েকজন অবৈতনিকরূপে শিক্ষা করিতে পারিবেন, এবং নিম্নশ্রেণীস্থ স্কুল মাষ্টারগণ ইহাতে শিক্ষা করিয়া গিয়া পুনরায় পূর্ব্ব কার্য লাভ করিতে পারিবেন। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকতা কার্য্যে ইহাদিগেরই অধিকার দাবী থাকিবে। আমরা প্রথমত বিবেচনা করিয়াছিলাম এই সকল প্রলোভনে অনেকেই ইহাতে শিক্ষার্থ আগমন করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক অতি অল্প ব্যক্তিই এই বিদ্যালয় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে ঢাকা ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলে মোট ৭ জন মাত্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। শিক্ষকতা ছাড়িয়া এবার একব্যক্তিও এখানে সমাগত হন নাই। এক্ষণ ইহাতে যে কয়েকজন ছাত্র বিদ্যমান আছেন তাঁহারাও নিম্নলিখিত কারণে নিতান্ত বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন।

এ বর্ষের যেমন আরম্ভ হইয়া অবধি আজি পর্যন্ত উক্ত স্কুলের ছাত্রদিগকে ইংরাজী ভাষায়ই প্রায় যাবতীয় পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে শুনা যায়, নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয় ডিরেক্টর সাহেবের বাচনিক অবগত হইয়াছেন, সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই উক্ত ছাত্রদিগকে বাঙ্গলা নর্ম্মাল স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত এক প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে হইবে। অঙ্ক, ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত প্রভৃতি যাহারা বরাবর ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সমস্যা তাঁহাদিগের বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া সহজ কথা নয়। পূর্ব্বাবধি অভ্যাস না থাকিলে অতিবড় কৃতবিদ্য লোকেও বোধ হয় এরূপ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন না। সংজ্ঞার অনবগতি ও অঙ্কপাতের অনভ্যাস প্রযুক্ত অবশ্যই ইংরাজী ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগকে বাঙ্গলা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইতে হইবে। যদিও তাঁহারা এই কয়েক মাস বসিয়া এ বিষয়ে অভ্যাস করিতে থাকেন, তথাপি তাহাদিগের চিরন্তন অভ্যাস পরিহার নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গলা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগের সহিত পরীক্ষা দিয়া তুল্যতা লাভ করিতে পারিবেন না। যাহা–হউক যদি কর্ত্তৃপক্ষের যথার্থই উক্তরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকে, শিক্ষকদিগকে প্রকাশ্যরূপে তাহা জ্ঞাপন করিয়া অতি সত্বর ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষাদান রীতি পরিবর্তিত করিয়া দিউন। অন্ততঃ এখন হইতেও যদি উক্ত স্কুলের ছাত্রদিগকে বাঙ্গলা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, আগামী পরীক্ষার ফল অত্যন্ত অসন্তোষ জনক না হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় বাঙ্গলা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগকে যে সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা

দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সময়ে ইংরাজী ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষা দিয়া অন্যান্য সময়ে উভয় ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগকে একত্র শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উক্ত উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সুসিদ্ধ হইতে পারে। এবং ইংরাজী ডিপার্টমেন্টের বর্তমান ছাত্রদিগেরও বিরক্তচিত্ততা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হয়। পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, যদি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে চান, হয় একবার লওয়ার নিয়ম একবারে উঠাইয়া দিউন, নয় নিয়মিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে অবশ্যই শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে, এইরূপ সুদৃঢ় নিয়ম বিধান করুন। অন্যথা এ বিদ্যালয়ের অসদ্ভাব, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অকল্যাণকর হইবে না।

১৫ এপ্রিল, ১৮৬৬

**সংবাদাবলী**

শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম অত্র্যত্য [ কুমিল্লা ] নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণ তাহাদের প্রধান পণ্ডিত জগদীশ তর্কা লঙ্কারের দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, স্কুলে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন এবং তাহারা জগদীশ বাবুর শিক্ষা প্রণালী ও স্বভাব চরিত্রের দোষ উদঘাটন করিয়া এক আবেদন পত্র শিক্ষা সংক্রান্ত ডিরেক্টরও ইনস্পেক্টরের নিটক পাঠাইয়াছেন। স্কুলে না যাওয়ার বিষয় টেলিগ্রাফে ইনেস্পক্টরের নিকট সংবাদ জানাইয়াছেন। যে পর্যন্ত উক্ত বিষয়ের মীমাংসা না হয় সে পর্যন্ত আমরা তৎসম্পর্কে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাই না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি কর্ত্তৃপক্ষের উক্ত বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ বিধান করা কর্ত্তব্য। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এ প্রকার কলহ ভয়ানক বিষয়। যখন সমুদায় ছাত্রগণ বিদ্রোহী হইয়াছেন তখন অবশ্যই ইহার নিগূঢ় কারণ আছে।

১৭ জুন, ১৮৬৬

**সংবাদাবলী**

জেন্দাবাহারের গলির ধারে একজন মিশনরি একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এই স্কুলটি অবৈতনিক। ঢাকার সৌভাগ্য বলিতে হয়।

২৬ আগস্ট, ১৮৬৬

**সংবাদাবলী**

শ্রীযুক্ত খাজে আবদুল গনি মিঞা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত খাজে আসানুল্লা বলিয়াছেন, প্রত্যেক সোমবার তিনি তাঁহাদের স্কুলে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং মাসের শেষে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কার দান করিবেন। ধনি সন্তানদিগের এইরূপ বিদ্যোৎসাহিতা নিতান্ত আহলাদের বিষয়।

২৬ আগস্ট, ১৮৬৬

**সংবাদাবলী**

খাজে আবদুল গনি মিঞা সাহেবের স্কুলে উচ্চশ্রেণীস্থ কোন ছাত্র আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে লিখিয়াছেন, উক্ত স্কুলে উত্তর দিকস্থ দ্বিতল হাবেলীর বারবিলাসিনীদিগের দ্বারা

স্কুলের ছাত্রদিগের পবিত্র চরিত্র ক্রমশ কলঙ্কিত হইতেছে। বারবিলাসিনীদিগের যেরূপ মোহিনী শক্তি আছে, তাহাতে এরূপ ঘটনা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা অনুরোধ করি গনিমিঞা সাহেব হয় স্কুলটিকে স্থানান্তরিত করুন নয় বারাঙ্গনাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া ছাত্রদিগের স্খলনোন্মুখ চরিত্র প্রকৃতিস্থ করিতে যত্নবান হউন। .

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬

## ঢাকা ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুল

আমরা যখনই এই স্কুলের বিষয় চিন্তা করি, তখনই নিরতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হই। এই স্কুলের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের অল্প অর্থ ব্যয়িত হইতেছে না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বৃথায় যাইতেছে। আমরা কি নিমিত্ত এরূপ বলিতেছি, এই বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষার ফল জানিতে পারিলে পাঠকগণ তাহা কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ভবিষ্যজ্ঞের ন্যায় এখনই বলিয়া রাখিতেছি, এবার এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা অনেক বিষয়েই শূণ্য ফললাভ করিবেন। আমরা জানি, উহাতে যে পরিমাণ পাঠ্য অবধারিত আছে, এবার তাহার অর্দ্ধাংশও অধ্যাপিত হয় নাই। ইহা কি—কর্ত্তৃপক্ষের অবিবেচনার না শিক্ষক বা শিক্ষা প্রণালীর ত্রুটির ফল, আমরা তাহা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারিনা। যাহা হউক যদিও এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক যথোচিত মনোযোগ সহকারে শিক্ষাদান না করিয়া থাকেন, যদিও তাহার শিক্ষা প্রণালীতে কোন প্রকার মারাত্মক ত্রুটি থাকে, তথাপি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, এই বিদ্যালয়ের যে পরিমাণ পাঠ্য নির্দিষ্ট আছে, এক বৎসর কাল মধ্যে তাহার অধ্যাপনা করা কঠিন। এই নিমিত্ত সমবৃদ্ধি অথবা পঠ্য ন্যূন করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু পাঠ ন্যূন করিলে যে উদ্দেশ্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি দুরুহ হইয়া উঠিবে। অতএব আমরা ভূত পূর্ব্ব অফিসিয়েটীং স্কুল ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বেলেট সাহেবের সহিত এক বাক্য হইয়া অনুরোধ করি, ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া অত্রত্য শিক্ষার্থীদিগের অন্তত দুই বৎসর কাল শিক্ষা করিবার নিয়ম হউক। অন্যথা এই বিদ্যালয় সর্ব্বদাই একটি বিরক্তি স্থান হইয়া থাকিবে। ভরসা করি, বর্তমান স্কুলে ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবও এ বিষয়ে মনোযোগবান হইবেন।

আমরা উক্ত বিদ্যালয়ের এবারকার বার্ষিক পরীক্ষণ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আগামিকল্য এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। গতকল্য কর্ত্তৃপক্ষের চিঠি আসিয়াছে, ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগকে সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গলা নর্ম্মাল স্কুলের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর যাবতীয় পাঠ্য বিষয়েই তুল্যরূপে পরীক্ষা দিতে হইবে। অধিকন্তু কেবল তাহাদিগের ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষা হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন কোথায় ঘুমাইয়া ছিলেন (।) আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একতঃ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এখন এমন অনেক বিষয়ে (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূমিপরিমাণ, শিল্পবিদ্যা ও জ্যোতিবিদ্যা ইত্যাদি) পরীক্ষা দিতে হইবে যাহা তাঁহাদিগের জন্মাবচ্ছিন্নে একদিনও শিক্ষা করা হয় নাই। তাহাতে যদি আবার উক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয়, তবেই প্রতুল হইবে। ভূগোল ইতিহাস গণিতাদি এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ইংরেজীতেই শিক্ষা হইয়াছে, এখন বাঙ্গলাভাষায় সেই সমুদায়ের প্রশ্নোত্তর লেখা কি সহজ ব্যাপার? কোন্ ব্যক্তি এক ভাষায় কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া সহসা ভাষান্তরে তাহার পরীক্ষা দিতে পারিবেন? এরূপ ব্যবহার কি কর্ত্তৃপক্ষের

নিতান্ত ঔদাসীন্য বা অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ নহে? কর্ত্তৃপক্ষ যদি স্কুলটি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান, এরূপ খেলাখেলী পরিত্যাগ করিয়া এতৎ সম্বন্ধে কোন স্থিরতর নিয়ম অবধারিত করিয়া দিউন। যাহাতে শিক্ষার্থীরা কিছু অধিক কাল অবস্থান করিয়া সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, এক্ষণ স্কুল পরিত্যাগ করিয়াই কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহার সদুপায় বিধান্ করুন অন্যাথা টিকে উঠাইয়া দিলেও কোন হানি দেখা যায় না।

১৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৬

## ঢাকা পোগস স্কুল

আমরা গত সপ্তাহেই প্রকাশ করিয়াছি, ঢাকা পোগস্ স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল এবার অতি সন্তোষজনক হইয়াছে। ৩৫ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন ২৭ জনই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৮ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা সংপ্রতি ফলের লিষ্ট দেখিয়া আরো সন্তোষ লাভ করিলাম। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে যে ৮ জন অনুত্তীর্ণ রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের ৬ জন ইতিহাসে, একজন গণিত, একজন বাঙ্গলা ভাষায় এবং একমাত্র ইংরাজী সাহিত্যে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় ৩৫ জনের মধ্যে একটি ভিন্ন সমুদায়ের কতৃকার্য্যতা লাভ সামান্য কথা নয়। এজন্য তদধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন বসাক মহাশয় সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

গোপীমোহন বাবুকে আমরা পূর্ব্বাবধিই একজন সুযোগ্য ও সুদক্ষ শিক্ষক বলিয়া জানি। ইহাঁরই শিক্ষা নৈপুণ্যে ঢাকা ব্রাঞ্চস্কুল (এক্ষণ যাহা বাঙ্গলা বাজার স্কুল বলিয়া অভিহিত হয়) অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া ছিল। তাহাতেই ইহাঁর পরিচয় পাইয়া শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অধিকতর বেতনে বরিশাল গবর্ণমেন্ট স্কুলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা পোগস্ স্কুলে কোন নিম্নতর শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। ক্রমে উন্নত হইয়া এক্ষণ দ্বিতীয় শিক্ষকতায় ইন্‌চার্জ্জ স্বরূপ আছেন। প্রায় দুই বৎসর হইল ইনি পোগস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় এই, স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এন, পি, পোগস্ সাহেব আজিও ইহাকে প্রধান শিক্ষকের পদে স্থিরতররূপে নিযুক্ত করিতেছেন না। বর্ত্তমান স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেব এই নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধও করিয়াছেন, স্কুল ফাণ্ডের যথেষ্ট টাকা আছে, তথাপি কি জন্য তিনি এ বিষয়ে কাল গৌণ করিতেছেন, বলিতে পারি না। বোধ হয় গোপীমোহন বাবুর বিজ্ঞতা বিষয়ে সংশ্রব থাকাই এরূপ করিবার কারণ। যাহা হউক এবারকার ফল দর্শনে অবশ্যই তাঁহার সে সংশ্রয় দুরগত হইয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি পোগস্ সাহেব বি এ, এম, এর আশা পরিত্যাগ করিয়া গোপীমোহন বাবুকেই প্রধান শিক্ষকের পদে স্থিরতররূপে নিযুক্ত করিবেন। আমরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি গোপীমোহন বাবুর অধ্যাপনায় এবং শিক্ষকোচিত সদ্ব্যবহারাদিতে ছাত্রগণ সবিশেষ সন্তুষ্ট আছেন। অতএব তিনি স্থিরতররূপে নিয়োজিত হইলে তাহারা সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। অন্যথা সকলেরই বিরাগ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

১৩ জানুয়ারি, ১৮৭৭

## ঢাকাস্থ যুবতী বিদ্যালয়

ঢাকার যুবতীবিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার দূষিত সংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন, উহা কেবল নাম মাত্র, উহাতে কেহই অধ্যায়ন করে না। কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মিছামিছি কয়েক জন যুবতীর নাম লিখিয়া একখানি রেজেষ্টর বহি রাখা হয়। কেহ ২ এরূপও মনে করেন, উক্ত বিদ্যালয়ে কয়েকটি যুবতী একত্রিত হন বটে, কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষাকরণোদ্দেশ্যে নয়। এটি সাধারণের বিশেষত কেবল হাস্য পরিহাস ও আহলাদ আমোদ করিয়া থাকেন। এটি সাধারণের বিশেষত পুরুষ জাতির দর্শনীয় নয় বলিয়াই এতৎসম্বন্ধে নানা লোকের নানা সংস্কার জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। এতদিন এ বিষয়ে আমাদের বাক্য ব্যয় করা তত উচিত বোধ হয় নাই। কিন্তু সংপ্রতি যেরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আবান্মুখ থাকা উচিত বোধ হইতেছে না। সেই ঘটনাটী এই অত্রত্য কোন ব্যক্তি আগমাদিগের কমিস্যনর সাহেবকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, "যুবতী বিদ্যালয়ের সৰ্ব্বৈমিথ্যা। উহা কেবল গবর্ণমেন্ট হইতে কতকগুলি টাকা গ্রহণ করিবার একটি অভিসন্ধি মাত্র। বাস্তবিক উহাতে শিক্ষার্থিনী নাই, কোন ইউরোপীয়া বিদ্যোৎসাহিনী মহিলা ঐ বিদ্যালয় দেখিতে চাহিলে পূর্ব্বে তাহার তত্ত্ব পাইয়া কতগুলি যুবতীকে শিক্ষার্থিনীরূপে প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। তাঁহারা (ইউরোপীয়ারা) পুস্তকধারিণী যুবতীদিগকে দেখিয়াই মনে করেন, যথার্থই বুঝি তাহার শিক্ষার্থ তথায় সমবেত হইয়া থাকে। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা জানেনা, সুতরাং অতি সহজেই প্রতারিত হন।" কমিস্যনর সাহেবের প্রত্যয়ার্থ ইহাও বলা হইয়াছে, "যদি যুবতী বিদ্যালয়টি প্রতারণাকাণ্ডই না হইবে, দর্শনার্থিনীদিগের পূর্ব্ব তত্ত্ব দিবার নিয়ম প্রচলিত থাকিবে কেন? পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া যাওয়ার নিয়ম না থাকাতে কি এই অর্থ সহজেই উদ্ভাবিত হয় না, ঐ অবকাশে [ অস্পষ্ট ] যুবতীকে একত্র করিয়া ছাত্রী স্বরূপ প্রদর্শন করা হয়? কমিস্যনর সাহেব এইরূপ কথায় বিশ্বাস করিয়া স্কুল ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়কে উহার সত্যাসত্যতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ডেপুটি বাবু কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন, এবং কমিস্যনর সাহেবের সংস্কারই বা তাহাতে কতদূর অপনীত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলিত পারি না।

যিনি যাহাই বলুন, যুবতীবিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ নই। উহাতে এরূপ কোন ২ লোক সংসৃষ্ট আছেন, যাঁহাদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্তও আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহাদিগের কেহ ২ নিজ হইতে এজন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য প্রদান করেন, এবং স্থানীয় চাঁদা ২০ কুড়ি। কিন্তু মাসে ২ গড়ে প্রায় ৬০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি মাসেই কোন ২ ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ব্যয় প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা এতদুদ্দেশ্য আপনা হইতে ব্যয় স্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা প্রবঞ্চনোদ্দেশ্যে উহার সংস্থাপন করিয়াছেন, একথা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? অধিকন্তু আমরা এই বলিতে পারি, ভূতপূর্ব্ব জজ ও ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের মেম প্রায়ই এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শন করিতেন, কলেজের প্রিন্সিপল শ্রীযুক্ত ব্রেনেন্ট সাহেবের মেম এবং অধুনাতন জজ সাহেবের মেমও মধ্যে ২ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা (বাঙ্গলা ভাষা না জানিলেও) কি এমনই নির্ব্বোধ বিদ্যালয়টি ফাঁকি কি যথার্থ তাহা বুঝিতে পারেন নাই?[৮৭] ...

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭

## ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল

আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছে উক্ত বিদ্যালয়টি সত্বরই উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ঢাকার ভূতপুর্ব্ব ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নিরতিশয় যত্নে তৎকালীন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর এল মার্টিন সাহেবের উৎসাহে এডাল্টট ফিমেল স্কুলও স্থাপিত হইয়াছিল। ইতপূর্ব্ব এডেলট ফিমেল স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। সংপ্রতি নর্ম্মাল স্কুলটিরও উঠিয়া যাওয়ার কথা শুনা যাইতেছে। ইহ; ঢাকার একান্ত দুর্ভাগ্য এবং আমাদিগের নিতান্ত আক্ষেপের কারণ সন্দেহ নাই। স্থানীয় লোকের অনুৎসাহ এবং অযত্নই ঢাকা এডালট ফিমেল স্কুল উঠিবার প্রকৃত কারণ। কিন্তু যদিও আমরা নিশ্চিত রূপে অবগত হইতে পারি নাই, যে পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে এই বোধ হয় বর্ত্তমান স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুত সি বি ক্লার্ক সাহেবের কুসংস্কারই ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল উঠিবার প্রধান কারণ। কাহারো কাহারো কথা শুনিয়া হউক অথবা আপনা হইতেই হউক তাঁহার সুদৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রীদিগের মধ্যে অনেকে সচ্চরিত্রা নয় তাহারা সুশিক্ষিতা হইলেও তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনের সম্ভাবনা অল্প সুতরাং এই বিদ্যালয় দ্বারা কোন উপকার হইতেছে না নিরর্থক গবর্ণমেন্টের কতকগুলি অর্থের বিনাশ হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় ক্লার্ক সাহেবের এই সংস্কার তাঁহাতেই বদ্ধ হইয়া রয় নাই, ডিরেক্টর ও লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরকে পর্যন্ত উহাতে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদিগেরও নাকি ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল এবালিস কারিয়া ফেলা অভিপ্রেত হইয়াছে। ক্লার্ক সাহেব কাহারো ২ নিকটে স্পষ্টাক্ষরেই ব্যক্ত করিয়াছেন আগামী জানুয়ারী হইতে ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল উঠিয়া যাইবে। এক কারণে কর্তৃপক্ষের এই কুমতি জন্মিয়াছে। আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, আমাদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস এই ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল উঠাইয়া দিলে এত (দাঞ্চলের) অঙ্কুরোদগম স্ত্রী শিক্ষা দানের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। আমরা কিয়দ্দিন উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত সবিশেষ সম্বন্ধ ছিলাম তদ্বশত যতদূর জানিতে পাইয়াছি তাহাতে একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই বলিতে পারি ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবের সংস্কার ভ্রমমূলক। ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলে একটিও অসচ্চরিত্রা ছাত্রী আছে আমরা এরূপ জানিনা। দেশীয় খৃষ্টয়ানদিগের যে সকল স্ত্রীরা এই বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগের সচ্চরিত্রতা বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। তবে বৈরাগিনী ছাত্রীদিগের পূর্ব্ব চরিত্রে অনেকে সংশ্রয় প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদিগের বর্ত্তমান চরিত্র দূষিত একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। বিদ্বেষীরা যাহাই বলুক না কেন অন্ধকার হইতে যত লোষ্ঠ্র নিক্ষেপই করুক না কেন। বোধ হয়না কেঁহ সাহসী হইয়া প্রকাশ্যরূপে এরূপ বলিতে পারিবে অমূক ছাত্রীর চরিত্র ভাল নয়। এ বিষয় লইয়া আমরা অধিক বাগবিতণ্ডা করিতে চাইনা। আমাদিগের এই মাত্র কর্ত্তব্য, যদি সত্য সত্যই ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের কোন কোন ছাত্রীর চরিত্রে দোষ থাকে, সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা অবগত হইয়া কেবল সেই সকল দূষিত চরিত্রা ছাত্রীদিগেকেই স্কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

দুই একটি ছাত্রীর দোষে স্কুলের প্রাণদণ্ড কখনই কর্ত্তব্য নয়। অঙ্গুলিতে ঘা হইলে তজ্জন্য কে শিরোচ্ছেদন করিয়া থাকে। ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের দ্বারা কোন উপকার হইতেছে না একথার অর্থ কি? ছাত্রদিগের শিক্ষান্নোতি হইতেছেনা, কি সাধারন্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হইতেছেনা? আমরা স্বীকার করি, যে সুমহান উপকার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে

নানা কারণে ততদূর উপকার হয় নাই সহসা হওয়াও অসম্ভাবিত ; কিন্তু যতদূর হইয়াছে তাহাও সামান্য নয়। দর্শকেরা এই বিদ্যালয় দর্শন করিয়া যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তৎপাঠে জানা যায় অধিকাংশ দর্শকই সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সরাসরি [ অস্পষ্ট ] বীডন, মিসেস উড্রো ডাইরেক্টর, একটিনসন এবং বর্ত্তমান লেপ্টেনেন্ট বাহাদুর উইলিয়াম গ্রেমেহোদয়, ব্যরিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের উন্নতি দর্শন করিয়া যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কেহই বলিতে পারেন না, ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রীদিগের শিক্ষান্নোতি হয় নাই।...যাহা হউক আমরা সবিশেষ রূপে জানিয়া বলিতেছি। ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রীদিগের দ্বারা ঢাকার সাধারণ স্ত্রী শিক্ষার বিলক্ষণ সহায়তা হইতেছে। এই স্কুলের ছাত্রীরা অনেক ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে যাইয়া যুবতী যুবতী মহিলাদিগকে লেখা পড়া ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। লিবিঙ্গষ্টোন সাহেবের পত্নী এবং মিসেস সিমসন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের সাহায্যে ঢাকায় "জাননা সিষ্টাম" (পুরস্ত্রী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া কত লোকের উপকাব করিয়া শেষ করা যায়না। এই স্কুলের ছাত্রীরা অনেক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়াতেও অনেক উপকার হইতেছে। আজিকালি অনেকস্থলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে বটে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়ত্রীর অভাবে অচিরাৎ তাহা উঠিয়া যাইতেছে। ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল সেই অভাব নিরাকারণের একমাত্র স্থান। এই আলোচনা করিয়াই মিস মেরী কার্পেন্টর এদেশে বাহুল্য রূপে ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিতে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন তদনুসারে সংপ্রতি গবর্ণমেন্ট প্রধান ২ কতিপয় স্থানে নূতন নূতন ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনে হইয়া এক্ষণ উঠিয়া যাওয়ার প্রস্তাব হইতেছে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি যদি ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের কোন দোষ থাকে, তাহা দূরীভূত করিয়া যাহাতে ইহা স্থায়ী থাকিতে তাহারই চেষ্টা করুন। বিদ্যালয়টি একবারে উঠাইয়া দিলে অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্ট লাভ হইবেনা।[৮৮]

৪ এপ্রিল, ১৮৬৯

### ঢাকায় চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব

এবারকার বার্ষিক রিপোর্ট উপলক্ষে এতদঞ্চলীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য কারকেরা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে ক্রমে স্বাভি প্রায় ব্যক্ত করিতে আমাদিগের বাসনা আছে। অদ্য তন্মধ্যে কেবল চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন প্রস্তাবে আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা যাইতেছে।—

বিক্রমপুরের স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং ঢাকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন এতদূভয়েই এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিয়াছেন ঢাকায় একটি "মেডিকেল স্কুল" অর্থাৎ চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। অধুনা সর্ব্বস্থানেই নানা রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে অধিকাংশ সময়েই কোন না কোন রোগের আধিক্য দৃষ্ট না হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষোভ এই, অধিকাংশ গ্রামেই চিকিৎসা প্রাপ্তির সুবিধা নাই। এই নিমিত্ত কত লোককে যে বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। অতএব যাহাতে ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীরা বিনা

চিকিৎসায় অকালে মারা না পড়ে—অন্ততঃ সাধারণ রোগ সমূহের প্রতীকার হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রামেরই এরূপ অর্থ সঙ্গতি নাই, যেখানে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে এক একটি সামান্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তত্তৎ স্থানীয় লোকসমূহের রোগাপণয়ন চেষ্টা হইতে পারে। এজন্য এমন উপায় ধারণ করা আবশ্যক যাহা অনুষ্ঠিত হইলে গ্রাম্য লোকেরা স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসক পাইতে পারে। এতৎ সৌকর্য্যর্থেই তাহারা ঢাকায় একটি সামান্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। শুনিলাম স্কুল ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব উক্ত প্রস্তাবের সারাংশ তাহার রিপোর্টে উদধৃত করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন।

স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর বৈকুণ্ঠ বাবু উল্লিখিত প্রস্তাব কেবল তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটও স্বতন্ত্ররূপে ঐ প্রস্তাব করিয়াছেন। শুনিয়া আহলাদিত হইলাম, মাজিষ্ট্রেট গ্রেহাম সাহেবও নাকি উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া কমিস্যনর সাহেবকে উক্ত প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেন। কি উপায়ে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে, বৈকুণ্ঠ বাবু তাহা প্রদর্শন করিতেও ক্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, ঢাকা বিভাগের প্রত্যেক স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিটির (যাঁহাদিগের সহিত এই বিদ্যালয়ের সবিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে) উচিত, তাহারা এতৎসংক্রান্ত ব্যয়ের আংশিক ভার গ্রহণ করেন। বৈকুণ্ঠ বাবু বলেন, "ঢাকা মিউনিসিপল খণ্ড হইতে মাসিক একশত, বরিশাল হইতে ৫০, ময়মনসিংহ হইতে ৫০, শ্রীহট্ট হইতে ২৫ এবং ফরিদপুর হইতে ২৫ এই আড়াই শত এবং আনুমানিক ছাত্র বেতন দেড়শত মোট এই চারিশত টাকা স্থানীয় আয় হইলে গবর্ণমেন্ট আর চারিশত টাকা দিবেন। তবেই মাসিক ৮০০ টাকা আয় হইবে। ইহা দ্বারাই প্রস্তাবিত চিকিৎসাবিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে। তিনি আরো বলেন, অত্রত্য মিটফোর্ড হস্পিটলের একাংশ (যে অংশ হাউস সার্জ্জন বাস করিয়া থাকেন) যদি স্কুলের নিমিত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অত্রত্য সিবিল সার্জ্জনকে যদি মাসিক একশত টাকা বেতন দিয়া স্কুলের অধ্যক্ষতায়, ও সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনকে ৫০ টাকা বেতন দিয়া কোন বিষয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করা যাইতে পারে তাহা হইলে একশত বা দেড়শত টাকা মাসিক বেতনে আর দুইজন নূতন সব আসিষ্টান্টকে অন্যান্য বিষয়ের নিযুক্ত করিলেই বোধ হয় এক প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে।"

উপরে যেরূপ প্রস্তাবের কথা উল্লিখিত হইল, তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান হইলে এতদঞ্চলের অনেক উপকার হইতে পারে যদিও ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি ইদানীং অনেকেই বীতশ্রদ্ধ এবং তাহাতে অশ্রদ্ধা জন্মিবার অনেকগুলি প্রকৃত কারণও বিদ্যমান আছে ; এবং যদিও ইহা নিশ্চয়, সমগ্র সম্পদ প্রধান চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধিককাল শিক্ষা লাভ করণনান্তর যাঁহারা চিকিৎসারম্ভ তাঁহাদিগের চিকিৎসাতেও অনেক ক্রুটি লক্ষিত হয় সুতরাং প্রস্তাবিত নাম মাত্র চিকিৎসা বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে, তাহাদিগের চিকিৎসার প্রতি তত নির্ভর করা যাইবে না ; তথাপি এতদদ্বারা একবারেই কোন উপকার হইবে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা সামান্য রোগের অনেক প্রতীকার এবং পল্লীগ্রামস্থ অনেকের অচিকিৎসা জনিত মৃত্যুর নিবারণ চেষ্টা হইতে পারে সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে ডাক্তার প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়াই ডাক্তারি চিকিৎসার প্রতি অধিকাংশ গ্রাম্য লোকের বিদ্বেষ ভাব রহিয়াছে, যদি তত্তৎ স্থানে ডাক্তারসুলভ হয়, তাহা হইলে অল্পে ২ সেই

বিদ্বেষভাবে চলিয়া গিয়া তৎপ্রতি অনেকের অনুরাগেরই সঞ্চার হইবে এবং তদ্দ্বারা সময়ে ২ অনেক উপকার হইবে বলা বাহুল্য। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়টি কার্য্যে পরিণত হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু এক বিষয়ে আমাদিগের মনে মহতী আপত্তি উত্থিত হইতেছে, তাহা এই—

যখন আয়ের তাদৃক্ সম্ভাবনা নাই, তখন প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও তাহার ভাল বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহাতে ভালরূপ সুশিক্ষা হইবে না। সেরূপ অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা বহির্গত হইবে, তাহারা কোন স্থানে যাইয়া সবিশেষ আদর লাভ করিতে পারিবে না। গবর্ণমেন্টও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সরকারী কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। সুতরাং তাহাদিগের এরূপ উপার্জ্জন হওয়া সুকঠিন হইবে, যদি [ত] দ্বারা স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বিশেষত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের এমন কোন বিদ্যা থাকিবে না, যাহারা সাহায্যে তাহারা ব্যবসায়ন্তর অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অতএব বিদ্যালয় বলিয়া প্রথম প্রথম যেরূপ হউক, কিছুদিন পরে আর কেহ এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেনা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের অর্থোপার্জ্জনের অনেক উপায় আছে। তাহাতে যেরূপ শিক্ষা হয়, তাহা অনেক কার্য্যেরই উপযোগী কেবল বিদ্যালয়সমূহের পণ্ডিতী নয়, ওকালতী মোক্তারী, এবং আমলাগিরি, প্রভৃতিতেও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অধিকার আছে। এতগুলি অধিকার সত্ত্বেও ইদানীং অনেকে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে, এক চিকিৎসা ভিন্ন অন্য ব্যবসায়ে তাহাদিগের অধিকার মাত্র থাকিবে না। যখন লক্ষিত হইবে সেই চিকিৎসা ব্যবসায়েও তাহাদিগের তাদৃশী সুবিধা নাই, তখন সে বিদ্যালয়ে কে প্রবেশ করিতে চাহিবে? অতএব উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্টরূপ শিক্ষালাভ করিয়া বহিগত হইলেই নিশ্চত কোন ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, উল্লিখিত প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্বিষয়েরও প্রস্তাব করিয়া অবধারণ করিয়া রাখা উচিত। সে বিষয়টি অবধারিত না হইলে প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিদ্যালয় দ্বারা বাসনানুরূপ ফল লক্ষিত হইবে আমাদিগের এরূপ ভরসা হইতেছে না। যদি গ্রাম্য সার্কেল বিদ্যালয় ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের ন্যায় স্বল্প ব্যয়ে সার্কেল চিকিৎসালয়ও সাহায্যকৃত চিকিৎসালয়ের প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই ২ চিকিৎসালয়ের কার্য্য চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিশ্চিত অধিকার থাকে, তাহা হইলে উল্লিখিত আপত্তির নিরসন হইতে পারে।[৮৯]

২ মে, ১৮৬৯

## ঢাকার ফিমাল নর্ম্মাল স্কুল

ঢাকার ফিমাল নর্ম্মাল স্কুল নিয়া মন্দ এক গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ইহার সমুদয় বিবরণ বোধ হয় পাঠকবর্গ অবগত নন। ঢাকায় এরূপ বিদ্যালয় টিকিবে কিনা, পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের তাহাতে অনেক সন্দেহ ছিল। অতএব তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রথমে এক বৎসরের নির্ম্মিত এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, গবর্ণমেন্ট পুনরায় গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত রাখার অনুমতি দেন। সংপ্রতি সে কালও অতীত হইয়াছে। অতএব দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের বর্ত্তমান স্কুল ইনেস্পেক্টর সাহেব, এই স্কুলের জন্য মাসিক আরো দেড় শত টাকা চাহিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একপত্র লিখেন। তাহাতে

কতকগুলি নূতন নিয়মেরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তদুত্তরে গবর্ণমেন্ট অধিক টাকা দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু গতবর্ষে যে দেড় শত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে, কি স্কুলের কার্য্য জানুয়ারী হইতে বন্ধ করা হইবে সে বিষয় কিছুই লিখেন নাই। অতএব ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সন্দেহাকুল হইয়া এ বিষয়ের কোন প্রকার স্পষ্ট আদেশের জন্য বিদ্যাধ্যাপনার ডিরেক্টর সাহেবকে পত্র লিখেন। ডিরেক্টর সাহেব ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত এই দেড়শত টাকা স্থিরতর থাকিবে। কিন্তু পরে ইহার কি হয়, আমরা বলিতে পারিনা। যাহা হউক তদ্বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাতে মৌনাবলম্বন বিধেয় নয়। আমরা এক্ষণ গবর্ণমেন্টের যেরূপ বিবেক শূন্য শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি দর্শন করিতেছি, তাহাতে ভবিষ্যতের জন্য এই দেড় শত টাকা স্থিরতর থাকিবে এরূপ ভরসা হইতেছে না। শিক্ষা বিভাগের যে সকল ব্যয় চিরস্থায়ী বলিয়া গবর্ণমেন্ট স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আজকাল তাহা ধরিয়াই টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত বিষয়ের কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? কিন্তু যদি এই স্কুলটির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তবে আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব। এই স্কুলটী এবালিশ করিয়া দেড়শত টাকা বাঁচান হউক, আমরা একথা কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের গবর্ণমেন্ট শিক্ষার প্রতি যেরূপ অনুকূল, একবার বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেলে যে আর কখনো তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, স্বপ্নেও এরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব আমরা ইহার মূলে যেন গবর্ণমেন্ট কুঠারাঘাত না করেন। অনেকদিন হইল ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুল এবালিশ হইয়া গিয়াছে। অর্থের অনাটন হইলে তাহার টাকাগুলি এদিকে আনয়ন করা যাইতে পারে। আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেব যে মাসিক ৩০০ শত টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক উপযুক্ত প্রস্তাব। গবর্ণমেন্ট যদিও আমাদের এ সকল কথায় কর্ণপাত না করেন, অন্ততঃ যে দেড় শত টাকা এক্ষণ ব্যয়িত হইতেছে, তাহাই রাখিয়া দিন। মাসিক দেড় শত টাকার অধিক লাভও হইবে না, মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষার একটী সোপান ভঙ্গ করা হইবে। আমাদের ইন্‌স্পেক্টর সাহেব যে সকল নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারও অধিকাংশই আমরা অনুমোদন করি। ইহাতে যে সকল অভাব লক্ষিত হয়, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর, ইনস্পেক্টর ও স্থানীয় প্রধান ২ লোকের মত লইয়া গবর্ণমেন্ট কেবল এতদিন ইহার কথঞ্চিৎ ব্যয় নির্ব্বাহ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু উন্নতি কিরূপ হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃকপাতও করেন নাই। যদি ইহার প্রতি গবর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত, তবে যে এ অঞ্চলীয় নারীজাতির এক মহৎ পরিবর্তন ঘটিত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না।

১৪ এপ্রিল, ১৮৭৮০

**বিজ্ঞাপন**

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৩ই মে বাবুর বাজার লালবাগ সারকেলের অন্তগর্ত একটি পাঠশালা খোলা হইয়াছে। এই স্কুলে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য পুস্তক সকল পড়ান হইবে। দুই আনা হারে সকল বালকে বেতন দিতে হইবেক। এবার যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে আমি তাহাদিগের পাঁচ টাকার পুরস্কার দিতেও প্রস্তুত আছি।

শ্রী আব্দুল রহেল
৩০ জুন, ১৮৭২

### সম্পাদকীয়

কলকাতা হইতে একজন লিখিয়াছেন, কাগমারির প্রসিদ্ধ ভুম্যধিকারিণী শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরানী মাসিক দুইশত টাকা দান প্রতিজ্ঞা করিয়া একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। স্কুলের পুস্তকালয়ের জন্যও তিনি একদা একসহস্র মুদ্রা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য্যভার একটী স্থানীয় সভার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বিভাগে যে জঘন্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে দেশীয় জমিদারগণ এইরূপ সদনুষ্ঠান না করিলে এদেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এদেশীয় জমিদারগণ এরূপ সৎকার্য্য করিতে নিতান্ত বিমুখ।

২৪ জুলাই, ১৮৭০

### বিজ্ঞাপন

ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীদিগের মধ্যে যিনি সাহিত্যের পরীক্ষাতে প্রথম হইবেন, তাঁহাকে ৪ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন (ডাক্তার) মহাশয় ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ছাত্রীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রীকে ৬ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। ছাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই পরীক্ষা দিতে ইচ্চুক তাঁহারা আমাদিগকে আশ্বিন মাস মধ্যে অবগত করাইবেন। এই পরিক্ষাও পৌষ মাসে গৃহীত হইবে।

নির্ব্বাচিত পুস্তক।
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ
নির্ম্মলার উপাখ্যান
২৬শে শ্রাবণ
১২৭৭ সন।

ঢাকার অন্তঃপুর
স্ত্রীশিক্ষা সভা।[৯০]

১৪

আগস্ট, ১৮৭০

### প্রাপ্ত

এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ঢাকা কলেজ নাকি উঠিয়া যাইতেছে। মস্তকে বজ্রাঘাত হয় সে ভাল। তথাপি এরূপ নিদারুণ কথা যেন ফলে পরিণাম না হয়। না হইবেই বা কেন? কেম্বল সাহেবই হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা তখন এ বস্তুত অঘটন ঘটনা সংগঠন তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গবাসীরা একেবারে অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হইবে। রাজভক্তি পরায়ন বঙ্গবাসীরা এমন কি অপরাধই করিয়াছে যে তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে? অথবা তাহাদের অপরাধ মধ্যে এই যে, তাহারা কেন বিদ্যা বুদ্ধিতে ইংরেজ ভায়াদের সমক্কক হইল? কেম্বল সাহেবের চক্ষে বুঝি বাঙ্গলীর উন্নতি সহ্য হইল না। তাহার মনের এক এরূপ গূঢ় অভিসন্ধি যে বনবাসিগণ চিরকাল মূর্খ থাকিয়া হলকর্ষণ অথবা "খেইতা আমিনী করতঃ" কষ্টে সৃষ্টে উদর পূরণ করুক আর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা নিজ ২ স্বার্থ সাধনে

রত থাকিয়া বিপুল লাভবান হউন। কি পক্ষপাত। বাঙ্গালী জাতি নিরীহ বলিয়াই কি কেম্বল সাহেব তাহাদের সুখ সূর্য্য অপহরণ করিবেন? লোকে কথায় বলে, "জোর যার ভাত তার", আমাদের ন্যায়পরায়ণ কেম্বল সাহেবের শাসন প্রণালীও ঠিক তদ্রুপ। তিনি মুখে জানান বাঙ্গালীজাতির হিত সাধনই তাহার মুখ্যেদ্দেশ্য কিন্তু তীল তীল এমন চিকন বুদ্ধি প্রয়োগ করেন যে, থাকুক হিত অহিতই সমুৎপন্ন হইতেছে।

সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে যে কেম্বল সাহেব স্বজাতি স্বার্থ সাধনে সায় প্রদান করিতেছেন আমরা তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নই কিন্তু আমাদিগকে যে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। ইহাই একান্ত দুঃখের বিষয়। ঢাকা কলেজকে হাই স্কুল করিলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণের সর্ব্বনাশ হইবে ইহা কি কেম্বল সাহেবের চক্ষের তৃপ্তি দায়ক এবং সুসভ্য ইংরাজ শাসনের কীর্ত্তি পতাকা? কেম্বল সাহেব যদি ব্যয়লাঘব জন্য একান্তই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া থাকেন, তবে–বরং স্কুল ডিপার্টমেন্ট উঠাইয়া কলেজ বিভাগ রাখা একান্তই কর্ত্তব্য। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার নিমিত্ত ঢাকায় অনেক স্কুল আছে। এখন পুর্ব্ব বঙ্গবাসী ধনী ও জমীদার বর্গ সমীলে প্রার্থনা, তাঁহারা আমাদের পক্ষ বল হইয়া যাহাতে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত না হয় তৎ সাধনে সচেষ্টা হউন। কল্পনা মাত্রেই যখন সকল প্রকার কার্য্য ও নিয়ম সাধিত হইতেছে, তখন এই বিষ বৃক্ষ যে ফলবান না হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব ঢাকাস্থ জাতি সাধারণ সভা সমীপে ও আমাদের প্রার্থনা যে সভা অতি সত্বর এই অসদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টে আবেদন প্রেরণ করুন।

১৭ নবেম্বর, ১৮৭২

### ঢাকা কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপক নিয়োগ প্রসঙ্গে

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, ঢাকা কলেজের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় শারীরিক পীড়ানিবন্ধন তিন মাসের বিদায় লইতেছেন। তাঁহার কার্য্যে প্রতিনিধি নিয়োজিত হইবার নিমিত্ত নর্ম্মালস্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়, কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং রুপরঘুলালস্কুলের অতিরিক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দোপাধ্যায় প্রার্থী হইয়াছেন। শুনা যায় কলেজের প্রিন্সিপল্ শ্রীযুক্ত পোপসাহেব উক্ত কার্য্যে সংস্কৃত কলেজ হইতে একজন এম. এ. উপাধিধারীকে পাঠাইবার জন্য ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়াছেন। যদি তাহা না পাঠান হয়, তবে তিনি এখান হইতেই উক্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবেন।

কলেজ সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনশুদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ লোকদ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া সুকঠিন। কারণ সচরাচরই কলেজের ছাত্রদিগকে সংস্কৃত হইতে ইংরেজিতে ও ইংরেজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদন শিক্ষা দিতে হয়। অপিচ ছাত্রগণ সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজিতেই বিশেষ বুৎপন্ন, সুতরাং তাহাদিগকে অপরকোন ভাষা বুঝাইতে হইলে, অনেকাংশে ইংরেজিতেই বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ পরীক্ষাসময়ে এরুপও অনেক প্রশ্ন হইয়া থাকে, যাহার উত্তর ইংরেজিতেই লিখিয়া দিতে হয়। সুতরাং উক্ত অধ্যাপকতায় সংস্কৃত ও ইংরেজি এই উভয়বিধ ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন। যদি সংস্কৃত কলেজ হইতে কোন উপযুক্ত লোক উক্ত পদে মনোনীত হন, তবে উল্লিখিত অধ্যাপনায় কোনও ত্রুটির আশঙ্কা থাকেনা। এইজন্য সাধারনের ইচ্ছা যে সংস্কৃত কলেজের কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকেই

আনয়ন করা অনাবশ্যক বিবেচনায় অত্রত্য প্রার্থিগণ মধ্যেই কোন একজনকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তবে তৎ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।—ন্যায়ানুগত কার্য্য সকলেরই প্রার্থনীয় ; এই কার্য্য ও পক্ষপাতমূলক পিয়প্রিয়ভেদ বা পরিচিতা পরিচিতজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে যাহার প্রাপ্য তাহাকেই মনোনীত করা হয়, এই আমাদের প্রার্থনা।

এখানে যে তিন জন প্রার্থী আছেন, তন্মধ্যে ঔচিত্য ও যোগ্যতা অনুসারে মনোনীত করিতে হইলে, নর্ম্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ই ন্যায়তঃ এই কার্য্যের অধিকারী। ইনি বহুকালযাবৎ অত্রত্য উচ্চশ্রেণীর নর্ম্মালস্কুলে অধিকতর বেতনে প্রসংশার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি তত্ত্বাবৎকাল রঘু, ভর্ত্তি প্রভৃতি সংস্কৃতের প্রধান প্রধান সাহিত্য গ্রন্থের আলোচনা ও অধ্যাপনা করিতেছেন বলিয়া, তাঁহার উচ্চদরের সাহিত্যাধ্যাপনা চলের মধ্যে রহিয়াছে। শাস্ত্রীয়জ্ঞান অধ্যাপনা সাপেক্ষ। অধ্যয়ন জ্ঞানলাভের সোপান মাত্র ; অধ্যাপনা তাহাকে চরম সীমায় উন্নয়ন করে। সুতরাং দুর্গাচরণ বাবু বহুদিন উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতের অধ্যাপনা করাতে যে উক্ত বিষয়ে অধিকতর ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। অপিচ প্রাগুক্ত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে ইনিই অধিক বেতনভোগী এবং প্রধান পদারূঢ়। নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, কোনও এন্ট্রেস স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হইতে যে পদ মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠ, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং প্রার্থিগণ মধ্যে সর্ব্বাংশেই যে ইনি উক্তপদে নিয়োজ্য, তদ্বিষয়ে কেহই দ্বিরক্তি করিতে পারেন না। পরন্তু গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীদিগকে গ্রেডভুক্ত করার সময় দুর্গাচরণ বাবুর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ সম্যক প্রকার অবিচার করিয়াছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল কর্ম্মচারীকে গ্রেডেট করা হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে দুর্গাচরণ বাবুও গণনীয় ছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাঁহার উপর অবিচার করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহাদের নিজের উপরও একটী কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছেন। সে কলঙ্ক অপনয়ন করা কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। সংপ্রতি তাহার অবসরও উপস্থিত হইয়াছে, ভরসা করি এই সূত্রে কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গাচরণ বাবুর কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্টিবিধান করিয়া নিজের ক্রটি খ্যালনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে না।

যদিচ আমরা অন্যতর প্রার্থী চন্দ্রকান্তবন্দোপাধ্যায়কেও এই কার্য্যে উপযুক্ত মনে করি, কিন্তু তাহার এমন কোনও পদমর্য্যাদা নাই, যদ্বারা তিনি একবারেই এতাদৃশ সম্মানকর ও উচ্চবেতনের কার্য্যপ্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, যদি অত্রত্য কোনব্যক্তিকেই এই কার্য্যে নিয়োগ করা হয়, তবে দুর্গাচরণ বাবুকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আমরা নিশ্চয় জানি যে দুর্গাচরণ বাবু উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইলে চন্দ্রকান্ত বাবুরও মনঃক্ষোভ জন্মিবার কারণ নাই।

৩১ আগস্ট, ১৮৭৯

## ঢাকা মাদ্রাসায় এন্ট্রাস খোলা হয়েছে

আমরা ঢাকা প্রকাশে ঢাকা মাদ্রাসাস্কুলে এন্ট্রেস ক্লাশ খুলিবার প্রস্তাবনা করিয়াছিলাম। গবর্ণমেন্ট সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া শীঘ্রই এন্ট্রেস ক্লাশ খুলিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সংপ্রতি ২৫/২০ টাকা বেতনে দুইটী মুসলমান মাষ্টর নিযুক্ত হইবেন। এই বন্ধের মধ্যেই

শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন, পরে নূতন বাটীতে স্কুল গেলে পর উচ্চ ক্লাশের কার্য্য আরম্ভ হইবে।' ঢাকা মাদ্রাসার ইংরেজী ডিপার্টমেন্টের প্রধান শিক্ষক অতীব সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও বহুদর্শী শিক্ষক। তাঁহার যত্নে ও শিক্ষায় ঢাকা মাদ্রাসায় এন্ট্রেন্সের শিক্ষা ও ফল উত্তম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। ঢাকা মাদ্রাসার সুপরিনেটডেন্ট মৌলবী ওবেদুল্লা সাহেবের মত উপযুক্ত, বিদ্বান ও ন্যায়পর এবং সচ্চরিত্র লোক মুসলমান সম্প্রদায়ে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ও হেড মাষ্টারের যত্নে স্বল্প দিনের মধ্যেই ঢাকা মাদ্রাসার ভূয়সী উন্নতি দেখিতেছি।[৯১]

২৩ মে, ১৮৮০

## দুইটি সারস্বত সভা

ঢাকাস্থ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সভা সম্বন্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন করা আমাদের কর্ত্তব্য। এজন্য তৎসম্বন্ধে কোন কথাই আমরা বলি নাই, কিন্তু ইহাতে দেশের যে একটি ভয়ানক অনিষ্টের সূচনা হইয়াছে। এজন্য কিছু না বলাও অনুচিত। বিশেষতঃ গতবারের ঢাকা গেজেটে সারস্বত সমাজের যে কতকগুলি ঘৃণিত কার্য্যের ভূমিকা দেখিয়াছি, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও কলির মহিমা স্মরণ করতঃ আমরা পণ্ডিত সমাজকে সাবধান করা আবশ্যক মনে করিতেছি। দ্বিতীয় সারস্বত সমাজ সত্য সত্যই কি বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণ করিতে এবং সাহাদিগকে শূদ্র করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন? সত্যই কি পণ্ডিতেরা সাহার দান গ্রহণ করিতেছেন? এসকল কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু কাল মাহাত্ম্য ও দলাদলির প্রভাব আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সারস্বত সভার দলাদলিতে যে একটা কুফল ফলিতেছে। ইহা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। যেমন দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউনিভার্সিটি) সৃষ্টি, তদ্রূপ সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সভার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বয়ং গবর্ণমেন্ট, সারস্বত সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। এক মতাবলম্বী ক একজন পণ্ডিত। এক ব্যক্তি অথবা একমত ভিন্ন এরূপ কার্য্য পরিচালিত হওয়া নানা কারণে নিতান্ত কঠিন। অথবা বিশৃঙ্খলাজনক। মনে করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে কত শাসন। বিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধে কত বন্ধন, তথাপি কঠিন দণ্ডের ভয় না করিয়া ছাত্রেরা প্রশ্নপত্র চুরি করে শিক্ষকেরা উত্তর বলিয়া দেন, শিক্ষকেরা পুরস্কারের লোভে নিতান্ত অনুপযুক্ত ছাত্রকেও পরীক্ষোত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কত শিক্ষক প্রতি বৎসর দণ্ডপ্রাপ্ত হইতেছেন। তাহার সংখ্যা করা যায় না। অন্যায়রূপে অনুপযুক্ত ছাত্র পাশ করার পক্ষে শিক্ষকের কিরূপ স্বার্থ, তাহা উহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এতকাল পূর্ব্ববঙ্গে একটি মাত্র সারস্বত সভা থাকাতে এবং তাহাতে প্রকৃত পক্ষে অল্প ক একজন মাত্র পণ্ডিতের হস্তে সমস্ত টোল চতুষ্পাঠীর শাসন ক্ষমতা অর্থাৎ অনুপযুক্ত টোলের পণ্ডিতকে বৃত্তি না দেওয়া ও উপযুক্ত পণ্ডিতকে বৃত্তি দেওয়ার অধিকার থাকাতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ করার কার্য্যটি সুশৃঙ্খল রূপেই চলিত, সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান দলাদলিতে ছাত্রদিগের মধ্যে ভাল শিক্ষা হওয়া অসম্ভব।

দলাদলিতে পণ্ডিতের গন্ধ যাহার গাত্রে আছে তিনিই অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র মহামূর্খ হইলেও তাহাকে পাশ করিয়া বৃত্তি ও পারিতেষিক দিতে হইবে। না দিলেই যে তিনি অন্য দলে যাইয়া সর্ব্বনাশ করেন, ইহা কোনক্রমেই সহ্য নহে। পরীক্ষকদিগের নিজ ঘর হইতে যখন বৃত্তি পারিতোষিক দিতে হয় না, যাঁহারা টাকা দাতা, তাহারা যখন পরীক্ষা গ্রহণে সমর্থ নহেন, তখন আর কথা কি? যে কোন প্রকারে স্বদল বাড়াইতে হইবে। যত গণ্ডমূর্খকে ধরিয়া আনিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করা হইবে।

এরূপভাবে দলাদলিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সম্ভাবনা। বাঙ্গালাদেশে প্রাচীন নিয়মে পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন পণ্ডিত থাকিলেও আমরা পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি। কি হাজার হাজার মূর্খ পণ্ডিত দেখিতে চাহি না। এরুপ মূর্খ পণ্ডিত যাহাতে জন্মিতে না পারে, তজ্জন্য সকলেরই সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে দুইটা সারস্বত সভা ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ববৎ একটা হয়। তাহাই করা এখন সকলের কর্ত্তব্য হইতেছে। দুইটা দল হওয়াতে যাঁহাদের স্বার্থ তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে শত্রু মনে করিবেন। কিন্তু দেশের দিকে চাহিয়া আমরা তাহাদের শত্রু হইতে প্রস্তুত আছি, তথাপি পণ্ডিত সমাজের ভয়ানক পরিণাম দেখিতে ইচ্ছুক নহি। কি উপায়ে দুইটা সমাজ এক হইতে পারে। তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য।

আমাদের বিবেচনায় যে দলে পণ্ডিত সংখ্যা অধিক, সেই দলের মতানুসারে অন্য দলের আইস উচিত। কেননা সর্ব্বত্রই অধিকাংশের মতানুসারে কাজ হয়। যে দলের সংখ্যা কম, সে দলের যুক্তি ভাল না হইলেও কোন কাজে লাগেনা। অধিকের মতানুসারে না চলিলেই যখন বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহাতে অধিকাংশেরই জয়লাভের সম্ভাবনা, তখন একটু ন্যূনতা স্বীকার করিতে হইলেও অল্পসংখ্যককে অধিকাংশের মতানুসরণ করিতে হইবে। দুইটি সারস্বত সমাজকে ঐভাবেই এক করিতে হইবে। এখন কোন দলে পণ্ডিত সংখ্যা অধিক। তাহাই নির্ধারণ করা আবশ্যক হইতেছে। এখন কোন পণ্ডিত কোন দলে, তাহা গণিতে লইলে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা হইবে। নিজ নিজ দলবৃদ্ধির জন্য অনেক অকার্য্য কুকার্য্য করা হইবে। বিশেষতঃ সমস্ত দেশের কোন পণ্ডিত কোনদিকে, তাহা নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যাশয় নহে। অতএব পূর্ব্বে কোন পক্ষে কত পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মীমাংসা করাই কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে দুই সভারই স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতদিগের নাম দেখিয়াছি, তাহাতে যে পণ্ডিত জগদ্বন্ধ তর্করত্ন সভাপতি ও যে দলের পোষটা স্বয়ং ভাওয়ালের রাজা প্রভৃতি, সেই দলেই পণ্ডিত সংখ্যা অধিক দেখিয়াছি। এ দলের পণ্ডিত সংখ্যা অন্যদল অপেক্ষা দ্বিগুণের ও বেশী, এবং যাহারা অন্যদলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহাও আমরা অবগত হইয়াছি। অতএব পণ্ডিত জগদ্বন্ধু তর্করত্ন দলকেই সারস্বত সমাজরুপে স্বীকার করা ও অন্য দল ভাঙ্গিয়া ফেলান কর্ত্তব্য হইতেছে।

আরও বিশেষ কারণে পণ্ডিত জগদ্বন্ধুর দলকেই স্থায়ী সারস্বত সমাজ মনে করা আবশ্যক হইতেছে। এতকাল সারস্বত সমাজ প্রধানতঃ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অর্থে ও ভাগ্যকুলের সরীকের অর্থে চলিয়াছে। বর্ত্তমান দলাদলিতে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ভাগ্যকুলের বাবু হরেন্দ্রলাল ও অন্য এক সরীক আছেন। কিন্তু অন্যপক্ষে মাত্র ভাগ্যকুলের দুই সরীক আছে।

ঐ দুই সরীকের মধ্যে কর্ত্তা কিন্তু ৭/৮টি। লোকে বলে "ভাগের মায় গঙ্গা পায়না" ইহাদের নিকটে সে আশঙ্কা খুব আছে। আমরা বিশেষরুপে অবগত আছি, ইহাঁরা ঐ কারণে

কখন ও নিজের কথা ঠিক রাখিতে পারেন না। কিন্তু এ পক্ষে সেরূপ সরীকী মতভেদ নাই। বাবু হরেন্দ্রলাল প্রভৃতিতে আছেনই, তদ্ভিন্ন যাহার প্রচুর অর্থে এতকাল সারস্বত সভা পরিচালিত হইয়াছে, সেই রাজা রাজেন্দ্রনারায়নের সদনুষ্ঠানে সদা উন্মুক্ত ধন ভাণ্ডার রহিয়াছে। এতৎভিন্ন রায় যোগেন্দ্র কিশোর চৌধুরী বাহাদুর প্রভৃতি যাঁহারা সারস্বত সমাজের পোষক, তাহারা ব্রাহ্মণ বংশধর রাজার পক্ষ ছাড়িয়া যে অন্যপক্ষ যাইবেন, ইহা কিছু অসম্ভব। কেননা আমরা জানি, ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদারগণ শূদ্র বৈদ্য যাজী ব্রাহ্মণদিগকেও একটু ঘৃণা করেন। ব্রাহ্মণ রাজার অর্থে সারস্বত সভার পণ্ডিতেরা চলিতেছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাদের কোন দ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই বটে। কিন্তু এখন সে ভাব থাকিবে কিনা সন্দেহ। রাজা শ্রীনাথ এই উত্তেজনার সময়ে যদি দুই লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া সারস্বত সমাজকে দান করেন, তবে তাহার সুদে দ্বিতীয় সারস্বত সভা টিকিয়া দেশে একটা অবিদ্যা প্রকাশের দলাদলি চিরস্থায়ী হইতে পারে। নতুবা অন্য উপায়ে পণ্ডিত অদ্বৈত কায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ দল রক্ষা করিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এতএব এখন দলাদলি না করিয়া যাহাতে সারস্বত সভার সম্মান ও উদ্দেশ্য ও সম্মান ঠিক থাকে তাহা করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। যাহারা শুধু দলাদলি বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন, এ প্রবন্ধ তাঁহাদের বিরক্তির কারণ হইলেও ভবিষ্যতেরও সমাজের প্রতি চাহিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিতে আমরা তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

২৭ জুন, ১৮৯৭

**পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ ও আমাদের কথা**

বিগত ২৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্বরচিত শ্লোকাবলী পাঠ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কৃত সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের প্রাণস্পর্শিনী ইংরাজি বক্তৃতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য ছিল, গত সপ্তাহেই আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সভার সাজসজ্জা, আড়ম্বর ও বার্ষিক রিপোর্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, সারস্বত পরেই উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সেদিনকার সেই সারগর্ভ সুন্দর বক্তৃতা ও সভার রিপোর্টে সভার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত শ্রবণে এবং স্থানীয় উচ্চতম ইংরেজ রাজপুরুষদিগের এ সভার প্রতি সানুরাগ উৎসাহ দর্শনে, অদ্য আমরা সভার কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে একটি প্রস্তাব করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি।

এই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ আজ বাইশ বৎসর যাবৎ ঢাকা নগরে প্রতিষ্ঠিত। এ সমাজ হইতে এই বাইশ বৎসরে বহুশত কৃতী ছাত্র উপযুক্ত উপাধি পাইয়া পণ্ডিতের ব্যবসায় লিপ্ত রহিয়াছেন। এই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বতসমাজের অনুকরণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে অনেকগুলি পরীক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছে। এবং সেই সকল সমাজ হইতেও বর্ষে বর্ষে বহুছাত্র পণ্ডিত উপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন। এ অংশে, বঙ্গদেশে ঢাকার এই সারস্বত সমাজই আদি পথপ্রদর্শক। ...

পাশ্চাত্য জ্ঞানে শিক্ষিত, সভায় উপস্থিত অন্যবিধ গণ্যমান্য দেশীয় ভদ্র সম্প্রদায়েরও এই সমাজের প্রতি যেরুপ অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাও পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশাপ্রদ। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াই, আমরা আজি, পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের নিকট এক অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করিতে অগ্রসর। প্রস্তাবটি এই, এই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের অনুকরণে এদেশে বহু সংখ্যক পরীক্ষাসমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঢাকার এই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। দেশে এখনও বহু টোল আছে-টোলে কথঞ্চিৎ শাস্ত্রচর্চ্চাও হইতেছে। কিন্তু, যে শিক্ষায় বর্ত্তমান যুগে সেই পুরাতন ঋষিদিগের সেই পুরাতন ভাব পূর্ণাবয়বে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাদৃশ গভীর ও [ অস্পষ্ট ] বিদ্যালাভের ব্যবস্থা কোথাও নাই বলিয়াই আমরা দুঃখিত। একমাত্র শাস্ত্রের, অন্নচিন্তাক্লিষ্ট একটিমাত্র অধ্যাপকদ্বারা প্রতি টোলে সেইরুপ ব্যাপকশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব। বিশেষতঃ গবর্ণমেন্টও যখন উচ্চ শিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হাত গুটাইয়া লইতেছেন এবং উচ্চকল্পের যথার্থ শিক্ষা ভিন্ন দেশের যথার্থ উন্নতি যখন অসম্ভব, তখন দেশীয়দিগের যত্নে, দেশীয়ভাবে, দেশীয় শিক্ষাদানের নিমিত্ত কলেজ প্রভৃতির মত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকা একান্ত আবশ্যক। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের যত্নে ও কৃতিত্বে ঢাকা নগরে একটি উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই শিক্ষালয়ে—ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ এবং উচ্চ শ্রেণীর ব্যাকরণ ও উচ্চশ্রেণীর কাব্য সাহিত্যাদি অধ্যাপনার বিশদ ব্যবস্থা থাকুক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানাদি সংক্রান্ত বিবিধতত্ত্ব, এনাটমি সার্জ্জরী ও রাসায়নিকতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ইংরাজী প্রফেসার নিয়োগেরও বিধান হউক। এইরুপে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ একদিকে শিক্ষাদান, অপরদিকে পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি দান প্রভৃতি কর্ম্মের যথারীতি অনুষ্ঠান করিয়া ছোট খাট একটি দেশী বিদ্যালয়ে পরিণত এবং পরীক্ষাসমিতি সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ যেমন আদর্শস্বরূপ উচ্চ শিক্ষাদান সম্বন্ধেও সেইরুপ আদর্শ স্থানীয় হউন, ইহাই আমাদিগের প্রস্তাব ও অনুরোধ। ...

১৫ জুলাই, ১৯০০

## ঢাকা কলেজের ফাড়া

প্রেসিডেন্সী কলেজের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এতকাল শিক্ষা বিভাগের উদর্ধতন কর্ম্মচারীরা ঢাকা কলেজকে দাবাইয়া রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকার ছাত্রদিগের স্বাভাবিক গুনে যখনই ঢাকা কলেজের ফল ভাল হয়, তখনই ইহার প্রফেসারের উপরে টান পড়ে। প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকার যে প্রফেসারকে যখন ভাল মনে করেন, তখনই তাঁহাকে ঢাকা হইতে সরান হয়, আর যত নূতন শিক্ষানবীসকে ঢাকা কলেজের ঘাড়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপার সুদীর্ঘকাল দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ঢাকা কলেজটিকে বিনাশ করাই শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য, কিন্তু ৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইল তখন ভাবিলাম, শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের যাহাই কেন অভিপ্রায় হউক না, ঢাকা কলেজেকে নষ্ট করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় নহে। যদ্যপি বিজ্ঞান শিক্ষার গৃহ নির্ম্মাণে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও বিজ্ঞান শিখাইবার যোগ্য ক্ষমতাশালী কোন প্রফেসারকে ঢাকা কলেজে দেওয়া

হয় না ; উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাববশতঃ কোন ছাত্র বিজ্ঞানে বিএ, এমএ, পরীক্ষার জন্য উৎসাহী হয় না ; যদ্যপি উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে এম এ ক্লাসটিই একেবারে মাটি হইয়াছে ; ভালরূপ শিক্ষা পায় না বলিয়া সমর্থ ছাত্রগণ প্রেসিডেন্সী কলেজে যাইতেছে, আর নির্ধন অধিকাংশ ছাত্র মনোদুঃখে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কোনরূপে জীবন কাটাইতেছে, তথাপি আমরা ঢাকা কলেজের প্রতি গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় মন্দ মনে করি নাই।

কিন্তু সম্প্রতি গত সপ্তাহে একটা কথাতে ঢাকা সহর তোলপাড় হইয়াছিল। কমিশনর মিঃ সেভেজ বাহাদুর এই কলেজটীকে বর্ত্তমান কলেজ গৃহ হইতে ঢাকা শহরের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমান্তে কলঘর নামে প্রসিদধ সৈন্যাবাসে স্থানান্তর করিবার পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি যে একটি সাধু উদ্দেশ্যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, একমাস পূর্ব্বে আমরা তাহা পাঠককে জানাইয়াছি। ঢাকায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন কমিশনর সেভেজ বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। এবং ঐ কলেজ ও গবর্ণমেন্টের অন্য সমস্ত স্কুল কলেজ এক স্থানে এক প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানে রাখা কর্ত্তব্য ; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রগণের কার্য্য শিক্ষার জন্য যে সকল কল কারখানা করিতে হইবে, তাহা বর্ত্তমান কলেজের নিকটবর্ত্তী স্থানে করিতে হইলে লোকের বিরক্তি জনক হইতে পারে ; এই ভাবিয়া তিনি উহা সুবিস্তৃত কলঘরে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। নিজের এই ইচ্ছা স্থানীয় সাধারণের মনোনীত কিনা, এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই ; শ্রী যুক্ত রায় কালী প্রসন্ন কোন কোন ভদ্রলোককেও তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। বলাবাহুল্য যে, রায় বাহাদুরের ন্যায় বিবেচক ব্যক্তিদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতেই আশঙ্কা দূর হইয়াছে। তাঁহাদের কথায় সুযোগ্য কমিশনর সাহেব নিজেই বুঁঝয়াছেন, এই কলেজটীকে স্থানান্তর করিলে ছাত্র ও শিক্ষকদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। সেরুপ অসুবিধাবশতঃ সরকারী স্কুল কলেজের অধিকাংশ ছাত্র বেসরকারী স্কুল কলেজসমূহে যাইবে এ সুতরাং তদ্দ্বারা সরকারী স্কুল কলেজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।

আহ্লাদের বিষয়, ঐ সমস্ত চিন্তা করিয়া কমিশনর বাহাদুর ঢাকা কলেজ ও স্কুলসমূহ স্থানান্তর করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কমিশনর প্রভৃতি রাজ–পুরুষদিগের এক একটী কথার ক্ষমতা এত বেশী যে, সেই একটী কথা হইতে শত শত লোকের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। আমরা [ অস্পষ্ট ] ঢাকা প্রকাশ সম্পাদন করিবার পরেই যেমন এই কথাটী প্রকাশ পাইল, তখনি চারিদিকে উহা ছড়াইয়া পড়িল। শিক্ষানুরাগী সমস্ত লোক সরকারী স্কুল কলেজের বিলোপ সম্ভাবনা মনে করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কমিশনর বাহাদুরকে এই কার্য্যের অনিষ্টকারিতা বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এত চেষ্টা, অল্প সময় মধ্যে তিনি নিজের গরজেই তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার নিকটে যে ভদ্র লোকগণ সমবেত হইয়া ডেপুটিশনরূপে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা আর যাইতে হইল না।

এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেন্টের সুযোগ্য উকিল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ অত্যান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। আর যাঁহার পরামর্শে কমিশনর বাহাদুর অত সহজে ঐ প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াছিলেন, সেই রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরকেও ধন্যবাদ দিতেছি। বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র কমিশনর স্যাভেজ সাহেব বাহাদুর

নিজে। তিনি যে সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই ঐ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; একবার সকল দিকে চিন্তা করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অনেকেই এক দিকে ভাল করিতে বসিয়া অন্যদিকে মন্দ করেন যাহারা শুধু নিজের বুদ্ধিতে কাজ করেন তাঁহাদের দ্বারাই অধিক স্থলে মন্দ হয়। স্থানীয় অভিজ্ঞলোকের পরামর্শ গ্রহণ না করিলে অনেক কাজেই হিতে বিপরীত হয়। অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ, দেশীয়ের পরামর্শ লওয়া অপমান মনে করেন। ধন্য স্যাবেজ বাহাদুর। তিনি যে স্বজাতিকে ঐরুপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য এরুপ গুরুতর কার্য্যে দেশীয় ভদ্র লোকের মত গ্রহণ করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। আশা করি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিগণ দ্বারা এদেশের অনেক উপকার হইবে। এই স্থানেই কমিশনর বাহাদুরকে নিবেদন করি, তাহার সাধূ সঙ্কল্প ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটী যাহাতে তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি হয়, তাহার চেষ্টা অবশ্যই তিনি করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা কলেজের পশ্চিমেই যে সুবিস্তৃত স্থান রহিয়াছে, ইহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা করুন। এক কলঘরের নিকটে যত স্থান কলেজিয়েট স্কুল হইতে জগন্নাথ স্কুল পর্য্যন্ত স্থান তদপেক্ষা বেশী অল্প নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণেও বেশী ব্যয় পড়িবে না, কাহারও অসুবিধারও সম্ভাবনা নাই। অতএব এই স্থানেই কলেজ করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প রক্ষা দ্বারা ঢাকাবাসীর নিকটে চিরস্মরণীয় হউন।

১২ আগস্ট, ১৯০০

# অর্থনীতি

[ অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনা ও সংবাদগুলি দু'টি উপ-শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ক. জমি, জমিদার ও কৃষক এবং খ. শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

জমি, জমিদার ও কৃষক সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গের পত্র-পত্রিকায় প্রায় সব সময়ই কোন না কোন সংবাদ/রচনা থাকত। মধ্যশ্রেণী সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে প্রজার ওপর জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী যে প্রকাশিত হতো না তা' নয়, হতো তবে জমিদারী ব্যবস্থার ওপর যেন কোন হামলা না আসে সে ব্যাপারে তারা ছিলেন সচেতন। তাঁরা চাইতেন, প্রজা মনে করুক, 'জমিদার প্রজাদিগের পিতামাতা স্বরূপ ও সহায় সম্পদ।'[১] জমিদারের অত্যাচার প্রজারা যেন সে ভাবে মেনে নেয় যেভাবে সন্তান মেনে নেয় পিতামাতার দু' একটি চপেটাঘাত। তবে, অত্যাচারের মাত্রা যেন বেশী না হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকায় জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ প্রকাশিত হতো না তা' নয়। লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'—জমিদার 'রাইয়তের রক্ত শোষিয়া লন।'[২]

এ ক্রোধের কারণ কি? কারণ, পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী ধারা ও ভারতীয় অভিবাবকবাদ ভাবধারার মিশ্রণে, উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে যে ধারার সৃষ্টি হয়েছিল, সম্পাদকরা তার বাইরে ছিলেন না। এর অর্থ, প্রজার ওপর জমিদারের অত্যাচার মেনে নিতে তার বিবেকে বাধে, তিনি তাই প্রজার পক্ষে লেখেন কিন্তু অন্তিমে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সংঘাত বাধলে, ঔপনিবেশিক কাঠামোয় জমিদারের সঙ্গে তার আঁতাত সৃষ্টি হয়। আর প্রজা হয়ে ওঠে নিয়তিবাদী, যার শাসকের কাছে আবেদন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ কারণে, প্রজাকে সরকার কর্তৃক দেয় কিছু সুবিধার জন্য উত্থাপিত বিল সমালোচিত হয়েছে, সমর্থিত হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে সংকলিত সংবাদসমূহ এর প্রমাণ।

জমিদারের বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি—এক, জমির ওপর তারা ছিলেন নির্ভরশীল কিন্তু জমির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিলেন তিনি নিজ জমিদারীতে অনুপস্থিত। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ উল্লিখিত হয়েছে বিষয়টি।

জমিদারের অনুপস্থিতি, জমিদার শোষক হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে বদলে দিয়েছিল তার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পর, প্রাথমিক পর্যায়ে জমিদার ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারী কারণ জমিদার তখনও নিজ জমিদারীতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু ক্রমে, জমিদার যখন পরিণত অনুপস্থিত জমিদারে তখন তার হয়ে রায়তদের ওপর প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার ও শোষণ করতেন গোমস্তা বা মধ্যস্বত্ব ভোগীরা। তিনি ক্রমেই পরিণত হয়েছিলেন দূরের মানুষে, যিনি পূজা পার্বণে, ঈদে ক্বচিৎ কখনো পদার্পণ করতেন

জমিদারীতে। কিছু দান ধ্যান অভিবাবক সুলভ আচরণ করতেন এবং প্রজারা তার কাছেই তার নায়েব গোমস্তার অত্যাচার সম্পর্কে বা অন্যান্য আবেদন করতেন।

সামাজিকভাবে জমিদাররা ছিলেন সমাজের শীর্ষে। রাজনৈতিক ভাবে ছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থক, কারণ, এ শ্রেণী ছিল ঐ কাঠামোরই ফল। সরকারী প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের ছিল অকুণ্ঠ ও সোচ্চার সমর্থন। অন্যদিকে, আবার রায়তদের পক্ষে সরকারী যে কোন ধরনের সংস্কারের তারা ছিলেন ঘোর বিরোধী। ভূমি সংস্কারমূলক বিভিন্ন আইনের বিরুদ্ধে তাদের সভাসমিতি, স্মারকলিপি প্রভৃতি এর উদাহরণ।[৩]

ঢাকা প্রকাশ-এ এ ছাড়াও আলোচিত হয়েছে চা ও নীলকর অত্যাচার, পাটচাষী ও নিম্নশ্রেণীর অবস্থা, কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি। এসব বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ সংকলিত হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে।

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সমাজে একটি প্রভাবশালী শ্রেণী ছিলেন ব্যবসায়ীরা যারা নিয়ন্ত্রণ করতেন আন্ত এবং বর্হিবাণিজ্য এবং এর অধিকাংশই ছিলেন হয় অবাঙালি অথবা ইংরেজ।

বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় পুরোটাই ছিল বৃটিশদের হাতে। এসময় যেসব চেম্বার অব কমার্স বা বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল সেগুলিও কাজ করেছিল বৃটিশ শাসনের অনুকূলে। এক হিসাবে দেখা গেছে ১৮৮৩ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত এই সত্তর বছরে বাংলা বর্হিবাণিজ্য বেড়ে গিয়েছিল চৌদ্দগুণ।[৪]

অন্যদিকে, পূর্ব্ববঙ্গের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল একদিকে বৃটিশ কারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং অন্যদিকে বৃটিশ ও ইংরেজদের তৈরি বাজার। চা ও পাট এসময় হয়ে উঠেছিল প্রধান রপ্তানীকারক পণ্য।[৫] কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক উৎপাদনকারীরা কখনই পায়নি তার পণ্যের ন্যায্য দাম।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা সবসময়ই জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন বাণিজ্য বা শিল্প গড়ে তোলার। কিন্তু কেউই তাতে তেমন সাড়া দেয়নি।

প্রথমেই জমিদারদের কথা ধরা যাক। কর সংগ্রহ এবং জবরদস্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিলো তার উদ্বৃত্তের। এই উদ্বৃত্ত তিনি শিল্পে লগ্নী না করে লগ্নী করেছিলেন নতুন জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব ক্রয় বা মহাজনী ব্যবসায়।[৬] ঔপনিবেশিক কাঠামোতে অনেক বাধানিষেধ ছিল শিল্পখাতে পুঁজি-বিনিয়োগের। তা'ছাড়া অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বাণিজ্য বা শিল্প কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শুধু তাই নয় ঐ কাঠামোতে শ্রেণী হিসেবে তার অবস্থান ছিল অধস্তন। সুতরাং মেট্রোপলিটান পুঁজির সঙ্গে জমিদারের প্রতিযোগিতায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। বরং অনুৎপাদনশীল খাতে, যেমন কোম্পানীর কাগজে বা মহাজনী ব্যবসার দিকেই তাকে ঝুঁকতে হয়েছিল যেখানে ছিল ঝুঁকি কম। সুতরাং এই উদ্বৃত্ত ব্যয়িত হয়েছিল ভোগের দিকে।

এবার মধ্যশ্রেণীর কথা ধরা যাক। ঔপনিবেশিক সরকারের চাকুরি পাওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল শিক্ষা। ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষার ধাঁচ আবার এমন করেছিলেন, যার ফলে এ শিক্ষা

মাধ্যম থেকে যারা এসেছিলেন তারা হয়েছিলেন অনুকরণকারী, সিভিল সার্ভিসের যে কোন পদের আকাঙ্ক্ষী যা তাদের অর্থ ও ক্ষমতা দেবে। ঔপনিবেশিক সরকারের চাকরিতে যারা গিয়েছিলেন তারা টাকা জমিয়ে বিনিয়োগ করেছিলেন জমিতে। কিন্তু সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেননি ব্যবসায় বা বাণিজ্যে। কারণ ঔপনিবেশিক গঠনে মেট্রোপলিটন পুঁজির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা যেতে চাননি অনিশ্চয়তার কারণে।

কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায় নামার জন্য বাঙালীকে শুধু 'ঢাকা প্রকাশই নয়, পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও নিয়মিত আহ্বান জানিয়েছে। এমনকি রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণী পত্রিকা 'হিন্দুরঞ্জিকা' আক্ষেপ করে লিখেছিল, দিন-দিন মধ্যশ্রেণীর বিশেষ করে ভদ্রলোকদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। কারণ তাদের ফাঁকা গর্ব্ব এবং স্বাধীন ব্যবসায় নামার লজ্জা। এ অবস্থা চললে দেশের কোন উন্নতি হবে না। চাষীরা কেরানীদের থেকেও এখন ভালো আছে, কারণ সাংসারিক স্বাস্থ্যন্দ্যের জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত। যদি কেউ একটু উঁচু পদের চাকরি করেন তাহলে সবাই তার ওপর নির্ভরশীল হবেন তবুও স্বাধীন ব্যবসায় কেউ নামবেন না।[৭] তবে, চাকুরিজীবীরা যে বাণিজ্যের জন্য কিছু কিছু উদ্যোগ নেননি তা নয়, কিন্তু সেগুলি খুব সম্ভব উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সত্তর দশকের পাঁচটি কোম্পানীর 'মেমোরেনডাম' দেখলে তাই মনে হয়। এদের সবার বৈশিষ্ট্য, তারা বন্ধকী বা মহাজনী ধরনের ব্যবসায় উৎসাহী, শিল্পে নয়। পুঁজি সবারই বিশ হাজার টাকা। যেমন, 'ময়মনসিংহ লোন অফিস লিঃ' [ ১৮৭১ ] উদ্দেশ্য, বন্ধকী ব্যবসা করা। 'ময়মনসিংহ গ্রেট ইস্টার্ণ বেঙ্গল কোম্পানী লিঃ [ ১৮৭৪ ]—উদ্দেশ্য, "জীবনোপায়ের স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করা।" কিন্তু মেমোরেনডাম পড়লে মনে হয় পূর্ব্বোক্তটির মতই ছিল এর লক্ষ্য। 'বগুড়া ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ' [ ১৮৭৭ ]–উদ্দেশ্য, বাণিজ্য। 'ইস্ট বেঙ্গল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিঃ' [ ১৮৭৭ ]—উদ্দেশ্য, বাণিজ্য। কিন্তু নিয়মপত্রের একটি ধারার লেখা ছিল—"চর্ম্ম কি চর্ম্ম নির্মিত দ্রব্য প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ"-কোন কিছুর ব্যবসা করা যাবে না। ব্যবসায় ধর্ম টেনে আনলে তার পরিণতি কি হয় তা অনুমান করা যেতে পারে।[৮]

স্বাধীন ব্যবসায়ে মধ্যশ্রেণীর না যাওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে শিক্ষা সম্পর্কে ফাঁকা গর্ব্ব। তবে, মূল যে কারণে জমিদাররাও স্বাধীন ব্যবসায় বা শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করেননি, সেই একই কারণে মধ্যশ্রেণীও যেতে চান নি ব্যবসায়। ]

## সূত্র

১. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, জুলাই, ১৮৬৯।

২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ আশ্বিন, ১২৬৮।

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৮৬। ১৮৮৩ সালে সরকার *'বেঙ্গল টেনান্সি বিল'* এর প্রস্তাব করলে এর বিরুদ্ধে জমিদার ও জমিদার পক্ষীয়দের অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ ধরনের কয়েকটি পুস্তিকার উল্লেখ করছি, যেমন—

Ashutosh Mookeerjea, *An Examination of the Principles and Policy of the Bengal Tenancy Bill*, Calcutta, 1884 ;

Peary Mohun Mookerjea (comp ilted). *Opnion of Mofunnil Landholder on the Bengal Tenancy Bill*, Calcutta, 1883 ;

Keshab Chunder Acharya, *Strik but Hear* orgnensingh, 1881 ;

Parbati Charan Ray, *The Rent Question*, calcutta, 1881.

৪. Nilmani Mokherjea, 'Foreign and Inland Trade 1833-1905', N.K. Sinha (ed). *History of Bengal*, Calcutta, 1966, p. 354.

৫. *ঐ*, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।

৬. বড় ছোট সব ধরনের জমিদাররা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন আঞ্চলিক মহাজন যারা টাকা বা ধানের মহাজনী কারবার চালাতেন, দেখুন—

Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society*, Calcutta, 1995. p. 20.

৭. 'হিন্দুরঞ্জিকা', ২৪-৯-১৮৭৮, *Report on Native papers*, No-13, 1878.

৮. *দেখুন*, *শহর ময়মনসিংহ গ্রেট ইস্টারণ বেঙ্গল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী লিমিটেড : আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অর্থাৎ নিয়মপত্র*, ময়মনসিংহ, ১৮৭৪ ; *সিলেট কলটিবেটিং কোম্পানী লিমিটেড সংসৃষ্টির নিয়মপত্র*, কলকাতা, ১২৮১, ইত্যাদি।

# সংকলন

## ক. জমি, জমিদার ও কৃষক

### জমিদার কর্তৃক প্রজার উপর করবৃদ্ধির উচিত্যানৌচিত্য

এই শিরোনামের লিখিত বিষয়টি লইয়া সমূহ তর্ক বির্তক হইয়া গিয়াছে, এবং এই ক্ষণও হইতেছে। এই বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল আইন ছিল, তাহার সমুদায় রহিত হইয়া ১৮৫৯ সনে ১০ আইন প্রচলিত হয়। এই আইনের কোন বর্জ্জিত স্থল ব্যতীত কয়েকটি কারণ অনুসারে ভূমির কর বৃদ্ধির ক্ষমতা জমিদারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। কর বৃদ্ধির পরিমাণ বিষয়ে কেবল "ন্যায্য" ও "সঙ্গত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কি পরিমাণ করবৃদ্ধি "ন্যায্য" ও "সঙ্গত" বিবেচিত হইবে, আইন প্রচলিত হওয়ার অনেক দিবস পর পর্যন্তও লোকে তাহার কিছু মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। পরে নীলকর হিলস্ সাহেব ও ঈশ্বর ঘোষের যে বিখ্যাত মোকদ্দমা হয় হাইকোর্টর জজ সেই মোকদ্দমায় প্রতি বিঘার পূর্ব্ব কর। /. আনার পরিবর্ত্তে ১ টাকা সুস্থির করিয়া তদ্বিষয়ের একরূপ রীতি স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণ যে স্থলেই কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে, সকলেই হাইকোর্টের উক্ত মোকদ্দমার 'ফয়সালা' অনুসারে নিস্পন্ন হইবেক, সন্দেহ নাই।

এইরূপে ভূমির কর অধিক বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমিদারদিগের হস্তে প্রদত্ত হওয়াতে অনেকেই অনেক প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জমিদারেরা যদি সময়ে২ আপন ইচ্ছামতে কর বৃদ্ধি করিতে পারিলেন, তাহা হইলে হয়তো অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রজাদিগকে স্ব স্ব দখলি ভূমি স্বহস্তে রাখিতে হইবেক, নতুবা চিরকাল যে সকল ভূমি কর্ষন করিয়া তাহারা জীবনোপায় আহরণ করিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবেক। তার প্রজাদিগের হস্তে যে ভূমি থাকে তাহা কোন দিন কেহ অধিক কর দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে, যদি প্রজাদিগের এমত আশঙ্কা থাকে, তাহারা কোন অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্থায়ীরূপে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি করিতে যাইবে? এই সকল কারণে কেবল যে প্রজারাই সম্পূর্ণ দুরবস্থাপন্ন হইয়া জমিদারদিগের করুণার উপর সমর্পিত হইল, এমত নহে, এতদ্বারা জমিদারদিগেরও সমূহ ক্ষতি হইবেক।

সোম প্রকাশ সম্পাদক বিষয়টিকে এইভাবে দেখিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আমাদিগেরও এই প্রকার মত ছিল। কিন্তু ক্রমে চিন্তা দ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ জমিদারের হস্তে ভূমির কর বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকা উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

করবৃদ্ধির অনৌচিত্য প্রদর্শক প্রধান আপত্তিই এই, যে ঐরূপ নিয়ম থাকিলে প্রজারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি করার পক্ষে যত্নবান হইবেক না। এই বিষয়ের বিচার নিমিত্ত

ভূমিকে ভিটী ও কর্ষা এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া যাউক, ভিটী জমির বিষয় পশ্চাৎ উল্লেখিত হইবেক। প্রথমতঃ বিবেচ্য এই, কি২ উপায়ে শস্য উৎপাদক ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে। ক্ষণিক চিন্তার পরই দেখিতে পাওয়া চায় যে, ভূমি অতি ... অধিককাল জলমগ্ন থাকিলে, বাঁধ অথবা অন্যবিধ উপায়বলক্ষণদ্বারা তাহাকে আবশ্যক মত শুষ্ক করা কোন স্থান উচ্চতা অথবা জলাশয় হইতে দূরতাবানতঃ অতিশয় শুষ্ক থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া খাল কাটিয়া, ... তাহাতে কূপ পুস্করিনী প্রভৃতি খনন করিয়া তাহার অতি শুষ্কতা দূর করা, কোন স্থান অকর্ম্মন্য কি অপকারী উদ্ভিদে আবৃত থাকিলে তৎসমুদয় বিনষ্ট করা, আর সার ফেলান কর্ষণ বপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্বন্ধীয় কার্য্য, বিশেষ মনোযোগিতা সহকারে উৎকৃষ্ট-পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত মতে সম্পাদন করা, এবং মৃত্তিকার উপর উদ্ভিজ্জ সকলের কার্য্য জানিয়া সময়ে২ উৎপন্ন শস্যের জাতি পরিবর্তন করা প্রভৃতি কয়েকটি প্রক্রিয়াই ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির প্রধানতম উপায়।[৯৩]

৪ নভেম্বর, ১৮৬৪

## এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারীদিগের কার্পাসোৎপাদনে যত্ন করা আবশ্যক

সুবিস্তৃত বাণিজ্য সংস্রুত না হইলে কোন দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়না, ইহা অতি সুনিশ্চিত কথা। অন্যান্য ব্যবসায় দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তুজাত সমুৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বাণিজ্য ব্যবসায় স্পৃষ্ট না হইলে তদ্বারা বাসনারূপ অর্থ লাভের সম্ভাবনা কি? অতএব যে যে বস্তু উৎপাদন করিলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সবিশেষ পরিচালিত হইতে পারে, বিবেচনা পূর্ব্বক কৃষি শিল্পাদি ব্যবসায়দ্বারা সমধিক পরিমাণে তৎবস্তুই করা আবশ্যক যে সকল দেশের লোকে এইরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম। সে সকল দেশ অবশ্যই বিলক্ষণ অর্থশালী হয় সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিশালী হইয়া উঠে ইহা বলা বাহুল্য। ইউরোপ ও আমেরিকার লোকদিগের যে এত উন্নতি, তত্রত্য লোকদিগের উল্লিখিত বিষয়ে যথোচিত বিবেচনা প্রয়োগই তাহার প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে এতদ্দেশীয়দিগের এত দূরবস্থার কারণই এই যে দেশীয় সাধারণ লোক উক্ত বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও অমনোযোগী। এদেশের ভূমধ্যধিকারী প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন যে তাহাদিগের এরূপ ভাব তাহারাই বলিতে পারেন। শিল্প ব্যবসায়ে তাহাদিগের বিশেষ লাভালাভ সম্পর্ক নাই সত্য, কিন্তু কৃষি ব্যবসায় সম্বন্ধে তাহাদিগের সে কথা বলিবার উপায় নাই। উদার গবর্ণমেন্ট যখন তাহাদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং ভূমির উন্নাতিতে তাহাদিগের উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছেন। তখন তাহাদিগের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা, কত দূর অন্যায় তাহাদিগের তাহা বিবেচনা করা উচিত। আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এদেশের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য কুসুমফুলও পাটের মূল্য হঠাৎ ন্যূন হইয়া যাওয়াতে সর্ব্বত্রই মছা [ মহা ] হুলুস্থুলু উপস্থিত হইয়াছে। কেবল বাণিজ্য ব্যবসায়ীর নয় কৃষি ব্যবসায়ীদিগেরও সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এবং তৎপ্রযুক্ত জমিদার তালুকদারদিগকেও যে কিঞ্চিৎ২ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই এরূপ বলা যাইতে পারেনা। এতৎ কারণ বশতঃ ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতঃপর আর এ দেশে বহুল পরিমাণে কুসুম ফুল এবং পাট উৎপাদন করিয়া লাভবান [ হওয়া ] যাইবে না প্রত্যুত ক্ষতিগ্রস্ত হইবারই একান্ত সম্ভাবনা। অতএব কৃষি দ্বারা এদেশে এরূপ কোন বস্তু উৎপাদন আবশ্যক, যাহা প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্য

ব্যবসায় দ্বারা পরিচালিত হইবে, সুতরাং কুসুম ও পাটের ক্ষতি পূরণ হইয়াও সত্বর লাভ হইয়া দাড়াইয়া উঠিবে। আমাদিগের বিবেচনায়, তুলাই এতভীষ্ট সিদ্ধির উপযুক্ত সামগ্রী ইংলন্ড প্রভৃতি প্রধান২ বাণিজ্য স্থানে যে তুলার প্রয়োজন হয়। তাহার অধিকাংশ আমেরিকা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। কোন কারণ বশতঃ যদি আমেরিকা হইতে তত্তৎ স্থানে তুলার রপ্তানি বন্ধ হয়, তাহা হইলে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া উঠে অনেকে তাহা অবগত থাকিতে পারেন। আমেরিকার বহুকাল ব্যাপী যুদ্ধ নিবন্ধন ইতঃপূর্ব্বে কিয়ত কাল তুলার রপ্তানি কম হওয়াতে সর্ব্বস্থানের বাণিজ্য সংসারে কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বোধ হয়না কেহ তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। নিতান্ত সুখের বিষয় এই, যে সংপ্রতি ইংলন্ড এবং আমেরিকার আলবামা জাহাজ সংক্রান্ত বিবাদ মধ্যস্থ সভা দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, উভয়কে অবশ্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। তাহা হইলে তুলার আনুষঙ্গিক বস্ত্রেরও বাণিজ্য সংক্রান্ত অবস্থা কিরূপ হইয়া উঠিত। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তাহা বুঝিতে পারেন। সময়ে২ দৈবী আবদ দ্বারাও উক্ত বিষয়ে ভয়ানক গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। যখন তুলার নিমিত্ত এক মাত্র দেশের মুখপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছে, তখন যে সেই দেশের সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদেই তুলাসংক্রান্ত বাণিজ্যের আপদ বিপদাশঙ্কা আছে ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিছুদিন হইল আমেরিকার সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ পাইয়াছে জল প্লাবন প্রযুক্ত আলবামা স্থানে ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলার চারা ও শস্য নষ্ট হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে ও পোকা ধরিয়াছে। ঈশ্বর না করুন যদি ঐ কারণ আমেরিকায় অল্প তুলা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে তুলার অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে ২ বস্ত্রেরও অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হইবে ইহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক যদিও পরবর্ত্তী তাড়িতবার্ত্তাবহের সংবাদ দ্বারা উক্ত বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হওয়া গিয়াছে কিন্তু সর্ব্বদাই যে উক্তরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব যাহাতে অন্ততঃ ইংলন্ডকে তুলার নিমিত্ত এক মাত্র আমেরিকার মুখপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়, ইংলন্ডের সহিত যে যে দেশের সংস্রব আছে তত্তদ্দেশের সকলেরই তদর্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। যত্ন করিলে এদেশের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণেই কার্পস উৎপন্ন হইতে পারে সন্দেহ নাই। অতএব এদেশের জমিদার ও তালুকদারগণ তাঁহাদিগের অধিকৃত যে যে স্থানে তুলা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, তত্তৎস্থানে কার্পাস উৎপাদন জন্য কৃষকদিগকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করেন, স্থল বিশেষে স্বকীয় পথ দ্বারা সহায়তাও করেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহাতে যুগপৎ কৃষকদিগের উন্নতি, বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি জমিদারীর আয়াধিক্য এবং ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ মাত্র নাই।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২

## প্রেরিত পত্র

সম্পাদক মহাশয় আপনার পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ নীলকর মেঃ জেপী ওয়াইস[৯৪] সাহেবের জমিদারী বিক্রয় হওয়া ও তদানুষঙ্গিক ঘটনা সবিশেষ জ্ঞাত থাকিতে পারেন। এ জিলায় তাহার যে জমিদারী ছিল, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া তাহা ক্রয় করিয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতি। মুক্তাগাছার অন্যতর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্য কান্ত আচার্য্য, গাঙ্গাইটা

নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী ও মেঃ কালানুস সাহেব, সড়ার চর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয় গোবিন্দ রায় ও মৌসা নিবাসী বাবু হরিকিশোর রায়। যদিচ ইহার তুল্য অংশী না হউন, তথাপি কোন অংশীদারকে এ উপলক্ষে বহুল ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ওয়াইজ সাহেবের জমিদারী বিক্রয়ের প্রসঙ্গ হওয়া অবধি অনেক নীলদাদনগ্রস্ত নিরীহ প্রজার হৃদয় কন্দরে আনন্দ উৎসব উদগত হইয়াছিল বটে, তাহারা মনে করিয়াছিল, "নীলকর বিষধরের অপ্রতিরোধেয় দংশন যাতনা আর ভোগ করিতে হইবেনা," কিন্তু ভাবিলে কি হয়? পূর্ব্বোক্ত জমিদারী ক্রেতাগণের মধ্যে জনৈক নীল প্রিয়ের উপদেশে নীল কুঠির কার্য্য এবর্ষ হইতে পুনরায় আরম্ভ হইবে। উপসংহার কালে আমরা অপর অংশিগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা—এ অধ্যাবসায় পরিত্যাগ করুন, বাঙ্গালীদিগের এ কার্য্য শোভা পায়না। অপিচ বাঙ্গালী হইয়া এ কার্য্যে বিশেষ লাভবান হইবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায়না। কারণ যে কার্য্যে যাহাদের অভিজ্ঞতা না থাকে তাহারা সে কার্য্যে হস্ত প্রসারণ কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক বরং বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে নীলের কার্য্যরম্ভ হইলে নিরীহ প্রজাবৃন্দের প্রতি অসহ্য দৌরত্ম্য হইবে। সুতরাং তাহাদের অভিসম্পাত গ্রহণই চরম ফল। ... কয়েক বৎসর উচ্চমূলে পাট বিক্রয় হওয়ায় কৃষিজীবীগণ অধিকলাভ আশায় এবর্ষে ধান্যের জমি সঙ্কুচিত করিয়া বাহুল্যরূপে পাটের চাষ করিয়াছিল সুতরাং পাটের বাজার এত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে যে প্রতি মন ১০/১২ আনার অধিক বিক্রী হয় না। এবর্ষে তাহাদের লাভ দূরে থাকুক জমীর কর এবং পরিশ্রমের মজুরি পাবে কিনা সন্দেহ। কোন কোন নিরন্ন প্রজার পাট গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে।

৬ অক্টোবর, ১৮৭২

## জমীদারদিগের প্রতি আক্রমণ

আজিকালি কোন২ সংবাদপত্রে এতদ্দেশীয় জমীদারগণকে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। কেন যে তাঁহারা এই সময়োচিত অন্যায়াক্রমণ করিতেছেন, বলিতে পারিনা। একতঃ অনেক রাজপুরুষেরই এদেশীয় জমীদারদিগের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে যদি আবার সংবাদপত্রগুলিও নানা অলীক বাক্যবলীদ্বারা সেই অমূলক বিদ্বেষ উদ্দীপিত করিয়া দেন, তাহা হইলে সময়ে অনিষ্ট সংঘটিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেকে অনুমান করেন, যে সকল ব্যক্তি অত্যাচারী জমীদার বিশেষ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া থাকেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমীদারকে কর বা দণ্ডাদি প্রদান করা যাহাদের একান্তই অসহনীয়, তাহারাই সময়ে২ পত্রিকা বিশেষ নানা কাল্পনিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন। এ অনুমান কতদূর সত্য যদিও আমরা একথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিনা। কিন্তু তাহারা যে এদেশীয় জমীদারদিগের উপর যারপর নাই অসন্তুষ্ট ও বিরক্তি চিত্ত, তাহা তাহাদিগের উক্তি পরম্পর দ্বারাই বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হয়। এদেশের জমীদার মাত্রেই উৎপীড়ন কারী। সাধারণ হিতকর কার্য্যে অনুৎসাহী এবং স্বাধিকার ও স্বদেশের মঙ্গলকর কার্য্যে বিমুখ, একথা কখনই স্বীকার করিতে পারা যায় না। সত্য বটে জমীদারদিগের মধ্যে অনেক অপদার্থ লোক ও আছেন, কিন্তু তন্নিমিত্ত অবচ্ছেদাবচ্ছেদে জমীদার মাত্রকেই অপদার্থ প্রতিপন্ন করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগের হস্ত

হইতে জমীদারি কাড়িয়া লইতে পরামর্শ দেওয়া যারপর নাই অসঙ্গত। জমীদার বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, "ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এদেশীয় জমীদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দ্যোবস্ত করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। এতদ্বারা ভূমির উন্নতি বিধানে প্রতিবন্ধকতা করা হইয়াছে। এবং জমীদারগণকে চির প্রধান ও কৃষক প্রভৃতি প্রজাগণকে চির কৃষ্ট রাখা হইয়াছে।" কেন যে তাঁহারা এরূপ বলেন, তাহা তাহারাই জানেন। মহাত্মা লার্ড কর্ণওয়ালিস অতি মহান উদ্দেশ্যে এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

জমীদারদিগের প্রাধান্য সম্পাদন উক্ত বন্দোবস্তের অন্যতর উদ্দেশ্য থাকিলেও তাহা অপ্রশংসনীয় হইতে পারেনা। প্রত্যুত ভূমির ক্রামোৎকর্ষ, প্রজা বর্গের নানা বিষয় যিনী সমুন্নতি এবং দেশের সর্ব্ব বিষয়ক অভাব মোচন ও হিত সাধন হয় ইহাই উহার মুখোদ্দেশ্য। যদি বঙ্গ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি কৃষিকারী প্রজার ন্যায় নিঃস্ব অবস্থান থাকিত, জমীদারের ন্যায় একশ্রেণীর ধনবান লোক কেহ না থাকিতেন, তাহা হইলে কি এদেশের কিঞ্চিমাত্রও গৌরব সম্পাদিত হইত? খাল ও জলাশয়াদি খনন পূর্ব্বক ভূমির উৎকর্ষ বিধান বা প্রজা বর্গের জল কষ্ট নিবারণ, রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের যাতায়াতের সুবিধা সম্পাদন এবং বিদ্যালয়ের ও চিকিৎসালয়াদি স্থাপন পূর্ব্বক সাধারণের উপকার বিধান প্রভৃতি বহু ব্যয় সাধ্য হিতকর কার্য্য সকল কি অর্থ শালী জমীদার ভিন্ন অন্যের দ্বারা নিষাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল? কেনা স্বীকার করিবেন, এতদ্দেশীয় জমীদারদিগের দ্বারা সময়ে সময়ে এবং বিবিধ সাধারণ মঙ্গলজনক বহু কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতেছে? জমীদারেরা সাধারণবৎ নিঃস্ব অবস্থায় থাকিলে কি তাঁহাদিগের দ্বারা ইত্যাকার কার্য্যের কোন প্রত্যাশা ছিল?

উপরিউক্ত জমীদার বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ বলেন গবর্ণমেন্ট জমীদারদিগের সহিত যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত[৯৫] করিয়াছেন, প্রজাদিগের সহিত জমীদারগণ যাহাতে সেইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আবদ্ধ হন, গবর্ণমেন্ট তাহার নিয়ম বিধান করুন। তাহাদিগের অভিসন্ধি এই, "কোন জমীদার কোন প্রজার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদিগের যুক্তি এই, "কৃষিকারি প্রজাদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা ভূমিকে নিজের ভূমি জানিয়া তাহার উৎকর্ষ বিধানে সমধিক মনোযোগী হইবে।" আমরা এই বিষয়টি বহুবার চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু একথার কোন মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। অথবা কথাটিরই কোন অর্থ নাই। এক্ষণ জমীদারদিগের ভূমিতে যেরূপ স্বত্ব আছে, প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে কিছু তাহাদিগের ভূমিতে এতদপেক্ষা অধিকতর স্বত্ব হইবেনা। অতএব প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইলে এখনকার জমীদারদিগের অপেক্ষা প্রজাদিগের ভূমিকা অধিকতর সমতা এবং ভূমির উৎকর্ষ সাধনে ক্ষমতা ও ইচ্ছা জন্মিবে,—ইহার অর্থ কি? যে সকল প্রজা প্রথম জমীদারদিগের নিকট হইতে যে ২ ভূমির স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে, তাহারা চিরকালই কিছু সেই ২ ভূমির কৃষিকারী থাকিবেনা। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে তাহার হস্তান্তর অথবা নিম্নবর্ত্তী (যাহারা জমীদার হইতে ভূমিতে স্থায়ী অধিকার না পাইবে) অপর প্রজার নিকট এখনকার ন্যায় অস্থায়িরূপে পত্তন করিবেই করিবে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে প্রজার সহিত জমীদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, কোনরূপেই তাহা সুসিদ্ধ হইবেনা। স্থূল কথা এই—"এক্ষণ এদেশীয় জমীদারিদিগের ভূমিতে যেরূপ সর্ব্বস্বক্ষম ক্ষমতা রহিয়াছে সেই ক্ষমতা না থাকে, তাহারা

অপেক্ষাকৃত অল্প আয়বান হইয়া সাক্ষিগোপাল স্বরূপ হন—নিম্নবর্ত্তী প্রজারা জমীদারদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, জমীদার বিদ্বেষী উপরিউক্ত লেখকদিগের ইহাই আন্তরিক বাসনা। এই বাসনা পূর্ণ করা হইলে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, বোধ হয় স্বার্থান্ধতা প্রযুক্ত আক্রমণকারিগণ তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

১২ জানুয়ারী, ১৮৭৩

## প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়। নীলকর মেঃ জেপীওয়াইজ সাহেবের এ জিলাস্থ জমিদারী যে কয়েক মহাত্মা সমবেত হইয়া ক্রয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে জনৈক ধবলত্বক অংশী ছিলেন। তিনি ওয়াইজ সাহেবের ম্যানেজার হইয়া জমিদারীর হর্তাকর্ত্তা বিধাতা স্বরূপ দুর্দ্দান্ত প্রতাপে জমিদারী শাসন করিতেন। অপর অংশিগণ তাঁহার হস্তে এ নবক্রীত জমিদারীর পুর্ব্বোক্ত ক্ষমতা দেন।

তিনি নীলের কুঠিগুলি পূর্ব্ববৎজারী রাখিতে সমুৎসুক হইয়া অনেকগুলি নীলের বীজ ক্রয় পূর্ব্বক নীলচাষে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু একার্য্যে অন্যাংশিগণের অনুরাগ না থাকায় প্রজাবর্গ নীলবপনের অবাধ্য হয়। এই উপলক্ষে যে শান্তিভঙ্গের উদ্যোগ হয়, তাহার নিবারণার্থে জিলার ও কিশোরগঞ্জের পুলিস আমলাগণ প্রায় মাসাধিককাল এখানে অবস্থান করেন। পরিশেষে নীলপ্রিয় মাহাত্ম "দশচক্রে ভগবান্ ভূতের ন্যায়" নিরুপায় ও লজ্জিত হইয়া, নিজাংশ আঠার বাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

এই অভিনব অংশীর সহিত অন্যতম অংশী মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত বাবু রামকেশব আচার্য্য মহাশয়ের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে উভয় পক্ষে বিস্তর লাঠিয়াল নিযুক্ত আছে। ওয়াইজ সাহেবের জমিদারী বিক্রয় হওয়ায় ফরিদপুরের লাঠিয়ালদিগের অন্ন মারা গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বিলক্ষণ আশ্বস্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যেরূপ সজ্জা দেখিতেছি, অচিরেই দাঙ্গা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা সানুনয়ে উভয় পক্ষকে বলিতেছি, তাঁহারা বিরোধে ক্ষান্ত দিয়া যাহাতে নিরূদ্বেগে জমিদারী শাসিত হয়, তাহার উপায় বিধান করুন্। কিস্তী বন্দীর নিয়মে ক্রীত জমিদারীর জন্যে অনর্থক বহুল অর্থের শ্রাদ্ধ করায় নিতান্ত অপরিনামদর্শিতা প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বে যেমন একবার পুলিস আমলা আসাতে দাঙ্গা নিবারণ হইয়াছিল, এখনও আসিলে তদ্রূপ হওয়ার সম্ভাবনা। এখন পুলিস আমলাগণ বুঝি কর্ণে তুলা দিয়া বসিয়াছেন, নচেৎ সে যাত্রায় দাঙ্গা উপক্রমে কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জের সাবইনস্পেক্টর বাবু আসিয়া দোল বাজার চাপিয়া বসেন। এবার এত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে, প্রজাগুলিকে অশোকাষ্টমীর পাঠার মত দুই দলে টানাটানী করিতেছে, লাঠিয়ালেরা দলে২ ফিরিতেছে, তথাপি পুলিসের চেতনা না হওয়ার কারণ কি? জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করেন,

তবে আর কোনরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাগণের রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। আমরা এবার এস্থলেই লেখনী বরিত করিলাম, আগমীতে আরও লেখার বাসনা রহিল।

হোসেন পুর বংশবদ
১২৮০ সন শ্রী—
২৬ শে বৈশাখ

১৮ মে, ১৮৭৩

## [কৃষি]

"তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে, দেশের লোকের ভাগ্যে খোষা ভু যি হায় গো রাজা কি কঠিন"

হরিশচন্দ্র নাটকের একটি গানের উপরিউক্ত অংশ সম্পূর্ণরূপে অন্বর্থ বোধ হইতেছে। দিন দিনই ইংরাজেরা এদেশের সারভাগ গ্রহণ করিয়া এদেশীয়দিগকে একবারে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছেন। যদিও এদেশীয়রা এক২ বার আপনাদিগের উন্নতি মার্গে সমারূঢ় হইতে প্রয়াস বান হইতেছেন, কিন্তু ইংরাজ জাতির সকৌশল দুশ্চেষ্টায় এবং অযথোচিত রাজসাহায্যে প্রায়ই তাহা বিফলীভূত হইতেছে। হায় ! এতদ্দেশীয় শিল্পকর শ্রেণী বিশেষতক্ত তন্তবায়গণ ইংরাজ বণিক্‌দিগের স্বার্থানলে দগ্ধীপ্রায় হইয়াছে—সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এখন অন্নাভাবেও জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদিগের দায়ার উদ্রেক হইতেছেনা, প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় ব্যবসায়িগণকে একবারে রসাতলে দিবারই পুনঃ২ চেষ্টা হইতেছে। অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই, গবর্ণমেন্ট জানিয়া শুনিয়াও সজাতি পক্ষপাতী হইয়া এদেশীয়দিগের সর্ব্বনাশে সাহায্য করিতেছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল আনয়ন করিতে দেখিয়া মাঞ্চেষ্টরবাসী বনিগ্‌গণ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ষ্টেট্ সেক্রেটরির নিকট এই উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে চান যে, ভারতবর্ষে যে সকল বিলাতীবস্ত্রের আমদানী হইয়া থাকে, তাহার শুল্কের হ্রাসন্যূন করা হয়। ষ্টেট সেক্রেটরি প্রথমত মাঞ্চেষ্টরবাসীদিগের এই অন্যায় স্বার্থমূলক প্রস্তাবে সম্মত হন নাই বটে, কিন্তু অবশেষে পুনরায় সেই স্বার্থবাগুরায় বিদ্ধিবদ্ধ হইয়া তাহাদিগের অভিলাষানুরূপ কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছেন। শুনা যায়, তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণমন্টকে কতগুলি দ্রব্যের শুল্ক হ্রাস এবং আর কতগুলি দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করিতে অনুমতি করিয়াছেন। এবিষয়ে আমাদিগের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অল্প আগ্রহবান এবং অগ্রসর নন, সংপ্রতি তাঁহারা অতিসত্বর হইয়াই তন্মুলক একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছেন। এই আইনটি এত সহসা "পাস" করা হইয়াছে যে, প্রায় কাহাকেও মতামত প্রকাশ করিতে সময় দেওয়া হয় নাই। যে বিষয়ে এতদ্দেশীয় দিগের সবিশেষে স্বার্থ সমৃদ্ধ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ক আইন প্রণয়নে এদেশীয়দিগের মতামতের কিঞ্চিৎমাত্রও অপেক্ষা করা কি উচিত কার্য্য হইয়াছে?

প্রথমতঃ উল্লিখিত আইনে নীল, ধান্য ও চাউল ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত রপ্তানী দ্রব্যের শুল্ক একবারে উঠাইয়া দেওয়াই হইয়াছে। ইহার কি ইহাই অর্থ নয় যে, এদেশ জাত দ্রব্য সকল ভিন্নদেশীয়েরা বিশেষত ইংরাজেরা যেন অতি সহজে বিদেশে লইয়া গিয়া তাহাদিগের

বাণিজ্যের সুবিধা করিতে পারেন? রত্নাকার ভারতবর্ষের যাবতীয় মূল্যবান বস্তু বিদেশীরা অক্লেশে লইয়া গিয়া বিবিধ ব্যবসায় দ্বারা সম্পত্তিশালী এবং ভারতবর্ষ একবারে সম্পত্তিবিহীনও চিরদিনের নিমিত্ত মস্তকোত্তোলনে অক্ষম হইয়া পড়ে? এদেশ জাত বস্তু সকল সহজে বিদেশে রপ্তানী হইয়া গেলে, বাধ্য হইয়া আবার যেন সেই সকল বস্তুই এদেশীয়গণকে অধিকতর মূল্যে ক্রয় করিতে হয়? এবং এইরূপে এদেশবাসী ব্যক্তিগণ যেন ক্রমেই অধিকতর দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়া চিরকাল তাহাদিগের দাসানুদাস হইয়া থাকে?

দ্বিতীয়ত ইতঃপূর্ব্বে সাধারণতঃ সকল দ্রব্যেরই আমদানীর মাসুল ৭।।. সাড়ে সাত টাকা ছিল, উক্ত আইনে সে স্থলে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা হার নির্ধারণ করা হইয়াছে। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহারও স্থূল মর্ম্ম ইহাই প্রতীতি হয় যে, এরূপ হইলে বিলাতের যৎসামান্য আপাত মনোহর বিলাসাদির বস্ত্র সকল সহজে এদেশে আসিয়া এদেশীয়দিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিবে। একতঃ এদেশীয়দিগের সম্পত্তি নিঃশেষ প্রায় হইয়াছে দিন দিনই দুঃখ দারিদ্র বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার উপর স্বল্প মূল্যের বিলাসাদির প্রলোভন কি একান্তই অনিষ্টজনক নয়? আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই, বিলাতীয় বিলাসবস্তু এদেশে যত অল্প আগত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। বিলাতের বিলাস সামগ্রীতে এদেশের কিরূপ ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ করিতেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহা অবশ্যই অনুভব করিতে পারেন।

তৃতীয়ত তুলা জাত দ্রব্যের শুল্কের হিসাবে যে বার্ষিক আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছিল, তাহা হইতে ৮০ টাকা ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায়ীদিগের (অবশ্যই বিলাতের বণিকদিগের) লাভের সুবিধা করা হইয়াছে। এই অকুলন যে প্রকারান্তের দরিদ্র ভারতবর্ষেরই কুলন করিতে হইবে না, কে বলিতে পারেন? একতঃ মাঞ্চেষ্টরবাসীদিগের অন্যায় স্বার্থানুরোধে বিলাতী বস্ত্রের মাশুল কমাইয়া দিয়া এদেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ের সবিশেষ ক্ষতি করা হইতেছে, আবার ঐ কারণে রাজকোষের যে আয় হানি হইবে, তৎপুরণভারও ভারতবর্ষীয়দিগের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হইবে; ইহা অপেক্ষা সুবিচার আর কি হইতে পারে?

চতুর্থতঃ বিদেশ হইতে এদেশের তুলার আমদানীর শতকরা ৫ টাকা হারে শুল্ক নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইহার কি এরূপ অর্থ নয় যে, এদেশীয়েরা যেসকল কাপড়ের কল আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যেন তাঁহারা অল্পমূল্যে বিদেশীয় তুলাপ্রাপ্ত হইতে না পারেন? হায়! যে গবর্ণমেন্ট মাঞ্চেষ্টরের সুবিধার নিমিত্ত বস্ত্রাদির উপর শতকরা ২।।. টাকা হারে শুল্ক কমাইয়া দিলেন,—এদেশীয় তুলার রপ্তানীর মাশুল একবারে রহিত করিয়া দিয়া (১ম নিয়ম দেখ) তাঁহাদিগের এদেশীয় তুলাপ্রাপ্তির সুবিধাবিধান করিলেন, তাঁহারাই আবার ভিন্ন দেশীয় তুলার আমদানীর উপর ৫ টাকা হারে শুল্ক নির্ধারণ করিয়া এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অনিষ্ট চরণ করিলেন। বিজ্ঞ সহযোগী সোমপ্রকাশ যথার্থই বলিয়াছেন, "এত আইন না করিয়া এরূপ সহজ আইন করিলেই হইত যে মাঞ্চেষ্টের ভিন্ন অন্য কোন দেশের লোকে বস্ত্রাদি নির্মাণ করিতে পারিবেন না।" ফলতঃ এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের পদে ২ সজাতিপক্ষপাতিতাই প্রদর্শিত হইতেছে। এদেশীয়েরা ব্যবসায় বাণিজ্যের সমুন্নতি করিয়া অবস্থোন্নতি করে, গবর্ণমেন্টের ইহাতে যেন সম্যক অনিচ্ছাই প্রতিপাদিত হইতেছে। সেদিনকার অমৃতবাজার পাঠে অবগতি হইল, কলিকাতায় যে কয়েকটি সুতার কল সংস্থাপিত হইয়াছে, যদিও তৎসমুদায়ের কার্য্য এক প্রকার ভালই চলিতেছে, তথাপি

উৎকৃষ্ট তুলার অভাবে তাহাতে উৎকৃষ্টবস্ত্র প্রয়োনোপযোগী সুতা প্রস্তুত হইতেছে না। ভিন্নদেশীয় তুলা এদেশজাত তুলা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। কিন্তু তাহা এদেশে আনয়ন করা স্বাভাবতই ব্যয়সাধ্য। তাহার উপর যদি আবার বিদেশীয় তুলার আমদানী সম্বন্ধে শতকরা ৫ টাকা হারে নূতনবিধ শুল্ক স্থাপন করা হয়, এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে তৎপ্রাপ্তি অধিকতর ব্যয়সাধ্য, এমন কি অসাধ্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং কোনও কালে যে, এদেশীয় সুতার কলে অত্যুৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত হইবে এবং তদ্বারা এদেশেই উৎকৃষ্ট ২ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া এদেশের অভাব মোচন করিতে পারিবে, তাহার আশা একবারে বিদূরিত হইতেছে। কোথায় গবর্ণমেন্ট এদেশীয় প্রজাবর্গের প্রতি স্নেহবান্ হইয়া তাহাদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনুকূলতা করিবেন, কোথায় তাঁহারাই স্বার্থপর মাঞ্চেষ্টরবাসীদিগের কুমন্ত্রণায় বিমোহিত হইয়া এদেশীয়দিগের উন্নতির প্রত্যুহস্বরূপ নিয়মপরম্পরা বিধিবদ্ধ করিতেছেন। ইহারই নাম কি প্রজাবৎসলতা?

১৫ আগস্ট, ১৮৭৫

## নিরেখ বৃদ্ধির প্রস্তাব ও প্রতিধ্বনি

আমরা ভূমির নিরেখ বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করিয়া তদুৎপাদনের ব্যয় বাদে যে লাভ পায়, তাহার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ জমীদারকে করস্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রতিধ্বনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া প্রথমত একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখেন। আমরা তদুত্তরে গত ১৭ই শ্রাবণের ঢাকা প্রকাশে আর একটি প্রস্তাব প্রকটন করি। আমরা মনে করিয়াছিলাম, প্রতিধ্বনি অতঃপর আর এ বিষয়ে বাঙ্নিস্পত্তি করিবেন না, প্রকৃত ন্যায়পক্ষাশ্রয়ী হইয়া আমাদিগের প্রস্তাবেই সায় দিবেন, অথবা মৌনী থাকিয়া সম্মতি লক্ষণ জ্ঞাপন করিবেন, কিন্তু আমাদিগের সে অনুমান ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার এতদ্বিষয়িনী বিবাদস্পৃহা ভয়ানকরূপে কণ্ডুয়িত হইয়া উঠিয়াছে। গত ২রা ও ৯ই ভাদ্রের কাগজে তিনি এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের সমস্ত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া উপর্য্যুপরি দুইটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি এই উপলক্ষে এতগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন যে তাহার সকল কথার প্রত্যুত্তর করিতে হইলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত আমরা সহযোগীর অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলির উত্তরদানে ক্ষান্ত হইয়া শুদ্ধ প্রাসঙ্গিক বিষয় কয়েকটির মাত্র উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।—

বঙ্গদেশের ফসলোপযোগী ভূমি সম্বন্ধে প্রতিধ্বনির যেরূপ সংস্কার, আমাদিগের সংস্কার তাহার অন্যরূপ। তিনি হয়ত বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের উচ্চতর শুষ্ক ভূমি দর্শন করিয়াই এদেশের ভূমি সম্বন্ধে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমির অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহার প্রস্তাব পাঠ করিয়া এরূপ অনুমান করা যায়না। যদি তিনি ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমির স্বাভাবিকী অবস্থা অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের উল্লিখিত "বঙ্গদেশে নদীমাতৃক ও দেশমাতৃক এই উভয়বিধ ভূমিই বিদ্যমান আছে ... এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া এরূপ কথা বলিতেন না, "বঙ্গদেশের ভূমি সাধারণতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক, সুতরাং নিস্তেজ

হইয়াছে। এখন অধিক মৃত্তিকা খনন না করিলে ভাল শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" সহযোগী হয়ত শুনিলে চমৎকৃত হইবেন, এতদঞ্চলে এমন সহস্র২ লক্ষ২ বিঘা ভূমি রহিয়াছে, যাহাতে বিনা কর্ষনে (বীজ ছড়াইয়া ফেলিলেই) সরিষা, মুগ, মটর, মাস, খেসারি প্রভৃতি রবিখন্দ সকল অপর্য্যাপ্ত পরিমানে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, কাটিয়া আনা ভিন্ন তাহাতে কৃষকদিগকে আর কোনও শ্রম স্বীকার করিতে হয়না। অন্যান্য ফসল উৎপাদনেও তাঁদৃশী ভূমিতে অধিক পরিশ্রম লাগে না। এরূপ অবস্থায় "অধিক মৃত্তিকা খনন না করিলে ভাল শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই" একথার অর্থ কী? সহযোগী স্বীকার করিয়াছেন যে, যেসকল স্থানে পূর্ব্বে নদী ছিল না, তৎস্থান দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়া ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি করিলে, তদ্রুপ স্থলে অবশ্যই করবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তৎপ্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "নূতন প্রবাহিত নদী জমীদারদিগের ভূমির যেরূপ উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইরূপ অনেক ভূমি নিজদেহে গ্রাসও করিয়াছে, সুতরাং জমীদারেরা যেরূপ একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, সেইরূপ অন্যদিকে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতেও অধিকারী। প্রচলিত রাজবিধিতেই তাহার ব্যবস্থা আছে। তজ্জন্য নূতন ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না।" আমরা সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি, কোন আইনের কোন ধারায় এরূপ বিধান আছে যে, নদী প্রবাহিত হইয়া একের ভূমি উদরসাৎ করিলে তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপর ভূমির প্রজারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে?. আমরা স্পষ্টাক্ষরেই বলিতে পারি যে, প্রজাভূম্যাধিকারী আইনে এরূপ বিধান নাই। থাকার যুক্তিও লক্ষিত হয়না। নদীতে যাহার ভূমি যে পরিমাণে গ্রাস করে, সে তৎপরিমাণে করদায় হইতে মুক্তিলাভ করিবে, রাজবিধিতে এইমাত্র বিধান রহিয়াছে। অপর ভূমির করবৃদ্ধি দ্বারা তৎক্ষতিপূরণ হইবার বিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক আমরা সহযোগীর সঙ্গে২ নির্দিষ্ট পথভ্রষ্ট হইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। অতএব পশ্চাদ্পাদ হইয়া পুনরায় প্রকৃত পথের অনুসরণ করা যাউক।

আমরা বঙ্গদেশের ফসলোপযোগী উচ্চতর ভূমিসম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে, উহাতে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন না হইলেও ইক্ষু, আলু হরিদ্রা প্রভৃতি মূল্যবান ফসল সকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাতে কৃষকেরা অধিকতর লাভবানই হয়। সহযোগীও একথা অস্বীকার করেন নাই। তিনি এতদ্বিষয়ে এইমাত্র বলিয়াছেন, "এই সকল ফসল উৎপাদনে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়া থাকে ; সুতরাং উহার অতিরিক্ত লাভও কৃষকদিগেরই প্রাপ্য।" সহযোগীর স্মরণ রাখা উচিত আমরা কৃষকদিগের যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়া ভূমিতে যে লাভ হইয়া থাকে, সেই লাভেরই হারাহারী বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কৃষকদিগের সমস্ত ব্যয় পূর্ব্বেই বাদ দিয়া লাভ গণনা করা হইলে অতিরিক্ত ব্যয়ে অতিরিক্ত আপত্তি কি হইতে পারে?

প্রতিধ্বনি আমাদিগকে এই বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন যে, আমরা এদেশীয় কৃষকদিগের যত্ন পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য প্রতিপন্ন করিতে যেরূপ ব্যস্ত, তাহাদিগের কিসে ঐসকল বৃদ্ধি পাইতে পারে, তজ্জন্য সেরূপ ব্যস্ত নই। ভূমির নিরেখ বৃদ্ধির প্রস্তাবে কৃষকদিগের যত্ন পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির উপায় প্রদর্শনও কর্ত্তব্য, আমরা সহযোগীর অনুযোগেও ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না! আমাদিগের বিবেচনায় এতৎপ্রস্তাবে তাহা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। প্রতিধ্বনি বলেন, "যে সকল কৃষকের উৎকৃষ্ট কৃষি

যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারাও অনিশ্চিত অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি করিবে কেন?" আমরা জিজ্ঞাসা করি, কৃষকেরা যে সকল ভূমি দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল ভোগ করিয়া দখলের স্বত্বলাভ করিয়াছে ইচ্ছানুসারের জমীদার যে ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেনা, কৃষকেরা কি তদ্রুপ ভূমির উৎকর্ষের নিমিত্তই উৎকৃষ্ট২ কৃষিযন্ত্রাদির ব্যবহার করিয়া থাকে? আজি কালি এদেশের লক্ষ প্রজার ভূমিতে দখলের স্বত্ব জন্মিয়াছে, সহযোগী তাহাদের মধ্য হইতে কি এরূপ একজনকেও নির্দ্দেশ করিতে পারেন যে. সে ঐভূমির উন্নতির নিমিত্ত দেশান্তর হইতে উৎকৃষ্টতর কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছে? পক্ষান্তরে বরং জমীদার শ্রেণীর মধ্য হইতে এরূপ ভূরি ২ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্বাধিকৃত ভূমির উৎকর্ষের নিমিত্ত ব্যয়বিধান পূর্ব্বক জল প্রণালী ও কূপ পুস্করিন্যাদি খনন করিয়া এবং স্থান বিশেষ বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া থাকেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাদিগের অপেক্ষা জমীদার প্রভৃতির অত্যধিক পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতিধ্বনি একথা আংশিক স্বীকার করিয়াও প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করিয়াছেন। সহযোগী যদি এদেশের কৃষকশ্রেণীস্থ শ্রমজীবী প্রজাদিগের ইদানীন্তনী অবস্থায় অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে আর আমাদিগের এই কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। বস্তুতঃ ধরিয়া দেখিলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রযুক্ত শ্রমোপজীবী কৃষকদিগের আয় যত বাড়িয়াছে, ব্যয় তাহার কিয়ৎ পরিমানও বাড়ে নাই। শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের শ্রমসাধ্য যাবতীয় বিষয়েরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাদিগের শ্রমসাধ্য কার্য্যে জমীদার প্রভৃতির যত প্রয়োজন, অপরের পরিশ্রম সাধ্য কার্য্যাদিতে ইহাদিগের তত প্রয়োজন নাই। নিত্য নৈমিত্তিক আহার ব্যবহারাদিতে ইহাদিগের ব্যয় অতি যৎসামান্য, কিন্তু অনেক জমীদারকে তন্নির্ব্বাহেই প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বাহুল্য ভয়ে আমরা ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম না। আমরা স্বীকার করি, জমীদারদিগের ভোগ বিলাসিতার বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রজাদিগের অর্থ প্রয়োজিত হওয়া অনুচিত, কিন্তু আজি কালি তাঁহাদিগের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন বৃদ্ধি নিবন্ধনই যে পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যাধিক পরিমাণে ব্যয় বাড়িয়া উঠিয়াছে, সত্বর অধিকতর অর্থাগমের উপায় না হইলে অনেকের তৎসম্পাদনই সুকঠিন হইয়া উঠিবে। "জমীদারদিগের সম্মান রক্ষা করিতে অনেক ব্যয় হইয়া থাকে" আমরা এরূপ বলাতে সহযোগী বলিয়াছেন, "একের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত অন্যের আবশ্যকীয় বস্তু অপহরণ করা কি কর্ত্তব্য?" তিনি 'সম্মান রক্ষা' শব্দের রায় বাহাদুর প্রভৃতি নাম ক্রয় করা টীকা করিয়াছেন, বোধহয় তাহাতেই ঐরূপ বলিয়াছেন। বাস্তবিক উহা আমাদিগের মনোগত অর্থ নয়; নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ নিস্পাদন, এবং মধ্যে২ দেশ হিতকর কার্য্যাদিতে অর্থ দান না করিতে পারিলে জমীদারদিগের সম্মান রক্ষা পায় না বলিয়াই আমরা ঐরূপ ক্রিয়া কলাপ নিস্পাদন ও দানাদিকে সম্মান রক্ষার কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। সহযোগী উহার যে টীকা করিয়াছেন, আমাদিগের মনোগত অর্থ তাহা হইলেই বা কি? বহুব্যয়সাধ্য দেশহিতকর ও প্রজাহিতকর সৎকার্য্যানুষ্ঠান ভিন্ন কি কখনও কেহ "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়া থাকেন? ঐরূপ সম্মান রক্ষায়ও যে এক এক ব্যক্তির ভূরি অর্থের প্রয়োজন, তাঁহাদিগের আয় বৃদ্ধির নূতন উপায় উদ্ভাবিত না হইলে কি তৎসম্মানের সম্ভাবনা আছে। কৃষকদিগের অত্যাধিক লাভের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশদ্বারা জমীদারেরা অধিকতর অর্থশালী হইয়া ঐরূপ সম্মান রক্ষা করেন, ইহা কি একান্ত বাঞ্ছনীয় নয়? সংগৃহীত বহুল অর্থ একত্রিত হইলে

তদ্দ্বারা যত হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে, বহুলোকের হস্তগত অল্প অল্প অর্থদ্বারা তাহার কিছুই হইতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারিনা, সহযোগী কেন এই স্পষ্ট সত্যের অপলাপ করিতেছেন? সহযোগী কি এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পরিবেন যে স্থান বিশেষের প্রজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ অর্থে বিদ্যালয় চিকিৎসালয়, পান্থশালা প্রভৃতি সংস্থাপন কি খাল কূপ পুষ্করিনাদি খনন করিয়াছে? অথবা দুর্ভিক্ষাদি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তন্নিবারনার্থ অর্থ ব্যয় করিয়াছে?

প্রতিধ্বনি ইংলন্ড প্রভৃতি দেশসহ শ্রমোপজীবী লোকদিগের সহিত এতদ্দেশীয় কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের অবস্থার তুলনা করিয়া আর একটি ভ্রম করিয়াছেন। ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের শ্রমোপজীবী লোকেরা সামবেতী প্রণালী (Co-operative System) দ্বারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সুসম্পাদন করিতেছে সত্য; কিন্তু এদেশীর শ্রমজীবীদিগের দ্বারা কি তৎসম্পাদন সম্ভবপর? ইংলন্ডীয় শ্রমোপজীবীদিগের অর্থাগমের বিবিধ উপায় রহিয়াছে। এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে সেরূপ প্রশস্ত উপায় কোথায়ও নানা শ্রেণীর শ্রমোপজীবীদিগের উন্নতির মূল দেশীয় আঢ্য শ্রেণী। আঢ্য শ্রেণীর নানা প্রকাশ প্রয়োজন সাধনোপলক্ষে শ্রমোপজীবী ব্যক্তিরা বিবিধ নানা প্রয়োজনের সম্ভাবনা না থাকিলে কখনই সেরূপ অর্থাগম হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে সামবেতী প্রণালী তাদৃশী কার্য্যকরও হয় না। এ দেশীয় যাবতীয় আঢ্যশ্রেণী–বিশেষতঃ বড় মানুষ জমীদার শ্রেণী পূর্ব্বাপেক্ষা অসচ্ছল অবস্থাপন্ন হওয়াতে যে, এদেশীয় শ্রমোপজীবীদিগের ও অনেকের ব্যবসায় লোপাপন্ন প্রায় হইয়াছে, এমন কি অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় একবারে বিলুপ্ত হইয়া "হা' অন্ন। হা অন্ন" রব উঠিয়াছে, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারেন? তাদৃশী ব্যক্তিদিগের মধ্যে সামবেতী প্রণালী কার্য্যকর হইবে কেন? ইংলন্ড প্রভৃতির ন্যায় এদেশে সামবেতী প্রণালী দ্বারা উন্নতি কামনা করিলেনও এদেশীয় আঢ্যদিগের বিশেষতঃ জমীদারদিগের অবস্থোন্নতি বিধান বিধেয় হইতেছে। ভূমির নিরেখ বৃদ্ধি দ্বারা জমীদারদিগের অবস্থোন্নতি হইলে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদিগের অধিকতর অর্থাগমের সদুপায় বিহিত হইলে যে সহযোগীর প্রস্তাবিত সামবেতী প্রণালী দ্বারাও এদেশের বহুল উপকার সংসাধিত হইতে পারে ইহা বলা বাহুল্য।

এদেশীয় জমীদারেরা আয়ের অল্পতা ও ব্যয়ের বহুলতা নিবন্ধন ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন, অনেকে ঋণজালে জড়িত হইয়া অবশেষে জমীদারীর অংশ পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইতেছেন, অনেকে একেবারে উৎস্বন্নও হইয়া যাইতেছেন, প্রতিধ্বনি কি আজি পর্য্যন্তও ইহা অবগত নন? শুদ্ধ কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সাধারণ হিতকর কার্য্যাদিতে অর্থদান করিয়া এদেশের অনেক সৎকর্মশীল জমীদারই নিরন্ন হইয়াছেন। সহযোগী যদি তাহার তালিকা জানিতে চান, আমরা সময়ান্তরে তাহা প্রদর্শন করিতে অসম্মত নই। সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে এতদঞ্চলের দুই তিন জন জমীদার ভিন্ন আজিকালি প্রায় সকল জমীদারই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সৎকীর্ত্তিশীল প্রাচীন জমীদারদিগের অনেকেরই নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। যে দুই চারি জনের বংশধরেরা আজি পর্য্যন্তও জমীদার বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, তাঁহাদিগেরও অনেকেই দিবাপ্রদীপের ন্যায় হীনপ্রভ।

জমীদারেরা ভূমির প্রকৃত অধিকারী কি করসংগ্রাহক মাত্র তদ্বিষয়ে এক্ষণ বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন ; যে বিষয়ের মীমাংসা হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া ফল কি ? সহযোগীকে আমরা এতৎসম্বন্ধে কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাসা করি, "ভূম্যধিকারী" "জমীদার" ও ইজারাদার এসকল শব্দের অর্থ কি ? জমীদারও যাঁহারা কিয়ৎকালের নিমিত্ত কর সংগ্রহমাত্র করিয়া থাকেন ; তাঁহাদিগকেও কি জমীদার বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে ? সহযোগী যদি এতদ্বিষয়ক ভ্রমনিরসন করিতে বাস্তবিক সমুৎসুক থাকেন, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূত–পূর্ব্ব চিফ্‌জষ্টিস সার বার্নেস পিককের প্রসিদ্ধ প্রজাভূম্যধিকারী ঘটিত মকদ্দমার নিষ্পত্তি পাঠ করিয়া দেখিবেন ; দুই একজন ইংরাজ ইতিহাস লেখকের "রেন্ট কালেক্টর" শব্দ দেখিয়াই জমীদারদিগকে কর সংগ্রাহক মাত্র মনে করিবেন না।

১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫

## জমিদারী খাস করার প্রস্তাব

এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের উপর ক্রমে২ গুরুতর কর ভারাদি নিক্ষেপ ও তাহাদিগের স্বত্ব সঙ্কোচ করিতে দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশর্থ হউক, বা প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্ণমেন্টের হিত কামুক হইয়াই হউক, অথবা এদেশীয় ভূম্যধিকারীরা ভূমির পরিবর্ত্তে নগদ টাকা পাইলে তদ্বিনিয়োগে অধিকতর লাভবান হইতে পারিবেন। প্রজারাও সমধিক সুখী হইতে পারিবে এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, লন্ডন ষ্টেটসম্যানের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক নাইট সাহেব সংপ্রতি এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের জমিদারী খাস করিয়া লইবার নিমিত্ত একটি বিস্ময়কর প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া সমস্ত ভূমি খাস করিয়া লউন। লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন কিঞ্চিদধিক তিন কোটি টাকা বার্ষিক রাজস্ব আদায় হইত। তখন বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ ভূমিমাত্র আবাদ ছিল। ক্রমে২ অধিকতর পরিমাণে ভূমির আবাদ হইয়া এখন জমিদারদিগের আয় অনেক বর্ধিত হইয়াছে। রোডসের হিসাব দৃষ্টে জানা গিয়াছে, ভিন্ন২ শ্রেণীর ভূম্যধিকারীরা প্রজার নিকট হইতে এক্ষণ ১২/১৩ কোটি টাকা পাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে তিন কোটি টাকা মাত্র গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ৯/১০ কোটি টাকা ঐ ভূম্যধিকারীরাই বিভাগ করিয় লন। অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূম্যধিকারীরা নির্দ্দিষ্ট লাভ রাখিয়া অপরের নিকট জমি বিলি করেন, ভূমির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের কোনও বিষয়ের কোন ও সম্পর্ক থাকেনা। কেবল অলসভাবে তাহারা নির্দ্দিষ্ট পেন্সনের ন্যায় ভূমির উপস্বত্বের কিয়দংশ ভোগ করেন, মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামীদিগের ক্রমশঃ শ্রেণী ও সংখ্যাবৃদ্ধি নিবন্ধন প্রজার উপর ক্রমেই অধিকতর ভার পড়িতেছে এবং তাহাদিগের সহিত জমিদারদিগের অসদ্ভাব বর্ধিত হইতেছে। যদি গবর্ণমেন্ট সমস্ত ভূমি ক্রয় করিয়া লন ; তবে আর ইহার কিছুই থাকিবেনা। ভূম্যধিকারী, প্রজা ও গবর্ণমেন্ট সকলেরই উপকার ও লাভ লক্ষিত হইবে। জমিদারদিগের ভূমির মূল্য রৌপ্য মুদ্রায় প্রদত্ত হইলে, গবর্ণমেন্টের আনুষঙ্গিক এই লাভ হইবে যে, রৌপ্যের প্রয়োজন বর্ধিত হইয়া বর্ত্তমান রৌপ্যমূল্য হ্রাস নিবারিত হইবে এবং তদ্বশতঃ বৎসর২ গবর্ণমেন্টের যে ক্ষতি হইতেছে তাহার পূরণ হইয়া যাইবে। ভূম্যধিকারীরা আনুমানিক যে দশ কোটি টাকা বার্ষিক লাভ প্রাপ্ত হন, ১৫ গুণে তাহা ক্রয় করিতে হইলে, গবর্ণমেন্টের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা লাগিবে। একার্য্য একবারে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নয় সত্য ; কিন্তু প্রতিবর্ষে পাঁচ হইতে দশ

কোটি টাকা মূল্যের ভূমি ক্রয় করিলে ২০ বৎসরেই প্রায় সমস্তভূমি গবর্ণমেন্টের হস্তগত হইতে পারিবে। বৎসর২ পাঁচ হইতে দশকোটি টাকা বিলাতে ঋণ করিয়া এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করা যাইতে পারে। ইংলন্ডীয় গবর্ণমেন্ট এই ঋণের দায়িতা স্বীকার করিলে, শতকরা সাড়ে তিন টাকা হার সুদেই ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতদর্থ যে ঋণ করিতে হইবে, গবর্ণমেন্টকে তাহার নিমিত্ত বার্ষিক পাঁচ কোটি টাকার অধিক সুদদিতে হইবে না। কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিলে গবর্ণমেন্ট অন্ততঃ নয় কোটি টাকা করিয়া বার্ষিক লাভ পাইতে পারিবেন। সুতরাং উল্লিখিত সুদ প্রদান করিয়া গবর্ণমেন্টের বৎসর২ চারি কোটি টাকা করিয়া বাঁচিয়া যাইবে। তদ্দারা গবর্ণমেন্ট অনেক দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। পরন্তু এদেশীয়দিগের মূলধন অধিক নাই ; যাহা কিছু তাহা প্রায় ভূমির আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মূলধনের অভাব বশতই এদেশীয়বাসীরা বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। অতএব উল্লিখিত ১৫০ কোটি টাকা এদেশীয়দিগের মূলধন স্বরূপ হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়াদি করিয়া এদেশীয়েরা নিজের ও দেশর ধন বৃদ্ধি করিতে পরিসমর্থ হইবে। বঙ্গদেশীয় ভূমি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক সুযোগ পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে কার্য্য সম্পাদন করিলে রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সুমীমাংসা হইতে পারিবে।"

সাধারণতঃ ইংরাজজাতি যেরূপ অর্থ পিপাসু। অর্থগৃধু স্বার্থক পরায়ণও প্রত্যেক কার্য্যে প্রতি বিষয়ে লাভালাভ কামনাকারী, নাইট সাহেবের উল্লিখিত ভয়ঙ্কর প্রস্তাব তাহার অনুরূপই হইয়াছে। কিন্তু এদেশে এমন ব্যক্তি অতি অল্প। যাহার এই বিস্ময়কর প্রস্তাব শ্রবণমাত্র হৃৎকম্প উপস্থিত না হইবে। যাহা হউক "এদেশের যাবতীয় ভূমি খাস করা হইলে প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধি পরিবর্ধিত হইবে। ভূম্যধিকারীদিগের মূলধনের সংস্থান হইয়া বাণিজ্যাদি করিবার সবিশেষ উপায় হইবে, গবর্ণমেন্ট লাভবান হইতে পারিবেন, দায়িত্ব স্বীকার করিলে গবর্ণমেন্ট ভূমি ক্রয় করার টাকাও সহজে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।" ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই নাইট সাহেব স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে জমিদারদিগের জমিদারী, গবর্ণমেন্ট হস্তগত করিবেন। ভূম্যধিকারী গণ ইচ্ছাপূর্ব্বক ভূস্বত্ব বিক্রয় না করিলে, বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইবে কিনা প্রতিজ্ঞপূর্ব্বক একবার ভূম্যধিকারীদিগকে চিরকালের নিমিত্ত স্বত্ব দান করিয়া বল বা কৌশলপূর্ব্বক পুনরায় তৎপ্রতি গ্রহণ ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কিনা। জানি না কেন তিনি এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন নাই। ইহা হইলেই বোধ হয় তাহার প্রস্তাব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত এবং গবর্ণমেন্টও সন্তোষ সহকারে তদবলম্বন্ধে আগ্রহবান হইতে পারিতেন। আমরা কোন রূপেই বুদ্ধিসহ করিতে পারিনা যে গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বত্ত ভূস্বত্ব অনিচ্ছ ভূম্যধিকারীগণ হইতে বার্ষিক উপস্বত্বের পনের গুণ মূল্যে কেমন করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন। যদি বল, প্রবল প্রতাপ গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে স্বকীয় অসীমক্ষমতার যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োগ করিলে অক্লেশ উহা সুসম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহা হইলে আমাদিগকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, আমরা পরাজিত হইলাম ; আর আমাদিগের যুক্তিতর্ক ন্যায়ান্যায় বিচার কিছুই নাই। অন্যথা আমরা অবশ্যই বলিব [ যত ] দিন পৃথিবীতে ন্যায়ের সম্মাননা ও ধর্ম্মের আদর থাকিবে ততদিন [ সহস্র ] ক্ষমতা থাকিলেও গবর্ণমেন্ট এরূপ লোকবিগর্হিত অধর্ম্মাচারণ করিতে পারেন না।

নাইট সাহেব যাহাই বলুন না কেন, তাহার প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে কি গবর্ণমেন্ট, কি ভূম্যধিকারী ও কি অধস্তন প্রজা কাহারও প্রকৃত প্রস্তাবে লাভ বা উপকার হইবে না। প্রত্যুত ক্ষতি ও অপকারেই ভূয়সী সম্ভাবনা রহিয়াছে। নাইট সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন বটে যে, গবর্ণমেন্ট ঋণ গ্রহণ করিয়া জমিদারী ক্রয় করিলেও বার্ষিক প্রায় ৪ কোটি টাকা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার এক বিষয়ে গুরুতর ভ্রম ঘটিয়াছে। সমস্ত ভূমি খাস করিয়া একবারে প্রজার নিকট হইতে অল্প২ পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে গবর্ণমেন্টের কত ব্যয় পড়বে এবং বর্ষ ২ কি পরিমাণ টাকাই বা অনাদায় থাকিবে, ইহা নির্ধারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, প্রজার অনাদায়ী খাজনা ও খাজনা তহশিল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়া ধরিলে গবর্ণমেন্টর বড় লাভ দৃষ্ট হইবেনা। এক্ষণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদান না করিলে ভূসম্পত্তি নীলাম করিয়া খাজনা আদায়ের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে। খাস প্রজাদিগের সম্বন্ধে কিন্তু সেবিধান থাকিবেনা। সুতরাং রীতিমতে যথা সময়ে সমস্ত খাজনা আদায়ও হইয়া উঠিবে না ; অবশ্যই কিছু না কিছু অনাদায় থাকিবে। পরন্তু জমিদারেরা যে পরিমাণে ব্যয় করিয়া ভূরাজস্ব হস্তগত করিয়া থাকেন, গবর্ণমেন্টকে নানা কারণে তদপেক্ষা অধিকতর ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের কোন কার্য্য অত্যল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে? এদেশীয়দিগের কার্য্য প্রণালীর সহিত গবর্ণমেন্টের কার্য্য প্রণালীর তুলনা কি (এতদধিক) কালমধ্যে ও ইহা প্রতিপন্ন হয় নাই। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করা যাইতে পারে যে, প্রস্তাবিত কার্য্যানুষ্ঠান উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট অনেকগুলি লোক প্রতিপালন করিতে পারিবেন, অনেক ইংরাজ কর্মচারী লম্বা বেতন পাইয়া সুখ সম্ভোগে পরিসমর্থ হইবেন এবং এদেশের অপেক্ষাকৃত অধিকতর অর্থ বিলাতে যাইবার আর একটি প্রশস্ত দ্বার উদঘাটিত হইবে। প্রস্তাবিত কার্য্যারম্ভেই যে বিষয় গোলযোগ উপস্থিত হইবে, ভিন্ন ২ কর্মচারী ভূস্বামীদিগের সংখ্যাও স্বত্ব নিরূপণাদির প্রয়োজন হইবে। তদর্থ বহু সংখ্যক বড়২ কর্মচারী নিযুক্ত না করিয়া উপায় নাই। এক্ষণ জমিদারেরা নিজে জমিদারী সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, গবর্ণমেন্টের নিশ্চয়ই সেই কার্য্য নিম্পাদন করিবার নিমিত্ত উচ্চ বেতনের ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োজনের প্রয়োজন হইবে। জমিদারেরা ১৫/২০ টাকা বেতন দিয়া যেখানে নায়েব নিযুক্ত করিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্ট হয়ত সেস্থলে ১৫/২০০ টাকা বেতনের ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে হইবে। সেই পরিমাণে অন্যান্য বিষয়েও যে অধিক ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বলা বাহুল্য। অতএব নাইট সাহেন জমিদারী খাস করা হইলে গবর্ণমেন্টের যে আয়ের অনুমান করিয়াছেন, প্রাথমিক ভূস্বত্বাদি নিরূপণ ও মূল্য নির্ধারণাদি কার্য্য সম্পর্কীয় ব্যয় এবং অনাদায়ী খাজনা ও উসুল সম্বন্ধীয় ব্যয় ধরা হইলে কখনই তত টিকিবেনা।

জমিদারদিগের স্থায়ী ভূসম্পত্তির বিনিময়ে নগদ টাকা প্রাপ্তিতে অধিকতর লাভ দূরে থাকুক বরং ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে উহা ব্যয়িত হইয়া গিয়া অবশেষে একবারে নিঃসম্বল দরিদ্র হইয়া পড়ারই ভূয়সী সম্ভাবনা। একতঃ এদেশীয়দিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে যথোচিত পরিজ্ঞান নাই, কোম্পানি স্থাপন পূর্ব্বক সংযোজিত অর্থবিনিয়োগে বিস্তৃত করিবারও রীতি প্রচলিত নাই, তাহাতে আবার জমিদার শ্রেণী আবহমানকাল হইতে যেরূপ শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগের ব্যয় বাহুল্য বিষয়ে যত, আয়াধিক্য বিষয়ে তত অভিজ্ঞ ও লাভ হয়না। আমরা অহরহঃ ইহার ভূরি২ দৃষ্টান্ত দেখিয়া শুনিয়াও জ্ঞানলাভ

করিয়াছি তাহাতে একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারি, এদেশীয় ভূম্যধিকারি শ্রেণীস্থ লোকে ভূমির পরিবর্ত্তে যথেষ্ট অর্থপ্রাপ্ত হইলেও তাহা খাটাইয়া অধিক লাভ করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত অচিরকাল মধ্যে ঐ অর্থের অপচয় করিয়া পরিশেষে নিঃস্ব নিরুপায় হইয়াই বসিবেন। বস্তুত যাহারা এদেশের ও এদেশীয় লোকের রীতিচরিত্র অবগত আছেন, তাহার কখনই এ কথায় আস্থা স্থাপন করিবেন না যে, এদেশীয় ভূম্যধিকারীরা ভূমির বিনিময়ে নগদ টাকা পাইলে তদ্বারা কার্য্যতঃ লাভবান হইতে পারিবেন।

নাইট সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করা হইলে প্রজাদিগেরও বাস্তবিক সুখ সুবিধা কিছুই হইবে না বরং অসুখ অসুবিধাই বাড়িবে। সাধারণ জমীদার তালুকদার প্রভৃতির প্রজাদিগের সহিত খাস মহলের প্রজাদিগের অবস্থার তুলনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। কে না জানেন যে, খাসমহালের প্রজাগণকে অপেক্ষাকৃত অত্যধিকহারে খাজনা দিতে এবং আইনের জ্বালায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। ফলতঃ জমীদার তালুকদারেরা প্রজাগণের নিকট হইতে যেরূপ রহিয়া সহিয়া অবস্থানুসারে খাজনা আদায় করেন, গবর্ণমেন্ট কিছু সেরূপ করিবেন না। হাতে টাকা থাকুক না থাকুক, গবর্ণমেন্টের খাস প্রজাদিগের নিয়মিত সময়ে খাজনা না দিয়া নিস্তার নাই। ঘর বেচ, গরু বেচ, আর ঘটি বাটি প্রভৃতি যাহা কিছু তৈজসপত্র থাকে তাহাই বিক্রয় কর, নির্দিষ্ট সময়ে গবর্ণমেন্টর তহশিলদারকে অবশ্যই খাজনা দিতে হইবে। না দিলে অত্যাচার না হইবে এরূপ বলা যাইতে পারেনা। জমীদার তালুকদার প্রভৃতি কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইলে গবর্ণমেন্টের নিকটে নালিশ করিয়া তৎপ্রতীকারের লাভের উপায় রহিয়াছে কিন্তু স্বয়ং গবর্ণমেন্ট অত্যাচার করিলে তৎপ্রতীকারের উপায় কি? গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতীকার সম্ভাবনাও অল্প থাকিবে। পরন্ত সময়ে২ শস্যাদি উৎপন্ন না হইলে দুর্ভিক্ষাদি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে ভূম্যধিকারীরা প্রজাদিগের উপর যেরূপ সদদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সময় ব্যত্যয় করিয়া খাজানা আদায় বা একেবারেই খাজানা মাপ করেন,-কখনই বা নিজ হইতে শস্য অথবা অর্থ প্রদান করিয়াও প্রজাদিগের উপকার করিতে ত্রুটি করেন না। গবর্ণমেন্ট ও কি সেইরূপ করিতে প্রবৃত্তিমান হইবেন? সেরূপ করিতে গেলে নাইট সাহেবের আনুমানিক আয় অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের খাস জমিদারীর আরো ন্যূনতর হইবেনা।

নাইট সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ভূম্যধিকারিগণের ভূস্বত্ব খাস করা হইলে আর একটি মহানিষ্ট এই হইবে এক্ষণ এদেশে ধনশালী জমিদার শ্রেণী বিদ্যমান থাকতে সময়ে২ গবর্ণমেন্টের ও দেশের এবং সাধারণ প্রজাবর্গের যে হিতমূলক অনুষ্ঠানাদি হইতেছে। তাহার পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এটিও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। অতএব আমরা বলিতে সঙ্কুচিত নই যে, নাইট সাহেবের প্রস্তাব অন্যায্য। অধম, অসাধ্য অপূর্ণ, অনবলম্বনীয় ও অহিতমূলক ; সুতরাং সর্ব্বদা প্রত্যাখ্যানযোগী।

২৩ জানুয়ারী, ১৯৮১

## রেন্টবিল ও প্রজাসমিতি

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের প্রজাসভার ন্যায় বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই আজিকালি প্রজাসমিতি হইয়া প্রস্তাবিত রেন্টবিলের[৯৭] প্রজাপক্ষ সমর্থক ধারার অনুমোদন ও আপাততঃ

প্রজাবিরোধিবৎ প্রতীয়মানধারার বিরুদ্ধ প্রস্তাব অবধারন করা হইতেছে। ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্পর্ক। স্বত্ব ও হিতাহিত প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক। উক্তরূপ সভাহবানকারিগণের প্রজহিতৈষনা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া জমীদারশ্রেণীর হিতাহিতের প্রতি দৃকপাতও করিতেছে না, ভূম্যধিকারী শ্রেণী রসাতলে যাউক, আর যাহাই হউক, তৎপ্রতি ভ্রক্ষেপও নাই। দেশীয় শ্রীবৃদ্ধির সম্পাদয়িতা, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠাগণ, রথ্যানির্ম্মান, পুস্করিন্যাদি খনন প্রভৃতি দেশ হিতকর ও প্রজা হিতবিধায়ক অনুষ্ঠান পরম্পরার অনুষ্ঠাতা, দেশের স্তম্ভ স্বরূপ জমীদার শ্রেণীর মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহারা প্রজার উপকার সাধনে অনুদ্যোগী হন, তাহারা কেমন বুদ্ধিমান ও কিরূপ দেশহিতৈষী ব্যক্তি বুঝিয়া উঠা ভার।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অদ্যও বলিতেছি, যে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা সমর্থন করিয়া প্রজাহিতৈষীতা প্রদর্শন করা হইতেছে। বস্তুগত্যা উহা প্রজাগণের মঙ্গলজনক নহে, সর্ব্বনাশেরই হেতুভূত। কৃষকশ্রেণীর অস্বচ্ছলতা চিরন্তন। স্বচ্ছলতা ঘটিবার নানা কারণ সত্ত্বেও উহারা অবিবেচনা ও অপরিনামদর্শিতামূলক আচরণবশতঃ দৈন্যগ্রস্ত অতএব জমীদারের রাজস্বপ্রদান কালে নৈমিত্তিক কার্য্যাদি উপলক্ষে ঋণ [ অস্পষ্ট ]। ভূমির দখলীকৃত বিক্রয়ের ক্ষমতালাভ হইলে ঋণগ্রহণের পথ আরো পরিস্কৃত হইবে, সুতরাং অবিবেকী কৃষশ্রেণী সহজেই ঋণজালে জড়িত হইতে থাকিবে এবং তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত উক্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়া অচিরেই "হা হতোহস্মি" রব করিবে, বলা বাহুল্য। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, জমীদার শ্রেণীর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিদান না করাতে, প্রজার দখলীস্বত্ব হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি বিষয়ক আপাত মধুর, পরিণামদির সবিধানের অন্তঃপ্রবৃষ্ট না হইয়া তৎসমর্থন করাতে দেশের ও প্রজাবর্গের হিত প্রত্যাশা দূরে থাকুক, প্রভূত অনিষ্টের ভূয়সী সম্ভাবনা রহিয়াছে। নিরতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, বিগত ২৬ শে মার্চ কলিকাতায় যে এক পক্ষাশ্রীয় প্রজাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, ভারত সভা উহার প্রধান উদ্যোক্তা। সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষাশ্রয়ী, গায়ে পড়িয়া প্রজাপক্ষালম্বন করা কি ভারতসভার পক্ষে শোভনীয়? যে কার্য্যে দেশের প্রকৃতি বর্গের, নিজের কাহারই ইষ্ট সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত অমঙ্গলেরই হেতু রহিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া কি ভারত সভা যশস্বী হইয়াছেন অথবা হইবেন? অনেকেরই বিশ্বাস, এতদ্বারা তাহারা অনভিজ্ঞতা ও অবিমৃশ্যকরিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ভারতসভার[৯৮] এই কার্য্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের সুযোগ্য সহযোগী আনন্দ বাজার বলিয়াছেন—"আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে সকল মহাত্মা রায়তদিগের পক্ষালম্বন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কয় ব্যক্তি নিজে এই আইনটি বুঝিতে পারিয়াছেন? রায়তেরা একি আইন্ হইতেছে, তাহা জানিতে চেষ্টা করেনা, তাহাদিগের কাজ তাহারা করিতেছে। বুদ্ধির অগম্য বিষয়ে তাহাদের মাথা ধরাইবার দরকার কি? রায়তেরা তাহাদের পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আহবান করে নাই, তাহারা কখনও ভারতসভার নাম শুনে নাই। ভারত সভা গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা না, মারকিনের যান। তাহা অবগত নহে, সুতরাং তাহার সাহায্যও চায়না। কিন্তু হে রায়ত। তুমি সাহায্য না চাহিলেও ভারতসভার তুমি ভিন্ন গতি কি? রায়তদিগের মুখপাত্রতা দেখাইবার নিমিত্ত কলিকাতার বাবুরা মফস্বলে গিয়া এক এক

স্থানে কতগুলি লোক জমা করিয়া একটী হাঙ্গামা করেন। তৎপর কাগজে বাহির হয় অমূক স্থানে এত রায়ত জমা হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ... ভারতসভার লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া মেকি চালাইতে যাইয়া আপনাদিগকে লোকের নিকট ঘৃণিত করিয়াছেন ও ঘোরতর স্বার্থপর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভারত সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য রায়তগণের উপকার করা নহে, নিজের উপকার করা ; সুতরাং নিজের উপকার করিতে গিয়া রায়তের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াও তাহারা প্রকৃতপক্ষে রায়তদিগের ঘোরতর অপকার করিয়াছেন, জমীদারের সহিত প্রজার মনোবিবাদ ঘটাইয়া দিতেছেন ও দেশে অশেষ অনিষ্টের বীজ রোপন করিতেছেন। "আনন্দ বাজার" প্রজাসভাসম্বন্ধে যেরূপ উক্তি করিয়াছেন আমরা পূর্ব্বে অনুমান বলেই তদ্রুপ বলিয়াছি। বস্তুতঃ ইদানীং যে সকল প্রজাসভার অধিবেশন হইতেছে, প্রজারা তাহার উদ্যোগকারী নহে, অনুচিত প্রজাহিতৈষীদলের প্ররোচনাই উহার একমাত্র হেতু।

প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত আইন হইয়াছে, তাহার কোনখানিই জমিদারের অনুকূল নহে। ভূস্বামীরা অত্যাচারী, প্রজার সর্ব্বস্বশোষক, ব্যবস্থাপকগণের ইত্যাকরার ভ্রান্ত সংস্কার প্রযুক্তই হউক আর কারণান্তর প্রযুক্তই বা হউক, দিন দিন জমিদারদিগের স্বত্ব, ক্ষমতাদি বিলুপ্ত ও স্বাধীনতা খর্ব্বীকৃত করা হইতেছে, পক্ষান্তরে প্রজারা অত্যাচার নিপীড়িত ও নিঃসহায় এই ভাবিয়া তাহাদের স্বত্ব ও সুবিধাদি বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রস্তাবিত বিধান সম্বন্ধেও উক্তরূপ ঘটনা ঘটিবে, আমাদিগের এই আশঙ্কা জন্মিতেছে। এতন্নিবন্ধন আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, যাহাতে, ভূম্যধিকারী ও প্রজা কাহারই অনিষ্ট হইতে না পারে। নির্ব্বিবাদে খাজনা আদায়ের সুবন্দোবস্ত হয়, অথচ প্রজাপীড়নের পথ ও না থাকে, এরূপ অপক্ষপাতমূলক বিধি ব্যবস্থাপন করা হউক। আমরা আহলাদিত হইলাম, যে সোমপ্রকাশ বহুদিবসের হইতে প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, ভূস্বামীশ্রেণীর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তত দৃকপাত করেন নাই, ইদানীং তিনিও প্রজাপক্ষ পাতিতা ও জমীদারের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অপক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের মুখে ভূস্বামীর হিতেচ্ছামূলক ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের মুখে ভূস্বামীর হিতেচ্ছামূলক এই বাক্য কয়েকটি বড়ই সুন্দর শুনা যাইতেছে যে, "জমীদারেরা উৎসন্ন হন, এ আমাদের ইচ্ছা নয়! জমীদারেরাই বঙ্গদেশের ধনিকশ্রেণী। দেশমধ্যে ধনিকশ্রেণী না থাকিলে দেশ উন্নত বলিয়া পরিগণিত হয়না। দেশ সাধারণ্যে আপদ ঘটিলে ধনিশ্রেণী হইতেই সবিশেষ সাহায্য লাভ হয়। ১২৭৪ সালের দারুণ অনাবৃষ্টিকালে এবিষয়ের সবিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে। অতএব ব্যবস্থাপকগণের বিবেচনার দোষে যদি সেই জমীদারদল উৎসন্ন হন, বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে"। উপসংহার কালে বক্তব্য এই, বিজ্ঞ২ ব্যক্তিরা যখন প্রস্তাবিত বিধি সম্বন্ধে অপক্ষপাতমূলক ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে যে, তাঁহারা সবিশেষ প্রনিধান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্ধারণ করেন। বিষয়টি অত্যন্ত গরুতর। পূর্ব্বপূর্ব্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরগণ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান ও আলোচনাদি করিয়া শীঘ্র না হউক, বরং কাল বিলম্বেই সদব্যবস্থা করা হয় এই আমাদিগের এই বাসনা।

১০ এপ্রিল, ১৮৮১

**বঙ্গে কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা**

যে ভূমি স্বর্ণপ্রসূ, শস্যশ্যামলা প্রভৃতি বিশেষণ সর্ব্বত্র বিখ্যাত, আর সেই ভারতভূমি অন্নকষ্টের আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত [ অস্পষ্ট ]—এখন তাহার সকল সন্তানের ভাগে দুই বেলা সমানে অন্ন জুটিতেছেনা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। দৈবনিগ্রহ, ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি হ্রাস লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও ভিন্ন দেশে অধিকতর শস্য রপ্তানী, ইহার কোন্ কোন্ কারণে এই শোচনীয় দুর্গতি ঘটিয়াছে, কি অবলম্বন করিলেই বা উহার প্রতীকার হইতে পারে, ভারতবাসী মনস্বিমাত্রেরই তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, ইদানীং দেশের এমনই দশা দাঁড়াইয়াছে, যে, প্রায় সকলেই গবর্ণমেন্টের মুখপ্রেক্ষী—গবর্ণমেন্ট উঠিতে বলেন ত উঠেন, বসিতে বলেন ত বসেন, এরুপ জীবন্মৃত দশাই দেশীয়গণকে জড়ীভূত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে বড় একটা হিতপ্রত্যাশা নাই। গবর্ণমেন্টই শেষ ভরসা স্থল।

ভূমি রাজস্ব ভারতীয় গবর্ণমেন্টের আয়ের প্রধানতম পথ। কৃষির উপর সেই রাজস্বের উন্নতি নির্ভর করে। যেবার যেরুপ ফসল হয়, সরকারী রাজস্বের অবস্থাও সেবার তেমনই দাঁড়ায়। অজন্মা হইলে, ভূমি রাজস্ব আদায় হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং এদেশীয় কৃষির উন্নতি সাধিত হইলে, কেবল কৃষকও ভূম্যধিকারীর স্বার্থসিদ্ধি হয় এমন নহে, গবর্ণমেন্টেরও রাজস্ব আদায়ের সুবিধা ঘটিয়া থাকে। অতএব শুদ্ধ প্রজাবাৎসল্যবশত নহে, স্বার্থানুরোধেও কৃষির উন্নতিবিধানে মনোযোগ দান করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, এতকাল এ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। ব্রিটিশ শাসনমাহাত্ম্যে ভারতের আচার ব্যবহারের-রীতি, প্রকৃতির অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে,-ধান্যেশ্বরীর বদলে ব্রান্ডি, শেরি, শাম্পিন চলিয়াছে,-ধুতিচাদরের জায়গায় পেণ্টুলনকোট, ঘটীবাটীর স্থলে গ্লাস, প্লেট, কুশাসন ও ভূমির বদলে চেয়ার টেবিল খাটিতেছে, কিন্তু মান্ধাতার আমলে চাসের যেরুপ নিয়মপ্রণালী ছিল, আজিও তাহাই রহিয়াছে। চাসীরা পুরাকালীন সেই অকিঞ্চিৎকর লাঙ্গলেই ভূমিকর্ষনপূর্ব্বক কষ্টেসৃষ্টে কতক কতক শস্য উৎপাদন করিয়া দিন গুজরাইতেছে। গবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে কৃষিবিষয়ক উন্নতির 'গদ' আওরাইয়াছেন বটে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোনও সংস্কার, শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারেন নাই। স্যর এশলি ইডেনের শাসনকালে যখন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিলাতে পাঠাইয়া কৃষিবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত বৃত্তি স্থাপন করা হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম, আমাদের গবর্ণমেন্ট বুঝি এদেশীয় কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হইলেন। বঙ্গসন্তান বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিবেন, দেশে আসিয়া সেই শিক্ষার ফল প্রদর্শন করিবেন, এই ভবিষ্যসুখের স্বপন দেখিয়া কতই না আশ্বস্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু কৃষিবিদ্যাপারদর্শী বঙ্গীয় যুবক নেটিব সিবিল সার্ব্বিসে শ্ব-বৃত্তি করিতেই নিযুক্ত হইলেন দেখিয়া আমাদের আশা ভরসা শূণ্যে বিলীন হইয়া গেল। সুখের বিষয়, এতদিন পরে আমাদের নিরাশহৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল—এতকাল পরে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট একটী কৃযিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সিবিলিয়ান ফিনুকেন সাহেব বিভাগের ডিরেক্টর হইলেন এবং সাইরেণ সেষ্টার কৃষিকলেজশিক্ষিত বাবু অম্বিকাচরণ সেন, সৈয়দ সখায়ৎ হোসেন ও সিবিলিয়ান এলেন সাহেব উহার কার্য্য পরিচালনভার পাইলেন। কৃষির তত্ত্বানুসন্ধান ও উন্নতিবিধান উক্ত বিভাগ স্থাপনের মুখ্যোদ্দেশ্য। মোঃ এলেন ও সৈয়দ সখায়ৎ হোসেন আপাততঃ বেহারে এবং বাবু অম্বিকাচরণ সেন সম্ভবতঃ বদর্ধমানে কার্য্য করিবেন। এই

সকল স্থানে যদি তাঁহাদের কার্য্যফল দর্শে, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশে যন্ত্র ও বীজ প্রভৃতি ব্যবহারে কৃষকদিগের উৎসাহবদর্ধন,—স্থানে স্থানে কৃষিপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎকৃষ্টশস্য ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য কৃষকদিগকে পুরস্কার দান করিবারও ব্যবস্থা হইবে। গবর্ণমেন্ট খাস মহলে, ওয়ার্ডষ্টেটে ও বিজ্ঞ বিজ্ঞ জমীদারের অধিকারে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিবেন।

কৃষিবিভাগের উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী ও তৎপরিচালকদের ক্ষমতাদিসম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে, আগামীতে সে সকলের উল্লেখ করা যাইবে।

১৭ মে, ১৮৮৫

**বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ। (২য় ভাগ)**

আশা ছিল, বঙ্গে কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সূচারুরূপে কার্য্য চলিলে, কৃষিপ্রজার উন্নতি ঘটিবে, সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারী ও গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায়ের পথ পরিষ্কৃত হইবে। কিন্তু উক্ত বিভাগেরই কার্য্যপরিচালনের যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে বড় একটা মঙ্গল হউক বা না হউক, প্রজাভূম্যধিকারীর অমঙ্গলের লক্ষন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ক্ষেত্রজরিপ, প্রজার ভূমিস্বত্বনির্ণয়, তৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্র রক্ষণ ও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহার্থ যে বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করার কথা হইয়াছে, তাহার ব্যয়ভার প্রজা ও জমীদারের স্কন্ধে নিপতিত হইবে। প্রজাকে খাজনার উপর শতকরা ও জমীদারকে শতকরা আনা টেক্স দিতে হইবে ; অর্থাৎ সাকল্যে শতকরা আনা করিয়া টেক্স গৃহীত হইতে থাকিবে। কৃষিবিভাগের কার্য্য বিস্তৃত হইবে। বাবু অম্বিকাচরণ সেন ও সৈয়দ সখায়ৎ হোসেন কৃষিবিষয়ে হাজার পারদর্শী হইলেও যে বর্ণদোষে নিগ্রহ ভোগ করিবেন, ইহা আমাদের জানাই আছে, সুতরাং সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু মোঃ এলেন শ্বেতচর্ম্মা, সিবিলিয়ান ও সাইরেন সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র হইয়াও কৃষিবিভাগের নায়কত্ব পাইলেন না অথচ তদ্রুপ কৃষিদক্ষতার প্রশংসাপত্রধারী না হইয়াও ফিনুকেন উহার অধিকারী হইলেন কেন, বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত সংশয় ও ক্ষোভেরই উদয় হইল।

সংপ্রতি কৃষিতত্ত্বানুসন্ধান নিম্নলিখিত কার্য্যে পর্য্যবসিত হইবে ; যথা—প্রত্যেক ক্ষেত্র জরিপ ও প্রধান২ আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ। প্রতি গ্রামের পাটওয়ারিদিগকে ক্ষেত্রে জরিপের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া এবং গ্রামসকলের হিসাব আদি রক্ষার জন্য পাটওয়ারি নিযুক্ত করা।

কৃষির উন্নতি সাধনার্থ এইরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত হইবে—কোন জেলার কোনও বিশেষ গ্রামে দেশীয় কৃষিকার্য্যের প্রণালী অভ্যাস করিয়া তথায় আরও উৎকৃষ্টতর প্রণালী, উৎকৃষ্টতর বীজ ও মূল্যবান শস্যবপন সম্ভবপর হইলে সে চেষ্টা করা যাইবে। কৃষক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিলে, তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার অঙ্গীকার করিযা ক্ষেত্রের অদর্ধাংশে নূতন ও অপরাদের্ধ পুরাতনপ্রণালী অনুসারে শস্য বপন করা হইবে। ইহাতে সুফল দেখিলে অন্যান্য কৃষকগণ নূতন প্রণালীতে চাস করিতে উৎসুক হইবে। এতদ্ব্যতীত গবাদি পশুর উন্নতি, পীড়া নিবারণ ও আহারীয় উৎপাদন এবং প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী কাষ্ঠ জন্মাইবার উপায় অবলম্বিত হইবে। যাঁহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানে

সমুৎসাহী তাহাঁদিগকে লইয়া স্থানে২ কমিটী স্থাপন—কমিটীর সাহায্যে উৎকৃষ্টতর কৃষি গবর্ণমেন্ট প্রজার হিতার্থ কৃষিবিভাগ খুলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে "বাহবা" লইবেন, ওদিকে কপর্দ্দকও ব্যয়স্বীকার করিবেন না ; প্রজা ও জমীদারেরাই সে দোহনযন্ত্রের দুহ্য স্থানীয় হইবে, মন্দ কৌশল নহে। সে যাহা হউক, একে এই টেক্স দেওয়াই প্রজা ও জমীদারের পক্ষে একান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবে, তদুপরি ৫/৭ টাকা বেতনের কর্ম্মচারীরা অনাহারে শুদ্ধতালু হইয়া ষোড়শোপচারে পূজা পাইবার জন্য যে, লালায়িত হইয়া থাকিবে, তদর্থও ব্যয়বিধান না করিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। যে পক্ষ ঐ কর্ম্মচারীর উদর পূরণ করিতে পারিবে, সে পক্ষেরই নিজ মতলব হাসিল করিবার সুবিধা ঘটিবে। দর্শনী দিয়া জমীদার, প্রজার কায়েমী স্বত্বকে ঠিকা এবং প্রজা, নিজের ঠিকা স্বত্বকে কায়েমী করিয়া লইতে থাকিবে এবং তদ্বশতঃ হয় প্রজাকে, নয় জমীদারকে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেখানেও ষ্টাম্প প্রভৃতির নিয়মিত ও অন্যান্যরূপ অনিয়মিত ব্যয়ে জমীদার ও প্রজা "ফতুর" হইয়া পড়িবে। এখনই পূর্ত্তকর ও রোডসেস হিসাবে খাজানার উপর বর্ষে বর্ষে ৬ হইতে ১২৷৷ পর্য্যন্ত দিতে হয় ; ইহার উপর "কৃষি-সেস" স্কন্ধ চাপিয়া বসিলে, প্রজার সর্ব্বস্ব শেষ হইবে, বলা বাহুল্য। ইদানীং ৩/৪ বা ৫/৬ বৎসরান্তে অন্নকষ্ট ঘটিয়া থাকে। কৃষিবিভাগের নিয়মশৃঙ্খলা— মাহাত্ম্যে প্রজার সর্ব্বস্বান্ত হইতে থাকিলে, প্রতিবর্ষেই অন্নকষ্ট ঘটিবে, এবং প্রজা ও জমীদারের উচ্ছেদদশা আসন্নবর্ত্তিনী হইতে থাকিবে। গবর্ণমেন্টের কিন্তু কোনদিকেই লোকসান পড়িবে না, বরং বিলক্ষণ লাভই দাঁড়াইবে। ভূমিরস্বত্বনিরূপণ ও জরিপ প্রভৃতির নিমিত্ত বৎসর বৎসর যে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেই চলিবে ; অবশিষ্ট অর্থ রাজকীয় ধনাগারের সাহেবসুবাপোষণাদিজনিত অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষতিপূরণে নিয়োজিত হইতে পারিবে। ওদিকে দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা বাড়িলেও ষ্টাম্প বিক্রয়প্রাচুর্য্যে গবর্ণমেন্টের প্রচুর লাভ হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, কৃষি বিভাগের উল্লিখিত কার্য্যপ্রণালী একদিকে যেমন প্রজা ও ভূম্যধিকারীর উচ্ছেদদশার হেতুভূত, পক্ষান্তরে তেমনই অর্থশোষণের সুকৌশল। গবর্ণমেন্ট কোথায় নিঃস্বার্থ হিতৈষনা দেখাইয়া প্রজাবর্গকে কৃষিবিষয়ক উন্নতিবিধানে অর্থোপার্জ্জনের নূতন উপায়ই আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। বঙ্গবাসীর আগৎদোষে অমৃতে গরলই সম্ভূত হইল।

কৃষির উন্নতিসমন্ধে যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বনের প্রস্তাব হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাহাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। আগামীতে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার বাসনা রহিল।

২৪ মে, ১৮৮৫

**রেন্ট-আইন**

দেশশুদ্ধ লোকে কত চীৎকার করিল—নানা স্থানীয় জমীদার, তালুকদার ও মধ্যবর্ত্তী প্রজাপক্ষ হইতে কত প্রতিবাদ, কত আন্দোলন, আবেদন হইল, কিন্তু তাহাতে ভারতীয় গবর্ণমেন্টের কর্ণপাত হইল না—হৃদয় গলিল না। রেন্ট আইন প্রকৃতভাবে প্রজা ও ভূম্যধিকারী কোন পক্ষেরই শুভকর না হইলেও আমাদের গবর্ণমেন্ট উহা পাস করিয়া বসিলেন। ভারতের শাসকচক্র যেভাবে গঠিত,—গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর যাদৃশ

পারিপার্শ্বিকদলে পরিবৃত,—ভারতবর্ষ কামধেনু হইয়াও মাতৃপিতৃহীন শিশুর ন্যায় যেরূপ দুর্গতির ক্রোড়ে শয়ান, তাহাতে এদেশে প্রকৃতিপুঞ্জের অনভিমতিতে আশুভকারী, অনুপযোগিনী বিধি ব্যবস্থা পাস হওয়া তত বিচিত্র ব্যাপার নহে ; কিন্তু ইহাই নিরতিশয় নৈরাশ্য ও ভোগের কথা যে, লোকে এতদিন যাঁহার সুবিবেচনা ও হিতৈষণার প্রতীক্ষা করিতেছিল, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সেই হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ষ্টেট সেক্রেটারিও রেন্ট আইনের কুহকিনী ব্যবস্থায় বিমোহিত হইলেন—ভারতবাসীকে অমৃত পান করাইবেন বলিয়া গরল পান করাইতে চলিলেন। জমীদার, তালুকদার ও প্রজার প্রকৃতিহিতৈষী সকল শ্রেণীরই আশা ভরসা সমূলে উৎপাটিত হইল।

ইতঃপূর্ব্বে পরস্পর বিরোধী সংবাদ প্রচারিত হইতেছিল বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটরির রেন্ট আইনসমন্ধীয় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি-সমন্ধে অনেকেই সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলেন ; কিন্তু সংপ্রতি লর্ড কিম্বার্লির এতদ্বিষয়ক মতসম্বলিত যে পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট সমাগত হইয়াছে এবং পাওনিয়ার উহার যেরূপ মর্ম্ম প্রকটন করিয়াছেন, তাহাতে যে সংশয় অপনীত হইতেছে। উক্ত পত্রে প্রকাশ, ষ্টেট সেক্রেটরি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভা, রেন্ট আইনকমিশন, সিলেক্ট কমিটি ; অনুকূলমত প্রকাশক প্রদেশীয় গবর্ণমেন্ট ও রাজকর্ম্মচারিগণের সুখ্যাতি করিয়া উক্ত আইনে অনুমোদন করিয়াছেন।

যাঁহারা আইনখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৌলাইয়া দেখিয়াছেন—উহার মহাত্ম্যে প্রজাবর্গের পরিণাম কিরূপ দাড়াইবে, যে সকল অবস্থাভিজ্ঞ লোক অভিনিবেশসহকারে ইহা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন—জমীদারশ্রেণীর অস্তিত্ব দেশের পক্ষে একান্ত আবশ্যকও ইষ্টকর এই ধ্রুবসত্যে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা বিবাদবিসংবাদের দেশের উৎসন্নতার হেতুভূত এই আইন বিধিবদ্ধ হইতে দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুন্ন ও ম্রিয়মান হইতেছেন ; কিন্তু প্রজাবন্ধু নামধারী কতকগুলি অনভিজ্ঞ লোক "প্রজার জয়, প্রজার জয়" বলিয়া আনন্দে বগলই বাজাইতেছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, যাঁহারা প্রজাহিতৈষী, দারিদ্র্যের প্রতি দয়াই তাঁহাদের হিতৈষণার নিদান ; কিন্তু রেন্ট আইনের ন্যায় সর্ব্বনাশী বিধানে অনুকূলতা প্রদর্শন করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, প্রজাবন্ধু নামধারীরা দরিদ্র দুর্গতের পরমশত্রু। স্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা লাভ হইলে, ঋণদায়গ্রস্ত, নিরাশ্রয়, অংশিগণের সহিত প্রতিযোগিতাকরণাসমর্থ প্রজা ও পতিপুত্রহীনা অবীরা প্রভৃতির শোচনীয় দশা ঘটিবে জমীদারের অনুগ্রহভিন্ন দরিদ্র প্রজা কিছুতেই তেষ্ঠিতে পারিবে না, সহজজ্ঞানে ইহা বুঝিতে পারিয়াও যাঁহারা রেন্ট আইনের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক আহ্লাদে আটখান হয়, তাঁহাদিগকে প্রকৃতিবর্গের পরমশত্রু ভিন্ন আর কি বলিতে হইবে? কৃষি প্রজারা মকদ্দমার মা'র পেচ কিছুই বুঝে না ; এমন লোকের স্বত্ববিলোপের পথ নানাদিক হইতে খুটিতে পারে। উহারা যেরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত, তাহাতে যথাসময়ে খাজানা পত্র আদায় হওয়াও সম্ভাবিত নহে। ইত্যকার নানাকারণে এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রজার স্বত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহারা একবার স্বত্বচ্যুত হইলে, ভূস্বামীর অনুগ্রহে পুনরায় নূতন স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে, রেন্ট আইনের প্রসাদে সে আশাও নাই। কেননা প্রজার প্রতি একবার দয়া করিলেই যখন ভূস্বামীকে চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তখন তিনি সেই স্বর্গীয় দয়া বিতরণে অবশ্যই কুণ্ঠিত হইবেন। এরূপ ও অন্যবিধ নানাক্ষতি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া আমরা রেন্ট আইনের স্তুতিবাদকগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

বিশেষ বিবেচনায় উপলব্ধ হয়, এখন যাঁহারা প্রজাহিতৈষী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাঁহাদের নিম্নলিখিতরূপ কোন না কোন গূঢ় অভিসন্ধি রহিয়াছে—ইদানীং [অস্পষ্ট] অনেকেই লেখাপড়া শিখিয়া দশ টাকা উপার্জন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের [অস্পষ্ট] জমীসকল মূর্খ ও নিম্ন [অস্পষ্ট] ভোগদখলেই আছে। রেন্ট আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, নিরক্ষর, দুর্গত প্রজাদিগকে অর্থপ্রলোভনে বিমোহিত অথবা হয়রান পেরাশান করিয়া সহজেই সেই সকল ভূমি হস্তগত করা যাইতে পারিবে। যাঁহারা এরূপ বা অন্যপ্রকার অভিসন্ধিতে খাজনার আইনের সমর্থন না করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে তৎপক্ষাবলম্বন করেন, তাঁহারা অপরিণামদর্শী, সন্দেহ নাই।

রেন্ট আইন পক্ষীয়গণের আরও দুইটী উদ্দেশ্যের আভাস পাওয়া যায়। গবর্ণমেন্টের কুমন্ত্রীদের দ্বারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের সৃষ্টি অবধিই উহার একটি সিদ্ধ হইতেছিল—এদেশে সীতারাম রায়, ইসা খাঁ প্রভৃতির আবির্ভাবাশঙ্কা একরূপ রহিত হইয়াছিল। ইদানীন্তন রেন্ট আইনের প্রসাদে ঐ উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবেই সুসিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী প্রথমটীর বিপরীত। এই উদ্দেশ্যশালীরা মনে করেন, রেন্ট আইন চলিলে বঙ্গে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী আছেন, অল্পদিনমধ্যেই তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। এই সকল লোকের ভূস্বামিত্ব প্রবলপরাক্রান্ত জমীদারদের করায়ত্ত হইয়া যাইবে। আইনে যতই কেন বাঁধাবাঁধী থাকুক না, প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের কোন স্বত্বস্বামিত্বই টিকিতে পারে না, তা প্রজাস্বত্বই হউক, আর যেকোন স্বত্বই হউক। স্বয়ং জজ মাজিষ্ট্রেট যাঁহাদিগকে খাতির করিতে বাধ্য হন, পুলিস যাঁহাদের অনুচর সাজিয়া বসে, সাধারণ প্রজা কি তাহাদের সহিত আঁটিতে পারে? সুতরাং "যে আইনের গণে দেশের উন্নতিনিদান সহস্র২ ভূম্যধিকারীর ভূস্বামিত্ব ছারে খারে যাইবে, সেই আইনের প্রসাদে কয়েকজন জমীদার বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য লাভ করিবেন। এই স্বাধীন রাজ্যাধিকারীদের মধ্যেকালে সীতারাম রায়, ইসা খাঁ প্রভৃতির আবির্ভাব বিচিত্র নহে; আর যদি শিবজীর প্রাদুর্ভাব হয় তবে তা মঙ্গলেরই কথা"। যাঁহারা এ আশা করেন, আমরা কিন্তু তাঁহাদিগকে লোকের বিষকুম্ভ ... গুপ্তচরই মনে করি।

আর এক শ্রেণীর প্রজাহিতৈষী আছেন, ইহাঁরা 'ব্রীফলেছ্' উকীল, মোক্তার আদালতের এপ্রেন্টিস বা উহাঁদের সম্পর্কিত ব্যক্তি। মামলা মকদ্দমায় ভূস্বামিগণ উৎপন্ন [অস্পষ্ট] প্রজাগণ নিরন্ন হইবে, আর উহাদের [অস্পষ্ট], এ দলের প্রজাহিতৈষীদের [অস্পষ্ট]।

উল্লিখিতরূপ নানাকারণে প্রজাবন্ধু নামধারীরা রেন্ট আইন প্রচলনাশায় নৃত্য করিতেছেন, আমরা কিন্তু ভাবী অনিষ্টে বিভীষিকায় বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছি। প্রজা, ভূম্যধিকারীর বর্ত্তমান দূরবস্থা দেখিয়া আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, গবর্ণমেন্ট নূতন আইন করিয়া উহাঁদের সুখশান্তি বদর্ধনের সদুপায় করিবেন। কিন্তু আমাদের সে আশায় ভস্ম নিক্ষিপ্ত হইল, কেঁচো খুঁড়িতে সাপ উঠিয়া পড়িল। গবর্ণমেন্ট জমীদার ও প্রজার সুবিধার্থ ৭/৮ বৎসর যত্ন চেষ্টা, অনুসন্ধান আলোচনা করিয়া যে, এরূপ বিচিত্র বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তণ করিবেন,—কমিশনের অনুসন্ধানত্রুটিতে, ব্যবস্থাপকগণের অনভিজ্ঞতাদোষে যে, এমন একটা জরদগব আইন প্রসূত হইবে,—৪/৫ বার পান্ডুলিপি ও পুনঃ পুনঃ সংশোধনের পরেও যে, কোন শ্রেণীর মনোমত একটী আইন দাঁড়াইতে পারিবে না, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এ কি সামান্য আক্ষেপের কথা, ভারতের ন্যায় দেশের লম্বাবেতনভূক্ ব্যবস্থাপকেরা বহুকালেও প্রজা, ভূম্যধিকারীর স্বত্বস্বার্থরক্ষার উপযোগী একখানি আইন প্রণয়ন করিতে পারিলেন না।

যাউক, এখন সে আক্ষেপ করিয়া লাভ কি? এখন দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া ও মহাসভা পার্লিয়ামেন্টের নিকটেই আমাদের এই সকরুণ প্রার্থনা যে, তাঁহারা রেন্ট আইন খানি এরূপ ভাবে সংশোধিত করিয়া প্রবর্ত্তিত করিবার অনুজ্ঞা করুন্ যেন তাহাতে মহাসভার নিকট একবার শেষ প্রার্থনা না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

২৬ জুলাই, ১৮৮৫

## বিষম অত্যাচার

গতবারের প্রতিজ্ঞানুসারে এবার আমরা জমিদারের প্রতি গবর্ণমেন্টের অত্যাচার কিরূপ, তাহাই দেখাইব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট থিব, দলীপ, মলহররাও প্রভৃতির প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছেন, জমিদারের প্রতি অত্যাচার অপেক্ষ অধিক। থিব প্রভৃতি অত্যাচারিতগণ, রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে বৃত্তি (রাজস্ব) পান তাহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমতী কুইনবিক্টোরিয়ার বৃত্তির কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই। এই বৃত্তির প্রসাদে ইহঁারা যে বিলক্ষণ সুখ শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বিলাসী বড়লোক অথবা কুঁড়ের বাদসাগণ, বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালার রাজগণ, যে রাজত্ব হারাইতেছেন, তাহার প্রতিদান কি পাইতেছেন। গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতেই জমিদারের প্রতি ঘোর অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসিয়াছেন। যখন ইংরাজ এদেশে রাজ্য পান নাই, তখন হইতে এদেশ বাসীকে সুখী করিবার আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন। পরে যখন সিরাজোদ্দৌলার বিরুদ্ধে দেশের প্রধান শক্তিদিগকে উত্তেজিত করা হয়, তখন এদেশের প্রধান শক্তি জমিদারগণকেই সুখী করিবার আশ্বাস দেওয়া হয়। ইহাদিগের স্বত্ব স্বামিত্ব বর্দ্ধিত করিবার আশা দিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাদের সহায়তায় বঙ্গরাজ্যে ইংরাজের আধিপত্য হয়। কিন্তু এই আশ্বাস দেওয়ার পর পরে আধিপত্য লইয়া ইংরাজ যখন ইহাঁদের স্বত্ব স্বামিত্ব বর্দ্ধিত না করিয়া খর্ব্ব করিলেন, তখন কি ইহাদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করা হয় নাই? রাজায় রাজায় কোন প্রকার নিয়মে বদ্ধ হওয়ার নাম যদি সন্ধি হয়, তবে কি ইংরাজকে সন্ধি ভঙ্গ করিতে হয় নাই? তারপর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সময়েও গবর্ণমেন্ট জমিদারদিগের যে সকল ক্ষমতা স্বীকার করিলেন, ক্রমে ক্রমে সেই সকল ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ [অস্পষ্ট] গবর্ণমেন্টকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার পাপে [অস্পষ্ট] হয় নাই? যদি জমিদারগণের সেই সাময়িক মিশনকে আশ্রয় লওয়া বলিয়াও ধরা যায়, তবেও কি গবর্ণমেন্টকে আশ্রিত দ্রোহকারী বলা যায় না? যে আশ্রয় লয়, তাহাকে বিপন্ন করা, রাজধর্ম্ম, না বীরধর্ম্ম, অথবা মহৎ লোকের ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মেই ইহা ঘোর অধর্ম্ম।

আমরা স্বীকার করি, যে কার্য্য দ্বারা একের অনিষ্ট হইলেও বহুলোকের হিত হয়, তাহা করা যদিও পাপজনক, তথাপি পাপের পরিমাণ অপেক্ষা পুণ্যের পরিমাণ অধিক হইলে করা যাইতে পারে। কিন্তু এদিকে দেখা উচিত যে, দশজনকে গোচর্ম্মের জুতাদ্বারা উপকার করাপেক্ষা একটী গোবধের পাপ অনেক অধিক। জমিদারগণকে এইরূপ পাপ কার্য্য দ্বারা বিপন্ন করিয়া গবর্ণমেন্ট কাহার উপকার করিলেন, আমরা ভাবিয়া পাইনা। কতিপয় দুর্ব্বৃত্তসমাজ কন্টক প্রজাশ্রেণীর লোকের উপকার করা ভিন্ন সাধারণ প্রজার যে কোন উপকার হয় নাই, বরং তাহাদের অনিষ্টের একশেষ হইয়াছে, তাহা আমরা বিভিন্ন প্রস্তাবে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখাইব। বস্তুতঃ জমিদারের ক্ষমতাহরণে সর্ব্ব প্রকার ঘোর

অত্যাচার হইয়াছে ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। দুষ্ট অথবা কৃতঘ্ন উন্নতশীলগণের যে উপকার হইয়াছে, তদ্দ্বারাও দেশের সাধারণ অনিষ্ট বিশেষ রূপে হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট এই সকল অনিষ্টের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সন্ধিভঙ্গ অথবা আশ্রিতের অপকার করিয়া কাহার উপকার সাধন করিলেন, তাহা ত তিনি জানেন। আমরা কেবল এইমাত্র দেখিতেছি, তাঁহার এই সকল পাপ কার্য্য দ্বারা দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে ; আর যাঁহাদের সহায়তায় ইংরাজ, এদেশে গণ্য মান্য, তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইংরাজের সহায়তাকারিগণের এই সর্ব্বনাশ সংবাদ আমরা শত সহস্র দিতে পারি, সময়ান্তরে দিব ; কিন্তু পাঠক যদি কৃষ্ণনগর, নাটোর প্রভৃতি রাজবংশের অবস্থা পরিদর্শন করেন, তবে আজই তাহার জাজ্জ্বল্যমান্ প্রমাণ পাইবেন। আর যে রাজা রাজবল্লভ ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ, তাঁহারই দুর্দ্দশাপন্ন বংশধরকে একখানি চারি আনা মূল্যে লাঠী চুরির অপরাধে কিরূপ বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক বুঝিবেন—ইংরাজের সহায়তাকারীদিগের কীদৃশ দুর্গতি হইতে পারে? এইরূপ বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদার যেমন ইংরাজের হিতৈষী ছিলেন, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সেই রূপ তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সহায়তাকারীর এইরূপ সর্ব্বনাশ করা গবর্ণমেন্টের হিতজনক কিনা, তাহা আমাদের অতিবুদ্ধি গবর্ণমেন্ট বুঝিবেন। কিন্তু তিনি যাহাই বুঝুন, এদেশে গবর্ণমেন্টের যে সকল অনিষ্টকারী দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা অন্য রূপ বুঝেন। তাঁহারা বুঝেন—এদেশে গবর্ণমেন্টের সহায়তাকারী যত কম, ততই মঙ্গল। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট জ্বালাতন হইয়া হইয়া যাহাতে এদেশবাসী ইংরাজের বিশ্বাসঘাতকতাদি স্মরণ করিয়া, ইংরাজের বিপদ কালে ইংরাজের প্রতিকূলে দাঁড়ায় সেরূপ অনুষ্ঠানই প্রার্থনীয়। ইংরাজের বিপক্ষগণ যাহাই ভাবুন, আমরা কিন্তু তাহাদের সে ভাবনায় কোন ফল দেখি না আগে এদেশবাসী ক্ষতি ও পীড়াগ্রস্ত হইবে, তারপরে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া কোন্ সর্প হাতে পাইবে, তাহা তাঁহারাই জানে। কিন্তু এই সকল শত্রুর কুহকে পড়িয়া অথচ ধন লালসায় মূহ্যমান্ হইয়া গবর্ণমেন্ট বঙ্গীয় রাজা বা জমিদারদিগের প্রতি যে অত্যাচার করিতেছেন এবং সেই অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গদেশকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন, তাহাতে গবর্ণমেন্টের নিতান্তই অপরিনামদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে। যদি এখনও গবর্ণমেন্ট সতর্ক না হন, এখনও জমিদারের স্বত্বস্বামিত্ব জমিদারকে প্রত্যর্পণ না করেন, তবে নিশ্চয়ই গবর্ণমেন্টের বিপক্ষগণের আশা পূর্ণ হইবে। তবে নিশ্চয়ই এদেশবাসীকে ছারেখারে দিয়া গবর্ণমেন্ট আপন পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। আমরা তাই গবর্ণমেন্টকে সাবধান করি, তিনি যদি এদেশের ও নিজের মঙ্গল চান, তবে তাহার ঘোরতর অত্যাচার হইতে বাঙ্গালার জমিদারকুলকে বিমুক্ত করুন। সর্ব্বাগ্রে ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের জমিদার শাসনী বিধান গুলি রহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

২১ নবেম্বর, ১৮৮৬

## বিষম অত্যাচার

বঙ্গের যে জমিদার কুল পূর্ব্বে, বরদারাজ মলহররাও, পাঞ্জাবেশ্বর দলীপসিংহ, ব্রহ্মরাজ থিব প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন, যাঁহাদের আনুকূল্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্যের আধিপত্য, যাঁহাদের কৃপায় ইংরাজবংশ ভারতে রক্ষা পাইয়াছে ; ইংরাজ ক্রমে ক্রমে তাহাদেরই যথাসর্ব্বস্ব বিনষ্ট করিবার উপায় করিয়া দিতেছেন। ইংরাজের একট মহারাণী

ভিক্টোরিয়া যেরুপ বৃত্তি পান, দলীপ সিংহ প্রভৃতিও সেইরুপ প্রচুর বৃত্তি পাইয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গের জমিদারের খাজানা ও বাজেয়ানা নিয়মিত দিনের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে না দেওয়া হইলেই তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন নীলামে ডাকা হয়। জমিদারের শত্রুপক্ষ অথবা স্বার্থপর রাজকর্ম্মচারীদিগের কৌশলে অনেক স্থলেই জমিদার নিজের সর্ব্বনাশসূচনা পূর্ব্বে জানিতে পারেন না। ইংরাজ সুহৃদ জমিদার সেই দিন পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ান। প্রজাবিদ্রোহী হইয়া জমিদারের সর্ব্বনাশ করিবে, জমিদার নিজ ক্ষমতায় কিছু প্রতিকার করিতে পারিবেন না, আত্মরক্ষার জন্য কোন কিছু করিলে তিনি অত্যাচারী বলিয়া প্রথিত হইবেন। এক জমিদারের বিরুদ্ধে শত সহস্র প্রজা আপনাপন স্বার্থের জন্য কেহ অত্যাচার করিবে, কেহ অত্যাচারীর সপক্ষে প্রমাণ দিয়া জমিদারকে বিপন্ন করিবে, বিচারক এই প্রমাণেই পরিতোষ চিত্তে সেই রাজপ্রতিম জমিদারকে নীচ জন রক্ষিত জেলে পুরিবেন, অথবা ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইবেন। গবর্ণমেন্ট সকলকেই আত্মরক্ষার ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু জমিদারকে বিনা সম্বলে শতসহস্র শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন জমিদার অর্থবলে ২/৪ জন লোককে আত্মরক্ষার সহায় করিতে পারেন বটে, কিন্তু অধিক জমিদারই আজ এমন দুর্দ্দশাপন্ন যে, তাঁহার প্রজা অথবা প্রজার সহায়তাকারীদিগের মধ্যে তদপেক্ষা সঙ্গতিসম্পন্ন শত শত লোকে চারিদিকে বর্ত্তমান থাকে, এমন কি তাঁহার সজাতি জমিদার যিনি, তিনিও সেই জমিদারকে আপনার অপেক্ষা অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহারই প্রজার সহায়তা করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিতে ছাড়েন না। হায় ইংরাজ। তুমি এদেশের লোককে এমনভাবে মন্ত্র মুগ্ধ করিয়া দিয়াছ, যে তাহারা আপনাপনি দ্বেযাদ্বেষীকরিয়া আপনার নাক কাটিয়া তোমার যাত্রা করিতেছেন। •

এইরুপে ইংরাজ জমিদারের আত্মরক্ষার ক্ষমতা হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঘোর বিপদে আপাতত করিয়াছেন। যে সকল জমিদার, ইংরাজ জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে স্ববশে রাখিতে অসমর্থ, আজ তাঁহাদের দুর্দ্দশার পার নাই। কিন্তু সেই জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে চিরদিন বশে রাখা কি সহজ কথা? সেই পরিবর্ত্তনশীল জজ ম্যাজিষ্ট্রেট রুপী তেত্রিশ কোটি দেবগণের প্রত্যেককে ষোড়শোপচারে পূজা করা কি কাহারও চিরদিন সাধ্যায়ত্ত? যদি সহজ সাধ্যায়ত্ত হইত, তবে যে সকল মহাপুরুষকে ইতঃপূর্ব্বে ধর্ম্ম ও দেশোন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে দেখিয়াছি, ইংরাজ পূজার অনুরোধে আজ সেই সকল মহাপুরুষকে তাঁহাদের সেই স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তি হইতে পরাঙ্মুখ দেখিতাম না। যে হউক, এরুপ ইংরাজ সেরা করিয়াও তাঁহারা অধিকদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি ইংরাজ সেবার গুণে কিছুদিন ইঁহাদের আত্মরক্ষা করা ঘটিতে পারে ; কিন্তু বাকি এই যে লক্ষ পরিমিত জমিদারকুল উচ্ছন্ন যাইতেছেন, এরুপ উচ্ছন্ন দিবার কারণ কি গবর্ণমেন্ট নহেন। এদেশকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এদেশের প্রকৃত রাজা জমিদার কুলকে সেভাবে উচ্ছন্ন দিতেছেন, তাহা কি কখনও রাজনীতি কি ধর্ম্ম নীতির অনুমোদিত হইতে পারে? এরুপ দূষিত রাজনীতি সাধারণে অবগত হইলে কি রাজার প্রতি সাধারণের ভক্তি থাকিতে পারে? পূর্ব্ববারেই বলা হইয়াছে,—এদেশের কতিপয় ঢেকি নিজেদের স্বার্থসাধন জন্য অথবা দেশে সমগ্র প্রবল শক্তিকে ইংরাজ অত্যাচারে উত্তেজিত করিবার জন্য ইংরাজের জমিদার শাসনী নীতির সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু সেই কুমীর রুপী গৃহঢেকীদিগের কথায় পড়িয়া একটী দেশকে উচ্ছন্ন করা কি গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য হইতেছে? সেই ঢেকীগণ যাহাই ভাবুক, কিন্তু দেশের শান্তি ভাঙ্গিয়া অশান্তি করা, দেশকে উচ্ছন্ন দিয়া

(বীজ থাকিলে) উজ্জীবনের চেষ্টা করা, গৃহপুড়িয়া বাস্তব ভূমিকে উর্ব্বরা করতঃ সেই ভূমিজাত শস্যমূল্যে নূতন করা গৃহ করা, ইহা কখনও বুদ্ধিমানের অভিপ্রেত হইতে পারে না। ফ্রান্স প্রভৃতি উগ্র ও অভাবশীল জাতির তুলনায় এদেশ বিপ্লবে সুফলোৎপাদনের আশা দুরাশা মাত্র। যে আশা করে, সে পাগল। আমরা সে বিপ্লব চাইনা, চাই দেশের শান্তি, কিন্তু গবর্ণমেন্টই আপনার পায়ে আপনি কুঠার দিবার জন্য, এদেশবাসীকে ঘোর বিপন্ন ও উত্তেজিত করিবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জমিদার কুলের বিরুদ্ধে আইন করিতেছেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল, জমিদার প্রজায়, হিন্দু মুসলমানে, বিচ্ছেদের যোগার যন্ত্র করিয়া তিনি যে চালাকি দেখাইতেছেন, তাহাও মিথ্যা নহে; তাঁহার বিশ্বাস হইয়া থাকিবে যে, এই বিদেশ বিভূমে, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তাঁহার স্থায়িত্ব কেবল এদেশের পরস্পরে বিচ্ছেদের উপর নির্ভর করে। "তিনি যে বিশ্বাসে বঙ্গের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, সেই বিশ্বাসের মধ্যেই ঘোরতর ভুল রহিয়াছে। তিনি পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মাইয়া যাহাদের ক্ষতি করিতেছেন তাহারা দিবানিশি তাঁহার সেই ক্ষতিকারিতা স্মরণ করিয়া অন্তর্দাহে জ্বালাতন হইতেছে; ইহাতে তাহাদের নিজে নিজ বল কমিতেছে সত্য, কিন্তু অনিষ্টকারীর প্রতি তাহাদের অন্তরাগ্নি নিয়তই জ্বলিবে না, কে বলিল? যদি পৃথিবীতে একমাত্র ইংরাজাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিত, যদি পৃথিবীর সমগ্র ক্ষমতা একমাত্র ইংরাজের করায়ত্ত থাকিত, তবে ইংরাজের এ নীতিতে বিশেষ কুফল ফলনের সম্ভাবনা থাকিত না। ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক রহিয়াছে, এমন স্থলে তিনি আপন সুহৃদদিগকে শত্রু করিয়া তুলিতেছেন, একি তাঁহার সুবিবেচনার কথা হইতেছে? বৃক্ষ হইতে পড়িবার ভয় সকলেরই আছে, কিন্তু পড়িলে আর ভয় থাকে না। যে পর্য্যন্ত সম্পত্তি থাকে, মানমর্য্যাদা থাকে, ততকাল সম্পত্তি অবহৃত হওয়া ও মান মর্য্যাদা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় প্রবল ব্যক্তির মন যোগাইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তাহা যখন অপহৃত হয় বা নষ্ট হয়, তখন মন যোগান দূরে থাকুক তাহার অনিষ্টের জন্যই সদা সমুদ্যোগ থাকিতে হয়। এটি প্রকৃতির আবশ্যম্ভাবী পরিণাম রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজকে একথা আমাদের শিখাইতে হইতেছে, ইহা কম বিড়ম্বনা নহে। ইংরাজ এদেশের এইরুপ অনিষ্ট না করিয়া যদি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন, তবে তিনি এদেশে চিরকাল সাম্রাজ্য রাখিতে পারেন। ভারতবর্ষ, হিন্দু, মুসলমান, রাজপুত, শিক, মারহাট্টা প্রভৃতি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির দেশ; এখানে কোন ভারতবাসীই নিরাপদে সাম্রাজ্য করিতে সমর্থ নহেন—সে আশাও কেহ করে না। যেদিন ইংরাজ এদেশ ছাড়িবেন, সেই দিন হয় ফরাসী না হয় রুষ এদেশের আধিপত্য লইবে। এমন স্থলে ইংরাজকে তাড়াইবার ইচ্ছা কাহারও হইতে পারে না। যাহাদের এরুপ ইচ্ছা নাই বা থাকিতে পারে না, তাহাদিগের ভয়ে তাহাদিগকে ঘোর কষ্টে ফেলিয়া ভয়গ্রস্ত দস্যুর ন্যায় কাজ করা কি গবর্ণমেন্টের উচিত? তাঁহার নিশ্চিন্তভাবে এদেশের হিত ও এদেশবাসীর উন্নতিবিধান করাই কর্ত্তব্য। অতএব গবর্ণমেন্ট যাহাদের ক্ষমতা হরণকে কর্ত্তব্য ভাবিয়া ছিলেন, তাঁহাদের সেই ক্ষমতা প্রত্যপর্ণ করিয়া আপনাকে দৃঢ় করা আবশ্যক। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা পক্ষপাতিতার দ্বারা গবর্ণমেন্ট যে ভুল করিয়াছেন, তাহা পরে বলিব।

২৮ নভেম্বর, ১৮৮৬

## বিষম অত্যাচার

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বঙ্গের জমিদার শ্রেণীর উপর যেরূপ অত্যাচার করিতেছেন, আর কোন সভ্যতাভিমানী এরূপ অত্যাচার করিতে পারেন নাই, কদাপি এমন দুষ্কার্য্যে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। রাজনীতির গুরুত্ব ও ধর্ম্মনীতির মাহাত্ম্য পদদলিত করিয়া বণিক নীতির দাসত্ব করা কখনও সুবোধের কার্য্য নহে। এমন নির্ব্বোধ গবর্ণমেন্ট আর কোথায় কবে হইয়াছে, যে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, বন্ধুদ্রোহিতা ও ছলগ্রাহিতা করিয়া একটি দেশের অনুগত প্রজাদিগকে সর্ব্বনাশ করিতে পারে? রাজকার্য্যের প্রশংসাই প্রজাপালনে, যে রাজা প্রজার মনে কষ্ট দেন, তিনি কদাপি রাজা নামের যোগ্য নহেন, কিন্তু আমাদের বণিকগবর্ণমেন্ট একথা মনে করিয়া যে কাজ করেন, কিছুতেই বোধ হয় না। যদি তিনি প্রজাপালনের [অস্পষ্ট] এরাজ্য শাসন করিতেন, তবে কদাপি [অস্পষ্ট] প্রধান অঙ্গ জমিদারগণ প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতেন না গবর্ণমেন্ট কি মনে করিয়াছেন, এই প্রধান [অস্পষ্ট] বিনষ্ট করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গের পুষ্টি সাধন করয়িাছেন ; ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি। মাথা কাটিলে হাত পা পুষ্টি হয় না, কোন অঙ্গই [অস্পষ্ট] পাইতে পারে না। বড় ছোট সকল শ্রেণীর লোক প্রকৃতির নিয়মানুসারে হয় ; কাহারও সাধ্য নাই যে, সকলকেই সমানবস্থ করিতে পারে। ইংরাজ, আজ বাঙ্গালার দুর্ব্বল জাতিকে সমান করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার নিজ দেশের দৃশ্য ইহার বিপরীত রহিয়াছে। তথাকার এক শ্রেণী যেমনই ধনী, অপর শ্রেণী তেমনই দরিদ্র। এত দরিদ্র যে এদেশের দরিদ্রদের সঙ্গে তুলনা হয় না, এত বড় লোক যে, এদেশের বড় লোকের সঙ্গে তুলনা হয় না। আজ সমগ্র সভ্যতাভিমানী দেশেই এই দশা ; যে দিন এদেশে সভ্যতা ছিল, এদেশের ক্ষমতা ছিল, সেদিন এদেশেরও ঐ দশা ছিল। এক পক্ষ প্রকাণ্ড বড়লোক ছিলেন, অপর পক্ষ নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল। কিন্তু আজ সভ্যতাভিমানী দেশের সঙ্গে এদেশের দশার বিশেষ একটী পার্থক্য রহিয়াছে ; পার্থক্য এই যে,—নব্য সভ্যতাভিমানীর নিকট দরিদ্রগণ চাহিয়া খাইতে পায় না। কিন্তু এদেশের বড়লোকের দরিদ্রের ভরণ পোষণই একটি প্রধান কর্ত্তব্য মনে করেন। নব্য সভ্য দেশের বড় লোকগণ, দান করেন লোক জানাইবার নিমিত্ত, কাগজ পত্রে নাম উঠাইবার নিমিত্ত, আর এদেশীয় বড়লোকেরা করেন, সদাব্রত। আজ এই যে, নিরন্ন দেশ,—এই যে নব্যসভ্যতার হুজুক,—এই যে অকৃতজ্ঞ লোকের ঘটা, ইহাতেও অনেকের গৃহে অতিথি অভ্যাগত, নিমন্ত্রিত, রবাহুত, আর দরিদ্র প্রতিবেশীগণ, নিত্য আহার পাইতেছে। যাহার যত আয়, তাহার অধিকাংশ দরিদ্র প্রতিপালনে ব্যয়িত হইতেছে। নব্য বড় লোকদিগের অর্থ দিন দিন বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু প্রাচীন ঘরানাদিগের প্রচুর আয়ের টাকা কি হইতেছে? এই যে একটী রাজ্যেশ্বর ত্রিপুরাধিপতি আজ ঋণের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট ধমক খাইতেছেন, ইঁহার সে ঋণের কারণ কি? ইঁহার সে বিপুল আয়ের অধিকাংশ কি কেবল দরিদ্রপালনে যাইতেছে না? এত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অর্থ নয় যে নানা উপায়ে বিলাতে রপ্তানি হইতেছে? এ রাজার রাজ্যের যত আয়, ত তাহা সেই রাজ্যেই ব্যয়িত হইতেছে। আর ঐ যে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সামান্য ঋণভার এতকালেও ঘুচিতেছে না, তাহারই বা কারণ কি? যে সংসারের কর্ত্তা গবর্ণমেন্টেরও প্রশংসিত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, যাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী বিচক্ষণাগ্রগণ্য বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, তাঁহার বিপুল আয় হইতে সামান্য ঋণ কেন শোধ হয় না? হয় না—দরিদ্র প্রতিপালন জন্য। আমরা দুইটী বড় ঘরের কথা বলিলাম ; বস্তুতঃ এদেশে যত সম্পন্ন লোক আছেন, তাঁহাদের ধন শুধু দরিদ্রের জন্য ব্যয়িত হয়।

এদেশের বড় লোকের সঙ্গে নব্য সভ্যতাভিমানীদিগের পার্থক্যত এই। এ পার্থক্য এদেশের দরিদ্রের পক্ষে কিরূপ উপকারী তাহাও পাঠককে বলিতে হইবে কি? এই দরিদ্র পালক বড়লোকদিগের বিনাশ করিবার জন্যই গবর্ণমেন্টের চেষ্টা। ইহাই কি সাম্যবাদিতার পরিণাম? আমরা কিন্তু দেখিতেছি, এই সাম্যবাদিতার কুহক দেখাইয়া জমিদারের প্রতি গবর্ণমেন্ট যতই কেন অত্যাচার করুন না, তাহারা কোনরূপে মোটা খেয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু যাহারা প্রকৃতি দরিদ্র, যাহারা উপার্জ্জনে অসমর্থ, তাহারা সেই আশ্রয় বিহনে এককালে প্রাণে মারা পড়িবে। জমিদারের দৈন্যদশা বস্তুতঃ আশ্রয় হীন দরিদ্র কুলের রক্ষা কে করিবে? যাহাদের উন্নতি জন্য জমিদারের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে, তাহারাই করিবে? এ কখনও সম্ভবপর নহে। ইহাদের দরিদ্র পালন না করিবার কতকগুলি কারণ রহিয়াছে। এক জমিদারের হাজার প্রজা হাজারটী টাকাও কষ্টে সৃষ্টে দিতে পারে, তদ্দ্বারা জমিদার উপযুক্ত কাজ কবিতে সমর্থ হন, কিন্তু টাকাটী-প্রজার কোলে থাকিলে প্রত্যেক প্রজা ঐ এক একটী টাকা দ্বারা কোন সৎকার্য্য করিতে পারে না। জমিদারের দেনা শোধ জন্য যে শাক ভাত খাইতে বাধ্য হয়, সে না হয় দশ দিনে দুধে মাছে খাইবে। নিজখাবার অতিরিক্ত অর্থদ্বারা লোকে সৎকার্য করে, কিন্তু জমিদারের দেনা দুই এক টাকা না দিয়া কোন প্রজাই সচ্ছল হইবে না। যাহারা প্রজার সচ্ছলতার আশা করেন, তাঁহাদিগকে মহামূর্খ না বলিয়া পারি না ভারতবাসীর আয়ের পরিমাণ যাহা ধরা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির রোজগার বার্ষিক ২২টী টাকার অধিক নহে। নিতান্ত ধনীর পক্ষেও এই ২২ নিতান্ত দরিদ্র্যের পক্ষেও এই ২২। সকলের মাথা সমান হইলে, সকলেই পাটাশাকেরপ্যাল্‌কা ক্ষারের টে বানী দিয়া পাক করিয়া খাইলে ঐ ২২ টাকায় চলে বটে, কিন্তু ওরূপ সমান করিবার চেষ্টা পাগল ভিন্ন করিতে পারে না। জমিদারদিগকে নিরন্ন করিলে ও দেশে ইংরাজ, কুঠীয়াল, মহাজন, আমলা, উকীল প্রভৃতি অসংখ্য উচ্চশ্রেণী থাকিবে।

ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ও ২২ টাকা দ্বারা কেহ সচ্ছল হইতে পারিতেছে না, এতদপেক্ষা দুই টাকা কমিলেও কেহ মারা পড়ে না। যাহার যেমন আয়, তদনুসারেই তাহাদিগকে আহার বিহার করিতে হয়। যে মাসকলাই, চিনা প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাইতে ভদ্রলোকের কখনও প্রবৃত্তি হয় না, তাহাই কৃষকেরা খাইয়া দিব্য হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গে থাকে। তাহাদের ঐরূপ একবেলা আহারে শরীর যেরূপ হয়, বড়লোকের ঘৃত মাংসে ৫ বার আহারেও সেরূপ শরীর হয় না। এ রহস্য বুঝে কে? সাম্যবাদিগণ কি ইহারই জন্য জমিদারের সর্ব্বনাশ করিয়া প্রজার হিত করিতে চাহেন? আমরা বারান্তরে দেখাইব যে, ইহাদ্বারা প্রজার যেটুকু সুখসাচ্ছন্দ্য বাড়িবে, তাহাদ্বারা তাহার ও দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইবে ভিন্ন ইষ্ট মাত্র হইবে না। অভাবে পড়িয়া তাহারা যে কষ্টটুকু স্বীকার করে ও প্রাণপনে পরিশ্রম করে, তাহাতেই দেশের মঙ্গল হয়, যেই তাহাদের অভাব কমিবে, সেই তাহারা অল্প শ্রমী ও সুখবাসী হইয়া দেশটিকে ছারে খারে দিবে। ধন্য। সাম্যবাদিগণ, ইহারই জন্য কি জমিদারের সর্ব্বনাশ করিয়া, জমিদারের আশ্রিতবৃন্দের মুন্ডপাত করা আবশ্যক হইয়াছে? সাম্যবাদিগণ যাহাই ভাবুন না কেন, আর গবর্ণমেন্ট যাহা বলিয়াই প্রবোধ দিউন না কেন,—গবর্ণমেন্ট কদাপি সাম্যবাদিতার অনুরোধে জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতে বসেন নাই। তিনি বণিকনীতির অনুরোধেই জমিদারের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। আমাদের অতিসাধের গবর্ণমেন্টকে এইরূপ দূষিত নীতি অবলম্বন করিতে দেখিয়া নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা হিন্দুজাতি, রাজা আমাদের

ঈশ্বর, যাহার রাজনীতি আছে, তাঁহাকেই রাজা বলিয়া জানি, কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বণিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতবাসীর নিতান্তই অবজ্ঞাস্পদ হইতেছেন। আমরা এখনও করযোড়ে গবর্ণমেন্টকে নিবেদন করি, তিনি অবিলম্বে এই বণিকনীতি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ রাজনীতি অবলম্বন করুন। জমিদারদিগের স্বত্ব স্বামিত্ব তাঁহাদিগকে প্রত্যপর্ণ করিয়া আপনার আধিপত্য দৃঢ়তর করুন। আমাদের বা সাধারণ ভারতবাসীর মনের আগুন নির্ব্বাপিত করুন।

৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৬

## গবর্ণমেন্টের অপদস্থতা

বিষম অত্যাচার বিষয়ক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট জমিদার শ্রেণীর প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তেমন অত্যাচার থিব, দলীপসিংহ কি মলহর রাও প্রভৃতির প্রতিও করেন নাই। রাজ্য লাভের আশায় থিব ও দলীপসিংহের প্রতি এবং অধিক ক্ষমতা লাভের আশায় অন্যান্য রাজন্যবর্গের প্রতি যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আধিপত্য বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আশ্রিত বঙ্গীয় জমীদার উপস্থিত রাজগণের ক্ষমতা হরণ করায় গবর্ণমেন্টের মান খর্ব্ব হইয়াছে।—বিশ্বাস অপহৃত হইয়াছে, অধর্ম্ম যাহা হইয়াছে, তাহা আর বলিবার দরকার নাই, তবে উপরে গবর্ণমেন্টের পদগৌরব একেবারে লাঘব হইয়া গিয়াছে। জমিদারের উপর রাজকীয় ক্ষমতা থাকিলে গবর্ণমেন্ট থাকিতেন রাজার রাজা মহারাজ, আর এখন হইয়াছেন তিনি শুধুই রাজা। এখন একজন সামান্য প্রজার সঙ্গে বিলাতবাসী ষ্টেট সেক্রেটারীর দোচোখা কারবার। সামান্য প্রজার সঙ্গে সেই সেক্রেটারি মহোদয়ের নিয়তই যুদ্ধ চলিতেছে, কখন ষ্টেট সেক্রেটরি হারিতেছেন, কখনও প্রজারা হারিতেছে, রাজার বিড়ম্বনা ত এতদূর। এই রাজায় প্রজায় নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলাতে রাজার সম্মান যে একেবারে বিনষ্ট হইতেছে, একথা কে অস্বীকার করিবে? রাজাকে প্রজারা ঈশ্বরের ন্যায় মানিবে, ইহাই ত হিন্দু প্রজার ধর্ম্ম। যাহার সঙ্গে শত্রুভাব চালাইতে হয়, তাহার প্রতি কখনও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। যাহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, বা শত্রু ভাবই অধিক হয়, তেমন রাজার রাজত্ব বিড়ম্বনা মাত্র। যে রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি না থাকে, সে রাজা কখনও নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারে না। পূর্ব্বে এদেশীয় লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরাজের মত একজন প্রবল সহায় থাকিলে কাহারও কোন অন্যায়অনিষ্ট হইবে না, ইংরাজ বিদেশী বলিয়া তিনিও একটু এদেশীয় সাধারণ শক্তির প্রতি নির্ভর করিবেন, সুতরাং এদেশীয়েরা তাঁহার সহায়তায় সচ্ছন্দে শান্তি উপভোগ করিবে। যখন এদেশীয় লোকের এভাব ছিল, তখন একদিকে বর্গীর, অপর দিকে মগের দৌরাত্ম্য বর্ত্তমান ছিল অথবা আশঙ্কা ছিল; যিনি রাজ্যেশ্বর ছিলেন, তিনি তখন এ দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারিতেন না, অথচ নিজে এক একটা এমন কার্য্য করিয়া ফেলিতেন যাহাতে প্রজার হৃদয় নিতান্তই আহত হইত। আজ প্রজা আইনের [অস্পষ্ট], অস্ত্র আইনের প্রখরতায়, সিবিলসার্বিসের অপব্যবহারে, গবর্ণমেন্ট যে অত্যাচার সাধারণের প্রতি করিতেছেন, পূর্ব্বে তেমন সাধারণের প্রতি অত্যাচার হয় নাই বটে, কিন্তু আজ সটে লওয়ার্থ নিউবেরিগণ ও ওয়েব, গিবন প্রভৃতি সিবিলিয়ান অথবা ব্যবসায়ীগণ রূপে ইংরাজ যে অত্যাচার করিতেছেন, সেরূপ অত্যাচার তাঁহার সময়ে কখন কখন হইত। এই সকল অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই

সাধারণের প্রযত্নে ইংরাজ এদেশে রাজা হন। কিন্তু ইংরাজের কৌশলে বর্গী, মগ, ভোট প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে এদেশবাসীরা এককালে বিস্মৃত হইয়াছে, এখন আর কারও আশঙ্কায় এদেশবাসীকে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না, এখন সকলেই আপন বলে আপনাকে প্রধান ভাবিয়া নির্বিঘ্নে থাকিতে চাহিতেছে। এমন সময়ে ইংরাজের একমাত্র অত্যাচার। সে অত্যাচারও যেমন তেমন নয়,—ধন মান সমগ্র সেই অত্যাচারের বিষয়ীভূত। এ অত্যাচারে যদিও প্রকাশ্যে ইংরাজের ভয়ে কেহ উত্তেজিত হয় না, কিন্তু ইহারা যে মনান্তরে পুরিয়া মরিতেছে, এওকি গবর্ণমেন্ট বুঝিবেন না? এমন সময়ে গবর্ণমেন্ট আপনার গৌরব রক্ষার উপায়গুলি বিস্মৃত হইয়া কি ভাল করিতেছেন? তিনি রাজা, রাজার ন্যায় কাজ করুন। ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি দিলে রাজাকে ও ক্ষুদ্র বলিতে হয়। রাজার বণিকনীতি বড়ই হেয়তাজনক। জমিদারের ক্ষমতাহরণে প্রজাগণ সহ জমিদারের বিরোধ নিয়ত সমৃদ্ধিত হইতেছে, তাহাতে কোটফি বাবত গবর্ণমেন্টের আয় বিলক্ষণ বাড়িতেছে। জমিদার প্রজার বিরোধে বার্ণেলশ্রেণীর নীলকর বা কুটীয়ালগণের প্রসর বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং গবর্ণমেন্টের সজাতি পুষ্টিতে গবর্ণমেন্টের প্রাণ ঠাণ্ডা হইতেছে জ্ঞাতি ভোজন ফলে স্বর্গে ঘণ্টা পড়িতেছে কিনা, তাহা আমরা শুনি নাই, কিন্তু ইংরাজবণিকদিগের অর্থ শুষিবার পথ খুব খোলাসা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট জমিদার পড়নে এই সকল লাভ দেখিয়া ক্ষুদ্র দর্শিতার পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দর্শিতা বশত রাজধর্মের নিতান্ত অপব্যবহার করায় দিন দিনই তিনি লোকের নিকট ঘৃণ্য হইতেছেন। প্রজার এরূপ ঘৃণেয়ভাব রাজার পক্ষে বড়ই অশুভজনক। এরূপ প্রজা, রাজার ভয়ে ভয়ে যতই বাধ্যতা দেখা হউক বিপদ কালে কিম্বা কোন রূপ কাল পাইলে তাহারা অনায়াসে বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হইতে পারে। সহস্র অস্ত্র আইনে ও তাহাদিগকে দমনে রাখিতে পারে না। ভারতবাসীর কখনও এমন দুর্গতি হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাই বলিয়া গবর্ণমেন্ট যে ইহাদিগকে অবহেলা করিয়া যদৃচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহা কখনও সঙ্গত নহে। প্রজার নিকট অবজ্ঞাত হওয়া কিছুতেই রাজার কর্ত্তব্য নহে। রাজা সাক্ষাৎ সমন্ধে প্রজার সঙ্গে কারবার চালাইলে কিছুতেই প্রজার নিকট উপযুক্ত মর্য্যাদা রাখিতে পারিবেন না। এজন্যই তাঁহার কর্ত্তব্য হইতেছে, যে, জমিদারের রাজকীয় ক্ষমতা জমিদারকে প্রত্যপর্ণ করেন। ইহাতে জমিদার যেমন গবর্ণমেন্টের বাধ্য থাকিবেন, সেইরূপ প্রজাও রাজার রাজ্য মহারাজ বলিয়া গবর্ণমেন্টকে জানিবে। জমিদারের ক্ষমতায় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা যে সংবর্দ্ধিত হয়, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। জমিদারের ক্ষমতা কিরূপে বাড়ান উচিত, তাহা আগামীতে বক্তব্য।

১২ ডিসেম্বর, ১৮৮৬

### প্রজা আইনের অপব্যবহার ও সৎপরামর্শ

জমিদার ও প্রজা মধ্যে অসদ্ভাব ঘটানে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পূর্ব্বে স্বার্থ ছিল, এখনও সঙ্কীর্ণ নৈতিক ইংরাজগণ ঐ বিরোধকে ইংরাজের স্বার্থ মনে করেন কিন্তু আমরা অনেকবার বুঝাইতেছি এদেশের যে সমূহ ক্ষতি হইতেছে তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টই প্রবল শত্রুদিগের নিকট দুর্ব্বল হইয়া উঠিতেছেন। এগুলো ইণ্ডিয়ানের সংঙ্কীর্ণ স্বার্থ সাধনের শুরু যেদিন জমিদারগণের রাজকীয় ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয় সেইদিন হইতেই হয়। তারপরে মিউটিনির পরে ১৮৬৯ সালে যেদিন খাজানা বিষয়ক আইন করা হয়, সেই দিন হইতে ঐ স্বার্থ সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে। জমীদার ও তালুকদারের সঙ্গে প্রজার মারামারী কাটাকাটির

সূত্রপাত তখন হইতেই হয়। জমিদারের ন্যায্য খাজানা আদায় করাও বিশেষ কষ্টজনক হইয়া উঠে। জমিদারের ন্যায্য খাজানা বন্ধ হইয়া অবশ্য গবর্ণমেন্টেরও ক্ষতিজনক। ঐ ক্ষতিনিবারণের অনুরোধেই এবং জমিদারগণের প্রার্থনামতে বর্ত্তমান প্রজা আইনের সূত্রপাত হয়। যাহাতে অতি সহজে খাজানা আদায় হইতে পারে, আইন করিবার মূল সূত্রই তাহা। এই জন্য যে কমিশন বসে সেই কমিশন জমিদারের প্রতি বাকি খাজানার দায়ী জোত নীলামের সরাসরি ভার দিতে চাহেন। কিন্তু তাহার সেই অভিপ্রায় বিফল হয়। অবশেষে আয়র্ল্যাণ্ডের জমিদার আশঙ্কিত লর্ড রীপন, যে আইনের অনুমোদন করিয়া গেলেন লর্ড ডাফারিন ভারতবাসীর ভয়েই যেন সেই আইনখানি তাড়াতাড়ি পাশ করিয়া ফেলিলেন।

বিশ্ব কর্ম্মার সাধের মেয়েটির চর্ম্মচটিকা হইল। সে জন্য আইন করা হইল তাহার বিপরীত আইন হইল। খাজানা আদায়ের সুবিধার জন্য আইন, খাজানা অনাদায়ের সুবিধায় পরিণত হইল। বিশেষতঃ এই হইল, যাহাতে দুর্ব্বলের ন্যায্য স্বত্ব বিনাশ করিতে না পারে প্রবলগণ তাহারই সুযোগ পাইল। কৃত্রিম ও নির্ব্বোধ দেশহিতৈষীগণ প্রবল জমিদারের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বল প্রজাকে রক্ষার জন্যই ঐ আইনের পক্ষপাত করিয়া থাকে বটে। এবং সেই পক্ষপাতে ভুলিয়াই সাধারণ মতের উপাসক লর্ড রীপন প্রজা আইনের পক্ষপাতি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন এ জ্ঞান কাহারই হয় নাই যে, তেমন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের অত্যাচার নিবারণের ক্ষমতা আইনের নাই। ধনবল ও জনবলের নিকট দলিল প্রমান আমলা উকিল চিরনিয়তই বাধ্য থাকিবে। আইনের সাধ্য কি যে উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া এক পা চলিতে পারে? যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না সেখানে আইনের কার্যকারিতা নাই।

দুর্ব্বলের প্রতি যদি আন্তরিক অত্যাচার ইচ্ছা করেন, তবে তাহা রহিত করিবার ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা প্রজা আইন কেন দণ্ডবিধি আইনেরও নাই। খাজানার আইন দুর্ব্বলের পক্ষেই বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়াছে। পূর্ব্বে জমিদার অন্ধ, আতুর, বেওয়া বিধবা দৈব বিড়ম্বিত নানা প্রকার দুস্থ প্রজাকে বিনা করে প্রতিপালন করিতেন, এখন লাভের মধ্যেই এই হইল যে প্রজার স্বত্ব নাশের জন্য জমিদার ঐ সকল সুযোগ খুঁজিয়া যে কোন উপায় অবলম্বন করিবেন। কাজেই সে সকল দুস্থ প্রজা ঘাটে পথে পড়িয়া মারা যাইবে। তবেই কৃত্রিম প্রজা হিতৈষীগণের পরকাল খোলাসা হইয়া আসিবে।

একদিকে দুস্থ প্রজাগণকে মারিবার উপায় হইয়াছে। অন্যদিকে দুর্ব্বল জমিদার তালুকদারগণ ন্যায্য খাজানা আদায় করিতে না পারিয়া দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইবেন। খাজানার জন্য একটি মোকদ্দমাতে কোন ক্রমেই পাঁচ টাকার কমে অপব্যয় হয় না, শত শত টাকাও বিস্তর মোকদ্দমায় লাগিয়া যায়। হয়রানি পেরেসান কার্য ক্ষতি কত যে হয়, তাহারতো কথাই নাই। অথচ সাধারণ প্রজার প্রত্যেকের নিকট খাজানা তত বেশি পাওনা থাকে না, ভূস্বামীকে শর্ষন কূড়ায়ে বেল করিতে হয়। এমন স্থলে তত ব্যয় করিয়া মোকদ্দমা করা কদাপি শক্তিতে কুলায় না। এক ভূস্বামী যদি সহস্র প্রজার নামে মোকদ্দমা করিতে যান, তবে তিনি তত বড়লোক হইলেও পথের ফকির না হইয়া পারেন না। প্রজা নিতান্ত নিঃস্ব হইলেও মোকদ্দমার খরচ ২/৪ টাকা দিয়া মারা যায় না, কাজেই তাহারা পর্য্যমানে ভূস্বামীর খাজানাদিতে (যায়) না। প্রজায় খাজানা না দিলে ভূস্বামীর, সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? ভূস্বামী একালে খাজানা না পান, গবর্ণমেন্টের বোধ হয় তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তাঁহার

আইন করিবার ক্রটিতে ভূস্বামীর ন্যায্য খাজানাও পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কোন প্রতিবিধান করা অবিলম্বে কর্ত্তব্য। প্রতিবিধানের বিশেষ উপায় ও আছে। গবর্ণমেন্ট এরূপ একটি বিধি করুন "যদি কোন প্রজা ক্রমাগত তিন বৎসরের খাজানা বাকি রাখে, তবে বাকী খাজানার দায়ী ভূমিতে সেই প্রজার যেই স্বত্ব থাকে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। ভূস্বামী তিন বৎসর অন্তে তাঁহার প্রাপ্য তিন বৎসর বা তাহার অধিক কালের খাজানা বাকী দর্শাইয়া প্রার্থনা করিলেই গবর্ণমেন্ট ঐ ভূমিতে ঐ ভূস্বামীকে দখল দিয়া প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন। কি ঐ প্রকারে দখল পাইয়া ভূস্বামী বাকী খাজানার দাবী ছাড়িয়া দিবেন। এরূপ বিধি হইলে প্রজা ভূস্বামীকে দীর্ঘকাল ঠকাইতে পারিবেন, এবং যদি মূল্যবান হয়, তবে নিয়মিত মতে খাজানা দিবে। ভূস্বামী খাজানা সহজে না দিলে যখন তাহারা ঐ খাজানা সহজে আদালতে আমানত করিতে পারিতেছি, তখন তাহাদের অন্যায় ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশেষত তিন বর্ষাধিক কালের খাজানা রেহাই পাইতেছে। ইহাতে তাহাদের বিশেষ লাভ হইতেছে। আমাদের একান্ত অনুরোধ, গবর্ণমেন্ট এইরূপ একটি বিধি অবিলম্বে প্রচার করুন নতুবা এদেশের প্রজা ভূস্বামীকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করিতে হইবে।

৫ জুন ১৮৮৭

## গবর্ণমেন্ট ও ভূম্যধিকারী

গবর্ণমেন্ট প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে এপর্যন্ত যত আইন কানুন করিয়াছেন, তত্তাবতের অভিপ্রায় হইতে অনুভূতি হয় যে, ভূস্বামী মাত্রই যেন প্রবল প্রতাপ-বিপুল ধনের অধিকারী, আর প্রজা মাত্রই যেন নির্ব্বল, নির্ধন, নিতান্ত নিরীহ। প্রজার নানাপ্রকারে নানাবিধ সুখ সুবিধা করিয়া দিতেছেন, কিন্তু ভূস্বামীর ন্যায্য খাজানাটি সহজে আদায় সম্বন্ধে এরূপ একটি ব্যবস্থা এপর্যন্ত করা ঘটিল না। খাজানা আদায় সম্বন্ধে আদালতে মোকদ্দমা করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই, কিন্তু সেই আদালতের মোকদ্দমায় গবর্ণমেন্টের কোর্ট ফি, উকিলের বায়না, প্যাদার তলাবানা আদি, সাক্ষীর ব্যয়বরদায়ী ইত্যাদি শতশত প্রকারে যে ন্যায্য খাজানার বহুগুণ ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা চালাইয়া খাজানার মোকদ্দমা করা অধিকাংশ ভূস্বামীরই ঘটে না, সুতরাং তাঁহাদের ন্যায্য খাজানাও পাওয়া ঘটে না। এক একটি মোকদ্দমায় ন্যূন কল্পে দশ টাকা, এবং সহস্র টাকাও ব্যয় হইয়া থাকে। ভূস্বামীগণের অধিক্যরে প্রজা খাজানা বন্ধ করে, তবে তাহাদের প্রত্যেকের নামে মোকদ্দমা করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারেন, এমন অর্থবল শতকরা ৯৯ জন ভূস্বামীরই নাই। বঙ্গ রাজ্যে ১৬৩৬০ টি মহাল ও প্রায় ৩ লক্ষ ভূম্যধিকারী আছেন। ইহাদের মধ্যে নবাব, রাজা, মহারাজা, কয়টি আছেন যাঁহারা প্রজার খাজানা মোকদ্দমা করিয়া আদায় করিতে সমর্থ? পক্ষান্তরে লক্ষ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এই ভূম্যধিকারগুলি অবলম্বন করিয়া বঙ্গরাজ্যের যে উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতেছিলেন, তাঁহার কখনই এরূপ ব্যয় বিধান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহারা আপনাপন বাস্তু ভিটার অনুরোধে এবং প্রজাদিগের অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ভূম্যধিকারগুলি রক্ষা করত দিন দিন হৃত সর্বস্ব হইতেছেন।

এই সময়ে ভূস্বামীদিগের রক্ষার উপায় বিধান করা গবর্ণমেন্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। এই কার্যে কোন প্রকার অনিষ্ট না করিয়া ও সুন্দর একটি ব্যবস্থা প্রণীত হইতে পারে। ভূস্বামী যেমন সূর্য্যাস্তের নিয়মে রাজস্ব আদায় করিতে বাধ্য প্রজার প্রতিত তেমন

একটি বাধ্যতা থাকা অত্যাবশ্যক। প্রজা মাত্রই যদিও নিৰ্ব্বল নির্ধন নহে-যদ্যপিকালের পরিবর্ত্তনেও যোত স্বত্ব ক্রয়াদি সূত্রে বহু প্রজার অবস্থা ভূস্বামীগণ অপেক্ষা সুসম্পন্ন, তথাপি আমরা প্রজার প্রতিকূলে সূর্যাস্ত আইনের ন্যায় কঠিন নিয়ম করিতে বলিতেছিনা। বর্ত্তমান খাজানা বিষয়ক আইনের পূৰ্ব্বতন পাণ্ডুলিপিতে বাকি খাজানার জন্য প্রজার যোত স্বত্ব নীলামের যে ক্ষমতা জমিদারকে প্রদানের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল আমরা তাহাও করিতে বলিতেছি না। আমরা এইরূপ একটি বিধি প্রণয়ন জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি যে যাহাতে প্রজা পক্ষের অনিষ্ট না হইয়া ভূস্বামীর স্বত্ব রক্ষা পাইতে পারে। গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিধি প্রণয়ন করুন :

"যে প্রজা যে ভূমির খাজানা ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কি ততোধিক কাল ক্রমে বাকী রাখিবে তাহার ভূস্বামী স্থানীয় আদালতে সেই ভূমি হইতে সেই প্রজার সৰ্ব্বপ্রকার স্বত্ব রহিত জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন। বিচারক তদনুসারে প্রজার নামে এরূপ নোটিশ প্রদান করিবেন যে অনধিক এক মাস মধ্যে ভূস্বামীরপ্রাপ্য খাজানাদি সুদ ও ঐ আদালতে যে খরচ হয় তাহা পরিশোধ না করিলে খাজানাদি দায়ী ভূমিতে প্রজার যে কোন প্রকার স্বত্ব থাকে তাহা রহিত হইবে, এবং ঐ ভূমি ভূস্বামীর ইচ্ছানুসারে ব্যবহৃত হইবে। অংশী ভূস্বামীর পক্ষে তাঁহার অংশ সম্বন্ধে ঐরূপ বিধি বৰ্ত্তিবে।"

সম্প্রতি প্রজার পক্ষে যে সকল সুবিধাপ্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভূস্বামী তাহার কোন প্রকারে অনিষ্ট করিতে পারেন না। প্রজা আদালতে দাখিল করিয়া অর্থ ডাক মানি অর্ডার দ্বারা ভূস্বামীর খাজানা পরিশোধ করিবার যে সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ক্রমান্বয় তিন বৎসর খাজানা বাকি রাখাতে প্রজারই সম্পূর্ণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সেই ত্রুটির জন্য তাহার স্বত্ব নাশ করা কখনই অকৰ্ত্তব্য নহে। পক্ষান্তরে সে ভূস্বামী তিন বর্ষাধিক কাল খাজানা বাকি থাকা এবং তামাদি দোষে সেই খাজানা পাওয়ার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও মোকদ্দমার বহুব্যয় বিধান দ্বারা তাহা আদায় করিতে সমর্থ নহেন, সে স্থলে ভূস্বামীর স্বত্ব রক্ষার জন্য ঐরূপ বিধি প্রণয়ন করা একান্তই প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ ভূস্বামী অপেক্ষা তাহাদের প্রজাগণ মধ্যে বিস্তর ধনাঢ্য পরাক্রমশালী লোক হইতেছেন। বিশেষত বৰ্ত্তমান আইনানুসারে প্রজার যে সকল যোতস্বত্ব বিক্রয় হইতেছে, তাহার অধিকাংশ ধনীও প্রবল পরাক্রান্ত লোকেরাই ক্রয় করিয়া থাকেন। এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত প্রজাগণসহ খাজানা আদায় জন্য মোকদ্দমা করা অধিকাংশ ভূস্বামীর পক্ষে যেরূপ দুঃসাধ্য, তাহাতে ঐরূপ বিধি দ্বারা ভূস্বামীর স্বত্ব রক্ষিত না হইলে ভূস্বামীর নিশ্চয় পতন হইবে ; এবং তদ্বারা গবর্ণমেন্টও ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না।

২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯০

## জমিদারী পঞ্চায়ত ও বঙ্গীয় জমিদার (দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা পূৰ্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, বঙ্গীয় জমিদারদিগের একদিন প্রবল প্রতাপ ও সমাজে প্রভূত আধিপত্য ছিল, কিন্তু নানা কারণে এখন তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শুধু কাল ও গবর্ণমেন্টের উপর দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? জমিদারদিগেরও অনেক দোষ আছে।

বাণিজ্য, কৃষি, তেজারতি প্রভৃতি শত শত ব্যবসায়ের ন্যায় জমিদারীও একটি ব্যবসায়। অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি, অধ্যবসায়, আয় ব্যায়ের উপর দৃঢ় শাসন, স্বচক্ষে সাক্ষাৎভাবে সকল

পরিদর্শন, মিতব্যয়িতা, নিরলসতা প্রভৃতি গুণ ব্যতীত কোন ব্যবসায়েই সম্যক উন্নতি লাভ করা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাস করি, বঙ্গদেশের কয়জন জমিদার জমিদারিকে ব্যবসায়ীর চক্ষে দেখিয়া থাকেন? জমিদারীতেও যে আয় ব্যায়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত এবং লাভ লোকসানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা উচিত, তাহা কয়জন জমিদার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম? পূর্ব্ব পুরুষের লব্ধ জমিদারী হইয়াছে এখন বিলাসিতা, ঘোর অপব্যয়িতা ও অলসতার নামান্তর, জমিদারদিগের গৃহ হইয়াছে এখন চাটুকার ও হীন প্রকৃতি লোকদিগের আশ্রয় ভূমি। ষ্টেটের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই, কত খাজানা আদায় হইল, কত বাকী রহিল, বাকী মধ্যে আদায় যোগ্য বাকী কত কত, তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই, সেরেস্তার সুবন্দোবস্তের ও জমিদারীর অন্তর্গত বিবিধ বিভাগের প্রতি মনোযোগ নাই,—বঙ্গীয় জমিদার মনে করেন পৈতৃক সম্পত্তি—শুদ্ধ উপভোগের ও উড়াইবার জন্য, রক্ষার ও উন্নতির জন্য নহে, জমিদারি আয় গিরিনিঃসৃত স্বজাত উৎস, লাভ করিবার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন করেন না। অশিক্ষিত অল্পবেতন ভোগী কর্ম্মচারী ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল কুকুরের মত আহারের জন্য উধাও ফিরিতেছে। বিলাসিতা হিল্লোল দুলিয়া দুলিয়া জমিদার প্রভু নিশ্চিত মনে প্রজাপতির ন্যায় সুখদ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন জমিদারগণ যদি আপনাদের ব্যবসায় বুঝিতেন, ব্যবসায়ীর চক্ষে যদি জমিদারী দেখিতেন তাহা হইলে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজ এভাবে খণ্ড বিখণ্ডিত হইতে পারিত না, প্রজার এত ঔদ্ধত্য, ভূমি সংক্রান্ত করের এত বাহুল্য এবং জমিদারদিগের এরূপ শোচনীয় অধঃপতনও দেখিতে হইত না। বঙ্গদেশে যে কর্ত্তব্যপরায়ণ, সচেতন, ও সুদক্ষ ভূম্যধিকারী নাই, আমরা তাহা বলি না, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত কম যে নখাগ্রে গণনা করা যাইতে পারে।

তাহার পর উপাধির প্রলোভন। ভূম্যধিকারীগণ যে কি মধু পাইয়া ইহাতে মজিয়াছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। দেশের প্রকৃত অভাবের প্রতি দৃষ্টি নাই, প্রাচীনকালের সেই পবিত্র পুণ্য কর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই, কেবল মধুমক্ষিকার মত সেই মৌচাকের দিকেই মন ছুটিতেছে, যেখান হইতে রাজপুরুষদিগের প্রসন্নতার সৌরভ আসিতেছে দানেরস্রোত সেই দিকেই প্রবাহিত হইতেছে।

মানুষের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া দিতে পারে, এমন অনেক গুণ জমিদারী ব্যবসায়ের আছে। প্রথমতঃ ব্যবসায়ে সম্মান আছে,—গবর্ণমেন্ট সম্মান করেন, প্রজাগণ এখনও প্রণাম ও সেলামটা দিয়া থাকে, সমাজও জমিদারদিগকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। শত শত প্রণাম ও সেলামের মধ্যে মাথা ঠিক রাখা বড় সহজ নহে। এই জন্য জমিদারের নজরটা যেমন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে, রক্তের সহিত কিছু নওয়াবিয়ানার ভাব, চাল চলতির মধ্যে কিছু বড় মানুষি কেতা সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। জমিদার পুত্র অনাহারে শুকাইয়া মরিবেন তথাপি এই চাল চলতি ও কেতাটুকু পরিত্যাগ করিবেন না, এবং পার্য্যমানে ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হইবে না। কেমন যেন একটুকু লজ্জা, কেমন যেন একটুকু পদমর্যাদাভিমান তাঁহাকে তাঁহার পুরাতন গণ্ডী রেখার বাহিরে যাইতে দেয় না।

কোন কৃতীবান পূর্ব্ব পুরুষ বুদ্ধি বলে বিষয় সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ তাহা ভোগ করিতেছেন। পরিবার বৃদ্ধি হইয়াছে, এক সম্পত্তি শতভাবে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্বার্থের অধীন হইয়াছে, জমিদার পুত্রের জমিদারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের

উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু অভাব পূরণের জন্য অতিরিক্ত চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করেন না। অতএব অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে থাকে, অবশেষে সছিদ্র নৌকা জলপূর্ণ হইয়া জলমগ্ন হয়।

কিন্তু বঙ্গীয় জমিদারদিগের অধঃপতনের প্রদান কারণ মার্মলা মোকদ্দমার বহুলতা। প্রথমত গবর্ণমেন্টের ভূমি বিষয়ক ও স্বত্ব বিষয়ক আইন এরূপ জটিল, ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজ বিচারকদিগের একই বিষয়ের নজির সময়ে সময়ে এরূপ বিপরীত পথগামী, বিচার আদালতের গঠন প্রণালী মোকদ্দমা বৃদ্ধির এরূপ প্রশ্রয় প্রদায়ক, যে ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় জমিদারের পক্ষে মামলা মোকদ্দমা পরিত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যমুনা ও পদ্মার চরে বিবাদ বিশম্বাদের অনন্ত বীজ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, যাঁহাদের জমিদারী যমুনা অথবা পদ্মার ধারে, বিবাদ বিসম্বাদ তাঁহাদের কণ্ঠের হার। পদ্মা যমুনা জমিদারী গড়াভাঙ্গা কার্য্যে সর্ব্বদাই নিযুক্ত রহিয়াছে, ধনীকে নির্ধন, নির্ধনকে ধনী করিতেছে।

তথাপি জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে মামলা মোকদ্দমা অনেকটা পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু অতি অল্প জমিদারের সে ইচ্ছা আছে, এবং তাঁহাদের উপদেষ্টা কর্ম্মচারিগণ সেরূপ ইচ্ছা হওয়ার সুযোগও তাঁহাদিগকে প্রদান করেন না। পশ্চিম বঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ জমিদারদ্বয়ের মধ্যে বহুদিন হইল তুমুল মোকদ্দমা চলিতেছিল। জমিদার দ্বয় সম্পর্ক সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ যাওয়া আসা, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, এমন কি এক বাড়ির লোকের অন্য বাড়িতে যাওয়াও নিষেধ। উভয় পক্ষে জলের মত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। একদিন ছোট জমিদার বাবু কোন এক সাহেবের নিকট হইতে একখানা সুপারিশ পত্র লইয়া একটি বড় সাহেব ব্যারিষ্টারের নিকট চলিয়াছেন, পত্রখানা পড়িতে জমিদার বাবুর বড়ই ইচ্ছা হইল, কৌতূহল নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া পত্রখানা পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া ছোট বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। পত্রের মধ্যে ইংরেজিতে যাহা লিখা ছিল তাহার মর্ম্ম এই ;—"প্রিয়–, তোমার জন্য একটি হৃষ্টপুষ্ট শূকরের বাচ্চা পাঠাইতেছি, ভরসা করি ইহা দ্বারা কিছু দিনের জন্য তোমার উপাদেয় খাদ্যের প্রচুর সংস্থান হইবে।" ব্যারিষ্টার ও উকীল প্রভূদিগের পদে দূর হইতে প্রণাম করিয়া ছোট বাবু গৃহে ফিরিলেন,—ফিরিলেন ত বড় বাবুর প্রকোষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত। বড় বাবুর নিকট সংবাদ গেল, লোক, জন, আমলা মুস্‌সুদ্দি অবাক্। বড় বাবুও অবাক্। ব্যাপারটা কি? বড় বাবু একবার ভাবিলেন, কোন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, আবার বিদ্যুৎবৎ মনে উদয় হইল ছোট বাবুর সহসা বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। যাহা হউক তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন, বহুদিন পরে ভাইর সহিত সাক্ষাৎ হইল, ভাই প্রণাম করিলেন, তিনি আশীর্বাদ করিলেন, আর ঘোর পেঁচের কথা নাই ; ছোট বাবুর প্রস্তাব সরল– "আপনি কি হলে আপোশ করেন?" জমিদারীর অংশ লইয়া বিবাদ ছিল ; বড় বাবু যে অংশ চান তাহা বলিলেন, ছোট বাবু তাহাই স্বীকার করিলেন। বড় বাবু বিস্মত অবাক্ আপন চক্ষু কর্ণকে যেন অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ছোট বাবু মোসাবেদা করিতে বলিলেন। বড় বাবু বলিলেন যেরূপ বৃহৎ ব্যাপার তাহাতে ব্যরিষ্টার উকীল দ্বারা মুসাবেদা করিতে বলিলেন। কিন্তু ছোট বাবুর হৃদয়ে অসহ্য আগুন জ্বলিতেছিল, সে বিলম্ব সহ্য হইবে কেন, বিশেষতঃ শূকর–বাচ্চার কথা তাঁর মনে আছে। আবার ব্যারিষ্টার ও উকীলের দরকার? মন সরল হইলে সমস্তই সরল হইয়া আইসে। সেই বৈঠকেই মূসাবেদা হইল, কাগজ আনা হইল, কাগজ

লিখিত হওয়ার সময় বড় বাবুর অংশের স্থান খালি রাখিয়া লিখিতে বলিলেন। পাপের ন্যায় সততাও এমনি সংক্রামক যে বড় বাবু বিরোধীয় অংশ স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন। বহুদিন পরে দুই ভাই অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া পরস্পকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন।

কিন্তু এতদূর মহত্ত্ব, এতদূর ত্যাগ স্বীকার কয়জন করিতে প্রস্তুত। ভূসম্পত্তির এমনই মাদকতা ও মমতা যে এক হাত স্থানের জন্য সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতে ভূম্যধিকারিগণ কুণ্ঠিত হন না। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দিগ্বি দিগ্জ্ঞান থাকে না। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে আমলাদিগের পাকা ফলাহার, শ্রাদ্ধ বাড়িতে কাকের মত শত শত ব্যক্তি হা করিয়া থাকে। ময়মনসিংহ জেলায় কোন দুই বিখ্যাত জমিদার সরকারে প্রতি বর্ষে বেহুদা ফৌজদারীতে যে রাশি অর্থ ব্যয় হয় তাহা সৎকার্য্যে লাগাইলে ময়মনসিংহ বঙ্গের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারিত।

অতএব বঙ্গীয় জমিদারের অধঃপতনের প্রধান কারণ মামলা মোকদ্দমা এবং সেই জন্য বঙ্গীয় পঞ্চায়ত সভার অধীন সালিস বিভাগ আমাদের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছে। যে সব সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, কর্ম্মপটু ও মহদাশয় ব্যক্তি এই সভার পৃষ্ঠপোষক তাহাতে সভার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। সভার মুখপত্রিকা আলোচ্য জমিদার পঞ্চায়ত ও প্রথমেই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বরের লিখিত প্রবন্ধটি বিশেষ অনুসন্ধান, গভীর চিন্তা ও ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক। ইংরেজি আদালতে মোকদ্দমা করা যেরূপ কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে জমিদার পঞ্চায়ত পত্রিকা যদি সালিস দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিতে বঙ্গবাসীকে কিয়ৎপরিমাণেও অগ্রসর করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। দেশের পক্ষে মোকদ্দমার ব্যয় যেন বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের ন্যায় চাপিয়া রহিয়াছে।

১২ জুলাই, ১৮৯১

## সংবাদাবলী

গবর্ণমেন্ট রিপোর্ট ঢাকা বিভাগীয় জমিদারগণের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, গত দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন সময়ে ইহাঁরা বিলক্ষণ বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফরিদপুরের বড় ২ জমীদারেরা ভিন্ন স্থানবাসী। অত্রত্য ক্ষুদ্র জমিদারেরা প্রজাদিগের কষ্টের দিকে না চাহিয়া টাকা আদায় করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রায় সকল অবস্থার জমিদারেরাই সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। প্রায় সকলেই কিছুকালের নিমিত্ত খাজনা আদায় স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং অনেকেই একেবারে খাজনা মাপ করিয়াছিলেন। বরিশালের প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা নবাব খাজে আসানুল্লা, কালী-কৃষ্ণঠাকুর মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র এবং ঘোষাল পরিবারের অধিকারে বাস করে, তাহারা জমিদারের বিলক্ষণ সদ্ব্যবহারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপরাপর জমিদারেরা প্রায়ই প্রজার সহিত ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকেন এবং সাধারণ শিক্ষা প্রচারেরও বিরোধী। ইহাঁদিগের প্রতি জেলার অফিসারদিগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ময়মনসিংহের জমিদারদিগের মধ্যে অনেকে কলহপ্রিয় এবং কিয়দংশ বিদ্যোৎসাহী। শেষোক্তদলের মধ্যে রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী অগ্রগণ্য। ত্রিপুরা জেলায় মহারাজের জমিদারীর শাসন সংরক্ষণের অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু রায় অন্নদাপ্রসাদ, রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ, মহম্মদ কাজি চৌধুরী ও ফয়জন্নেছা চৌধুরাণী বিলক্ষণ বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী।

১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮০

## সংবাদাবলী

পাটের কারবার ছাড়িয়া দিলে মানিকগঞ্জের সমান কারবার স্থান পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই। এ স্থানে তামাকু, গুড়, চিনি, তৈল, মাহিষ ঘৃত লঙ্কা মরীচ প্রভৃতির কারবার এত বিস্তৃত যে, ঐ সকল জিনিসে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোওয়াখালি, বরিশাল ও চট্টগ্রামের সমস্ত আয়োজন এক মানিকগঞ্জ হইতে নির্ব্বাহ হয়। তামাক প্রভৃতি অনেক জিনিস ব্রহ্মদেশে ও মানিকগঞ্জ হইতে যায়। কুচবিহার জলপাইগুড়ী ও রংপুরের তামাক ও তৈল অত্রত্য ব্যবসায়ীগণ চিরন্তন কারবার স্থান মানিকগঞ্জে আনিয়া দেয়, এইরূপ পাটনা, গাজীপুর কাশী মির্জ্জাপুর প্রভৃতি উত্তর দেশীয় উল্লিখিত মাল সমূহের পূর্ব্ববঙ্গে একমাত্র বিক্রয় স্থান মানিকগঞ্জ। মানিকগঞ্জের ঐ সকল জিনিস অধিক পরিমাণে কিনিলে এত শস্তা যে, পূর্ব্ববঙ্গের আর কোন স্থানে তাহার তুলনা হয় না।

১৮ মার্চ, ১৮৯৪

## জমিদার ও দুর্ভিক্ষ

পূর্ব্বে যখন জমিদার দেশের রাজরূপে প্রজা শাসন করিতেন, তখন প্রজা রক্ষার সমস্ত কার্য্যই জমিদারদিগকে করিতে হইত। জমিদারের তখন আদালত ফৌজদারীর বিচার ক্ষমতা ছিল, প্রজাকে ইচ্ছানুসারে ধরিয়া আনিয়া যে কোন কাজে লাগাইবার অধিকার ছিল, প্রজার ধন রাজার ধন মধ্যেই পরিগণিত ছিল। এরূপ অবস্থায় প্রজার হিতাহিত জমিদার না দেখিলে, প্রজার হিতানুষ্ঠান ও অহিত নিবারণ জমিদার না করিলে আর করিবে কে? পূর্ব্বে এই কারণেই জমিদার প্রজা পালনে যে যে কার্য্য করিতে হয় সমস্ত করিতেন। দুর্ভিক্ষ হইলে অন্ন দিয়া বাঁচাইতেন। জলকষ্ট হইলে পুষ্করণী খননাদিদ্বারা জলকষ্ট নিবারণ করিতেন। লোকজন দ্বারা জলকষ্ট নিবারণ করিতেন ; কিন্তু এ সকল করিতেন কি নিজের জমিদারী বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা? তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজার ধন রাজারই ধনছিল, প্রজার ধনেই রাজা বা জমিদার দুর্ভিক্ষ নিবারণের আবশ্যক ধান্যাদি ক্রয় করত গোলজাত করিয়া রাখিতেন, অথবা তখন রাজস্ব স্বরূপ শস্যেরষ্ঠাংশ বা চতুর্থাংশ দিবার নিয়ম থাকাতে জমিদারের গৃহে সুজন্মার বৎসরে প্রচুর শস্য মজুত হইত তদ্দারা দুর্ভিক্ষের সময়ে অনায়াসে প্রজারক্ষা করা যাইত।

জলকষ্ট হইয়াছে। জমিদার অমনি যাহাদের জলকষ্ট, তাহাদিগকে বেগার ধরিয়া পুষ্করণী খনন করাইলেন। যে সম্মানী প্রজা পুষ্করণী খনন করিতে পারেনা, সে নিজ অর্থে চাকর রাখিয়া পুষ্করণী খনন কার্য্যে লাগাইতে বাধ্য হইল ; যে নিজে পারে ; সে নিজেই কাজে লাগিল, বহু প্রজার সাহায্যে জমিদার সুতরাং অতি সহজে পুষ্করণী কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার একটি পয়সা ব্যয় হইল না। অথচ প্রজার জলকষ্ট নিবারণ হইল। জমিদারের এ সকল ক্ষমতা ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কাড়িয়া নিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে জমিদারের যত আয় ছিল তাহা হইতে শতকরা মাত্র সওয়া ছয় টাকা জমিদারের তহসিল খরচ বাদ দিয়া সমস্তই গবর্ণমেন্ট সদর রাজস্বরূপে গ্রহণ করিতেছেন। কোন কোন বড় জমিদার নিজ নিজ জমিদারীর আয় সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাময়িক অপেক্ষা ১০/৫ গুণ বাড়াইয়া প্রচুর লাভবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ জমিদার গবর্ণমেন্টের আইনের কঠিন বন্ধন জন্য কোন লাভই করিতে পারিতেছেন না। অনেক জমিদার আইনের দোষে আদালতের বহু ব্যয় বহন করিয়া সদর রাজস্ব আদায়ের উপযুক্ত অর্থও প্রজা হইতে আদায় করিতে পারেন না। এইরূপ

অবস্থানপন্ন জমিদারের সংখ্যা এদেশে বহু লক্ষ এক ঢাকা জিলাতেই প্রায় ৫০ হাজার ; কিন্তু যাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রজা হইতে বর্দ্ধিত খাজনা আদায় করিয়া প্রচুর লাভবান হইয়াছেন। তাদৃশ বড় জমিদার কয়জন?

জমিদারের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, প্রজামরুক, বাঁচুক তাহাতে জমিদারের লাভালাভও কিছুমাত্র নাই, জমিদারের কর্তব্য সমস্ত গবর্ণমেন্ট কাড়িয়া নিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় দুর্ভিক্ষে জলকষ্টাদিতে জমিদারের সাহায্য চাওয়া নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক ও নিতান্ত অনুচিত কার্য্য। জমিদার ইচ্ছা করিয়া যদি কিছু দেন, তবে তাহার মহত্ত্ব সে জন্য তাহার নিকটে সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু কোন জমিদার ঐ সাহায্য না দিলে তিনি অনুযোগের পাত্র নহেন। সাধারনের অবস্থা ধরিয়াই কথা বলিতে হয়। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে ২/১টি বড় জমিদার থাকিলেও ২/১টির জন্য পঞ্চাশ হাজারকে কোন কাজে বাধ্য করা কর্ত্তব্য নহে। এই ঢাকা জিলার পঞ্চাশ হাজার জমিদারের ৪০ হাজারের অবস্থা গবর্ণমেন্ট এমন করিয়াছেন যে তাহারা প্রজা হইতে খাজানা আদায় না পারিয়া ঋণে ঋণে জর্জরীভূত হইয়া নিজেই অন্নাভাবে মরিতেছে। তাহারা নিজের জলকষ্ট নিজে দূর করিতে না পারিয়া শুষ্ক কণ্ঠে হাহাকার করিতেছে। তাহারা পৈতৃক সম্মানের ভয়ে কাহারও নিকট সাহায্য চাহিতে পারে.না, গবর্ণমেন্ট যে শ্রেণীর লোকের জন্য রিলিফ ওয়ার্ক খুলিয়াছেন, তাহাতে তাহারা গিয়া মাটি কাটিতে পারেনা। সুতরাং তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। আমরা দেখাইতে পারি, আমাদের অঞ্চলে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভদ্রলোক জমিদার তালুকদার ছিলেন, এখন তাহার সিকিও নাই। শস্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী তালুকদারীর আয়-বৃদ্ধি করিতে না পারিয়া সুতরাং আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য চালাতেই না পারিয়া অনেকেই অন্নাভাবে মরিয়াছেন। জলাভাবের প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া দূষিত জল পান করত নানা রোগেও অনেকের প্রাণ গিয়াছে।

এই কারণে ভদ্র বংশ উৎপন্ন হইতেছে। ইতরজাতীয় প্রজাদিগের এখন খাজনা পর্য্যন্ত দিতে হয় না, অন্নাভাব হইলেও তাহারাই সাহায্য পায়, সুতরাং তাহারাই নিরূপদ্রবে পরিজন বৃদ্ধি করিতেছে। ইতর লোকের সুখের সীমা নাই, সরল ভদ্রলোকের [ অস্পষ্ট ]। কিন্তু ভদ্রলোক চাহিতে জানেনা বলিয়া তাহাদের মৃত্যুর খবরও কেহ রাখেনা ; ইতর লোকের মধ্যে কেহ কষ্ট পাইলেই দেশহিতৈষীদিগের মাথায় টনক পড়ে। দূর্ভিক্ষে যত সাহায্য হইতেছে, ততই ভদ্রলোকের অনিষ্ট হইতেছে। ভিক্ষা পরাঙ্মুখ ভদ্রলোকের আহারীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া নীচ জাতীয় ভিক্ষুকদিগকে পোষণ করা হইতেছে। ইহা কখনও দেশের মঙ্গলজনক নহে। একজন ভদ্রসন্তান দ্বারা দেশের যে উপকাব হয় সহস্র ইতর লোক দ্বারা সে উপকার হইতে পারেনা। ভদ্র সন্তান স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেচনায় দেশের অনেক উপকার করে, নিজ সম্মানের অনুরোধে সাধ্যানুসারে অনেক ইতর লোকের প্রতিপালন করে। কিন্তু ইতর লোকের সাহায্য করাতে দেশ ছরাখারে যায়। নিজ নিজের ব্যবসায় নষ্ট করিয়া ভিক্ষা করে। অথবা নিজেদের পোষণে যে কিছু উপার্জ্জন আবশ্যক, কোন ক্রমেই তাহাই করিয়া বৃথা কাজে দিন কাটায়, সুতরাং এরূপ ইতরের প্রশ্রয় না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহার এইরূপ ইতরের উপকারার্থ দেশের অস্থিমজ্জা স্বরূপ ভদ্রবংশীয়দিগের সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার

তালুকদারদিগের সর্ব্বনাশের হেতু হইতেছেন, আমরা তাহাদিগের নিবুর্দ্ধিতা দেখিয়া নিতান্তই চিন্তিত হইয়াছি।

৯ মে, ১৮৯৭

### বঙ্গের জমিদার

অধঃপতিত বঙ্গীয় সমাজের জমিদারবর্গই একমাত্র ভরসাস্থল। দারিদ্র্যের দারুণ তাড়নে নিগৃহীত হইয়া অনশন বা অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট বঙ্গদেশবাসী গ্রাসাচ্ছাদন চেষ্টায়ই সতত ব্যাকুল। সুতরাং লোক হিতকর কার্যানুষ্ঠানে বাঙ্গালী সাধারণের যোগদান সম্ভাবনা অতি অল্প সন্দেহে নাই। দেশের হিতানুষ্ঠান একমাত্র কমলার প্রিয়তনয়গণেরাই সাধ্যায়ত্ত। এ নিমিত্তই বঙ্গের জমিদারবর্গ উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়া যাহাতে সমাজের গৌরবস্তম্ভরূপে বিরাজিত থাকিতে পারেন তজ্জন্য যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করা বাঙ্গালী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দূরদৃষ্ট বলে এমনি সময় আসিয়াছে যে বুঝি বঙ্গের জমিদারবর্গের অস্তিত্ব আর দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে না। সুশিক্ষা ও সদৃষ্টান্তের অভাবে জমিদারবর্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এখন অনেকে কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আত্ম কলহে ধ্যাপৃত। পূর্ব্বে জমিদারগণ দেশের হিতসাধনাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, এখন স্বার্থজ্ঞানবিমোহিত হইয়া হিংসাদ্বেষ সমাশ্রয়ে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া কলহে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই জমিদারগণ অনেকে আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। যে সামাজিক একতার অভাব বাঙ্গলীর অধঃপাতের একমাত্র কারণ জমিদারবর্গের মধ্যে তাহার বিদ্যমানতা পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব না থাকিলে দিন দিন সকলের ক্ষতি হইতেছে। ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতায় পুত্রে, পিতৃব্যে ভ্রাতষ্পুত্রে সামান্য খুটিনাটি লইয়া আপনাদের মধ্যে নিত্য এত কলহের কারণ সৃজন করিয়া লইতেছেন যে উহার প্রভাবে জমিদারবর্গ পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পরিণত হইয়া চিরতরে শান্তি সুখের আশায় বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ভূস্বামিগণ হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া অভিমান বশে অনেক সময় এমন কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যাহার পরিণামফলে নিজেদেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। আত্ম বিরোধবৃদ্ধিই বাঙ্গালীর অধঃপতের কারণ এবং এই আত্মবিরোধবহ্নি প্রভাবেই বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যাহারা, বঙ্গীয় সমাজের উন্নতিসাধন সংকল্প মুহূর্ত্তরেও যাদের হৃদয়ক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া থাকে, বঙ্গীয় জমিদারগণের মধ্যে যাহাতে এ আত্মদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইতে না পারে তজ্জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। জমিদারবর্গের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতিসাধন প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

২৫ আগস্ট, ১৯০১

## খ. শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

### সম্পত্তি বিনামীকরণ

এদেশীয় পূর্ব্বতন লোকদিগের সুদৃঢ় সংস্কার ছিল নিজ সম্পত্তির বিষয় কাহারো নিকট ব্যক্ত করা উচিত নয়। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অস্থাবর সম্পত্তির মৃত্তিকায় প্রোথিত

করিয়া এবং স্থাবর সম্পত্তি নামান্তর করিয়া রাখিতেন। তৎকালীন অবস্থানুসারে এ নিয়ম নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ছিল না।

.... কিন্তু চমৎকার আজিও সম্পত্তি লুক্কাইত করিবার প্রথা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, অধুনাতন লোকে অস্থাবর সম্পত্তি মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখে না সত্য। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিনাসী করিবার প্রথা আজিও পূর্ব্ববত প্রচলিত আছে। বোধ হয় স্বার্থ সাধনের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই অদ্যাপি লোকে এই রীতির মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখন অনেকে কোন ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে হইলে নিজ নামে ক্রয় না করিয়া স্ত্রী, পুত্র, ভাগিনেয় বা চাকর নফর প্রভৃতির নামে ক্রয় করিয়া থাকেন। ভাবী উত্তরাধিকারি ও উত্তমর্ন প্রভৃতিকে বঞ্চনা করাই সম্পত্তি বিনাসী করিবার মুখ্যোদেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্তই কখন ২ অন্যের নিকট সম্পত্তি বিক্রয় এবং হেবা প্রভৃতি দ্বারা অন্যকে তাহা দান করিয়া নিজের প্রকাশ্য সম্পর্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়। অথচ গোপনে ২ তাহাদিগের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত থাকে, যেন সেই সম্পত্তির একটি পয়সাও তাহারা গ্রহণ করিতে না পায়। বস্তুতঃ সম্পত্তি বিনামীকরণ এক প্রকার জুয়াচুরি মাত্র। ইহার অভিসন্ধি নিতান্ত দূষিত ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। এই রীতি প্রচলিত থাকাতে কত সময়ে কত লোক যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতেছে, কতলোক প্রাপ্য হইতেছেনা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা শুনিয়াছি কিছুদিন হইল বরিশালের কোন বিখ্যাত উকীল তাহার ভাগিনেয়ের নামে সম্পত্তি বিনামী করিয়া কালী পাড়ার জমীদার বিশেষকে প্রায় ৫০০,০০ টাকা ঠকাইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে আরো ভূরি ২ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। যে উপায় দ্বারা অন্যকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করা যায়, সময়ে ২ সেই উপায়ে আপনাকেও প্রতারিত হইতে হয় ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। সম্পত্তি বিনামীকরণ দ্বারা যেমন অন্যের স্বত্ব নাশ করা হয়। সেইরূপ কখন২ নিজেরও স্বর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। আমরা অদ্য ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বিক্রমপুরের অন্তর্গত ষোলঘর নিবাসী মৃত ফকির চাঁদ মুনসী একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারি করিয়া প্রভূত সম্পত্তি করিয়া যান। কিন্তু তিনি যে একখানি প্রধান তালুক ক্রয় করেন, তাহা নিজ নামে না করিয়া তাঁহার এক বিশ্বাসী নকরের নামে ক্রয় করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্তই ঐ তালুক তাঁহারই পৌত্রের অধিকারে আছে। কয়েক বৎসর হইল উক্ত তালুক লইয়া শরীরিক বিবাদ উপস্থিত হয়। সম্প্রতি প্রতিপক্ষের অন্য কোন উপায়ে জয় করিতে না পারিয়া যাহার নামে তালুক ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসঘাতক পুত্রকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়াছে। এবং তাহার দ্বারা ঐ মকদ্দমায় দস্তবর দারি দেওয়াইয়াছে। সুতরাং ফরিকচাঁদ মুন্সীর পৌত্রের জয়লাভের আর সম্ভাবনা নাই। এই মকদ্দমায় ফকিরচাঁদ মুন্সীর, সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ওয়াসিলাতের দাবিতে নালিস হইলে তাঁহার পাকা বসতবাটি রক্ষা পাওয়ায় সুকঠিন হইবে।

... অতএব সর্ব্ব সাধারণের নিকট আমাদিগের অনুরোধ এও, তাহাবা যেন অসদভিসন্ধিতে সম্পত্তি বিনামী করন পূর্ব্বক যথার্থ স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে বঞ্চিত করিতে গিয়া পরিশেষে স্বয়ং প্রতারিত না হন।

১ জুলাই, ১৮৬৬

## আফিমের ব্যবসায়

এখন আফিমের বিষয় নিয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। পার্লেমেন্টে প্রস্তাব হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আফিমের ব্যবসায় রহিত করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ হইতে আফিম বহুপরিমাণে চীনদেশে প্রেরিত হয়। চীনীয়েরা তাহা অপরিমিতরূপে ব্যবহার করে। সুতরাং অপরিমিত আফিম ব্যবহারে যতদূর অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা চীনীরদিগের হইতেছে। এমন কি আফিম ব্যবহার করিয়া তাহারা দিন ২ পশুতুল্য হইয়া যাইতেছে। এই অনিষ্টের নিদান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট। যাহাতে সহস্র ২ লোকের এত অনিষ্ট হইতেছে, তাহাতে লিপ্ত থাকা উচিত নয়। অতএব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আফিমের বাণিজ্য পরিত্যাগ করা বিধেয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেহ ২ বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আফিমের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেও কোন লাভ হইবে না। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা পরিত্যাগ করেন, তবে পারস্য প্রভৃতি স্থানের আফিমের চাসবৃদ্ধি পাইবে। সেখানে আফিমের পরিমাণ অনিষ্ট হইতেছে, তখন পারস্য প্রভৃতি দেশীয় আফিম দ্বারাও তাহাই হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টর তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয় নয়। কারণ যে জন্য পরিত্যাগ করা, তাহা থাকিয়াই যাইবে, কেবল মধ্য হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের কতকগুলি টাকা ক্ষতি হইবে মাত্র। কেহ ২ ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, চীন দেশীয় দিগের উপকার হউক বা না হউক, যদি ইহা দূষণীয় বলিয়াই স্থিরীকৃত হইল, তবে অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অন্যেরা সে দোষ করুক অথবা অন্যের দ্বারা তাহাদের সে অপকার ঘটুক, আমি যাহা অন্যায় বোধ করিব আমি তাহাতে লিপ্ত থাকিব কেন? যদি অন্যায় বলিয়াই বোধ হইল তবে অবশ্যই তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে এসকল কেবল যুক্তি তর্কমাত্র। প্রকৃত পক্ষে দেখা উচিত, ইহা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে কিনা? যদি পরিত্যাগ করা না যায় তবে যুক্তি তর্কে কিছুই হইবে না। আফিমে সামান্য লাভ হয় না। বর্ষে ২ প্রায় ৭/৮ কোটি টাকা রাজস্ব আফিম হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কি এতগুলি টাকা এখন রাজস্ব হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবেন? এখন রাজ কোষের ভয়ানক অনাটন। একটী পয়সা পাওয়া যাইতেছেনা। টাকার যাতনায় চতুর্দ্দিকে লোকে হাহাকার করিতেছে। দিন ২ নুতন করে সূচনা হইতেছে। তাহাতে প্রায় ৭/৮ কোটি টাকা ছাড়িয়া দেওয়া এখন গবর্ণমেন্টের দ্বারা কুলাইয়া উঠিবেনা। যদি ছাড়েন আবার নুতন টাকা ধরিতে হইবে। অতএব আমরা বলি যত দিন রাজকোষের সচ্ছলতা না হয়, ততদিন আফিমের বাণিজ্য উঠাইয়া দেওয়া উচিত নয়।

১০ জুলাই, ১৮৭০

## [ চাকরি সম্পর্কিত ]

আজিকালি এ দেশে চাকরির সংখ্যা অপেক্ষা চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা যে বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, অনেক ঘটনায়ই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। কোনরূপ সামান্য চাকরি খালি হইলেই যখন তদর্থ ভূরি ২ ব্যক্তিকে প্রার্থী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন কি ইহা নিশ্চিতরূপেই প্রতিপন্ন হয় না যে, এক্ষণ চাকরির বাজার নিতান্তই গরম এবং চাকরিয়ামহলে একান্তই দুর্দ্দশা উপস্থিত? জনসংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্য্যে কিয়দিনের নিমিত্ত কতকগুলি লোক নিযুক্তির প্রয়োজন হওয়াতে ৩/৪ মাসের নিমিত্ত ১৫ টাকা বেতনে ঢাকায় লোক নিয়োজন

করা হইবে,—যাহারা গণনাকারী থাকিয়া ভালরূপে কার্য্য সমাধান করিয়াছে, তাহাদিগের দাবি উহাতে অগ্রগণ্য হইবে এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচারিত হয়। তাহাতে নানা স্থান হইতে এই কার্য্যের প্রার্থনায় গত সপ্তাহে অত্রত্য কালেকটরির কাছারিতে এত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। শুনা যায় প্রায় ২/৩ সহস্র প্রার্থী উল্লিখিত কাছারিতে উপস্থিত হইয়া নিয়োগ কর্ত্তা কালেকটর সাহেবকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত ও উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে সকল কর্ম্মচারীকে প্রার্থীদিগের আবেদনপত্র গ্রহণ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের ত্রুটি বা দুরভিসন্ধি প্রযুক্তই হউক কিংবা প্রার্থীদিগের আগ্রহাতিশয়, অধীরতা বা অসভ্যতাদিবশতই বা হউক, কয়েক দিন কাছারিতে এরূপ জনতা হট্টকোলাহল গোলযোগ এবং হস্তাহস্তী ও ধস্তা ধস্তী হইয়াছিল যে, তাহাতে কোনরূপেই শৃঙ্খলা সহকারে ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারেনা। আবেদনকারীদিগের সকলেরই এই ইচ্ছা ও এই আগ্রহ স্বহস্তে আবেদন লইয়া গিয়া নিয়োজনকারী সাহেবের হস্তে অর্পণ করে, প্রহরী কনষ্টেবলগণ তাহাতে প্রতিরোধ করাতে ২ মধ্যে ২ নাকী মারা মারীও হইয়া গিয়াছে। কোন২ কনষ্টবল কোন২ প্রার্থীকে রুল দ্বারা প্রহার করাতে কোন ২ প্রার্থীও তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম দিতে ত্রুটি করে নাই। এক ব্যক্তি কোনও কনষ্টেবলের উপর ঢিল নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া হাজতে প্রেরিত হয়, পরে ১০০ টাকার জামিন দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি পাইয়াছিল বটে কিন্তু অবশেষে জয়ন্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে সে ১৫ দিবসের নিমিত্তি কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত ও হইয়াছে। আবার শুনা যাইতেছে, আবেদন পত্র গ্রাহী আমলাদিগের কেহ ২ নাকি মুখ চিনিয়া ২ সজাতি বিজাতি আত্মীয় অনাত্মীয় বাছিয়া ২ এবং মানসী পূজার বলাবল বুঝিয়া ২ আবেদন পত্র গ্রহণ করাতে অনেক প্রকৃত দাবি ওয়ালা অকৃতকার্য্য হয় এবং তাহাতেই অনেকরূপ গোলযোগ করে। মধ্যে ২ কেহ ২ কমিস্যনর সাহেবের নিকটে অভিযোগ করাতেও ত্রুটি করে নাই। ইত্যাকার বিবিধ গোলযোগ দর্শনে কালেকটর সাহেব উল্লিখিত ৫০০ কর্ম্মচারীর মধ্যে কয়েকজন মাত্র লোককে নিযুক্ত করিয়া অবশিষ্ট প্রার্থীগণকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন যে, যাবতীয় সুবারভাইজারগণকে তাহাদিগের পরিদর্শনাধীন ভাল ২ এনিউমোরাটারদিগের মধ্য হইতেই উক্ত কার্য্যে লোক নিযুক্ত করা হইবে। তাহাতে ৫০০ সংখ্যা পূর্ণ না হইলে পরে বাহিরের লোক নিয়োজন করা যাইবে। এই উপায়েই নিয়োগ কর্ত্তা ও আপাতত যন্ত্রণা এড়াইতে পরিসমর্থ হইয়াছেন। এবং মফঃস্বলের প্রার্থীরাও বৃথা ব্যয় বিরক্তি কালরহনাদি হইতে অব্যবহতি পাইয়াছে। যদি প্রথমেই এই রূপ বন্দোবস্ত করা হয়, অথবা যদি আবেদন পত্র গ্রহণ, নির্ব্বাচন ও নিয়োজনাদির সুশৃঙ্খলা বিধান করা হইত, তাহা হইলে কাহারও এত বিরক্তি ও কষ্ট ভোগ হইতনা বলা বাহুল্য।

উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি গুরুতর বিষয়ের পরিজ্ঞান হইতে পারে। চাকরি যাহাদিগের ব্যবসায় চাকরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব ভাবিয়া যাহারা বিবিধ কষ্ট ও অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া থাকে লেখা পড়ার চাকরি ভিন্ন যাহাদিগের অর্থ উপার্জ্জনের অপর ব্যবসায় নাই, সেই শ্রেণীসহ লোকদিগের কেমন শোচনীয় অবস্থা, এই ঘটনা দ্বারা কি ইহা প্রমাণিত হইতেছে না? যে চাকরির মূল্য মাসিক ১৫, টাকা, স্থায়িতা ৩/৪ মাসের অধিক নয়, তাহার নিমিত্ত যুগপৎ এতগুলি লোক এতকষ্ট ও অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত, গৃহে অন্ন সংস্থান থাকিলে অথবা অন্য কোন উপায়ে এই পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারিলে কি কখনও সম্ভনীয় হয়? ইংরাজ শাসনে

এ দেশের সবিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং দিন ২ আরও উন্নতি হইবে, যাহাদিগের এই দৃঢ় সংস্কার রহিয়াছে, পরিউক্ত ঘটনা কি তাহাদিগের সেই সংস্কারকে শ্লথমূল করিয়া দেয়না?

৬ মার্চ, ১৮৮১

## [দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি]

বঙ্গদেশে রাজনীতির বাজারটা কিছু বেশি গরম হইয়া উঠিয়াছে। স্থান অস্থান নাই, কালাকাল ভেদ নাই, প্রাবৃটের পূর্ণ প্রবাহের ন্যায় রাজনীতির আন্দোলন চুতর্দ্দিক সর্ব্বদাই বহিতেছে। রাজনীতি ভিন্ন কথা নাই, রাজনীতিরশূন্য বক্তৃতা নাই, রাজ নীতিবিবর্জ্জিত সভা নাই। বড় বড় শিক্ষিত বাবুদেরই ত কথাই নাই, কিন্তু যাহাদের গাত্রে দুগ্ধের গন্ধ এখনও লাগিয়া রহিয়াছে, ষ্টেটস্ম্যান্ পত্র যাহাদের রাজনীতির একমাত্র ভাণ্ডার তাহারাও প্রগাঢ় পণ্ডিত বিশ্বমার্ক এবং গ্লাডষ্টোনকে রাজনীতির বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিতেছে। যেদেশে রাজনীতির এত বহুল চর্চা সে দেশের সুখের সীমা কি?

রাজনীতি আন্দোলনে আমারা বিরোধী নহি, কিন্তু আমারা সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামী এবং হুজুকের শত্রু। আমাদের দেশে রাজনীতির একটা হুজুক উঠিয়াছে। এই হুজুকে পড়িয়া আমারা অন্যান্য যার পর নাই প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারেই উপেক্ষা করিতেছি।

দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ লোক কঙ্কালসার হইতে চলিল, দেশীয় কারিকরদিগের পেটেপৃষ্টের এক হইতে চলিল, অন্নমিলে না, চাকরী যোটে না, তথাপি দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিবেন না, শুদ্ধ রাজনীতির হাটে দিবারাত্র হৈচৈ করিয়া বেড়াইবেন। মানুষ বলি বোম্বেবাসীদিগকে। তাহারা আপনাদের অভাব বুঝিয়াছে, মহত্ত্বের প্রকৃত পথে তাহারাই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে গরম পান ইংরেজভায়ারা সেখানেই নরম হন। বোম্বে বণিকদিগের সহিত ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকগণ আটিয়া উঠিতে পারেতিছেন না। কলিকাতা বাঙ্গলার শিরোভূষণ, ভারতবর্ষের রাজধানী, রাজনীতির আলোচনা করিতে সেখানে এত বড় ২ সভা আছে, এ বড় বড় বাবু বড় বড় বক্তৃতা করিয়া আকাশকে আকুল করিয়া তুলেন, কিন্তু দেশীয় বানিজ্যের উন্নতি করিতে বীরপুরুষের ন্যায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, এরূপ কেহই নাই? দেশীয় ব্যবসায়িকগণ নিতান্ত সরলপ্রকৃতির লোক, দেশীয় শিল্পকলা ও শ্রমজীবী নিতান্ত অন্ধ। তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে, বিলাতী বণিক্দিগের ভেল্কি হইতে তাহাদিকে রক্ষা করিতে বোম্বের দেশীয় বণিক সমিতির ন্যায় কলিকাতাতেও কি একটী ক্ষমতাশালী সমাজ সংগঠিত হইতে পারে না? পারে নাযে কেন তাহাওত আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কলিকাতায় বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী ও বড় বড় ব্যবসায়ীর অভাব নাই, কেবল লাগিয়া পড়িয়া কায আরম্ভ করিলেই হইতে পারে। মাঞ্চেষ্টার বণিকদিগের জুয়াচুরিতে আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কি আমরা এখনও বুঝিতে পারি না? মাটি মাজা কাপড়, হাতে কম থান ও অকর্ম্মন্য নয়নরঞ্জন বস্ত্রদিদ্বারা ম্যাঞ্চেষ্টর বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপে প্রতারিত না হইতে দেশীয় বণিকগণ কেন বদ্ধপরিকর হন না? কেন কলিকাতা নগরে একটি মূল সভা করিয়া, তাহার শাখা প্রশাখা বাঙ্গলারসর্ব্বত্র প্রসারিত করুন না? যাহাতে বোম্বে এবং অন্যান্য স্থানের বস্ত্রাদির অধিক কাটতি হয়, মাঞ্চেষ্টারের শঠতা লোকে·

বুঝিতে পারে, পাড়াগেঁয়ে সোজা লোক কাঞ্চ ভাবিয়া কাচ না কিনে তজ্জন্য চেষ্টা করেন না? এগজিবিসন কি একটী বৃহৎ তামাসায় পরিসমাপ্ত হইল? জুবার্ট সাহেবের মেদবৃদ্ধি করিবার জন্যই বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট এই অর্থের শ্রাদ্ধ করিলেন। আমাদের অনতির জন্য আমরা গবর্ণমেন্টকে দায়ী করিতে বড় ভালবাসি, কিন্তু আমরাই যে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি তাহা একবার ভাবিয়া দেখি না।

২২ নবেম্বর, ১৮৮৫

## সবদিকে হাহাকার

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, যে যে ব্যবসায় করিত, সেই ব্যবসায় তাহার পুরুষানুক্রমিক হইত। ইহাতে পূর্ব্বকালে প্রত্যেক ব্যবসায়ের তেমন উন্নতি হইয়াছিল। আর [অস্পষ্ট] রাজনীতির মাহাত্ম্যে কোন জাতি [অস্পষ্ট] ব্যবসায় [অস্পষ্ট] নিজস্ব নাই, যে যাহা সহজে করিতে পারে, তাহাই অবলম্বন করিতেছে। আজ [অস্পষ্ট] আপনাপন ব্যবসায় ছাড়িয়া [অস্পষ্ট], অথবা কায়স্থের অক্ষরজীবিত্ব ব্যবসায়াবলম্বন করিতেছে। ইহাদ্বারাও যদি প্রত্যেক ব্যবসায়ের অবনতি না হয়, এবং সেই অবনতিতে দেশ দরিদ্র না হয়, এবং সেই অবনতিতে দেশে দরিদ্র আর প্রত্যেকের হাহাকার করিতে না হয়, তবে আর কিসে হইবে। [অস্পষ্ট], মাঞ্চেষ্টরের শস্তা কাপড় আইসাতে এদেশের জোলা জুগি তাঁতীগণের রোজগার কমিয়াছে, রোজগার একটু কম হওয়াতে ইহারা আপন ব্যবসায় ছাড়িয়া ছাড়িয়া অন্য নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে, ইহারোও ব্যবসায় ছাড়িতেছে, মাঞ্চেষ্টরের সুবিধাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। আচ্ছা যদি নিজ ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায়ে কাহারও যাওয়ার ক্ষমতা না থাকিত, তবে ইহারা কি অল্প লাভে অথচ অধিক পরিশ্রম করিয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া নিজ ব্যবসায় চালাইতে বাধ্য হইত না? জোলাভায়া যে কাপড় খান পাঁচসিকা বিকে, তাহা না কিনিয়া মারকিন কাপড় কিনিত? ৪০ নং ছাড়িয়া যদি ৮০ নং সূতায় কাপড় বোনা হয়, তবে কি তাহার সৌন্দর্য্য মাঞ্চেষ্টরের ধূতিকে পরাজয় করে না? তা যাউক, যদি তাঁতীর টাকা অপর ব্যবসায়ে না খাটিতে পারিত, তবে এই এক ঢাকাই তাঁতীর ধনে কি ২০/২৫ খান কাপড়ের কল আসিত না? ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সব হইত। যদি অসুরগণ আর্য্যধর্ম্মের অনাস্থা না জন্মাইত, তবে শাস্ত্রীয় শাসনকে সকলেই মানিয়া চলিত। তাহা মানিলেই জাতীয় ব্যবসায়েও সকলে দৃঢ় হইত। এই যে সকল ব্যবসায়ের অবনতি, সকল ব্যবসায়ীর হাহাকার, এ কেবল ধর্ম্ম বিপ্লবের ফল,—নব্য সভ্যতার মাহাত্ম্য। কায়স্থের লিপি ব্যবসায় যেরূপ সর্ব্বজাতিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এখন কাহাকেও অধিকার না দেওয়া দুষ্কর। এখন এক ঘৃণা প্রদর্শন ব্যতীত এবং রাজকার্য্যগুলিতে নিম্ন শ্রেণীর জাতি সমূহকে বঞ্চিত করা ব্যতীত ব্যবসায়গুলি ঠিক রাখা দুষ্কর হইতেছে। এরূপ না করিলে দেশের অদূরদর্শীগণ, অন্য রূপ ক্ষতি সহসা অনুভব করিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু যে দিন মেথরগণ নিজ ব্যবসায় ছাড়িয়া কলমের আস্বাদন লইবে, যে দিন প্যাইখানা পথ ঘাটের বদ্ধ মল হইতে [অস্পষ্ট] ছাড়িয়া ঐ সকল পরিষ্কার করিবেন কিনা এখনই তাঁহাদের ভাবা উচিত।

আরও [অস্পষ্ট] ভাবিতে হইতেছে। ভূমির প্রতি অধিকারির এমন একটি জিনিষ হইয়াছে, যাহার লোভ কাহারও পরিহার করিবার উপায় নাই। কোন জমিদারী তালুকদারী নয়, সাধারণ প্রজার [অস্পষ্ট] সকলের বাঞ্ছনীয়। এক টাকার বীজ হইতে ৫০ টাকা লাভ করা

কাহার না প্রার্থনীয় হয়? আজ যদিও জমিদারর আধিপত্য বিড়ম্বনাময়, তথাপি তৎপ্রতি অর্থশালী লোকের লোভ না যাইয়া পারেনা। আজ যদি জমিদারের স্বত্ব হয়, তবে ঐ প্রজাস্বত্বকেই ধনীগণ আপনাদের করিয়া তুলিবেন। ভূম্যধিকারিত্বের লোভ এমনই বটে। এই লোভে এদেশের অবনতির একটি প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য ব্যবসায় দ্বারা যখনই যাহার কিছু টাকা হাতে হয়, তখনি তাহারা আপনাপন অর্থকরী ব্যবসায় ছাড়িয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া বসে। ইহাতে অন্যান্য ব্যবসায়ের মূলধন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। অধিক মূলধন খাটাইয়া ইহারা কোন ব্যবসায় করিতেই প্রস্তত হয় না। যদি ভূসম্পত্তি ক্রয় করার সুবিধা না থাকিত, তবে ভাবিয়া দেখ, আধুনিক ধনী লোকের ধন দ্বারা রেলওয়ে, ষ্টীমার, বস্ত্রাদির কলদ্বারা ভারতবর্ষ ছাইত কিনা? নবাব আবদুল গনির ষ্টেটের মূল্যটি মজুত থাকিত, তবে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েটির ন্যায় লভ্যকর ব্যবসায়টি ইহারই একার সম্পত্তি হইতে কিছুমাত্র বাধিত না। ব্যবসায়ীদিগের অর্থগুলি এইরূপ ভূসম্পত্তিতে প্রযুক্ত হওয়ায় ব্যবসায়ীর যে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শুধু এই ক্ষতি নহে, এক ব্যবসায়ী অপর ব্যবসায় অবলম্বন করিলে শিক্ষা ও সংস্কারের অভাবে ও ব্যবসায়ের নিতান্ত ক্ষতি হয়। তার পর আর একটী দোষ বড়ই গুরুতর বোধ হয়। যে ভূস্বামী ও প্রজা মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ, বর্ত্তমানে যে তাহাদেরই পরস্পরে বিবাদ, এ কেবল ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের ভূম্যধিকারিত্ব গ্রহণের ফল। যে স্থলে ভূস্বামীর অধিকার পুরুষানুক্রমিক, সেখানে আর নুতন কোন অন্তরায় উপস্থিত না হইয়া থাকিলে ভূস্বামীকে প্রজাগণ পিতা বা দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে, ভূস্বামী ও প্রজাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। প্রজাপালন ভুস্বামীর প্রধান ধর্ম্ম প্রজার সুখবর্দ্ধন করা ভূস্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য, প্রজাপালনের যশ অতুলনীয়, প্রজা ভূস্বামীর প্রধান বল। বুনিয়াদী ভূস্বামী কদাপি পার্য্যমানে এমন প্রজার সঙ্গে বিরোধ করেন না। বিরোধ করে কে? বিরোধ করে, যে যে অপর ব্যবসায়ী ভূসম্পত্তির লাভ দেখিয়া তাহা খরিদ করে, তাহারাই অর্থেক সম্মান অপেক্ষা শ্লাঘ্য জানিয়া প্রজাযশোকতায় ব্রতী হয়। অর্থের মায়া এবং রাজা প্রজা সম্বন্ধ বিষয়ক সুখে অনভিজ্ঞতাবশত যেমন তাহারা ছলে বলে প্রজা হইতে স্বার্থসাধান করে, অপর দিকে প্রজাও সেই অপরিচিত অথবা অপদস্থ ব্যক্তিকে প্রভূত্ব করিতে দেখিয়া কিম্বা সেই অনভিজ্ঞ নবাবগত ভূস্বামীকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে অবাধ্যতা দেখায়। প্রজা ভূস্বামীড় বিবাদ অনেক ,লে এইরূপ কারণেই ঘটে। অতএব দেখা গেল, অপর ব্যবসায়ীর ভূসম্পত্তি লাভের সুবিধা থাকা সকল প্রকারেই ক্ষতিজনক।

এরপরে আরও গুরুতর কথা আছে। যিনি সম্পত্তি করেন, তাঁহার বড়ই আশা থাকে, তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশগণ সেই সম্পত্তি লইয়া চিরদিন তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিবে। তাঁহার এই কষ্টের সম্পত্তি দ্বারা যেমন তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ সুখ ভোগ করিবে, তেমন অতিবৃদ্ধ পৌত্রাদি ও সুখ ভোগ করিবে, সুতরাং সেই সম্পত্তি ভোগের সময় তাঁহার নামও স্মরণ করিবে। কিন্তু তাঁহারা পুত্রপৌত্রগণ কি করে? অন্বেষণ করিলে দেখিবে, যিনি অতি কষ্টে মাথায় বোঝা বহিয়া সম্পত্তি করিয়াছেন তাহার পুত্রই ঘোর বাবু হইয়াছে। হয়ত তিনি সম্পত্তি রাখিয়া জাকিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার পৌত্র এক দিক হইতে সম্পত্তি লুটিয়া দিতেছে। সেই কৃপনের পৌত্রটি দাতার শিরোমনি, উদারতার প্রতিমূর্ত্তি, মকারাদির পরম ভক্ত। এখন, সম্পত্তি রাখে কে? কার সম্পত্তি কে নষ্ট করে দেখ। দণ্ড বিধি আইনে বিশ্বাস ঘাতকতার দণ্ড আছে, কিন্তু এরূপ ঘোর বিশ্বাষঘাতকতার দণ্ড নাই। একজনের কীর্ত্তি বিনাশ

করার দণ্ড আছে। কিন্তু ঐ মহতীকীর্ত্তি বিনাশের দণ্ড নাই। ইহা করা যেমন বিশ্বাস ঘাতকতার সহায়তা বলা যায়। কোন কোন প্রদেশে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী করাটা বড় সহজ নহে, পুত্র থাকিলে তাহার আবার অনুমতি চাই, কিন্তু সে ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ পুরুষদিগের কোন আনুকূল্য হয় না। ব্যবস্থাপকগণ ওরূপ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেও পারেন না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে এবিষয়ের একটু সুব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা এবিষয়ে যে কর্ত্তব্য দেখিতেছি, যাহা দ্বারা উল্লিখিত সকল প্রকার বিঘ্নেরই কথঞ্চিৎ প্রশমন হইতে পারে, তাহা এখানেই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

গবর্ণমেন্ট সম্পত্তি বিক্রয়ের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং রাজস্ব অনাদায়ে হেতু নীলামের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই ঐ সকল অব্যবস্থার প্রধান কারণ। ঐ ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টের রাজস্বাদি আদায় পক্ষে বড় অনুকূল বিশেষত এদেশের কোন সম্প্রদায়কে প্রবল হইতে না দেওয়া এবং এদেশেকে অনেকাংশে বিলাতের আশাধারী রাখায় যদি গবর্ণমেন্টের পোলিসি থাকে, তবে তাহার ও খুব অনুকূল। কিন্তু পোলিসির কথা স্বতন্ত্র। পোলিসি আন্তরিক কথা, তাহা ধরিয়া আমাদের কিছু বলা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমরা সরলরাজনীতির অনকূলেই যাহা বলিবার বলিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, প্রজার বলবর্দ্ধনে প্রজার হিতানুষ্ঠানে, রাজার রাজত্ব দৃঢ় হয়। প্রজার বল বর্দ্ধন, হিতানুষ্ঠান অধোপতন নিবারণ, এই একটি কিসে হইতে পারে, তাহার একটি প্রধান উপায় আজ নিরুপণ করিতেছি।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি--পৈতৃক সম্পত্তি বিনাশ করার সুবিধা দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তা করা হয়, অপর ব্যবসায়ীদিগকে ভূস্বামীত্ব করিতে দেওয়ায় ব্যবসায়ের হানি করা হয়, এবং বিদ্রোহের উপায় করা হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্ব প্রকারেই বিষয় অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। যে নিয়মের এই অনিষ্টকারিতা তাহা রহিত করা সর্ব্বধা কর্ত্তব্য। আমরা তাই সনির্ব্বন্ধ সহকারে এই নিয়ম রহিতের প্রার্থনা গবর্ণমেন্টে করিতেছি। কি উপায়ে এই প্রার্থনা পুরণ করা যাইবে, তাহাও সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। বাকি রাজস্বের জন্য নীলামের প্রথা রহিত করা হউক। নীলাম না করিয়া ঐ বাকী রাজস্ব যতকাল আদায় না হয়, তত কাল গবর্ণমেন্ট নিজ দখলে আনিয়া নিজ কর্ম্মচারীদ্বারা রাজস্ব আদায় করুন। রাজস্ব ইহার সুদ এবং উহা আদায়ের সরমজামী খরচা কাটিয়া রাখিয়া মহাল ছাড়িয়া দিউন।

যদি নিজকৃত না হয়, তবে সেই স্থাবর সম্পত্তি ১২ বৎসরের অধিককালের জন্য কোন প্রকারে হস্তান্তরিত করা না যায়, এমন বিধি করা হউক। দেনার জন্যও ১২ বৎসরের অধিককাল ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়া সঙ্গত নহে। অতএব এমন নিয়ম করা হউক, যদ্দারা দেন ডিক্রী ক্রমে নীলাম খরিদার অনধিক ১২ বৎসর মধ্যে দেন ডিক্রী প্রাপ্ত টাকা, এই টাকার আইনত সুদ, এবং উহা আদায়ের খরচা উসুল হইলেই সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

৩০ জানুয়ারী, ১৮৮৭

## এম্প্রেস বিক্টোরিয়া

শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাদান্যতার আর যে একটি উদাহরণ সেদিনকার সভায় প্রকাশিত করিলেন, যদি অন্যান্য ধনীগণ সেই উদাহরণের অনুসরন করেন, তবে একটি বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন হইতে পারে। এই বৃহৎ ব্যাপার কি

কি নামে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এখনও তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। টাকা উড়াইবার অনেক উপায় আছে, কিন্তু এস্থলে সে সকল উপায় অবলম্বন করা কোনরূপে সঙ্গত বুঝি না। মহারাণীর নাম চিরস্মরণীয় হইবে, তেমন এদেশের একটি লভ্যকর ব্যবসায় অনুষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার অসুবিধা দূর করিবে। বস্ত্রাদির কলে সাহেবদিগের সহানুভূতি পাওয়া ভার ; ঢাকায় ড্রেন করিলে দেশীয়ের পক্ষে নূতন কাজ করা হইবে না এবং তাহাতে মহারাণীর নাম চিরস্মরণীয় হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। বিশেষতঃ ঢাকা জিলার একমাত্র ঢাকানগরীর কয়জন লোকের সামান্য উপকারার্থে ব্যয় করিয়া ফেলান, উচিত নহে। ঢাকায় ড্রেন না থাকাতে ঢাকাবাসীর যে সামান্য অসুবিধা, তাহা ঢাকা মিউনিসিপালিটিই দূর করিতে পারিবেন। টেকনিক্যাল কলেজ হওয়া অপরামর্শ নহে, কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকান্তের প্রদত্ত ৫ হাজার টাকা দ্বারাই বোধ হয় টেকনিকাল কলেজের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। রাজা বাহাদুর, সে পঞ্চাশ হাজারে না কুলাইলে যখন আরও টাকা দিতে সম্মত আছেন এবং ময়মনসিংহের অন্যান্য বড় লোকেরাও এই মহৎ ব্যাপারে সহায়তা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে তখন ময়মনসিংহে নিশ্চয়ই একটা টেকনিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা। এই কানের গোড়ায় ময়মনসিংহে উহা হইলে ঢাকায় আর আবশ্যক করিবে না বরং সময় সামগ্রীকে দুই স্থানে দুইটী হইলে ক্ষতিজনক হইবে। অতএব রেলওয়ে হওয়াই প্রধান পরামর্শ মনে করি। সত্যি বটে, জুবিলী উপলক্ষে এত টাকা উঠিবে না, তাহাতে রেলওয়ে হইতে পারে। কিন্তু রেলওয়ে যখন একটী প্রধান বাণিজ্য, তখন তাহাতে টাকা দেওয়ার সমর্থ লোকের কিছুতেই ইতস্ততঃ করিতে হইবে না। জুবিলী উপলক্ষে যত টাকা উঠে উঠুক, তারপর ১ শত হইতে ৫ শত টাকা পর্য্যন্তর অনেকগুলি অংশ করা হউক। গবর্ণমেন্ট অবশ্যই ইহাতে গ্যারান্টী দিবেন। অত্রত্য কমিসনর বাহাদুর ইহার কার্য্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া বিশেষ মনোযোগী হউন। অনায়াসে ১৫/১৬ লক্ষ টাকা উঠিয়া যাইবে। ইহার ৭/৮ লক্ষ টাকাতেই সাভার পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তৃত হইবে। বাকী টাকাদ্বারা সাভারের পশ্চিম পার হইতে মানিকগঞ্জ হইয়া শিবালয় পর্য্যন্ত ট্রামওয়ের জন্য পৃথক সড়ক করিতে হইবে না। ডিষ্ট্রিক্ট রেলবিভাগের যে সড়ক আছে ও যাহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহা ট্রামওয়ের জন্য লওয়া যাইতে পারিবে।

এরূপ হইলে বাণিজ্যের যে মহুদপকার হইবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্ট একবার এই পথে রেলওয়ে করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধলেশ্বরীতে পুল দেওয়ার ব্যয় বাহুল্য বিবেচনায় এবং সেই ব্যয়ের ফল ষ্টীমার গতায়তের ব্যয়জনিত ফলাপেক্ষা তত অধিক নয় বলিয়া ক্ষান্ত দিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্টের যেরূপ টানাটানির সংসার এবং ষ্টীমারেই কাজ যেরূপ চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে এপথে রেলওয়ে না হওয়া তত বড় কথা নহে, কিন্তু ষ্টীমারে যাতায়াতে যেরূপ অসুবিধা এবং দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক, তাহাতে গবর্ণমেন্টকেও ক্ষতি বোধ করিতে হয়। ষ্টীমারের কষ্ট অথচ ব্যয়াধিক্য বশতঃ অধিক লোকেই এই পথে ঢাকা ও গোয়ালন্দে যাতায়াত করে। জাহাজের বহু ভাড়া দিয়া দীর্ঘকালে মাল যাতায়াতেও বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হইয়া থাকে। এপথে রেলওয়ে কি ট্র্যামওয়ে হইলে যে ঐসকল অসুবিধা দূর হইয়া এই রেলট্র্যামিক ব্যবসায়ের প্রচুর লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। যে কাজে সাহেব দলের মন্তষিট গবর্ণমেন্টের বিশেষ লাভ, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা বা প্রচুর লাভ, তাহা করিতে সমর্থ ব্যক্তিমাত্রেই সম্মত হইবেন। অতএব চেষ্টা করিলে ফল পাওয়া যাইবে না, উপযুক্ত অর্থ জুটিয়া উঠিবে না, এসকল ভাবিয়া কেহই এই শুভ প্রস্তাবে উদাসীন না হন ইহাই আমাদের

একান্ত বাসনা। আমরা জানি, একবার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ ধনিগণ আপনাদের ব্যয়ে এই সম্পূর্ণ পথে ট্র্যামওয়ে করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্র বাবুর একটি দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় এবং রাস্তা প্রস্তুত না হওয়া বশতঃ এ কার্য্যে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন নাই। সম্প্রতি ঈশ্বরেচ্ছায় সে সকল বিঘ্ন দূর হইয়াছে ; যেরুপ ভাব বুঝা যায়, এই বর্ষেই ঢাকা হইতে এই বর্ষেই মানিকগঞ্জ রাস্তা সম্পন্ন হইবে। এমন সময়ে কমিসনর বাহাদুর দ্বারা যোগার করিলে কার্য্য সিদ্ধির নিতান্ত সম্ভাবনা। এই জুবিলীর মহৎ ব্যাপার উপলক্ষে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক। মহারাণী বিক্টোরিয়ার নাম চিরস্মরণীয় করিতে যাঁহারা আন্তরিক যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকেও চিরস্মরণীয় করণ। বিশেষ [অস্পষ্ট] এই রেলওয়ের নাম "এম্প্রেস বিক্টোরিয়া" রাখা হউক। এম্প্রেস বিক্টোরিয়ার দোহাই আজ আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি ভরসা করি এ প্রস্তাবে কেহই অবহেলা করিয়া সাম্রাজ্ঞীর অবমাননা করিবেন না।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭

## ভারত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ

সকলেই বলে, ভারত মরিয়াছে, কাজেই ভারত মাতার মাতৃভক্ত পুত্রগণ বৎসর বৎসর তাঁহার সপিন্ডীকরণ করিয়া থাকেন। প্রথম বর্ষে আদ্যশ্রাদ্ধ হওয়ার পর হইতে প্রতিবর্ষে ষোড়শ ও বৃষোৎসর্গ করিয়াই শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করা হইত, এবার দান সাগর করা হইয়াছে। দান সাগরের অগ্রদানী, বৈদিক, পুরোহিত, ব্রহ্মা উদগাতা, তন্ত্রধার, সদস্য সকলেই যথাবিধানে আপনাপন কর্ত্তব্য সমাহিত করিয়াছেন। এই বৃহৎ ব্যাপারে ইংলন্ডের পুরোহিতগণ প্রত্যক্ষভাবে ৬৫ হাজার টাকা এবং রেলওয়ে সাজসজ্জা, অশন বসনাদিতে অন্যূন তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। ভারত মাতার পুত্রগণের ধন্য ধন্য নাম পড়িয়া গিয়াছে ; মহাত্মারা সশীরের স্বর্গলাভের পথ করিয়াছেন, যে স্বর্গে যাইবেন, তাহার নাম ব্যবস্থাপক সভা। বালিকা বিধবাগণ এ স্বর্গের বিদ্যাধরী (এজন্য বড় বড় চুলের ফরমাইশ দেওয়া হইয়াছে) হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সংস্করণ, এ সভার অমৃত, এবং হিন্দু স্থানকে ইউরোপ করিলে যে সৌন্দর্য্য ও সৌরভ উঠিবে, তাহার নাম পারিজাত।

পাঁচ বৎসর যাবৎ এই শ্রাদ্ধের ব্যাপারে অন্যূন ৯৫ লক্ষ টাকা ইংলন্ডের ব্রাহ্মণগণ লাভ করিলেন, কিন্তু এদেশের অলীক, কাঙ্গালীগণ কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইল না, ইহা দেখিয়া শ্রাদ্ধের পক্ষপাতী অনেকের মুখেও নিন্দা শুনা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন, যে ব্যাপারে বিধবার চুল বাড়ানোর জন্য প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষরিত হয়, সে স্থানে দরিদ্রের হিত জন্য এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরিত হইয়াছে? সত্য বটে, লবণ ট্যাক্স কমানোর কথা ছিল, কিন্তু [অস্পষ্ট] কি কোন প্রতিজ্ঞা পাঠ হইয়াছে? এখনও কি বুঝিবাব বাকি যে, মহাত্মাদের মনের টান কোন্‌দিকে বেশী? এক দিকে মুখের কথা—হল হল-না হ'ল নাই, আর অন্য দিকে প্রতিজ্ঞা প্রাণপনে করিতেই হইবে। ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যাহাদের চৈতন্য হয় না, তাঁহাদিগকে অধিক আর কি বলিব? একটি পয়সা লাভ নাই—কিন্তু বিলাতে গেল অন্যূন পোনর লক্ষ টাকা, জিজ্ঞাসা করি, যে যে উদ্দেশ্যে এতগুলি টাকা ব্যয় করা হইতেছে, সে সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হওয়ার আশা করাই পাগলামি। আর তাহাতে মহাত্মাদের মতি গতি যত আছে, তাহা তাঁহাদের নিজ নিজ আচরণেই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বিলাতে পাঠাইবার জন্য এক...

পঁয়ষট্টী হাজার টাকা যোটাইতে পারিলেন, কিন্তু শুনিয়াছি, ঐ দলের একজন নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য বড় অনুরাগী, তাই তিনি পাঁচ বৎসরের চেষ্টাতেও তাহার জন্য ৪০/৫০ হাজার টাকা যোটাইতে পারিলেন না। নিজেরা সমাজ সংস্কারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে, কিন্তু বিলাতি বসন ভূষন সাজ সরঞ্জাম পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিলে দেশে অন্যূন ৫/৭ কোটি টাকা বৎসর বৎসর থাকিয়া যায়, তাহার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন না। তাঁহারা যে টাকাটি বৎসর বৎসর রেলওয়ালাদিগকে দিতেছেন, এই টাকাটি যত টাকার সুদ, তাহা দ্বারা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নূতন রেলের প্রবর্ত্তন করিতে অথবা পুরাতন রেললাইনগুলি কিনিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা সকলেই পৈতৃক ধনে ধনী, অথবা পৈতৃক ধন প্রসাদাৎ, উপার্জ্জন ক্ষমতা বিশিষ্ট, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দেশে কৃষি ব্যাঙ্ক করিয়া অথবা আদর্শ কৃষি কার্য্যালয় করিয়া কৃষকদিগের, কাপড় কাগজ প্রভৃতির কল করিয়া সর্ব্বসাধারণের এবং নানা উপায়ে দেশের বিস্তর উপকার করিতে পারেন, কিন্তু তাহার কিছুতেই তাঁহাদের মন নাই, মন বাধা কেবল মাতৃশ্রাদ্ধের বৎসতরী যোটানের দিকে ; মহাত্মাদিগের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এমনই বিচিত্র।

১২ জানুয়ারি, ১৮৯০

## দেশীয় শিল্প ও দেশীয় বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার

কবি ত বহুদিন হইল করুণ ক্রন্দন স্বরে গাহিয়াছেন "দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন, অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, শোকে তাপে তনু ক্ষীণ" কিন্তু সেই বিষাদ সঙ্গীত অনন্ত আকাশ বক্ষে বিলীন হইয়াছে, জাতীয় হৃদয় তন্ত্রী ত একটী বারও সেই শোক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিল না, ভারতসন্তান ত মাতার মলিনমুখ মন্ডল ও শীর্ণ শরীরখানির প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিল না।

কিন্তু আজ এ কি শুনিতেছি? কি দেখিতেছি? আকাশের বক্ষে আজ আশার সঙ্গীত মৃদুল বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকের মনে আজ এক নবীন ভাব-তরঙ্গ খেলিতে আরম্ভ হইয়াছে দেশীয় বাণিজ্য ও দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার জন্য দেশীয় প্রাণ আকুল হইয়াছে। বড় শুভ দিন, বড় শুভ লক্ষণ। ...

মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দুদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করেন নাই ; কিন্তু ইংরেজগণ আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিয়াছেন। রাজার রীতি নীতি অধিকৃত প্রদেশে কিছু পরিমাণে প্রবেশ করিবেই করিবে। অতএব মুসলমান রাজত্ব কালেও যে হিন্দু সমাজে রীতি, নীতি ও রুচির আংশিক পরিবর্ত্তণ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে সামান্য পরিবর্ত্তনে দেশের তত অমঙ্গল হয় নাই। মুসলমান রাজগণ ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন, ইংরেজগণও তাহাই। কিন্তু মুসলমান ছিলেন দেশীয় রাজা, ইংরেজ বিদেশীয় রাজা। মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অর্থ ভারতবর্ষেই ব্যয় করিতেন, ইংরেজগণ ভারতবর্ষের অর্থে ইংলন্ডের উন্নতি বিধান করিতেছেন। মুসলমানদিগের নবাবিতে ভারতবর্ষীয় শিল্প পরিপুষ্ট ও পরিবদির্ধত হইয়াছিল, ইংরেজী বাণিজ্যের নিদারুণ প্রতিযোগিতায় সে শিল্প মৃতফল হইয়াছে। ইংরেজগণ ভারতবর্ষে বসন্তের পাখী, বসন্ত অন্তে স্বদেশে উড়িয়া যান। বিলাতি বাণিজ্যের চাকচিক্যশালী বহিরাবরণ ভেদ কর, ভয়ানক বিভীষিকা দেখিতে পাইবে। বাণিজ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র অর্ণব পোত, বিবিধ মনোহর

পণ্যদ্রব্য রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বিলাতি সভ্যতায় সমস্ত উপকরণের মধ্যে ভারতবর্ষের দরিদ্রতা স্পষ্ট অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। কুসুম মাল্য বিশ্বাসে যাহা আমরা কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, তাহার মধ্যে কালসর্প লুক্কায়িত রহিয়াছে।

• দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের অধোগতির আর একটী কারণ দেশীয় রুচির বিপর্য্যয়। বিলাতি রুচির বিষময় স্রোত ভারতবাসীর সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উঠিতে বসিতে, আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে বিলাতি দ্রব্য ললাট লিপির মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গী। বিজাতীয় শিক্ষা এই রুচি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। বিলাতি শিক্ষা আমাদিগকে সাহেবি শিক্ষা দিয়াছে, সাহেবি শিক্ষা আমাদিগকে দেশীয় দ্রব্যের প্রতি ঘৃণার ... দর্শন করিতে বলিয়া দিয়াছে, আর আমরাও তোতা পাখীর মত যাহা শুনিয়াছি তাহা শিখিয়াছি।

তারপর দেশ দিন দিন দরিদ্র হইয়া যাইতেছে, দরিদ্র লোকের সুলভ দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। বিলাতি শিক্ষা চাক্‌চিক্য প্রিয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে, অতএব সুলভ মূল্যে চাক্‌চিক্যশালী দ্রব্যের জন্য দেশের লোক লালায়িত হইল। বিলাতি বণিকগণ দেশীয় শিল্পী ও দেশীয় বণিক অপেক্ষা সুপটু ব্যবসায়ী, ভারতবর্ষীয় ক্রেতাদিগের নাড়ীর অবস্থা তাহারা অতি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল ; ভারতবাসী কিরূপ দ্রব্য চায় তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল, অমনি সুলভ চাক্‌চিক্যশালী দ্রব্যে ভারতবর্ষীয় হাট ঘাট পরিপূর্ণ হইল, দেশীয়দ্রব্য দেখিতে দেখিতে হাট বাজার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। দেশের লোক সুলভ মূল্যে মনোহর দ্রব্য চায়, দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য দৃঢ় কিন্তু মূল্য কিছু অধিক, অতএব দেশীয় দ্রব্যের সহিত দেশীয় নবীন রুচির মিশ খাইল না, কিন্তু বিলাতি বণিকগণ ঠিক সেই রুচির ফরমাইস মত দ্রব্য প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন।

বারি সিঞ্চন দ্বারা নবীন বৃক্ষ যেমন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইলেও সেইরূপ শিল্পাদি উন্নতিলাভ করে। মুসলমান নবাবগণ পূর্ব্বে দেশীয় শিল্পের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন দেশীয় শিল্পগণ ও নূতন নূতন শিল্পচাতুরি প্রদর্শন করিয়া ক্রেতার মন ভুলাইয়াছে। বিশেষতঃ তখন তাহাদের কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে, সহানুভূতির অভাব ও প্রতিযোগিতার প্রখরতায় দেশীয় শিল্পীগণ উদ্যম শূন্য ও উদ্ভাবনা শক্তিহীন এখনও প্রতিভাহীন হয় নাই। কিন্তু দুর্দ্দিনের মেঘে তাহাদের সেই প্রতিভা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। দেশীয় লোকও বিলাতি রুচির রঞ্জিত চশমা চক্ষে দিয়া সেই প্রতিভাকে তত উজ্জ্বল দেখিতেছে না।

ইংরেজগণ দোকানদারী আমাদের অপেক্ষা ভাল জানেন। সাজসজ্জা ভদ্রব্যবহার মিষ্ট কথা বণিক বৃত্তির প্রাণ, ইহাতে বিলাতি ব্যবসায়ীগণ খুব সুশিক্ষিত। দেশীয় ব্যবসায়ীগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

১৪ জুন, ১৮৯৯

### দেশের এ দুরবস্থা কে করিল ?

যে পাঠক ত্রিশ বৎসরের অবস্থা অবগত আছেন, একবার সেই সময়ের চিত্রটী স্মরণ করিয়া দেখুন, দেখিয়া একবার বর্ত্তমানের সঙ্গে তুলনা করুন, নিশ্চয়ই শোকে দুঃখে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে—। নিশ্চয়ই তাঁহাকে বলিতে হইবে—সে স্বর্গের সঙ্গে এ নরকের

তুলনা হইতে পারে না, সে রাজ্যে সুখ ছিল, তাহার আর এরাজ্যে নাই ; এই ত্রিশ বৎসরে এক মহাযুগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন লোকের স্বাস্থ্য ছিল, এখন নানা রোগের অধিকার হইয়াছে, ইনফুলুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু জ্বর, কালোজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা রোগের নুতন আবির্ভাব হইয়াছে। পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, এসকল নূতন রোগ কেন হইল? লক্ষ লক্ষ বর্ষে যাহা হয় নাই, সহসা এই কয়েক বৎসর মধ্যে মাত্র যদি ৪টি রোগেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এই হারা হারিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষে সহস্র সহস্র রোগের উৎপত্তি হইল না কেন? বস্তুতঃ এই সময়ে এমন কোন নূতন কার্য্য স্বীকার করিতে হইবে, যাহার ফল এই সকল রোগ।

পূর্ব্বতন বালক বৃদ্ধ যুবাগণ সর্ব্বদা আমোদে প্রমোদে মত্ত থাকিত, অতি অল্প সময় কাজ করিতে হইত, এখন আমোদ প্রমোদ করিবে কি—সর্ব্বদা লোক পেটের ধান্দায় অস্থির। সে কালের লাটিম, ডুডু ডুডু, ছিছি, লবণকোট, কড়ি মঞ্জরি, মীর মীর, ঘরভর্নি, আমঝোল প্রভৃতি শত শত খেলা যাহাতে ব্যায়াম, হস্তপদাদির কার্য্য ক্ষমতা মনের ধরতা প্রভৃতি জন্মিত, স্বাস্থ্য রক্ষা পাইত, সে সকল খেলা আর নাই। এখন বড় বড় স্কুল কলেজ ২/১টা ব্যায়ামশালা হইতে ৫/৭/১০ জন বালককে জিমনেষ্টিকও ক্রীকেট প্রভৃতি খেলায় নিবিষ্ট হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু পল্লিগ্রামে লক্ষ লক্ষ কোটি লোক যে এককালে অসাড় হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিলে, দেখিয়া পরিনাম ভাবিলে চক্ষু জল–ভারাক্রান্ত হয় : বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম অভ্যাস করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে যে শরীর উপযুক্ত রুপে গড়িত হয় না, তাহা সভ্যতম সাহেবগণ হইতে নিতান্ত হেয় বিড়াল কুকুরেরা পর্য্যন্ত বুঝে ; সাহেবদিগের ব্যায়াম সকলে না দেখিলেও বিড়াল কুকুরাদির শাবক শিক্ষা সকলেই দেখিয়াছেন ; পশুর পক্ষে শাবকদিগের শিক্ষা দান পদধতি হইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও অনুভব হয় ; এমন প্রয়োজনীয় বাল্যক্রীড়া দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহা কি দেশের অবশ্যম্ভাবী পতনের চিহ্ন নহে? এই ব্যায়াম বিমুখতা যে আগন্তুক অভিনব পীড়া সমূহের অন্যতম কারণ নহে তাহাই বা কিরূপে বলিবে? দেশ হিতৈষীর ধ্বজাধারীরা গাঁয় গাঁয় ইংরাজী বিদ্যালয় করিয়া যত শিল্পী ও কৃষকের সন্তানদিগকে বাবু প্রস্তুত করিতেছেন ; কৃষি শিল্পের অবনতি করিয়া গোলামির জন্য সকলকে ঢুঢু করাইতেছেন, কিন্তু কিছু কিছু ব্যয় স্বীকার করিয়া দেশীয় ব্যায়াম শিক্ষা করাইলে যে সমূহ উপকার হয়, তৎপ্রতিকাহার মনোযোগ আছে? কোন কোন খেলায় কিছু লাভের প্রলোভনও ছিল। কড়ি খেলায় কড়ি লাভ হইত, অন্যান্য খেলায় ধনীগন কিছু কিছু খাবারও পুরস্কার দিতেন। এখন স্কুলের ব্যায়টি সেজন্য করিলে উপকার হয় না কি?

খাদ্য সামগ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত বৃদিধ পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে চাউল টাকায় ২৫ সের পাওয়া যাইত, এখন তাহা দশ সের। মাছ দুধ তরকারী ডাইল তৈরি প্রভৃতি সমস্তই আগুনে চড়িয়াছে। মজুরের বেতন ৬/৭ গুন বৃদিধ পাইয়াছে। পূর্ব্বে ১, ১।০ সিকায় যেমন মজুর পাওয়া যাইত এখন ৭, ৮ টাকা তেমন মজুরকে দিতে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তদ্বারা যেমন কাজ পাওয়া যাইত, এখন তাহার অৰ্দ্ধেক কাজও পাওয়া যায় না। লোকের বিলাসিতা বাড়িয়াছে, পরিশ্রম শক্তি কমিয়াছে। পাটের কৃষিতে কৃষকগণ এক থোকে কিছু টাকা পায়। বলা বাহুল্য, পরিণামদর্শিতার অভাবে ভবিষ্যতের জন্য তাহা রাখিতে জানে না,—তখন তাহা খরচ করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে যাহারা শাকান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে, অথবা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া খাইত, হাতে টাকা পাওয়াতে তাহাদের সে কষ্ট ও পরিশ্রম

করিতে ইচ্ছা হয় না, উপাদেয় খাদ্যাদিতে সে অর্থে কতকাংশ ব্যয় করে ; নিজে পরিশ্রম করিয়া যে কাজ করিত সেই কাজের জন্য চাকর রাখিয়া কতকাংশ ব্যয় করে ; ছাতা জুতা পিরন প্রভৃতি যাহা না হইলে চলিত, এখন সে বৎসরে অন্তত ৪ খানি বস্ত্র কিনিয়া ঐ অর্থের কতকাংশ ব্যয় করে। পূর্ব্বে একখানি কাপড় হইলে যাহার ২ বৎসর যাইত, এখন সে বৎসরে অন্তত ৪ খানি বস্ত্র কিনিয়া ঐ অর্থের কতকাংশ ব্যয় করে। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে সামান্য ক্ষতিগুলি অকাতরেসহ্য করিত, এখন হাতে টাকা হওয়ায় তাহারই জন্য তাহার দশ গুণ ব্যয় বিধান পূর্ব্বক মোকদ্দমায় ও জেদাবাদে লিপ্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। পূর্ব্বে সে স্বহস্তে হাল চষিত, এখন সে মোকদ্দমায় ব্যাপৃত ; তাহার এক জনের কাজ নির্ব্বাহ জন্য তিন জন চাকর রাখা হইয়াছে। তাঁহার মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণাদির জন্য আর পাঁচজনের কাজ নষ্ট হইতেছে।

জিনিসের মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণের লাভালাভে কিরূপ তাহার পরিচয় ইউরোপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলন্ডও [অস্পষ্ট] ৬০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ১২৫০০০০ লোক অর্থাৎ ঐ বয়সের মোট লোক সমষ্টির শতকরা ৬.৪ জন লোক দরিদ্রাশ্রমে যাইয়া জীবন রক্ষা করে, ষাইটের অধিক ও পঁয়ষট্টীর ন্যূন বয়স্ক লোক ৮২ হাজার অর্থাৎ শতকরা ১০.২ জন দরিদ্রাশ্রমে প্রাণরক্ষা করিতে বাধ্য হয়, তাহার অধিক বয়স্ক ৫০৭০০০ অর্থাৎ শতকরা ৪২ জন ঐ দরিদ্রাশ্রমে জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। এতদ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে যতদিন লোকের শক্তি সামর্থ্য থাকে, ততদিন প্রাণপনে খাটিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে ; এইজন্য যাইটের ন্যূন বয়স্কদিগের মধ্যে দরিদ্র সংখ্যা কম ; তবে সম্ভবতঃ রোগাদি জন্য শতকরা প্রায় সাড়ে ছয়টি লোক প্রাণ রক্ষার জন্য দরিদ্রাবাসে যায়। যাইটের অধিক হইলেই শরীরের বল কমিতে আরম্ভ হয়, নিজের উপার্জ্জনে সেই মহার্ঘ আহার্য সংগ্রহে ক্রমে ক্রমে অসমর্থ হইয়া উঠে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অধিক লোককে দরিদ্রাবাসে যাইতে হয়। ৬৫র পরে ৭০/৮০/৯০ প্রভৃতি বয়স্ক বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধগণ যখন উপার্জ্জন দ্বারা সংসার চালাইতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইয়া উঠে, তখন সেই সভ্য দেশের মহিমায় দরিদ্রাবাস ভিন্ন আর জীবন ধারণের উপায় থাকে না। শতকরা ৪২ জন—প্রায় আধাআধি লোক যেদেশে এরূপ বিপদাপন্ন, সেদেশ বস্তুতই কি উন্নত আর যে মহার্ঘতাবশতঃ লোকে অল্পে স্বল্পে কিনিয়া খাইতে পায় না বলিয়া পরের অনুগ্রহ ভিখারী হয়, সেই মহার্ঘতা কি বাঞ্ছনীয়? এই সকল দারিদ্রাবাসস্থ দরিদ্রদিগের আহার প্রত্যহ এক পোয়া করিয়া শুষ্ক গো-মাংস ও একটু লবণ। যাহারা ইহাদ্বারাই জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য হয়, তাহারা কি ভয়ানক কষ্টভোগ করে, তাহাও কি বলিতে হইবে? বলা বাহুল্য, শতকরা বাকী যে ৫৮ জনকে দরিদ্রবাসে স্থান লইতে হয় না, তাহার অধিকাংশই ভারতাদি বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া বসিয়াছেন, অথবা তাঁহারা সকলেই বড় বড় ধনী। বড় ধনী না হইলে সেদেশে দুঃসময়ে নিষ্কর্ম্মে বসিয়া কেহ পাঁচদিনও চলিতে পারে না। পুত্র কন্যা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণও তাহাদিগকে খাইতে দেয় না—নিজে খাইয়া বাঁচিতে পারিলে ত অন্যকে দিবে। সেই দেশে মহার্ঘতার এমনই শোচনীয় পরিণাম।

ভারতের বিপদ বহুপ্রকার, তৎসমস্ত একবারে পত্রস্থ করা কঠিন। যে পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইল ইহার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কারণগুলিকে সম্মুখে উপস্থিত করিলে অনেক বিদ্যাভিমানী মহাপুরুষ মনে মনে একটু চটিতেও পারেন ; আমরা তথাপি সত্য কথা না বলিয়া

পারিতেছি না। বস্তুত ভারতের এত দুর্দ্দশার প্রথম নম্বর কারণ ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত এদেশীয়গণ ; দ্বিতীয় নম্বর কারণ এদেশের ... ও সমাজ তত্ত্ব অনভিজ্ঞ গবর্ণমেন্টের বিধি ব্যবস্থা, তৃতীয় কারণ বৈদেশিক কল কারখানা। এ সকলকে কেন কারণ বলিতেছি, বারন্তরে তাহার আলোচনা করি।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২

## মাঞ্চেষ্টরের তাঁতী ভারতের অধিনেতা

করবৃদ্ধি বিষয়ক একটা আইন পাশ হইয়াছে। তাহার মধ্যে কি আছে জানিনা, কিন্তু শুনিতেছি, মাঞ্চেষ্টরের তাঁতীদিগের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে বিলাতী কাপড় ও সুতার উপর শুল্ক বসান হয় নাই। ভারতের অধিবাসীদিগকে দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লাইসেন্স টেক্স বসাইয়া "দুর্ভিক্ষ ফান্ড" নামে যে একটা তহবিল করা হইয়াছিল, সেই তহবিলে সঞ্চিত প্রায় দেড় কোটি টাকা এ বৎসরের ব্যয়ে নিয়োগ করা হইবে। "প্রজা মরিবে" এই ভয়কে উপলক্ষ করিয়া যে দুর্ভিক্ষ ফন্ড গঠিত হইয়াছিল, যদ্যপি তদ্বারা অধিক স্থানের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মুমূর্ষুগণের উপকার হয় না তথাপি যেখানে মাজিষ্ট্রেটগণ হৃদয়বান্ ও কর্ত্তব্য পরায়ন, সেখানে তদ্বারা অনেক প্রজার জীবন রক্ষা পাইত, কিন্তু এই টাকা অন্য কাজে ব্যয়িত হওয়াতে এখন আর সে আশা থাকিতেছে না ; এখন প্রজা মরে মরিবে, তথাপি গবর্ণমেন্ট স্বজাতি পোষণ জন্য যে ব্যয়বৃদ্ধি করিয়াছেন, সে ব্যয়ের হ্রাস, অথবা মাঞ্চেষ্টরের তাঁতীদিগের অন্যায় অতিরিক্ত লাভের অন্তরায় হইবেন না।

বিলাতী পার্লিয়ামেন্টের সভ্যনির্ব্বাচনে মাঞ্চেষ্টরী তাঁতীদিগের অনেকগুলি ভোট আছে। এই ভোটের জোরে লিবারেল ও কন্সার্বেটিভ—উভয় দলেরই অনেক সভ্য নির্ব্বাচিত হন। যদি বিলাতী বস্ত্রে শুল্ক বসান হয়, তবে লিবারেল কি কন্সার্বেটিভ—যে দলের আধিপত্য সময়ে ঐ শুল্ক বসিবে, সেই দল মাঞ্চেষ্টরের তাঁতীকুলে আর ভোট পাইবেন না ; এই আশঙ্কায় এবং ভারতকে নির্ধন করিয়া বিলাতে ধনবৃদ্ধি করার অভিপ্রায়ে কোন দলই ঐ শুল্ক বসাইতে সাহসী এবং প্রবৃত্ত নহেন। শুনিয়াছি, ভারতগবর্ণমেন্ট এই করবৃদ্ধির আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে বিলাতী বস্ত্রে শুল্ক বসান হইবে কিনা, তারযোগে ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ষ্টেট সেক্রেটারির্ মন্ত্রীগণও সকলেই ঐ শুল্ক বসানে মত দিয়াছিলেন (ইঁহারা পার্লামেন্টের্ মেম্বর অথবা মাঞ্চেষ্টরের ভোট ভিখারী নহেন) কিন্তু ভারত হিতৈষী ভায়াদের বড় আশা ভরসাস্থল গ্লাড্‌ষ্টোন্ প্রমুখ লিবারেল অধিনেতৃবর্গ অসম্মত হওয়াতে ষ্টেট সেক্রেটারি ঐ শুল্ক বসাইতে ভারতবগবর্ণমেন্টকে নিষেধ করিয়াছেন। এখন বুঝিয়া লউন পাঠক, লিবারেল সম্প্রদায় কেমন ন্যায় পরায়ণ ও ভারত হিতৈষী।

শুনিয়াছি, শ্রী শ্রীমতী বিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত অধিকারিণী। শুনিয়াছি ঐ শ্রী শ্রীমতী বিক্টোরিয়া যখন ভারতবর্ষ স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে অর্থাৎ ইংরাজ আমার স্বজাতি,—ভারতবাসী পরজাতি এরূপ বিভেদ সকল প্রজাকে পালন করিবেন। শুনিয়াছি, তিনি ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি তাঁহার কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রজাগণ মধ্যে জাতি বর্ণ সম্বন্ধে বৈষম্য প্রদর্শিত হয় ; তবে সেই কর্ম্মচারী তাঁহার বিদ্বেষভাজন ও দণ্ডার্হ হইবেন। শুনিয়াছি ত অনেক··; কিন্তু দেখিতেছি কি? দেখিতেছি সেই মহারাণীর একটি কথাও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ পালন করিতেছেন না।

দেখিতেছি, মাঞ্চেষ্টরের তাঁতীদিগের ভয়ে রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার সমস্ত আদেশ অমান্য করিতেছেন। দেখিতেছি, রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার ভয় অপেক্ষা মাঞ্চেষ্টর বাসীদিগকে সমধিক ভয় করেন। এত দেখিয়া প্রজাগণ এখন মনে করিতে পারে না কি, এ ভারতবর্ষের প্রকৃত অধিনেতা মাঞ্চেষ্টরের তাঁতী সম্প্রদায়? সেই তাঁতীকুলের স্বার্থের জন্যই ভারত শাসিত হইতেছে? সেই মহামাননীয়া ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী বিক্টোরিয়া মহোদয়া নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি বিচার করিয়া বলুন, এরূপ অবস্থায় প্রজাগণ কি মনে করিবে?

বিলাতী বস্ত্রের উপরে শুল্ক বসান যে, একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ভারতের সমস্ত লোক, সমস্ত সংবাদপত্র এক বাক্যে বলিতেছেন। এবিষয়ে ইংরাজের পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহ, ইংরাজের সভাসমিতিসমূহও ঐ শুল্ক বসানের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। ভারতীয় বড় ব্যবস্থাপক সভার ইংরাজ ও দেশীয় সাতজন বেসরকারী সভ্যও ঐ শুল্ক বসানোর ঔচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন; সরকারী সভ্যগণও প্রকারান্তরে ঐ কর বসানোর ঔচিত্য স্বীকার করিয়া ঐ শুল্ক বসাইলে বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষ এ আইন অসিদধ করিবেন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ শুল্ক বাদ দিয়াই আইন পাশ করিয়াছেন। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে, বস্ত্র শুল্কের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ভারতের সকল জাতীয় সমস্ত লোকেই একমত। মাঞ্চেষ্টরের তাঁতীগণ বস্ত্র ও সূতা বেঁচিয়া এদেশ হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ৪০ কোটি টাকা লইয়া যাইতেছেন। অন্যান্য জিনিসে যে নিয়মে শুল্ক ধরা হয়, সেই নিয়মে এই বস্ত্রাদির শুল্ক ধার্য্য হইলে গবর্ণমেন্টের প্রায় ৪ কোটি টাকা লাভ হয়। এজন্য যে বস্ত্রখানির মূল্য এখন দশ আনা, তাহা এগার আনায় বিক্রয় হওয়ার আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু এখন যে সকল দরিদ্র লোক দশ আনায় কাপড় পায় বলিয়া যত সকালে কিনিতে পারে, এক আনা মূল্য বাড়িলে তত সকালে কিনিতে পারিবে না; ততকাল ছিন্ন বস্ত্রে কাটাইবে, সুতরাং বিলাতী বস্ত্রের কাটতি কিয়ৎ পরিমাণে কম হইবে। বিলাতী বস্ত্রের মূল্য একটু বাড়িলে দেশীয় বস্ত্র বিক্রয় না হওয়াবশতঃ যে সকল তাঁতী জোলা উৎসন্ন হইতেছে, তাহাদের এবং বোম্বে প্রভৃতির কলওয়ালাদিগের বস্ত্র বিক্রয়ের অনেকটা সুবিধা হইবে। অগত্যা মাঞ্চেষ্টরী তাঁতীগণও অল্পালাভে সুলভ মূল্যে বস্ত্র বেচিতে আরম্ভ করিবেন। এজন্য মাঞ্চেষ্টরী তাঁতীকুলেও অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়াই গবর্ণমেন্ট ঐ শুল্ক বসাইতেছে না; পক্ষান্তরে লবন প্রভৃতির উপরে শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া অল্প লবন ভক্ষণ জনিত রোগে দরিদ্র ... পীড়িত করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অবিচার আর কি হইতে পারে?

১৮ মার্চ, ১৮৯৪

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

... ঢাকা প্রকাশের পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট আজ একটী সাহেবের স্বাবলম্বন, সহিষ্ণুতা, চেষ্টা, উদ্যোগ ও পরিশ্রম-সহিষ্ণুতার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্ব্ববঙ্গের জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সবমান্য কৃষক সকলেরই মিঃ ডেভিড সাহেবের নাম শুনা আছে। মিঃ ডেভিড অতি সামান্য অবস্থায় দরিদ্রবেশে নায়ারণগঞ্জ আসেন; তখন নারায়ণগঞ্জ মাত্র

একখানা সামান্য মছুয়া বাজার ও সামান্য কয়েক ঘর মুদী তেল, লুন বেচিত, অনেক স্থান জঙ্গলায় ও সামান্য অবস্থার মুসলমান দ্বারা বসবাস ছিল। মিঃ ডেভিড এইরূপ স্থানে কোন সামান্য ধনীর আশ্রয় নিয়া পাটের কারবার খুলেন। এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, ক্রমাগত ১০/১২ বৎসর অবিরত পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পাটের চাষ প্রচলন করেন। এইরূপ পাটের চাষে চাষারা লাভবান হইয়া ধান, কলাই ইত্যাদি চাষে অবহেলা করিয়া পাটের চাষ বহুল পরিমানে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ঘাটে, মাঠে, বাজারে, বন্দরে, নৌকা ইত্যাদিতে পাটের বেপারীগণ সারি বাঁধিয়া পাটের গান গাহিয়াছিল।

মিঃ ডেভিড আশানুরূপ মালের আমদানি পাইয়া যথেষ্ট লাভ করিতে লাগিলেন ; শীতলক্ষা নদীর এপারে ; ওপারে নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জে দালান কোঠা, গোলাবাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মান করিয়া বাণিজ্যের বহুল বিস্তার করিলেন। উঠিত যথায় দিবাভাগে শিবারব। লোকে কোলাহলময় হয়েছে তা সব।

মিঃ ডেভিডের যত্ন চেষ্টার ফলে নারায়ণগঞ্জ পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়াছে। এখানে শত শত ইংরেজ বণিক কারবার করিতেছেন, তাঁহাদের অধীনে হাজার হাজার লোকজন কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আদালত, ফৌজদারী রেজিষ্টরী অফিস, মিউনিসিপালিটী এন্ট্রেন্স স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ অতি স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন এখানে চলওলা লক্ষী অচলা হইয়া বসে আছেন। দিবা, রাত্র ট্রেন, ষ্টিমার, কলকারখানার শব্দে ও যাতায়াতের ধুম ধামে দিন কাটিয়া যাইতেছে। যাঁহার প্রসাদে নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের এত শ্রীবৃদ্ধি সেই মহাত্মা মিঃ ডেভিড কয়েক মাস হইল তাঁহার নিজ বাসস্থান সুদূর ইংলন্ডে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

আজ মিঃ ডেভিড নাই, তাঁহার অতুলকীর্ত্তি পূর্ব্ববঙ্গে পরিয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে অনেক ধনী, জ্ঞানী আছেন বিদেশের উন্নতি করিবেন দূরে থাকুক নিজের দেশের উন্নতিতে কুম্ভবর্ণ। অনেক স্থানের স্কুল পাঠশালা যত্ন ও সাহায্য অভাবে উঠিয়া যাইতেছে ও যাহা আছে তাহাও গেলাম গেলাম শব্দে ডাক ছাড়িতেছে। এই দারুণ নিদানকালে অনেক ধনীর গ্রামে একটা পুকুরেও জল নাই, জলাভাবে জনপ্রাণী মহাকষ্টে বর্ষার আশায় দিন পিছনে ফেলিতেছে ; জলাভাবে ধোপা কাপড় কাচিতে পারে না, ময়লা কাপড় গ্রামবাসীর অঙ্গের ভূষণ হইয়া কাকের ন্যায় শ্রীবৃদ্ধি ধারণ করিয়াছে। গ্রামবাসীর এই প্রকার কতদুঃখের কথা প্রকাশ করিব? ঢাকা প্রকাশ অনেক দুঃখের কথা অনেক অভাবের কথা পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইয়াছেন কিন্তু কাল–গুণে সকলেই শুনে ও বুঝে অথচ বধির ও হাবা। ইংরেজের ঘেসাঘেসিতে ইংরেজের সদ্‌গুণের পরিবর্ত্তে, হ্যাট, কোট, চুরট নিয়া দিন কাটাইতেছি, তাঁহাদের সদ্‌গুণ ছাড়িয়া দুর্গুণের অনুকরণ করিতেছি। হে বঙ্গবাসী যতদিন তুমি তাঁহাদের সদ্‌গুনের অনুকরণ না করিবে ততদিন তোমার দেশের গৃহের দারুন দুর্ভিক্ষ, দুঃখ, দারিদ্র দূর হওয়া সুদূর পরাহত।

শ্রী গিরিশচন্দ্র দাস
১৫ এপ্রিল, ১৮৯৪

## বিলাতী বস্ত্র

বিলাতি বস্ত্রে দেশ ছাইয়াছে। এখন বিলাতী বস্ত্র না হইলে বাবুদিগের পোষাক হয় না। সুতরাং বিলাতী বস্ত্রের জন্য এদেশের প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। নাদির সাহা ভারত লুণ্ঠন করিয়া যত টাকা নিয়াছিলেন, দেশের বাবুরা নিজ ইচ্ছায় তাহার দশগুণ টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে পাঠাইতেছেন। শিক্ষিত বাবুদিগের দেখাদেখি অশিক্ষিত ছোট লোকেরাও বিদেশে টাকা পাঠাইতেছ ধরিয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াও বার্ষিক পোনর কোটির বাঁটা ক্ষতি সম্বলিত ২৪ কোটির বেশী নিতে পারেন না, কিন্তু শিক্ষাভিমানীদিগের জন্য তাহার প্রায় দ্বিগুণ টাকা বিদেশে যাইতেছে, এতদপেক্ষা পরিত্যাগ কিসে হয়? তাঁহাদের জন্য এদেশের অতি গৌরব স্থূল বস্ত্র শিল্প নষ্ট হইয়াছে। এদেশে বিলাতী বস্ত্রের প্রতিযোগী বস্ত্র হয় না বলিয়া নহে, রুচির মহিমায় ও সর্ব্বনাশ হইতেছে। অদ্যাপি দেশে যে বস্ত্রশিল্প আছে, যদি তৎপ্রতি শিক্ষিত বাবুদিগের অনুরাগ আকৃষ্ট হয়, তবেও দেশের প্রচুর ধন রক্ষা পায়। ঢাকাই বস্ত্র শীতের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে, কিন্তু ঢাকা বিভাগের প্রতিবাসী আসামের এন্ডী ও মুগা বস্ত্র দ্বারা শীতের দর্পচূর্ণ করা যাইতে পারে। এই বস্ত্রের অসাধারণ গুণ এই যে, বিলাতী যে কোন বস্ত্র অপেক্ষা ইহা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী। এই বস্ত্রের গুণে মুগধ হইয়া ইংরাজেরা তাঁহাদের সর্ব্বজন প্রসিদধ জাতীয় ভাব বিস্মৃত হইয়া এই বস্ত্রের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং দেখিতেছি, এখন অনেক শিক্ষিত বাবু ও আসাম ছিল্কের পক্ষপতী হইয়াছেন ; অনেকেই এন্ডি মুগার কোট প্যান্টুলন করিতেছেন।

২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫

## বিলাতী বস্ত্রের প্রভাব

বিলাতী বস্ত্রে দেশের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা দূরীকরণ জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এ স্থানের যে সকল তন্তুবায় পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুগ্রহে শিক্ষিত হইয়াছেন—বাবু হইয়াছেন, তাঁহারাই যেন দেশীয় বস্ত্র চালানের বিরোধী বোধ হয়। তাঁহাদের ইহা যেন ঈপ্সিত নহে যে, তাহাদের জাতি ভায়ারা আর তাত বুনে। তাঁহাদের কেহ কেহ বিলাতী বস্ত্রের দোকানদার হইয়াছেন। বিলাতী বস্ত্র না বিকাইলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, এ আশঙ্কা তাহাদের বড়ই প্রবল। আমরা তদ্রূপ একজন দোকানদারকে বলিয়া যে কর্কশ উত্তর পাইয়াছি, তাহাতে আর তাহার [অস্পষ্ট] উপকার জন্য কাহারও চেষ্টা হইতে পারে না। কিন্তু আমরা তথাপি সংকল্প ছাড়িতে পারি নাই। আমরা প্রায় সাড়ে সাত বৎসর যাবৎ বিলাতী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু এতদ্দ্বারা অনেকটা ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতেছি। ঢাকার তাঁতীরা ফিনফিনে পোযাকী ধূতি ভিন্ন সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য টেকসই ধূতি বানায় না। আমাদের সুতরাং গ্রাম্য জোলাদের নিকট ফরমাইস দিয়া ধূতি প্রস্তুত করাইতে হয়। কিন্তু ধূতির দাম অনেক বেশী পড়ে ও সকল সময় পাওয়া ঘটে না। দোকানদারেরা ইচ্ছা করিলে তাতীদ্বারা সেইরূপ ধূতি প্রচুর পরিমাণে বয়ন করাইয়া বেচিতে পারেন। যদি এইরূপে দেশীয় ধূতি মিলে তবেই বিলাতী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় ধূতি পরিধানে লোককে প্রতিজ্ঞাবদধ করা যাইতে পারে। ওরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অনেকেরই ইচ্ছা আছে, কিন্তু

দেশীবস্ত্রের অভাববশত তাহা হইতেছে না। এরূপ স্থলে তন্তুবায় দোকানদারগণ ও ধনিগণের উদ্যোগ ব্যতিরেকে আমাদের কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব।

২৯ মার্চ, ১৮৯৬

### ভারতের ধনক্ষয়

উন্নতি ও অবনতি মানুষের ক্ষমতাধীন নহে। যে মহামহিম জগদীশ্বর কর্ত্তৃক জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিবিধ বৈচিত্র্য সুখ লাভ অলাভ প্রভৃতি জোয়ার ভাঁটার ন্যায় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কর্ত্তৃকই আমাদের লাভালাভাদি যাহা কিছু হইবার হইতেছে, আমরা উপলক্ষ মাত্র। যাহার যে শক্তি আছে, স্বধর্ম্মে লক্ষ্য করিয়া তাহার তাহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই কার্য্যে সুফল পাওয়া না পাওয়া তাঁহার হাতে। ...

ধন লাভের চেষ্টা সকলেরই স্বাভাবিক। ভারতেরও প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা যে, নিজ নিজ ধনবৃদ্ধি হয়।

ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুজাতির প্রতি আত্যন্তিক অনুগ্রহ বশতই বোধ হয়, ভারতকে ভগবান্ এত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন, যাহার তুলনা অন্য দেশে সম্ভবে না। যাহারা সোনা রুপাকে ঐশ্বর্য্য বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বিনিময়ের সুবিধার জন্য সোনা রুপার প্রয়োজন বটে, কিন্তু সোনা রুপা খাইয়া কেহ বাঁচে না। বর্ত্তমান কালে ইংল্ডাদি দেশ সোনা রুপাব প্রচুর ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন, কিন্তু জীবন ধারনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার নিমিত্ত এই ভারতবর্ষের নিকটে সকলেই ভিখারী। অন্য কাহারও তোয়াক্কা না করিয়া ভারতবর্ষ অসনর্য্যমান কাল হইতে কোটি কোটি এদেশবাসীর পরিপোষণ করিতেছেন, কিন্তু এরূপ তোয়াক্কা না করিয়া এত দীর্ঘকাল এতগুলি লোকের পরিপোষন করিতে আর কোন্ দেশ কবে সমর্থ হইয়াছে? অতি অল্পমাত্র কাল যাবৎ ইউরোপ মানবের যোগ্য হইয়াছে, কিন্তু এখনই সেখানে প্রচুর "সার" বিনা শস্য জন্মে না ; আর যে ভারতে কোটি কোটি বর্ষেরও অধিক কাল লোকবাসের প্রমান পাওয়া যাইতেছে, সেখানে বিনা সারেই সমস্ত [অস্পষ্ট] জীবনোপযোগী শস্য [অস্পষ্ট]। স্বধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের প্রতি ভগবানের ইহাও একটা আশ্চর্য্য [অস্পষ্ট] বলিয়া আমরা মনে করি। ধর্ম্মের অনুরোধেই এদেশবাসী হিন্দুর অন্যত্র [অস্পষ্ট] রহিত হইয়াছে, তথাপি এদেশবাসী কেবল ব্রিটনের প্রজাত্ব স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং সেখান হইতে এদেশে কিছু লাভ না হইয়া লোকসানই হইতেছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ কোটি কোটি টাকা আনিয়া এদেশের পদে প্রণামী দিতেছে। এ সৌভাগ্য ধর্ম্মানুরাগের পুরস্কার স্বরুপ ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কোনরূপে হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

সমুদ্র যাত্রার পক্ষপাতীদিগের মতানুসারে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা না করা এদেশের সর্ব্বনাশের কারণ। যদ্যপি সমুদ্রযাত্রা না করা বশতঃ সর্ব্বনাশের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, কেবলই অবিবেচিত এক দেশদর্শিতা প্রসূত অনুমানের জল্পনা তথাপি সমুদ্রযাত্রার পক্ষপাতীদিগের ঐমতের অসারতা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইদেশে যে মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শি এবং হিন্দুনামধারী বা অহিন্দু নামধারী অন্যূন ১২ বার কোটি লোক আছে, তাহাদের সমুদ্র যাত্রায় কিছু মাত্র বাধা নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যের মহিমায় যে ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান জাতি হইয়াছেন, সেই ইংরাজের সংখ্যা অপেক্ষা ঐ সংখ্যা চতুর্গুণ বেশী। যদি বৈদেশিক বাণিজ্য করিতে বাধা না থাকিলেই বড়মানুষ হওয়া যাইত, তবে এই ভারতের বার কোটি লোক

ইংরাজের অপেক্ষা চতুর্গুণ বড়মানুষ হইত ; কিন্তু কৈ? ইহারা অনেকে বানিজ্যার্থ দ্বীপ যাইতেছে, অনেকে জাহাজের খালাসী হইয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে ; অনেকে কূলী মজুর রুপে দ্বীপান্তরে যাইয়া কত কষ্ট পাইতেছে, এই ১২ কোটি লোক দ্বারাত এদেশের কোনই উন্নতি হইল না। নিজের ঘরে বসিয়া হিন্দু যেমন বড়মানুষ হইতেছে, বোম্বের একমাত্র পার্শি ভিন্ন আর কোন্ জাতি [অস্পষ্ট] বড় মানুষ হইতে সমর্থ হইয়াছে? ব্যবসায়ের প্রধান ক্ষেত্র কলিকাতায় বাস করিয়া যেমন অনেক হিন্দু বড়মানুষ হয়, সেইরুপ অধিকতর সুবিধাজনক বাণিজ্য ক্ষেত্র বোম্বে নগরীতে বাস করিয়া অনেক পার্শি বড় মানুষ হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের সমুদ্র যাত্রার পুরস্কার নহে।

জাতিভেদের অযথা বর্ণিত অপকারিতা দেখিয়া এদেশের যে বহু সহস্র শিক্ষিত বড়লোকের ছেলে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন কৈ? তাঁহাদের মধ্যে ত একজন ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বড়মানুষ হইতে পারিলেন না? নিজেদের ক্ষমতায় যাহা কুলায় নই, সেই কাজে অন্যকে প্রবর্ত্তিত করা ও অন্যে সে কাজে প্রবৃত্ত না হইলে টিট্কারী করা নিতান্ত নির্লজ্জতা নহে কি? কিন্তু এই শ্রেণীর লোকগুলির কেহই পাশব প্রকৃতি যে, নিজের বুদ্ধি বিবেচনার দোষে পিতৃপুরুষের অতুল ঐশ্বর্য্য হিন্দুর অকার্য্যে লাভবান্ হইবার নিমিত্ত প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেও হিন্দুকে বাক্দন্তে আঘাত করিতে ইহারা কুণ্ঠিত নহে?

পৈতৃক আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ যে ভীষন নির্ব্বুদ্ধিতা, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি বিবেচনা সকলের না থাকাই সম্ভবপর ; কিন্তু ধনের লাভালাভ কিসে হয়, তাহা বুঝা খুব কঠিন কার্য্য নহে। অথচ দেখিতে পাই যাহারা ভীষণ লোভ বশতঃ স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া হিন্দুগণের প্রতি যে কোন ছুতায় লতায় গালি বর্ষণ করে ; তাহারা নিজের বুদ্ধি বলে বৈদেশিক বাণিজ্যাদি দ্বারা কেহই বড়মানুষ হইতে পারে নাই। বরং যে সামান্য মূলধন লইয়া চেরাকালী ফকির জুতার ব্যবসায়ে লাখপতি হইতেছে, তাহার সহস্রগুণ মূলধন লইয়া বিদ্যাবুদ্ধির ভাণ্ডার চাটুয্যাবংশধর সেই জুতার বাণিজ্যে দেউলিয়া হইতেছেন, বুদ্ধিটা চেরাকালীর বেশী, কি চাটয্যাকুলনন্দনের বেশী, তাহার পরিচয় কি পাঠক পাইতেছেন না? যে যৌথ বা কোম্পানীর কারবারে ইংরাজজাতি পৃথিবীতে প্রধান ধনী, স্বধর্ম্ম ত্যাগিদলের বড় বড় বুদ্ধিসাগরেরা সেই কোম্পানী খুলিয়া যে শত শত লোকের সর্ব্বনাশ সহকারে নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার প্রধান মৃত দুর্গা মোহন দাস প্রভৃতির গঠিত করপোড়েসন হইতেই সকলে পাইয়াছেন।

নিজেদের বা ভারতের ধন বৃদ্ধি করিবার প্রলোভনে যাহারা স্বধর্ম্ম ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা ধনের কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই ; কিন্তু ধন কমিয়াছে বিস্তর। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই বিলাতে অথবা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছেন ; প্রত্যেকে এদেশ হইতে ন্যূন কল্পে পাঁচ হাজার, ঊর্দ্ধ কল্পে কত লক্ষ কে বলিবে,—ব্যয় করিয়াছেন, সকলে মিলিয়া এদেশের যতকোটি টাকা বিদেশে ঢালিয়াছেন, তাহার পরিমাণ হয় না। সমুদ্র যাত্রায় লাভ হইল না এক পয়সা, ক্ষতি হইতেছে কোটি কোটি টাকা, ইহাতেও কি হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষেধের উপকারিতা স্মর্ত্তব্য নহে? বক্তৃতায় বাবুদিগের স্বদেশ হিতৈষনণর কতই আড়ম্বর। বক্তৃতায় বলিতেছেন, এদেশের কোটি কোটি টাকা বিলাতী বিলাস দ্রব্যের জন্য বিলাতে যাইতেছে, অতএব সকলে

বিলাতী দ্রব্য কিনিবে না, প্রতিজ্ঞা কর। কিন্তু নিজে বক্তৃতার পরেই বিলাতী গেলাসে ব্র্যান্ডি, বিলাতী প্লেটে বিলাতী বিষকীট বীফের বড়া, বিলাতী টেবলে রাখিয়া বিলাতী চেয়ারে বসিয়া ব্যাদানিত বদনে বিনাইতেছেন। ভারতের যত কোটি টাকা বিলাতে যায়, তাহার অধিকাংশ ঐ শ্রেণীর স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বাক্য বা লেখনী সর্ব্বস্ব বাবুদিগের বিলাস সামগ্রীর জন্য গিয়া থাকে, আজ ইঁহারাই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগকে মূর্খ [অস্পষ্ট] বিবেকহীন রূপে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন। ভারতের ধন ইঁহাদের দ্বারা [অস্পষ্ট] হইতেছে, ভারতকে ইহারাই রসাতলে নিবার যোগাড় করিতেছেন ; ইঁহাদের জন্যই ভারতের পরিনাম ভীষণরূপে সজ্জত হইতেছে।

২১ মে, ১৮৯৯

# রাজনীতি

[ মধ্যশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় কখনও বলা হয়নি যে, ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকতে তারা আগ্রহী নয়। ইংরেজ শাসন/প্রশাসন সম্পর্কে মধ্যশ্রেণীর মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, পূর্ববঙ্গের রক্ষণশীল পত্রিকা 'হিন্দু রঞ্জিকা'র এক মন্তব্যে—"বৃটিশ শাসনের অধীনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। হঠাৎ কোন বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে বিশৃঙ্খলার। এতে শুধু আমাদেরই নয়, অসুবিধা হবে সরকারেরও।" এ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই সমালোচিত হয়েছে ইংরেজ শাসন।

কলকাতার সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার মত 'ঢাকা প্রকাশ'ও প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে ইংরেজ প্রশাসন ও এর সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের। শুধু তাই নয়, কোন কোন সম্পাদকের ইংরেজ প্রীতিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি। যেমন, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক সম্পর্কে লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ', "সোমপ্রকাশ সম্পাদক আজকাল ইংরেজদিগের বড় ভক্ত ও হিতৈষী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইংরেজদিগকে কেহ কিছু বলিলে তাঁহার মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়। ... এরূপ মোক্তারি করিতে পারিলে ইংরাজ মহলে তাহার আদরের সীমা থাকিবে না। তাঁহার হৃদয় এত ইংরাজ স্নেহে পরিপূর্ণ, আমরা এতদিন জানি না। ইংরাজদিগেরও বুদ্ধি সকলে তাঁহাদের এই হিতৈষী বান্ধবকে চিনেন না। অতএব আমরা এখন বলিয়া দিতেছি সোমপ্রকাশ বিশেষরূপে তাঁহাদের পথ ধরিয়াছেন, কিছু অনুগ্রহ যেন থাকে।"[১]

সমালোচনার এই যে ধারা, তার উৎস ছিল, বিনয় ঘোষের ভাষায় 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র' যা 'পাশ্চাত্যভাবের একটি বিশিষ্ট উপাদান।' এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন—

"ইংরেজি শিক্ষিতরা ইংরেজের প্রভুত্ব আর নির্বিচারে মেনে নিতে রাজী নন, তাঁদের মনোভাবে পরিবর্তন হয়েছে। তাঁরা ইংরেজদের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করেন, স্পষ্ট ভাষায় দোষের সমালোচনা করেন, শাসক—শাসিতের প্রভুভৃত্য সম্পর্ক স্বীকার করেন না, সর্বক্ষেত্রে সমকক্ষের মতো ব্যবহার করেন, তুল্যসম্মান ও তুল্যপদ নিয়ে বিবাদ করতেও দ্বিধা করেন না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে ইংরেজ শিক্ষিতদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদবুদ্ধ হচ্ছে বোঝা যায়। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাই দেখা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ইংরেজ শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা অগ্রণী হয়েছে এবং সর্বভারতে জাতীয় চেতনার সম্প্রসারণে তারাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।"[২]

তবে, এই মধ্যশ্রেণী, আগেই উল্লেখ করেছি, ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ছিল রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতা অন্বেষী কিন্তু অর্থনৈতিক পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং সামাজিকভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় তাদের রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সমঝোতাপূর্ণ এবং আদর্শ বিকৃত।

ইংরেজ শাসন/প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্পাদকদের দৃষ্টি প্রধানত আকর্ষিত হয়েছে পুলিশের অন্যায় আচরণ, সিবিলিয়ানদের রূঢ় ব্যবহার, আদালতের পক্ষপাতদুষ্টতা প্রভৃতির প্রতি।

ভারতীয় প্রশাসনের সমালোচনা করে লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'—"ভারতবর্ষীয় শাসন কার্য্যের বহু দোষ, ইহার অপকর্ম্মের সীমা নাই।" তারপর উল্লেখ করেছিল অপকর্মের কারণসমূহ—

"প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নিতান্ত একগুঁয়ে কাহারো হিতবাক্য শুনিতে চান না। নিজেও আবার নানা বিষয়ে নিতান্ত ভ্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ। ইংলন্ড হইতে ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে বিজ্ঞ ও উপযুক্ত লোক প্রায় আইসেন না। ... তৃতীয়তঃ। এ দেশে গবর্ণমেন্টের কয়েকজন মন্ত্রদাতা আছেন। ইহারা মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার অনর্থকর দুর্ম্মন্ত্রণা।... চতুর্থতঃ। স্বার্থসাধনে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটী প্রধান লক্ষ্য ... এখনো শাসনকার্যের নানা অংশে স্বার্থপরতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যেখানে স্বার্থ, সেখানে ন্যায় অন্যায় ও হিতাহিত বিচার থাকিতে পারে না।"[৩]

বিচারালায়ের আমলাদের কথা এসেছে ঘুরেফিরে। কারণ বিচারালয়ের দ্বারস্থ হতে হতো নানা কারণে, বিশেষ করে জমিজমার কারণে। পেশাজীবীদের অনেকেই ছিলেন জমির ওপর নির্ভরশীল। বিচারালয়ের আমলাদের এ কারণে ঘুষ দিতে হতো। বিচারপ্রার্থীদের উদ্দেশে বলা হয়েছে— "আর যেন তাহারা আমলার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ও আদালতকে কলঙ্কিত না করেন।" (৬.৮.৬৬)

আরেকটি রচনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল—"ভারতের যে সকল দোহনযন্ত্র আছে, শাসন বিভাগ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বড়লাট, ও ছোটলাটগণের এবং সিবিলিয়ান ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বেতনবাবদে ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ ব্যয় করিতে হয়, পৃথিবীর কোন দেশীয় কোন শাসকশ্রেণীর নিমিত্তই তত টাকা খরচ হয় না।"[৪]

সিবিলিয়ান বা আমলাদের প্রসঙ্গটি দু'ভাবে বিচার করা হয়েছে। একদিকে আমলাদের রূঢ় ব্যবহারের সমালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন পদে ভারতীয়দের নিযুক্তির ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক আচরণের নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে।

সিবিলিয়ানদের [ বিশেষভাবে শ্বেতাঙ্গদের ] আচরণ প্রসঙ্গে লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'— "যদি এইক্ষণ হইতে তাঁহারা ইহার কোন উপায় বিধান না করেন, পরে সিবিলিয়ানেরা দিনে ডাকাতি করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। তখন মারা পড়িলে দেশীয়রাই পড়িবেন।"[৫]

ইংরেজ কর্ম্মচারীদের কথা উল্লেখ করে লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'—"ইংরাজদিগের নানা প্রকার অত্যাচারে টিকিয়া থাকা ভার হইল।" (২৪-৪-৭০) মন্তব্য করেছিল পত্রিকা "বিদেশীয়লোকের পক্ষে দেশ শাসন এক প্রকার অপ্রাকৃতিক ব্যাপার। ইহাতে শাসনাধীন দেশ ও শাসনকর্তা উভয়েরই বিড়ম্বিত হইতে হয়। ... নানা বিষয়ে আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি এবং শাসনকর্ত্তৃগণও অকৃতকার্য্য হইতেছেন।" [ ৫-৩-৭০ ]

ভারতীয় কর্মচারীদের প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে এবং তাদের যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রশাসন থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে তার সমালোচনা করে পত্রিকায় মন্তব্য করেছিল—"পরন্তু কে বলিতে পারে, ২০ কোটি প্রজার মনে রাজপুরুষদিগের প্রতি অভক্তি ও অপ্রীতিকর ভাব ক্রমে বৃদ্ধি হইলে ৭৫ হাজার ইংরেজ সৈন্যও অবশেষে রাজ্য রক্ষার জন্য অপ্রচুর হইয়া উঠিবে।"[৬]

আদালতে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ইংরেজ বিচারকরা যে পক্ষপাতদুষ্ট রায় দেন তাও উল্লেখ করা হয়েছিল। লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'—"প্রদেশীয় জজ

ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতি ইউরোপীয় বিচারকগণ মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ভোজপ্রিয়।... যে সকল মোকদ্দমায় একপক্ষ ধনাঢ্য, ও অপর পক্ষ নির্ধন, অথবা মধ্যবিধ, অতীত ভোজের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থই হউক বা ভবিষ্যৎ ভোজপ্রাপ্তির আশায়ই হউক, ভোজপ্রিয় বিচার কর্ত্তারা, তত্তাবত মোকদ্দমায় প্রায়ই ধনাঢ্যপক্ষের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।"[৭]

বিভিন্ন সময় 'নেটিব' পেশাজীবীদের বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ এসেছে। পত্রিকা বারবার উল্লেখ করেছে 'নেটিব' পেশাজীবীরা যেন ভালো বেতন পান এবং তাদের সম্মান হানিকর কোন কিছু যেন না করা হয়। এ সব মন্তব্যের উৎস ছিল স্বার্থসংঘাত যা ক্রমপরিণতিতে রূপ পেয়েছে ক্ষোভ ও স্বাজাত্যবোধে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৬৯ সালের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়। আই, সি, এস হওয়ার জন্য ঢাকার কৃষ্ণগোবিন্দগুপ্ত রওয়ানা হয়েছিলেন লন্ডন। এই উপলক্ষে একজন পাঠক লিখেছিলেন—

"আর দুর্ব্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গণের কসাঘাত সহ্য হয় না। অবিচার, অবমাননা দেখিতে ২ হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! বঙ্গ দেশীয়দিগের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সময় কোন ভ্রাতা ইংলন্ডে চলিলেন, এটা কি সামান্য সুখকর বিষয়? বিশেষতঃ তিনি নাকি সিবিলিয়ান হইবেন। এ কথা শুনে কার না মনে হয় যে এ দুর্ভাগ্য দেশের দুঃখ রজনী আসন্ন প্রায়? দেশীয়েরা এখন বিচারক হইবেন। অবিচার দূরে পলায়ন করিবে। বাঙ্গালীদিগের মান বাড়িবে। আপনি বোধহয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের ইংলন্ড যাত্রা লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই কয়েকটি কথা বলিলাম।

প্রকৃত দেশ হিতৈষী মহাশয় ব্যক্তির স্বদেশ হিতৈষিতার এই একটী প্রধানতম ক্ষেত্র।"[৮]

ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে একারণেও যে, ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষে ব্যয় না করে পাচার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করা হলেও মূলতঃ এর ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক। তাই, শুধু অর্থ পাচার প্রসঙ্গই নয়, শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের পোষণের কারণে ব্যয় বৃদ্ধিও সমালোচিত হয়েছিল। ডিউক অফ এডিনবরা ১৮৬৯ সালে যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তার 'দরবার' এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল—

"আমরা গবর্ণমেন্টকে জিজ্ঞাসা করি, টাকাগুলির যে ব্যয় করা হইবে তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের কিছু উপকার আছে কিনা? আমাদেরও বোধ হয় না যে ভারতবর্ষীয় সাধারণ প্রজা অথবা বাদশা ইহা দ্বারা কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারিবেন।"[৯]

ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থ এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ মধ্যশ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে তৈরি হয়েছিল একাত্মতা। ইংরেজ শাসনের স্বরূপ যে মধ্যশ্রেণী বোঝেনি তা' নয়। লিখেছিল 'ঢাকা প্রকাশ'—"... ইংরাজ যতই উদার হউন, কোন ক্রমেই ভারতবর্ষীয় জাতিকে এ সমস্ত প্রাণ ধরাইয়া দিতে পারিবেন না। ভারতবাসী যত কেন ইংরাজ সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হউন না কেন, ভারতবাসীকে ইংরাজ যতই কেন বিশ্বাস করুন না, কিন্তু কোন ক্রমেই গবর্ণমেন্ট স্বদেশে স্বজাতির প্রতি প্রযুজ্য নীতি এই বছর বিদেশে ভিন্ন জাতির প্রতি প্রয়োগ করিবেন না।"[১০]

উনিশ শতকে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি তাই আবেদন নিবেদনের। কারণ তা উৎসারিত হয়েছিল ঐ 'একাত্মতা'র ভিত্তি থেকে। 'ঢাকা প্রকাশ' বোধহয় তাই লিখেছিল—"ইংরেজ

গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার দেন বা না দেন, উচ্চপদে অভিষিক্ত করেন বা না করেন, যাহাতে আমরা মোটাভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া, কোনমতে দিনপাত করিতে প্যারি শীঘ্র তাহার উপায় করুন।"[১১]

ইংরেজ শাসন/প্রশাসন সঞ্জাত যে স্বার্থ সংঘাত, ক্ষোভ ও স্বাজত্যবোধ–এর মধ্যেই নিহিত উনিশ শতকের বাঙালির রাজনৈতিক মনোভাব। এবং এই মনোভাব বা মনোভঙ্গি তারা নিবেদন করেছিলেন সংবাদ সাময়িকপত্র ও বিভিন্ন সভাসমিতির মাধ্যমে। সংকলিত সংবাদগুলি তারই উদাহরণ। ]

## সূত্র

১. *ঢাকা প্রকাশ*, ১০–৭–১৮৭০।

২. বিনয়ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ২২০।

৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮–৫–১৮৭০।

৪. *ঐ*, ১৭–৫–১৮৮৫।

৫. *ঐ*, ২১–৭–১৮৬৪।

৬. *ঐ*, ৩–৮–১৮৬৬।

৭. *ঐ*, ২–৬–১৮৭২।

৮. *ঐ*, ৩–১০–১৮৬৯।

৯. *ঐ*, ২২–৮–১৮৬১।

১০. *ঐ*, ১০–৬–১৮৯০।

১১. *ঐ*, ১২–৯–১৮৮৬।

# সংকলন

## ক. ইংরেজ শাসন/প্রশাসন

### আজিও আমলাদিগকে উৎকোচ দেওয়া হয় কেন.

অধিকাংশ লোকের সংস্কার আছে, বিচারালয়ে আমরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে, মকদ্দমার প্রতুল হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সংস্কারটিকে নিতান্ত নিষ্কারণ বলা যাইতে পারে না। ইতপূর্ব্বে নিয়মের বিশৃঙ্খলা ও বিচারকদিগের দুরালাস্য বশতঃ অফিস সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্য্যই আমলার হস্তে সম্পাদিত হইত সাধারণতঃ হুকুম দেওয়ামাত্র হাকিমদিগকে কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। সেই হুকুম ও আমলার সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রায় দেওয়া হইত না। এই সকল কারণেই আমলারা অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া সাধারণ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিতেন। সুতরাং কোন এক মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারার্থী কিরূপ অধিক টাকা দিয়া আমলাকে বশীভূত করিবেন, সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করিতেন। অনেক জমীদার আমলাদিগকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগের বাসায় গমনাগমন ও উপহার প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। ফলতঃ মকদ্দমার জয় পরাজয় আমলার ঘূষের উপরই প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। তখন যিনি মকদ্দমা করিয়া জয়লাভ করিতেন তিনি আমলাকে অধিক টাকা দিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেন, এবং পরাজিত ব্যক্তি মকদ্দমার তদ্বির সম্বন্ধে তাহার অন্য কোন ত্রুটি শিকার না করিয়া কেবল আমলাকে যথাযোগ্য ঘুষ দিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখিত চিত্ত হইতেন। এতদদ্বারাই অনুমিত হইতে পারে তৎকালীন আমলাদিগের কিরূপ আধিপত্য ও কিরূপ অর্থলাভ ছিল। তখন ১০ টাকা বেতনের সামান্য মোহরের যেরূপ আড়ম্বর সহকারে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতেন, ১০০ টাকা বেতনের অন্য কর্ম্মচারীরও তাহা সুসাধ্য হইত না। কাল মহাত্মে এক্ষণ আর আমলাদিগের তত প্রতাপ নাই। নিয়মের সুশৃঙ্খলা ও বিচারকদিগের মনোযোগ নিবন্ধন এখন অনেক স্থলেই আমলারা “সাক্ষী গোপাল,” হইয়া বসিয়াছেন। অফিস সংক্রান্ত অধিকাংশ গুরুতর কার্য্যই এখন বিচারকেরা স্বহস্তে সম্পন্ন করেন। তাহাতে আমলাদিগের পরামর্শও প্রায়ই গৃহীত হয় না। এতন্নিবন্ধন আমলাদিগের ক্ষমতা নিতান্ত খর্ব্বীকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব সম্ভাবনা করা যাইতে পারে, এক্ষণ দিন ২ই আমলাদিগকে উৎকোচ দেওয়ার রীতি অপীভূত হইয়া আসিবে। কিন্তু আক্ষেপ এই, আজিও অনেক আদালতে সেই সম্ভাবনারূপ কাজ দেখা যাইতেছেনা। আজিও অনেকস্থানে উৎকোচস্রোত ভয়ানক বেগে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা না জানিয়া এরূপ বলিতেছি, কেহ এরূপ মনে করিবেন না, ইতিমধ্যে অত্রত্য প্রধান সদর আমিনী 'আদালতের আমলারা সমধিক পরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করেন বলিয়া কমিস্যনর সাহেবের নিকট দরখাস্ত পড়িয়াছিল। কমিস্যনর সাহেব তদনুসারে প্রধান সদর আমীন

মহাশয়কে তদর্থ শাসন করিয়া দিতে ও অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া দিয়াছেন। প্রধান সদর আমীন সেই অবধি কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমলাদিগকে এজলাসে আসিতে দেন নাই। উকীলদিগের দ্বারাই মকদ্দমার কাগজপত্র পাঠ করাইয়া শুনিয়াছেন। এখনও তিনি সেরেস্তাদারকে মিসিলে আসিতে দেন না, কেবল পেস্কার দ্বারা কাজ লইয়া থাকেন। সম্প্রতি অন্যান্য অদালতের ঘুষের কথা প্রকাশ পায়নাই সত্য, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে প্রধান সদর আমিনী আদালত অপেক্ষা সেগুলি ন্যুন কল্প হইবে এরূপ বোধ হয় না। আমলাদিগের এক্ষণ পূর্ব্ববত ক্ষমতা না থাকাতেও লোকে তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করে কেন, পূর্ব্ব সংস্কার ও ধূর্ত্ত মোক্তারদিগের কুপরামর্শ ব্যতীত আমরা ইহার অন্য কারণ দর্শন করিতেছিনা। এখন আমলাদিগকে ঘুষ দিয়া কোন অভীষ্ট সুসিদ্ধ করিবার সম্ভাবনা নাই, ইহা একপ্রকার স্থির নিশ্চয় কথা। তথাপি লোকের এমনই অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাহারা মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আমলাদিগকে ঘুষ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানেন সুতরাং এতদনুষ্ঠানে নিরস্ত থাকিতে পারে না। তাহাদিগের দৃঢ় সংস্কার এই, আমলাদিগকে উৎকোচ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তাহারা হাকিমদিগকে বলিয়া কহিয়া তাহাদের পক্ষে পুতুল করিয়া দিতে পারিবেন দুর্ল্লোভ মোক্তারেরা এই সংস্কার জীবিত রাখিবার প্রধান সাধন। তাহারা নানা পরামর্শ দিয়া আমলাদিগের ঘুষের টাকা হস্তগত করিতে প্রাণপনে যত্ন করিয়া থাকে। সুতরাং অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হয়। আমরা উপরিউক্ত বিষয় সম্বন্ধে সর্বসাধারণ বিচারার্থীকে একটি পরামর্শ দিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিতেছি। তাহারা প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিয়া জানুন, মকদ্দমার প্রতুলাপ্রতুল বিষয়ে আমলাদিগের পূর্ব্ববত ক্ষমতা আছে কিনা ; আমাদিগের নিশ্চিত ভরসা আছে, প্রকৃত রূপে অনুসন্ধান করিলে তাহার কিছুই দর্শন করিতে পাইবেন না। তবে কেন তাহারা তাহাদিগকে নিরর্থক প্রভূত অর্থ দিয়া উৎকোচ দান ও গ্রহণ উভয়ই অপরাধ উভয়ই গর্হিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ, মিছামিছি টাকা ব্যয় করিয়া অপরাধ হইতে যাওয়া কিরূপ মূঢ়তার কার্য্য তাহারাই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহাদিগকে বিনয়ের সাথে বলিতেছি তাহারা এক্ষণ হইতেই এই দুস্প্রাথা রহিত করিতে চেষ্টা করুন। আর যেন তাহারা আমলার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ও আদালতকে কলঙ্কিত না করেন। তাহারা আমলাদিগকে যে টাকা দিয়া মকদ্দমা ডিগ্রি করিবেন বলিয়া নিশ্চিত থাকিতে অভ্যাস করিয়াছেন, সেই টাকা দিয়া প্রত্যেক মকদ্দমায় উকীল নিয়োগ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করুন, সর্ব্বদা মঙ্গল হইতে পারিবে। যে টাকা অবৈধরূপে আমলাদিগের ঝুকি পুরান পর্য্যবসিত হয়, প্রত্যেক মকদ্দমায় উকীল দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে তদপেক্ষা বড় অধিক টাকা লাগিবেনা, অথচ কাজ উত্তম হইতে পারিবে। এক্ষণতঃ সাধারণ দশ আইন প্রভৃতির মকদ্দমার প্রথমে উকীল দেওয়া হয় না বলিয়া অনেক মকদ্দমার মূলই অপরিপক্ক থাকিয়া যায়, সুতরাং আপীল আদালতে জয় পরাজয়ে অনিশ্চিত হইয়া ব্যয় বাহুল্য স্বীকার করিতে হয়। যদি ঐ সকল মকদ্দমায় উকীল দেওয়া হয়, মোক্তারদিগের পরামর্শে কেবল আমলার টাকা যোগাইয়াই নিশ্চিত থাকা না হয়, কখনই তাহা তাদৃশ অপরিপক্ক থাকিবে না। সুতরাং তদর্থপরে ব্যয় বাহুল্যও হইবেনা। সর্ব্বস্থানের সর্বসাধারণ লোকে যাবতীয় মকদ্দমায় উকীল নিয়োজন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া আদালত সমূহের উৎকোচ স্রোত মন্দীভূত করিতে চেষ্টা করেন, এই আমাদিগের বাসনা।

৫ আগস্ট, ১৮৬৬

### বিচারার্থীদিগের কষ্টবৃদ্ধি

কেহ অত্যাচার করিলে তাহার প্রতীকার হইবে ক্ষতি করিলে ক্ষতি পূরণ হইবে, অন্যায়পূর্ব্বক কোন বিষয় হইতে স্বত্বচ্যুত করিলে প্রকৃত ন্যায়ানুসারে সেই স্বত্ব প্রদত্ত হইবে, ইত্যাদি মহৎ মহৎ উদ্দেশ্যসাধনার্থই বিচারালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংক্ষেপ বলিতে হইলে এই বলিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক অশান্তি নিবারণপূর্ব্বক শান্তি স্থাপনই বিচারালয়ের মুখ্যোদ্দেশ্য। কিন্তু ক্ষোভ এই, কর্ত্তৃপক্ষের নিয়মের দোষেই হউক, আর কর্ম্মচারীদিগের দোষেই হউক, এদেশের বিচারালয়গুলি লোকের শান্তি বিধায়ক না হইয়া দিন দিনই অশান্তির নিকেতন হইয়া উঠিতেছে। নিরুপদ্রবস্বভাব শান্ত প্রকৃতি লোকে এখন আর পার্য্যমানে বিচারালয়ে যাইতে চান না। আজিকালি যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা যায় তিনিই বলিবেন, আপোসে ক্ষতি হয় সে ভাল, কিন্তু বিচারালয়ে যাইয়া নানা ঝঞ্ঝাটে ভোগ করা আর সহ্য হয়না। মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন, প্রবলকর্ত্তৃক সর্বস্বান্ত হইলেও বিচারার্থী হওয়া কর্ত্তব্য নয়। এরূপ বলিবার মুখ্যকারণ এই বিচারার্থী হইয়া বিচারালয়ে গেলে অত্যাধিক ব্যয়, নানা রূপ বিরক্তি ও অধিক পরিমাণে কালহরণাদি অশেষ অসহনীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সবিশেষে অনুসন্ধান করিয়া উল্লিখিতরূপ অসুবিধা দূর করিবেন কি, দিন দিন আরো বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছেন।

১ আগস্ট, ১৮৬৯

### পুলিসের নূতন বন্দোবস্ত

বাঙ্গলার পুলিসের নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল, এই বন্দোবস্ত উপলক্ষে পুলিসের সমুদয় অযথা ব্যয়রূপ রহিত হইয়া অনেক অর্থ উদ্বৃত হইবে কিন্তু এখন দেখি, টাকা উদ্বৃত হইয়াছে, অযথা ব্যয়ের নিরসন হয় নাই। গবর্নমেন্ট পুলিসের সেই অযথা ব্যয় দোষটুকু রাখিয়াই গেলেন। অনেক প্রয়োজনীয় পদ এবালিশ করিয়া অনাবশ্যকীয় পদ রাখা হইয়াছে। সুতরাং অর্থের অযথা ব্যবহার করা হইয়াছে বলা বাহুল্য। বোধ হয় পুলিসের বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট না করিয়া কেবল টাকা বাঁচান গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ছিলনা। কিন্তু ফলে তাহাই করা হইয়াছে। টাকা বাঁচিয়াছে, বন্দোবস্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। নিম্নে তাহার এক তালিকা প্রদান করা যাইতেছে, দেখিলেই পাঠকগণ বন্দোবস্তের দোষগুণ বুঝিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা পুলিসে পূর্ব্বে কত কর্ম্মচারী ছিল, এখন কত আছে এবং কত কমান হইয়াছে, এই তালিকায় তাহাই দৃষ্ট হইবে।

| [পদের নাম] | পূর্ব্বের | বর্ত্তমান | এবালিশ |
|---|---|---|---|
| ইন্সপেক্টর জেনারেল | ১ | ১ | ০ |
| ডে: ই: জেনারেল | ৬ | ২ | ৪ |
| ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রথম শ্রেণী | ৭ | ৬ | ১ |
| ঐ দ্বিতীয় শ্রণী | ৭ | ৬ | ১ |
| ঐ তৃতীয় শ্রেণী | ১১ | ১১ | ০ |
| ঐ চতুর্থ শ্রেণী | ১১ | ১১ | ০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ঐ | পঞ্চম শ্রেণী | ১৭ | ১৫ | ২ |
| এসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট | প্রথম শ্রেণী | ৩৯ | ১৩ | ২৬ |
| ঐ | দ্বিতীয় শ্রেণী | ১৮ | ১৫ | ৩ |
| ঐ | তৃতীয় শ্রেণী | ১০ | ১০ | ০ |
| ইন্সপেক্টর | | ২৬৫ | ২৪৫ | ২০ |
| সাব ইন্সপেক্টর | | ৮৮৪ | ৯০০ | ১৬ বৃদ্ধি |
| হেড কনষ্টাবল | | ৩২০৮ | ২৯৪৪ | ২৬৪ |
| কনষ্টাবল | | ২২৯৭৮ | ২১১২৩ | ১৮৫৫ |
| সওয়ার | | ৯১ | ৪০ | ৫১ |

পূর্ব্বে বাঙ্গালা পুলিসে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭৫৫৩ জন কর্ম্মচারী ছিল। তন্মধ্যে ২৫৩৪১ জন রাখিয়া ২২৪৪ জন কমান হইয়াছে। এই ২২৪৪ জনের মধ্য হইতে ৮ লক্ষ টাকা বাঁচিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যদি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া কাজ করা হইত তাহা হইলে এই আট লক্ষ টাকাও উদ্বৃত্ত হইত কর্ম্মচারীও আরো রাখা যাইতে পারিত। এই সংখ্যার মধ্যে দেখা যায় নিম্নস্থ অল্প বেতনের কর্ম্মচারীই অধিক কমান হইয়াছে। যাহাদের একজন অধিক টাকা শোষণ করে, তাহাদের প্রতি বড় দৃষ্টি পড়ে নাই। যাহাও পড়িয়াছে, তাহাও উপযুক্তরূপে হয় নাই। উপরিস্থ লম্বা বেতনের কোন২ কর্ম্মচারী আরো কমাইলেও হানি ছিল না। ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল ৪ জন কমাইয়া যে দুই জন রাখা হইয়াছে তাহার আবশ্যকতা ছিল কি? ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল একজনও রাখার প্রয়োজন ছিল না। যে দুই জন রাখা হইয়াছে তাহা কমাইয়া দুই জন হইতেই ১৬০০০ হাজার টাকা বাঁচান যাইত। এই ১৬০০০ হাজার টাকায় কত জন কনষ্টাবল বা হেড কনষ্টাবল রাখা যাইতে পারে সকলেই বুঝিতে পারেন। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট না থাকিলে ৪৯ টা জিলায় ৪৯ সুপারিন্টেন্ডেন্টরই প্রয়োজন। এসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ৩৮ জন কেবল বৃথা রাখা হইয়াছে। ইহার একজনেরও কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। টাকাও অনেক বাঁচিত। সব ইন্সপেক্টরের সংখ্যা যে বাড়িয়াছে ইহা বিবেচনার কাজই করা হইয়াছে। বাস্তবিকই সব ইন্সপেক্টরদিগের দ্বারা পুলিসের যথেষ্ট কার্য্য হয়। হেড কনষ্টাবল ও কনষ্টাবলের সংখ্যা এত কমান উচিত ছিলনা। ইহাদের বাবদে টাকা যায় কম কার্য্য হয় বেশী। এই দুই পদের কর্ম্মচারী, যাহা ছিল তাহা রাখিলেই ভাল হইত। গবর্ণমেন্ট কেন এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল ও এসিষ্টান্ট সুপারিন্টেডেন্টের পদে যে টাকাগুলি দেওয়া হয়, আমাদের বিবেচনায় তাহা জলে ফেলা হইতেছে। যাহা হউক, এখন আর সে সকল কথা বলা না বলা সমান। যদি গবর্ণমেন্ট পুনঃ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন তবে যেন আমাদের এই কথাগুলি স্মরণ করেন। ফলের দ্বারাই কার্য্যের পরীক্ষা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০

## আলমের ডাঙ্গির দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড

ইংরাজদিগের নানা প্রকার অত্যাচারে টিকিয়া থাকা ভার হইল। কি গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী, কি মহাজন, কি জমিদার, অত্যাচার সকলেরই ব্যবসায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় এমন সপ্তাহ যায়না যে ইহাদের দুই একটী অত্যাচারের কথা না শুনি। ইহারা সর্ব্ববিধ অত্যাচারেই নিপুণ

এবং এদেশের কন্টক স্বরূপ। লোকে অহরহ ইহাদের যন্ত্রণায় জ্বালাতন হইতেছে। ধন, মান, স্বত্ব ও জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিতেছেন। ইংরাজ নামে যত কলঙ্ক পড়িয়াছে এসকল অত্যাচারই তাহার প্রধান কারণ। এদেশীয় লোকের এখন ইংরাজ নামের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। ইংরাজ নাম শুনিলেই তাহারা স্বার্থপরতা ও অত্যাচারের মূর্ত্তি কল্পনা করে। অধিকাংশ লোক ইংরাজ নামে চটা। কিন্তু চটা থাকিয়াও কিছু করিতে পারেনা। বিচারালয়ই এদেশীয়দিগের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থল। কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই অত্যাচারীদিগেরই জয়। সুতরাং কোনমতেই রক্ষা নাই। এদিকে কতকগুলি ইংরাজ শত প্রকার অত্যাচার করিয়া ওদিকে বিচারালয়ে গেলে, টুপি কাইত করিয়া সমুদয় উড়াইয়া দেয়। অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই ইংরাজ বিচারকগণ স্বজাতীয়ের পক্ষপাত করিতে ত্রুটি করেন না। এইরূপ অনুগ্রহের প্রত্যাশা থাকিলে, অত্যাচারীরা কেননা নিতান্ত উশৃঙ্খল হইবে? আমরা নিরুপলক্ষ এতগুলি বাক্য ব্যয় করিলাম না। নিম্নের ঘটনাটি দেখিলেই, কিরূপ অত্যাচার হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

২৪ এপ্রিল, ১৮৭০

## ইউরোপীয় সিবিলিয়ান

বিদেশীয় লোকের পক্ষে দেশ শাসন এক প্রকার অপ্রাকৃতিক ব্যাপার। ইহাতে শাসনাধীন দেশ ও শাসনকর্ত্তা উভয়েরই বিড়ম্বিত হইতে হয়। এক্ষণ আমাদের দেশের সেই দৃশ্য। আমাদের শাসন কর্ত্তৃগণ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন দেশীয়। সুতরাং নানা বিষয়ে আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি এবং শাসন কর্ত্তৃগণও অকৃতকার্য্য হইতেছেন। আমাদের দেশের শাসন কার্য্য বিদেশীয় লোকে পরিপূর্ণ। যতই উর্দ্ধে যাওয়া যায় ততই বিদেশীয় অনভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত উপরে উঠিলে আর স্বদেশীয় লোকের গন্ধ মাত্রও পাওয়া যায় না। ইহাতে শাসন কার্য্যের ভয়ানক অঙ্গবৈকল্য ঘটিতেছে। এদেশে ইংলন্ড হইতে যে সকল কর্ম্মচারী আইসেন, তাঁহাদের দ্বারা শাসন কার্য্যের ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটে। তবে যে কিছু ২ কার্য্য হইয়া থাকে, সে কেবল এদেশীয় লোকের সাহায্যের ফল। এদেশীয় লোকেরা সিবিলিয়ানদিগকে নিয়ত সাহায্য করেন। সেই সাহায্য বলেই অধিকাংশ সিবিলিয়ন টিকিয়া রহিয়াছেন। এদেশীয়দিগের পদ অতিক্ষুদ্র কিন্তু কাজ করিতে হয় বৃহৎ। কেহ কেরানী, কেহ এসিষ্টান্ট ও কেহ নিম্নস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারী হইয়া অনেক স্থলে প্রধান কর্ম্মচারীর কাজ করেন। কেবল কাজ করেন, এমত নয়। ইউরোপীয়দিগকে শিক্ষাও দেন। উহারা এতদ্দেশীয় নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর সাহায্য ব্যতীত একপদও চলিতে পারেন না। চলিলে, অতি বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দেন। কিন্তু এদেশীয়েরা উপরিস্থ ইউরোপীয়দিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদয় করিতে পারেন। দেখিতে গেলে কাজ এদেশীয়েরা করেন, বেতন ইউরোপীয়রা পান। কমিস্যনর, জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী আছেন, ইহার কয়জন, আসিষ্টান্ট, রাইটার পেস্কার প্রভৃতির সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজেরা কার্য্য সাধন করিতে পারেন? যেখানে এদেশীয়দিগের হস্ত নাই, সেখানেই নানা বিশৃঙ্খলা। কেবল বিশৃঙ্খলা নয়, কখন ২ একের মধ্যে আর করিয়া বসা হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিতে বাসনা রহিল। আক্ষেপের বিষয় এই, অনেক সর্ব্বদা সাহায্য নিতে ইচ্ছুক নন; কখন কখন নিজের ক্ষমতায় কাজ করিতে চান। ক্ষমতা থাকিলে, এই গুণটী মন্দ ছিলনা। কিন্তু যখন নিজের সেই ক্ষমতা নাই, তখন সাহায্য না দেওয়া মূঢ়ের কাজ। এইরূপ

ভাবের সিবিলিয়ান অনেক আছেন। তাঁহারা যে কাজ নিজে করেন, তাহাতেই অঙ্গহীনতা ঘটে। মাজিষ্ট্রেট কমিস্যনর প্রভৃতির সর্ব্বদা স্থানীয় নানা বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হয়। সেই সকল রিপোর্ট মধ্যে ২ তাহারা নিজেরাও করিয়া থাকেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাদের নিজের কতদূর ক্ষমতা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এইরূপ কাজে অনেক সময় তাঁহাদের গুণ বাহির হইয়া পড়ে। ঐ সকল রিপোর্টে গবর্ণমেন্ট নানা বিষয়ে ভ্রান্ত হন। সুতরাং অনেক সময় অনুচিত ব্যবস্থা ও আদেশ প্রচারিত হয়। অতএব আমরা অনভিজ্ঞ ইউরোপীয় সিবিলিয়ানদিগকে সবিনয়ে বলিতেছি, তাঁহারা অভিমান পরিত্যাগ করুন। তাঁহার দেশের সুশাসনের জন্য আসিয়াছেন ; অভিমান রক্ষা করিতে আইসেন নাই। নানা বিষয়ে এদেশীয় লোকের সাহায্য লইতে লজ্জিত হইবেন না। যে বিষয়ে যাহার অনভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হানি কি? ইউরোপীয় সিবিলিয়ানগণ যে এদেশীয়দিগের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কাজ করিতে অক্ষম, ইহা সকলেরই জানা আছে। তবে আর অভিমান করিয়া কাজ কি?

এই উপলক্ষে আমরা গবর্ণমেন্টকে কয়েকটি পুরাতন কথা বলিতে চাই। যদি এদেশীয় লোক শাসন কার্য্যে ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেন, তবে যাহারা উপযুক্তরূপে পদস্থ না হইবেন কেন? ইহাতে যে কেবল আমাদের অসুবিধা এমত নয় ; গবর্ণমেন্টেরও অনেক ক্ষতি হইতেছে। যদি এতদ্দেশীয়দিগকে শাসন কার্য্যের উচ্চ২ পদে নিযুক্ত করা যায়, তবে কার্য্যও ভাল হয়, রাজকোষেরও অর্থ অনেক বাঁচিয়া যায়। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের কল্যাণে অনেক অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে বলা যাইতে পারে। অতএব গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয়দিগকে উচ্চ ২ কার্য্যে নিযুক্ত করুন।

৫ জুন, ১৮৭০

## এদেশীয়দের রাজকার্য্যে প্রবেশ ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ

এদেশসহ অধিকাংশ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর অভিলাষ যে এদেশীয়দিগকে একবারে রাজকর্ম্ম হইতে বিদূরিত করা হয়। এবং ছোট বড় সমুদয় পদ তাহাদেরই নিমিত্ত একচেটিয়া থাকে। এদেশীয় লোক রাজকর্ম্মে লব্ধাধিকার হইলে ইংরাজগণ আপনাদিগকে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও স্বার্থবিচ্যুতি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা কেবল ইংরাজগণ এদেশে সর্বপ্রকার ক্ষমতান্বিত কার্য্যে থাকিয়া অসীম ও অব্যাহত প্রভূত্ব প্রকাশ করেন, আর এদেশীয়গণ কেহ তাঁহাদের আরদালী, কেহ তাহাদের খানসামা, কেহ তাহাদের বেহারা, ও কেহ তাহাদের কুকুর রক্ষক হইয়া জীবনযাপন করে। ভাগ্যক্রমে কোনসময় এদেশীয় কোন ব্যক্তি ইষদুচ্চ রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেও সহস্রজন ইংরাজের শরীররোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, এবং সে কোনরূপে অপদস্থ হইলে সকলের মনের ক্ষোভ নিবারিত হয়। আর যদি কখনও গবর্ণমেন্ট এদেশীয়দিগকে কোন রাজকার্য্যের অধিকার প্রদান করিতে সংকল্প করেন, তবে এদেশসহ সহস্র ২ ইংরাজ সম্পাদকদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাহার প্রতিবাদ ও নিবারণ চেষ্টা করেন, ইংরাজ সম্পাদকগণের লেখনীর তীক্ষ্নমুখ যেমন এদেশীয় লোকের দিকে সর্ব্বদা সজ্জিত রহিয়াছে, সাধারণ ইংরাজগণের যত্ন চেষ্টাও এদেশীয়দিগের উচ্চপদ প্রাপ্তির বিপক্ষে সংকল্পিত হইয়াছে। এক দিকে সংবাদপত্র সকল ভীষণস্বরে নিনাদ করিতে থাকেন, অপর দিকে অন্যরা সভা করিয়া প্রতিবাদ ও আবেদন করেন। ১৮৭১ সনে আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারী

রাজকর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের যে একটু নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, এখন ইংরাজগণ নানা স্থানে সভা করিয়া তৎপ্রতিবিধানার্থ গবর্ণমেন্ট আবেদন করিতেছেন। ইংলিশম্যান এদেশের প্রধান এক খানা ইংরেজী সংবাদপত্র ; ষ্টেট সেক্রেটারীর উক্ত অভিপ্রায়ে তিনি পর্যন্ত ঐ বিষয়ে অস্থির ও ভীত হইয়া নিজের সংকুচিত ও অসাধুভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেবল উপরিউক্ত ঘটনা বলিয়া নয়, প্রায় সর্ব্বদা সকল বিষয়েই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি ও সতর্ক হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি ইংরাজের প্রতিপালনোপায় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য নয়। যাহাতে শাসন কার্য্যের মঙ্গল ও সুধারা হইতে পারে, তাহাতেই তাহাদের লক্ষ্য স্থিরতর রাখা বিধেয়। আমাদের বিবেচনায় এদেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণ রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে দিলে শাসন কার্য্যের নানা প্রকার হিত ও সুধারা হইতে পারে। এইক্ষণ এদেশীয় লোক শিক্ষা বলে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে অক্ষম হয় নাই। যে সকল লোককে রাজকার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাহাদের কার্য্য নৈপুণ্যই আমাদের বাক্যের প্রধান স্থল। এদেশীয়দিগের সমপদস্থ ইংরাজগণ অপেক্ষা প্রায়ই এদেশীয় লোকেরা যত্নে, পরিশ্রমে ও বুদ্ধিতে অধিক কৃতকার্য্যতা ও প্রাধান্য লাভ করিতেছেন। ইংরাজ জাতির মধ্যে বহুতর লোক অসীম বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ লোক আছেন সত্য, কিন্তু এদেশে তাঁহারা প্রায়ই আইসেন না, যাহারা আইসেন তাঁহারাও অত্যন্ত উচ্চ পদেই রহিয়া যান। সুতরাং যে সকল লোক বিলাতে একপ্রকার অজিজ্ঞাস্য ও অগন্য তাহারাই এদেশে আসিয়া নিম্নতর রাজকার্য্যের লম্বা ২ বেতনে নিযুক্ত হন। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগকে ঐসকল কার্য্যে নিযুক্ত করিলে অল্প বেতনেই উক্ত পদস্থ ইংরাজগণ অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ লোক পাওয়া যাইতে পারে। কারণ স্বদেশীয় যেরূপ বিজ্ঞলোক অল্প বেতনে পাওয়া যায়, বিদেশীয় সেইরূপ লোক তত অল্প বেতনে পাওয়া যায় না। এতএব বিশেষ উচ্চ বেতন না হইলে বিলাতের বিজ্ঞলোক আমাদের পাওয়া অসম্ভব। এদেশে যেসকল ইংরাজ লম্বা ২ বেতন ভোগ করেন, বিলাতে তাঁহাদের সামান্যাবস্থায় জীবন যাপন করা কষ্টকর। ভারতবর্ষ এবং বিলাতে রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতনের তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতে পারে। ইংলন্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী যে বেতন পান ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলের বেতন তাহার পাঁচ গুণ, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের বেতন তাহার দ্বিগুণ, এবং হাইকোর্টের এক ২ জন জজের বেতন তাহার তুল্য। এমন কি এদেশীয় একজন কালেক্টরও ইংলন্ডের কোন ২ রাজমন্ত্রীরতুল্য বেতন পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে একথা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না, ইংলন্ডের একজন প্রধান রাজমন্ত্রী ও এদেশের একজন গবর্ণর জেনারেল বা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর অথবা হাইকোর্টের একজন জজ তুল্য রূপ বিজ্ঞ। এবং একজন কালেক্টর ও একজন রাজমন্ত্রীর সমান ক্ষমতাশালী লোক। এরূপ দেখিতে গেলে সমুদায় কর্ম্মচারী সম্বন্ধে এই প্রকার বৈসাদৃশ্য আছে। প্রকৃত কথা এই, স্বদেশে অল্প বেতনেই অধিক বিজ্ঞ লোক পাওয়া যাইতে পারে, অতএব আমরা বলি ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্যে যতই এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত করা যায় ততই মঙ্গল। ভারতবর্ষে যতদিন ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্যে অধিক পরিমাণে নিযুক্ত না হইবেন ততদিন শাসনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে না। অতএব এদেশীয়দিগের রাজকার্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধাচরনের প্রতি গবর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২৩ জুন, ১৮৭২

## বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ নেটিব ডাক্তারগণের প্রতি গবর্ণমেন্টের পক্ষপাত

বোধ করি সকলেই অবগত আছেন যে নেটিব ডাক্তারগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রথম যাহারা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা কার্য্য করেন তাহাদিগকে বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ নেটিব "ডাক্তার বলে। উদার গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের উপকারার্থই এই শ্রেণী সংস্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয় যাহারা উর্ধ্বশ্রেণীতে শিক্ষিত হন তাহাদিগকে মিলিটারী নেটিব ডাক্তার বলা যায়। গবর্ণমেন্ট এই শ্রেণীস্থ নেটিব ডাক্তারগণকে হস্পিটাল আসিষ্টান্ট আখ্যা দিয়াছেন এবং বেতন বৃদ্ধির বেশ সুন্দর একটি নিয়ম করিয়াছেন। সৈনিক চিকিৎসালয়ের এবং যে ২ স্থানে উর্দ্দু ভাষা চলিত আছে, তত্তৎস্থলের চিকিৎসা কার্য্যের সুবিধা জন্য উর্দ্দু শ্রেণী স্থাপিত আছে। বস্তুতঃ এই শ্রেণীস্থ নেটিব ডাক্তারগণই তুল্যরূপ লিখিত এবং কর্ম্মঠ, অতএব এই উভয় সম্প্রদায়েরই তুল্যরূপ বেতন বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যে কেন তাহা করেন নাই আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হস্পিটাল আসিষ্টান্টেরা সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করেন, এইটিই যদি কারণ হয় তবে বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ নেটিব ডাক্তারগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়া উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ পুলিস সৈন্যেরা যখন যুদ্ধা যাত্রা করিবে তখন বাঙ্গলা শ্রেণীস্থ নেটিব ডাক্তারগণকে তাহাদিগকে পৌছিয়া দিতে হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট সংপ্রতি নিয়ম করিয়াছেন।

হস্পিটাল আসিষ্টান্টেরা প্রথম ৭ সাত বৎসর ২০ টাকা পাইবে, আর যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা আর ৫ টাকা অধিক মোট ২৫ টাকা বেতন পাইবেন। সাত বৎসর পরে যদি তাহারা অভ্যস্ত বিদ্যার এবং ইংরেজীর পরীক্ষা দিতে পারেন, তবে ৪০ টাকা আর যদি ইংরাজী না পড়িয়া কেবল শুদ্ধ চিকিৎসা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন, তবে ৩০ টাকা বেতন পাইবেন। ১৪ বৎসরের মধ্যে যদি উল্লিখিত রূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারেন, তবে ৬০ টাকা, আর যদি ইংরেজী না পারেন তবে ৪০ টাকা বেতন পাইবেন। চিকিৎসা বিষযে পরীক্ষা প্রতি সাত বৎসরে দিতে হইবে। তাহারা যেখানেই কর্ম্ম করিবেন এই বর্দ্ধিত বেতন সেইখানেই পাইবেন। এটি যে উত্তম নিয়ম তাহার সন্দেহ নাই। কারণ এই প্রকার বর্দ্ধিত বেতন পাওয়ার প্রত্যাশায় হস্পিটাল আসিষ্টান্টগণ উৎসাহিত হৃদয়ে গবর্ণমেন্টের কার্য্য নির্ব্বাহ এবং আপন ২ উন্নতি করিতেছেন। এবং সকলেই উন্নত বেতন পাইতেছেন। কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গলা শ্রেণীস্থ নেটিব ডাক্তারগণকে এই নিয়মের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে। যদিও ইহাঁরা ৪০-৬০ টাকা বেতন পাইতেছেন বটে। কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিবে এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। প্রায় মফস্বলস্থ ক্ষুদ্র ২ দাতব্য চিকিৎসালয়স্থ নেটিব ডাক্তারগণকে স্থানীয় চাঁদার হারে বেতন ৪০-৬০ টাকা দেওয়া হয়। চিরকাল জেল হস্পিটালের কার্যকরিয়া মরিলেও পঁচিশ টাকার অধিক একটি কড়ী দেওয়া হয়না। কাজেই ইহারা নিজ উন্নতি করার জন্যও উৎসাহী নহেন। ক্বচিৎ কেহ কেহ কিঞ্চিৎ ইংরেজী জানিলে ৫ টাকা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন এবং উপরিস্থ ডাক্তার সাহেব সুপারিশ করিলে কোন একটি দাতব্যচিকিৎসালয়েও ৪০-৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। বাঙ্গলা শ্রেণীস্থ নেটিব ডাক্তারগণের গবর্ণমেন্টের কার্য্য করিয়া এই পর্য্যন্তই উন্নতি। এই ক্ষণ গবর্ণমেন্ট সমীপে এই প্রার্থনা যে, হস্পিটাল আসিষ্টান্টদিগের সম্বন্ধে যেমন পরীক্ষা ও বেতন বৃদ্ধির সুপ্রণালী অবলম্বিত হউক। ফলত এই হতভাগ্য দুঃখী ডাক্তারগণের যাহাতে কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়, তদ্রূপ উপায় বিধান করা গবর্ণমেন্টের তাস্ত আবশ্যক।

১৫ ডিসেম্বর, ১৮৭২

## দেশীয় সিবিলসার্ব্বিস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের রিজলিউশন

মহারাণীর ১৮৫৮ সনের ঘোষণার পর হইতে আমরা দেশীয় উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছি। ভারতবর্ষের প্রায় উচ্চপদই, সিবিল সার্ব্বেন্টদিগের অধিকৃত রহিয়াছে, সুতরাং সিবিলসার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে না পারিলে, ভারতবাসীদের ঐ পদে কোনরূপেই স্বত্ব জন্মিতে পারেনা। পূর্ব্বে বিলাতে যাইয়া সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা প্রদান করিতে হইত। এদেশীয়গণের জাতিনাশ ও অর্থক্ষতি করিয়া সিবিলিয়ান হওয়ার বিষম অন্তরায় ছিল। ক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সেই সকল অন্তরায় ও পদদলিত করিয়া সিবিলসার্ব্বেন্টে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন ইংলিশ গবর্ণমেন্টের চক্ষু ফুটিল বুঝিলেন, কি সর্ব্বনাশ ! উচ্চপদ পাইবার জন্য ভারতবাসীরা জাতি ত্যাগ করিতে ও প্রস্তুত হইয়াছে, তবে আর আমাদের স্বজাতি পরিপোষক নীতি থাকিতেছেন। সুচতুর লর্ড সালিসব্যরি প্রভৃতি মহাত্মগণ, এই সকল চিন্তা করিয়া ভারতবাসীদের পক্ষে প্রথমে একবিংশ, পরে উনবিংশবর্ষ যুবকের মাত্র সিবিলসার্ব্বিসে প্রবেশ করিবার নিয়মবিধান করিলেন। কাজেই আমাদের হস্তপদ ক্রমে বদ্ধ হইতে চলিল। ইংলিস গবর্ণমেন্টের এই পক্ষপাতিতামূলক আচরণের [অস্পষ্ট] আমরা ক্রমে, পার্লিয়ামেন্টস্পর্শী [অস্পষ্ট] করিতে আরম্ভ করিলাম। লর্ড [অস্পষ্ট] আমাদের ভক্তিভাজন হইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষেই নূতন সিবিলসার্ব্বিসে প্রবেশ করিবার নিয়ম প্রচার করিলেন। এই নিয়ম হইতে ইংলিশ গবর্ণমেন্ট, দেশীয় সিবিলসার্ব্বিস সম্বন্ধে সম্প্রতি নিম্নলিখিতরূপ রিজিলিউশন প্রচার করিয়াছেন।

অতঃপর গবর্ণমেন্ট রাজকীয় প্রধান ২ পদে দুই শ্রেণীর লোক মনোনীত করিবেন। — ১. উচ্চপরিবারস্থ অল্প বয়স্ক লোক। ২. যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত কার্য করিতেছেন। আমরা গবর্ণমেন্টের প্রথম প্রস্তাবের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। "উচ্চ পরিবারস্থ অল্পবয়স্ক লোক" এই কথার উদ্দেশ্য কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, ধনী ও উচ্চবংশীয় বিবেচনায় দেশীয় সিবিলসার্ব্বিসের পদ দেওয়া হইবে, তবে দ্বিতীয় নিয়ম যে, যোগ্যতার পরিচায়ক ছিল, প্রকারান্তরে তাহার অন্যথা করা হইতেছে। আমরা জানি, মধ্যবিত্ত ও মধ্যবংশীয় ব্যক্তিগণই সমধিক সুশিক্ষিত ও যোগ্যতম। তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে উপেক্ষা করা, পদের অগৌরব করা মাত্র। দেশীয় রাজা ও জমীদার বংশীয়দিগকে এই পদ প্রদান করিলে, দেশের কিছুই উপকার করা হইল না। যদি সম্মাননা ভিন্ন উচ্চপদে অর্থসংযোগেরও লক্ষ্য থাকে, তবে মধ্যবংশীয়দিগেরই তাহা পাওয়া উচিত। রাজা ও জমীদার বংশীয়দের যেরূপ গৌরব ও সম্ভ্রম রহিয়াছে, সিবিলসার্ব্বিস পদলাভে তাহা সমধিক শাণিত হইবে না। বিশেষত রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে তাদৃক ক্ষমতাপন্ন সুশিক্ষিত অতিঅল্প। এদিকে মহারাণীর ১৮৫৮ সনের ঘোষণা ও ১৮৫৩ সনের ইণ্ডিয়া বিলে যে "জাতি, বংশ ও বর্ণভেদে, কোনপ্রকার পক্ষপাত করা হইবেনা।" নিয়ম প্রচলিত আছে, ইহাতে তাহাও উন্মূলিত হইতেছে। তবে কেন গবর্ণমেন্ট, এই নিয়ম প্রচার করিলেন, তাহাই এখন চিন্তনীয় হইতেছে। বোধহয়, উপাধি পাশ বিস্তারিত করিয়া, গবর্ণমেন্ট যেমন ক্রমে, দেশীয় রাজা, জমীদার এবং অন্যান্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিতেছেন, তেমন সিবিলসার্ব্বিসের পদ প্রদান করিয়াও ঐ বন্ধন আরো দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে মধ্যবংশীয় ও মধ্যশ্রেণীর হইতেই গবর্ণমেন্টের সমধিক ভয়। মধ্যম শ্রেণীস্থরাই গবর্ণমেন্টে চীৎকার করে, তাহারাই দেশের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত, তাহারাই সুশিক্ষিত ও

দেশের আদর্শ স্বরূপ। অথচ ধন, পদ ও গৌরবহীন ব্যক্তি। এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে উচ্চপদ দিলে, অধিক স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা বৃদ্ধি পায়, এইজন্যই বুঝি গবর্ণমেন্ট এই অনুদার অনুচিত নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় নিয়মে যে, "অত্যন্ত যোগ্যতার" কথা লেখা আছে, তাহার একটি সীমা নির্দেশ থাকা..আবশ্যক। নতুবা কতদূর কার্য করিলে, অত্যন্ত যোগ্য হওয়া যাইবে, এবং কখন সিবিলসার্ব্বিস পদলাভের প্রত্যাশা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছেনা। আমরা এ বিষয়ে ইংলিস গবর্ণমেন্টকে নিরপেক্ষ উদার নীতির অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

১৮ এপ্রিল, ১৮৮০

**আমাদিগের আর একটি স্বত্ব হরণের প্রস্তাব**

আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, সংপ্রতি "ইস্টইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস "পরীক্ষাটি উঠাইয়া দেওয়ার কথা হইতেছে। ইংলণ্ডে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস ও ব্রিটিশ মেডিকেল সার্ব্বিস নামক দুইটি ডাক্তারি পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহারা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহারা ভারতবর্ষে চিহ্নিত ডাক্তার হইয়া আইসেন, আর যাঁহারা ব্রিটিশ মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষাত্তীর্ণ হন, তাঁহারা ইংরেজাধিকৃত সকল দেশেই চিহ্নিত ডাক্তার হইয়া যাইতে পারেন। বৃটিশ মেডিকেল সার্ব্বিসে এদেশীয়দিগের প্রবেশাধিকার নাই। কেবল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষাদানেই ইহারা অধিকারী এই নিমিত্তই নাকি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া, ইহা ব্রিটিশ মেডিকেল সার্ব্বিসের অন্তর্গত করার প্রস্তাব হইতেছে। ক্রমে ২ এদেশীয় অনেক ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এদেশের অনেকস্থানে চিহ্নিত ডাক্তার হইয়া অসিয়াছেন। এই পরীক্ষায় ইউরোপীয়দিগকে এদেশীয়রা পরাভূত প্রায় করিয়া দিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় গতবর্ষে দুই জন মাত্র ইউরোপীয়, অথচ সাতজন এদেশীয় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এতদ্দর্শনে ভীত হইয়াই নাকি ইহা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত রাজপুরুষদিগের ইচ্ছা হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রণা সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে যে সকল ডাক্তারের প্রয়োজন, প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত না করিয়া, ইংলণ্ডের প্রধান২ চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হউক। শুনা যায়, মন্ত্রণা সভার অনেকগুলি সভ্য.এই প্রস্তাবে অনুমোদনও করিয়াছেন, বড় আক্ষেপ যে, ইংরাজ জাতি (উদার) বলিয়া পরিচয় দান করেন, সর্ব্বত্র গৌরবও প্রকাশ করিয়া থাকেন—আপনাদিগের সমদর্শিতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ত প্রদর্শন করিতে চান, তাহাদিগেরই মন এত সঙ্কুচিত। সামান্য স্বার্থানুরোধে তাহারই এত ব্যগ্রস্পৃহ। ভারতবর্ষ ভারতবাসীদিগের জন্মভূমি, এতৎ সংক্রান্ত কাজকর্ম্মে ইহাদিগেরই স্বাভাবিক স্বত্ব, স্বার্থপর ইংরেজ জাতি স্বত্ব তৃণবৎ উল্লেখ করিয়া ভারত সাম্রাজ্যের উচ্চ ২ রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছেন,—ভারতের প্রভূত অর্থ লইয়া স্বদেশে যাইয়া রাজভোগে কাল যাপন করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষবাসীরা কিছুই বাঙনিষ্পত্তি করিতেছেন না, কিন্তু ভারতের সামান্য দুই একটি উচ্চবেতনের কার্য্যের সুযোগ্য ভারতবর্ষীয়েরা নিয়োজিত হইলেই ইংরেজদিগের চক্ষুঃশূল হইতেছে। কোনরূপেই তাঁহারা ইহা সহ্য করিতে পারিতেছে না। নানা কৌশলে তাহার পথ বন্ধ করিতেছেন। সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষার দ্বারা নানা

অমূলক ব্যপদেশে এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে রুদ্ধপ্রায় করা হইয়াছে। আবার ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষাও উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব চলিয়াছে। হায়! এদিকে বলা হইতেছে, ভারতবাসীরা যোগ্য নয় বলিয়াই ইহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্যের উচ্চ ২ রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত করা হইতেছেনা। ওদিকে যে ইহাদিগের যোগ্যতার পরিচয় হইতেছে, অমনি তাহার মূলোৎপাটন করিয়া ফেলা হইতেছে। ইহাতে কি ইংরেজদিগেরই সংকীর্ণ হৃদয়তা প্রকাশ পাইতেছে না। লর্ড রিপনের ন্যায় শাসনকর্ত্তার শাসনকালে এদেশীদিগের সম্বন্ধে এদেশের উচ্চ ডাক্তারি পদ বন্ধ করা হইলে একান্তই ক্ষোভের কারণ হইবে সন্দেহ নাই।

১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১

## টমসন সাহেবের শাসন শৈথিল্য ও সিবিলিয়ান সাহেব সম্প্রদায়ের অত্যাচার বৃদ্ধি

আমাদের ছোটকর্ত্তা রির্ভাস টমসন সাহেব[১২২] কিরূপ শাসন সুদক্ষ লোক, তাহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। ইহার আমলে মফস্বলের সিবিলিয়ান মহাপুরুষদের যেরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যেরূপ অপ্রতিহত অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে ইহাঁদের উপরওয়ালা যে কেহ আছেন, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। বাস্তবিক যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, টমসনের ন্যায় দুর্বলহৃদয় শাসনকর্তা শীঘ্র বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত হন নাই। সাহেব হাকিমগণ চিরকালই স্বেচ্ছাচারী। সিবিলিয়ান সাহেব বলিলে কতকগুলি ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য স্বেচ্ছাচারীর কথা লোকের মনে উদয় হয়। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় বিচারের নামে অবিচার, শান্তিরক্ষার নামে অশান্তিবৃদ্ধি এবং প্রজারসর্ব্বস্ব রক্ষার নামে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনাদের হাকিমী জাহির করিয়া থাকেন, কিন্তু টমসনের শাসন সময়ে ইহাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মফস্বলের হাকিমগণ প্রজালোকের এরূপ ভীতিস্থল হইয়া উঠিয়াছেন যে, লোকে তাহাদিগকে অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলার অবতার জ্ঞানে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকে। শ্বেতাঙ্গ হাকিমদিগের এরূপ অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবার প্রধানতম কারণ বঙ্গীয় শাসন কর্ত্তারা শাসন শৈথিল্য। মফসলের কর্ত্তাগণ তাহাকে কিছুমাত্র ভয় বা গণ্য করে বলিয়া বোধ হয়না। রিভার্স টমসন যে একজন নিরীহ প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের মনের বল যে কিছুমাত্র নাই, তাহা তাঁহাদের বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, — তাই তাহারা নিশ্চিন্ত মনে অত্যাচার অবিচারের পশার বৃদ্ধি করিতে কিছু মাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেছে না। চাঁটগায়ের সর্ব্বস, নদীয়ার টেলার লালবাগের বিমস—এইরূপ কত নাম করিব, ইহাঁরা এক একজন এক একটি অবতার বিশেষ। যে একবার এই মহাপুরুষদিগের বিষনয়নে পড়িয়াছে এবং ইহাদের মহিমার পরিচয় পাইয়াছে, ইহাঁদের নাম শ্রবণে তাহার গায়ে জ্বর আসে। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি ছোটলাট মহোদয় যে বসিয়া বসিয়া ভারতভাণ্ডারের অতগুলি টাকা ধ্বংস করেন, তাহা কি এই সকল সাহেবদিগের মুরুব্বিআনা করিবার জন্য? এমন সপ্তাহ নাই, যে সপ্তাহে কোনো না কোনো শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে বিবৃত করিতে না হয়। তাঁহারা ইহা করেন বলিয়াই সময় ২ কোনো কোনো মহানুভব কর্ত্তৃক তাহারা রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। যাহাদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করা হয়, তাঁহাদের উচিত শাস্তি পদোন্নতি বা প্রশংসা লাভ। কি অত্যাচারের প্রশমন বাসনায় চীৎকার করিয়া যাহারা গলা ভাঙ্গেন, তাঁহাদের ফলপ্রাপ্তি উপাধি লাভ। অত্যাচারকারীদের দমন না করিয়া শুধু সংবাদপত্র

সম্পাদকদিগকে রাজদ্রোহী প্রভৃতি উপাধি দান করিয়া ভয়াবহ অপব্যবহার করিলে ফল কি হইবে আমরা জানিনা। যত দিন অত্যাচার থাকিবে, ততদিন অত্যাচারিত ব্যক্তিদিগের উচ্চ চীৎকার ও অত্যাচারীর কাহিনীর বিবৃতি কিছুতেই বিলুপ্ত হইবেনা। রাজপুরুষগণ অত্যাচারীর দমন করিতে যত্নশীল নহেন, কিন্তু অত্যাচারিত ব্যক্তির মুখবন্ধ করিতে উৎসুক, কেমন বিচার?

টমসন মহোদয় প্রথম যখন বঙ্গের নবাবী পদে নঙ্গর ফেলেন, তখন বঙ্গবাসীদের মনে আশা জন্মিয়াছিল যে, তাহারা তাহার নিকট সুবিচার, সুশাসন লাভ করিবে, তিনি বঙ্গবাসীর দুঃখ দুর্দশা বুঁঝিয়া তাহাদের দুঃখ দুরীকরণে মনোযোগী হইবেন। আশার আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গবাসীর অনুকূলে বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তার দুই একটি স্তোকবাক্য শুনিয়া, অনেকে তাঁহাদের পরম হিতৈষী জ্ঞানে তাঁহার প্রশংসার গীতিগাহিতে ক্রুটি করেন নাই। একদিকে মহাত্মা লর্ড রিপন, ভারতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, অন্যদিকে ধর্ম্মাত্মা টমসন মহোদয় বাঙ্গলার শাসন সিংহাসনে আসীন, বঙ্গবাসী ইহাকে মনিকাঞ্চন যোগ মনে করিয়া কতই না আশ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে। এখন টমসন মহোদয়ের ভাবগতি দেখিয়া দেখিয়া সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, যে, ইহাঁরা শাসন কর্ত্তৃত্বাধীনে বঙ্গের মঙ্গলের আশা নাই। ...

২৯ জুন, ১৮৮৪

### বঙ্গীয় দেওয়ানী মকদ্দমা

দেশে মকদ্দমার কিরূপ ছড়াছড়ী হইয়াছে—গবর্ণমেন্ট আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সাহেবসুবা পরিপোষণ করিয়াও বর্ষে বর্ষে কি পরিমাণ লাভবান হইতেছেন দেশীয়লোকের প্রকৃতি "মামলা প্রিয়" হইয়া পড়াতে তাহাদের কেমন শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, পাঠককে সে দৃশ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা বঙ্গের গতবর্ষীয় শাসনবিবরণী হইতে দেওয়ানী মকদ্দমার কর্তৃক চিত্র অঙ্কিত করিব। এই বর্ষে মফসলের কোন প্রকার আদালতে কতসংখ্যক মকদ্দমা উত্থাপিত হইয়াছে, প্রথম তাহাই দেখাইতেছি —

| আদালতের নাম | উত্থাপিত মকদ্দমার সংখ্যা | নিষ্পন্ন মকদ্দমার সংখ্যা |
|---|---|---|
| ছোট আদালতসমূহ | ৫৫৮২১ | ৫১৯৬৪ |
| মুন্সেফী আদালতসমূহ | ৪৪৬১০০ | ৩৫১৭৪১ |
| সবজজ আদালতসমূহ | ৬৯১৩ | ৪৫৪৮ |
| জেলার জজ আদালতসমূহ | ৮৯৫ | ৫৩৬ |
| সিডিউলজেলা আদালতসমূহ | ১৪৬৪৯ | ১৩০৩৮ |
| সমষ্টি | ৫২৪৩৭৮ | ৪২১৮২৭ |
| রেভিনিউ আদালতসমূহ | ১৫৪০১ | ১০৫৬৭ |
| সাকল্যে | ৫৩৯৭৭৯ | ৪৩২৩৯৪ |

সমালোচ্য বর্ষে হাইকোর্টের মকদ্দমার সংখ্যা নূন্যতর হইয়াছে। লোকের উচ্চদরের মকদ্দমা প্রবৃত্তির হ্রাস উহার আনুসঙ্গিক কারণ কি না, বলিতে পারি না। তবে জজদিগের মন্থরভাবজনিত কষ্ট, অসুবিধা ও ব্যয়বৃদ্ধির ভয় যে, উহার প্রধান কারণ তাহাতে বড় একটা সংশয়-নাই। এখন জজসংখ্যা বাড়িয়াছে, দেখা যাউক, ফল কিরূপ দাঁড়ায়।

হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ৮১ অব্দে ১৫৮৮ ও ৮২ অব্দে ১৩০৮টী মকদ্দমা বিচারার্থ উপস্থাপিত হইয়াছিল। কথ্যমানবর্ষে ১২৫৭ টী উত্থাপিত হয়। জজ্জগণ ইহার মধ্যে ৪৬৪টির বিচার নিষ্পত্তি করেন। পূর্ব্ববৎসর ৫৮৬টীর বিচার শেষ হইয়াছিল। বর্ণনীয় বর্ষে আপীল বিভাগীয় জজেরা ২২৮ দিন বিচারাসনে বসিয়া ৪৩৯১টি আপিল ও দরখাস্তের বিচার করিয়াছে। বর্ষশেষে ৪৮৫৮টী আপীল বিচার অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্ববৎসর ৭৩৬৯টীর বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং বর্ষ শেষে ৩৫৮৩টীর বিচার অবশিষ্ট ছিল। টাকার কত মকদ্দমা হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই —

| | | |
|---|---|---|
| ১০ | টাকার অনধিক | ৮৬৭২৬ টী |
| ৫০ | " " | ২০৫২৮০ " |
| ১০০ | " " | ৬৯৩৮৪ " |
| ৫০০ | " " | ৪৯৭৮৫ " |
| ১০০০ | " " | ৪৮৬৬ " |
| ৫০০০ | " " | ৩৫৬১ " |
| ১০০০০ | " " | ৪৩০ " |
| ১০০০০০ | " " | ২৭৫ " |
| ১০০০০০০ | " " | ২৫ " |
| সমুদায় | | ৪২০৩৩২ " |

এতদ্ব্যতীত ৬১৩টী মকদ্দমা কত টাকার তাহার গণনা করা হয় নাই। বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ, প্রোক্ত বর্ষে সমস্ত আদালতে মোট ৩০১৭২০৯ টাকার মকদ্দমা নিষ্পন্ন হইয়াছে। আদিম মকদ্দমার সংখ্যা ৬৬০১৩১ ও [অস্পষ্ট] মকদ্দমার সংখ্যা ৩৪৬০৯ সুতরাং সাকল্যে ৬৯৪৭৪০ টি মকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ বর্ষে আদালত সমূহের মোট আয় ৯৬৬১৪৮৮ ও মোট ব্যয় ৭৮৬২১৭ টাকা, অতএব গবর্ণমেন্ট একমাত্র দেওয়ানী মকদ্দমায় বঙ্গদেশ হইতে এক বৎসরে ১৭৯৩২৭১ টাকা লাভ করিয়াছেন। ১৮৮২–১৮৮০ অব্দে ১৬২০৮৪ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছিল।

যে দেশে এক বৎসরে পাঁচকোটি তিন লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশত একাত্তর টাকা লাভ করিয়াছেন, সে দেশের সমস্ত মকদ্দমার সমুদায় ব্যয় কত — বারিষ্টার, উকীল, মোক্তার এটর্নিদিগের পারিশ্রমিক, আদালতের উৎকোচ, পেয়াদাগণের দক্ষিণা ও পাথেয়াদির পরিমাণ কত, পাঠক তাহাও ভাবিয়া দেখুন। আর্য্যরাজত্ব ও মুসলমান শাসনকালে কি বঙ্গদেশীয়েরা গৃহ হইতে বর্ষে বর্ষে মকদ্দমার বাবদ এত টাকা পুরাকালে মকদ্দমা ব্যয়ে ভূম্যধিকারির বংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িত? তখন কি পথে, ঘাটে এত বিচারালয় ও বিচারকের অধিষ্ঠান ছিল। আর্য্যভূপতি বা মুসলমান বাদশাহ, নবাবেরা কি এত উচ্চমূল্যে বিচার বিক্রয় করিয়া বৎসর বৎসর তল্লব্ধ লক্ষ লক্ষ টাকা ধনাগারে লইয়া যাইতেন? ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরেই এ সকল প্রশ্নের উত্তরে নিষেধোক্তি করিতেছে। সুসভ্য ব্রিটিশ শাসনে, উনবিংশ শতাব্দীর সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকেই এই অবাঞ্ছনীয় শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। ইংরাজ শাসনে ইংরেজি শিক্ষা করিয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতা লাভ করিয়া বাঙ্গালীজাতি এই মামলাবাজ হইতেছে কেন, কর্ত্তৃপক্ষ কি কারণানুসন্ধান করিবেন না? আইনের উপর আইন সৃষ্টি করিয়া মকদ্দমা ব্যয়ের নানা [অস্পষ্ট] খুলিয়া দিয়া স্বার্থবোধহীন [অস্পষ্ট] প্রকারান্তরে সর্ব্বস্বান্ত করিলে যে সুসভ্য ন্যায়পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ঘোরতর কলঙ্ক হয়, তৎপ্রতীকারের কি

সমুচিত উপায় অবলম্বিত হইবেনা? মুসলমান শাসনকালে, অজ্ঞানান্ধকারের সময় বিনা ব্যয়ে মামলা মকদ্দমার সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারিত, তখন বিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হইয়া যাইত, আর এখন ব্যয়ের প্রস্রবণ বিচারাদালতের আশ্রয় ভিন্ন কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না, ষ্টাফ, উকীল জটিল লেখাপড়া রেজিষ্ট্রি ব্যতীত ঋণদানাদি হইতে পারে না, ইহার হেতু কি? পাশ্চাত্য শিক্ষাই কি দেশ শুদ্ধ লোককে পরস্পরের প্রতি এরূপ অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে? দেশের নেতৃপুরুষেরা কি এই শোচনীয় অবস্থার রহস্যভেদ করিয়া প্রতিবিধানে মনোযোগী হইবেন না?

প্রকৃতিপুঞ্জ মামলাবাজ হইয়া সর্ব্বশান্ত হয় উচ্ছেদ্দশা প্রাপ্ত হয়, ইহা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্তু আইনের জটিলতা, অপ্রার্থনীয়রূপে বিধানবৃষ্টি ও মকদ্দমাব্যয়ের অতিবৃদ্ধি পরোক্ষভাবে তাহাই করিয়া বসিতেছে। প্রজার হিতার্থ যে সকল অনুষ্ঠান হইতেছে, এদেশের জলবায়ুর দোষেই হউক, অদৃষ্টচক্রের ঘূর্ণিবর্তেই হউক, সে সমুদায় অমঙ্গলকর হইয়াই দাঁড়াইতেছে। সুতরাং প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেন্টের এবং দেশ হিতৈষী সুশিক্ষিত সমাজ নায়কগণের এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারের অনিষ্টকারিতা নিবারণে শীঘ্রই মনোযোগ বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন পঞ্চায়েতী প্রথার ন্যায় বিনা ব্যয়ে অথবা অন্য কোন রূপ অল্প ব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্তির পথ না করিলে শীঘ্রই দেশীয়গণের বিলোপ দশা আসন্নবর্ত্তীনী হইবে, তাই উদাসীন থাকা বিধেয় নহে।

১০ চৈত্র, ১২৯১

## সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা ও ইংরাজের অপূর্ব্বনীতি

বিগত বৎসর, মহাত্ম লর্ড রিপনের শাসনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐক্যমত্য হইয়া সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা সমন্ধে বিলাতে ষ্টেট সেক্রেরারীর নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন পাঠকবর্গ বোধ হয় সেকথা এখনও ভুলিয়া যান নাই। যে তুমুল আন্দোলনে সমগ্রভারতভূমী আন্দোলিত হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সভাসমিতি সংগঠিত করিয়া ভারতবাসী যেরূপ সকরুণস্বরে স্বীয় রাজার নিকট মনোব্যথা বিবৃতি করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই তুমুল আন্দোলনের প্রতি স্টেট সেক্রেটারী কিম্বার্লি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। দুঃখী প্রজার আর্তনাদে রাজার মন বিচলিত হইল না। ভারতবাসী, কৃপা নয়, অনুগ্রহ নয়, ন্যায্য প্রাপ্য হইতেও বঞ্চিত হইল। British born প্রজার ন্যায় তাঁহার কোনও স্বতন্ত্র ও বিশেষসত্ত্বের প্রার্থনা করিয়াছিলেন না, ভারতেশ্বরীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ প্রজাদিগের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে এইমাত্র তাঁহাদিগের বিনীত প্রার্থনা ছিল। সত্য বটে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার সমুদয় প্রজাকেই সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার সমভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন সুকৌশলে আবার আইনটি সুরক্ষিত হইয়াছে যে প্রকৃত পক্ষে এদেশীয়দিগকে উক্ত অধিকার হইতে একরূপ বঞ্চিত করা হইয়াছে। "উনিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে কোনও ব্যক্তি আর উক্ত পরীক্ষাদানে সমর্থ হন না।" আইনের মধ্যে এই রূপভাবে বয়সের একটা নিয়ম সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহারা সিবিলসার্ব্বিস দ্বারা অর্গল দ্বারা এমনভাবে রুদ্ধ করিয়াছেন, যে কি সাধ্য দুর্ব্বল ভারতবাসী ঐ দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। আইন প্রণেতাগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া, সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া কোনও ভারত

শিশু ১৫/১৬ বৎসরের সময় স্বদেশ ছাড়িয়া ইংলন্ডে যাইতে সমর্থ হইবেন না, তবেই কৃষ্ণবর্ণ ভারতবাসীকে প্রকৃতপক্ষে শ্বেতাঙ্গ দিব্য পুরুষের তুল্য অধিকার দেওয়া হইল না। তাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার বয়সের নিয়মটি আইন মধ্যে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নতুবা কি সেই সুচতুর ইংরেজ বুঝেন না, যে একটী বিজাতীয় জাতির ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা কি ভয়ানক অধর্ম্মের কার্য্য? ইংরাজ একথা বেশ জানেন, কিন্তু স্বজাতীয় স্বার্থ তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই উনিশ বৎসরের পরিবর্ত্তে একুশ বৎসর সন্নিবেশিত করিবার জন্য দুটী বৎসর বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতবাসী এত আন্দোলন, এত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। একথাও সর্ব্বধারারণে একরূপ চারিত যে ভারত গবর্ণমেন্ট যখন ভারতবাসীর আবেদন পত্র সকল স্টেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন মহাত্ম লর্ড রিপন ভারতবাসীর এই ন্যায্য প্রার্থনাতে সম্যক সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক এতৎসমন্ধে এক তীব্র মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তখন মনে বড় আশা হইয়াছিল, বড় ভরসা হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, এতদিনে বুঝিবা ভারতবাসীর একটা গুরুতর অভাব দূরীভূত হইল। কিন্তু আজ আমাদিগের সকল আশা, সকল ভরসা ফুরাইয়া গেল। পাঠক আমাদিগের আবেদনপত্রের প্রত্যুত্তরে স্টেট সেক্রেটারী কি লিখিয়াছিলেন, তাহা একবার তাঁহার ভাষাতেই আপনাদিগকে অবগত করাইতেছি --

"After giving his fullest attention to the whole subject to which these representations refer. Her majesty's secretary of state has found himself unable to accede to them. but has expressed a hope that the mode of advancing [ অস্পষ্ট ] of India to employment the public service, provided by parliament in 1870 may be so used as to do full justice to their claims. It should, at the same time be explained to the memorialist that the arrangement for the admission of [ অস্পষ্ট ] of India to the public service under the Act of 1870. will receive early and careful consideration from the Governor General in council.

ইহার তাৎপর্য এই যে, স্টেট সেক্রেটারী সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে তিনি কোনও মতেই আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন না। তবে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এদেশীয়দিগকে উচ্চতর কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য যে সমুদায় প্রস্তাব পার্লিয়ামেন্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ করিবেন। এবং একথাও আবেদনকারিগণকে সুস্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে যে, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর ও পার্লিয়ামেন্টের ঐ প্রস্তাব অনুসারে ভারতবাসীদিগকে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে শীঘ্রই বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

পাঠক ! এখন দেখুন আমরা কি চাহিলাম আর কি পাইলাম। আমরা সিবিলসার্ব্বিসের দ্বারমুক্ত করিতে প্রার্থনা করিলাম স্টেট সেক্রেটারী সে দ্বার যেমন অর্গলাবদ্ধ তেমনই রাখিয়া ছেলে ভুলানর মত, আমাদিগকে আর একটী কথা বলিয়া একটু প্রবোধিত করিয়া দিলেন। এখন হইতে হয়ত নেটিব সিবিলসার্ব্বিসের দ্বার অপেক্ষাকৃত মুক্ত হইবে, কিন্তু নেটিব সিবিলসার্ব্বিস যে কি পদার্থ তাহা তো আমরা বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করি, কোনও নেটিব সিভিলিয়ান কি কোনও জেলার মাজিস্ট্রেট হইবার জন্য এক দিন ভরেও আশা করিতে

পারেন। সকলই যে ফাঁকি এটী আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ষ্টেট সেক্রেটারীর উত্তরে আমাদিগের অধিকতর বিস্ময়ের কারণ এই যে, গ্লাডষ্টোন[১২৩] সাত বৎসর পূর্ব্বে পার্লিয়ামেন্টে স্পষ্ট করে বলিয়াছিলেন যেন ভারতবাসীর এ প্রার্থনা অতি যুক্তিপূর্ণ আজ তাহারই গবর্ণমেন্ট, তাহারই সেক্রেটারী সেই [অস্পষ্ট] সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। আর আমরা যাহাকে বিশ্বাস করিব? এ লজ্জার কথা কাহাকে বলিব? ধন্য ইংরাজ! ধন্য তোমার অপূর্ব নীতি!!

১১ জুলাই, ১৮৮৫

## সংবাদাবলী

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১২৪] হাইকোর্টের জজিয়তি গ্রহণ করায় বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ পদ এবং মৌলবি আবদুল জব্বার ও বাবু কালীনাথ মিত্রের সময় অচিরে পূর্ণ হইলে যে দুইটি পদ খালি হইবে, তাহাতে গবর্ণমেন্ট কাকে কাকে নিযুক্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে কথা বার্ত্তা চলিয়াছে। ন্যাসন সম্পাদক বারিষ্টার নগেন্দ্র বাবুর বন্ধু কটন সাহেব নগেন্দ্র বাবুকে একটি পদ দেওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন. কিন্তু কলিকাতার সহযোগীদের নিকট শুনিলাম, ব্যবস্থাপক সভায় বসিবার উপযুক্ত গুণ নগেন্দ্র বাবুর খুব কম। তিনি দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না, বক্তৃতা করিবার তেমন ক্ষমতা রাখেন না. ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমাদের সুযোগ্য সহযোগী নববিভাকর[১২৫] সাধারণী[১২৬] একটি সৎপ্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এতদিন ব্যবস্থাপক সমাজে যে সকল দেশীয় লোক নিয়াছেন, তাহা অধিকাংশই কলিকাতার কি তৎনিকটবর্ত্তী স্থানের। ভিন্ন স্থল হইতে দুই একটা রাজ রাজড়া ধরিয়া আনিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ব্যবস্থাপক সমাজের উপকার হয় নাই। মফস্বলের অভিজ্ঞতা মফস্বলবাসীদিগেরই অধিক। বস্তুতঃ মফস্বলের অবস্থাভিজ্ঞ যে সকল ব্যক্তির ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়ার গুণ গ্রাম আছে, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এই ঢাকাতে বাবু কালীপ্রসন ঘোষ ও বাবু আনন্দচন্দ্র রায়ের অপেক্ষা বিদ্যা বৃদ্ধিও প্রতিভাশালী লোক ব্যবস্থাপক সমাজে অতিকম বসিয়াছেন। অতএব আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি, মফস্বলের অভিজ্ঞতার জন্য, পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী ঢাকার অনুরোধে বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ অথবা বাবু আনন্দচন্দ্র রায়কে ব্যবস্থাপক সমাজের একটী সভ্য পদ প্রদান করেন।

১ ডিসেম্বর, ১৮৮৮

## গবর্ণমেন্ট ও দেশের মত

যখন রাম রাজ্য ছিল, ক্ষুদ্র অযোদ্ধ্যা রাজ্যমাত্র রাজার শাসনাধীন ছিল, রাজা রাম রাজ্যের প্রধান পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপে রাজ্যের অবস্থা সহজেই জ্ঞাত হইতে পারিতেন, সামান্য একটা রজক রাজার অখ্যাতি ঘোষণা করিবার কালে রাজা স্বয়ংই তাহা শুনিতে পাইতেন, তখনও গুপ্তচর দ্বারা প্রজার মনোগত জানিবার বিধান ছিল। এখন অযোদ্ধ্যার শতগুণ বিশাল সাম্রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীন। গবর্ণমেন্টের প্রধান পুরুষেরা বিদেশীয়, প্রজার মনোগত ও রীতিনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। প্রজার রীতিনীতি যাহা রাজপুরুষদিগের স্বজাতীয়েরা পূর্ব্বের সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা বহুপ্রকারে অসম্পন্ন, অথচ উহা দেখিয়াই রাজপুরুষেরা

এদেশীয় বিভিন্ন প্রদেশবাসী বিভিন্ন জাতির রীতিনীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়াই এদেশীয় উপরে আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা প্রচার করেন। এতদ্বারা কত যে অত্যাচার অবিচার হয়, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। ভাগ্যে ইহার অধিকাংশ প্রজা হিন্দু, হিন্দু রাজাকে সর্ব্ব দেবতার স্বরূপ স্বয়ং ভগবানের ন্যায় সম্মান করে, এই হেতু সমস্ত অত্যাচার ইহারা সহ্য করিতেছে, সেই হেতু গবর্ণমেন্টের প্রতিকূলে প্রজাসাধারণ কদাপি মস্তকোত্তোলন করে না। কিন্তু এ কাল বুঝি আর অধিক দিন থাকে না। গবর্ণমেন্ট এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খৃষ্টানী প্রচার দ্বারা এদেশবাসীর ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট করিতেছেন, যে শিক্ষা ও ধর্ম্মের জন্য ইউরোপে নাস্তিক সাম্যবাদী, নিহিলিষ্ট, কেনিয়ান প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া প্রদেশীয় স্বজাতীয় রাজা ও ভ্রাতৃগণ বক্ষে ছুরি বসাইতেছে, সেই শিক্ষা ও ধর্ম্ম বহু বিস্তৃত হইলে এদেশে এ পরাধীন জাতি অতি সত্বরে যে ঐরূপ করিবে, তাহা দুরদর্শীদিগের ভাববার বিষয়।

বড় দুঃখের বিষয়, বৈদেশিক রাজ পুরুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্য এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও নিজেদের সংস্কার অনুসারে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও মত প্রচার করিয়া সেই প্রচার কার্য্যের সুবিধার্থ এদেশীয়ের স্বাভাবিক অধিকার সমস্ত দিন দিন অপহরণ করিত। যাহারা ঐ শিক্ষা ও ধর্ম্মলাভ করিতেছে, তাহাদিগকে অর্পণ করিতেছেন। দেশের লোক এখন দেশের স্বাভাবিক ভাষা শিখিয়া রাজ কার্য্য পায় না, ওকালতি মোক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় পর্য্যন্ত করিতে পারেনা। কোমদ্দমা মামলা করিতে সকলেই বাধ্য, কিন্তু মোকদ্দমা করিতে গেলেই তাহাদিগকে ইংরাজী শিখিয়া লইতে হইবে, নিজে না শিখিলে বহু অর্থ ব্যয় অন্য ইংরাজী নবীশের খোশামোদী করিতে হইবে। কেননা, হাকিম ইংরাজী ভিন্ন বুঝেন না, যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশীয়া ভাষা বুঝেন, তথাপি তাঁহারা সাক্ষীর জবানবন্দী লইবেন ইংরাজীতে, রায় লিখিবেন ইংরাজিতে, উকিল মোক্তারের বক্তৃতা শুনিবেন ইংরাজিতে, সমস্ত কাজ করিবেন ইংরাজীতে। কিন্তু জবানবন্দীর কালে সাক্ষী বলে এক, ইংরাজীতে তাহার তখনই তরজমা করিতে অসমর্থ হইয়া লিখেন তাহার বিপরীত। ভাষা বৈচিত্রে সাক্ষীর মনের ভাব অধিক স্থলেই ঠিক থাকে না। সত্য বটে, সাক্ষিকে জবানবন্দী পড়িয়া শুনাইবার নিয়ম আছে, কিন্তু হাকিমের লিপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস হাজারে একজন সাক্ষীর ও হয় না, তবে মোকদ্দমায় উভয় পাশে ইংরেজি নবীশ উকিল থাকেন, তাঁহারা কতকটা সংশোধন করিয়া দেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজেই যখন সেই সময়ে তাড়াতাড়ি ভাবোদ্ধার করিতে অসমর্থ, তখন প্রকৃত পক্ষে সংশোধন হইয়া উঠে না, এই হেতু অধিকাংশ মোকদ্দমায় সাক্ষীর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কথায় নির্ভর করিয়া বিচার হয়।

নিজে ইংরাজী না জানিলে শুধু উকিলের উপর নির্ভর করা অনেক ন্যায়পরায়ণ পথভ্রষ্ট হন, এরূপ উকিলও নিতান্ত বিরল নহে। উকিল অনেক অসদ্ব্যবহার দ্বারা যে জেল পর্য্যন্ত খাটিয়া থাকেন, তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন অথচ মোকদ্দমা করিতে গেলে এইরূপ উকিলের উপরে নির্ভর করিতেই হইবে। উকিল মোকদ্দমার ছওয়াল জবাব প্রভৃতি হাকিমদিগের অনুরোধে ইংরাজীতেই করিয়া থাকেন, এই সুযোগে তিনি ইচ্ছা করিলেই বিপক্ষের অর্থে ভুলিয়া স্বপক্ষের প্রয়োজনীয় কথা গোপন করত বিপক্ষের জয় ও স্বপক্ষের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। মোকদ্দমাকারী ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাহার উকিল তাহার কথা বলিতেছে। কি অহিতের কথা বলিতেছে বুঝিতে পারে না। অথবা উকিল ন্যায়পরায়ণ হইলেও ভ্রমে

অনেক প্রয়োজনীয় কথা ছাড়িয়া যাইতে পারেন, যাহার মোকদ্দমা সে ইংরাজী না জানাবশত উকিল কোন বিষয় ছাড়িয়া গেলেন, তাহা যে উকিলকে স্মরণ করাইয়া দিতে না পারিয়া মোকদ্দমায় পরাজিত হয়।

উকিলেরা দেশের লোক হইলেও সর্ব্বদা ইংরাজীতে লিপ্ত থাকেন বশতঃ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই বড় অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা কতদূর, তাহার একটা প্রমাণ এস্থলে দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম। গবর্ণমেন্ট যাঁহাকে খুব যোগ্য মনে করেন ময়মনসিংহের গবর্ণমেন্ট উকিল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি একটি খুনী মোকদ্দমাতে ছওয়াল জবাব করিতেছিলেন। সাক্ষীর জবান বন্দীতে প্রকাশ ছিল যে কৃষকেরা ধানের গাছ কাঁচি দিয়া কাটিবার কালে ঐ খুন হয়। গবর্ণমেন্টের উকিলের কাছে ঐ কথা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। ধানের গাছ, তাহাও কাঁচি দিয়া কাটা যায়। কাঁচি অতিশয় পাতলা অস্ত্র, পক্ষান্তরে যে গাছের ধান খাইয়া দেশ শুদ্ধ লোকের জীবন রক্ষা হয়, সে গাছ অবশ্যই অতি প্রকাণ্ড, এতবড় গাছও কি পাতলা কাঁচিতে কাটা যায়? সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় সাক্ষীর জবানবন্দী মিথ্যা হইল। এইরূপ অভিজ্ঞতাশালী উকিলগণ যদি সত্য ঘটনাকে মিথ্যা করিতে বসেন, আর মোকদ্দমাকারীরা উকিল কি বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সংশোধন করিতে না পারে, তবে বিচারের যে বিপরীত ফল ফলিবে, তাহাত নিশ্চয় কথা। বস্তুতঃ এই সকল কারণে মাজিষ্ট্রেটরা যে সকল ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করিয়া দওরায় সোফর্দ্দ করেন, তাহার অধিকেই খালাস হয়। অধিক স্থলেই যে খুন করে, সে শাস্তি পায় না, সে নিজে সাক্ষী হইয়া অথবা নিজের লোককে মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া নিজের অপরাধ অন্য যে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতিকূলে সপ্রমান করে, নিরপরাধে সেই ব্যক্তির ফাঁসি হয়।

বস্তুতঃ গবর্ণমেন্টের ইংরাজী অনুরাগে এদেশে ভয়ানক অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে, অবিচারের চূড়ান্ত হইতেছে। নির্দ্দোষ লোকের ফাঁসি হইতেছে, খুনীরা অব্যাহতি পাইতেছে। এই হেতু দেশে খুন ডাকাতি, প্রভৃতি ভয়ানক অপরাধ প্রায়শঃ হইতেছে। জজ মাজিষ্ট্রেটেরা অধিকেই দেশীয় ভাষা বুঝেন না, এবং সাক্ষীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারেন না, এই হেতুই সুবিচার হয় না, প্রকৃত অপরাধীর দণ্ড হয় না, অধিক স্থলে দণ্ড হয় নিরপরাধের। গবর্ণমেন্ট যদি ভারতের ২৮ কোটি লোককেই ইংরেজী শিখাইতে পারিতেন, তবে এইরূপ অবিচার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহা হওয়া যখন অসম্ভব, দেড়শত বৎসরের চেষ্টাতেও যখন হাজারে একজন লোককে ইংরেজী শিখান ঘটে নাই, তখন সুশাসন ও সুবিচার করিতে হইলে রাজপুরুষদিগকেই দেশীয় ভাষা ভালরূপ শিখিতে হইবে ; দেশীয় ভাষায় বিচার কার্য্যাদি চালাইতে হইবে, ইংরাজীর পক্ষপাত দূর করিতে হইবে, ঊর্ধ্বতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট লিখা ব্যতীত অপর সমস্ত কাজ দেশীয় ভাষায় করিতে হইবে। এরূপ না করিলে, ইংরাজীর প্রতি পক্ষপাত দেখাইলে এদেশের পক্ষে যে ভয়ানক অত্যাচার করা হইবে, তাহা কখনই গবর্ণমেন্টের পক্ষে হিতজনক নহে। হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাবান হিন্দু প্রজা মরিলেও তাঁহার অনিষ্ট করিবে না বটে, কিন্তু তাঁহার এই ইংরাজী ও খৃষ্টানী পক্ষপাতে যে জীবনসমূহের সৃষ্টি হইতেছে, ইহাদের দ্বারা একদা তাঁহার ও এদেশের ভয়ানক পরিণাম উপস্থিত হইবে।

২৫ আগস্ট, ১৮৯৫

## খ. রাজনৈতিক মনোভঙ্গি

[ সম্পাদকীয় ]

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারী সর ষ্টেফোর্ড নর্থকোট গতবর্ষে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান বিষয়ে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় অর্পণ করিয়াছিলেন। নানা কারণে গত বর্ষে সেই বিলের লিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইতে পারে নাই। বর্তমান ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অব আর্গিল এবার সেইবিলের পুনরুত্থান করিয়াছেন, অল্প দিন হইল হাউস অব লর্ড সভায় উক্ত বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবিত বিলে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টকে স্বতন্ত্র গবর্ণমেন্ট করিবার (বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের পদে বোম্বাই বা মান্দ্রাজের গবর্ণরের ন্যায় একজন স্বাধীন গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলাকে স্বতন্ত্র রাজ্য করিবার) যে প্রসঙ্গ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কেবল আইন বহির্ভূত প্রদেশে গবর্ণর জেনেরেলের ক্ষমতা আরো বর্দ্ধিত করার গবর্ণমেন্টের প্রধান ২ কার্য্যগুলিতে শুদ্ধ ইউরোপীয়দিগের একচেটিয়া অধিকার না থাকিয়া তাহাতে এতদ্দেশীয়দিগকেও অধিকার প্রধান করার যে প্রস্তাব ছিল তদ্বিষয়েই অনেক বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরেলের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাবে অনেকেই অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে। আইন বহির্ভূত প্রদেশসমূহে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে যথেচ্ছ রূপে আইনের ন্যায়বলবৎ নিয়মবিধান করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইবে। আর যে যে প্রদেশে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর আছেন, সেই ২ প্রদেশসম্বন্ধে তত্তৎস্থানীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর যদি কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরল ব্যবস্থাপক সভার মতামতপেক্ষা না করিয়াই তাহা আইনবৎ প্রচালিত করিতে পারিবেন। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ সম্বন্ধেও এই প্রকার হইবে। প্রথমোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ কেহ বিশেষত ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারি লাড্‌ক্রানবোর্ন স্পষ্টক্ষরে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়দের সাধারণতঃ নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী ও আইন কানুনের জটিল ব্যবস্থা ভাল বাসেনা, অতএব ক্রমে ২ সর্ব্বত্র আইন বহির্ভূত প্রণালী প্রবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য! আমরা এতদিন বিবেচনা করিতাম কে পঞ্চাবী রাজপুরুষদিগেরই এই প্রকার মত। কিন্তু এক্ষণ ইংলন্ডের প্রধান ২ লোকেরও এইরূপ মত জানিয়া চমৎকৃত হইলাম। যাহা হউক বোধ হয় এতদুভয়ের মধ্যে সবিশেষ তারতম্য আছে, একের যথেচ্ছাচার ও সর্ব্বকুশ প্রভুত্ব প্রকাশ বাসনা এবং অপরের ভ্রান্তিমূলক প্রজাহিতৈষনা ঐরূপ মতপ্রসব করিতেছে। যে কারণেই হউক উল্লিখিত মতানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হইলে এদেশ সম্বন্ধে অশেষ অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। বিরক্তির আইনের বাহুল্য এদেশীয়েরা ভাল বোধ করেন না সত্য, কিন্তু প্রয়োজনীয় অভীষ্ট-সাধক সরল ব্যবস্থাসমূহকেও ইহারা ভাল বোধ করেন না, একথা সত্য নহে। প্রত্যুত এতদ্দেশীয়দিগের অধিকাংশ লোকে আইন বহির্ভূত প্রণালীকেই যমস্বরূপবোধ করিয়া থাকেন। অতএব গবর্ণর জেনেরেলের ক্ষমতাবৃদ্ধিনিবন্ধন নিয়মান্তর্গত প্রদেশসমূহে ক্রমে ক্রমে নিয়ম বহির্ভূত প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হয়, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ডিউক অব আর্গল উদার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা কতদূর অনুসৃত হইবে বলা যায় না। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের সুদৃঢ়রূপে সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, অধিকাংশ রাজপুরুষের এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা নাই, এদেশীয়েরা রাজকীয় উচ্চ ২ পদে লব্ধাধিকার হয়। মুখে অনেকেই ইহাদিগকে উচ্চ উচ্চ

অধিকার দিতে সম্মত, কিন্তু কার্য্য কালে তাঁহাদিগের গূঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই নিমিত্তই এই অঙ্গীকার, এই তর্কবিতর্ক এবং এত আলোচনাতেও এতদ্দেশীয়েরা সিবিল সার্ব্বিসে কার্য্যতঃ প্রবেশাধিকার পাইতেছেন না। যাহা হউক সম্প্রতি ডিউক অব আর্গিল যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তদদ্বারা অন্ততঃ ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চ ২ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সার্ব্বিস কার্য্যে নিয়োগ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের যেরূপ কর্ত্তব্য ও অঙ্গীকার, এ পর্য্যন্ত তাহা প্রতিপালিত হয় নাই। ১৮৩৩ সনের পার্লিয়ামেন্টের আইনে লিখিত আছে, উপযুক্ত হইলে কোন জাতির, কোন বর্ণের বা কোন স্থানের লোকই উচ্চ ২ পদ লাভে বঞ্চিত হইবে না। তৎপরেও এই বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইয়াছে। ১৮৫৩ সালে যখন কোম্পানির সনদ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন পার্লিয়ামেন্টের তৎকালীন মেম্বর লর্ড মন্টিগল বলিয়াছিলেন, ভারবর্ষীয়াদিগকে ইংলন্ডে আসিয়া সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিতে হইবে এই নিয়ম বিধান করা, আর তাহাদিগের সম্বন্ধে সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করা প্রায় তুল্য। ইহার পরও এই বিষয়ে অনেক নূতন নূতন প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু এপর্যন্ত তাঁহার একটিতেও বাসনানুরূপ ফল প্রসব করে নাই। গতবর্ষে সরজন লরেন্স এতৎসম্বন্ধে এক নূতন নিয়ম করিয়াছেন। প্রতি বর্ষে ৯ জন ভারতবর্ষীয়কে ইংলন্ডে আসিয়া সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বৃত্তিপ্রদান করা হইয়াছে। যে দেশে ১৮ কোটি লোকের অধিবাস্ত সেই দেশের ৯টি মাত্র ব্যক্তিকে প্রতিবর্ষে সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশের উপায় করিয়া দিলে কি হইতে পারে? অতএব তিনি বিবেচনা করেন, উপযুক্ত ভারতবর্ষীয়দিগকে বিনা পরীক্ষায় কি ভারতবর্ষেই কোন এক প্রকার পরীক্ষা লইয়া সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশাধিকার দিবার ক্ষমতা গবর্ণর জেনেরলকে দিলে ভাল হয়। তাঁহার মতে সিবিল সার্ব্বিস কর্য্যে ইংলন্ডীয় অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়, অতএব সর্ব্বস্থানীয় লোকেরই ইংলন্ডে যাইয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার যে বিধান আছে, তাহার বিবেচনায় তাহার অন্যথা করা শ্রেয়স্করময়। কিন্তু তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবের সামঞ্জস্য করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের এমন অনেক কার্য্য সিবিলিয়ানদিগের অধিকারে রহিয়াছে, যাহাতে ইংলন্ডীয় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মাত্র নাই, অতএব গবর্ণর জেনেরলকে তত্তৎপদে লোক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দিলে কোন হানি নাই।

ডিউক অব আর্গিলের উপরি উক্ত প্রস্তাব শুনিতে এক প্রকার মন্দ শুনায় না বটে, কিন্তু আমাদিগের নিকটে উহা ততদূর সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমাদিগের বিবেচনায় যতদিন না ভারতবর্ষীয়দিগের সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা ভারতবর্ষে গৃহীত হইবে, ততদিন সম্যক অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প। ইহাদিগের সম্বন্ধে স্বদেশে পরীক্ষা দানের বিধান করিয়া উচ্চ উচ্চ পদাধিকার দানের যাহা কিছু প্রস্তাব হউক না কেন, তাহাই আমাদিগের অন্তঃকরণে বালপ্রবোধনার্থভানবৎ বঞ্চনার কৌশল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্যও আমাদিগের মনে বিশ্বাস হইতেছে না, উল্লিখিত প্রস্তাব অবধারিত হইলেও কোন ফল লক্ষিত হইবে। গবর্ণর জেনেরল নির্ব্বাচন প্রণালী দ্বারা ভারবর্ষীয়দিগকে সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পাইলেই কি তিনি সেই ক্ষমতার ব্যবহার করিতে সমুৎসুক হইবেন? অথবা সমুৎসক হইলেই কি যথাযোগ্যরূপে তাহার প্রয়োগ করিতে পারিবেন? ইতঃপূর্ব্বে সর জন লরেন্স প্রস্তাব করিয়াছিলেন নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের শাসনাদি

কার্য্যে এতদ্দেশীয়দিগকে বাহুল্যরূপে নিযুক্ত করা হইবে কৈ কার্য্যকালে তাহার কিছুইই লক্ষিত হইল না? প্রস্তাবিত নিয়ম সংস্থাপিত হইলেও কার্য্যত সেইরূপ হইবে না, কে বলিতে পারেন? তদ্রূপ না হইলেও কথিত নিয়মানুসারে যাহাদিগকে সিবিল সার্ব্বিস কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের কার্য্যের সহিত গবর্ণর জেনেরলের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যেকে উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত কাহাকে নিযুক্ত করিলে পদোচিত কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, কাহাকে নিযুক্ত করিলে হইবে না, গবর্ণর জেনেরল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা অবগত হইতে পারিবেন না। নিম্নস্থ রাজকার্য্যকারকেরা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যখন যেরূপ অভিপ্রায় করিবেন, গবর্ণর জেনেরলকে তদনুসারী হইয়াই উল্লিখিত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। এ নিয়মে যত উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত হইয়া কার্য্যে নিয়োজিত হন, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ সম্বন্ধে আমরা তাহা অনেক দর্শন করিয়াছি। অনেক অযোগ্য চাটুকার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও কমিস্যনরদিগের তোসামোদ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট লাভ করিয়াছেন। সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে নির্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলেও ঠিক এইরূপ অবস্থা হইবে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রত্যুত তখন অনেক অনুপযুক্ত অদক্ষ লোককে নিয়োজিত করিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ভারতবর্ষীয়েরা সিবিল সার্ব্বিসের ন্যায় উচ্চতর পদে নিয়োযিত হইবার অভিজ্ঞ যোগ্যতা লাভ করে নাই। বাস্তবিক যদি, সরল ইচ্ছা লাভ থাকে, কর্তৃপক্ষ অনায়াসে এদেশে সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াই এতদ্দেশীয়দিগের চিরাভীষ্ট সুসিদ্ধ করিতে পারেন। তাহা না করিলে কিছুতেই বাসনানুরূপ ফল দর্শিবে না বলা বাহুল্য।

২৫ এপ্রিল, ১৮৬৯

## হিন্দু ন্যাশনালিটি

যখন বঙ্গভূমির ভাবী সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা পটে উদিত হয় যখনই ইহার বিশুদ্ধ নীতি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যায়। তখন মনোমধ্যে যুগপৎ আশা ও নিরাশা, আনন্দ এবং নিরানন্দ উপস্থাপিত হইতে থাকে। যখন দেখি যে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দেব পূজকেরা ক্রমেই ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতা প্রকাশ করিয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান সহিষ্ণু হইয়া আসিতেছেন। নির্ম্মল বিদ্যালোকে শত ২ কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে। তখন আশা হয় যে অল্পকাল মধ্যে বাহ্যড়ম্বর জীবন শূন্য উপধর্ম্ম এবং অপবিত্র দেশাচার অন্তর্হিত হইয়া জন সমাজ শান্তির এবং সভ্যতার আলয় হইবে। পরম পবিত্র যুক্তিযুক্ত মুক্তিপ্রদ এক ঈশ্বরের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে পিতৃভাব, মনুষ্যের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব এই সুসমাচার বিস্তারিত করিবে। স্বদেশজাত বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি সামাজিক আচার ব্যবহার অমিশ্রভাবে সাময়িক সভ্যতার উপযোগী হইয়া স্বদেশীয় ধর্ম্ম সমাজ সংস্থাপন করিবে। বিদেশীয় এবং বঙ্গবাসীদিগের শরীর মনের অনুপযোগী, কোন প্রকার সামাজিক কি ধর্ম্ম বিষয়ক আহারাদি কি পরিচ্ছদ বিষয়ক রীতিনীতি ব্যবহার গৃহীত এবং দেশ জাত স্বভাবোৎপন্ন ব্যতিত কোন প্রকার আচরণ আদৃত না হইয়া সর্ব্বতোভাবে উদার সার্ব্বভৌমিক অথচ দেশীয় সকল প্রকারভার সংস্থাপিত হইবে কিন্তু যখন ইহার বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন এককালে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। সুশিক্ষিত যুবকদল যাহাদের উপর উল্লিখিতকার্য্যভারও সকল

প্রকার আশা অবস্থিত করিতেছে যাহাদের উপর দুঃখিনী বঙ্গভূমির ভাবী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে তাঁহারা প্রকৃত দেশের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কতগুলি বিদেশীয় সভ্যতার আস্বাদ পাইয়াছেন এবং আপনি শোলাটুপি মাথায় দিয়া সাহেব সাজিতেছেন, স্ত্রীকে গাউন পরাইয়া বিবি সাজাইতেছেন। এই সকল অস্বাভাবিক ব্যাপার নিতান্ত কদাকার হইলেও তজ্জন্য বিদেশীয় সভ্য রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও তিরস্কৃত মনে কিছুমাত্র অপমান বা লজ্জা বোধ হয় না এ সকল ঐরূপ অনুকরণ করিতে গিয়া এক প্রকার অদ্ভুত জন্তুর ন্যায় আপনাদিগকে প্রদর্শন করে। ইহারা দেশীয় ভাবকে এককালে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় রীতিনীতির অনুকরণ করত ভিন্ন জাতির ন্যায় হইয়া যাইতেছে। এই শোচনীয় জীবদিগের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। আজকাল সাহেবী রোগগ্রস্ত কোন২ ব্রাহ্ম ও সস্ত্রীক হইয়া এ দলে প্রবেশ করিতেছেন। এদিকে যেমন এই মহাপুরুষেরা স্বদেশের ও স্বজাতীয় ভ্রাতাদিগের উন্নতির প্রতিমনোযোগ না করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইতেছেন। সেইরূপ দেশজাত স্বাভাবিক ধরিতা নম্রতা দয়াশীলতা প্রভৃতি গুণকে বিকৃত করিয়া ডিন্যাশনালাইজড হইয়া যাইতেছেন। অপর দিকে আবার তেমনি কতকগুলি ন্যাশনাল জীব ন্যাশনালিটির রক্ষা করার ভান করিয়া তাহার মধ্যে দুর্বলতা কপটতা ভীরুতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীচ কামনা লুক্কায়িত করত উন্নতির পথে কন্টকপ্রদান কবিতেছেন। ইহাদিগকে সহসা কেহ ধরিতে ছুঁইতে পারেনা কেননা ইহারা হিন্দু রিফরমার সর্ব্বদা ন্যাশনালিটীকে রক্ষা করিবার জন্য বক্তৃতা দান সংবাদ পত্র প্রকাশ প্রভৃতি তদ্বিষয়ক বাহ্যাড়ম্বর অনেক করিয়া থাকেন। দেশের আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে রক্ষা করিবার জন্য ইহাদের অনেক যত্ন কেবল এইটুকু মাত্র ক্রটি এই যে নিজেরা সেই প্রকার আচরণ করেন না। বরং তাহার বিপরীত আচরণেই অতি ব্যাকুল এবং অগ্রসর। এই সকল বিষয়ে হাসি পায় দুঃখ ধরে। কি করি যখন দেখি এই সকল মানুষেরা পরমপিতার সন্তান, আমাদের ভ্রাতা, তখন ভ্রাতৃভাবে কিছু না বলিয়া সরল মিষ্ট ভর্ৎসনা কিছু না করিয়াও থাকিতে পারিনা। আবার এ সকল বিষয় প্রকাশ্য পত্রিকাদিতে লিখিতে গেলেও কঠোর হইয়া উঠে ভাবও ঠিক রাখা যায় না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে বাধ্য হইয়া কিছু না বলিলেও চলেনা। দেখা যাউক কিছু উপকার এবং একবার চৈতন্যোদয় হয় কিনা আমরা পূর্বোক্ত বিদেশীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ প্রিয় যে যুবকদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের দ্বারা তত অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিতেছিনা কেননা তাহারা যাহা কিছু করে সরলভাবে স্বাধীনতা ও নির্ভয়ের সহিত করিয়া থাকে। কিন্তু শেষোক্ত মহাত্মাদিগের দ্বারা এক্ষণে বিশেষ উন্নতির ব্যাঘাত দেখিতে পাই। ইহাদের অবলম্বিত কার্য্যটি কেবল কপটতা ও ভীরুতার শব্দান্তর কিম্বা রূপান্তর মাত্র। ইহারা বিপদে পড়িয়া ন্যাশনালিটি.উপাসক হইয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের এবং নিজের স্বাভাবিক মনের গতি তাহার বিপবীত দিকে। সুতরাং যত সকল কার্য্যে পরিণত বড় হইতে পারেনা। আমি যদি অৰ্দ্ধগোপনে মুরগীর ঝোল খাইয়া অন্তে একটি ভগবতীপায় করিয়া বাহিরে লোকের নিকট বেদ পাঠ করি, মহা নির্ব্বানের গম্ভীর অর্থযুক্ত মনোহর সংস্কৃত অনর্গল উচ্চারণ করি তবে কেন আমাকে লোকে অমিশ্র হিন্দু বলিবে। যাহাদের সম্মুখে চাল ছড়াইয়া দিলে উদর হইতে পালে পালে মুরগী বাহির হইয়া পড়ে যাহাদের পাচক মুসলমান, তাহারা কেমন করিয়া কোনমুখে লজ্জার মাথা খাইয়া বলিবে, আমার উচ্চকুলোদ্ভব কুলীন ব্রাহ্মণ। আমরা ন্যাশনাল প্রণালীতে সকল কার্য্য করিয়া থাকি। যাহাদের একটুকু মাত্র বিবেচনা আছে। চক্ষের পাতা আছে তাহার কখন এরূপ

বিপরীত অসংলগ্ন কথা বলিতে পারেনা। কোন প্রকার উপদেশ দ্বারা যে ইহারা চেতন হইবে কিংবা এই সকল দোষ সংশোধন করিবে তাহা কোথায়? বরং বন্ধুভাবে ইহা বলিতে গেলে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইবে। এ সকল অসম্ভব ভাব তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গ করা উচিত। জগতের লোকে ইহা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে বর্ত্তমান কালের উন্নতি ও সভ্যতার সঙ্গে অবিরোধ সম্বন্ধ। তবে ন্যাশনালিটির কি কেবল বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহাদি বহু দোষের আকার। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ ও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা দেওয়া প্রভৃতি সাধু কার্য্যের প্রতিকুলাচরণ। তবে আমি তোমাদের ন্যাশনালিটি দেখিয়া পরাস্ত হইলাম। আজকাল এই প্রকার চতুরতা বড় কার্যকারিণী হইবে না। লোকের বুদ্ধি বিদ্যা ও বিবেচনাশক্তি ক্রমশ উন্নত হইতেছে। এখন লোকে সরলতা অন্বেষণ করে, বাক্যে কার্য্যে সামঞ্জস্য দেখিতে চায়। জাত্যাভিমান করা অথচ তাহার পূর্ব্ব পরম্পরাগত আচার ব্যবহারের বিপরীত পথে চলা, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক হওয়া অথচ কপটতা করা লোকের চক্ষে বিষবৎ প্রতীয়মান হয় বিশেষত বর্ত্তমান সভ্যতার সময়ে ইহা বড় বিড়ম্বনার বিষয়। ইহা সকলের নিশ্চয়ই জানা কর্ত্তব্য যে দুই দিক রক্ষা করা যাইবে না সময়ের উপযোগী হিন্দু ন্যাশনালিটি যদি কেহ রক্ষা করিতে চাও তবে এস, বীরের ন্যায় কটিবন্ধন করিয়া অনাথা বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখী হও মহান অনিষ্টকারণ দেশাচারের ও জাতিভেদের বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সকল বর্ণকে এক বর্ণ করত কেবল সাহেব হইও না যেমন বাঙ্গালীর সন্তান ছিলে তেমনি থাক। এই ঈশ্বরকে সহায় করিয়া সকল প্রকার উন্নতির কার্য্যে অগ্রসর হও। ধার্ম্মিককে উচ্চলোকে বলিয়া জ্ঞানকর দুর্ব্বল জ্ঞানহীন মানুষদিকে স্নেহ করিয়া তাহাদের মনুষত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের অপহৃত স্বাধীনতা তাহাদের হস্তে দাও। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অনুসারে কিছু কিছু করিয়া অস্তিত্ব বুঝিতে দাও, তাহাদের পরিচ্ছদ পরিবর্তন কর-মদ্য পান-বিষয়ে উৎসাহ না দিতে কৃতসংকল্প হও। ইহাও ন্যাশনালিটি। এই সকল করিলে পিতা-পিতামহের নাম থাকুক না থাকুক স্বর্গস্থ পিতার নাম থাকিবে। হে দুঃখিনী বঙ্গমাতার স্নেহের ধন। নির্ভরের স্থান সকল একবার চাহিয়া দেখ। আর গোলযোগ করিয়া সময় নষ্ট করিও না। বিশুদ্ধ পবিত্র বাঙ্গালী হইয়া যাহাতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন হয় পৃথিবীতে একটি জাতি বলিয়া যাহাতে পরিগণিত হইতে পার তাহাই কর। এক্ষণে চারিদিকে অনুকূল হইয়াছে সকলে কিঞ্চিত যত্ন করিলেই সেই ফলদাতা পরমেশ্বর সাধু কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন।

## রাজকুমারের আগমন

রাজকুমার আগমন করিবেন, এই নিমিত্ত মহানগরী কলিকাতায় মহাহুলুস্থূল উপস্থিত হইয়াছে। কি করিয়া তাঁহার সমাধান করা হইবে, এই নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছেন, আপাতত অবধারিত হইয়াছে, আলোকদান, বাজিপোড়ান এবং ভোজ ও উপহার দানাদি দ্বারা ডিউকের সম্মাননা করা হইবে। মহাড়ম্বর সহকারে ঐ সকল বিষয়ের উদ্যোগ হইতেছে। কলিকাতার প্রধান ২ ব্যক্তিরা ডিউককে উপহার দিবার নিমিত্ত বহুমূল্য বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। এতনিবন্ধন কাহারো বাটি হাজার, কাহারো সত্তর হাজার এবং কাহারো ২ বা লক্ষ টাকা ও ব্যয় হইতে পারে। বাজি পোড়ান ও আলোকদানেও অল্প ব্যয়িত হইবে না। কেবল সাধারণ প্রজামণ্ডলীয় নয়, গবর্ণমেন্ট ও ডিউকের সম্মানার্থ প্রায় ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়

করিবেন অবধারিত হইয়াছে। কলিকাতায় গবর্ণমেন্টের যতগুলি নিজের অথবা ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে, তাহার সমুদয়গুলিই গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে আলোকিত হইবে। ২০ দিন অগ্রেই সেই সকল বাটীতে শিশি ঝুলাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে।

রাজকুমারের সম্মানার্থ যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়, ইহা কাহারো অনভিমত নহে। কিন্তু আজি কালি রাজকোষের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কেবল বাহ্য আমোদ প্রমোদে তাহার অর্থবৃথা ব্যয়িত হইয়া যায়; ইহা অনেকের [অস্পষ্ট] এতদ্দেশীয়গণও অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে প্রভূত পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া রাজকুমারের অভ্যর্থনা মনে করেন, ইহাও অনেকের অভি প্রেত নহে। অনেকেরই মত এই, রাজকুমারের সম্মানার্থে নিতান্ত যাহা না করিলে নয়, রাজকোষের অর্থ দ্বারা এমন কয়েকটী বাহ্য কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা হয়। ওদিকে অসচ্ছ লতানিবন্ধন ইন্‌কামটেক্স বৃদ্ধি করা হইতেছে এদিকে রাজকোষের অর্থগুলিকে বৃথা ২ ব্যয় করা হইবে, ইহা যার পরনাই অবিবেচনা সন্দেহ নাই। দেশীয় প্রধানদিগেরও উচিত নয় যে, তাহারা অন্যবিধ অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়া রাজকুমারের ক্ষণিক সন্তোষ বিধানার্থ প্রভূত অর্থ ব্যয় দ্বারা উপহার প্রদান করেন। আজিও এদেশের নানাস্থানে সর্ব্বনাশক দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে—অন্নাভাবে শত শত লোক অকালে কালকবলিত হইতেছে। অনেক স্থান মহামারীগ্রস্ত হইয়াছে বিষম ক্লেশ অনুভব করিতেছে। সেই সেই স্থানের অনেক দরিদ্র প্রজা, সমুচিত ঔষধ পথ্যাদির অভাবে অসময়ে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অনেক স্থানে এরূপ জল কষ্ট রহিয়াছে যে, তত্রত্য সর্ব্বসাধারণেই বিশুদ্ধ জলের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত হাহাকার করিতেছে। পরস্পর অনেক স্থান এখন পর্যন্ত এরূপ অজ্ঞানতাচ্ছন্ন রহিয়াছে যে তথায় আজি পর্যন্ত বিদ্যালোকে লব্ধ প্রবেশই হয় নাই। রাজকুমারকে উপহার দান অপেক্ষা কি এই সকল অভাবের নিরাকরণ করা অধিক গুরুতর নয়? যাঁহারা রাজকুমারের প্রকৃত অভ্যর্থনা করিতে চান, তাঁহারা রাজকুমারের অভ্যর্থনার নাম দিয়া উল্লিখিত অভাবের কোন একটীর মোচন করিলে কি তাহাদিগের অভীষ্ট অধিকতর সুন্দর রূপেই সম্পাদিত হইতে পারে না? আমাদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস এই, আলোকদান, বাজিপোড়ান এবং উপহার প্রদান অপেক্ষা এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানেই রাজকুমারের সমধিক আহ্লাদ হইবে। আমাদিগের মহারাজ্ঞীও এইরূপ অভ্যর্থার সংবাদ শুনিলে সবিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

উপসংহারকালে এতদ্দেশীয় ভিন্ন ২ প্রদেশের সাধারণ ব্যক্তিদিগের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই, তাঁহারা রাজকুমারকে মনি মুক্তা ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদির পরিবর্ত্তে আর একটি উপহার দিতে যত্নশীল হউন। এদেশের যে সকল কষ্ট ও অনিষ্ট এদেশের গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বিদূরিত হইতেছেনা, গবর্ণমেন্ট যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যথোচিত মনোযোগ বিধান করিতেছেনা, সেই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া "এদেশের অবস্থা পত্র" স্বরূপে রাজকুমারকে উপহার দান করুন। ভরসা করি রাজকুমারের নিকটে এবং ইংলন্ডীয় প্রধান ২ নিরপেক্ষ সদাশয় লোকের নিকটে অন্যান্য উপহার অপেক্ষা ঐরূপ উপহার অধিকতর আদরের বস্তু হইবে।

২৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৯

**সম্পাদকীয়**

কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি হইবে। এক কেম্বল[১২৭] সাহেব বঙ্গ দেশকে যে রূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, যদি ইহার ন্যায় আর দুই একটি কর্ম্মচারী আগমন করেন তবে দুই দিনেই ইংলন্ড গবর্ণমেন্টকে বিধবাদিগের অধীশ্বর হইল। যদি কর্ত্তৃপক্ষের একান্তই ইচ্ছা হয় যে, বঙ্গবাসীরা নিপাতে যাউক, তাহা হইলে শানিত খড়গের সহয়তা লইয়া নির্দ্দোষী বঙ্গবাসীদিগকে নিপাত করুন। তাহাও ভাল, তথাপি যেমন কেম্বল সাহেবের যে কুটিল চক্রে আমরা আস্তে আস্তে নিপাতের দিকে যাইতেছি যে চক্রে ঘুরিয়া যাতনা সহ্য না করি। ওহাবীদিগের চক্রান্তে নর্ম্মান ও লর্ড মেও হত হইলেন, আর মুসলমানদিগের উন্নতি ও শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের সবিশেষ যত্ন হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে দেশীয়েরা যথোচিত রাজ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াও উচ্চ শিক্ষার রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে চলিল। ইহা দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে কি সিদ্ধান্ত হইবে। জুরি দ্বারা যে শাসনের বিচার নির্ব্বাহিত হইত, তাহা উঠিয়া যাইতেছে। এক্ষণাবধি জজ স্বেচ্ছামত কার্য্য করিবেন। সরাসরি বিচারে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা যে ক্রন্দন করিয়াছিলাম, কেহই শুনিলনা ছিটকেন সাহেব শীঘ্র বাড়ী যাইবেন সুতরাং অতি তাড়াতাড়ি কেম্বল সাহেবের কুটিল বুদ্ধির সহায়তায় আমাদের মাথা খাইয়া ফৌজাদারী মোকদ্দমার ৩ দিন ৩ মাস মেয়াদ এবং ২০০ শত টাকার অনুধিক দন্ডের পুনর্ব্বিচার রহিত ও একরূপ বিনা কারাবদ্ধ করিবার ক্ষমতা মাজিস্ট্রেটকে প্রদান করিয়া গেলেন। কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ! হায়! কি স্বেচ্ছারিতা! পাঠক শেসনের অবিচারের যে প্রতিবন্ধকটুকু ছিল তাহা গেল, উচ্চ শিক্ষার মস্তকে কুঠারাঘাত করা হইল। টেক্সের যন্ত্রণার ত অন্তই নাই, তাহার পর আর কুচক্রী কেম্বল সাহেব রচিত মিউনিসিপল বিল বিধিবদ্ধ হইতে উন্মুখ হইয়াছে। এখনও এত কষ্ট সহ্য করিয়া এরূপ অরাজক রাজ্যে বাস করা কেমন সুখের হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ! ইংরেজ রাজ্য নিপাত যাউক, আমাদের এরূপ ইচ্ছা নয়। তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও আমাদের বল নাই, আর আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞ নই, যে ইংরেজ জাতি দ্বারা এপর্যন্ত আমাদের এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগের অমঙ্গল কামনা করিব ; কিন্তু কেম্বল সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস হইবার যে পথ প্রদর্শিত হইতেছে তাহা দেখিয়াই, আমরা ভীত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে সাবধান করিতেছি। প্রায় ১১৫ বৎসর হইল ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। এই কাল মধ্যে ভারতবর্ষে সময়ে ২ যে রাজ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার কারণ কি? তাহাতে কি সুসভ্য বাঙ্গালী জাতির সংস্পর্শে ছিল? কখনই নহে অশিক্ষিত জাতির অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতাতেই যদি উক্ত বিদ্রোহের উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে আর কেন এদেশ হইতে উচ্চশিক্ষা উঠাইয়া নেওয়া হইতেছে? কেম্বল সাহেবের কোনরূপ দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে। তাহা না হইলে এই শান্তির সময় দেশশুদ্ধ লোককে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিবার প্রয়োজন কি আছে? দেশীয়েরা যাহা চায়না, যাহা হইলে সর্ব্বনাশ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, কেম্বল সাহেব শত বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও তাহা করিয়া বসেন। বঙ্গদেশীয়েরা কি এমনিই গণ্ড মূর্খ যে তাহাদের কথায় কেম্বল সাহেব কর্ণপাতও করিবেন না? কেম্বলের ন্যায় এক গুয়ে লোক আমরা আর একটিও দেখিনা। দেশশুদ্ধ লোকের আর্ত্তনাদে পাষাণ ও দ্রবীভূত হয় কিন্তু তাহা কেম্বলের হৃদয়ে প্রবেশাধিকারও পাইতেছেনা। কেম্বল সাহেবের এতাদৃশ অনুচিত ঔদাসীন্যে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। উচ্চ

শিক্ষার পথ বন্ধ হইলে দেশীয়েরা মূর্খ হইবে। মূর্খের দিগ্বিদিক বোধ নাই। আমরা সমাধান করি, কেম্বল সাহেব যেন আর বেশী বাড়াবাড়ী না করে। এটুকু দোষ ধরা উচিত। এ কাল পর্য্যন্ত প্রজাগণ সন্তুষ্ট চিত্তে রাজ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আসিতেছিল। কিন্তু একজন রাজপুরুষের অত্যাচারে আর যাতনা সহ্য করিতে পারিতেছেনা। কোম্পানীয় রাজত্বে প্রজারা সুখে ছিল। এক্ষণ আর সুখ নাই। করের যাতনায় প্রতিঘরের আবাল বৃদ্ধা বনিতাগণ ক্রন্দন করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ কেন ঐ সকল দেখিতেছেন না? এক জন "বদমেজাজ" লোক দ্বারা দেশ উৎসন্ন হইতে চলিল। তথাপি কি ইংরেজ গবর্ণমেন্টের চৈতন্য হইবে না। যদি রাজ্যে শান্তি স্থাপন এবং ইংরেজ রাজনীতির যশোরাশি নিষ্কলঙ্ক রাখিতে ইচ্ছা থাকে তবে শীঘ্র কেম্বল সাহেবকে স্থানান্তরিত করা হউক। দেশীয়েরা আর কতকাল এইরূপ অসহ্য যাতনা সহ্য করিবে।

২৮ এপ্রিল, ১৮৭২

## নূতন গবর্ণর জেনারেল

প্রবল ঝটিকা ও বিদ্যুৎপাত সহকৃত বারিবর্ষণের পর প্রকৃতি যেমন স্বভাবতই প্রচণ্ডালোক অংশুমালী দর্শনোৎসুক হয়, লর্ড মেয়োর ঝটিকাময় শাসনের পর এবং কেম্বলের বিদ্যুৎপাত সহকৃত ভয়ঙ্কর শাসনের মধ্যে বঙ্গবাসিগণ সহস্র রশ্মি নর্থবুকের পানেতে মন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। লর্ড মেয়ো উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রস্তাব করিয়া, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিজ্ঞার–মস্তকে পদাঘাত করিয়া, রথ্যাকার, শিক্ষাকর স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া বঙ্গদেশে যে ভয়ঙ্কর ঝড় প্রবাহিত করাইয়া গিয়াছেন, কেম্বল সেই ঝটিকার মধ্যেই চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন। কালেজাদি উঠাইয়া দিয়া কেম্বল কেবল দেশীয় সুশিক্ষিতদিগকে চমকিত করেন নাই, রথ্যাকার, মিউনিসিপাল বিল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সঙ্ঘটন করিয়া জমীদার ও প্রজা প্রভৃতি সকলেরই প্লীহা চমকিত করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে দীনা হীনা বঙ্গভূমির দৃষ্টি নর্থব্রুকের দিকে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু নর্থব্রুক কতদূর পর্যন্ত বঙ্গভূমির দূরবস্থামোচন করিতে সক্ষম হইবেন ইহাই এখন সকলের জিজ্ঞাস্য। ইনি ইংলন্ড পরিত্যাগ কালে বন্ধুবান্ধব কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের নিকট বারম্বার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে প্রাণ শীতল হয়, বোধ হয় যেন বঙ্গদেশের দূরবস্থা আর থাকিবে না। বাস্তবিকও তিনি যদি মহারাণীর ঘোষণাপত্র অবলম্বন করিয়া বর্ণাভেদে প্রজা সাধারণের মতের অনুকরণ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন, তবে তাহার শাসন কাল মহাত্মা কর্ণওয়ালিশ ও বেন্টিঙ্কের অধিকার কালের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ফলতঃ তাঁহার গুনবত্তা ক্ষমতা প্রকাশ ও সহজে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার এই উত্তম সময়। কিন্তু আমাদিগের বড় সন্দেহ হইতেছে। ইংলন্ডে তিনি যাহা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিয়া যে তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, তাহার বিশ্বাস কি? বিজ্ঞানবিত লোকের ন্যায় আমরা তাহার ব্যক্তিগত একত্বের প্রতি সন্দেহ করিতেছি না, কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ এক নহে। ইংলন্ড শীতপ্রধান দেশ, সেখানে কিছু তরল থাকিতে পারেনা, জমাট হইয়া যায়। ইংলন্ডে থাকিবার সময় দেশের প্রকৃত্যনুসারে ব্রুকের বুদ্ধি, মতি ও চিন্তা প্রভৃতি ঘন ও গাঢ় ছিল, এখন তিনি গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন; সুতরাং দেশের উত্তাপে তাহার ঘন বুদ্ধি, মতি চিন্তগুলি যে তরল হইয়া না

উঠিবে তাহা কে বলিতে পারে? সত্য বটে তিনি শীতল শিলাময় শিমলা পর্ব্বতে যাইতেছেন, কিন্তু উহা পঞ্জাবের অতি নিকটবর্ত্তী। তখন তাঁহাকে পঞ্জাবের উষ্ণ ও দূষিত বায়ু সেবন করিতে হইবে। তবেই প্রতুল। যাহা হউক যদি তাঁহার শাসনকর্ত্তৃত্বানুরূপ দৃঢ়তা এবং বিবেকশক্তির পক্কতা থাকে, তবে আর আমাদের ভয়ের বিষয় নাই। ভরসা এই, ঈশ্বর তাহাকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিবেন। উপসংহারকালে পূর্ব্ববর্তী প্রতিনিধি গবর্ণর নেপিয়ারের শাসন সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইনি কেবল ৩ মাস ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে অধিরূঢ় ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি একজন ক্ষমতাশালী এবং হিতৈষী শাসনকর্তা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। কয়েকদিন যখন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় চিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগকে অপরাধী ইউরোপীয়দের বিচার ক্ষমতা দেওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন করা হয়, তখন ইনি দেশীদের পক্ষে যে উদার মত ব্যক্ত করেন তাহাতে তাহার অপক্ষপাতিতা, বহুদর্শিতা এবং ন্যায়পরতার সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে? ইহার অধিকারকালে সভ্য বিবাহ বিধি, সাক্ষ্য বিধান ইত্যাদি কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যদি ব্যবস্থাপক মন্ত্রী ষ্টিফেন সাহেব তাঁহার শাসনকালে জুরির বিচার উঠাইয়া না দিতেন, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের পরিবর্তন করিয়া ম্যজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেশীয়দিগকে তাঁহাদের আজ্ঞাধীন দাস না করিতেন, তবে নেপিয়ারের এই স্বল্প সময়ব্যাপী শাসনকাল একেবারে নিষ্কলঙ্ক থাকিত।

১২ মে, ১৮৭২

**এক্ষণকার অবস্থা**

কোনো বিষয়ই চিরকাল অধোগতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোনো বিষয় ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইলে শেষে আর অধিকতর অধোগতি প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া পরে। তখন আপনা হইতেই বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ সংশোধন হইয়া যায়। ১৮৫৭ সনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজশাসন প্রণালী ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল; ডেলহাউসী এক এক দেশ করিয়া ইংরাজাধিকার ভূক্ত করিয়াছিলেন; তদ্বারা সেই সকল দেশের লোকের মনে কি প্রকার বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় রাজগণের সহিত সংস্থাপিত পূর্ব্ব সন্ধি অকারণ অমান্য করাতে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের প্রতি সেই সকল রাজগণের ও সাধারণ ভারতবর্ষীয় লোকের কি প্রকার অবিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি তিনি বড় দৃষ্টি করিতেন না। ভারতবর্ষে রাজ্য শাসন কার্য্যে ইংরেজরা এদেশীয় লোকের অভিপ্রায়ে অধিক অপেক্ষা না করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। তদ্বারা এদশীয় লোকের মনে কি প্রকার অসন্তুষ্টি উপস্থিত হইয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। ক্রমে এই রূপে ভারতবর্ষে রাজকার্য্য বিশৃঙ্খলা জন্মিয়া যখন আর অধিকতর অপকৃষ্টতা লাভের সম্ভাবনা রহিল না, তখন ১৮৫৭ সনের ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের রাজ্যশাসন প্রণালী এককালে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই ঘটনার গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের অধিকার ইংরেজ শাসনভুক্ত না করিয়া তাঁহাদিগের মনে ইংরেজদিগের প্রতি ভক্তি, সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা সঞ্চারের সর্ব্বপ্রকার উপায় করিয়াছিলেন, সেই সকল রাজাদিগের সম্মান বর্দ্ধনার্থ মহারাণী নূতন উপাধি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসন কার্য্যে অধিকতর মনোযোগের সহিত সম্পাদিত হইবে, এই ভরসা করিয়া ইংলন্ডীয়

মহাসভা এদেশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে লইয়া মহারাণীর অধীন করেন। এদেশের রাজকার্য্য এদেশীয় লোকের সহায়তা গ্রহণ মানসে ব্যবস্থাপক কৌন্সিল ও প্রধানতম বিচারালয়ে এদেশীয় লোক বিদ্রোহের পর পূর্ব্বের অপকৃষ্ট শাসন পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়া অভিনব উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এতবন্ধন সেই অবধি দেশ মধ্যে শান্তির ভাব বিরাজ করিতেছিল। ১৮৫৭ সনের গোলযোগের পরেই যে যে নিয়ম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার পর দেশ মধ্যে বিশেষ কেনো প্রকার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হয় নাই। তখন দেশ সমস্ত বিষয়ে প্রগাঢ় শান্তি ও নিঃশব্দতার আধার হইয়াছিল।

পরিদোলকের ন্যায় সকল দেশই শান্তি ও বিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান হইয়া থাকে। এদেশ একবার সীমায় যাইয়া শান্তির দিকে এমন বেগে দোদুল্যমান হইয়াছিল, যে দেশ আর বিপ্লবও গোলযোগের অভিমুখে অগ্রসর হইবে, এমন কিছুই আকার দেখা যাইত না এরূপ অবস্থা অতিশয় সুখকর। সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকাল এরূপ শান্তি ও বিশ্রাম ভোগ করা যাইতে পারে। সেই শান্তিও তখন প্রায় অসন্তোষজনক হইয়া উঠে। তখন কোনো প্রকার পরিবর্তন, উন্নতি অথবা কোনো প্রধান রাজপুরুষের কোনো আশ্চর্য্য কার্য নিতান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই শান্তির সময়ে গবর্ণর জেনারেল সিমলা পর্ব্বতে গমন, কখন বা বাঁশের সাঁকোতে, বা বায়ূপূর্ণ স্ফীত চর্ম্মের উপর চড়িয়া পর্ব্বত গহ্বর ও নদী প্রস্রবন পার হইতেন। কখনো বা চা বাগিচা পর্যবেক্ষণ ও পার্ব্বতীয় অসভ্য রাজগণ লইয়া দরবারে সময় কর্ত্তন করিতেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর প্রায়ই ট্রাবেলিং করিয়া ফিরিতেন। আসর বুঝিয়া সাধারণের সুখ্যাতি লাভার্থে দুই একটি কার্য করিয়া অভিনন্দনের যোগার করিতেন। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর হেড কেরানীর উপর সমুদয় ভার দিয়া দারজিলিঙে যাইয়া বিশ্রাম করিতেন। হাইকোর্ট, পব্লিক ওয়ার্ক এবং রেবিনিউ বিভাগে তখন কিছুই ছিল না। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তৎকালে ভারতবর্ষীয় রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়েই প্রগাঢ় বিশ্রাম ও নিষ্কর্ম্মভাব অবলম্বন করিয়াছিল। কোথায়ও কোনো নূতন কথা শুনা যাইত না। কোথাও কোনো বিষয়ে পরিবর্তন হইত না। কোথা হইতেও সম্পাদকেরা পাঠক বন্ধুকে আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারিতেন না। পরিদোলক শান্তির সীমায় পদার্পণ করিল। আর শান্তি নাই, ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে চারিটি নর শোনিতপায়ী রাক্ষস, এমন সময় স্বীয় কুটিলচক্রী সহচরগণ সমভিব্যাহারে উদয় হইল। তাহাদিগের চক্রে দেশ ক্রমেই উচ্ছন্ন হইতে চলিল। ভারতবর্ষীয়দিগের উপর নানা প্রকার কর এবং কঠোর বিধানাদি প্রবর্ত্তিত হইল। পরে তাহার শাখা প্রশাখা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধারণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। লোকে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারানীর অধীনে সুখে থাকিবে মনে ভাবিয়াছিল। এই স্বেচ্ছাচারী রাক্ষসগুলি কোম্পানীর শাসনকে ভাল বলাইল, ইংরেজ গবর্ণমেন্টের প্রতি প্রজার মনের ভাব বিক্ষত করিয়া উঠাইল। এই সময়ে পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা দৃষ্ট হইল। সুচতুর গবর্ণমেন্টের কার্য্যদক্ষতায় তাহা বিদূরিত হইল। ক্রমে কতকগুলি শাসনকর্তার পরিবর্তন ও পদত্যাগ এবং নূতন নূতন রাজপুরুযের ভারতবর্ষের স্কন্ধে অবতরণ হইল। ইহাদিগের মধ্যে কোনো কোনো রাজপুরুষের অপরিণামদর্শিতা হেতু দেশ বিশেষে লোকের উপর মহান অত্যাচার আরম্ভ হইল। এই সকল রাজপুরুষদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দেশীয়েরা মূর্খ হউক, উচ্চশিক্ষা রহিত হউক, দেশী(য়ে)রা কর দেউক, তাহারা লম্বা লম্বা বেতন পাইয়া বেল বিডিয়ার বাটিতে সুখে অবস্থান করুন।

রাজপুরুষদিগের পক্ষপাত এবং স্বেচ্ছাচারিতায় দেশ সুদ্ধ লোক উৎপীড়িত হইতে লাগিল ক্রমেই রাজশাসন অপকৃষ্ট হইয়া আসিল, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তৎপ্রতিবিধানে কিছুই মনোযোগী হইলেন না। অন্যায় পীড়নে পীড়িত হইয়া প্রজার মনে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই বিদ্বেষের পরিণামে কি সর্ব্বনাশই ঘটিল। শতযুদ্ধে ও শতবিপ্লবে যাহার মৃত্যু অসম্ভাবনীয় ছিল, জঘন্য ওয়াহাবীদিগের কুটিলচক্রে আমাদিগের সেই প্রধানতম রাজপুরুষ লর্ড মেও ও চিফজাষ্টিস নরম্যান নিহত হইলেন। ইংরেজ রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষের অদৃষ্টে যাহা হইয়াছিল না এবং যাহা হইবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবা যায় নাই, তাহাই ঘটিল। ইহা হইতে ভারতবর্ষের দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে। দেশ শুদ্ধও লোক কাঁপিয়া উঠিল, সকলে অস্থির হইল, লেডিমেওর আর্ত্তনাদ প্রজা [অস্পষ্ট] পরিবারে প্রবেশ করিল। নানাপ্রকার কষ্টে এবং উদ্বেগে প্রজারা দিন যাপন করিতে লাগিল, চিরকাল সমান যায়না। সকলেই আবার শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। লর্ড নর্থব্রুক প্রজার মঙ্গল সংকলন করিয়া আগমন করিয়াছেন, তিনিও শান্তি বুঝিয়া সিমলা যাইতেছেন। জর্জ ক্যাম্বেল ও অস্থির বুদ্ধি স্থির হইয়া আসিতেছে। শিক্ষা বিভাগের আর গোল নাই। এইরূপ সকল বিভাগই শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্পাদকেরাও পূর্ব্বের ন্যায় বিস্ময়কর বিষয় লিখিয়া পাঠকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বিষয় না বলিয়া উপসংহারে আমাদের এই প্রার্থনা যে সকল অশান্তিকর কার্য্যে এদেশীয়দিগকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সেই কার্য্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় বঙ্গবাসীদিগকে শান্তির আশ্বাস দিউন এবং প্রজার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

৯জুন, ১৮৭২

### প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনার্থ ব্যয়

সংবাদপত্র পাঠে অবগতি হইল, প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষাগমনে যে ৬ লক্ষ ও সামগ্রিক কার্য্যে ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে, তাহা ভারতীয় রাজকোষ হইতে দেওয়া অবধারিত হইয়াছে। একতঃ ভারতবর্ষ অসচ্ছলতায় দরিদ্রতায়, ও ঋণদায়ে জর্জ্জরিত, নিতান্ত প্রয়োজনোপযোগি ব্যয় বিধানেও অসমর্থ, আবার যদি ইহার স্কন্ধে উল্লিখিত গুরুতর ভার নিক্ষেপ করা হয়, প্রিন্স অব ওয়েল্সের আগমন এদেশীয় প্রজাসাধারণের সুখের না হইয়া অসুখেরই কারণ হইবে। "রাজ্ঞীপুত্র এদেশীয় আসিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যাইবেন, উত্তর কালে তিনি রাজা হইলে, তাদ্দারা এদেশের ভূরি উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে"। অতএব ভাবিমঙ্গলের প্রত্যাশায় সংপ্রতি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ভারতবর্ষকে যুবরাজের যাতায়াত ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, যাহারা এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগের ইত্যাকার যুক্তি প্রদর্শনও আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, "গৃহাদি দাহ দ্বারা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেলে বায়ু বিশুদ্ধ হয়, তাহাতে জনগণের স্বাস্থ্যাদির অনেক হিত হইতে পারে, অতএব ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যোন্নতির আশ্বাসে আপাততঃ কষ্ট স্বীকার করিয়াও লোকের গৃহাদি পোড়াই ফেলা উচিত।" ফলতঃ গৃহাদি দাহের অগ্নিকাণ্ডে বায়ুর বিশুদ্ধি এবং তাহাতে লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির যেরূপ নিশ্চিত ; প্রিন্স অব ওয়েল্স এদেশে আসিলেই এদেশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত অবস্থাভিজ্ঞতা জন্মিবে, এবং তিনি রাজা [অস্পষ্ট] ইহার তত নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যুত এরূপও হইতে পারে, বাস্তবিক এদেশের যেরূপ অবস্থা রাজ্ঞীকুমার এদেশে আসিয়া

তাহার বিপরীত জ্ঞানই লাভ করিবেন,—তিনি হয়ত সামান্য বাহ্যদৃষ্টিদোষে অথবা অবস্থাজ্ঞাপকদিগের দূরভিসন্ধি কি ভ্রান্তিমূলক বিবৃতিতে এরূপ অযথা সংস্কার লইয়া যাইবেন, তাহাতে সুফল না হইয়া অফল হওয়ারই অধিকতর সম্ভাবনা। কে বলিতে পারেন, লর্ড নর্থব্রুক ঢাকার ক্ষণস্থায়ী বাহ্যশোভা দেখিয়া ঢাকাকে যেমন সম্পন্ন ও সুখী মনে করিয়া গিয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব আন্ডার সেক্রেটারি গ্রান্টডফ সাহেব এবং রেবেরেন্ড সমরভিল সাহেব ভারতবর্ষ হইতে যেরূপ উপহাস্যকর অযথা জ্ঞান লইয়া স্বদেশে গমন কবিয়াছেন, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সও সেইরূপ সংস্কারাপন্ন হইয়া যাইবেন না? শেযোক্ত ব্যক্তি (রেবেরেন্ড সমরভিল) ইংলন্ডে যাই একটী প্রকাশ্য সভায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "হিন্দুরা ইংরাজদিগকে ঘৃণা করে এবং সুবিধা পাইলে সেও ঘৃণা প্রকাশ করিতে ক্রুটি করে না।" ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের পর হিন্দুদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সেই ঘৃণা কার্য্যে প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু ইংরাজেরা তাহাদিগের হস্তের শিক্ষাগুরু আর এক নূতন অস্ত্র প্রদান করিতেছেন। রাজ্ঞীপুত্রেরও যখন এদেশ সম্বন্ধে ইত্যাকার বিপরীতি সংস্কার জন্মিবার ভূয়সী সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাহাতে ভারতবর্ষের গুরুতর অনিষ্টাশঙ্কাও আছে, তখন ভারতবর্ষের সেই অসচ্ছলতার সময়ে তাহার আগমনার্থ এত অর্থব্যয় স্বীকারের প্রয়োজন [অস্পষ্ট] "গাঙ্গ কাটিয়া কে কুমীর আনিয়া থাকে?" আমরা স্বীকার করি, আমাদিগের রাজ্ঞীপুত্রের আগমনে আমাদিগের সকলেরই হর্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহার চিত্ত বিনোদনার্থ সাধ্যানুরূপ যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় বিধানও অনুচিত নয়; কিন্তু দরিদ্র ভারতবর্ষের যখন অভাবের অবধি নাই, তখন ইহার প্রতি এত উৎপীড়ন কেন? আমরা পূর্ব্বেও (গত ২২ শে চৈত্রের ঢাকা প্রকাশে) বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ক্রমেই দীন ভাবাপন্ন হইতেছে,—ভিন্ন দেশীয়েরা ছলে বলে ও কৌশলে এদেশের সার শোষণ করিয়া লইতেছে,—এদেশের চিরপ্রচলিত ব্যবসায় সকল বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন হইযা পড়িয়াছে—রাজকোষের অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে, তন্নিবন্ধন প্রজাগণ করে করে উৎপীড়িত হইতেছে,—রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় উচ্চপদগুলি ভিন্ন দেশীয়েরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, ক্ষমতা সত্ত্বেও এদেশীয়েরা উহাতে বড় একটা লব্ধ প্রবেশা হইতে পারিতেছেনা ইত্যাদি। পরন্ত এতদ্দেশীয়দিগের প্রত্যেক বাড়ির তোরণদ্বারে কাষ্ঠ ফলকোপরি বড় বড় অক্ষরে হরিশ্চন্দ্র নাটকের নিম্নলিখিত গানটি লিখিয়া রাখাও অকর্ত্তব্য নয়—

রাগিনীভৈরবী—তাল-একতালা।
"[অস্পষ্ট] পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনুক্ষীণ।।
সে সাহসবীর্য্য নাহি আর্য্য ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে
লজ্জারাহুমুখে লীন। ১।

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল, কেহ না জানিল
এম্নি কৈল দৃষ্টি হীন। ২।

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য গ্রামে, যতছিল দেশে
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভূষি শেষে,
হায়গো রাজা কি কঠিন। ৩।

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশীবস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকে আর—
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন। ৪।

আ'জ যদি এরাজ্য ছাড়ে ভূঙ্গরাজ,
কলের বসনবিনা কিসে রবে লাজ
ধর্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকলটেনা ডোর কপিন। ৫।

ছুঁই সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে;
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে;
প্রদীপটী জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন। ৬।”

যখন এদেশের প্রকৃত অবস্থা এই—তখন কি ইহার অতিরিক্ত অর্থব্যয় বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন শোভা পায়? বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রিন্স অব ওয়েলসের যাতায়াতাদির ব্যয় ইংল্যণ্ডীয় গবর্ণমেন্টেরই প্রদান করা কর্ত্তব্য! যুবরাজ নিজ তহবিল হইতে এই ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে আরো ভাল হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক রাজ্ঞীপুত্রকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছেন, যদি ইহা যথার্থ হয়, তবে তাঁহারই নিজ হইতে এই ব্যয় বিধান করা উচিত। তিনি ইহাতে অসমর্থও নহেন।

১ আগস্ট, ১৮৭৫

## রাজনৈতিক আন্দোলন

আমরা ভূতলে সর্ব্বথা অতুল্য জীব। আমরা একদিকে ছাই—মাতৃভূমির বক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার কুনীতি, কুরীতি, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা ও অধীনতা দূরীভূত করি; অন্যদিকে চাই—নৃত্যগীতিবাদ্যাদি সর্ব্ববিধ বিনাসসম্ভোগ রজনীযাপন করিয়া দিবাভাগ নিদ্রার সম্মোহন অঙ্কেই অতিবাহন করি। আমরা এক দিকে চাই—পাঠশালা, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম ও পতিতাশ্রমস্থাপন করি, অন্যদিকে চাই—আমাদিগকে সমস্ত অর্থই সিন্ধুকে নিহিত রাখি; আমরা একদিকে চাই—বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করি; অ্যদিকে চাই—স্বয়ং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উক্ত পাপসমূহের অনুষ্ঠান করি—স্বীয় পরিবার হইতে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবাবিবাহাদি সুদূরে ফেলিয়া রাখি। আমরা একদিকে চাই স্বদেশীয়েরা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়পরায়ণ ও স্বাধীনচেতা হউক, অপরদিকে চাই—স্বয়ং বংশানুক্রমে ইংরাজের দাসত্ব করি; ইংরাজ দেখিলেই ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করি এবং নির্লজ্জভাবে স্তুতিগান করিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য ধ্বনিত করিতে থাকি। আমরা একদিকে চাই—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমাদিগের প্রতি যেরূপ

অন্যায়ব্যবহার করিতেছেন তাহার প্রতীকার বিধান করি—আমাদিগের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অধিকারগুলি লাভ করি ; অন্যদিকে চাই—রাজনৈতিক অধিকার লাভার্থ অক্লান্তপরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদির সহিত যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইতে সুদূরে অবস্থান করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করি। তাই বলিতেছি, আমরা ভূতলে সর্ব্বথা অতুল্যজীব। আমরা ইদানীং বহুলোকের মুখে শুনিতে পাই,—"টাউন হলে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে সংবাদপত্রে লিখিলে পার্লিয়ামেন্টে আবেদনপত্র পাঠাইলে অথবা ইংলন্ডে আন্দোলন করিলে কোনো ফলও হইবে না। যাহা হইবার নয়, তাহার নিমিত্ত অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করা বৃথা যদি। আমাদিগের দুঃখ দূর হইবার হইত ; তাহা হইলে এতদিনই আমরা বহুবিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম। কত আবেদনপত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরিত হইল—কত আবেদন মহাসভা পার্লিয়ামেন্টে উপস্থাপিত করা হইল, কই তাহার কোনো সুফলইত ফলিল না। তবে কেন অতঃপর আমরা আর সভাস্থাপন করিব—তবে কেন অতঃপর আমরা আর আবেদনপত্র লইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অথবা পার্লিয়ামেন্ট সমক্ষে উপনীত হইব?" অস্মদ্দেশীয় অনেক শিক্ষিত এবং রাজনীতিজ্ঞমন্য ব্যক্তির মুখেও উক্তরূপ নিরাশার বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ব্যক্তির সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। আমাদের বিশ্বাস এই যে, উহারা ভারতের ঘোরতর অনিষ্টকারী-বিকাশোন্মুখ নবোদ্যমত্ত উৎসাহের খরগতিরোধকারী। উহারা শিক্ষাভিমানী হইলেও অশিক্ষিত এবং আপনাদিগকে রাজনীতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মনে করিলেও তদ্বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ। কোন দেশে কোনকালে কোন জাতি একদিন দুদিনের চেষ্টায়—একবৎসর দুবৎসরের আন্দোলনে বিদেশীয় রাজা হইতে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। আমরাও পারি নাই; তাই বলিয়া কি নিরাশ হইয়া হস্তপদ সঙ্কোচনপূর্ব্বক নিষ্পন্দভাবে বসিয়া থাকিব? ইংলন্ডের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, ইংলন্ডীয় জনসাধারণ অবিচলিত অধ্যাবসায় সহকারে স্বদেশীয় রাজশক্তির সহিত সহস্রাধিক বর্ষকাল যুদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর আমরা কি চাহিয়া মাত্রই বিদেশীয় রাজশক্তির হস্ত হইতে সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইব। ...যে জাতি স্বদেশের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে, দৃঢ়তা ও অধ্যাবসায়াদি সহকারে শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া ক্লিষ্টভাবে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে জাতি রাজনৈতিক কোনরূপ স্বাধীনতা বা অধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত নহে। জ্ঞানের রাজ্যে উপনীত হইবার যেরূপ প্রশস্ত সরল বর্ত্ম নাই, রাজনীতির স্বাধীন রাজ্যে গমন করিবারও সেরূপ সরল, প্রশস্ত, নিষ্কন্টক ও ছায়াবিশিষ্ট পন্থা নাই। যদি সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করিতে পারে—অহোরাত্র কার্য্য করিতে পার—ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পার, তবে রাজনৈতিক উন্নতি চাহিও ; অন্যথা চাহিও না। ক্ষুদ্রস্বার্থ পরায়ণ অল্পপ্রাণ জাতি সে পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ভারতবাসীরাও যতদিন ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে না শিখিবে যতদিন মহাপ্রাণ হইয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের সুখকামনায় আপনারা অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ধরনীমণ্ডলে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক রাজ্যের এক অতি নিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেই থাকিবে। অতএব বলিতেছি, অর্থশূন্য নিরাশার বাক্য বলিয়া লোকের উদ্যম উৎসাহ ভঙ্গ করিও না—ভারতভূমিকে আরো দীর্ঘকাল দুঃখদুর্গতি পরম্পরায় নিমজ্জিত রাখিয়া ক্ষুদ্রতর স্বার্থসুখোপভোগের বাসনা করিও না। যে মনে প্রাণে কার্য্য করে, নিরাশা তাহার জন্য সৃষ্ট হয় নাই—অলসের জন্য হীন প্রাণের জন্যই নিরাশার সৃষ্টি হইয়াছে। যদি ভারতভূমিকে উদ্ধার করিতে চাও, কায়মনোবাক্যে কার্য্য করিতে

আরম্ভ কর, ভারতমাতার দুর্ব্বিষহ দুঃখভার বিদূরনে বদ্ধ পরিকর হও। রাজনৈতিক অধিকার চাওত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে রাজনীতিবিষয়ক উদার উচ্চমত প্রচার কর—ভারতবর্ষের প্রতিনগর হইতে ইংলন্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ কর এবং ঐ প্রতিনিধিকর্ত্তৃক আমাদিগের সর্ব্ববিষয়িনী দুঃখ দুর্গতি ইংলন্ডীয় মহামনা ব্যক্তিগণের গোচরীভূত করাইতে থাক—ইংলন্ডীয় জনসাধারণের মধ্যে আমাদিগের দুঃখদুর্দ্দশাজ্ঞাপিনী পুস্তিকা লক্ষ ২·খণ্ড বিতরণ কর। যদি ইহা করিতে পার, তবে দেখিতে পাইবে,—ক্রমে ২ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক হীনতা দূরীকৃত হইতে থাকিবে। ক্ষীণপ্রাণ ও ক্ষুদ্রস্বার্থপরায়ন হইলে এই গুরুতর উদ্দেশ্যে সংসিদ্ধ হইবে না—স্বয়ং রাজনৈতিক অধিকারপ্রাপ্তিজনিত সুখভোগেচ্ছু হইলে ২/৪ বৎসরের অধিককাল অক্ষুণ্নভাবে কার্য্যে করিতে পারিবে না। এই নিমিত্তই বলিতেছি,—যদি মানসক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের সুখ প্রত্যাশা করিয়া সুখী হইতে পার,—যদি জননী জন্মভূমির বক্ষোদেশ হইতে একটীমাত্র কণ্টক উত্তোলন করিয়াও আনন্দানুভব করিতে পার--যদি হিমাদ্রির ন্যায় অটলপ্রকৃতি. গঙ্গার স্রোতের ন্যায় অবিরাম শ্রমশীল হইতে পার, তবে ঈশ্বরের নাম লইয়া—মাতৃভূমির নাম স্মরণ করিয়া এবং আপনাকে বিস্মৃত হইয়া অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, দেখিবে একদিন না একদিন মাতৃভূমি জন্মভূমির দুঃখ দুর্গতি অপনীত হইবেই হইবে।

২৭ এপ্রিল, ১৮৭৯

## সম্পাদকীয়

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমাদের নূতন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলি সাহেব আগষ্ট মাসের প্রথমভাগেই পূর্ব্ববাঙ্গলায় আগমন করিতেছেন। এতদঞ্চলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণই না কি তাঁহার শুভাগমনের উদ্দেশ্যে। স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলির পূর্ব্বাঞ্চল—পদার্পণের শুদ্ধ উহাই অভিলাষ্য কিনা, জানিনা, তবে যিনিই যখন বাঙ্গলার লেপ্টেনেন্ট গবর্ণনের পদে নূতন বরিত হন, তিনিই তখন একবার শাসনাধীন প্রদেশের সমুদায় স্থান পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া থাকেন, এই চিরাচরিতরীতি দর্শনে বেলি সাহেবের পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যবেক্ষণ সংবাদে সন্দেহ হইতেছে না ; অধিকন্তু অত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটীর দীর্ঘনিদ্রার পর জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়া-সংস্করণ কার্য্যাদির আয়োজন দেখিয়া স্থিরবিশ্বাসই জন্মিতেছে।

বঙ্গদেশের নবপ্রভু ষ্টুয়ার্টবেলি পূর্ব্ববঙ্গে শুভাঁগমন করিতেছেন, আহ্লাদের বিষয়। তাঁহার যথোচিত সৎকারও অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু কথা হইতেছে, তদর্থ বৃথা বাহ্যাড়ম্বর ও নিরর্থক ব্যয়বিধান করিয়া দেশের প্রকৃত দুর্দ্দশা গোপনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য কি না?—দুই চারি দিন সহরকে দীপমালার আলোকে আলোকিত, পতাকাশ্রেণীতে বিভূষিত ও তূর্য্যস্বরের আমোদে আমোদিত রাখিয়া অধিবাসীগণকে স্বচ্ছল ও সুখী জানাইয়া দেশের অন্নাভাব কষ্ট, নিরন্নের হাহাকার, শীর্ণমূর্তি ও আসন্নমৃত্যুর শোচনীয় অবস্থা আচ্ছাদিত রাখা বিধেয় কিনা? আজিকালি দেশের যেরূপ ঘোরতর দুর্গতি উপস্থিত, তাহাতে আমরা এরূপ বাহ্যড়ম্বর ও আমোদ-প্রমোদে দরিদ্রপ্রজাবর্গদত্ত অর্থের বিনিয়োগ সঙ্গত মনে করিনা। রাজভক্তি প্রদর্শন কর্ত্তব্য, স্যরষ্টুয়ার্ট বেলির যথোচিত অভ্যর্থনা করা বিধেয় সত্য, কিন্তু বহুব্যয় সম্পাদ্য জাঁকজমকব্যতিরেকে কি তাহা নির্ব্বাহিত হইতে পারেনা? ভক্তিমান আঢ্য যোড়শোপচারে

দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন ; দীনহীন ভক্ত দুর্ব্বাতুলসী ও আতপতণ্ডুল দ্বারাই দেবসেবা করে ; ইহাতে কি দীনহীনের ভক্তিপ্রদর্শন হয় না? দেবতা, দরিদ্রের যৎসামান্য পূজোপকরণ অগ্রাহ্য করিয়া তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট ও বীতস্নেহ হন, পক্ষান্তরে ধনবানের যোড়শোপচারে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহপ্রদর্শন করেন, ইহা কি বিশ্বাস্য ও সম্ভাব্য? শস্যভান্ডার পূর্ব্ববাঙ্গলা পূর্ব্বে সম্পন্নাবস্থই ছিল,—ঢাকা নগরী ধন্যঢ্যগণেরই বসতি স্থান ছিল, কিন্তু এক্ষণ সেই পূর্ব্ব বাঙ্গলার—ঢাকা নগরীর সুখসম্পদের অবস্থা সুদূরগত হইয়াছে। এতদঞ্চল এখন পথের ভিখারী, অন্নচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত! সুতরাং ইহার দরিদ্রজনোচিত সৎকারে কি স্যর ষ্টুয়ার্টবেলি অসন্তুষ্ট ও বীতস্নেহ হইবেন? বোধ হয়না। তাই বলিতেছি, আজিকালি যে পূর্ব্ববাঙ্গলার—ঢাকার গৃহে গৃহে অন্নকষ্টের আহাকারধ্বনি বর্ত্তমান নিরুপায়লোক অর্থ সাহায্যভাবে ম্রিয়মান, সেই পূর্ব্ববঙ্গের—ঢাকার বৃথাব্যয়বিধানে প্রবৃত্ত হওয়া সময়োচিত সঙ্গত কার্য্য হইতেছে না। শুদ্ধ এই কারণেই কি বাহ্যড়ম্বরের বিরোধী? তাহা নহে। উহাতে রাজপুরুষগণের মনে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্তসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া অভাব অসুবিধাদি নিরসনের পথও একবারে বন্ধ হইয়া যায়। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর যখন ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন ঢাকা-বাসিগণ বাহ্যাড়ম্বরের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়াছিলেন,—দীপ, পতাকা ও আতসবাজিতে ঢাকা নগরীকে অপূর্ব্ব শ্রীশালিনী করিয়াছিলেন, জীর্ণতম অট্টালিকাদি সুধাধবলিত করিয়া শোভান্বিত করিয়াছিলেন, রাজভক্তি প্রদর্শনার্থ ক্ষমতাতিরিক্ত ব্যয়বিধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছিল? লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর এরূপ ভ্রান্ত সংস্কারপন্নই হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঢাকা সম্পন্ন জনগণের বসতিস্থান ; এতদধিবাসিগণ স্বচ্ছল ও সুখী। সুতরাং ঢাকার অভাব অসুবিধাদি দূরীকরণার্থ গবর্ণমেন্টের ব্যয়ভারবহন করা অনাবশ্যক, লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুরের অন্তঃকরণে এরূপ সংস্কারও বদ্ধমূল হইয়াছে, বলা বাহুল্য। ফলতঃ বৃথা জাঁকজমক প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বকীয় দূরবস্থাগোপন করিলে, পরিণামে বিষয় কষ্টই ঘটিয়া থাকে, অন্নাভাবে তনুত্যাগের উপক্রম হইলেও সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও আশা থাকে না। এতদঞ্চলের ইদানীন্তন শোচনীয়দশার অসহায় নিঃস্বলোকের প্রাণপ্রয়ান দশার প্রতি যে গবর্ণমেন্টের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইতেছেনা, রাজপুরুষগণের উক্তরূপ অযথাসংস্কারই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। এই নিমিত্ত আমরা ঢাকা মিউনিসিপালিটী ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন অন্নক্লিষ্ট ঢাকাকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলির দয়ালাভে বঞ্চিত না করেন। এস্থলে বেলি সাহেব মহোদয়ের নিকটেও আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, পূর্ব্ববাঙ্গলার যথার্থ অবস্থা পরিজ্ঞান যদি তাঁহার আগমণের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, তিনি যেন কেবল কয়েকটী মাত্র নগর দেখিয়াই ক্ষান্ত না হন, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বাক্যমাত্রেই যেন অবস্থা জ্ঞানের পরিসমাপ্তি না করেন। এবার এতদঞ্চলের যে ঘোরতর দুর্দ্দশা ও কষ্ট উপস্থিত, নগর দর্শনে তাহা উপলব্ধ হয় না, নগরবাসী চাকুরিয়া ও ব্যবসায়ীদিগকে কোট পেন্টুলনধারী, চিত্রবিচিত্রপরিচ্ছদ পরিহিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া সে দূরবস্থার অস্তিত্ব কল্পনা পথে উদিত হয়না ; গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া অনুসন্ধান করিলে—অনাহার শীর্ণ ব্যক্তিদিগের শুষ্কমুখশ্রী, কঙ্কালমাত্রাবিশিষ্ট দেহ ও কাতরোক্তি প্রভৃতি দর্শন শ্রবণ করিলেই ঐ শোচনীয়তা

অনুভূত হইতে পারে। অতএব স্যরষ্টুয়ার্ট বেলি সাহেব অন্ততঃ এতদঞ্চলের ২/৪ খানি গ্রাম বা ২/৪টী পল্লী পরিদর্শন অভ্রান্তসংস্কারাপন্ন হন—যথোচিত কর্ত্তব্য নির্ধারণ করেন, একান্ত প্রার্থনীয় হইতেছে।

৩ আগস্ট, ১৮৭৯

## লর্ড লিটনকে মুসলমানদের দেয়া সাহিত্য সমালোচনার পত্র

মুসলমানদের সাহিত্য সমালোচনী[১০১] সভা লর্ড লিটনকে[১০২] এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন ; লর্ড লিটন বাহাদুর উক্ত সভার প্রধান অভিভাবক ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাকে সেই সভার অভিনন্দন পত্র প্রদান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে লর্ড লিটনের রাজনীতি বিষয়ের প্রশংসা করা সাহিত্যসভার ক্ষমতার অতিরিক্ত হইয়াছে। সেই সভার সহিত রাজনীতির কোনরূপ সম্পর্ক থাকিতে পারেনা। কি চমৎকার যে লর্ড বাহাদুর, কাবুলের অনর্থ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিন্দা সংগ্রহ করিতেছেন, মুসলমানদের সাহিত্য সমালোচনী সভা লর্ড লিটনের সেই আফগানী নীতিরই প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই চাটুক্তিতে সভার মর্য্যাদা লাঘব হইয়াছে, বলা বাহুল্য। লর্ড লিটনও ইহা অবগত আছেন যে, তাঁহার কাবুল সম্বন্ধীয় নীতি, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার নীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আছে বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, সেই সীমাবদ্ধ সভা ভিন্ন, সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহেন। সভার কার্য্যাও লর্ড লিটনের উক্তিতে সাধারণের অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে।

২৭ জুন, ১৮৮০

## শ্রীচরণেষু

নবাব আবদুল লতিফ,[১০৩] প্রমুখ কতিপয় মুসলমান, লর্ডলিটনকে অভিনন্দন প্রদান করিয়া অভ্যস্ত সেবক পাঠের সমাপ্তি করিয়াছেন। এদিকে কলিকাতার মুসলমান লিটাররি সোসাইটী, 'শ্রী চরণ কমলেষু' পাঠের সম্মাননা রক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়ই মনে করিয়াছিলেন। আমরা এই যবন-সংস্পৃষ্ট অভিনন্দনকে অপবিত্র বোধে ঘৃণা করিতে বাধ্য।

লর্ড লিটন যে দলিল লইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, তাহা যেন পার্লিয়ামেন্টের বিচার দ্বারে আপনার ভারতীয় কর্ত্তব্যতার আইনতঃ প্রমাণে উপস্থিত না করেন। ন্যায়ের শক্তিতে উহা যোগ সাজস সংসৃষ্ট দলিল বলিয়া অবশ্য অগ্রাহ্য হইবে। তাহার কারণ এই, তিনি যে সভা হইতে, এই অপূর্ব্ব অভিনন্দনপত্র অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সভা পূর্ব্বেই তাহাকে মুরব্বি বলিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়াছিল। প্রভুর জন্য সভায় এই আচরণ অথবা সাক্ষ্য, সাপেক্ষ চুক্তিমাত্র। দ্বিতীয় কথা এই, নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া যাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন, ন্যায়ের বিচারে ইহাই অকুণ্ঠিত উক্তি হইবে যে, ইতঃপূর্ব্বে তিনি, নবাব ইত্যাদি উপাধিপ্রদানে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই যোগসাজসী কান্ডে এই দলিলের বলবত্তা কিছুই রক্ষিত হইবে না। বিশেষতঃ ভারতের প্রতিনিধিত্বে ইহার একব্যক্তি কি উক্ত সভা দণ্ডায়মান হইবার যোগ্য নহেন।

আমরা শ্রীচরণ প্রার্থীদিগকে নিবেদন করি, মহাশয়েরা কেন এই অভিনন্দনের অনুচিত। প্রসবে লর্ডলিটনের করকন্ডুয়ন ক্ষত ভারতভূমির দুঃখ ও অবমাননা আরো বৃদ্ধি করিলেন? লর্ড লিটনের যে আফগান নীতির প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে কি সজাতীয় পাঠানদের প্রতি নির্দ্দয়তার পরিচয় হয় নাই? যে মুসলমান জাতি একতায় এবং স্বধর্ম ও স্বজাতি পরিপোষকতায় পৃথিবীতে সমধিক পরিচিত, আজ কি লর্ডলিটনকে অভিনন্দন প্রদানে তাহাদের সেই গৌরব কলঙ্কিত হইলনা? তবে কি বলিতে হইবে, তাহাদের স্বজাতি পরিপোষন প্রবৃত্তি ও অনুরাগ লর্ডলিটনের সহিতই তিরোহিত হইয়া গেল? আমরা লর্ডলিটন বাহাদুরকে অনুরোধ করি, তিনি যেন বিলাত যাইবার কালে এডেনের নিকট আরবসমুদ্রে এই অভিনন্দনপত্র বিসর্জ্জন করিয়া যান ; তবে ভারতভূমি তাঁহার মহত্ত্বের এই একটীমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চির-স্মৃতিতে রাখিতে পারিবেন।

৪ জুলাই, ১৮৮০

## ভারতবর্ষে পূর্ব্ববৎ ইংরেজ রাজপুরুষের সমাগম হয়না কেন?

ত্রিংশৎবর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ উচ্চপ্রকৃতি ও সদ্বংশজাত ইংরেজগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতেন, এক্ষণ আর তাদৃক্ উন্নতাশয় ও উচ্চবংশীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, ভারতবর্ষে কার্য্যোপলক্ষে আসিতে সম্মত নহেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতভূমি বিলাতের নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীস্থ রাজপুরুষদের দ্বারা শাসিত হইতেছে। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলী পদের ন্যায় উচ্চতম, বড় মানুষী ও অধিক বেতনের পদ রাজপদের পর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। অধুনা সেই পদপ্রদানের যাচ্ঞা করিয়া ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ও মহারাণী বিলাতের দ্বারে ২ ফিরিয়া থাকেন। যাহারা সুসম্মানিত, বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ ও ভদ্রবংশজ, তাঁহারা প্রায়ই এক্ষণ ভারত শাসনের কর্ত্তৃত্বপদকে উপেক্ষা করিতেছেন। সেই পাঁচ বৎসরের ব্যয় শূন্য ১২ লক্ষ টাকায়ও তাঁহাদের লোভকে আকর্ষণ করিতে পারেনা। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিতে, অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইত—সাতসমুদ্র তের নদী পার হইতে হইত, [অস্পষ্ট] ঘূর্ণিত আবর্ত্ত স্মরণ করিয়া [অস্পষ্ট] হইতে হইত, কিন্তু এক্ষণ আর সেদিন নাই। সেই ব্যায়াত্তর যোজনের পারি নাই, ষন্মাষ কি বর্ষব্যাপিয়া পথ কষ্টও ভোগ করিতে হয় না। অনায়াসে, নিরুদ্বেগে, সুয়োজের বালুকাভেদী প্রণালী অতিক্রম করিয়া ৬ সপ্তাহের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে আতিথ্য লাভ হইতে পারে। রেলওয়ে দ্বারাও পৃথিবীর প্রধান ২ স্থানগুলি যেন একত্র পুঞ্জীভূত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হয়। ভারতে সুখ সামগ্রীর অপ্রতুল নাই। তবে এক জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে কিনা তাহাই চিন্তনীয় হইয়াছে। জল বায়ু সহ্য হইবেনা, এই এক দুষ্পরিহর আপত্তি, উপস্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটে নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা বরং প্রকৃতিগত স্বাস্থ্যলাভ স্বচ্ছন্দে ভোগ হইতে পারে। আমরা এক কলিকাতার বিষয়ে এই বলিতে পারি যে, অক্টোবর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত কলিকাতার জল, বায়ু অসহনীয় অথবা দূষণীয় নহে এবং প্রধান প্রধান প্রেসিডেন্সীর নিকটে কৃযের বিহারগিরি বৈতকে ন্যায় স্বাস্থ্যকর, রমনীয় পার্ব্বতীয় প্রদেশ রহিয়াছে। শিমলা কাশ্মীর, নাইনিতাল, দারজিলিং, উতরামন্দ, চেরাপুঞ্জি ও শিলঙ প্রভৃতি স্থানসকল তাহার উদাহরণ স্থল। বিশেষতঃ রেলওয়ের প্রচার-বাহুল্যে এই সকল স্থানে, রাজপুরুষগণ অনায়াসে পুষ্পকভ্রমণে বেড়াইতেছেন। যদিও মফঃস্বলের স্থানে ২ জল বায়ু অসহনীয় ও দূষণীয় আছে, কিন্তু তৎসমুদায় প্রধান

রাজপুরুষগণের গম্য স্থল নহে। তাঁহারা যে সকল স্থানে অবস্থান করেন, তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রায় কোনো কারণ নাই। তবে গোশেন, ডফারিনগণ, ডড্‌সন্ প্রভৃতি মহোদয়গণ যে, ভারতের উচ্চপদ, জল বায়ুর অসহনীয়তাবশতঃ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে। তাহাতে কেবল বর্ণনার এক দফা পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তব কারণ এই—বর্ত্তমান সময়ে ভারেতের শাসনকর্ত্তাদের স্বাধীনতা অভিমতি সংরক্ষিত হয়না। ষ্টেটসেক্রেটারী ইংলন্ডে থাকিয়া আদেশ প্রচার করেন, গবর্ণর জেনেরেল ও গবর্ণরগণ কেবল তাহা বহন করিয়া ফিরেন। তাঁহাদের স্বাধীনতা সম্ভুত প্রজ্বলিত ক্ষমতা কার্য্যে পরিণত হইতে পারেনা। টেলিগ্রাফের সৃষ্টিতে প্রতি মুহূর্ত্তে ইংলন্ডের ক্ষমতাপ্রিয় মন্ত্রীগণ, ভারতবর্ষের বিষয় অবগত হইতেছেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কটুকষায় পরিপূর্ণ আদেশ আসিতেছে ও কৈফিয়ৎ তলব হইতেছে। সুতরাং শাসনকর্ত্তৃগণ, তৎসমুদায়ের প্রত্যুত্তর করিতেই অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না। বিশেষতঃ যে কার্য্যের প্রতিপাদক্ষেপে আশঙ্কা ও সন্দেহ অপেক্ষা করিতেছে, স্বাধীনচেতাদের পক্ষে সেই কার্য্যের জন্য অধীনতা স্বীকার অবশ্যই কষ্টপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য পূর্ব্বে এক একজন গবর্ণরের যেরূপ গুনগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছে, অধুনা আর তদ্রুপ হইতেছেনা। এক্ষণ মন্ত্রীগণের আদেশ সংরক্ষণেই শাসন কাল অতিবাহিত হইতেছে। ফলতঃ ভারতবর্ষের হিতসাধনে কেহই মনোযোগ দেননা অথবা অবকাশ প্রাপ্ত হননা ; কেহ বিলাসভোগ করিয়া কেহবা বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার মজুত গনিয়া কষ্টেসৃষ্টে মহারাণীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া যান। নতুবা লর্ড মেও ও লর্ড লিটনের ন্যায় শাসন কর্ত্তারা ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইতেন না এবং জ্বালাতন করিয়াও যাইতেন না। বিশেষতঃ লর্ড লিটন, লর্ড বিকনস ফিল্‌ডের নৈতিক সূত্রে নাচিয়া স্বকীয় স্বাধীনতার অবমান ও ভারতবর্ষের এত সর্ব্বনাশও করিতে পারিতেন না। লর্ড ডফারিন[১০৪] ও গোশেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞ পুরুষেরা আসিতে অসম্মত হইয়াছেন, এতদ্‌ভিন্ন তাহার আর কোনো কারণ আছে, বোধ হয় না। কৌন্সেলের সদস্য পদেও এক্ষণ ভাল লোক আসিতে ইচ্ছা করেন না। ট্রিবিলিয়ান মেকলে ও উইল্‌সনের ন্যায় যোগ্যতম বিজ্ঞ ও ক্ষমতাপন্ন লোক আর ভারতবর্ষে আসিতেছেন না। ষ্ট্রেচির ন্যায় অপদার্থ রাজস্বমন্ত্রী ইন্ডিয়া কৌন্সেলের পদে পূর্ব্বে অধিরূঢ় হইয়াছেন কিনা, সন্দেহ।

ভাগ্যবশাৎ এইযুগে, লর্ড নর্থব্রুক কতিপয় বৎসর ভারতশাসন করিতে আসিয়াছিলেন, পরে তিনিও স্বাধীনতা রক্ষা হয়না বলিয়া আপনার সম্মান লইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। কর্ণেল গর্ডন ও ডড্‌সন্ যে ভারতবর্ষে আসিলেন না মুখাপেক্ষিতারোপই তাহার কারণ। তবে লর্ড রিপন উচ্চ বংশীয় ও উচ্চ পদস্থ লোক বটেন। তিনি অনেক অনুরোধে আসিতে সম্মত হইয়াছেন কিন্তু দীর্ঘকাল এদেশে অবস্থিতি করিবেন এমত সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার ধার্ম্মিকতা ও উদারতাই তাঁহাকে চক্ষুলজ্জার সহিত আসিতে বাধ্য করিয়াছে। সে যাহা হউক, নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস, মার্কুইস অব ওয়েলেসলী,[১০৫] লর্ড মিন্টো,[১০৬], লর্ড ময়রা,[১০৭] লর্ড বেন্টিক,[১০৮] লর্ড কানিঙ,[১০৯] ও লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় লোক আর ভারতবর্ষের ভাগ্যে উপস্থিত হইতেছেন না। যে স্থানে রাজহংস শুকশারী অবস্থান করিয়া গিয়াছে তথায় লর্ড লিটনের ন্যায় [অস্পষ্ট] অবস্থান করিবে। [অস্পষ্ট] জল বায়ুরদুর্নাম, এ ব্যধির কারণ নহে। ইহা হৃদরোগ, [অস্পষ্ট] জন্মিতেছে। এই হৃদরোগের আশঙ্কা করিয়াই এক্ষণ সদ্বংশজাত প্রধান প্রধান শ্বেতপুরুষগণ ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইতেছেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

১১ জুলাই, ১৮৮০

## ক্রমে ভারতবর্ষের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ত্রিবিধ দোষ সমাগত। সকল দেশেই ধনী, মধ্যম এবং দরিদ্র এই তিন শ্রেণীর লোক আছে। দেশের মঙ্গল এই শ্রেণীত্রয়ের উপরেই নির্ভর করে। প্রথমে ধনী সংজ্ঞায় সমাহ্বান করিতে গেলে জমীদারদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হয়। তাঁহারা প্রজাগণের অভিভাবক। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাবচ্ছেদে প্রজাগণের ও ভূমির শুভসম্পাদিত হয়। জমিদার ও প্রজার বিরোধে দেশে প্রথম অনিষ্ট বীজ রোপিত হইয়া থাকে। ইহাতে জমিদারদেরই ভবিষ্যৎ বিষময় হইয়া উঠে। আমরা স্বচক্ষে অনেক উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি যে, প্রজাবিদ্রোহে অনেক ভূস্বামীর সংসার নিরন্ন ও নির্ধন হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা একটি পয়সাও প্রজাগণ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না, অন্যতঃ চারি কিস্তিতে সরকারী মালগুজারী প্রদান করিবার নিমিত্ত শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুক হইয়া কোথায় ঋণ পাইবেন, কিরূপে জমিদারী রক্ষা করিবেন, তাহার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন। কেবল জমিদারদের অত্যাচার এই দেশে দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারিনা। গবর্ণমেন্ট প্রজাদিগের শক্তি অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত করিয়া জমিদারদের পথে সুতীক্ষ্ণ কন্টক উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। ১৮৫৯ সনের ১০ আইন ও ১৮৫৯ সনের ৮ আইনে প্রজার শক্তিকে বলবতী রাখিতে গবর্ণমেন্ট ক্রটি করেন নাই। অধুনাতন রেন্ট কমিশনের ব্যবস্থা বিহিত থাকিলে আমরা দেখিতেছি, প্রজার দুর্ভরক্ষমতা ও শক্তিতে জমিদারদিগকে তিরোহিত হইতে হইবে। গবর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া রোডশেস্ ও পাব্লিক ওয়ার্কশেস দ্বারা প্রত্যেক জমিদারীতে প্রত্যক্ষতঃ এক আনীয় অংশী হইয়াছেন। মালগুজারীর কথাই স্বতন্ত্র। সুতরাং দেখিতে পাই গবর্ণমেন্টের নিম্ন স্বার্থ ও প্রজাবাৎসল্যের আব্দারেই প্রথম শ্রেণীস্থ জমীদারদের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত। ইংলন্ডের লর্ডগণের অধিকাংশ জমিদার। সাধ্য কি ইংলিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে আইরিশ বিলের উদাহরণ দেখিয়াই তাহা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত হইয়াছে। আমরা বলিতে চাই, গবর্ণমেন্টের অবিমৃষ্যতায় নিম্নপ্রজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া জমীদারদিগের সর্ব্বনাশই উপস্থিত।

প্রথম শ্রেণীর আর এক ভাগ ধনী সম্প্রদায়। এই খন্ড শ্রেণীর লোকেরা বাণিজ্যাদিতে বহুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশে বড় মানুষ বলিয়া প্রখ্যাত। ইহাদের অর্থে, দেশ অনেক শুভ প্রার্থনা করিয়া থাকে। আমরা প্রায় বিংশতি বৎসর যাবৎ দেখিয়াা আসিতেছি, বিলাসিতারূপ পিশাচী প্রবেশ করিয়া অনেক ধনীর সংসারকে ছারখার করিয়া ফেলিতেছি। ইউরোপা সমাগত লোহিত সুধাপানার্থ বিলাসী ধনীসন্ততিগণ পূর্ব্বপুরুষের বহুকষ্ট সমাইত বিপুল অর্থ মদ্যতর্পণে নিঃশেষ করিতেছেন। আমরা বলি, গবর্ণমেন্টের আবকারী মহালের এই উদারতা ধনী সন্তানের সর্ব্বনাশের একটী নিরেট কারণ। কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতিতে এই বিলাসিতার কত বহু সম্মানিত ধনী পরিবার অকালে দেহ ত্যাগ করিতেছে, অতঃপর তাহার গণনাও কঠিন হইবে। বিলাসিতা ও প্রজা বিদ্রোহিতায় দেশের প্রথম শ্রেণীর এই দুর্গতি ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত।

মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা 'হাঅন্ন' কোথায় চাকরী, বলিয়াই ব্যতিব্যস্ত। ইহাদের মত নিরুপায় সম্প্রদায় আর নাই। সম্মান সংরক্ষণ ও দারিদ্র দূরীকরণের জন্য এই শ্রেণীর লোকেরা যারপর নাই কষ্টভোগ করিতেছে। ঘরে অন্ন নাই, তথাপি অবমাননার বিভীষিকাময় প্রতিবেশীকেও বলিতে পারেনা, 'অদ্য আমাকে অনাহারে যাপন করিতে হইবে।' বঙ্গদেশের

মধ্যম শ্রেণীর কষ্ট সংদর্শন করিলে দয়ালু গবর্ণমেন্ট অবশ্য অশ্রুপাত করিবেন। কিন্তু চাকুরী ভিন্ন ইহাদের আর অন্য গতি নাই। বর্ত্তমান সময়ে চাকরীর সত্তা কমিয়া যাওয়াতে মধ্যম শ্রেণীর আর রক্ষা দেখিতেছি না। বাণিজ্যে ও শিল্পে ইহাদের মতি না থাকা দুর্ব্বলতার ২য় কারণ।

তৃতীয় শ্রেণীতে কৃষকাদি সম্প্রদায়। বহুকাল হইতে ইহারা দরিদ্র শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের জন্যই গবর্ণমেন্ট সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। দশশালা বন্দোবস্ত প্রজাগণ উপেক্ষিত ছিল বলিয়া গবর্ণমেন্ট পরে তাহাদের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে ক্রুটি করেন নাই। কিন্তু আমাদের মতে ইহারা নিরন্ন নয়, সান্ন। দুর্ভিক্ষে মধ্যমশ্রেণীর মরিতে হইবে, ধনীর অর্থ নিঃশেষ হইবে, কিন্তু অন্নের প্রথম গ্রাস ইহাদিগ হইতে কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ইহারাই অন্নের উৎপাদক। এই শ্রেণীতে আর এক খন্ড বিভাগ আছে। তাহারা কৃষক শ্রেণীর নয়। দৈহিক পরিশ্রমে ইহাদের অন্ন সংস্থান ঘটে। এই শ্রেণীর লোকদের দুর্দ্দশা পূর্ব্বে ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান (অস্পষ্ট) পরিশ্রমিক কার্য্যের এত বৃদ্ধি [অস্পষ্ট] ইহাদিগকে এক্ষণ আর হা অন্ন [অস্পষ্ট] নিম্ন শ্রেণীরই ক্রমে অভ্যুদয় ও উন্নতি হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ক্রমে অবসাদ পাইতেছে। যাহাদের উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে, তাহারাই যখন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তখন আর কিরূপে দেশের মঙ্গল আকাঙ্খা করিতে পারা যায়। গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক।

১১ আগস্ট, ১৮৮০

## ভারতবর্ষের দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের লাভ কি?

ইংলন্ডের মাহত্ম্য বুঝা ভার। আমেরিকাই তাহার প্রথম মহিলা আগত হইয়াছে। পিউরিটান ও ফিনিসিয়ানরাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অন্তর্ভেদ করিতে পারিয়াছিল। বাস্তব স্বার্থের একমাত্র প্রজ্জ্বোলমূর্তি ইংলন্ডেই জীবন্ত রহিয়াছে। অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহাদেরই সমধিক অভিজ্ঞতা। সেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রায়সার্দ্ধেক শতাব্দীকাল হইল আমাদের প্রভু হইয়াছিলেন। বিলাতে সম্প্রতি এক কাহিনী উপস্থিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ আমাদের এক প্রকার গলগ্রহ। কি আশ্চর্য্য! তবে কি, লর্ড ক্লাইব[১১৫] মিথ্যা, চতুরতা ও প্রবঞ্চনা করিয়া জাতির গলদেশে এই পাশবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন? তাতেই এখন এই পাশচ্ছেদ করি কি রাখি ইহাই কোন কোন ইংলিস নীতিজ্ঞগণের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। একদিন মহাত্মা লো সাহেব পার্লিয়ামেন্টে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের দ্বারা আমাদের কোন ফল হইতেছে না"। তখনই আমরা বলিতে চাহিয়াছিলাম, ইংলিস গবর্ণমেন্টের সাত সমুদ্র তের নদী পার, কেবল হনুমানের সীতান্বেষণের জন্যই হইয়াছিল! কিন্তু দেখিবে, এদিগে স্বর্ণলঙ্কা ছারখার। যাহা হউক সম্প্রতি মেঃ গ্রন্ট এলেন, কান্টেরবুরি রিবিউ নামক সাময়িকপত্রে ভারত রক্ষার ফল কি? এই প্রশ্ন করিয়া স্বয়ংই মীমাংসা করিয়াছেন যে, "গলগ্রহই' তাহার ফল। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের দ্বারা আমাদের কোন উপকার থাকেনা। আমরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে আরও ধনী প্রবল এবং সুখী হইতে পারিব। আমরা ভারতবর্ষের জন্য ক্রমে ব্যস্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি।" মেঃ এলেন আরো বলেন, "ভারতবর্ষই ইংলন্ডকে সর্ব্বদা [অস্পষ্ট] ও বিবাদে লিপ্ত করিতেছে।"

কি কারণে মেঃ এলেন এই প্রলাপ করিতেছেন, কিসে এই বিকার উপস্থিত আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় বর্ত্তমান সাময়িক ঘটনাগুলি ও রুশিয়ার চাতুর্য্য ভয়েই মেঃ এলেন ত্রাসবিকম্পিত হইয়া পড়িয়াছেন। যদি পৃথিবীতে ইংলন্ড উচ্চসম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষই তাহার হেতু। এত ভোগবিলাস, ও অর্থে লক্ষ ২ ইংলন্ড কুমারের উদর পূরণ আর কোথা হইবে? সভাসুন্দর নরসুন্দরের সন্তানগণইবা কোথায় গর্ব্বিতভাবে বিচারাসনে বসিয়া আর্য্যসন্তানগণের পবিত্র শরীর লঙ্ঘন করিতে পারিবে? ভারতবর্ষ গলগ্রহ নয়, উহা ব্রিটিশ বক্ষের বহুমূল্য স্বর্ণহার এলেন সাহেবের মত ভীরু ও অজ্ঞাতস্বার্থ ইংরেজের বিলাতে, অবস্থান বিড়ম্বনা মাত্র। এলেন সাহেব যদি গলগ্রহ না বলিয়া উদারতার নির্ভরে ধর্ম্মদৃষ্টিতে আর কিছু বলিতেন তবে তাহাই স্বাধীন সভ্যসমাজে সমাদৃত হইত। ভারতবর্ষ কাম ধেনু। ইহাকে দোহন করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য স্বতঃপরতঃ সৌভাগ্যবান হইয়াছে। [অস্পষ্ট] ইংলন্ডের ঈদৃশী আত্মবিস্মৃতি ঘটিতেছে, কিছুই বুঝা যায় না। বোধ হয়, ইংলন্ডে এখন আর কোন অভাব নাই। বৈভবের প্রাচুর্য্যে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, পুর্নোদর ব্যক্তি আর আহারের চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করে না, বোধ হয়, বর্ত্তমান ইংরেজ জাতিতে সেই অবস্থা উপস্থিত। আমাদের বনিকদাস উপাধি চলিয়া যাউক, আমাদের তাতে বাসনা নাই। ইংলিস গবর্ণমেন্টের অধিকারে ভারতভূমি রাজন্বতী বলিয়া আখ্যাত্ত হউক ইহাই প্রার্থনীয়।

৫ ডিসেম্বর, ১৮৮০

## রাজনীতিবিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাব

ভারতভূমি পৃথিবীর চিত্রশালিকাস্বরূপ। সমগ্র ভূভাগ পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দর্শন ও সংগ্রহ করিতে পারা না যায়, একমাত্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া যত্ন স্বীকার করিলে তাহা দর্শন ও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ভারতে ধান্যের কিছুই অভাব নাই; বসুমতী ভারতভূমিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন। কামধেনুস্বরূপী ভারতভূমির অক্ষয় অর্থের অংশ লইয়া কোনও না কোনও রূপে সমগ্র পৃথ্বজনবাসী প্রতিপালিত হইতেছে। অনার্য জাতিদিগের উপদ্রবে, গ্রীক রোমান বাসীদের শোষণে ডেরায়স্ আলেকজান্ডারের আক্রমণে, মুসলমানদিগের শাসনে, ইউরোপীয়দিগের আদান প্রদানে, কিংবা ইংরাজদিগের আগমনে বহুকাল হইতে ভারতের ধন ভারতমহাসাগর পার হইয়া বিদেশে নীত হইয়াছে বটে, কিন্তুতলাচ এখনও এই পঞ্চবিংশতি কোটি মুহূর্ষু ভারতবাসী স্বদেশে বসিয়া অশন বসন সংগ্রহ করিতে সম্যকপরিসমর্থ। এদেশের অন্তর্বাণিজ্যের হ্রাস, বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি, অপরিমিত অর্থশোষণ এবং জনসংখ্যার অপরিমিততা হইলেও কেবল একটীমাত্র কারণে ভারতের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইতেছে না। এই উন্নতির পথে অনেকগুলি [অস্পষ্ট] অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া আছে বটে, কিন্তু আমরা একটি মাত্র কারণকেই মুখ্যকারণ বলিয়া গণ্য করিতেছি। সেটির নাম রাজনীতি বিষয়ে এদেশের লোকের সাম্প্রদায়িকভাব। রাজকীয় বিষয়ের কোনও আলোচনায় কিংবা দেশের স্বার্থসম্বন্ধীয় কোনও তত্ত্বের আন্দোলনে, এদেশের লোকের একতা এবং সমবেদনা নাই। রাজনীতি বিষয়ের পর্য্যালোচনায় এইরূপ সহানুভূতির অভাব নিতান্ত শোচনীয় এবং একান্ত অশিবকর। হিমালয় গিরিতে আঘাত করিলে যদি সেই আঘাত কুমারীদ্বীপে প্রতিঘাত না হয়, তবে এদেশের উন্নতি কোথায়?

যেমন পৃথিবীর অগন্য মনুষ্যবৃন্দের মধ্যে কাহারও মুখমন্ডলের সহিত কাহারও মমতা দৃষ্টি হয়না, সেইরূপ সমরুচিবিশিষ্ট দুই ব্যক্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। অশেষ সাম্যবাদসম্পন্ন মুনিগণেরও মধ্যে মতিভ্রম এবং মতি-ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইংলন্ডের ন্যায় স্বাধীনভাব এবং পূর্ণহৃদয়বিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যেও সমতার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা যে একসূত্রে গ্রথিত এবং একমধ্যবিন্দুর দিকে হৃৎপ্রবণ, ইহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারেনা। ভারতের লোকদিগের গ্রন্থনসূত্র বিভিন্ন ; ইহাদের সমবেদনার মধ্যভূমি অনুর্ব্বর ও হৃদবিন্দু শিথিল উপাদানে গঠিত।

ইংলন্ডের নাম করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তথায় ইংরাজেরা বাস করেন। হলন্ডের নাম করিলে আমরা বুঝি যে, তথায় ওলন্দাজেরা বসতি করেন। এইরূপে এক এক শ্রেণী, এক এক বর্ণ, এক এক সম্প্রদায় লইয়া পৃথিবীর দেশপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত বলিলে আমরা কি বুঝিব? 'বর্ত্তমান ভারত' এই দুইটি শব্দ অথবা সপ্তাক্ষরের মধ্যে আমরা সমগ্র পৃথ্বীমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। এখানে ষড়ঋতু বৎসরের সকল মাসেই একস্থানে না এক স্থানে বিরাজ করে ; এখানে বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, কর্ণাটি, মান্দ্রাজী, পার্সি, সাঁওতাল, রজঃপুত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক বাস করেন। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, নানকীয়, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, জোরাস্তার প্রভৃতি বহু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত আর এক ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মিশিতে গেলে সমাজচ্যুত হইতে হয়। সুতরাং এই বহু বর্ণ, বহু জাতি, বহু সম্প্রদায় ও বহু সমাজবিশিষ্ট দেশের লোকদিগের মধ্যে সহজে সমতা স্থাপিত হওয়া দুঃসাধ্য। ইহাদের সমাজ একই নহে বলিয়া, ধর্ম্ম এক নহে বলিয়া, ইহারা একত্রিত হইতে পারেনা, কিন্তু একমাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারে ইহারা পরস্পর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে। রাজনীতির আলোচনাই ইহাদের মিশ্রণের সাধারণ ভূমি। ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটি অধিবাসী যদি কখনও একসূত্রে গ্রথিত হয়, তাহা হইলে রাজনীতি লইয়াই হইবে, অন্য কিছু দ্বারা হইবে না। আজিকালি রাজকীয় বিষয় লইয়া এদেশীয় লোকেরা আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, তাহাতে সাধারণের সহানুভূতি উত্তরোত্তর বহুলপরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছে বটে, সেই উদীয়মান উৎসাহের জ্বলন্তভাবে এদেশের যুবকবৃন্দ স্বদেশের মঙ্গল সাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইতেছেন বটে, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতেও সম্প্রতি দূষিত সাম্প্রদায়িভাব প্রবেশ করিয়াছে! ভারতবাসিগণ! দেখিতেছে না, গোপনভাবে ঐ কুসুমকোরকে কালকীট প্রবেশ করিতেছে?

ভারত এক্ষণে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত! ভারত শরীরের একদিক এক্ষণে অসাড় ও নিস্পন্দ। ভারত আজি তজ্জন্য রুগ্নভাবে শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। যে দুঃখে ভারতের শরীরস্থ মেদশুষ্কপ্রায় হইতেছে, যে শোকে ইহার মর্ম্মদগ্ধ হইতেছে, তাহা একদিনের বা এক শতাব্দীর ফল নহে। ইহা বহুশত বর্ষকালব্যাপি মহাপাপের মহাপ্রতিফলস্বরূপ। মহাপাপে আমাদের চিত্তের বিকৃতি জন্মিয়াছে। আমরা 'আপনহারা বিবশ' হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানবিহীন উহাদের ন্যায় প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছি। যদি এই মহারোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সুদূর পশ্চাতে গমন করিতে হইবে। কিন্তু আজিকার প্রস্তাবে সে কথার উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক চর্চামাত্র। সকল রোগের মূলস্বরূপ এই অভিনব সাম্প্রদায়িকভাব কোথা হইতে আসিল অগ্রে তাহাই দেখা হউক।

ভারতের অধিবাসীর দুঃখ একবিধ। যে দুঃখে তোমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, সেই দুঃখে আমারও হৃদয় পুড়িতেছে। একবিধ দুঃখে তোমার ও আমার এতদুভয়ের দেহস্তশোণিত জল হইয়া যাইতেছে। তবে এই অসংখ্য দুঃখীর মধ্যে এত মতবিভিন্নতা কেন? এ প্রথা কোথা হইতে আসিল? আমি যাহা বলি, তুমি তাহা বল না; আবার তুমি যাহা বল, আমি তাহা বলিনা। ইহার কারণ কি জান? ভারতে আর সাধারণমতের প্রবলতা নাই। এখানে ধনমানের পূজা আরম্ভ হইয়াছে, এখানে দুঃখী মানুষ রূপ মৃগকে ধনবান মানুষরূপে সিংহগণ 'নায়ক' বা 'দলপতি' বেশে নির্ব্বিঘ্নে ভক্ষণ করিতেছে। এদেশের লোকের রীতিনীতি এরূপ হইয়া গিয়াছে যে, তুমি বিদ্বান রূপবান সচ্চরিত্র এবং উদার হইয়াও যদি ধনহীন হও, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! তোমাকে কেহই সম্মান করিবে না; তোমার মতে কেহই মত দিবে না; তোমার অভিরুচিতে কেহই অভিবাদন করিবে না। আমি মূর্খ, কুৎসিত, কলঙ্কিত, অনুদার ও পরশীর্ষঘাতী হইয়াও যদি ধনসংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জয়! এই ভারতরণে আমি তাহা হইলেই জয়লাভে সবর্থ। ভারতবর্ষে যে দিন ধনমানের অযথা পূজা উঠিয়া গিয়া নিঃসার্থভাবে সাধারণমতের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, সেই দিনই রাজনৈতিক বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া ভারতের মঙ্গল দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে।

১৪ মে, ১৮৮২

## ষ্টেটস্ সেক্রেটারির পত্র

ভারতবর্ষের ইংলন্ডস্থ কর্ম্মকর্ত্তা (ষ্টেটস্ সেক্রেটারী) শ্রীযুক্ত মার্কুইস্ অব্ হার্টিংটন সাহেব ভারতশাসন কার্য্যের কোনও কোনও বিভাগের ব্যয়ভার লঘুতর করিয়া দিয়া রাজকোষের অর্থকৃচ্ছ বিদূরণ ও রাজস্বের সচ্ছলতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি অত্রত্য প্রধান শাসনকর্তা ও রাজপ্রতিনিধি মহাশয়ের নিকটে যে সুদীর্ঘ প্রস্তাব সমন্বিত অনুষ্ঠানলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, গত ৮ই শ্রাবণ দিবসীয় ঢাকাপ্রকাশে তৎসংবাদ প্রকটিত হইয়াছে। ষ্টেটস্ সেক্রেটারী মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের মাসিক বেতন কমাইয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করি নাই। যে সকল যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা লর্ড হার্টিংটনের সহিত ভিন্নমত হইয়াছি, তাহাও ইতঃপূর্বে বিকৃত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় এই যে লর্ড হার্টিংটন সংপ্রতি এদেশের বণিক্‌সভা, ব্যবসায়ী–সমাজ, জাতীয় মুসলমান সভা, হাইকোর্টের উকীলগণ ও চীফ জাষ্টিস গার্থ সাহেবেরও এতদ্বিষয়ক প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের অভিপ্রায়ই স্থিরতর রাখিয়াছেন।

আমরা উক্ত অনুষ্ঠান পত্রখানি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিবার অবসর পাই নাই। অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা এই প্রয়োজনীয় লিপিখানি এবং এতদন্তর্গত অত্যাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ভারতের হিতসাধন করা যাঁহাদের অভিপ্রেত ও রাজকীয় বিষয়ের সমালোচনায় যাঁহারা দক্ষ, এই পত্রখানি পাঠ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে ইহার আলোচনা করিব এবং কোন্ কোন্ বিভাগে কি প্রকারে ব্যয় সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলে শাসনকার্য্য উত্তম চলিতে পারে, অথচ রাজা প্রজা কাহারও স্বার্থ হানি না হয়, তাহাও দেখাইয়া দিব। হার্টিংটন সাহেব গবর্ণমেন্টের পরিব্রজন ব্যয় কমাইতে চাহেন। পাঠকগণ বোধহয় জানেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিবৎসর গবর্ণর জেনেরল সিমলায়, বাঙ্গলার ছোট লাট সাহেব দার্জিলিঙ্গনগরে, মাদ্রাজের গবর্ণর মরীতে,

পঞ্চাবের গবর্ণর সিমলাশৈলে ও বোম্বাইয়ের গবর্ণর ঘাটউপত্যকায় গমন করিয়া থাকেন। গবর্ণর জেনেরলের সিমলা গমনের ব্যয়কে ইংরাজীতে সিমলা এক্সোডস্ (Simla exodus) কহে এজন্য প্রতি বর্ষে ভারতের বহুল অর্থ জলের ন্যায় ব্যয়িত হইয়া যায়। ব্যয় কমাইয়া দিলে এই হইবে যে, দেশীয় যে সকল কেরানী বাবু ইন্ডিয়া আপিসের কার্য্যে তথায় গমন করেন, তাহারা অনাহারে মারা যাইবেন। তাহাদের স্ত্রীপুত্রের অন্নপ্রথমেই বন্ধ হইবে। অগ্রে তাঁহাদেরই রেলভাড়া বাজেয়াপ্ত হইবে। একথা যে সত্য, তাহার আর প্রমাণ দেখাইবার আবশ্যকতা নাই। যে সকল ইংরাজ ইন্ডিয়া গবর্ণমেন্টের কার্যালয়ে মাসিক ২ সহস্র টাকা বেতন প্রাপ্ত হন,— তাহারা সিমলায় গিয়া ৫ মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র টাকার যোগাড় করিয়া আসেন রমণীয় অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান, কুসুম সুবাসিত শয্যা, উৎকৃষ্ট অশ্বসংযুক্ত যান তাঁহাদের জন্য গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে প্রস্তুত থাকে, দেশীয়গণ একখণ্ড ছিন্নবিলাতী কম্বল পাইয়াই সন্তুষ্ট হয়েন। তথায় স্ত্রী পুরুষের পোষাণের জন্যই তাহাদের সমুদয় টাকা ব্যয়িত হইয়া যায়। যাহাহউক, আমাদের বিবেচনায় এ বিষয়ের ব্যয় কমাইতে হইলে স্থূল বেতনভোগী ইংরাজদিগের গমনাগমনের ব্যয়, অশন বসনের ব্যয়, অবস্থানের ব্যয় প্রভৃতি কতগুলি অপরিমিত অন্যায্য ব্যয় কমাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যয়ের লঘুকরণ সম্বন্ধে লর্ড হার্টিংটন যাহা বলেন, তৎসমন্ধে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত না হইলে এখন পূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে না। তিনি বলেন "উচ্চশিক্ষা দানভার দেশীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকের সাধারণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ব্যয় কমিয়া যায়, অথচ দেশীয় লোকদিগকে স্বাধীনতার স্পৃহায় উত্তেজিত করা হয়।" একথাটি বালকের ন্যায় হইয়াছে ; প্রবীণের মুখে ইহা শোভা পায় না। তিনি যাহাই বলুন, এদেশীয় লোক উচ্চশিক্ষার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে এখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত রহিয়াছে। স্পষ্টত আমরা বলিতে হইলে তাহাতে অক্ষম। স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে আমরা এদেশের লোকের শিক্ষাসম্পর্কীয় কোন কোন বিষয়ের পরিচালনের কিয়দংশ ভার প্রাপ্ত হইব বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ভার আমরা গ্রহণ করিতে যে অনুপযুক্ত, তাহা লর্ড রিপণ জানিয়াছেন। লর্ড হার্টিংটন বলেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের বেতন কমাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। পাঠকগণ বোধ হয় জানেন যে এখনকার বড় লাট মহাশয়েরা ন্যূনাধিক এক বিংশৎতি সহস্র টাকা (প্রতি মাসে) বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মহারানীর ব্যয়ে ইংলন্ড হইতে ভারতে আইসেন ও ভারত হইতে ইংলন্ডে যান, ইঁহারা যতদিন ভারতে থাকেন, ততদিন ইঁহাদের অশন, বসন, শয়ন, ভ্রমণ প্রভৃতি কোনও বিষয়ের জন্য কখনও একটি তাম্র খণ্ডও ব্যয় করিতে হয় না ; সমুদায় ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়। প্রতিবৎসর গবর্ণর জেনেরল সার্দ্ধ দুই লক্ষাধিক মুদ্রা বেতন স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন, তাঁহার আরও পাওয়ানা আছে। বড় বড় দরবারে নবাব, আমীর, মহারাজ প্রভৃতি যাহা প্রদান করেন, তাহা লাট সাহেবদিগের নিজকোষ মধ্যে রক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণর জেনেরলদিগের মাসিক ১৫ হাজার টাকাবেতন করিলে মন্দ হয় না। তাহা হইলেও তাঁহারা এদেশে বিনা খরচায় খাইয়া পরিয়া ৫ বৎসর নয় লক্ষ টাকা বেতন স্বরূপ উপার্জ্জন করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন আরও পাওনা আছে। পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণর জেনেরলদিগকে এখন সংগ্রাম করিতে যাইতে হয়না, এখন তাঁহারা মস্তিষ্ক শীতল—করিবার জন্য সিমলাশৈলে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে বিহার করিতে পান, এখন তাঁহাদিগকে আর সৈনাধ্যক্ষের কার্য্য করিতে হয় না,

সুতরাং কেন ১৫ সহস্রটাকা বেতনে তাঁহারা এই চাকরি গ্রহণ করিবেন না? আমাদের বিবেচনায় গবর্ণরও লেপ্টেনেন্টদিগের বেতন কমাইয়া দেওয়া উচিত নহে। মার্কুইস্ অব হার্টিংটন সাহেব সৈনিক বিভাগে ব্যয়ও কমাইতে চাহেন। অনেকদিন হইতে আমরা এই কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, কাজের বেলায় সকলকেই আমবা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে দেখি। সিমলায় এতদিন ধরিয়া আর্ম্মি কমিশন বসিল, সমস্র সহস্র টাকার শ্রাদ্ধ হইল, সার আস্‌লি ইডেনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, কত বড় বড় কর্ণেল বাহাদুরের জোবানবন্দী পত্রস্থ করা হইল, কিন্তু কার্য্য কিছুই দেখিলাম না। রাজা দিগম্বর মিত্র হইতে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত এজন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। যে দিনে কলিকাতার টাউন হলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা এবং ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এতদুভয়ের যত্নে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, যে দিনে সৈনিক বিভাগের ব্যয় ভার কমাইয়া দিবার জন্য আচার্য রাজেন্দ্র লাল মিত্র,[১১২] মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ,[১১৩] অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল,[১১৪] মহারাজ যতীন্দ্রমোহন,[১১৫] নবাব আমীর আলি,[১১৬] রাজাদিগম্বর মিত্র,[১১৭] বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়[১১৮] প্রভৃতি রাজনীতি শাস্ত্রের সুপণ্ডিতগণ জ্বলন্ত—ও জীবন্তভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট সমীপে ভূরি[১] আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন ; সেইদিন ভরসা হইয়াছিল বুঝি কিছু ফলোদয় হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কিছুতেই মনোযোগী হইলেন না। লর্ড হার্টিংটন কি উপায় অবলম্বন করিয়া সৈনিকবিভাগের ব্যয় কমাইবেন, তাহা বলেন নাই। তিনি বলুন আর নাই বলুন, আমরা এককথা বলিয়া রাখিয়ে, এই ব্যয় কমাইতে গিয়া যেন দেশীয় সৈন্য মারা না পড়ে। যাহারা ৫/৭ টাকা বেতনের জন্য সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া অমূল্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, যাহারা অজ্ঞাবশতঃ স্বদেশের বিপক্ষে তরবারি প্রয়োগের কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, যাহাদের সংগ্রাম কালীন আহার ও শয়নের জন্য একমুষ্টি ছোলা এবং একখানি তিব্বতজাত কম্বল ভিন্ন আর কিছুই থাকেনা, সেই হতভাগ্য রাজভক্তদিগের সম্বন্ধে যেন অবিচার করা না হয়। তাহাদের এক পয়সা কমাইয়াদিলে তাহাদের শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইবে। গবর্ণমেন্টের অনুষ্ঠান লিপিত উপরে আমরা সংক্ষেপে এও পর্যন্ত বলিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতেছি।

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২

## লর্ড রিপন কি করিলেন

ধর্মভীরু, উদারমতি লর্ড রিপন ভারতের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ১৮৫৮ সালের উদার ঘোষণা পত্রের-সামান্যতর সম্মান রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হইলে, ভারতবাসী আহলাদ সাগর ভাসমান হইল। ইলবার্ট বিলের[১১৯] নিরপেক্ষ পাণ্ডুলিপি দেখিয়া এবং স্বায়ত্তশাসকের প্রস্তাব শুনিয়া পরাধীন, নিগৃহীত দেশীয়গণের ভগ্নহৃদয়ে আশা সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিল, লর্ড রিপনের শাসনকালে ভারতবর্ষে বহুল হিতকর অনুষ্ঠান হহবে, অসাম্যনীতি ভারত হইতে সুদূরে প্রস্থান করিবে। কিন্তু হায়। দুর্ভাগ্যবশত সেই উচ্চ আশায় ভস্মনিক্ষিপ্ত হইয়াছে। লর্ড রিপন নিজের পঞ্চবার্ষিক শাসনকালে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখবন্ধকর ৯ আইন রহিত করণ ভিন্ন আর কিছু করিয়া যাইতে পারিবেন, বোধ হইতেছেনা। ষ্টেট সেক্রেটারী যেরূপ আদেশ করিয়াছেন এবং স্থানীয় শাসন কর্তৃগণ বিশেষত

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর, যেরূপ অবয়ব সংগঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে রিপন বাহাদুরের সাধের স্বায়ত্তশাসন মাঠে মারা যাইতেই বসিয়াছে। ইলবার্ট বিলের যাদৃশ পরিনাম ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়-সম্বলিত পরিতাপের উদয় হইয়া থাকে। ঐ বিল বিধিবদ্ধ করিয়া কোথায় জাতিবর্ণের ভেদ-বুদ্ধি রহিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, আর কোথায় সাহেব সম্প্রদায়ের ভীষণ আক্রমণ ও ভ্রুকুটিভঙ্গীতে পূর্ব্ববৎ অবিচলিত থাকিতে না পারিয়া লর্ড রিপন অবশেষে উহাতে এরূপ বিধান নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, তাহাতে অসমদলিতার পরকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপিচ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাগণ জুরির বিচারের অধিকার লাভ করাতে দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজগণের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথও প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্বেকায় পক্ষপাতী ইলবার্ট আইনের অন্যায় অনুগ্রহমূলক প্রশ্রয়েই মফস্বলে দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজগণের অত্যাচার প্রবৃত্তি ফলবতী হইয়াছে এবং তদ্বশতই ওয়ের, ফ্রান্সিস প্রভৃতির ন্যায় পাষণ্ডেরা নির্ভয়ে অসহায়া রমণীদের সতীত্ব ও জীবন নাশ করিতেছে-শিকারী সাহেবদের গুলিতে নিরীহ দেশীয়গণের অথবা তাহাদের পালিত পশুর প্রাণ অকারণে বিনষ্ট হইতেছে। ঐ আন্দোলনে গবর্ণমেন্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ হওয়াতে এঙ্গলো ইন্ডিয়ানদের বুকের পাটা এত বাড়িয়াছে যে, তাহারা যে কোন দুষ্কার্য করিতেও শঙ্কিত হইতেছে না। উক্ত আন্দোলনে রিপন বাহাদুরের অদৃঢ়তা ও সাহেবভীতি উপলব্ধ হওয়াতেই বোধ হয় এদেশীয় রাজপুরুষ ও তাঁহার অধীনস্থ শাসকগণের অনেকের স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্তি দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে-চট্টগ্রামের মাগোয়র, ঢাকার ষ্টেলি, লয়েড, ম্যারিয়ট, ফরিদপুরের সার্ন্স, নদীয়ার টেলর ও ব্রায়েন ও রামসে প্রভৃতি শ্বেত প্রভুদের যথেচ্ছব্যবহারের ছড়াছড়ী হইয়াছে এবং তাহাতে প্রজাবর্গ-স্কুলের কচিছেলেরা পর্যন্ত জ্বালাতন ও "হয়রান পেরাশান," হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। এই সুযোগেই বোধ হয় অনেক শ্বেতবিচারক ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক শাসনকর্তা স্বজাতিমমতার একশেষ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে—স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারকারী দুরাশয়েরা অনেক সময়ে দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছে। কৌতুকের কথা কি বলিব যথেচ্ছাচারপরায়ন শাসক ও পক্ষপাতী বিচারকের অবনতি হইবে দূরে থাকুক, ক্রমেন্নতিই ঘটিতেছে। অতএব প্রতীত হইতেছে। লর্ড রিপনের যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতবাসীকে সামান্যনীতির ফলভোগী করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই আইনে-তাহার আন্দোলনে বিষময় ফলই প্রসূত হইয়াছে ; হতভাগ্য ভারতবাসী অমৃতাস্বাদের পরিবর্ত্তে বিষের জ্বালায়ই জর্জরীভূত হইয়াছে। রিপন বাহাদুর যদি পূর্ব্বাপর প্রদর্শন করিতে পারিতেন, অথবা ইলবার্ট আইন প্রচলিত হওয়ার পরেও যদি অনয়াচারী, শ্বেত পুরুষগণকে সুমচিত শাস্তি দিয়া, শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতেন ; ঔদাসীন্যমূলক স্তব্ধতা অবলম্বন করিয়া না বসিতেন, তাহা হইলে কি ভারতে অত্যাচার, অবিচারের পথ অত প্রশস্ত হইতে পারিত—তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত যশোরাশিতে কি কলঙ্ক কালিমা পড়িবার উপক্রম হইত এবং বহুবার সে লঘুক্রিয়া দেখিয়া ভারতবাসী কি তৎপ্রতি রীতরাজ্য হইয়া পড়িত? কখনই নহে। তাই বলিতেছিলাম, লর্ড রিপন চুপ করিয়া থাকিয়া, কি করিতে কি করিলেন, সুখের রাজত্বে ভূতের প্রাদুর্ভাব হইতে দিয়া কি অনর্থই ঘটাইলেন।

মহামতি রিপন অবশ্যই জানেন, ভারতের রাজপ্রতিনধিত্বে বহুল গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কেবল লম্বা বেতন গনিলে, শৈলবিহার সুখ সম্ভোগ করিতে, প্রজাগণের স্বত্ব ও স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া স্বজাতীদিগের স্বত্ব ও স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হইলে, মহারানীর

ভারতরাজত্ব বজায় রাখিবার কূটনীতি প্রয়োগ করিলে সেই মহৎ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়না। প্রকৃতি পুঞ্জের সুখ সুবিধাবিধান, যে কোন জাতীয় দুরাচারের অত্যাচার দমন। বিপন্নের বিপদুদ্ধার, অধীনস্থ রাজকর্ম্মচারীদের অন্যায় ব্যবহারের প্রতীকার ও সর্ব্বত সুতীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া স্বজাতি। বিজাতি সকলের প্রতি সমদর্শিতা প্রদর্শন প্রভৃতি রাজোচিত আচরণ করিলেই ঐ গুরুতর কর্ত্তব্য রক্ষা পাইতে পারে এবং তাহা হইলেই প্রজাবৃন্দের আন্তরিক অনুরাগ আকর্ষণ করা যায়—শ্রী শ্রীমতী বিকেটারিয়ার ভারত রাজত্ব সুচিরস্থায়ী হইবার পথ প্রশস্ত হইতে পারে। কেবল শাক্তশাসনে-পেষণ-পীড়ন-অর্থদোহনে সে' উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। এই সকল জানিয়াও রিপন বাহাদুর কেন নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিতেছেন,—হাইল (হাল) ছাড়িয়া দিয়াছেন,—অহরহ অত্যাচার অবিচার হইতে দেখিয়াও কেন উচ্চ বাচ্য করিতেছেন না, বলিতে পারিনা। ষ্টেট সেক্রেটারির কৌণেস্‌লের ইঙ্গিত-তত্রত্য স্বজাতি হিতৈষী সাহেবদের কানকথাই কি তাঁহাকে বিমোহিত করিয়াছে? স্বকীয় পারিষদবর্গের প্রয়োজনায়ই কি তিনি ভূতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? অথবা ঔদাস্যই কি তাঁহাকে ঐ দশায় উপনীত করিয়াছে? সে যাহা হউক, এই স্তিমিতভাব যে, নিতান্তই দোষাবহ ও একান্ত আক্ষেপজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া ভারতের ন্যায় বিস্তীর্ণ রাজ্যের সর্বোচ্চ রাজাসনে আসীন থাকা, আর না থাকা উভয়ই তুল্য। লর্ড রিপন অধিককাল ভারতসিংহাসনে বর্ত্তমান থাকিবেন না বটে, ভারতবাসীরা তাহা হইতে যেরূপ আশা করিয়াছিল, তাহাও সম্যকপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই সত্য ; কিন্তু তিনি আর যে কিছুকাল এদেশে অবস্থান করেন সেই সময়টুকু প্রকৃত কর্ত্তব্যপালনে অতিবাহন করিলে-প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধন বিনিয়োগ করিলেও অনেক হিত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সেজন্য এখনও আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তিনি মৌনভাব ও নিশ্চেষ্টতা পরিহার পূর্ব্বক স্বায়ত্তশাসন প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করিয়া ভারতবাসীর সঞ্জাত আশাফলবতী করুন-অস্ত্রসংক্রান্ত আইন উঠাইয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট যে, এদেশেয়ীদিগকে অবিশ্বাস করেন না, ইহাদের রাজভক্তিতে সন্দিহান নহেন, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করুন এবং এদেশীয় রাজপুরুষগণকে দুরাশয় ইংরাজদের দুষ্কার্য্য-প্রবৃত্তি সংযমনের সমুচিত উপায় বিধানে প্ররোচিত করিয়া-উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া ভারতবাসীগণের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির শীতল ছায়া বিস্তার করিতে বলুন। দেখিবেন, ভারতবাসী পূর্ব্বের ন্যায় তৎপ্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তিসম্পন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে আরম্ভ করিবে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে সমুদ্যত হইবে। প্রজারনুনসম্ভুত নির্মল কীর্ত্তিই রাজকীয় অমূল্য ধন ; ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কি লর্ড রিপন অবশিষ্ট শাসনকাল কর্ত্তন করিবেন না?

৩১ আগস্ট, ১৮৮৪

## রিজার্ভ ভলন্টিয়ার সৈন্য প্রসঙ্গ

ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্রে প্রকাশ, গবর্নমেন্ট ভারতে রিজার্ভ বলন্টিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করিবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন! এঙ্গলো ইন্ডিয়ান, ইউরেশীয়ান ও দেশীয় খৃষ্টানেরাই নাকি এই দলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম খাতায় লেখা থাকিবে ' সকল সময়ে কুচকাওয়াজ করিতে হইবে না ; প্রয়োজন পড়িলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হইবে। রেজিষ্টরিভুক্ত রিজার্ভ বলন্টিয়ারেরা গবর্ণমেন্ট হইতে বন্দুক ও ৫০ বার "ফেত্তড়"

করিবার উপযুক্ত বারুদ, গুলি প্রাপ্ত হইবেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারিবেন, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে পারিতোষিক ও পরিচ্ছদব্যয় প্রদান করিবেন। কর্ত্তৃপক্ষ ভরসা করেন, 'ভারত হইতে রিজার্ভ বলন্টিয়ারদলে ৭০/৭৫ হাজার লোক পাওয়া যাইবে। আমাদের বিশ্বাস, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে লোক গ্রহণ করিলে, সত্তর পঁচাত্তর সহস্র কেন, কোটি কোটি অস্ত্রধারী জুটিতে পারে। ভারতে এখন সবে মাত্র ১৩০০০ শকের সৈনিক আছেন। গবর্ণমেন্ট যদি—দেশীয়দিগকে ঐ দলভূক্ত করিবার আদেশ করেন, তবে দেখিতে পান, এক দিনেই লক্ষ লক্ষ লোকের আবেদন পড়িয়া যায়।

কাজ কর্ম্মের ভিড়ে বলন্টিয়ার দলভূক্ত হওয়া সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নয়, কেননা সময়মত কুজকাওয়াজ করিবার অবসর হয়না রিজার্ভ বলন্টিয়ার হইতে যখন অসুবিধা নাই, তখন অসংখ্যলোক ঐ দলভূক্ত হইবেন, এরূপ আশা করা হইয়াছে। আশা দুরাশা নয় সত্য, কিন্তু ভারত এঙ্গলো ইন্ডিয়ান, ইউরেশীয়ান ও দেশীয় খৃষ্টান কয়জন? তাঁহাদের মধ্য হইতে আর কত লোক লোক অসময়ের কান্ডারী হইবেন? গবর্ণমেন্ট নানা ব্যাপারে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের ঐকান্তিক রাজভক্তির পরিচয় পাইতেছেন, তথাপি ইঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়! রুষীয় গবর্ণমেন্ট মুসলমান ও আর্ম্মণীদিগকে বড় বড় সেনাপতির পদে নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন, আর "উদার" খ্যাতিমান ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট শকের সৈনিকদেরও হিন্দু মুসলমানদিগকে গ্রহণ করেন না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে? রুষভল্লুক ভারতের নিকটবর্তী হইয়া ছিদ্রান্বেষণ করিতেছেন, এসময়ে হিন্দুমুসলমানদিগকে অবিশ্বাসের চক্ষে নিরীক্ষণ করা কি দুরদর্শিতার কার্য্য? ২৫ কোটি ভারতসন্তান এখন যাহাতে ব্রিটিশসিংহের পৃষ্ঠবল হয়, সব্বপ্রযত্নে তাহা করাই কি সুবিবেচক রাজনীতিভিজ্ঞের কার্য্য নয়? দেশীয় খৃষ্টানগণ কোনও অধিকার পান, তাহাতে আমাদের অসন্তোষ নাই; কিন্তু তাঁহারা কোন্‌গুণে বিশ্বাস ভাজন, আর অপরাপর প্রজাইবা কোন্ দোষে অবিশ্বাসপত্র আমরা তাহা বুদ্ধিস্থ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজভক্তিসূচক কার্য্য পরম্পরায় কি খৃষ্টানেরাই নায়কত্ব করিয়াছেন? মহারাজ সিন্ধিয়া, হুলকার, নিজাম প্রভৃতি যে, ধনেপ্রাণে সাহায্য করিয়া ব্রিটিশাধিকার অব্যাহত রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, খৃস্টানদলে—কি সেরূপ দুই চারিজন প্রধান সহায় আছেন? তদনুরোধে কি একটা ভিন্নরূপ অনুগ্রহের ব্যবস্থা না করিলেই নয়? তবে তাঁহারা যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই কি অনুগ্রহভাজন? এরূপ ধর্ম্মগত ভেদবুদ্ধি কি সমদর্শী, প্রজাবৎসল রাজার পক্ষে শোভা পায়? আমরা ভরসা করি, দেশের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম। বলম্বী ভারতসন্তানেরা রিজার্ভ বলন্টিয়ারদলভুক্ত হইতে প্রবৃত্তিমান্ হইবেন না। আর একটা কথা, বলন্টিয়ারদলের ধুরন্ধরেরা হিন্দু মুসলমানের অর্থসাহায্যগ্রহণকালে বেশ হাত বাড়াইতে পারেন, কিন্তু ইহাদিগকে ঐ সম্প্রদায়ে লইবার বেলায় মুখ ফিরান কেন? ইহা দেখিয়াও যে, দেশীয় দাতাদের জ্ঞানোদয় হয়না, বড়ই আশ্চার্য্যের বিষয়।

এঙ্গলো ইন্ডিয়ান সহযোগীরা [এ] বিষয়ক সংবাদ যেরূপ রটাইয়াছেন, আমাদের তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়না। কেননা ইতিমধ্যে এমনও সংবাদ আসিয়াছে যে, মাদ্রাজের গবর্ণর বলন্টিয়ার গোলন্দাজদলে তথাকার হাইকোর্টের ৩জন হিন্দু উকীল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক হিন্দু অধ্যাপককে গ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রাজে যাহা হইয়াছে, বাঙ্গলার কি তাহা হইবে

না? তবে টমসন সাহেব এখানে রহিয়াছেন এই আশঙ্কা। কিন্তু উৰ্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের যদি অনুজ্ঞা থাকে তাহা হইলে টমসন প্রতিকূল হইয়া কি করিতে পারেন? এবিষয়ে ডফারিনের অভিপ্রায় কি, হিন্দু মুসলমানেরা কেন আবেদনাদি করিয়া তাহা অবগত হউন না?

৫ এপ্রিল, ১৮৮৫

## নববর্ষ

... ইংলন্ড ও ভারত-হতভাগ্য ভারতবাসীর ধনপ্রাণ প্রভুশক্তি প্রিয়, উদরম্ভরি সাহেব সুবাদের চক্ষে অতি সামান্য। আমাদের শাসক, উপশাসকদলে ঐরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। প্রধানতম ভারতশাসক ইঁহাদের প্রতিকূলে চলিতে গেলে মহানর্থ বাধিয়া যায়। ইলবার্টবিল ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতসন্তানের কোনও রাজনৈতিক অধিকার লাভ ও স্বত্ব, স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে উদারমতি ইংলন্ডবাসীর আশ্রয় লইয়া বিলাতে আন্দোলন, আবেদন করিবার একান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয়, গতবর্ষে এ বিষয়ে চেষ্টা হইয়াছে। মহাসভা ভারতকথায় ক্রমে অধিকতর মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাত প্রবাসী ভারতসন্তানেরাও স্বদেশের কথা লইয়া ইংলন্ডে আন্দোলন চালাইতেছেন; ভরসার বিষয়, অনেক ক্ষমতাপন্ন ইংরাজ তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছেন। লর্ডরিপনও স্বদেশে যাইয়া ভারতকথায় বিলাতবাসীর মন বিলক্ষণ আকর্ষণ করিয়াছেন। রেন্টবিল, স্বায়ত্তশাসন বিল, খোলাভাটী প্রভৃতির আন্দোলন আপতত ফলপ্রসূ হয় নাই বটে ; কিন্তু ভাবী সঞ্চার করিয়াছে। আন্দোলনের আশুফল না দেখিয়া কাহারও নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। যুগযুগান্তেই উহার ফল ফলিয়া থাকে।....এখন প্রতি শীতঋতুতেই দুই একজন বিলাতী রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ভারত পরিদর্শনে আসিতেছেন। ইহারা যদি পরের মুখে অম্ল চাকিয়া না যান, ধীরভাবে নিজ চক্ষু কর্ণে দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রতিগত হন, আমাদের অনেক অভাব, অসুবিধা দূরীভূত হইয়া সুখ-শান্তি ঘটিতে পারে। দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের সকলে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যান না বলিয়া উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইবারই আশঙ্কা হয়। তবে দিন দিন বিলাতবাসীদের মধ্যে ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে কালে প্রকৃত সত্য বাহির হইবে এবং প্রতিকূলবাদীদের মুখবন্ধ হইয়া দুর্গত ভারতের সুদিন আসিবে, আশ্বাস জন্মিতেছে।—

...শাসক, উপশাসকদের কার্য্য—বাঙ্গলার লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় গতবর্ষেও সমাজনেতা শিক্ষিতগণকে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে যে চিত্তদৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, অন্যান্য বিষয়েও তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তদীয় বার্ষিক বিবরণীর নিন্দাবাদত সংবাদপত্র-সম্পাদকের কপালে ধরাই রহিয়াছে। রাজপ্রতিনিধির উদার ব্যবহারদর্শনেও তাঁহার শিক্ষালাভ হয় নাই।....টমসনের বিগ্রহে স্বায়ত্তশাসন আইনও অবাঞ্ছনীয়রূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। স্থূল কথা, যিনি বঙ্গের সিংহাসনে আসীন হইবেন শুনিয়া বঙ্গবাসিগণ প্রথমে আহ্লাদে আটখান হইয়াছিলন তাঁহার নানা ব্যবহারেই নিতান্ত অসন্তোষ ও বিরাগ জন্মিতেছে। শাসকের কার্য্যদর্শনের পূর্ব্বে আশায় উৎফুল্ল হইলে যে, অনেক সময় নিরাশ হইতে হয়, টমসন বাহাদুরের আচরণপরম্পরায় বোধহয় সকলেই এই শিক্ষালাভ হইয়াছে।

জাহাজী গোরা, নীলকর, চাকর ও ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতির অমানুষ অত্যাচারে সতীর সতীত্ব ও প্রাণনাশ, দীনহীন নিরাশ্রয় প্রজার ধনপ্রাণহানি গতবর্ষে প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। সতী বিক্টোরিয়ার রাজ্যে সতীক্ষেত্র ভারতে কুলিরমণী সুকুরমনি ও আহ্লাদি এবং রামজীবন বাগ্‌দির ভাগিনেয়ী প্রসন্নকুমারীর উপর ওয়েব, ফ্রান্সিস, ওলটন যে আসুরিক অত্যাচার করিয়া বিচারব্যাঘ্রদের সুবিচার গুণে যেরূপে অব্যাহতি পাইয়াছি—ডিফেন্স এসোসিয়েশন ঐ সকল কুকার্য্যের সমর্থন করিতে যাইয়া যাদৃশ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়, বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইতে হয়। পূর্ণিয়ার নীলকর ওয়াকার কাণ্ড লিপ্ত অসহায় মোহর গোপ ও লালুরাম পাঁড়ে, ম্যাজিষ্ট্রেট উইক্স ও সাহেব সংরক্ষণী সভার স্বজাতিপক্ষ সমর্থক—অন্যায় আচরণপরম্পরায় যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে,--ঢাকার গ্লোভার ও ময়মনসিংহের রোজনকাণ্ডে ইংরাজবিচারকদের যে বিচার বিড়ম্বনা ও জাতীয় পক্ষপাত পাইয়াছে, ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশসাম্রাজ্যে তাহার কোনও প্রতীকার হইল না, ইহাভাবিয়াও বিস্ময়স্তিমিতভাব অবলম্বন না করিয়া পারা যায় না। ঐ সকল আচরণ ও ঈদৃশ বিচার দর্শন করিয়া দেশীয়গণ কি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? যাহাতে এরূপ আসুর অত্যাচার ও পক্ষপাতী বিচারপ্রভৃতি আর হইতে না পারে, সে চেষ্টায় কি সকলেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত নহে? এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি ভারতবাসীর শিক্ষা না হয়, তবে আর কিসে হইবে, জানিনা।

আইন—৪/৫ বৎসরকাল যে বিধান লইয়া বাদ প্রতিবাদ, আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল—বুহুলোকের স্বার্থসম্পৃক্ত জটিল বিষয় বলিয়া লর্ড রিপন যাহা তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ করা উচিত মনে করেন নাই—ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়পক্ষ হইতেই যাহার প্রতিবাদ হইতেছিল, গতবর্ষে সেই রেন্ট আইন পাস হইয়া গিয়াছে। এই আইন-দ্বারা কি জমীদার প্রজা কাহারও হিতপ্রত্যাশা নাই, বরং অনেক অনিষ্টেরই আশঙ্কা রহিয়াছে, সুতরাং বঙ্গ ও বিহারের অধিবাসীদিগের চিত্তে বড়ই ক্ষোভ জন্মিয়াছে। এখনও বিলাত রেন্ট আইনঘটিত আন্দোলন চলিতেছে, স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া পার্লিয়ামেন্ট ও ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট ইহার প্রতিকূলে আবেদন করিবার আয়োজন হইতেছে।

আদালত—বিচারালয়গুলির অবস্থা ও রীতিপদ্ধতি পূর্ব্বানুরুপই রহিয়াছে। কেবল কলিকাতা হাইকোর্টের জজের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়াতে কার্য্যশক্তি কতকপরিমাণে-- বাড়িয়াছে। আদালতের ইংরাজপ্রভুরা বরাবর যেরূপ বিচার বিতরণ করেন, গত বর্ষেও সেরুপই করিয়াছেন,—শ্বেতদুরাচারদের গুরুতর অপরাধে লঘুতর শাস্তিদান করিয়া অদ্ভুত স্বজাতিস্নেহ দেখাইয়াছেন। বিভগীয় আপীলট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার কথা পুনরায় উঠিয়া সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইয়া আছে। এখনও উহা কার্য্যে পরিণত হইতেছেনা কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। গতবর্ষে মজঃফরপুরী জজব্রেটের সুবিচার ও বাবু বিহারীলাল গপ্তের জেলার জজিয়তী লাভ দর্শন করিয়া দেশীয়গণ সবিশেষ সুখী হইয়াছেন। অজাতশ্মশ্রু সিবিলিয়ানসংখ্যা কমে বর্দ্ধিত হওয়াতে ভারতীয় অনেক আদালত বাল্যক্রীড়াক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। যাহাতে ধীরপ্রকৃতি, বর্ষীয়ান লোকসকল পদস্থ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণ নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, সে বিষয়ে সকলেরই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা বিধেয়।

অন্ধকারে আলো-নেটিব সিবিল সার্ব্বিসে প্রতিযোগী পরীক্ষা, ডেপুটীপদলাভে গুণের আদর সার্ব্বে ও অহিফেন বিভাগে দেশীয়ের কতপরিমাণে প্রবেশাধিকার এবং রাজকীয়

কার্য্যে ক্রমে অধিকসংখ্যক দেশীয়ের নিয়োগ অধীনতার অন্ধকারময় ভারতে ক্ষীণতর আশার আলোক আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু রুড়কী ও কুপাসহিলের কুপোষ্যদের অধিকতর সুখ সুবিধা করিয়া দিয়া আমাদের মনের কালিমা বাড়াইয়াই দেওয়া হইয়াছে।

রাজনৈতিক উৎসাহ-ভারতবাসীর রাজনৈতিক উৎসাহ ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইতেছে। সাহেব সংরক্ষিণী সভার অন্যায় পক্ষসমর্থন দেখিয়া দেশীয়গণও নানারূপ প্রতীকার চেষ্টা করিতেছেন ; অনেক কার্য্যেই সজীবতা প্রদর্শনে ত্রুটি করিতেছেন না। রিপণের বিদায়োপ-লক্ষে যে জাতীয়ভাব লক্ষিত হইয়াছে, তাহা নিতান্তই আশ্বাসের বিষয়। এদেশে সভাসমি-তিরও সংখ্যা ও শক্তিবৰ্দ্ধিত হইতেছে। অনেক জেলায় রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে এতদ্বিষয়িনী বৃহতী সমিতির প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মন আশার আলোক দেখা দিয়াছে। পূৰ্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সভাগুলিও উন্নতিতরুর মূল জলসিঞ্চন করিতে ত্রুটি করেন নাই। দেশীয় সংবাদপত্রের শক্তি ও পসার উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছে। ইহারা সাহেবসম্পাদকদের ভারত শুভদ্বেষী মতের প্রতিবাদে সবিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন। দুই দলের সংবাদপত্র সময়ে দেশের সজীবতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজপরুষগণও সংবাদপত্রের শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইতেছেন। ভরসা করি, ভারতবাসীর উৎসাহ, উদ্যম জলবুদবুদের ন্যায় বিলীন না হইয়া ক্রমশ উপচীয়ানই হইতে থাকিবে।

রাজভক্তির পূৰ্ব্ব বিকাশ-লর্ডরিপণের বিদায় উপলক্ষে ভারতবাসী গতবর্ষে যে অপূৰ্ব্ব রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন—হিমালয় হইতে কুমারিকা ও পাঞ্জাব-হইতে ব্রিটিশব্রহ্ম পর্য্যন্ত যে কৃতজ্ঞতার আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইয়াছে, সমস্ত জগৎ তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। মধ্য আসিয়ায় সমরসম্ভাবনা হওয়াতে দেশীয় মিত্ররাজগণ ধন, প্রাণ দিয়া সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াও বিলক্ষণ রাজপ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আর কোনও অধীন জাতি কখনও ঈদৃশী রাজ ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, বোধ হয়না। এসকল দেখিয়া শুনিয়া যে, ইংরাজেরাজ ভারতবাসীকে সম্যক্ বিশ্বাস করিতেছেন না, নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

শিল্প, বাণিজ্য-ভারতের শিল্পবাণিজ্যের কথা তুলিতে ইচ্ছা হয় না। বিজাতীয় বণিকগুণের কৌশলে, আমাদের গবর্ণমেন্টের স্বজাতিহিতৈষণায় এবং দেশীয়দিগের স্বার্থবোধের অভাবে দিন দিনই ভারতের শিল্প, বাণিজ্যের অধোগতি হইতেছে—এদেশে এখন বিদেশীয় দ্রব্যসামগ্রীরই পসার বাড়িতেছে। গতবর্ষেও ভারতবাসী এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। চাউল ও গমের রপ্তানী যে কম হওয়াতে গত সন আয় অনেক কম হইয়াছে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে দেশীয়গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে কি?

রেলবিস্তার—বিলাতে ১০ কোটি টাকা ঋণ করিয়া রেলবিস্তারের কথা হইয়াছে। রেলবিস্তৃতিতে বিলক্ষণ উন্নতিই দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহাতে বিদেশীয় মূলধন প্রযোজিত হইতেছে বলিয়া ভারত ক্রমেই অন্তঃসারশূন্য হইয়া যাইতেছে। গত বর্ষে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, তারকেশ্বর ও হাজিপুর রেলওয়ে খুলিয়াছে। অনেক নতুন রেল পথের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্য্যে মূলধন প্রয়োগ করিয়া ইংলন্ডীয় ধনাঢ্যেরা নিঃস্ব ভারতবাসীর অর্থ শুষিয়া লইয়া যাইতেছেন, এক একজন অল্প দিনে কোটি পতি হইতেছেন, ইহা দেখিয়াও কি এদেশীয় ধনকুবেরগণের জ্ঞানোদয় হইবে না? তাঁহারা কি সুদ গণিয়াই চিরকাল কাটাইবেন।

অন্নকষ্ট—বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাকরাপ্রভৃতি স্থানে অন্নকষ্ট ঘটিয়াছে। নির্দ্ধন প্রজাপুঞ্জের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। অনেকের প্রাণবায়ু ও অকালে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। রাজপুরুষেরা প্রথমত অন্নকষ্টের কথা স্বীকার করিতে চাহেন নাই, কিন্তু যখন ভীষণভাবে শমানের ভেরী বাজিল, তখন আর স্বীকার না করিয়া পারিলেন না অর্থভিক্ষার প্রবৃত্ত হইলেন—মজুরী করাইয়া লোকের প্রাণ রক্ষা করি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে পরিমাণে সাহায্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অগ্নিরাশিতে বিন্দুমাত্র জলক্ষেপ হইল। ভাবগতি দেখিয়া দয়ালুস্বভাব দেশীয়েরা সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি ইহারা সহায়তায় প্রবৃত্ত না হইতেন, বড়ই শোচনীয় অবস্থা ঘটিত। এখনও দুর্ভিক্ষরাক্ষসের প্রকোপ হ্রাস পায় নাই। সথাসাধ্য সাহায্য করিয়া অন্নক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণ রক্ষা করা সকলেই কর্ত্তব্য।.....

১৯ এপ্রিল, ১৮৮৫

## তবে ও ভারত স্বাধীন হইবে

কি মজার আজগবি ফল বিলেতী সভ্যতা, কিবা বাহার আহার সবাতে নব্যতা/ কি ঘটা দালান কোটা ক্যালকাটা সহরে/। ঝড় লণ্ঠন, সেজে চেয়ার মেজেশুনি সন হব/। কি সুন্দর ফেটিনজুরি ট্রামের গাড়ী বাই ছাইকেলে/, ছুটছে বাবু সাহেব বিবি সকালে বিকালে চৌদিকে/ঝাকে ঝাকে বাল বানা কুল। কেউ যাচ্ছে কালেজেতে কেউ যাচ্ছে স্কুল/ এড়াই বটে, ভাবত ললাটে প্রভাতের তারা (এড়া) হতে এ ভারতে ছুটছে সু ধার ধারা/। (এড়া) যবে লাভ করিবে, টাইটেল খিলাত [ অস্পষ্ট ] ভারতে হাতে হাতে বানাবে বিলাত। [অস্পষ্ট ] হিন্দুর পূতিগন্ধ ধরা ধামে জাতিভেদ পুতুল পূজা যাবে জাহান্নমে।/ (অবলা) রমণীকূল হইবে প্রবলা।/ (থাকবেনা) শ্বাশুরী কিবা পরসীর জ্বালা/, ঘুরবেনা রমণী আর এর সোয়ামীরপাকে/, মনের মত পুরুয বাছি লবে চেকে চেকে/, খাবেনা অসারভাত ডাল তরকারি/, সবে খাবে পোলা কোর্ম্মা কাটলেট কারি/। বাছবেনা আর গরু ঘোড়া শুকর মহিষ /। পশু বংশ ধ্বংসি মাংসে পূরাইবে ডিস/। মাংসে মাংস বৃদ্ধি মাংসে হয় বল/। কাড়ি লবে স্বাধীনতা হইয়া প্রবল। হিন্দুর জাতীয়তা গেলে সম্রাট সম্প্রতি/, এদেশে বসাবে আনি স্বদেশীয় জাতি/। আসিবে আইরিয ফ্রেঞ্চ রুষীয় জার্ম্মান/। হিন্দুবেটির বাচ্ছা হবে ইউরেসিয়ান/। হিন্দুর বদলে এসব মিলে উঠবে যেই দিন/। অমনি ভারত ভূমিহইবে স্বাধীন/। হায় কত কালপরে একাল রাত্রি পোহাইবে/। একাল হিন্দুর কূল নির্ম্মূল হইবে।

২৩ অক্টোবর, ১৮৮৭

## লর্ড ক্রস কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভা সংস্কারের পাণ্ডুলিপি

ব্রাডল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভা সংস্কার বিষয়ক পাণ্ডুলিপি উদার নীতি প্রণোদিত ও ভারতবাসীর অভিলাষনুযায়ী হইবে, সুতরাং উহার ভারতীয় রক্ষণশীল কর্ত্তৃপক্ষের কোন মতেই মনোমত হইবার নহে। অতএব এই পাণ্ডুলিপি পার্লিয়ামেন্টে উত্থাপিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন হইল। তদনুসারে ভারত সেক্রেটারী লর্ডক্রস ব্রাডল সাহেবের পূর্ব্বেই এক পাণ্ডু লিপি দাখিল করিয়াছেন, ইহার স্থূলমর্ম্ম এই–ভারতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন দ্বারা সংগৃহীত হইবার যথোচিত সুবিধা বর্ত্তমান না থাকায় গবর্ণমেন্ট দ্বারা সভ্য মনোনীত হইবে।

ভারতীয় ও প্রাদেশিক সকল ব্যবস্থাপক সভারই সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারই সভ্য ১০জন, মাদ্রাজ বম্বেও বঙ্গীয় সভার সভ্য ১০জন হইতে ২০জন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৫জন সভ্য অতিরিক্ত গৃহীত হইতে পারিবেক।

লর্ড রিপন ও লর্ড ডফরিন উভয়েই নির্ব্বাচন প্রথার অনুকূল ; কাজেই ভারত সেক্রেটারী তাঁহাদের মতামত গোপনীয় বলিয়া আপত্তি করতঃ পার্লিয়ামেন্টে উপস্থিত করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু বাধ্য হইয়া উহা দাখিল করিতে তাঁহাতে সম্মত হইতে হইয়াছে। নির্ব্বাচিত সভ্যাপেক্ষা গবর্ণমেন্টের মনোনীত সভ্যসংখ্যা অধিক হওয়া লর্ড ডফরিনের মত ছিল। নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বনের কোন রূপ সুবিধা নাই বলিয়া লর্ড লেন্স ডাউনের প্রকৃতি নহে। ভারত অত্যল্প কালস্থিতির পরেই এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল, তিনি দেশের অবস্থা সম্যক অবগত হইয়া ও পর্য্যালোচনা করিয়াই যে এরূপ লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয়না—

ভারত হিতাকাঙ্ক্ষী লর্ড নর্থব্রুক ও লর্ড রিপন এই পাণ্ডুলিপি নাকি অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমরা কখনই এরূপ সিদ্ধান্ত করিব না যে, তাহারা প্রথার বিরোধী। তাঁহাদের অনুমোদন দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারের আবশ্যকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। তাঁহারাও নির্ব্বাচিত পক্ষপাতী, লর্ড রিপন এ সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে তাহার মতপ্রদান করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বিত হওয়া সম্বন্ধে সদাশয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমগ্র ভারতবাসী প্রার্থনা করিতেছে। এই সামান্য প্রার্থনা উপেক্ষিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভার অন্য কোন প্রকার সংস্কার পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে ভারতবাসীর নিতান্তই অসন্তোষের কারণ হইবে সন্দেহ নাই।

মনোনয়ন প্রথা লোকের প্রীতিকর নহে, কেননা গবর্ণমেন্ট দ্বারা মনোনীত সভ্য সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, তদ্দ্বারা সাধারণের উপকার হইবে না ; কারণ তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইয়া স্বাধীন মত প্রদানে অসমর্থ। সুতরাং চিরপ্রচলিত মনোয়ন প্রথানুসারে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে ভারতবাসীর অভিযোগের কারণ বিদূরিত হইবেক না, দেশীয়গণ কেন যে স্বদেশের হিতাহিত জ্ঞাপনে কোন অধিকার প্রাপ্ত হইবেক না, তাহার কারণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বিত হইয়া সাধারণের প্রতিনিধি গৃহীত হউক তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শুধুই যে আমরা নির্ব্বাচন প্রথার জন্য লালায়িত তাহা নহে। কেবল নির্ব্বাচিত সভ্য দ্বারা এদেশের রাজকার্য্য চলা সম্বন্ধে আমাদেরও সন্দেহ আছে, এবং সে অধিকার বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের নিকট কোন ক্রমেই যখন আমাদের পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন কেবল নির্ব্বাচিত সভ্য দ্বারা ব্যবস্থাপক সভা পূর্ণ করিতে চাহিনা। আমরা চাহি গবর্ণমেন্টের নিকট রাজনীতি অভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তিকে আর চাহি দেশীয় লোকের–নিকট দেশের অবস্থাভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তিকে। সমাংশেই হউক, আর একটু উনিশ বিশ করিয়াই হউক, উভয়পক্ষের মনোনীত সভ্য থাকাই নিতান্ত আবশ্যক। দেশীয় বলিলেই আমরা দেশীয় বুঝিনা, যে ব্যক্তির চরিত্রে দেশীয় অধিকাংশ লোকের সহানুভূতি নাই, তাহাকে দেশীয় বলিয়া গ্রহণ করিলে নিতান্ত জুলুম করা হয়। যে ব্যক্তি দেশীয় ধর্ম্ম সমাজ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, দেশীয় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ও পারসী প্রভৃতি সমাজেহস্তে নির্ব্বাচন সভার দিলে তেমন লোক নির্ব্বাচন

হওয়ার আশঙ্কা নাই। ব্যবস্থাপক সমাজে সম্পর্কিত নানা বিষয়ক ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তখন আপনাপন ধর্ম্ম ও সমাজ বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্নব্যক্তি না থাকা, নিতান্ত অন্যায়। ধর্ম্ম সমাজসমূহের প্রতি নির্ব্বাচন ভার না দিলে ; গবর্ণমেন্ট কখনই তেমন ব্যক্তিকে চিনিয়া লইতে পারেন না। অতএব যাহাতে হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

১৬ মার্চ, ১৮৯০

## আবার মলভারী

কংগ্রেসী বীর পার্সি মলভারী ১২০ সাহেব আছেন এখন বিলাতে। অবশ্য বিন কাজে নহে–কাজে। হিন্দুর দেশে তার বাস, জাতীয় সমিতির বিজাতীয় হিন্দুর সঙ্গে বড় মিশামিশি, ঘেষা, ঘেষী। সুতরাং "ম্লেচ্ছ পার্সি" হইলেও নব্যমতে একজন "পরম হিন্দু"। এই হিন্দু সাহেবের নিকট হিন্দুর রীতিনীতি গুলি বড় বিসদৃশ বোধ হয়, তাই তিনি হিন্দুর বাল্যবিবাহ রহিতের জন্য সেবার লম্ফ ঝম্প দিয়াছিলেন। কাজে কিন্তু কিছুই হয় নাই। সম্প্রতি আবার বিলাতী বক্তৃতামঞ্চে হিন্দুর বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি বিষয় লইয়া আসর জমকাইয়া তুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরিয়াছেন, বোম্বের সেই নামজাদা সূত্রধর নান্দিনী রুকু, আর দাদাভাই নারুজি। এবার মিলেছে ভাল মেয়ে আর পুরুষ। সেবার মলভারী সাহেব ছিলেন একা, তাতেই গোটা দেশটা টলটলায়মান হইয়াছিল, এবার সঙ্গে আরও দুইজন। একেই রক্ষা পাওয়া ভার, তাতে আবার তিন। কি যে একটা ঘটিয়া উঠে বলা যায় না। পার্সি সাহেব শুধু বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বড় বড় সম্পাদক এবং লর্ড, লেডিদিগকেও দলে লইবার জন্য হুটাহুটি ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছেন। সংবাদপত্রে দেখিতেছি, লেডি ও লর্ড নর্থব্রুক লর্ড রিপন, লর্ড ডফারিন প্রভৃতি মলভারী ব্যাপারে যোগ দিয়াছেন। রিপন ও নর্থব্রুকের মত লোক দিগকে দেখিলে দুঃখিত হই বটে, কিন্তু বিস্মিত হইনাই।

এখন কথা হইতেছে গবর্ণমেন্ট কি দেশের শত্রু। সমাজের শত্রু, রাষ্ট্রবিপ্লবাঙ্খী অহিন্দু নির্লজ্জ জীবের আপাত মধুর বাক্য ছটায় মোহিত হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মে আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিবেন? আমাদের এমন ধারণাই মনে আইসে না। বাল্য বিবাহে আঘাত করিলে যে হিন্দুর ধর্ম্মে কর্ম্মে ভয়ানক বাধা পড়িবে, তাহাতে নিশ্চয়, আর বিধবা ও হিন্দু সমাজে কখনই চলিতে পারেনা। জানিয়া শুনিয়া গবর্ণমেন্ট কখনই এহেন আসুরিক প্রস্তাবে পোষকতা করিতে পারিবেন না বা করিবেন না। সে বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু রাজা ইংরেজ বিদেশী বিধর্ম্মী, হিন্দু আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কাজেই আমাদিগকে এত কথা বলিতে হয়, না হইলে এতটা বলার কোন প্রয়োজন ছিলনা। বিশেষতঃ সমাজ বা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কোন কাজে হাত দিতে গেলেই তাহাতে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। লাভের মধ্যে এমন একটা কিছু করিতে গেলে অষ্টাদশ কোটি হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। তাহার ফল আর কিছু হউক, কিনা হউক, যে হিন্দুর রাজাকে দেবতা বলিয়া জানে ও মানে, তাহাদের হৃদয়ে সেই ভক্তি ও বিশ্বাস কিছুতেই টিকিবেনা। অপিচ রাষ্ট্র বিপ্লবকামী পুরুষদিগের মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত হইবে ; ধর্ম্ম ভীরু হিন্দুকে উত্তেজিত করিয়া শেষে তাহারাই যে একটা গোলযোগ ঘটাইবেনা কে বলতে পারে? কাজেই আমরা গবর্ণমেন্টকে ধীরতার সহিত কার্য্য করিতে পরামর্শ দেই। উপসংহারে বলা আবশ্যক ; মলভারী বা তাহার মত বিকৃত মস্তিষ্ক ম্লেচ্ছেরা

হিন্দু সমাজের কেহই নহে। তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও হিন্দুকে কৃচ্ছ্র বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০

## ভারতবর্ষের জাতীয় ভাব

....ভারতবর্ষের জাতীয় ভাব বাণিজ্য, কৃষি, স্বদেশানুরাগ বা রাজনীতি নহে। ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতির বীজ কৃষিক্ষেত্রে নিহিত নাই। রাজনীতি লইয়া আমরা যতই আন্দোলন করি, কেবল আন্দোলনে আর্য্যজাতির প্রকৃত পুনরুত্থান হইবার নহে, হইবে না। আর্য্যজাতির ভাবী উন্নতির বীজ আর্য্যধর্ম্মে। সেই পবিত্রযুগযুগান্তরের অশেষ মূল্যবান সারপ্রাপ্ত মহাক্ষেত্রের সমুচিত কর্ষণ না হইলে, সে বীজে অঙ্কুরোদগম হইবেনা। যেমন ইংরেজ জাতির সর্বকার্য্যে বলিগ্লপ্তি [ বণিকবৃত্তি ] প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ আর্য্যজাতির সমক্ষ কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে । কোন একটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় কার্য্য হিন্দুগণ ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া করেন না। বিলাতী পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের অস্মদ্দেশীয় শিষ্য উপশিষ্যগণ এই সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বর স্মরণকে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার বলিতে পারেন তাহাতে আমাদের শোক বা আপশোষ নাই। তাঁহাদের কথা তর্কের স্থলে সত্য বলিয়া যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, হিন্দুজাতি যদি ভ্রান্ত হয়, তবে তাহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে পারিবে যে তাঁহাদের ভ্রান্তি সত্যের দিকে। আর একটি কথা। ধর্ম্মকে যদি সমস্ত কার্য্যের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া যায়। কোটি কোহিনুর অপেক্ষায়ও যদি ধর্ম্মকে মূলাবান মনে করা যায়। তবে ধর্ম্মের জন্য অধিক সময় ব্যয় করিলাম তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরকে লাভ করাই যদি মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে, ঈশ্বকে যত বেশিবার ডাকিতে বা স্মরণ করিতে পারি, সুখে দুঃখে প্রাতে সন্ধ্যায় সজন নির্জ্জনে যত অধিকবার তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি ত কিছুই কারণ দেখিতেছি না। সংবাদপত্রে এসব বিষয় সম্যকরূপে আলোচিত হইতে পারেনা, তাই আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত দিলাম।

আমাদের এই প্রস্তাবের মূল আলোচ্য বিষয় এই ঃ—ভারতবর্ষের নিজস্ব জাতীয় ভাব ধর্ম্ম ; ভারতবাসী যখন যে কার্য্য করুন, যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন, ধর্ম্মকে তাহার ভিত্তি না করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। আড়ম্বরময় আন্দোলন ক্ষণকাল রজত চাকচক্যে চিত্তকে ভুলাইতে পারে, কিন্তু কালের স্রোতে তাহা বালির বাঁধের মত কোথায় ভাসিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও বলিবার রহিল।

৭ ডিসেম্বর, ১৮৯০

## গবর্ণমেন্টের নিবর্বুদ্ধিতা

রাজা আমাদের শাস্ত্রানুসারে সপ্ত পিতার অন্যতম, সুতরাং পিতার ন্যায় সম্মানার্হ।

সুতরাং তাঁহার দোষ উল্লেখ করায় আমাদের পাপ আছে, ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, অধিকন্তু ভীষণ দণ্ডের আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। তথাপি আমরা যে কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিয়াছি, তদনুরোধে সময়ে সময়ে গবর্ণমেন্টের বহু ত্রুটি আমাদের প্রদর্শন করিতে হয়। দশ বিশ সহস্র টাকা যাঁহাদের বেতন, তাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনায় দোষের উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে অল্প

ধৃষ্টতার কথা নহে ; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, নিতান্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইলেও গবর্ণমেন্টের সেই বহু বেতনভোগীদিগের বিধি ব্যবস্থা ও বিচারের দোষ প্রায়শঃ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হই ।

গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভা খাজনা বিষয়ক আট আইনের সৃষ্টি করিয়া ভূম্যধিকারীদিগকে ন্যায্য উপায়ে খাজানা আদায়েও বঞ্চিত করিয়াছেন। এক টাকা খাজনার জন্য মোকদ্দমায় একশত টাকা ব্যয় হয় দেখিয়া ভূস্বামীগণ খাজনা সমস্ত বাকী থাকিলে ও মোকদ্দমা পার্য্যমানে করিতে পারেন না। যেখানে জমিদার সবল ও প্রজা দুর্ব্বল, সেখানে জমিদার বেআইনী অত্যাচার করিয়া নিজ স্বার্থ রক্ষা করেন বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ভূস্বামিগণ মোকাদ্দমা দ্বারা অথবা অন্য উপায়ে ন্যায্য খাজানা আদায় করিতে না পারিয়া পূর্ব্ব পুরুষের কৃত ভদ্রতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন ভূম্যধিকার গুলি বেচিয়া খাইতেছেন। যাহারা অর্থ বলে প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে পারে, এখনই নিম্ন শ্রেণীর নূতন ধনীরা তাহা কিনিয়া লইতেছে। আইনে ন্যায্য খাজানা আদায়ের যে সামান্য সুবিধা করিলে সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হয়, আমরা তাহা পুনঃ পুনঃ দেখান সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট তাহাতে মনোযোগ দেন না ; ইহাতে গবর্ণমেন্ট দেশের অস্থিসজ্জা স্বরূপ সমস্ত ভদ্র বংশীয়গণের সর্ব্বনাশ করিয়া অভিসম্পাত লাভ করিতেছেন ; অথচ কাহাকেও সুখী করিতে পারিতেছেন না, এতদপেক্ষা নির্ব্বোধের কার্য্য আর কি হইতে পারে ?

এদেশে ইংরাজী ভাষার একান্ত পক্ষপাত দ্বারা বিচার কার্য্যের নিতান্ত বিঘ্ন জন্মান হইয়াছে। একজন উকিল ভিন্ন দেশের পোনর আনা পোনে বিশ গণ্ডা লোক ইংরাজী বুঝেনা। হাকিম সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতেছেন–ইংরাজীতে, ছওয়াল জবাব শুনিতেছেন–ইংরাজীতে রায় লিখিতেছেন–ইংরাজীতে ; সমস্ত কার্য্য ইংরাজীতে–হইতেছে ; অথচ যাহার মোকাদ্দমা সে ইংরাজী বুঝে না। তাহার নির্ভর উকিলের উপরে ; তিনি নানা জনের নানা কাজে ব্যাপৃত ; প্রকৃত ঘটনা তাঁহাকে জানান হয়, তিনি তৎসমস্ত বিশেষ মনোযোগসহ স্মরণ রাখিয়া যে যথাসময়ে আদালতকে জানাইবেন, এমন অবকাশ অধিকাংশ উকিলের নাই। অনেক উকিল উৎকোচাদি গ্রহণের অপরাধে মাঝে মাঝে ধরা না পড়েন, তাহাও নহে। যদ্যপি নানা প্রকার পাপ কার্য্য কোন উকিলকে লিপ্ত দেখা যায়, তথাপি সেই উকিলের প্রতিসমস্ত মক্কেলের ধন প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। উকিল বিপক্ষের উৎকোচের বাধ্য হইয়া মক্কেলের পক্ষে কর্ত্তব্য কাজ না করিয়া যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন ; এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞতা বশতই যে মক্কেল তাহা জানিতে পারে না, এই সোজা কথাটা গবর্ণমেন্ট এতকাল মধ্যে বুঝিলেন না। যে ইংরাজীর মহিমায় লক্ষ লক্ষ মোকাদ্দমাকারীদিগের সর্ব্বনাশ এবং কাহারও কাহারও প্রাণ নাশ পর্যন্ত হইতেছে, গবর্ণমেন্ট দিন দিন সেই ইংরাজীর প্রসার বাড়াইয়া ২৮ কোটি লোকের মধ্যে জন কতক উকিল আমলা ছাড়া আর সমস্ত লোকের বিরক্তি ভাজন হইতেছেন ; ইহাও কি নিবর্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে ?

হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা প্রদানের সুবিধা না করিয়া গবর্ণমেন্ট পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা বহু বিস্তৃতরূপে প্রদান করিতেছেন। যত কৃষক নন্দন হাল ছাড়িয়া বহী ধরিয়াছে, ইহাতে কৃষিকার্য্য ভালরূপ হইতে না পারায় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে। যত শিল্পীর সন্তান শিল্প কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাটক নভেল পড়িতেছে ; ইহাতে সমস্ত শিল্প কার্য্যের ঘোরতর অবনতি হইতেছে। যেসকল প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য এদেশ হইতে বিদেশে যাওয়ায় প্রচুর

অর্থোপাৰ্জ্জন হইত, সেই সকল শিল্পের জন্য ভারতের সমস্ত ধন–বিদেশে যাইয়া এদেশকে নিতান্ত দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছে ; এই দরিদ্রতা বশত ও যে এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষাদিতে মরিতেছে, তাহাও গবর্ণমেন্ট অবগত হইয়াছেন। শিক্ষার পুস্তকে ও শিক্ষকের উপদেশে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে মতসমূহ অবগত হইয়া ছাত্রগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরতর নাস্তিক হইয়া উঠিতেছে। যেরূপ শিক্ষার মহিমায় ইউরোপে নিহিলিষ্ট, কমনিষ্ট, কেনিয়ান, সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি রাজদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী সম্প্রদায়সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে ; যেরূপ মত প্রভাবে স্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজা মহারাজদিগকেই সর্ব্বদা কাঁপিতে হয়—অনেকের প্রাণাত্যয় পর্যন্ত হয় সেই শিক্ষা এই বিদেশের বিজাতীয় বিধর্ম্মদিগের মধ্যে কেমন যে ভীষণ দুর্ঘটনার আয়োজন হইতেছে, গবর্ণমেন্ট তাহাও এতকাল মধ্যে না বুঝিয়া ঘোরতর নিৰ্ব্বুদ্বিতার পরিচয় দিতেছেন। এদেশের যে হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষায় রাজাকে ঈশ্বররূপে অথবা সমস্ত দেবতারূপে জানা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরোধে সে শিক্ষা একেবারে রহিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভিন্ন এখন এক পদ চলিবার উপায় নাই ; পাশ্চাত্য শিক্ষা ভিন্নরাজার অনুগ্রহ, সুবিচার, এমন কি,—জীবনধারনোপযুক্ত উপার্জনের পথ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়না, সুতরাং এ দেশের লোককে বাধ্য হইয়া ইংরেজী শিখিতে হয় ; যে শিক্ষায় রাজার প্রতি–মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি। বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই শিক্ষাতে প্রাণ রক্ষা পায় না দেখিয়া, যে শিক্ষাতে রাজাকে নিজের সমান মনে করার উপদেশ, সেই শিক্ষা লাভ করিতে হয়। এমন শিক্ষার পরিবর্ত্তে আমরা গবর্ণমেন্টকে পুনঃ পুনঃ প্রকৃত হিন্দুর মতানুসারে শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেও তিনি তাহা শুনিতেছেন না। এতদ্বারা তিনি এদেশবাসীর ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট করিয়া নিজের পায়ে যে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছেন ; ইহাও তিনি এতকালে বুঝিলেন না ; এতদপেক্ষা নিবেবাধের কার্য্য আর কি হইতে পারে ?

এদেশে খ্রীষ্টান পাদ্রিদিগের ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা ও সাহায্য করিয়া গবর্ণমেন্ট অতি ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছেন। আমরা কয়েদী সংখ্যার রিপোর্ট হইতে পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছি, এদেশে হিন্দু মুসলমানের অপেক্ষা খ্রীষ্টানেরা অত্যন্ত বেশী পরিমাণে পাপী। এদেশে খ্রীষ্টানের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হিন্দু–মুসলমানের তুলনায় না হওয়া সত্ত্বেও খ্রীষ্টান অপরাধীর সংখ্যা এত বেশী পরিলক্ষিত হয়, যে জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও এ পর্য্যন্ত প্রতি হাজার হিন্দুর মধ্যে গড়ে মাত্র .৪৩৯ হিন্দুকে অপরাধীরূপে পরলক্ষিত হয়, কিন্তু পাপের উপযুক্ত শাস্তি না পাইলেও খ্রীষ্টান অপরাধীর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১.৯১। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এরূপ হীনতা সত্ত্বেও সেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দু মুসলমানকে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট অথবা স্বধর্ম্মে সন্দিহান করিবার চেষ্টা কেমন নিৰ্ব্বুদ্ধিতা, তাহা গবর্ণমেন্টের খ্রীষ্টীয় মতের পক্ষপাতী পরিচালক কোন ক্রমেই বুঝিতেছেন না। যে সকল দেশের লোকেরা ধর্ম্মজ্ঞান রাখে না, তথায় খ্রীষ্টানেরা ধর্ম্ম প্রচার করুন, তাহাতে গবর্ণমেন্ট সাহায্য করুন, অর্থ ব্যয় করুন, তাহা অবশ্যই ভাল কথা ; কিন্তু যে দেশের ধর্ম্মজ্ঞান খ্রীষ্টানের ধর্ম্মজ্ঞান অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতেছে, সে দেশে খ্রীষ্টানী প্রচার দ্বারা যে কেমন ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করা হইতেছে, তাহা গবর্ণমেন্টের না বুঝা নিতান্তই বিস্ময়ের কথা। ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক করার মত নিৰ্ব্বুদ্ধিতা বোধ হয় আর কিছুতে প্রকাশ পায় না। খ্রীষ্টীয় প্রচারের দোষে হিন্দু সন্তান খ্রীষ্টান হইলেও যে তাহার পাপ বৃদ্ধি পায়, ইহা পরীক্ষিত ; কিন্তু

ওরূপ খ্রিষ্টানও অধিক লোকে হয় না। ঐ প্রচারের দোষে অধিকাংশ হিন্দু সন্তান যাহা হয়, তাহার বরং চিন্তা করিলে একবার হতবুদ্ধি হইতে হয়। তাহারা খ্রিষ্টীয় প্রচারকের নিকটে শুনিতে পায়, হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম প্রতারকের উদ্ভাবিত, উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ইহা শুনিয়া তাহারা বুঝে, যদি বহু প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মই প্রতারকের ধর্ম্ম হয়, তবে খ্রিষ্টীয়ানাদি ধর্ম্মও প্রতারকের আবিষ্কৃত মিথ্যা। অতএব সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, পরকাল মিথ্যা। যাহাতে সুখ হয়, তাহাই সুতরাং করিতে পারা যায় ; অতএব রাজার চক্ষেধূলি দিয়া চুরি ডাকাতি বদমায়েসী-যে কোন উপায়ে ইন্দ্রিয়ের সুখ বৃদ্ধি করাই কর্ত্তব্য।" এই মতেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজ সর্ব্ব প্রকার পাপ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ক্রমে সমস্ত লোকই স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট বা সন্দিহান হইয়া অধঃপাতে যাইতেছে। এতদ্বারা হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণ পাপী হইলে গবর্ণমেন্টের আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস বশতঃ রাজভক্তির অভাবে, অথচ রাজস্ব প্রদানাদি জন্য রাজাকে গলগ্রহ মনে করাতে এদেশে গবর্ণমেন্টের প্রতি কিরূপ ভাবের উৎপত্তি হইতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করাও কি গবর্ণমেন্টের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে?

১ জুলাই, ১৯০০

## বিষম অত্যাচার

ব্রহ্মরাজ থিবকে পদচ্যুত করিয়া ইংরাজ ব্রহ্মাধিকার করিয়াছেন, আমরা সে জন্য কান্দিতেছি ; দলিপ সিংহের জন্য কান্দিতেছি ; মলহর রাওকে রাজ চ্যুত করা হইয়াছে বলিয়া কান্দিয়াছি ; এইরূপ আমরা অনেকের জন্য কান্দিয়াছি ও কান্দিতেছি। কান্দিবার কথাই বটে, মৃত পুত্রকে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পুত্র মরিতে দেখিলে না কান্দিয়া পারেনা, কেননা, পুত্র নাশের শোক তাহার হৃদয়ের পরলে পরলে [ অস্পষ্ট ] থাকে ; যে-মনই আর একটী শোকের আদর্শ উপস্থিত তাহা প্রতিফলিত হয়। আমরা পরের জন্য কান্দিতেছি বটে, কিন্তু নিজ কান্না ও সময়ে সময়ে না কান্দিয়া পারি না। আমরা যে পুত্র হারা হইতেছি, তাহা ভুলিবার নহে ; ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। সত্য বটে, [ অস্পষ্ট ] পুত্র একেবারে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে [ অস্পষ্ট ],—প্রথম একটী যুদ্ধে ইহার হাত পা-ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার পরে তাহার বাক্‌শক্তি অপহৃত হয়, তার পর তাহার শরীরে গলিত কুষ্ঠ রোগ সংক্রামিত করা হয় ; শেষে সেই ক্ষতাঙ্গে এমনই করিয়া সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র সস্ত্র বান্ধিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যদ্বারা কোন প্রকারেই তিষ্ঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই বিপন্নপুত্রের সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে যেরূপ ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি ; তাহাতে ইহার মরণের শোক অধিক নাই বটে, কিন্তু পুত্রের মরণ, বিষয়টী এমন গুরুতর যে সে শোক কিছুতে ভুলিবার সাধ্য নাই। অহর্নিশি থাকিয়া থাকিয়া পুত্রের বিপদগুলি মনে পড়ে, আর সেই অত্যাচার মনে পড়ে।

পাঠক বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন, আমাদের পুত্রটীর নাম বাঙ্গালার জমিদারী। কোন যুদ্ধে ইহার হাত পা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন ইহার বাক্‌শক্তি নষ্ট করা হয়, ১৮৫৯ সালের ৮ আইন দ্বারা ইহাকে গলিতে কুষ্ঠাক্রান্ত করা হয়, আর ১৮৮৫ সালের আট আইন দ্বারা ইহার অষ্টঙ্গে শোণিত অস্ত্র শস্ত্র সংযোজিত করা হইয়াছে। এখন বাছার মরণের আর বাকি নাই। গলিত কুষ্ঠে বাছার শরীর খসিয়া পরিতেছে ; চারিদিকে হইতে মাছি উড়িয়া আসিয়া বাছার ক্ষতাঙ্গে হুল বসাইতেছে ;

—আর ঐ দেখ, বাছার অন্নে প্রতিপালিত অথবা অশ্রয় প্রাপ্ত কুকুর শৃগালগণ লেলিহান জিহ্বায় চারিদিকে ঘিরিয়া আছে। অস্ত্র শস্ত্রের জন্য বাছার লড়িবার সাধ্য নাই, মাছিটী তাড়াইবার শক্তি নাই, কান্দিবার বাক্‌শক্তি নাই ; শুধু আছে অন্তরে অন্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে দারুন জ্বালা, ছট্‌ফ্‌টি–অন্তর্দাহ। বাছার মরণের আর বাকি নাই।—

আমরা থিব, দলিপসিং প্রভৃতির রাজ্য ইংরাজ অন্যয়তঃ গ্রহণ করিয়াছেন জন্য ইংরাজের বহুল অত্যাচার করিতেছি, কিন্তু বাঙ্গালার যে শত সহস্র রাজা রাজ্যচ্যুত হইতেছেন, তাহা কি অত্যাচার ঘোষণা হইতেছে না? নব্যপাঠক ব্রহ্মরাজের সহিত বাঙ্গালার রাজার তুলনা দেখিয়া চমকিত হইতে পারেন? আমরা এজন্য একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি।

রাজা শব্দের অর্থ প্রজারঞ্জনকারী। যিনি অধীন প্রজা মণ্ডলীকে আপনার অধীনে সুখে শান্তিতে রাখিতে পারেন তিনি রাজা, পাঠক, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির সময় স্মরণ করিয়া দেখুন, তখন এই ভারতেই লক্ষাধিক রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। [ অস্পষ্ট ] যত প্রজা থাকিতে পারে, তাহা আধুনিক জমিদারের প্রজাপেক্ষা অধিক নহে। অতএব অল্প ও অধিক প্রজার জন্য রাজা নামের, তারতম্য হয়না। বিশেষতঃ ব্রহ্মরাজের যতগুলি প্রজা ছিল, নাটোর, নদীয়া প্রভৃতি রাজ্যে তদপেক্ষা বড় কম প্রজা ছিলনা। রাজার উপরে সম্রাট কখন থাকে, কখন থাকেও না। সম্রাট হইলেই রাজার ক্ষমতা নষ্ট করিতে হয়না। সম্রাট রাজার উপর কর আদায় করেন, আধিপত্য করেন, কিন্তু প্রজার উপর রাজার ক্ষমতা থাকেই। যিনি সম্রাট নামের অধিকার, তিনি সাধারণ প্রজাকে শাসন করা বরং অপমান বোধ করেন, কাজেই তাঁহার অধীনে একটী রাজার শ্রেণী রাখিতে হয়। বণিক্ রাজার পূর্ব্বে সকল সম্রাটেরই এইরূপ পদ মর্যাদার দিকে দৃষ্টি ছিল। মুসলমান সাম্রাজ্যে ও এপদ মর্যাদা অতিক্রম কর হয় নাই, এজন্যই রাজা শব্দের যাবনিক অর্থে 'জমিদার' নামের প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলমান আমলে জমিদারগণের ক্ষমতা রাজার ক্ষমতার ন্যুন ছিলনা। জমিদারগণই আপনার অধীন প্রজাদিগের শাসন সংরক্ষণ করিতেন। পাঠক বঙ্গের বারভূঞার নাম শুনিয়াছেন। আর যে রাণী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির ক্ষমতা জানেন, তাঁহারাও সেই জমিদার—ছিলেন। এই সকল জমিদারের হাতেই সাম্রাজ্য বন্দোবস্ত হইত। এখন পাঠক বুঝিলেন,—ব্রহ্মরাজ ও রাজা, বাঙ্গলার জমিদারও রাজা। ব্রহ্মের উপর চীনের অধিপত্য থাকিলেও যেমন ব্রহ্মবাসী প্রজাশসন করিতে ব্রহ্মরাজের ক্ষমতা ছিল, বাঙ্গালায় বৃটিশ অধিপত্য হইলেও জমিদারগণ প্রজাশাসন করিতে সেইরূপ ক্ষমতাবান ছিলেন। কিন্তু বণিক গবর্ণমেন্ট এদেশী জমিদারের সাহায্যে যেমনই আপনার আধিপত্য এদেশে স্থাপন করিলেন, অমনি জমিদারের ক্ষমতাগুলি আপনার আয়ত্ত করিতে লাগিলেন, যখন জমিদারের আদালত ফৌজদারী ঘটিতবিচার ক্ষমতাগুলি নিজে গ্রহণ করিলেন, তখন ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র জমিদারগণ বিশেষ আপত্তি করিতে পারেন নাই। তখন আপত্তি করিবার কারণও বিশেষ ছিলনা। আজ বণিক গবর্ণমেন্ট কোর্টফি দ্বারা যে বিচারটেক্সে বা মোকাদ্দমার খরচ আদায় করিতেছেন, পূর্ব্বে সে রীতি ছিলনা। প্রজার শান্তি রক্ষার জন্য জমিদার নিজে ব্যয় বিধান করিয়া বিচার করিতেন, দূষী সাব্যস্থ হইলে আসামীকে জরিমানা ও প্যাদার রোজ যৎসামান্য দিতে হইত বটে, কিন্তু বাদীকে মোকাদ্দমার খরচ দিতে হইতনা। গবর্ণমেন্ট এই বিচার ক্ষমতা রহিত করাতে জমিদারের আর্থিক ক্ষতি বিশেষ হয় নাই। এজন্য জমিদারগণ সেই ক্ষমতা হারানে বিশেষ আপত্তি করেন নাই। কিন্তু, গবর্ণমেন্ট যখন এই বিষয়ে নাটোরের মহারাজের সম্মতি লইতে যান, তখন তিনি কিছুতেই সে ক্ষমতা

ছাড়িতে সম্মত হন নাই তিনি সম্মত না হওয়ায় গবর্ণমেন্ট সৈন্য সামন্ত দ্বারা ইহাকে আটক করেন। ইনি ইংরাজের নিকট আবদ্ধ হইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসে অবস্থিত করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার সাথের সাথী কেহই এসময়ে অগ্রসর হইতে সমর্থ নহে, তিনি স্বীকার না করিলেও ইংরাজের গ্রাস হইতে সে ক্ষমতারক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না, তখন তিনি সম্মুচ্চস্বরে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, "ইংরাজ, আজ জানিলাম–তুমি এদেশের সর্ব্বস্ব লইবার জন্যই সমাগত হইয়াছ, লও, বিচার ক্ষমতা, লও, তোমার যাইচ্ছা তাই—কর।" গবর্ণমেন্ট সেই অবধি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সোনার মত মুখ করিয়া বিচার ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। গবর্ণমেন্ট এই ক্ষমতা হরণ করিলেন বটে, কিন্তু জমিদারগণ ও আপনাদের কর্ত্তব্যসাধ্যপক্ষে আপনারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিরূপ রক্ষা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বাপর মোকাদ্দমার পরিমাণ তুলনা করিলেই পাঠক বুঝিবেন। প্রজাগণ, ভূস্বামীর ক্ষমতা যখন যে পরিমাণ স্বীকার করিয়াছে, তখন সেই পরিমাণে মোকদ্দমার সংখ্যা কম ছিল। কেবল মোকদ্দমার কম ছিলনা, তখন বিনা দলিলে দস্তাবেজে আন্ধাররাতে কারবার চলিত ; অতি অল্প পরিশ্রমে ভাত জুটিত, লোকে অবসর সময়ে ব্যায়াম চর্চ্চা করিত, সদা সুখ সচ্ছন্দে মাতিয়া থাকিত। এখন ও যেখানে বড় জমিদারের আধিপত্য অধিক, সেখানে মোকাদ্দমার পরিমাণ খুব অল্প, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ খুব বেশী। প্রস্তাব বড় হওয়ায় এবার পর্যন্তই শেষ করা গেল, বারান্তেরে দেখাইব, ব্রহ্মরাজের প্রতি অত্যাচারই অধিক কি এদেশের জমিদারের প্রতি অত্যাচার অধিক।

১৪ নবেম্বর. ১৮৮৬

## সংবাদ সাময়িকপত্র

১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ–সাময়িকপত্রের সংখ্যা মোট ৯০৫টি। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮০টি। কিন্তু, এ ছাড়াও খোঁজ পাওয়া গেছে আরো ৭২টি সংবাদ সাময়িকপত্রের। ফলে উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রের সংখ্যা মোট ২৫২ টি বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু এ চিত্রের অন্য আরেকটি দিক আছে। যদি, শুধু মাত্র পূর্ববঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিচার করি এবং সে সময়কার পূর্ববঙ্গের চিত্রটি মনে রাখি তা হলে বিষয়টি অকিঞ্চিৎকর মনে নাও হতে পারে। কারণ, বাংলাদেশ ছিল তখন বনে জঙ্গলে ঢাকা, এবং বহির্বিশ্বে কেন বাংলাদেশেরই অনেক অঞ্চলের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং সে সময় সংবাদ–সাময়িকপত্র প্রকাশ হওয়াই ছিল অভাবনীয় ঘটনা।

১৮৫৭ সালের আগে প্রকাশিত দু'একটি পত্র–পত্রিকার কথা বাদ দিলে, সত্যিকার অর্থে পূর্ববঙ্গে সংবাদ সাময়িকপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিলো ষাটের দশকে। পত্রিকার সম্পাদকরা বাংলা সংবাদপত্রের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পটভূমিকা সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। বলা যেতে পারে, পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা যাত্রা শুরু করেছিলেন। আমরা যদি উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রকে মধ্যশ্রেণী/প্রবল শ্রেণীর ভাবনার জগতের মাপকাঠি হিসেবে ধরি তাহলে দেখব উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণীর অনেক বৈশিষ্ট্যই এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আগের আটখণ্ডে বিশেষত প্রথমখণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ সিরিজের প্রথমখণ্ডে পৃ. ৪২–৪৫ এর মধ্যে যে সারণি দেওয়া হয়েছিল তাতে কিছু ত্রুটি ছিল। তা ছাড়া গত ১৫ বছরে আরো কিছু সংবাদ সাময়িকপত্রের খোঁজ পেয়েছি। এখানে তাই নূতনভাবে সংশোধিত করে তিনটি সারণি দেয়া হলো —

**সারণী : ১ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা**

| অঞ্চল | প্রকৃতি | | সময়কাল | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৮৪৭-৬০ | ১৮৬১-৭০ | ১৮৭১-৮০ | ১৮৮১-৯০ | ১৮৯১-১৯০৫ | মোট |
| ঢাকা | সাপ্তাহিক | ১ | ৬ | ৬ | ৯ | ১ | ২৩ |
| | পাক্ষিক | | ১ | ১ | | | ২ |
| | অর্ধসাপ্তাহিক | | ১ | | | | ১ |
| ময়মনসিংহ | সাপ্তাহিক | | | ৪ | ২ | ১ | ৭ |
| | পাক্ষিক | | | | ২ | | ২ |
| চট্টগ্রাম | সাপ্তাহিক | | | ১ | ৩ | | ৪ |
| | পাক্ষিক | | | ১ | ১ | | ২ |
| কুমিল্লা | সাপ্তাহিক | | | ২ | ১ | ১ | ৪ |
| | পাক্ষিক | | | | | ১ | ১ |
| নোয়াখালি | সাপ্তাহিক | | | | ১ | | ১ |
| সিলেট | সাপ্তাহিক | | | | | ১ | ২ |
| | পাক্ষিক | | | ১ | | ২ | ৩ |
| পাবনা | সাপ্তাহিক | | | ১ | ১ | | ২ |
| | পাক্ষিক | | | ১ | | | ১ |
| রাজশাহী | সাপ্তাহিক | ১ | ১ | ১ | | | ২ |
| | পাক্ষিক | ১ | | | | ১ | ২ |
| বগুড়া | সাপ্তাহিক | | | | | ১ | ১ |
| যশোর | সাপ্তাহিক | | ১ | | ১ | | ২ |
| রংপুর | সাপ্তাহিক | ২ | | | | | ২ |
| কুষ্টিয়া | সাপ্তাহিক | | | ১ | | | ১ |
| | পাক্ষিক | | ১ | | ১ | | ২ |
| ফরিদপুর | সাপ্তাহিক | | | | ১ | ১ | ২ |
| বরিশাল | সাপ্তাহিক | | | ২ | ১ | ২ | ৫ |
| | পাক্ষিক | | ১ | ১ | ২ | | ৪ |

## সারণী : ২ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা

| অঞ্চল | প্রকৃতি | | সময়কাল | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৮৪৭-৬০ | ১৮৬১-৭০ | ১৮৭১-৮০ | ১৮৮১-৯০ | ১৮৯১-১৯০৫ | মোট |
| ঢাকা | সাপ্তাহিক | ৪ | ৮ | ১০ | ১৭ | ১২ | ৫১ |
| | পাক্ষিক | | ১ | | ১ | ১ | ৩ |
| | সাপ্তাহিক | | | | ১ | ১ | ২ |
| ময়মনসিংহ | ত্রৈমাসিক | | | | ১ | | ১ |
| | মাসিক | | ২ | ৭ | ৯ | | ২০ |
| চট্টগ্রাম | মাসিক | | | ২ | ৪ | ১ | ৭ |
| কুমিল্লা | মাসিক | | | | ১ | ২ | ৩ |
| নোয়াখালি | মাসিক | | | | | ১ | ১ |
| সিলেট | মাসিক | | | | ১ | ৪ | ৫ |
| পাবনা | মাসিক | | ২ | ২ | ২ | ১ | ৭ |
| রাজশাহী | মাসিক | | ২ | ১ | ৫ | ২ | ১০ |
| বগুড়া | মাসিক | | | ১ | | | ১ |
| যশোর | মাসিক | | | | ৭ | ৫ | ১২ |
| | পাক্ষিক | | ১ | | | | ১ |
| রংপুর | মাসিক | | ১ | | | ৫ | ৬ |
| কুষ্টিয়া | মাসিক | | ২ | | ২ | ২ | ৬ |
| | ত্রৈমাসিক | | | | | ১ | ১ |
| ফরিদপুর | ত্রৈমাসিক | | | | | ১ | ১ |
| | মাসিক | | | ২ | ১ | ৩ | ৬ |
| বরিশাল | মাসিক | | | ৩ | ২ | ১ | ৬ |
| | পাক্ষিক | | | ২ | | | ২ |
| | সাপ্তাহিক | | | ২ | | | ২ |
| দিনাজপুর | মাসিক | | | ১ | ১ | | ২ |
| খুলনা | মাসিক | | | | | ২ | ২ |

সারণী : ৩ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত মোট সংবাদ সাময়িকপত্রের সংখ্যা

| সংবাদপত্র | মোট | সাময়িকপত্র | মোট |
|---|---|---|---|
| সাপ্তাহিক | ৫৮ | ত্রৈমাসিক | ৪ |
| পাক্ষিক | ১৯ | মাসিক | ১৪৫ |
| অর্ধসাপ্তাহিক | ১ | পাক্ষিক | ৬ |
| বিজ্ঞাপিত | ৫ | সাপ্তাহিক | ২ |
| | | প্রকাশকাল বা স্থান | ৫ |
| | | জানা যায়নি | |
| সর্বমোট ২৫২ | | বিজ্ঞাপিত | ৭ |

# সংকলন

## বিজ্ঞাপন

### আরতী ভাণ্ডার

উক্তনামে একখানী ৮ ফর্মা সাময়িকপত্র আমাদিগের যত্নে আগামী মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। উহাতে বঙ্গ সাহিত্য সংসারের নানা বিষয় লিখিত হইবে। মূল্য প্রত্যেক সংখ্যার আট আনা। ছয় খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেক খণ্ডে তিন আনা।

শ্রী কালিদাস মিত্র
শ্রী হরিচন্দ্র মিত্র, ম্যানেজার।[১২৭]

৯ নভেম্বর ১৮৬৯

[ বিজ্ঞাপন ]

আমি ভবিষ্যতে আমা হইতে একখানি মাসিকপত্র প্রচরণ কার্য্য দর্শন করিতেছি। একশত জন গ্রাহকের পত্র পাইলে তাহা প্রচারণ করিব। মূল্য মাসিক ডাক মাসুলসহ তিন আনা। পত্রের আয়তন ৮ পেজি ফর্মার এক ফর্মা।

ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র মাসিক পত্র
২৯ শে মার্চ সম্পাদক।[১২৮]

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০

### নূতন পুস্তক

বরিশাল বার্তাবহ–এখানি বরিশাল ঝালকাঠি হইতে প্রতিপক্ষে প্রকাশিত হয়। ইহারও আয়তন দুই ফরমা। ইহাতে রাজকীয়, সামাজিক ও নানা প্রকার সংবাদাদি লিখিত হয়। সংবাদ পত্রাদি উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে সহসা মতামত প্রকাশ করা দুস্কর। অতএব আমরা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রহিলাম। এখন এই বলিতে পারি, সহযোগিগণ, যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তবে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে। এবং পরস্পর সহায়তায় আমরা অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।[১২৯]

তত্ত্বকুসুম (পদ্য পুস্তক) পোগোস স্কুলের ছাত্র। শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল্য দুই আনা। ইহাতে ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি উত্তম উপদেশ লেখা হইয়াছে। যাঁহারা সর্ব্বদা কবিতার নূতনত্ব ইচ্ছা করেন এই পুস্তক খানা তাঁহাদের বিশেষ প্রীতিকর নাও হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ধর্মানুরাগী সদালোচনা তৎপর তাঁহাদের চক্ষে ইহা রমণীয় বোধ হইবে। কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দের লেখাটুকুতে মধ্যে মধ্যে ছন্দপতন হইয়াছে।

## বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে সংবাদসার নামে একখানি অভিনব মাসিক পত্রিকা প্রতিমাসে যথানিয়মে গদ্য পদ্য রচিত বিবিধ হিতকর প্রবন্ধে পুরিত হইয়া প্রকাশিত হইবেক। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিনটাকা, মাসিক চারি আনা ডাক মাসুল মাযিক ।।০ আনা মাত্র নির্ধারিত হইল। যে কোন মহাশয় ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষ করিবেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুর্গাচরণ মিত্রের ইষ্ট্রিট ৮ নম্বর দাওয়ালে গলিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে পত্র লিখিবেন।

২৪ এপ্রিল, ১৮৭০

## নূতন পত্র

মিত্রপ্রকাশ এখানি মাসিক পত্র। ইহার সম্পাদক সাধারণ্যে অপরিচিত নহেন। শ্রীযুক্তবাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক। হরিশ বাবুর কবিতাশক্তি সর্ব্বত্র পরিচিত। অতএব পাঠক বর্গের নিকট আর লেখার উৎকর্ষাপকর্ষের বিষয় বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই পত্রিকার লিখিত উদ্দেশ্য হইতে কতদূর উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, তদ্বারাই ইহার বিষয় পাঠকগণ বিশেষ জানিতে পারিবেন।

"আমরা দেশ, কাল, পাত্র, তথা আত্ম অবস্থা এবং ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া এই নব পত্র সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবধারনে বাধ্য হইয়াছি। ইহা সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ইহার আয়তন ৮ ফর্ম্মা. দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫ পাঁচ টাকা, ষাট খণ্ডের মূল্য ৩ টাকা প্রত্যেক খণ্ডের ।।০ আট আনা। প্রদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাক মাসুল পৃথক দিতে হইবে। ইহার লেখা এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য স্বল্পাক্ষরে এই মাত্র বিজ্ঞাপ্য, এখানীতে ভাষার এবং বঙ্গ সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয় সকলই বিন্যস্ত হইবে। যাহাতে বঙ্গভাষার উন্নতি, বঙ্গীয় কবিদিগের কাব্যকলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণ্যের বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়, "মিত্র প্রকাশ" সর্ব্বথা তৎপতি অবহিত থাকিবে। শুদ্ধ সম্পাদকীয় রচনামালায় ইহা পরিপুরিত হইবে না। অন্যান্য সাময়িকপত্র সকলের যেরূপ পাঠ মাত্র প্রয়োজন নিরশোষিত হয়, "মিত্র প্রকাশ" সেইরূপ হইবে না। গ্রাহকগণ ইহার সংখ্যা যথাক্রমে নিবন্ধ করিয়া রাখিলে বৎসরান্তে অনেকগুলি কাব্য নাটক পদ্য প্রবন্ধ তথা বঙ্গীয় কাব্যকারগণের চরিতমালা ও তাহাদিগের প্রণীত কাব্যকলাপের সমলোচন দেখিতে পাইবেন। ইহা প্রায়ই প্রতিমাস একবার প্রচরিত হইবে। এই সাহিত্য বিষয়ক পত্রের "মিত্র প্রকাশ" নাম দৃষ্টে গ্রাহকগণ নামটির সংলগ্নতা বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন, অতএব তদ্বিষয়ে বিজ্ঞাপ্য এই-মিত্র শব্দার্থ যখন সূর্য্য, বন্ধ এবং উপাধি বিশেষ গণ্য হইয়াছে তখন ইহার একটা না একটা গ্রহণ করিলেই পত্র খানির পক্ষে নামের অসংলগ্নতা দোষাশংকা রহিবে না।"

ঈদৃশ পত্রিকা এদেশে অতিবিরল। নাই বলিলেইও হয়। যদি এখানি সুন্দররূপে চলিয়া উঠে, বাংলা সাহিত্যের অনেক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই, হরিশ বাবু এখন নিতান্ত অসুস্থকায় আছেন। যাহা হউক হরিশ বাবুর এই কার্য্যের বিঘ্নাপাত না হয়, এই প্রার্থনা।[১৩০]

১৮ মে, ১৮৭০

## ইংলিশম্যান ও ঢাকা প্রকাশ

ইংলিশম্যান[১৩১] সম্পাদক বাংলা সংবাদপত্র এ সমুদয়কে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের অভিজ্ঞতা ও বালকত্ব প্রভৃতি নানা প্রকার দোষের উল্লেখ করিয়া তিনি বিধি রাগিণীতে সঙ্গীত্র করিয়াছেন। তাহার লিখা দ্বারা অনুমতি হয়, বাংলা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে এই স্বাধীনতা দ্বারা অনেক অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা উচ্ছেদ হয়, তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রায়। এই বিষয় লইয়া বাক্য ব্যয় করিতে অদ্য আমাদের অভিলাষ নাই। হিন্দু পেট্রিয়টের সুযোগ্য সম্পাদক[১৩২] উহার অনেক কথার সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইংলিশম্যান সম্পাদক ঢাকা প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া যে রূপ উক্তি করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিত বলিতে হইল।

আমরা জানি, উক্ত সম্পাদক লোককে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করিতে বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন। ঢাকা প্রকাশের বিষয় লইয়াও তিনি কতকাংশে ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা ২৬ শে মে তারিখের ঢাকা প্রকাশে লর্ড নর্থ ব্রুক বাহাদুরের প্রতি যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই উক্ত সম্পাদকের বিশেষ লক্ষ্যস্থল। তিনি এই বিষয়ে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই — "ঢাকা প্রকাশ বলেন রাজ্য শাসন সম্বন্ধে লর্ড নর্থ ব্রুক যেন তাঁহার কৌন্সেলের মেম্বরদিগের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেন, এবং তাহাদের কোন বাক্যও না শুনেন। সুতরাং তিনি সমূদয় হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "যাহারা ঐ তারিখে ঢাকা প্রকাশ পাঠ করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন না, ইংলিশম্যান সম্পাদক এই সকল কথা কোথায় পাইলেন। অতএব ইংলিশম্যান সম্পাদক কি সূত্র অবলম্বন করিয়া ঐ রূপ বলিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক বর্গকে বলিয়া দিতেছি। ঢাকা প্রকাশের লেখা আর ইংলিশম্যানের লেখার অনেক ভাবান্তর হইয়াছে। আমরা এক প্রকার লিখিয়াছি, তিনি অন্য প্রকার লিখিয়াছেন। তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা লিখিব দূরে থাকুক কল্পনাও করি নাই। ইংলিশম্যান সমুদয় কথারই বৈষম্য ঘটাইয়াছেন। এইরূপ ঘটিবার দুইটি কারণ আছে : ১. অনুবাদ কোন বিষয় ভাষান্তরিত হইতে গেলেই কিছু না কিছু ভাবান্তরিত হইয়া যায়। আমাদের ঢাকা প্রকাশ পাঠ করিলে উক্ত প্রস্তাবের লোকেরা মনে যে রূপ ভাব সংগ্রহ হয়, অনুবাদ পাঠ করিলে কোন কোন অংশে তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার ভাবাবেশ হইয়া থাকে। ইংলিশম্যান বোধ হয় কেবল অনুবাদ পাঠ করিয়াই ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। এরূপ মত প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় থাকিলে ঢাকা প্রকাশখানা স্বয়ং পড়িয়া লওয়া উচিত ছিল। পর হস্তে খাইতে গেলে আহারিয় দ্রব্য মুখ ব্যতীত মুখের পার্শ্বে অন্য স্থানেও লাগিয়া যায়। এই জন্যই ইংলিশম্যানের কথা একদিক সেদিক গিয়াছে হয়ত : তিনি কেবল অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখেন নাই। তিনি মনগড়া অনেক কথা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ হইতে তিনি এমন বাক্য সকল কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন যে তাহা আমাদের মনে কখনই উপস্থিত হয় নাই। এইরূপ কল্পিত বাক্য দ্বারা প্রস্তাবকে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল করা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নয়। লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই কাহাকেও তর্কে অন্যায় রূপে পরাস্ত করিবার ইচ্ছা থাকিলে স্বাভিলাষানুরূপ কল্পিত কথার সৃষ্টি করিয়া লইতে হয় এবং কাহাকেও অন্যায় রূপে নির্যাতন করিবার মানস থাকিলে কল্পিত দোষের আরোপ করিতে দেখা যায়। ইংলিশম্যান ও এই স্বাভাবিক লোক ধর্ম্মের বহির্ভূত হন নাই। তিনি আমাদিগকে পরাস্ত ও নির্য্যাতন করিবার

অভিলাষে কতকগুলি কল্পিত কথার উপর দণ্ডায়মান হইয়া গর্জন করিয়াছেন। ইংলিশম্যান সম্পাদক ঢাকা প্রকাশের যে অংশ লইয়া কল্পিত বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য রাজমন্ত্রীগণ কিরূপ স্বভাবের লোক তাঁহাদের শাসন কার্য্যেই যথেষ্ট পরিচয় হইতেছে। ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর যে এতদ্দূরবস্থা তাঁহাদের দোষেই উহার অনেক হইয়াছে। মন্ত্রীগণ নানা প্রকার অহিতকর যন্ত্রণা দিয়া অনেক সময় গবর্নর জেনারেলকে পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারেন। ইহাঁরা দুস্মন্ত্রণাদানে নিতান্ত পটু। নর্থব্রুক বাহাদুর যদি তাহাদের [ অস্পষ্ট্য ] সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, তবেই অভীষ্ট সিদ্ধির স্বভাবনা। নতুবা তাঁহাকেও বর্ত্তমান জঘন্য রাজনীতির অনুসরণ করিয়াই যাইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় আমাদের ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ প্রজার হিত চাহেন না, যথোচ্ছারিত চাহেন। যাহারা শাসন ব্যবস্থা প্রণেতা ও তাহারা প্রযোজক তাহারাই যদি স্বেচ্ছাচারবশবর্তী হন, তবে মঙ্গললের আশা কোথায়?

কেবল ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গেরই যে এই দোষ এমত নয়। কি সদরে কি মফস্বলে যত ইংরাজ আছেন, তাহারা প্রায়ই ঐ দলের লোক। ইহারা কি বিচার কি ব্যবহার সকল বিষয়েই এদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে যথোচ্ছচারী হইয়া চলেন। ইহারা সকলে একদিন থাকিয়া উপস্থিত কর্ম্মে যে দুই একজন ভাল লোক থাকেন তাহাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা পান। তাহারা রাত্রিকে দিবা দিবাকে রাত্রি করিতে পারেন। গবর্নর জেনারেলের পর্য্যন্ত এই চক্রে পড়িবার সম্ভাবনা।" উপরি লিখিত বিষয় হইতে ইংলিশম্যান এই ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন লর্ড নর্থ ব্রুক বাহাদুরকে তাহার কৌন্সিলের মেম্বারগণের এবং তাহার অন্যান্য স্বদেশীয় দিগের সহিত শাসন কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে অথবা তাহাদের কথা শুনিতে আমরা নিষেধ করিয়াছি। তিনি আমাদের কথায় এরূপ ভাব কোথায় পাইলেন বুঝিতে পারি না। আমরা বলিয়াছি নর্থ ব্রুক বাহাদুর সর্তক হইয়া তাহাদের কথা শুনেন, অর্থাৎ কোন অন্যায় মতের বা কার্য্যের অনুমোদন না করেন। তিনি তাহার কৌন্সিলের সঙ্গে শাসন বিষয়ক পরামর্শ আদি না করেন, আমাদের লেখা দ্বারা এরূপভাব প্রতিপন্ন হয় না। এবং আমাদের অভিপ্রায়ও এরূপ নয়। তবে যে কিরূপে ইংলিশম্যান সম্পাদকের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ মনগড়া মত প্রকাশ করিলেন বুঝিতে পারি না।

আমরা ঢাকা প্রকাশে যে সকল কথা লিখিয়াছি, তাহা সত্য কি মিথ্যা পাঠকগণই বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল বিষয়েরই দৃষ্টান্তও অপ্রাপ্য নয়। কেবল প্রস্তাব বাহুল্য আমরা তাহার উল্লেখ করিতে চাহি না। তথাপি এ স্থলে দুই একটি না দেখাইলে ভাল হয় না। কৌন্সিলের মেম্বরগণ যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে প্রজার হিতের দিকে দৃষ্টি করেন না, ফৌজদারী কার্য বিধানের সংশোধন পিন্যাল কোর্টের সংশোধন সেসকল সংক্রান্ত আইন, শপথের আইন, হিন্দু উইল আইন এবং সুসঙ্গের রাজার পাহাড় গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করন সংক্রান্ত আইন, এ সকল দ্বারা কি প্রকাশ পায়? আমাদের লিখিত বাক্যের দৃষ্টান্ত এ সকল হয় কিনা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। মফস্বলে ইংরাজগণ অত্যাচার করিলে যে গবর্ন্মেন্টে অন্যরূপ রিপোর্ট করা হয়, ইহাও নিরুদাহরা নয়। কুমিল্লার কয়েদীদিগের প্রতি ভিন্ন জাতির অন্নাহার বিষয়ক অত্যাচার ও বন্নুর আসিষ্টান্ট কমিসনার কর্তৃক হত্যাকাণ্ড ঐ সকল বাক্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এরূপ উদাহরণ সংগ্রহ করিতে গেলে অনেক আছে। এ সম্বন্ধে অপক্ষপাতী হইয়া ও আমরা যথার্থ যাহা লিখিয়াছি তাহার অনুবর্তী হইয়া আলোচনা করা সম্পাদক মহাশয়ের

উচিত ছিল। এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই যে তিনি বাঙ্গলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা উচ্ছেদ করিবার অভিলাষ করেন। ইহা তাহার ন্যায় মহদন্তঃ করণের উপযুক্ত নয়। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা যে বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকলকে শাসন করা হয়। আমরা বলি, যদি কোন দিন গবর্নমেন্ট এ বিষয়ের শাসন করেন, তবে যেন ইংলিশম্যান সম্পাদকের প্রতি শাসন কার্য্যের ভারর্পন করেন। এ বিষয়ে তাহার যেরূপ উৎসাহ দেখা যায় বোধ করি, বিনা বেতনে তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন।

৭ জুলাই, ১৮৭২

## সংবাদাবলী

আগামী হইতে বঙ্গবন্ধু পত্রিকা বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া সাপ্তাহিক রূপে বহির্গত হইবে। আয়তন চারি ফরমা হইবে। তাহাতে রাজকীয়, সামাজিক ও ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লিখিত হইবে। এই উপলক্ষে ঢাকায় আর একটি মুদ্রা যন্ত্র আসিতেছে। সংবাদটি অবশ্যই সুখকর।[১৩৩]

১৪ জুলাই, ১৮৭২

## বিজ্ঞাপন

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু ও মুদ্রাযন্ত্র। বাংলা ১২৭৭ সনের ১লা শ্রাবণ হইতে ১২৭৯ সনের ১৬ই আষাঢ় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৎসর কাল "বঙ্গবন্ধু" পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা চারি ফর্ম্মার আয়তনে সোম প্রকাশের আকারে বাহ্যিক ও আন্তরিক শ্রী সম্পন্ন হইয়াছে রাজনৈতিক আলোচনা, সামাজিক আলোচনা ও সাময়িক আলোচনা ও ধর্ম্ম নৈতিক আলোচনা, এম্মিধ চারি ভাগে বিভক্ত বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ সহকারে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে। লিখা, কাগজ ও ছাপা সকলই যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় তৎপক্ষে সকল প্রকারের আয়োজন করা হইতেছে। সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধুর মূল্য নিম্নলিখিত সুলভ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

(ঢাকাতে ও বিদেশে)

অগ্রিম বার্ষিক (৪৮ খণ্ডে) ৭

অগ্রিম ষান্মাসিক (২৪ খণ্ডে) ৪

অগ্রিম ত্রৈমাসিক (১২ খণ্ডে) ২

অগ্রিম প্রতিসংখ্যা তিন আনা

পশ্চাদেয়—যতমাস অন্তরে মূল্য আদায় হইবে অগ্রিমের উপরে ততসিকি অধিক দিতে হইবে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষরাদি সমুদয় কলিকাতা হইতে নূতন আনা হইতেছে। উক্ত যন্ত্রে সুবিধার সহিত নিয়মিত সময়ে ও উৎকৃষ্ট রকমে কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। যাহারা সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধুর গ্রাহক হইতে চাহেন কিম্বা নূতন যন্ত্রে পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দী ঢাকা বাংলা বাজার" এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন বা তত্ত্ব করিবেন।

বঙ্গবন্ধুর তত্ত্বাবধায়কগণ

৪ আগস্ট, ১৮৭১

## নূতন পুস্তক ও পত্রিকা

পরিমল বাহিনী-এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, বরিশালের কতিপয় যুবক ইহার প্রচারান্ত করিয়াছেন, অপরিণত বুদ্ধি আধুনিক যুবকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা লেখার যে একটি অপ্রতিকার্য্য রোগ জন্মিয়াছে এখানি তাহার অন্যতর নিদর্শন স্বরূপ।[১৩৪]

২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২

## শুভসাধিনী পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের প্রতি।

আপনি আমাদিগের যন্ত্রে শুভসাধিনী পত্রিকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বাবদ আপনার নিকট ১০ টাকা প্রাপ্য রহিলাম। তাহা আপনি এযাবৎ পরিশোধ করিতেছেন না, অতএব এক সপ্তাহ মধ্যে প্রাপ্যগুলি পরিশোধ করুন নতুবা প্রাপ্য আদায় করিতে বাধ্য হইব।[১৩৫]

শ্রীকালিদাস মিত্র
গিরিশ যন্ত্র

১২ জানুয়ারি, ১৮৭৩

## নূতন পুস্তক ও পত্রিকা সমালোচনা

মহাপাপ বাল্যবিবাহ—মাসিক পত্রিকা এখানি নব স্থাপিত বাল্যবিবাহং নিবারিনী সভা হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে। মূল্য বার্ষিক তিন আনা। পত্রিকার উদ্দেশ্যেটি মহৎ প্রচারার্থে সকলেরই যত্ন করা উচিৎ। আমরা প্রচারকদিগকে অনুরোধ করি, পত্রিকা খানিকে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করুন। মাসের পর এক ফর্ম্মায় একখানি ক্ষুদ্র কাগজ পড়িয়া কেহই তৃপ্তি লাভ করিবে না, ফল ও আশানুরুপ হইবে না।[১৩৬]

বালারঞ্জিকা—দুই পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্রিকা খনো ১লা বৈশাখ হইতে বরিশাল, মাদারীপুরান্তর্গত গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ছৈয়দ আবদুল রহিম মহাশয় প্রকাশিত করিতেছেন। মুসলমানগণ পত্রিকা লিখিতে বিশেষত স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য লেখনী ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন অত্যন্ত সন্তোষের বিষয় ছৈয়দ সাহেব এই সৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য হন একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরিশাল নগরে যাইয়া পত্রিকার মূল্য এক পয়সা করুন, পত্রিকাখানি রেজিষ্টারি করিয়া যাহাতে ১০ টিকেটে চলিতে পারে তাহার চেষ্টা করুন। নগরে ভাল ভাল লেখক এবং উৎসাহশীল ধনিগণের আশ্রয় পাওয়া ও বিচিত্র নহে॥[১৩৭]

২৭ এপ্রিল, ১৮৭৩

## সংবাদাবলী

"ঢাকা হইতে" ঢাকা দর্শক নামে একখানি এক পয়সার কাগজ প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত হইলাম, ঢাকা প্রকাশের একজন পত্রপ্রেরক যাহার প্রকাশ্য চরিত্র অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিই উহার জন্মদাতা। নিন্দিতব্যক্তি গাত্রজ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক ইহার প্রচারম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশও ইহার সাহায্যকারীদিগের নিন্দাবাদ এবং নিজের ও নিজের অতএব বন্ধু বর্গের গুনকীর্ত্তনই নাকি

ঢাকা দর্শকের প্রধান উদ্দেশ্য, অন্যান্য বিষয় প্রকটন আনুষঙ্গিক মাত্র। পাঠকবর্গ প্রতি সপ্তাহে এক এক পয়সা ব্যয় স্বীকার করেন, প্রায় প্রত্যেকখণ্ড ঢাকা দর্শকেই উক্তরূপ নিন্দা এবং প্রশংসা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। যে সংবাদ পত্রের লক্ষ্য এইরূপ মহৎ, ভদ্রসমাজে তাহার সমাদরের অসম্ভাবনা কি এবং তাহার চিরস্থায়ীতারই বা ভাবনা কি ?[১৩৮]

২২ আগস্ট, ১৮৭৫

বিজ্ঞাপন

ভারত-সুহৃদ

অত্যাশ্চর্য উপন্যাস ও বিধি সম্ভাবপূর্ণ মাসিকপত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১ টাকা ছয় আনা।[১৩৯]

২৭ এপ্রিল, ১৮৭৯

শ্রী অম্বিকাচরণ রায়
নান্নার। পোঃ রোয়াইল, ঢাকা।

[ সংবাদপত্র সম্পর্কে ]

আমরা গত সপ্তাহে "নব বিভাকর" নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ পত্র খানি কলিকাতা মৃজাপুর কেরিসচর্চলেন ১০ নং বাটী হইতে প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০ টাকা ও ষান্মাষিক ৫ টাকা। শুদ্ধ বার ও মূল্য বিষয়ে নয়, লিখন প্রণালী এবং বহুজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে ও এই সংবাদপত্র খানি সোমপ্রকাশের অনুরূপ। সোমপ্রকাশের নব বিভাকর সুতরাং নব বিভাকরের করে সোম প্রকাশের অন্তর্দ্ধান জনিত অন্ধকার বিদুরিত হইবে, একটি জ্যোতিষ্মানে প্রধান গ্রহের নবোদয় রাজনৈতিক আকাশের মালিণ্যহ্রাসের সহায়তা ঘটিবে, এই প্রত্যাশায় আমরা সবিশেষ পরিভ্রষ্টই হইয়াছি।

সুসভ্য গবর্নমেন্ট শাসিত রাজ্যে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব থাকিবেই থাকিবে, একের বিলোপ ঘটিলে পরক্ষণেই অপরের অভ্যুদয় হইবে, নববিভাকর দর্শনে আমাদের এই বিশ্বাস আরো দৃঢ়ীভূতই হইতেছে। ইহা নিশ্চয়, গবর্নমেন্ট যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার একবারে বিলুপ্ত না করিবেন, ততদিন সোমপ্রকাশের মৃত্যু ঘটিলে নব বিভাকরের সহচরের লীলা সংবরণ হইলে নব সহগামীর প্রভাকরের দেহত্যাগ ঘটিলে, নবতপণের অমৃতবাজারের তনুত্যাগ হইলে, আনন্দ বাজারের এবং অপরাপর নামধারী সংবাদপত্রের বিলোপ ঘটিলে, নব নব অভিধাধারী অন্যান্য সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইবেই হইবে। যতদিন প্রকৃতিবর্গের জীবন শক্তি থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রেই এক ক্ষুদ্র পুস্তকাদিতেই হউক, আর প্রকারান্তরেই বা হউক, অভাব, অসুবিধা ও কষ্টজ্ঞাপন এবং প্রার্থনাদি দ্বারা তৎপরিপূরণ ও প্রশমনচেষ্টা হইতেই থাকিবে। কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করাতে কোন কোন সংবাদপত্রের উচ্ছৃখলাত নিবারণ কাহারো কাহারো বিলোপ সাধন সম্ভাবনীয় সত্য, কিন্তু যে প্রজাশক্তি হইতে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই শক্তি বিনাশ করিয়া প্রজার দুঃখদুর্গাতিবার্তা শ্রবণে বধির হইয়া কি সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অভিপ্রেত ও ন্যায়ো [ অস্পষ্ট ] শক্তির সাধ্যায়ত্ত ?

৪ মে, ১৮৭৯

**বিজ্ঞাপন**

বিক্রমপুর প্রকাশ

(মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (ময় ডাকমাসুল) ৩ টাকা। ঢাকা, শ্রীনগর বীরতারা বিক্রমপুর প্রকাশ কার্য্যালয়।

শ্রী মহিন্দ্র চন্দ চক্রবর্ত্তী[১৪০]

২৮ নভেম্বর, ১৮৮০

**এদেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে আসলে ইডেনের অভিপ্রায়**

কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, ১৮৭৯/৮০ অব্দের বাংলার শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অবকাশ ক্রমে তল্লিখিত কোন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে আমাদের একান্ত বাসনা রহিল। এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর উক্ত রিপোর্টে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অদ্য কেবল তৎ সম্বন্ধেই আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতেছে। সার আসলি ইডেন বলেন, "দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হওয়াতে যদিও বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা ও লিখন প্রণালীর কিয়ৎ পরিমাণে উৎকর্ষ হইয়াছে। কিন্তু তৎসমদায়ের সাধারণ ভাব, গবর্নমেন্টের কার্য্য প্রণালীর বিরোধী, এই সকল সংবাদপত্র গবর্নমেন্টের প্রতি অনুচিত উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে সংকুচিত হয় না, এবং উহা গবর্নমেন্ট কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তিনিষ্ঠ দোষের আলোচনায় পরিপূর্ণ থাকে। যাহা হউক বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকেরা এইক্ষণ সাধারণত ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা পূর্ব্বে, নিজ নিজ রাজভক্তির ব্যঞ্জক ভূমিকার অবতারণা করেন এবং প্রেস আক্ট প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া নানারূপে আপেক্ষও প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের অগ্রগণ্য সংবাদপত্র কলিকতাই প্রকাশিত হয়, তাহাতে তৎসম্পাদকদিগের নিজের কথা কিছুই থাকেনা, ইংরেজি সংবাদপত্রেরই মত তাঁহাদিগের কাগজে অনুসৃত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই প্রচুর পরিমাণে বিষয় সকল গ্রহণ করা হয়। নতুনত্ব কেবল এইমাত্র লক্ষিত হয় যে, ইংজের রাজনীতি সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে মনোযোগও স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। পরন্ত ইংরেজি সংবাদপত্রে বিলাতের দলাদলী ঘটিত বাদানুবাদ প্রকাশিত হইলে আদর পূর্ব্বক তাহা পরিগৃহীত হয়।"

সর আসলি ইডেন যে এদেশীয় সংবাদপত্রের উপর স্নেহ সম্পন্ন নহেন, প্রত্যুত জাতাপরাগই হইয়া আছেন, উপরি উল্লিখিত মন্তব্য পাঠে সুস্পষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হয়। এদেশীয় সংবাপত্রের প্রতি তাহার স্নেহ ও অনুরাগ থাকিলে অন্তত কোনও এক স্থলে তিনি তাহা প্রদর্শন করিতে পারিতেন, এতৎ সম্পাদকদিগের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন পূর্ব্বক সদুপদেশ দান করিয়া অভিভাবকোচিত সম্মান লাভ করিতেও পরিসমর্থ হইতেন। কিন্তু তিন সে পথে পদচারণা না করিয়া ইহাদিগের প্রতি কেবল অপরাগই প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বে এদেশীয় সংবাদপত্র সকল তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে নাই, বরং তাঁহাকে হিতৈষী হিতকারী জ্ঞান করিয়াই অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন, তাহাকে এদেশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এদেশীয় সংবাদপত্র সকল কত আগ্রহই প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহাকে বঙ্গদেশের সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া কত সন্তোষ ও কত আহলাদই ব্যক্ত করিয়াছে এবং

কত সুখ সুবিধার প্রত্যাশারই বা কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ক্ষোভ এবং আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর হইয়া অবধি এক দিনের নিমিত্ত ও এদেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে স্নিগ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করেন নাই। যেন বিডিয়ারের প্রাসাদে সমাসীন হইয়াই ইহাদিগের প্রতি গালি বর্ষণ করিয়াছেন। ইহাদিগের অস্তিত্ব বিলোপী ৯ আইন ব্যবস্থাপিত করিবার নিমিত্ত যত্নের ত্রুটি করেন নাই এবং সেই আইন প্রয়োগ করিয়া নিগ্রহ প্রদর্শনে পরাভূতমুখ হন নাই। এখানে সেখানে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এদেশীয় সংবাদপত্রের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধার একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার শাসনসংক্রান্ত রিপোর্টেও তিনি এদেশীয় সংবাদপত্রের মর্ম্মে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কারণের উল্লেখ করিয়া এদেশীয় সংবাদপত্রের প্রতি এই নিগ্রহাচারণ করিয়াছেন, অভিনিবিশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তন্নিমিত্ত তাহার ঐরূপ আচরণ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

মুদ্রা যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন ব্যবস্থাপিত হওয়াতে এদেশীয় সংবাদপত্রের ভাষা ও লিখন প্রণালীর যৎকিঞ্চিত উৎকর্ষ হইয়াছে, জানি না কি দেখিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্বারা মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত অবস্থার বিবৃতি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারি। মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন শব্দ এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের নয়। সর্ব্ব সাধারণেরই সবিশেষ বিরক্তিকর হইয়াছে এবং সুসভ্য ইংরাজ গবর্নমেন্টের ও উহাতে অযশ অকীর্ত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে তজন্য সংবাদপত্র সম্পাদকগণ মর্মাহত হইয়া সময়ে ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন সত্য। কিন্তু উক্ত আইনের প্রভাব অনুভব করিয়া প্রাণ ভয়ে নিজ নিজ ভাবের ও কার্য্যের কিছুই পরিবর্তন করেন নাই। ইহারা আইন ব্যবস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বেও যেরূপ ভাষা ও লিখন ভঙ্গী অবলম্বন করিতেন, এখনও তাহাই করিতেছেন পূর্ব্বেও প্রকৃত রাজভক্তিপোষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই, এখনও তাহাতে ত্রুটি করিতেছেন না। রাজপুরুষেরা কেবল ভ্রান্তবুদ্ধির বশবর্তী হইয়াই সুসভ্য ইংরাজ গবর্নমেন্টের কলংক স্বরূপ আইন এর সৃষ্টি করিয়াছেন। এদেশীয়রা কোনও কালে বিদ্রোহিকেও রাজার প্রতি ভক্তিসূচক ভাব প্রকাশ করেন নাই। এখনও করিতেছেন না, ভবিষ্যতেও করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ৯ আইন সৃষ্টি উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা বাস্তবিক কিছুই নাই। এদেশীয় সংবাদপত্র গবর্নমেন্টের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক সময় প্রতিকূলভাব প্রকাশ করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাহা কি অসঙ্গত? ঐরূপ প্রতিকূল্যাচরণে গবর্নমেন্টের ও সর্ব্বসাধারণের অহিত না হইয়া কি প্রকৃত প্রস্তাবে হিতই সংসাধিত হয় না? গবর্নমেন্টের যে সকল কার্য্যে প্রজার অহিত আশংকা হয়, অথবা যাহাতে প্রজাদিগের অসন্তোষ বা বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, সংবাদপত্র সম্পাদকগণ তাহাতেই আপত্তি উত্থাপন করেন। এদ্বারা কি বাস্তবিক গবর্নমেন্টেরই কার্য্যে ‥বিধা হয় না? অনকূল প্রতিকূল পক্ষের বলাবল বিবেচনা করিয়া কি গবর্নমেন্ট উপকৃত হইতে পারেন না? তবে কেন এদেশীয় সংবাদপত্রের ঐরূপ প্রাতিকূল্যাচরণ দোয বলিয়া পরিগণিত হইল, বুঝিয়া উঠা যায় না। গবর্নমেন্টের সদুদ্দেশ্য থাকিলেও এদেশীয় সংবাদপত্র অসদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে, বহুজ্ঞতার অভাব ভিন্ন আমরা এরূপ স্থূল প্রত্যক্ষ গোচর করি নাই। গবর্নমেন্ট যদি ইংরেজি সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের ন্যায়

যাবতীয় বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদককেও গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে যথাযত বিবরণ জ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় না উল্লিখিত দোষ কুত্রাপি প্রত্যক্ষীভূত হইত। অতএব এতৎসম্বন্ধে অগ্রে গবর্নমেন্টের দোষ পরিহারের চেষ্টা না করিয়া এদেশীয় সংবাদপত্র [ সম্পাদক ] কে অন্যায় রূপে আক্রমণ করা [ সর অসলি ] ইডেনের ন্যায় প্রধান ব্যক্তির উচিত কার্য্য হয় নাই।

আমরা জানি এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা গবর্নমেন্ট কর্মচারীদিগের গোপনীয় আচরণ লইয়া কিছুই আন্দোলন করেন না—রাজকীয় পদোপলক্ষে প্রকাশ্যরূপে কর্ম্মচারীরা অন্যায় ও অনুচিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা করিয়া থাকেন। সার আসলি ইডেনের চক্ষে ইহাও কি অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইল? গবর্নমেন্ট কর্ম্মচারী বিশেষের অন্যায় অত্যাচার ও অমানুযোচিত ব্যবহার দর্শন করিয়াও কি, তাঁহার মনে এদেশীয় সংবাদপত্রগুলির মুখবন্ধ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য? যে দেশে সন্ডার্স, কার্কুড, যে প্রাথ, ডেমন্ড, শার্প, মার্কহেম, উইলমট, আষ্টন, কুক এলেন, কেম্বল ও মসলি প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মাবতারেরা বিচারও শাসন কার্য্য, উপলক্ষে মফস্বলে থাকিয়া প্রাজ্ঞাগণকে বিবিধরূপে অহরহ জ্বালাতন করিতেছেন, সেই দেশের সংবাদপত্রগুলি তাদৃশ রাজকর্ম্মচারীদিগের চারিত্রালোচনা অপকারের না হইয়া উপকারের নিমত্তই হইয়া থাকে। সুতরাং উহা এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের দোষ মধ্যে গণ্য না হইয়া কর্ত্তব্য মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে।

সত্যবটে, নানা কারণে এদেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে ইংরেজি সংবাদপত্র হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু ইংরেজি সংবাদপত্রের মধ্যেও ইহারা অনুবর্তন করেন, ইহা যথার্থ কথা নহে। (প্রত্যুত) ইংরাজ সম্পাদিত অধিকাংশ সংবাদপেত্রর সহিত ইহাদিগের মত বিরোধেই পরিলক্ষিত হয়। জানিনা কেন ইডেন সাহেব এতৎসম্বন্ধেও অযথাযথ উক্তি করিয়া এদেশীয় সংবাদপত্রগুলির অগৌরব প্রতিপাদনে প্রয়াসবান হইয়াছেন।

৩০ জানুয়ারি, ১৮৮১

## সংবাদাবলী

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী চারুযন্ত্র নামে তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিয়াছে। সুধাকর নামে সেই যন্ত্র হইতে একখানি স্বল্পমূল্যের সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

২৪ এপ্রিল, ১৮৮১

## প্রেরিত পত্র

সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার নানা বিষয়ে উন্নতি দর্শন করিয়া আমরা ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল হইতেছি। এ জেলার পাঁচটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সাধারণ শিক্ষারও দিন দিন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এইক্ষণ আবার সংবাদপত্রের বাহুল্য প্রচার আরম্ভ হইয়াছি। এতদিন একমাত্র ভারতমিহিরই ময়মনসিংহের গৌরব স্থল ছিল। সম্প্রতি সেরপুর হইতে আরও দুইখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সুধাকর যেরূপ শান্তভাবে আপনার শক্তিও ক্ষমতা বুঝিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায়, এই ক্ষুদ্রপত্র দ্বারা স্থানীয় অনেকগুলি অভাব দূর হইবে। চারুবার্ত্তা যেরূপ কলেবরে যেরূপ দৃশ্যে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদের নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বহুব্যয় স্বীকার করিয়া একটি উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র ও চারুবার্তার জন্য একজন সম্পাদক আনিয়াছেন। আমাদের আশা আছে, চারুবার্ত্তা সেরপুরের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। চারুবার্তা অতিশিশু ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার এখন সময় নহে। কিন্তু প্রথম সংখ্যায় আমরা সম্পাদকের একটি অসতর্কতা দর্শনে দুঃখিত হইয়াছি। সম্পাদক পত্র সূচনায় বলিয়াছেন, "যে সকল ব্যক্তি উচ্চশিক্ষায় অভাব নিবন্ধন ওকালতী বা চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, যাহাদের সহায় ও সম্পত্তির অভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই, তাহারাই সম্পাদকের গুরুতর দায়িত্বের ভার আপনাদের সস্কন্ধে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয় বাংলা সংবাদপত্রের অধিকাংশই এইরূপ সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত। আমরা নব সম্পাদকের এইরূপ অসর্তকতা ও ধৃষ্টতা দর্শনে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। বঙ্গবন্ধু ইডেন সাহেব বাংলাপত্র সম্পাদকদিগের শিরে যেরূপ পুষ্প বৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে এরূপ উক্তি বিস্ময়জনক না হইলেও নিতান্ত লজ্জাজনক সন্দেহ নাই। গবর্নমেন্ট বাংলা সংবাদপত্রের উপর যেরূপ অথবা দোষারোপ করেন, আমাদের চারুবার্তা যদি তাহারই প্রতিধ্বনি করিতে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তথাপি সাধারণ্যে সত্য প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া আমরা সম্পাদকের এই অদ্ভুত উক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। যে সকল সংবাদপত্র জলবদ্ধদের ন্যায় মনে উদ্বিত ও ক্ষণে অদৃশ্য হয় আমরা তাহাদের কথা ধত্তর্ব্যের মধ্যে আনিবনা। বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের শাসন বিজ্ঞাপনীতে সোমপ্রকাশ, নব বিভাকর, সহচর,[১৪১] ভারতমিহির,[১৪২] সাধারণী, ঢাকা প্রকাশ, এডুকেশন গেজেট[১৪৩] এই কয়খানিকে প্রধান বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সাধারণেও বাংলা সংবাদপত্র বলিতে এই কয় খানিকে প্রধানত লক্ষ্য করে। এইক্ষণ আমরা দেখিব, এই পত্রগুলির অধিকাংশ আমাদের নবীন সম্পাদকের বর্ণিত গুণসম্পন্ন সম্পাদক দ্বারা পরিচালিত হয় কিনা। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা এই কয়খানি পত্রের পরিচালক মহোদয়দিগের সহিত পরিচিত আছি। উহাদের একজনও উচ্চ শিক্ষার অভাব নিবন্ধন জীবিকার উপায় না থাকাতে সম্পাদক হয়েন নাই। সম্পাদক মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন "তোমার (ঈশ্বরের) কৃপায় বাতুলও দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন হয়" কিন্তু আমাদের সম্পাদকের প্রতি ঈশ্বরের সেই কৃপা হইয়াছে কিনা আমরাতো চারুবার্ত্তা পাঠে তাহার কোনও পরিচয় পাইলাম না। যাহা হউক, ভরসা করি সম্পাদক বাবু অতঃপর বিশেষ সাবধান হইয়া এবং আপনা আপনার ক্ষমতাও শক্তি সামর্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার এই কঠোর দায়িত্ববহন করিবেন।

বংশবদ

সেবপুরর একজন হিতৈষী

৮ মে. ১৮৮১

**সংবাদাবলী**

আমরা ময়নসিংহ সেরপুর হইতে প্রকাশিত চারুবার্ত্তা ও সুধাকর নামধেয় দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রপ্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র দুইখানির অপোগণ্ড দশা, সুতরাং অদ্য তাহাদের বিষয়ে কোনও কথা বলা সঙ্গত নহে। আমরা উহাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

৮ মে. ১৮৮১



## সংবাদাবলী

সদানন্দ নামক ঢাকায় নূতন একখানি রস প্রধান প্রথম খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে সদানন্দকে, পাদরি সাহেবের সঙ্গে সদানন্দের সাক্ষাৎ, বক্কেশর পন্ডিত ও রড়লোক এই কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে। লেখা মন্দ হইতেছেনা। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন বাঞ্ছা করি।[১৪৪]

২২ মে, ১৮৮১

## বিজ্ঞাপন

**সদানন্দ**

**বিদ্রূপপত্র ও সমালোচনা**

বর্ত্তমান সনের বৈশাখ হইতে কলিতে কলি অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। অগ্রিম বার্ষিক দক্ষিণা মফস্বলে ময় রাহা খরচ আনা। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

১২৮৮ সন
১৪ই মাঘ

শ্রী হরিহর নন্দী কার্য্যাধ্যক্ষ
ঢাকা গিরিশযন্ত্র

৫ ফেব্রুযারি, ১৮৮২

## সংবাদাবলী

প্রতিভা নাম্নী একখানি ৫ মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা উহার দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ভরসা করি প্রতিভা সর্ব্ব বিষয়িকী প্রতিভা প্রদর্শন পূর্ব্বক চির জীবনী হইতে পারিবে।

৬ আগস্ট , ১৮৮২

## নূতন পুস্তক ও পত্রিকা

বৈষয়িকতত্ত্ব এই মাসিক পত্রখানির ছয়খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কৃষি, শিল্পাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকটন করিয়া দেশীয়গণকে বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্তিমান ও দক্ষ করা এতৎপ্রচারের মুখ্যোদ্দেশ্য।[১৪৫]

১২ এপ্রিল, ১৮৮৫

## সমালোচনা

চিকিৎসা সম্মিলনী ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির ও কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা করিবাজী এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালীর দোষগুণ সমালোচনা করিয়া এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবশ্যকীয় বিষয় সমস্ত লইয়া মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত হইতেছে। দুইজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের প্রযত্নে ইহা যেরূপে সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশষে আনুকূল্য হইবে. সন্দেহ নাই।

১২ জুলাই, ১৮৮৫

**বিজ্ঞাপন**

তাহিরপুর কৃষি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। শিল্প ও কৃষি পত্রিকা।

গত বৈশাখ হইতে বাহির হইতেছে। কেবলমাত্র বার্ষিক বার আনা ডাক মাসুলেই বিতরণের জন্য একজনের নামে প্রতি সংখ্যার কতগুলি পত্রিকা এক সঙ্গে পাঠান যাইতে পারে। বিলম্বে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

৩০ আগস্ট, ১৮৮৫

**সমালোচনা**

দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা। উত্তর বঙ্গে বিশেষত দিনাজপুরে সংবাদপত্র কি সাময়িক পত্রের বড়ই অপ্রতুল ছিল, দিনাজপুর হইতে ঐ নামের মাসিক পত্রিকা খানির প্রচার দেখিয়া সুখী হইলাম।[১৪৬]

১ মে, ১৮৮৭

**দ্বৈভাষিকী**

সংস্কৃতি বাংলা মাসিক পত্রিকা। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। যশোহর হইতে ইহা প্রকাশ পাইতেছে, ইহার দুই সংখ্যা পদ্যে বিরচিত ...।

৫ জুন, ১৮৮৭

**সমালোচনা**

হিন্দুধর্ম্ম নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র অনেক দিন যাবৎ আমরা পাইতেছি। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় যে দিন দেখিলাম যে, "ইতিমধ্যেই আমাদের ছয় হাজার গ্রাহক জাগিয়াছে। আমরা দশ হাজার কপি ছাপাইতেছি। সেই [ অস্পষ্ট ] প্রাপ্ত হইতে একজন মুসলমান হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় গলিয়া আমাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম প্রেরণ জন্য পত্র লিখিয়াছেন।" সেইদিন হইতেই হিন্দুধর্ম্ম পত্র পরিচালকের উদ্দেশ্যে আমাদের সন্দেহ জন্মিতেছিল, সম্প্রতি সহযোগী অনুসন্ধানের কথায় সে সন্দেহ প্রকৃত বলিয়া মনে হইতেছে। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ দেখিলে হৃদয়ে গুরুত্বর বেদনা উপস্থিত হয়। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু ঝলসিতেছে কাকে কি বলি?

বেশীদিন গত অশ্বিন হইতে বিহারী লাল ঘোষ নামক এক মহাশয় "সচিত্র কারিকর দর্পণ" এবং "বিশ্বকর্ম্মার বিজ্ঞান রহস্য" নামক দুইখানি মাসিক পত্র সুদৃশ্য আকারে প্রকাশ আরম্ভ করেন। একযোগে এরূপ ঘটা দেখিয়াই ইহাব স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হয়। কার্য্যের পরিণত হওয়ার লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সেই সময়েই সেই বিহারী লাল ঘোষ "বিজলী" নামক একখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশ আরম্ভ করেন। যে ক্ষেত্রে কত মহামহিম সংবাদপত্র বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। সেই ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির তিন খানি কাগজ চালান কদাচিৎ সম্ভবপর নহে। আমরা বিজলীর সমালোচনায়ই আমাদের সে আশংকার আভাস দিয়াছিলাম। ইহাতে বিজলী মহাশয় আমাদের প্রতি চটিয়াছে যে কত গালিগালাজ করিয়াছেন, তাহা বিজলীর পাঠকেরাই জানেন [ অসপষ্ট ] হিন্দুধর্ম্ম বা বিজ্ঞান

রহস্য, সচিত্র কারিকর দর্পণ ও বিজলীর প্রথম যোগের সম্পাদক বিহারী লাল ঘোষ নিরীহ গ্রাহকদিগের টাকা কড়ি লইয়া গা ঢাকা দিয়াছেন। তাহার সহিত বিজলীর কোন সম্পর্ক নাই।

২১ আগস্ট, ১৮৮৭

## সমালোচনা

হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী : মাগুরা হইতে মুন্সী গোলাম কাদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই আনা। আমরা একখানি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। মুসলমানদিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে দেখিলে, মুসলমান জাতির অনেকটা উপকার সম্ভাবনা। তবে আশংকা এই যে হিন্দুগণ যেমন শিক্ষার মহিমায় জাত্যাভিমান জলানজুলি দিয়া দাসত্ব শৃংখলে দিন দিন অধিকতররূপে বদ্ধ হইতেছে, মুসলমানগণ সেরূপ শিক্ষা দ্বারা বিড়ম্বিত না হন। সম্মিলনী হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ দূর করিতে থাকুন, কিন্তু জাতীয়তা পরিত্যাগ না হয়, সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭

## সমালোচনা

চট্রল গেজেট। চট্রগ্রাম হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার অবয়ব চাঁটগায়ে সহযোগিনী সংশোধনীয় কনিষ্ট ভ্রাতার মতই হইয়াছে। যে হউক বেঁচে বর্ত্তে থাকিলে সুখী হইব।

৩০ নভেম্বর ১৮৮৭

## সমালোচনা

ব্রহ্মান্ডবাজার নামে আর এক নতুন সহযোগির উদয় হইল। ইহার দুই সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। বন্ধু বিয়োগে আমরা যেরূপ জ্বালাতন হইতেছি, তাহাতে নব প্রসূতিদিগের প্রতি অধিক মমতা দর্শন কিছু অপরিণামদর্শিতার কাজ হয়। তথাপি আমরা ইহার দর্শনে সুখী হইয়াছি।

১১ ডিসেম্বর ১৮৮৭

## গরীব

নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে গরীবের পূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক কুঞ্জ বাবু গরীব চালানে নিতান্ত লোকসান দেখিয়া তিন শত টাকা মূল্যে তাহা ও গরীবের প্রেসটুকুন বিক্রয় করিয়াছেন। যে বরদাশংকর দাস আমাদের অফিসে পাঁচ টাকা বেতনে চাকরি করিতেন, তিনিই তিন শত টাকা মূল্যে প্রেস সহ গরীব কিনিয়া সম্পাদকতা করিতেছেন। সম্পাদকতা কাজটা খুব সহজ কি? অভিপ্রায়টা অবশ্য দূরদর্শী লোককে করিতে হইবে না, অগ্রিম মূল্য বাবত ২/৪শ টাকা যদি জুটিয়া উঠে, তবে আশাতীত লাভ হয় কিনা? সে তিন শত টাকার সম্পত্তিটুকুন স্থানান্তরিত করা কিছুই কঠিন নহে, তবে আর পায় কে? এটি ছাড়া আরও কয়টি উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গরীব পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের স্বপক্ষে থাকাতে ব্রাহ্মদের

ক্ষতি হইতেছিল, এখন দুইটি ব্রাহ্মণবালককে প্রধান লেখক করা হইয়াছে। লেখকদ্বয়ের সাবধানতাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু এ সাবধানতা যথা সময়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশের জন্য কিনা, দূরদর্শী পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন। আমাদের চাকরি হইত বিতারিত হওয়াতে গরীব সম্পাদক আমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার, করিতেছেন, তাহা গরীবের পাঠকই জানিয়া রাখুন। নীচ লোক উচ্চ আশা করিলে প্রভুর সর্ব্বনাশই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হয়, বলিয়া চারা নাই, কিন্তু দুঃখ হয় যে, এমন লোককে আশ্রয় দেয় এমন নীচাশয় লোকের অভাব নাই, তাইতো কবি বলিয়াছে :

"খলে খলে সদা প্রীতি, নপ্রীতি সুজনে খলে।"

লাইবেলের ভয় নাই, কেননা পুঁজির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র। ফাটলের ভয় নাই, কেননা ফাটল খানায়ও রীতিমত অন্ন মিলে, বরং কম পরিশ্রমেই মিলে। সম্ভবতঃ এই সাহসেই ভদ্র লোকদিগের মিথ্যা দুর্নাম রটনা করা হইতেছে। কালের গুণে এমন পামরও অনেক জুটিয়াছে, যাহারা শত্রুর প্রতি অনর্থক, গালি শুনিয়াও সন্তোষ লাভ করে। কিন্তু তাহারা ভাবে না যে, আজ শত্রুর প্রতি যে ব্যবহার হইয়াছে, দুই দিন পরে নিজের প্রতি সে ব্যবহার হওয়ার সম্ভা, এরূপ ঘটনা ইতি মধ্যে ঘটিয়াছে। আমরা অবশ্য সে উল্লেখ করিতে চাই না। কিন্তু গরীবে দেড়মাস পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, দেড়মাস পড়ে ঠিক তাহার বিপরীত বলিতে [ অস্পষ্ট ] ও যাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না আমরা সেই পরিনাহ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

১ জুলাই, ১৮৮৮

**বিজ্ঞাপন গৌরব**

(অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)

ইহাতে রাজনীতি. সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধ সকল থাকিবে। অতি সামান্য ব্যয় এরূপ একখানি সংবাদপত্র এই নূতন।

ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ঢাকায় আট আনা, অন্যত্র আঠার আনা।

**গৌরবের গ্রাহকদিগের বিশেষ সুবিধা**

গৌরবের যে গ্রাহক, অপন বংশের গৌরব চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম, উপাধি, গাঁই, গোত্রও বিশেষ বিশেষ কীর্তি, গৌরবে বিনামূল্যে প্রকাশ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে উহা এক কালে ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইবে।

**বিক্রেতা বিশেষ সুবিধা**

এক মোড়কে দশখানি গৌরব লইলে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ঢাকায় সাড়ে চারি টাকা, ও অন্যত্র ৬ টাকা। ইহাতে বিক্রেতার লাভ বিস্তার। মফস্বলে প্রত্যেক খানি দেড় করিয়া বিক্রয় করিলে দশ খানির মূল্য এক বৎসরে ১০।।। টাকা, সুতরাং পোনে পাঁচ টাকা লাভ। ঢাকায় ৫ হিসাবে বিক্রয় করিলে ৩।৴। লাভ।

বৎসর পূর্ণ হইলে এক বৎসরে মোট ৪৮ সংখ্যা গৌরব যিনি ফিরত দিবেন, তাহাকে এক আনা ফিরত দেওয়া যাইবে, সুতরাং তাহার পক্ষে বার্ষিক মূল্য মাত্র সাত আনা পড়িবে।

**উপহার**

এই শ্রাবণ মাস মধ্যে যাঁহারা গৌরবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিবেন, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ১ টাকা তিন আনা মূল্যের পাঁচখানি পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইবে।

নিদর্শন — আর পাপে মজিও না। পাপকার্য্যের প্রতিকূল এরূপ সংক্ষেপে এত সদুপদেশ পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থে নাই। মূল্য । আনা।

বিদ্রূপ ও মুন্সিয়মোর হন্দ। এদেশে ইংরাজ চরিত্রের ও রাজনীতি যত প্রকার দোষ আছে, তাহা সুক্ষদপি সুক্ষ্মানুসন্ধান পূর্ব্বক এরূপ ব্যঙ্গ ভাবে ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা আর কুত্রাপি দেখিবার উপায় নাই। এবং অন্যান্য বিষয়েও চূড়ান্ত মুন্সিয়ানা প্রদর্শিত হইয়াছে।

মূল্য তিন আনা।

**অধ্যয়ন**। কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার মহোদয় কৃত প্লেটো, বার্ক, ভনহার্টম্যান, ডারুইন, প্রভৃতি ইয়ূরোপীয় শিক্ষা গুরুদিগের লিখিত গ্রন্থাদি ও ইংরেজি, লাটীন, পারস্য প্রভৃতি ভাষার উপাদেয় প্রবন্ধ সকলের অনুবাদ, এবং বেদ, পুরান, দর্শন, কাব্য প্রভৃতির বিবিধ উপদেশ সকল মূল ও অনুবাদ যাহা তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত অধ্যয়ন নামে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত, ঐ অধ্যায়ন তিন মাস এর তিন সংখ্যা। মূল্য।।। আনা। ঐ উপহার যাঁহার ডাকে লইবেন, গৌরবের মূল্যের সহিত তাঁহাদের এক আনা করিয়া ডাক মাসুল পাঠাইতে হইবে। উপহার পুস্তকের সংখ্যা অল্প বলিয়া সর্তক করা যায়, যাহারা পূর্ব্বে মূল্য না দিবেন, পুস্তক নিঃশেষ হইলে তাঁহাদের উপহার পাওয়া কঠিন হইবে।

শেষকথা—ঢাকা প্রকাশ ব্যতীত ঢাকার কোন সংবাদপত্র অপেক্ষা যে সংখ্যক গৌরবে কাজের কথা কম থাকিবে, তাহা ফিরত লওয়া যাইবে।

গৌরবের মূল্য ও চিঠীপত্র ইত্যাদি ঢাকা প্রকাশ অধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক

৫ আগস্ট, ১৮৮৮

**সংবাদাবলী**

ঢাকা হইতে শক্তি নামে আর একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে।

২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮

**ফরিদপুর হিতৈষিণী**

গত মংগলবার আমরা "ফরিদপুরে একখানি সংবাদপত্র নাই ও কোন সংবাদপত্রের রী সংবাদদাতাও নাই" ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু বুধবারের ডাকেই ফরিদপুর হইতে ফরিদপুর হিতৈষিণী নামক এখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আসিয়া আমাদের হস্তগত

হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় যে, ইহা প্রকাশের তারিখও সেই মঙ্গলবার। বস্তুত মরুভূমিতে একটি কূপ দেখিলেও যেরূপ সন্তোষ জন্মে, ফরিদপুর হিতৈষিণীর কলেবর ক্ষুদ্র, ছাপা অপরিষ্কার ও প্রথম বারোচিত সংবাদ সংগ্রহের ত্রুটি সত্ত্বেও এতদ্দর্শনে আমরা সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। সহযোগী মুখবন্ধে যে যে বিষয় লিখিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, তাহা লিখা সংবাদপত্র মাত্রেরই সাধারণ কর্ত্তব্য, তবে কার্য্যক্ষেত্রে সকল দিক রক্ষা নানা কারণে হয় না। সহযোগী প্রথমবারে ফরিদপুর কালেক্টর কেলেংকারিগুলি প্রকাশ করিলে বিশেষ সুখী হইতাম, কিন্তু অন্য গুটি দুই সংবাদে আমরা বিশেষ লাভ বোধ করিতেছি। তাহা নিম্নে লিখা গেল।

৩ মার্চ, ১৮৮৯

### ঢাকা গেজেটের বক্তব্য

ঢাকা গেজেটে, তাহারই উপযুক্ত চণ্ডালাদি ইতর জাতীয় পাঠকদিগকে পারমর্শ দিতেছেন যে "যত দিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্যাদি উচ্চজাতিগণ তাহাদের সহিত জলাদি ব্যবহার দ্বারা সমাজ না করিবে, ততদিন তাহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির কোন কাজ যে না করে,. কোন সংগ্রহ না রাখে, টাকা কর্জ্জ পর্য্যন্ত না করে, কায়স্থ শাসনের ভোট না দেয়। এইরূপ করিলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি রাগে পড়িয়া চণ্ডালাদিকে সমাজে চালাইবে" যেমন অগাধ বুদ্ধি, তেমনই অসম সাহস। সেই ভাগ্যের বিষয় যে, আর হিন্দু সমাজের জাতীয় জীবন নাই, তাহা হইলে যাহার চেষ্টা এতদূর নীচ, এরূপ সমাজ বিপ্লবের যে পরামর্শ দাতা তাহার যথোপযুক্ত শাস্তি হইত। সমাজ বিপ্লবকারীরা শুধু সমাজের নিকট নহে, রাজদ্বারেও দণ্ডনীয়। যাহারা জাতিভেদ উঠাইতে চাহে তাহাদের সহিত সমাজ বিপ্লবকারীদের কোন সম্পর্ক নাই। জাতিভেদ রহিত প্রার্থনা উচ্চ জাতিকে একটু উদার হইয়া জাত্যভিমান পরিত্যাগের পরামর্শ দেয়, সে পরামর্শে বিশেষ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এরূপ সমাজ বিপ্লবের পরামর্শ এই হয় যে, অপরিণামদর্শী মূর্খ নীচ জাতিরা এইরূপ পরামর্শ শুনিয়া হঠাৎ জাত্যভিমানী হইয়া নহে, চাকরী রায়তী বা অন্য কোন না কোন রূপে অধীন না থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, তাহাদের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া কাজে কাজে চৌর্য্য লুণ্ঠনাদি অসৎকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়, আমাদের টিপরা সহযোগী এহেন কার্য্যের পরামর্শ দাতা।

১৩ এপ্রিল, ১৮৯০

### সংবাদাবলী

জোতিঃ [ জ্যোতি ] নামে আর একখানি মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। যে সকল প্রস্তাবে লোকের অপকার ভিন্ন উপকার নাই, এরূপ প্রবন্ধ নির্ব্বাচন দ্বারা লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিয়া আমরা অতীব দুঃখিত হইয়াছি। যে সকল শাস্ত্র জ্যোতির প্রবন্ধ লেখক দেখিয়াছেন, তাহা কোটি কোটি হিন্দু দেখিয়া আসিতেছে, অথচ তাহা দেখিয়া কোন বুদ্ধিমান হিন্দু জ্যোতির প্রবন্ধ লেখকের ন্যায় প্রতারিত হয় না। সর্ব্ববাদিসম্মত কোন মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে বিশেষ বিবেচনা করিতে হয়।

১২ আগস্ট, ১৮৯৪

### সংবাদাবলী

শিক্ষা পরিচয় নামক একখানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে চলিতে আরম্ভ হইতেছে, দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। পূর্ব্বে ইহা রাজসাহী হইতে বাহির হইত, এবার কলিকাতা হইতে প্রচার হইতেছে। ইহার লিখন প্রণালীতে চিন্তশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মূল্য বার্ষিক এক টাকা মাত্র।

১২ আগস্ট, ১৮৯৪

### সংবাদাবলী

চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ নামে অপর একখানি মাসিক পত্রের একাদশ সংখ্যার মধ্যে দুই সংখ্যা পাইয়াছি। মাসিক পত্র সমূহের মধ্যে ইহার আকার খুব বৃহৎ। লিখা মন্দ হইতেছে না। মূল্য অতিশয় শস্তা, বার্ষিক এক টাকা দুই আনা মাত্র।

১২ আগস্ট, ১৮৯৪

### সংবাদাবলী

কৌমুদী নামক আরও একখানি মাসিক পত্রের এক সংখ্যা পাইয়াছি। ব্রাহ্ম সমাজের যে সকল ব্যক্তি সম্প্রতি সকল ধর্ম্মকে উদার বক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কতিপয় ব্যক্তি ইহার লেখক। চেষ্টা সাধু, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া একরূপ অসম্ভব।

১২ আগস্ট, ১৮৯৪

### বিজ্ঞাপন

হিন্দুপত্রিকা

ছাত্রসুহৃদপত্রিকা।

যশোহর হিন্দুপত্রিকা অতি অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র হিন্দু সমাজের আদরের পাত্রী হইয়াছে। অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে হিন্দু পত্রিকা সম্বন্ধে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, ও সম্বাদ পত্র সমুদায়ের মত পাঠান যাইবে। হিন্দু পত্রিকার বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় দুই সমস্র। ইহা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে বাঙ্গালী আছেন প্রায় সকল স্থানেই যাইয়া থাকে। যাহারা ১৩০১ সালের প্রথম হইতে গ্রাহক হন নাই, তাহাদের বৈশাখ হইতে প্রথম কয়েক সংখ্যা কাগজ পাইতে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। এই জন্য যাহারা ১৩০২ সাল হইতে গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা যেন এইক্ষণ হইতে আমাদিগকে লেখেন। বৈশাখ হইতে চৈত্র সংখ্যা ১৩০১ সালের হিন্দু পত্রিকা ভবিষ্যৎ গ্রাহকগণের ২ টাকা নগদ মূল্যে খরিদ করিতে হইবে। ১৩০২ সালের পত্রিকা সকল গ্রাহকগণই সমতে ডাকমাশুল একটাকা চারি আনায় পাইবেন। যাহারা ইচ্ছা করেন, তাহারা কেবল ১৩০২ সালের জন্য গ্রাহক হইতে পারেন, অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে কেহ কাগজ পাইবেন না।

### হিন্দু পত্রিকা কিরূপ পত্রিকা

"এরূপ পত্রিকা এদেশে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্র ব্যাপার লইয়া এদেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে বিস্তর, আছে ও কয়েকখানি, কিন্তু

তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের অনেক পশ্চাৎ। হিন্দু পত্রিকায় মাসে মাসে বেদ, বেদাঙ্গ, স্তোন, পুরান নানা প্রসঙ্গ প্রবন্ধাকারেই নহে, কোন কোনে অংশে দেবনাগর অক্ষরে মূল অন্বয় ব্যাখ্যা টীকা টীপন্নী সহযোগে প্রকাশিত হইতেছে। পদ পাঠগুলি এমনিভাবে দেওয়া হইতেছে যে নাগরী অক্ষর জানা না থাকিলেও ক্ষতি হইবে না, এদিকে অল্পে অল্প অক্ষণ পরিচয় হইয়া আসিবে। এহেন হিন্দু পত্রিকার মূল্য এক টাকা। কিন্তু আকারে বৃহৎ ও জ্ঞাতব্য শাস্ত্র কথায় পূর্ণ। প্রতি হিন্দুর হিন্দু পত্রিকাকেই হিন্দুর মূখ্য পত্র ভাবিয়া হিন্দুপত্রিকা গ্রহণ করা উচিত।

উহা আমাদের নিজের কথা নয়, উহা কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র বঙ্গ নিবাসীর কথা। হিন্দুপত্রিকা সম্বন্ধে বহুতর সমালোচনা হইয়াছে। অর্দ্ধ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে উহা পাইতে পারেন।

### উদ্দেশ্য

হিন্দুপত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হিন্দু শাস্ত্র প্রকৃত মর্ম্ম সাধারণ হিন্দুবর্গকে অবগত করান, এবং যদি হিন্দুপত্রিকার বহু সংখ্যক গ্রাহক হয় এবং লাভ হইতে থাকে তাহা হইলে বংগ দেশে প্রাচীন ঋষিদিগের আদেশনুযায়ী প্রকৃত ব্রহ্মচর্য, সম্বলিত বেদ বিদ্যালয় ও হিন্দুধর্ম্ম প্রচার বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইবেক। হিন্দুপত্রিকার সম্পাদক যশোহরের উকিল, বাবু যদুনাথ মজুমদারের নামে টাকা পাঠাইবেন।

### ছাত্রসুহৃদ

### হিন্দুপত্রিকা

সুকুমার মতি বালকদিগের হিতার্থে আগামী বৈশাখ মাস হইতে ছাত্র সুহৃদ হিন্দুপত্রিকা প্রকাশিত হইবে। উহার আকার রয়াল আট পেজি ৩২ পৃষ্ঠা হইবে। প্রত্যেক দুই মাসে এক এক খণ্ড করিয়া বাহির হইবে। বৎসরের শেষে ১৯২ পৃষ্ঠায় বড় একখানি পুস্তক হইবে। মূল্য সমেত ডাঃ মাঃ এক টাকা চারি আনা।

### স্বতন্ত্র হিন্দু পত্রিকা কেন?

আজ কাল হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি হিন্দু সন্তানের অনাস্থা দেখা যাইতেছে। অতি অল্প দিন হইল প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিসনার মেঃ জেঃ মনসর সি, বি যিনি রানাঘাটে অবস্থিতি করিয়া তাহার স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তিনি সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন "বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত লোক কিছুই বিশ্বাস করেনা, এবং ছাত্রবর্গ ও তাহাদের অভিভাবকদিগের অবিশ্বাস অনুকরণ করিতেছে। আপনার হিন্দু পত্রিকার হিন্দু ধর্ম্ম কি তাহা সকলেই অবগত হইতে পারিবে। "হিন্দু পত্রিকা যাহা গত এক বৎসর প্রকাশিত হইতেছে, পঠোপযোগী নয়। অধিক বয়স্ক লোকের ভিন্ন তাহাতে প্রীতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সুকুমারমতি বালক যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র একখানি হিন্দুপত্রিকা প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম।

ইহাতে থাকিবে কি?

যাহাতে হিন্দু ছাত্রবর্গের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি-প্রীতি জন্মে, স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মে, প্রাচীন ঋষিদিগের প্রতি ভক্তি জন্মে চরিত্র গঠিত হয়, যাহাতে তাহারা ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারেন, যাহাতে পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে এরূপ ভাবের সমুদয় প্রবন্ধ মূল সংস্কৃতি ও তাহার বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক প্রধান প্রধান নর নারীর জীবনের উচ্চ আদর্শ, পুরান ইতিহাস এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে সুন্দর সুন্দর নীতিগত প্রবন্ধ, সংক্ষেপতঃ যাহা যাহা ছাত্র জীবনের উপযোগী বলিয়া বোধ হইবে তাহা সমুদায়ই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক অভিভাবক তাহার অধীনস্থ ছাত্রবর্গকে ছাত্র সুহৃদ হিন্দু পত্রিকা পড়াইবে তাহাদের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। ছাত্র সুহৃদ হিন্দু পত্রিকা, হিন্দুপত্রিকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পত্রিকা হইবে, এবং উহার প্রবন্ধও স্বতন্ত্র হইবে। ছাত্র সুহৃদ হিন্দু পত্রিকার মূল্য ছাত্র সুহৃদ হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক যশোহরের উকীল বাবু যদুনাথ মজুমদারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১০ মার্চ্চ, ১৮৯৫

## বিজ্ঞাপন

### দশ হাজারের সুবিধা

খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে এদেশে সংবাদপত্র ও ইংরেজি শিক্ষা প্রচার হয়। ঐ সংবাদপত্রও শিক্ষা যে সকল বালক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই উহা হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মভাবে লাভ করিয়া অধিকাংশে খ্রীষ্টান হইতেছিল, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ ঐ খ্রীষ্টীয় মতানুসারে অথচ এদেশীয় সরল বিশ্বাসী লোকদিগকে ভুলাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকদিগের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে খ্রীষ্টানি প্রচার নিমিত্ত সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন। এদেশে পাশ্চাত শিক্ষা প্রাপ্তদিগের দ্বারা যে সকল সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে, তাহা প্রায় সমস্তই ঐ উপায়ে হিন্দুধর্মের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। শিক্ষিতদিগের যে একখানি সংবাদপত্র এখন হিন্দুয়ানির পক্ষসমর্থন করেন, তাঁহারাও অনেক বিষয়ে ঘোরতর অহিন্দুর কার্য্য করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ দ্বারা অথবা স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে কালমহিমায় লোকের তাহা বুঝিতে না পারিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছে। এই ভয়ানক পতন হইতে লোক সমূহকে রক্ষার নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম প্রচার করিতে একমাত্র ঢাকা প্রকাশ ব্যতীত আর কাহাকেও পরিলক্ষিত হয় না। একমাত্র ঢাকা প্রকাশই এই গুরুতর প্রয়োজনীয় কার্য্য প্রাণপণে নিবিষ্ট হইয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের যে সকল কথা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ কর্ত্তৃক প্রচার হওয়াতে দলে দলে হিন্দু সন্তান মহা মহর্ষিগণ ও ভগবানের প্রচারিত হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গভীর নরকের দিকে ধাবিত হইতেছে, ঢাকা প্রকাশ সেই সকল কথা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমালোচনা করিয়া নিগূঢ় সত্যরূপে প্রচার করিতেছেন। এ বিষয়ে ঢাকা প্রকাশ যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা আমার কথা নহে, এদেশে যাহারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমানদিগের সর্ব্বপ্রধান, সেই বঙ্গীয় লেখক শিরোমণি রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবু কুঞ্জলাল নাগ এম এ, বাবু বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্তী এম,

এ, বাবু রাজকুমার সেন এম এ, বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম এ, বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বহু সম্মানিত মহোদয় কর্তৃক ঢাকা প্রকাশের ও ঢাকা প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধ সমূহে সঙ্কলিত নিদর্শন নামক গ্রন্থের প্রশংসা দেখিলেই সকলে বুঝিবেন। ইঁহাদের এবং দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরার কাশীস্থ আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিনী সভার মুখপত্র ধর্ম্মপ্রচারক এবং পণ্ডিত সমাজের মুখপত্র সারস্বতপত্রের মতানুসারে ঢাকা প্রকাশের ন্যায় চিন্তাশীলতাপূর্ণ প্রয়োজনীয় সংবাদপত্র আর একখানিও নাই।

কেবল উহাই নহে, ঢাকা প্রকাশে পূর্ব্ববঙ্গ এর প্রয়োজনীয় সংবাদ এত বেশী পরিমাণে থাকে, যাহা অন্য একখানি সংবাদপত্রেও থাকে না। মধ্য ও প্রাইমারী পরীক্ষার ফল কেবল ইহাতেই বিশুদ্ধ রূপে প্রকাশ হয়। এতদ ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য, বিষয়ই ইহাতে চিন্তাশীলতা সহকারে প্রচার করা হয়। এই সকল বিষয়ের নিমিত্ত আমি সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছি না। ঐ ধর্ম্ম বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষা প্রচারে লোকসমূহের যে ভীষণ নরকাভি মুখে পতন হইতেছে, তাহা হইতে লোক সমূহকে রক্ষার নিমিত্ত এই ঢাকা প্রকাশ সর্ব্বত্র প্রচার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়াই আমি সকলের নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইতেছি।

২/১ টাকা মূল্যে বড় বড় কাগজ পাওয়া যায়, সুতরাং ঢাকা প্রকাশের নিয়মিত মূল্য ৫ টাকা ফি অসমর্থ পক্ষের মূল্য ৩ টাকা দিয়া ইহা পাঠ করিতে পারেন, এরূপ আগ্রহ অত্যল্পলোকের আছে। কিন্তু আবশ্যক মনে করিয়া ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরীর সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি যে, উহা ঢাকা সহরে ১ দেড় টাকা ও অন্যত্র মাত্র ১ টাকা চৌদ্দ আনা মূল্যে কমালে তাঁহার যে ক্ষতি হইবে, তাহা আমি পূরণ করিব. কিন্তু দশ হাজার গ্রাহকের অতিরিক্ত হইলে আমার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। যাঁহারা ৫ কি ৩ টাকা দিতে পারেন, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ মূল্য পাঠাইবেন, কিন্তু যাঁহারা ১... কি এক টাকা চৌদ্দ আনা মূল্য ঢাকা প্রকাশ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "লাল মোহন সাহা শঙ্খনিধির সাহার্য্যপ্রার্থী" এই কথা একটি কুপনে লিখিয়া "ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক — ঢাকা" এই ঠিকানায় ঐ ১ টাকা চৌদ্দ আপনা পাঠাইলেই এক বৎসর ঢাকা প্রকাশ পাইবেন। অথবা কেহ নমুনা দেখিতে চাহিলে দুই আনা পাঠাইবেন। আর কিছু জানিতে হইলে উত্তর লিখবার পোষ্টকার্ড পাঠাইবেন। ভরসা করি, এটু সামান্য অর্থের জন্য কেহ কৃপণতা করিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভে বর্ধিত ও স্বর্গের পথে কাঁটা দিয়া নরকের পথে ধাবিত হইবেন না।

শ্রীলাল মোহন সাহা
৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮

# বিবিধ

**ময়মনসিংহের সংবাদদাতার পত্র**

১। ব্রহ্মপুত্র নদ নৌকা গমনাগমনের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই শীত ঋতুর আরম্ভেই কম্পপুরের মোহন অবধি টোক পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল পথের অনেক স্থানে ২।০ ২।০ ফুটের অধিক জল অনুমিত হয় না। ক্ষুদ্র ২ নৌকা সঞ্চলেন করিতেও টানাটানি লাগে। এতন্নিবন্ধন লোকের যাতায়াত ও বাণিজ্যাদির যারপর নাই অসুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা এরূপ আশা করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেন্ট ইনকম ট্যাক্সের কিয়দংশ দ্বারা ব্রহ্মপুত্রকে কথঞ্চিৎ সংস্কৃত করিয়া সাধারণের গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দিবেন। তৎপর ৬১ সনে আগস্ট মাসে বর্ত্তমান লেপ্টেনেন্ট গবর্ণনর বীডন সাহেব এনগর পরিদর্শন করিয়া যাইবার সময় তাঁহার বাষ্পীয় পোত নদের চড়ায় সংবদ্ধ হইয়া যাওয়াতে আমাদের আশা আরো বলবতী হয়। কিন্তু কোথায় কিছুইত শুনিতে পাইতেছি না, আমাদের সমুদায় আশা ভরসাই কি মৃগ তৃষিকায় পরিণত হইয়াছে আমরা জিজ্ঞাস করি ইন্‌কম ট্যাক্স ব্যপ দেশে ময়মনসিংহের শোণিত শোষণ করিয়া যে বর্ষে ২ ভূরি অর্থ সংগৃহীত হইতেছে তাহার কিয়ৎ পরিমাণও এদেশের কোন বিশেষ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইতে দেখিতেছি না কেন? কি কারণে ময়মনসিংহের এতদূর দুর্ভাগ্য হইল? সত্য বটে ইতিপূর্ব্বে ২/১ টী সড়ক মেরামত ও পুষ্করিণী খনন নিমিত্ত রাজ কোষের কিঞ্চিৎ অর্থ বিসৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থব্যয় ঢাকা প্রভৃতি জিলার হিতোদ্দেশে যে পরিমাণ টাকা বিতরিত হইয়া থাকে তাহার তুলনায় যৎসামান্য হইবেনা? ঐসব জিলা অপেক্ষা কি ময়মনসিংহ অল্প অর্থ দ্বারা গবর্ণমেন্টকে পূজা করে যে তজ্জন্য উপেক্ষিত হইবে? যাহা হউক আমরা আপাত আর কোন অভাব মোচনার্থ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতে চাহিনা। সম্প্রতি তাঁহারা এই জল পথের দুর্গমতা দূর করিয়া এই জিলার অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। একান্ত প্রার্থনা ব্রহ্মপুত্রের যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় ২/৩ বৎসরের মধ্যে উহা সম্পূর্ণ পলিকীর্ণ হইয়া নৌকার গতি বিধি এককালে রোধ করতে সাধারণের বিপুল কষ্টদায়ক হইবে। প্রথমে গবর্ণমেন্ট উদ্যোগী হইলে ভরসা করি এই মহৎকার্য্যের নিমিত্ত প্রদেশীয় ধনাঢ্যগণ ইহাতে ও কিছু ২ গ্রহণ করিতে পারিবেন। উপসংহারকালে অত্যন্ত জমীদার ও প্রধান লোকদিগকে অনুরোধ এই যে তাঁহারা সত্বর সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের দূরবস্থা মোচনার্থ গবর্ণমেন্টে আবেদন করুন।

২। কিছু দিন হইল মৃত আনন্দ কিশোর রায় ও লক্ষণ দেবীর জমিদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন এবং তাহাদিগের নাবালগ পুত্রদ্বয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতা ওয়ার্ডস স্কুলে প্রেরিত হওয়ার সংবাদ উপহার দিয়াছি। সম্প্রতি তত্ত্ব আসিয়াছে আনন্দ কিশোর রায়ের পুত্র রাজেন্দ্র কিশোর রায় কলিকাতায় পৌছিয়া হলে ভর্ত্তি হইয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর গর্ভধারিণী আনন্দময়ী দেবীও তথায় গিয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহার বাড়ী শূন্য ময় কয়েকজন কনষ্টাবুল মাত্র রক্ষকরূপে

নিযুক্ত আছে। শুনিতে পাইলাম রাজেন্দ্র বাবুর হস্তী অশ্ব প্রভৃতি অচিরেই সরবরাহকার সাহেব কর্তৃক নিলাম হইবে। অদ্য ৫ দিবস হইল তাহার (রাজেন্দ্র কিশোর রায়ের) পালিত কতকগুলি কুকুর (অন্যূন ২০/১৫টা হইবে) নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। অনেক উত্তম ২ কুকুর যাহা ৫০/৬০ টাকা মূল্যে খরিদ হইয়াছিল, তাহাও দুই চারি আনার বড় অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় নাই। যাহা হউক তজ্জন্য দুঃখিত নহি কিন্তু ইহা অবশ্য শোচনীয় যে একজন অতবড় বিখ্যাত জমীদারের সন্তকের কুকুরগুলি পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যমান থাকিতেই নিলাম হইয়া গেল। আমাদিগের অধিক দুঃখের বিষয় এই যে গবর্ণমেন্ট ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও স্বজন বর্গের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পীড়িতাবস্থায় রাজেন্দ্রবাবুকে কালকাতার ন্যায় প্রসিদ্ধ (অস্পষ্ট) স্থানে, রাখিতে বাধ্য হইলেন। আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না রাজেন্দ্র কিশোর এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে গবর্ণমেন্টের তাদৃক নিগ্রহ ভাজন হইল। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুনি আসামীদিগের প্রতিও সদয় দৃষ্টি হইয়া থাকে, অথচ বাবুর প্রতি হইল না। কেহই এরূপ বলিয়া থাকেন যে স্বাস্থ্যের প্রতি অতগূঢ় দৃষ্টি রাখিলে কখনই তাহার শিক্ষা হইয়া উঠিবে না এই বিবেচনাই গবর্ণমেন্ট এ প্রকার করিয়াছেন। যাঁহারা এ রূপ বলেন তাঁহাদিগকে আমি অধিক কিছু না বলিয়া এই মাত্র অনুরোধ করি যে তাঁহারা এক বার ৮ আশ্বিনের ঢাকা প্রকাশের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভূম্যাধিকারী, এই শিরোনামের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখুন, তাহা হইলে একথা বলিতে আর কদাচ সাহসী হইবেন না। বাস্তবিক যদি প্রকৃত শিক্ষা হইত, তবে আর আমাদিগের অতদূর আক্ষেপ করিতে হইত না। গবর্ণমেন্ট কি জন্য ইহাদিগকে জিলা স্কুলে পাঠ করিতে দিলেন না। জেলা স্কুলে পড়িলে একদিন ইহাদিগের সৎশিক্ষার আশা করা যাইতে পারিত।

৩। আনন্দ কিশোর রায়ের পরলোক যাত্রার পর অন্যূন ৫/৬ বৎসর কাল তাহার সহধর্ম্মিণী দেবী স্বামীর জমীদারি শাসন সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। এই ক্ষণ জানিনা বোর্ড কি কারণে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া উক্ত জমীদারি কোর্ট ওয়ার্ডদের অধীন করিয়া দিলেন। শুনিতে পাই আনন্দময়ী চৌধরাণী পুনঃ প্রাপণার্থ আপিল করিয়াছে।

৪। অত্রত্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্রকে ইংরেজী বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক হার করিতেছেন, শুনিতে পাই ছাত্রগণ ইংরেজী স্কুলের অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া মেম সাহেবদিগের খেলা দেখিতেছিল, শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে তথা হইতে অপসৃত হইবার জন্য পুনঃ ২ অনুরোধ করেন। কোন কোন ছাত্র তাহা গ্রাহ্য না করাতে অগত্যা তিনি দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়াছেন। যাহা হউক শিক্ষক মহাশয় যে উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে মারিয়া থাকুন, অনেকেই তাহার কিঞ্চৎ অনাধিকার চর্চ্চাকরা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রহৃত ছাত্রগণ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট এক আবেদন পত্রীদ্বারা বিচারার্থী হইয়াছে। শুনিলাম উপরি উক্ত শিক্ষককে লক্ষ্য করিয়া আরজি খানাতে নাকি অসঙ্গত নিন্দা লিখা হইয়াছে । যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্যায় হইয়াছে। যাহাহউক আমরা উভয় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মহাশয় দিগকে অনুরোধ করি যে তাহারা মনোযোগী হইয়া এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিউন। আত্মবিরোধ মহানর্থের মূল।

৫। শুনিলাম আমাদিগের পোষ্ট অফিসের দ্বিতীয় কর্ত্তা তাহার নিকট হইতে টিকেট খরিদ না করিলে পত্র রেজেষ্টরি করিতে চাহেন না, প্রত্যুত বিরক্ত হইয়া কেহ কেহকে

শ্রীমুখের ২/১টি মধুমাখা কথা শুনাইয়া দেন। এরূপ না করিবেন কেন? ইহাতে তাহার নিজের হানি হয় কি না? পোষ্ট অফিস আর কত দিনে শুধরি ইয়া উঠিবে।

৬। অত্রত্য জজ শ্রীযুক্ত ডজশন সাহেব আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভেই স্বদেশে যাত্রা করিবেন। তাঁহার কাজে কে নিযুক্ত হইলেন?

২০ জানুয়ারি, ১৮৬৬

**খেয়াঘাট**

এদেশীয় সাধারণ খেয়াঘাট এক একটি স্বেচ্ছাচার রাজ্য বিশেষ। পাটনী এরাজ্যের একাধিপতি রাজা। ইহা দিনের কার্যকলাপ সন্দর্শন করিলে মুসলমান নবাবদিগের অনেক ভার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের না আছে হিতাহিত জ্ঞান, না আছে ধর্ম্মা ধর্ম্ম বোধ, না আছে রাজশাসন ভয় এবং না আছে ভদ্রাহুমোদিত ব্যবহার। সময়ে সময়ে ইহারা লোকদিগের যে পরিমাণ দৌরাত্ম্য ও স্বেচ্ছাচারমূলক অভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা দর্শন করিলে নিতান্ত শীতল বা [ অস্পষ্ট ] শরীরের শোণিত উষ্ণ না হইয়া পারে না। খেয়াঘাটের পাটনীরা যে যে প্রকার অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার করে এবং পথিকদিগকে খেয়াঘাটে যে যে প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নিম্নে তাহার কতিপয় প্রকারের উল্লেখ হইতেছে ।

১। অনেকগুলি খেয়াঘাট এরূপ স্থানে নির্দ্দিষ্ট, তাহার নিকটস্থ দুই তিন ক্রোশের মধ্যে লোকালয় বা সপল্লববৃক্ষ বিদ্যমান নাই। রৌদ্র বৃষ্টি উপদ্রব নিবারণার্থ সেখানে আশ্রয় স্থানের নিতান্ত অসম্ভব। কোন কোন স্থানে পাটনীর অবস্থানার্থ এক একখানি ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পাটনী ভিন্ন অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। যদি কদাচিৎ কোন পথিক রৌদ্রোত্তাপে উত্তপ্ত, বা বৃষ্টিজলে আদ্রীভূত হইয়া সেই কুটীরে প্রবেশ করে, তাহার প্রতি পাটনীর ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। যথেচ্ছরূপে তাহার পর গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। কখন কখন বা প্রহার করিতেও সমুদ্যত হয়। ভদ্র হউক আর না হউক পাটনীর নিকট সকলেই সমান দর। কেহই প্রায় তাহাদিগের সৎকার বা সম্মানভাজন হইতে পারে না। আমাদিগের তাদৃশ ব্যবহার যুগপৎ ক্রোধ বিরক্তি ও ক্ষোভ উপস্থিত না হয়, জগতে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প।

২। শহরের নিকটবর্তী খেয়াঘাট ভিন্ন প্রায় কোন খেয়ার নৌকায়ই পাটনীকে বৈঠা স্পর্শ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। নৌকারুঢ় ব্যক্তিকেই স্বহস্তে নৌকা চালাইয়া এপার, ওপার, হইতে হয়। অথচ পয়সা লওয়ার সময়ে ছাড়াছাড়ি নাই। রীতিমত পয়সা দিয়া ঐরূপে যাতায়াত করা কেমন ক্লেশ, সকলেই ,তাহা বিবেচনা করিতে পারেন। কুটীরে বসিয়া নবাবজাদার ন্যায় পয়সা উসুল করাই পাটনীর একমাত্র কার্য্য। নদীর যে তীরে পাটনীর কূটীর স্থাপিত থাকে, তত্তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে নৌকারহনের পূর্ব্বে এবং অপর তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে সেই পারে উত্তীর্ণ হইয়াই-পাটনীর নিকট পয়সা দাখিল করিতে হয়। নৌকা পরিচালনার সহিত পাটনীর কোন সম্বন্ধ নাই। ক্বচিৎ কোন কোন নৌকারুঢ় পাটনীর দুই একজন চেলা বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে নৌকা চালাইবার কথা বলিলে তাহারা অমনি আরক্তচক্ষুঃ হইয়া উঠে।...

৩। বহুলোক না জমিলে প্রায় খেয়াঘাটের নৌকা খোলা হয় না। আরোহীরা নিজে নৌকা চালাইয়া যাইতে চাহিলেও পাটনীদিগের অনুমতি বিনা তদবিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্যানুরোধে সত্বর যাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র নৌকা ভাড়া করিয়া পার হইতে অভিলাষী হয়, তাহাতেও আবার পাটনীরা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করে। কাজেই অনেকেই কার্য্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রৌদ্রাদি ভোগ পূর্ব্বক নিরর্থক বসিয়া থাকিতে হয়। এতন্নিবন্ধন কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ, নিরর্থক সময় ব্যয় ও কত কার্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

৪। বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে ও অবসান সময়ে অনেক পাটনীই নির্ধারিত পণ্যের দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ অধিক লইয়া থাকে। দুএকখানি কাপড় বা সামান্য কোন জিনিষের নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রায় অতিরিক্ত মাসুল লয়। এতদ্বিষয়ে সরকারী কোন প্রকার আদেশ আছে কিনা আমরা নিশ্চিত অবগত নই। যাহা হউক এতদুপলক্ষেও পাটনীদিগের সময়ে সময়ে বিলক্ষণ দৌরাত্ম্য প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই।

৫। খেয়া ঘাটের নৌকা কুত্রাপি প্রায় দেখা যায় না। ঐ সকল নৌকায় সময়ে সময়ে একত্র এত লোক উঠিয়া থাকে যে, প্রাণসংশয় হইয়া নদী পার হইতে হয়। এতন্নিবন্ধন কখন ২ নৌকা ডুবিয়া অনেকের সর্বনাশ না ঘটায় এমনও নয়, কিন্তু তথাপি পাটনীরা এতদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে না, প্রত্যুত অধিক পয়সার প্রলোভনে মানুষ ও গরু দিয়া নৌকাখানিকে একেবারে ডুই ডুই বোঝাই করিয়া দেয়।

....অতএব আমরা প্রস্তাব করি, নিম্নলিখিত গভর্ণমেন্ট নিয়মানুরূপ নিয়ম বিধান করিয়া সাধারণের কষ্ট নিবারণ করুন :

১। এরূপ স্থানে খেয়াঘাট নির্দ্দিষ্ট হইবে যাহার নিকটে লোকালয় বা আশ্রয়োপযোগি বৃক্ষাদি বিদ্যমান আছে। যে সকল স্থানে তদ্রূপ লোকালয়াদির নিতান্তই অসম্ভব, সে সকল স্থানে পথিকদিগের বিশ্রামার্থ ফেরীফন্ডের অথবা পাটনীদিগের ব্যয় দ্বারা এক এক [ অস্পষ্ট ] ঘর প্রস্তুত করাইতে হইবে।

২। পাটনীদিগকে স্বয়ং নৌকায় থাকিয়া লোক পার করিতে হইবে।...অত্যাচার করিলে নিকটবর্তী পুলিশ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ বিচারার্থ প্রেরীত হইবে।

৩। বিশেষ বিশেষ খেয়াঘাটের নৌকা খুলিবার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ সময় নির্ধারণ করিতে হইবে। ...এরূপ হইলে আর কাহাকেও খেয়াঘাটে যাইয়া নিরর্থক সময় যাপন করিতে হইবে না।

৪। বিশেষ বিশেষ খেয়াঘাটের পণ্যের এক নির্দ্দিষ্ট তালিকা থাকিবে। পাটনীরা যে কখনও তাহার অধিক লইতে না পারে। যাহারা এককালীন জমা দিয়া সর্ব্বদা এপার ওপার হয় তাহাদিগের সহিত পাটনীদিগের লোক সংখ্যার এক আনুমানিক বন্দোবস্ত থাকিবে। বন্দোবস্তের অতিরিক্ত লোক হইলে জমাদায়ীদিগকে অধিক মাশুল দিতে হইবে।

৫। নৌকার আয়তন বিবেচনা করিয়া আরোহীর অনাধিক সংখ্যা নিরূপণ করিয়া দিতে হইবে। পাটনীরা যেন সেই নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক লোক কখনই না উঠাইতে পারে ইত্যাদি কতিপয় নিয়ম অবধারিত হইলেই খেয়াঘাট সংক্রান্ত সকল অসুবিধার নিরাকরণ সম্ভাবনা আছে।

৬ মে, ৮৬৬

## মোক্তার নির্বাচন

১৮৬৫ সনের ২৯ আইন অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত হাইকোর্ট সম্প্রতি যে সারকুলার প্রচার করিয়াছেন ১৭ই বৈশাখের ঢাকা প্রকাশে তাহা উল্লেখ করিয়াছি।....উহাতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হইয়াছে, আইন ও কার্য্য-বিধিজ্ঞতা ও সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট প্রদর্শন না করিতে পারিলে কোন ব্যক্তিই হাইকোর্টের ফর্দ্দভক্ত হইতে পারিবেন না।....

উপরি উক্ত সারকুলার প্রচার হইয়া অবধি মফস্বলের মোক্তার সংসারে ভারী হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন মোক্তারি বড় সুখের ব্যবসায় ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি বল, আইন, কানুন বল, আর বংশমর্যাদাদিই বল, মোক্তারির সহিত এসকলের বড় সম্পর্ক ছিল না। সামান্য একটি চাপকান ও একটি ফেঁটা এবং একটি ওয়াস্তিখাগের কলম থাকিলেই মোক্তারির যথেষ্ট উপযোগিতা হইত। তৎসহ যদি কিছু ধূর্ত্ততা শঠতাদির সহযোগ বর্ত্তমান থাকিত, মনিকাঞ্চনযোগের ন্যায় মোক্তারী অতি গৌরাবান্বিত হইয়া উঠিত। কিন্তু ২০ আইন প্রচার দ্বারা গবর্ণমেন্ট উত্তরূপ মোক্তারির আয়ু শেষ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। যদি মফস্বলের কর্ত্তৃপক্ষ উপেক্ষা না করিয়া গবর্ণমেন্টের আইন ও হাইকোর্টের সারকুলার অনুযায়ী কার্য্য অনুষ্ঠান—করেন, অত্যল্প দিবস মধ্যেই মোক্তার শ্রেণী অতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু মফঃস্বলের বিচারকদিগের যে প্রকার ভাবগতি ও লোকের মোক্তারি করিবার যেরূপ আগ্রহাতিশয়তা দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় না মোক্তারশ্রেণী সহসা বিশুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিবে। আমরা অবগত হইয়া বিস্মৃত হইলাম, যত গণ্ড মূর্খ উমেদার ও গ্রাম্য মণ্ডলশ্রেণীর লোক, সকলেই এই সময়ে মোক্তারী কার্য্যে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান গরদা মোক্তারদিগের ত কথাই নাই। এই সকল লোকে মোক্তারিতে প্রবেশ করিবার বা বহাল থাকিবার এক উত্তম কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। নানা সুপারিশ দ্বারা উকীলদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের স্বাক্ষরিত আইনজ্ঞতার ও সচ্চরিতার সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতেছে। এই সার্টিফিকেট দেখাইয়া জজ সাহেবকে পরিতুষ্ট করিবে ও তাঁহা হইতে তামাদের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবে এই তাহাদের অভিপ্রায়। যে উকীল যে মোক্তারের নিকট সুপারিশ বা আত্মীয়তার সূত্রে সমৃদ্ধ, তিনি তাহার সতীর্থ অন্যান্য উকীলদিগকেও বাধ্য করিয়া ঐ সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করাইতেছেন। সার্টিফিকেট দেখিলে সহসা সকলেই বোধ হইতে পারে, সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি অতি সাধু উপযুক্ত ব্যক্তি। বাস্তবিক তাহাদের অনেকের পেট চিঁরিলে 'ক' অক্ষরও বাহির হইবে না এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনা ধূর্ত্ততা শঠতাদির নিমিত্ত তাহারা বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন। এজন্য আমরা পূর্বেই জানাইয়া রাখিতেছি, জজ প্রভৃতিরা ঐরূপ সার্টিফিকেট দেখিয়াই যেন ভুলিয়া না যান।

১৩ মে, ১৮৬৬

## বেগার ধরা

নবাবী অমলে সৈন্যাদি প্রেরণের রসদ, নৌকা ও লোক যোগাইবার নিমিত্ত বিশেষ ২ স্থানে বিশেষ ২ জমিদার প্রভৃতিকে ভার দেওয়া হইত। জমীদার প্রভৃতিরা তাঁহা প্রয়োজনরূপ যোগাইতে পারিলে পুরস্কৃত ও না পারিলে দণ্ডিত হইতেন। কেহ ২ তদর্থ নির্দ্দিষ্টরূপে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পাইতেন। যাঁহারা এজন্য লাখেরাজ ভোগ করিতেন। তাহারা যেরূপে পারিতেন কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিতেন। এই উপলক্ষে নিরূপায় দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে নিরতিশয়

অত্যাচার সহ্য করিতে হইত সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু নবাবী আমলে প্রজারা সেই সকল অত্যাচারকে বড় অত্যাচারে বলিয়া অনুভব করিতেন না। ব্রিটিশ অধিকারে এক্ষণ প্রায় সকল বিষয়েই ন্যায় সঙ্গত সুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন বিষয়ে একটুকু অন্যায় অনিয়ম বা অত্যাচার দর্শন করিলেই লোকের অসহনীয় হইয়া উঠে। এক্ষণ গবর্ণমেন্টের সৈন্যাদি প্রেরণের বেগারি নৌকা ও লোক যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত কাহারো প্রতি নির্দ্দিষ্ট ভার নাই। প্রয়োজনানুসারে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীরাই তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকেন। কাহারো প্রতি অত্যাচার প্রকাশ না হয়। এজন্য সরকার হইতে যথোপযুক্ত কখন ২ প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যায় ও দেওয়া হইয়াকে [ থাকে ] কিন্তু আক্ষেপ এই, কর্ম্মচারীদিগের দোষে এতৎ সংক্রান্ত অত্যাচার এখনও বিদূরিত হয় নাই। প্রত্যুত এখনকার অত্যাচার নবাবী আমলের অত্যাচারকেও সময়ে ২ ভাল বলাইয়া থাকে। এক্ষণ বেগার ধরা সম্বন্ধে রীতি এই, কখন কোন সরকারি কার্য্য অধিক নৌকা বা লোকের প্রয়োজন হইলে কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার রিপোর্ট করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নাজির অথবা পুলিসের সাহায্যে তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাদিগের দ্বারা সংগ্রহ করুন, অবশেষে দুর্ব্বৃত্ত কনষ্টেবলদিগের উপরই সে ভার অর্পিত হইয়া থাকে। কখন ২ বা সৈনিক পুরুষেরা স্বয়ং ও উহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে ভয়ানক অত্যাচার হইয়া থাকে। অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান মাসের ২০শে তারিখে ছাতক হইতে কোন প্রামাণিক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। চারি পাঁচ দিবস হইল কতকগুলি মনিপুরী সৈন্য লইয়া তথায় একখানি জাহাজ অসিয়াছে। তদুপলক্ষে বেগার ধরার ভারি ধূম পরিয়া গিয়াছে। ভয়ে রাস্তা দিয়া লোক যাতায়াত করিতেছে না। কাপ্তান সাহেব প্রধান ২ মিরাশদারগণকে বাটি হইতে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ রাখিয়াছেন। নৌকা ও কুলি না পাইলে ছাড়িয়া দিবেন না। পরন্তু কোন ভদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তাহার যুবতী স্ত্রী শ্রাদ্ধ করনোদ্দেশ্যে নৌকায় মুরশিদাবাদ যাইতেছিলেন, একজন সুবাদার ও একজন সিপাহী সেই নৌকাখানিও ধরিয়া আনিয়াছে। এই নৌকায় আরো পাঁচ ছয়টি স্ত্রীলোক আছেন। শ্রাদ্ধের ম্যাদ গত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া অনেক ভদ্র বিশিষ্ট লোকে ঐ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ১০/১২ খান নৌকা গ্রহণ করিতে কাপ্তান সাহেবকে অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেছেন না। পাঠকগণ উপরিউক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া কি আপনাদের নবাবী আমল স্মরণ হইতেছে না? নবাবী আমলে ইহা অপেক্ষা অধিক কি অত্যাচার হইত? সত্য বটে অনেক সময়ে যথোপযুক্ত খাটুনি পাইলেও অনেকে মিছামিছি ভয় করিয়া সরকারি বেগার অস্বীকার করে, অথচ তখন বেগার না ধরিলে গবর্ণমেন্টের কাজ চলিতে পারেনা, কিন্তু এই বলিয়াই কি অত্যাচার করা উচিত? বেগার ধরা উপলক্ষে সাধারণের ভয় উৎপাদন সম্মান্য ব্যক্তিকে বন্দী করণ স্ত্রীলোকের নৌকা অবরোধ, হিন্দুর শ্রাদ্ধ বা কি সামান্য অত্যাচার? আমরা গবর্ণমেন্টকে নির্ব্বন্ধ সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকার বিধান করুন। আর সুদৃঢ়রূপে নিয়ম প্রচার করিয়া দিউন। অর্থ গৃধ নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা যেন বেগার ধরা না হয় এবং বেগার ধরা সম্বন্ধে কেহ কোন দৌরাত্ম্য করিলে তর্জ্জন্য যেন সে যথোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

২৭ মে, ১৮৬৬

## নোওয়াখালীর সংবাদদাতার পত্র

....ইতঃমধ্যে এখানকার ধৰ্ম্মসভার একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারনোপায় চেষ্টা করাই উক্ত অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই মৰ্ম্মে গবর্ণমেন্টে আবেদন করা স্থির হইয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু রাজাগণ ধনাগারের ন্যায় একটি শস্যাগারও রাখিতেন। ঐ শস্যাগার দ্বারা দুর্ভিক্ষকালে প্রজাদিগের প্রচুর উপকার হইত অতএব আমাদের বৰ্ত্তমান শাসন কৰ্ত্তারাও সেই পথ অবলম্বন করুন। আমাদের ধৰ্ম্ম সভার অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রে যে কিম্ভুত বুৎপত্তি পাঠকবর্গ তাঁহাদের এই অদ্ভূত উপায় আবিষ্ক্রিয়া দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন। দেশীয় ও বিদেশীয় ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা বারংবার মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়াও এইরূপ একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক ধৰ্ম্মসভা যদি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের দুঃখে দুঃখী হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এইরূপ একটি নিরর্থক প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন? মনে করিলে কি নওয়াখালীর ধৰ্ম্মসভা ২০০/৩০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রদেশের সাহায্যাপদার্থ প্রেরণ করিতে পারিতেন না?

২২ জুলাই, ১৮৬৬

## ময়মনসিংহের সংবাদদাতার পত্র

এ ময়মনসিংহ জিলায় বহু সংখ্যক ধনী জমীদার তালুকদার আছেন। অনেক জমিদারের আয় লক্ষ টাকারও অধিক, এগারোপরি সমৃদ্ধ বিচারক উকীল প্রভৃতি অনেক আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এত অধিক ধনবান ক্ষমতাশালী লোকদিগকে নিরন্তর বক্ষে ধারণ করিয়াও এ প্রদেশের হীন মলিন বেশ দূর হইতেছে না। ইহার যে অংশে দৃষ্টিপাত করি তাহাতেই নানা অভাব আমাদের নয়ন পথবৰ্ত্তী হইয়া হৃদয়কে ব্যপিত করিয়া তুলে। পাঠকবর্গ আমাদের গতবারের পত্রে অবগত হইয়া থাকিবেন এই ঋদ্ধিশালী ময়মনসিংহ জিলা অহরহ শত ২ লোক অচিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তথাপি সকলে মিলিয়া কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক একজন উপযুক্ত চিকিৎসক রাখার চেষ্টা পাইতেছেন না। অদ্য আর একটী অভাবের উল্লেখ করিতেছি। তাহা এই—

এ নগরে একটীও পুস্তকালয় নাই যে সাধারণে পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারে। ১০/১১ বৎসর হইল ভূতপূৰ্ব্ব বিদ্যোৎসাহী কালেক্টর কেম্প সাহেবের প্রযত্নে একটী পাব্লিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সাহেব স্থানান্তরিত হইলে অচিরকাল মধ্যেই উহা লীলা সম্বরণ করে। তৎপর অত্রত্য ভূতপূৰ্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সদাশয় বাবু কালিদাস দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে একটী রিডিংক্লাব (পুস্তকাদি পাঠের সভা) স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাও দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে না। ডিপুটী বাবুর স্থানান্তর গমনের অব্যবহিত পরেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। ২/৩ বৎসর যাবৎ এ নগরে লাইব্রেরি বা রিডিং ক্লাবের নাম গন্ধও নাই। জমীদার মহোদয়দিগের এক জনে মনে করিলেই অনায়াসে এই মহান অভাব মোচন করিতে পারেন। তাঁহার এসকল বিষয়ে মনোযোগ করিবেন না, ময়নমসিংহের উন্নতি সাধন বিষয়ে কেম্প সাহেব ও কালিকা দাস বাবুর দায়। তাঁহারা আত্ম কলহ ও জঘন্য আমোদ প্রমোদ ও মকদ্দমাবাজি করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন। যে টাকা লাইব্রেরি ইত্যাদির উদ্দেশ বিসৰ্জ্জন করিবেন তদ্বারা নানাপ্রকার বাবুগিরি ও মকদ্দমা করিয়া সক

মিটাইতে পারিবেন। জন্মভূমির উন্নতি অবনতিতে তাঁহাদিগের কি আসে যায়? ক্ষমতাবান স্থানীয় চাকুরে মহাশয়গণ ও বিলাসী ভূম্যধিকারী দিগের ব্যবহারানুকরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যুত তাঁহাদিগের অনেক আমোদি পুরুষ অনেক ঘোর বিলাসী জমীদার মাতাকে ও লজ্জা দিয়াছেন। এই সকল মুখোজ্জ্বলকারী পুরুষেরা আমোদ প্রমোদ গল্প অবকাশ পাইয়া উঠেন না প্রস্তাবিত তুচ্ছ বিষয়ে কোন সময়ে মনোযোগ করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বড় মানুষী জাঁক জমক ও আমোদ করিবার জন্যই মাসে ২ প্রচুরার্থ প্রসব করিয়া থাকেন, সাধারণের হিত সাধন করা সেই অর্থের উদ্দেশ্য নহে। এ নগরে ৪/৫ জন মাত্র ইউরোপীয় আছেন। তাঁহারাও আপনাদের মধ্যে একটী বুকক্লাব স্থাপন করিয়া জ্ঞানানুশীলন করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের বহুকালীন মনোরথ পূর্ণ দেখিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। জানি না গবর্ণমেন্ট কেন পুনর্ব্বার তাহাদের এই সন্তোষকে বিরসে পরিণত করিলেন। এক জন অধ্যাপকের শিরে এই ভার ন্যস্ত করিলে অধ্যাপনা কার্য্যের বহুতর ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়াই যদি গবর্ণমেন্ট এই কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে আমরা কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু প্রিয়নাথ বাবু অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যে, নিজে প্রেক্টিস করিবেন না তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের বক্তব্য এই, প্রিয়নাথ বাবু হউন এবং আর যিনিই হউন ঢাকা কলেজের জন্য একজন স্বতন্ত্র বাঙ্গালী সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন নিযুক্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩

## এতদ্দেশীয় স্ত্রীদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র রেলওয়ে শকট

এদেশীয় স্ত্রীদিগের নিমিত্ত সর্ব্বথা স্বতন্ত্র এক প্রকার শকট রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহাতে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়াদি শ্রেণীর সাধারণ রেলওয়ে শকটের ন্যায় শ্রেণী বিভেদ ও নমুনানুসারে ভাড়ার তারতম্য রাখিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু স্ত্রী শকট মাত্রেই এরূপ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, যেন তাহাতে দেশীয় স্বজনোচিত সম্ভ্রম রক্ষায় কোন প্রকার ক্রুটি ঘটনা না হয়। প্রত্যেক শকটে এরূপ স্থান রাখা আবশ্যক যেন শকট হইতে অবতরণ না করিয়াই মলমূত্র ত্যাগ করা যাইতে পারে, অথচ তদ্বশতঃ দুর্গন্ধ বিস্তারিত হইয়া শকটাভ্যন্তরবর্ত্তিনী স্ত্রীদিগের স্বাস্থ্যনাশ বা অসহ্য বিরক্তি উৎপাদন না করে। যাহাতে স্ত্রী শকটের সহিত পুরুষদিগের কোনরূপ সংশ্রব না থাকে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে। স্ত্রী শকটের রক্ষণাবেক্ষণাদি জন্য স্ত্রী লোক "গার্ড" রাখিতে হইবে। ধূর্ত্তেরা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রীশকটে প্রবেশ পূর্ব্বক অত্যাচারাদি করিতে না পারে এজন্য প্রত্যেক স্ত্রীশকট রক্ষিকাদিগের এই কর্ত্তব্য হইবে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে এক ২ করিয়া দেখিয়া শকটাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয়। পাছে তাহারা কোন ধূর্ত্তের অর্থপ্রলোভন মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্ত্রীবেশে শকটাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দূরভিসন্ধি সাধন করিতে দেয়, এই নিমিত্ত স্ত্রী রক্ষিকাদিগের প্রতি সবিশেষ শাসন রাখিতে হইবে। তাহারা ভ্রমক্রমে কোন স্ত্রীবেশধারী পুরুষকে শকটে প্রবেশ করিতে দিলেও গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিতা হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিবে। সাধারণ শকটের সহিত স্ত্রীশকটের এরূপ স্বাতন্ত্র্য বিধান করিতে হইবে যেন চলিষ্ণুশকটের পুরুষ "গার্ড"গণও বহিস্পার্শ্বদিয়া স্ত্রীশকট পর্য্যন্ত গতয়াত করিতে না পারে।

অনেক স্ত্রীলোক আত্মীয় স্বজন হইতে পৃথক হইয়া অপরিচিত পূর্ব্বা স্ত্রীদিগের সহিত এক শকটে যাইতে অনিচ্ছু হইতে পারেন। আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে স্বতন্ত্র এক খানি শকটে যাওয়াই তাঁহাদিগের অধিকতর অভিপ্রেত হইতে পারে। অতএব যে সকল স্ত্রীরা স্বতন্ত্র এক এক খানি শকটের সম্যক ভাড়া দিতে পারি সমার্থ হন তাহাদিগের আত্মীয়স্বজন সহ যাইবার উপযোগী স্ত্রীশকট রাখাও কর্ত্তব্য।

শকটবর্ত্তিনী মহিলারা কোন ষ্টেশনে যাইয়া যে পর্যন্ত না তাহাদিগের কোন আত্মীয় পুরুষকে শকটের সম্মুখে দেখিতে পান বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শকট হইতে অবতরণ করিতে না চান, সে পর্য্যন্ত যেন তাঁহাদিগের বাধ্য করিয়া শকট হইতে নামাইয়া দেওয়া না হয়। তাহাদিগের আত্মীয়রা যাহাতে নিকটতরবর্তী কোন শকটে আরোহন করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যদি অন্য কোন ব্যাঘাত ঘটনা না হয়, তাহা হইলে একই শকটে যাহাতে আত্মীয়সম স্ত্রীলোকদিগের অবস্থানের সুবিধা হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে পারিলে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হয়।

২৩ মে, ১৮৬৯

## বিলাতযাত্রী

আজিকালি এদেশীয় যুবকদিগের অন্তঃকরণে বিলাত যাত্রায় বিলক্ষণ ঔসুক্য জন্মিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে বৈদেশিকগণ অর্থপ্রলোভনে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র ও নদনদী এবং দুরতিক্রম্য পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতেন। স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা যাহা অভিলাষ করিতেন তাহাই পূর্ণ করিয়া লইতেন। অর্থলোলুপ ডেরায়দ তৈমরলঙ্গ, নাদির সাহ ও মামুদ যেমন ভারতবর্ষ লুঠিয়া লইয়া মনিমুক্তা ও ধনে স্বদেশ পূর্ণ করিয়াছিলেন, গ্রীক, চীনীয়, রোমান এবং আরবীয়ানেরা আবার তেমনই জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না, দেবভূমি ভারতের রীতি প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করাই বোধ হয় তাঁহার মুখ্য অভিপ্রেত ছিল। একদা ভারতবর্ষ যেমন শিল্পেশ্বর্য্যে সুশোভিত ছিল, তেমনই আবার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গণিতাদি শাস্ত্রে পৃথিবীর সর্ব্বোচ আসন অধিকার করিয়াছিল। তৎকালীন ভারতকর্ম্মক্ষেত্রে যে যাহা চাহিত তাহাই প্রাপ্ত হইত, কিন্তু হায়। সেই ভারতসন্ততিগণ এখন অধীনতার প্রখর তাপে বিশুষ্ক হইয়া ভারতভূমিকে মরুক্ষেত্র প্রায় দর্শন করিয়া কোথায় অন্ন, কোথায় চাকরি বলিতে বলিতে জাতীয় সম্মান ও জাতীয় গৌরব পদদলনানন্তর বিলাতযাত্রায় বিমুখ হইতেছেন না। স্বদেশ তাহাদের উদর পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং সাত সমুদ্র তের নদীর তরঙ্গমালা তাহাদিগকে ভীত ও বিমুখ করিতে পারিতেছে না। যাহাহউক, এখন সে দেশে লক্ষলক্ষ বৈদেশিক লোক প্রতিপালিত হইতেছে এবং ধনবান হইয়া দেশে চলিয়া যাইতেছে, আশ্চর্যও আক্ষেপের বিষয় এই, সেই দেশবাসী সুকুমার যুবকগণ শুদ্ধ অন্নসংস্থানের নিমিত্ত বিলাত যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনেকেই বারিষ্টার, ডাক্তার ও সিবিলিয়ান হইবার জন্য ব্যস্ত, কারণ তাহাতে অর্থের প্রলোভন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও যে ভস্ম প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, অনেকে তাহা জানিয়া শুনিয়া এবং বুঝিয়াও কেন কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, বুঝা যাইতেছেনা। সিবিলিয়ান হওয়া এক্ষণ এদেশীয়ের পক্ষে দেবত্বলাভের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। বিলাতের একজন মুরদা ফরাসের সন্তানও অক্লেশে সিবিলিয়ান হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এদেশের

মুখোর্য্যা, চাটুর্য্যা, ঘোষ গুহ ও [ অস্পষ্ট ] সন্তানদিগের অনেকেই প্রকারান্তরে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আবার যাঁহারা বিলাতে যাইয়া বারিষ্টার [অস্পষ্ট] ম তাঁহাদিগেরও [ অস্পষ্ট ] অন্ন খুটিতেছেন। কেহ কেহ মুন্সেফী লইতে বাধ্য হইতেছেন। এদেশে থাকিয়া যাঁহারা সাধারণ ওকালতী করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকে বারিষ্টার অপেক্ষা অধিকতর অর্থও উপার্জ্জন করিতেছেন। তবে কেন বৃথা অর্থ, জাতি ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসা ভরসাস্থল নবযুবকগণ দেশের বলক্ষয় করিতেছেন? যদি চাকরি না যুটে, ক্ষতি নাই, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি চর্চ্চা করিয়া অর্থোপার্জ্জন, অভাব বিদূরণ ও সৌভাগ্য সঞ্চয় কর, নিরর্থক বিলাতের আকর্ষণে পড়িয়া দেশের শক্তি ও গৌরব নষ্ট করিলে কি ফল হইবে? আমরা অবশ্য স্বীকার করিব, যাঁহারা শুদ্ধ স্বদেশের উন্নতি কামনায় প্রশস্তবিদ্যা, প্রশস্তজ্ঞান, বহুজ্ঞতা ও সৎসাহসাদি উপার্জ্জন করিতে বা ধর্ম্ম বিস্তারার্থে বিলাত যাত্রা করেন, তাঁহারা দেশের নমস্য ও সম্মাননীয়। ইউরোপের বিবিধ বিদ্যা, উচ্চতর সুনীতি ও শিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়া তাহার প্রয়োগ এবং স্বদেশীয়দিগের মধ্যে তাহার বিস্তার করিলে দেশের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কয়ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অতএব আমরা পুনরায় বলি, যদি শুদ্ধ অর্থ প্রলোভনই বিলাত যাত্রার মুখ্য অভিসন্ধি হয়, তবে তাহার আর প্রয়োজন নাই।

২৫ জুলাই, ১৮৮০

### ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্রিকেট খেলা

ঢাকা কলেজ ক্লব ও প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্লবের ক্রিকেট খেলা নিয়া বড়ই গোল বাধিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। কলিকাতার কতিপয় সহযোগী প্রেসিডেন্সির জয় ঘোষণা করিতেছেন। তন্মধ্যে সহযোগ "সময়" যে কিছু বিস্তৃতভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। নিম্নে তাঁহার মত সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১. এই খেলার কোন অধ্যাপকের খেলিবার কথা ছিল না।

২. খেলায় প্রথম দিন বুথ ও টেপার বেশী দৌড় করিয়াছিলেন বলিয়া ঢাকার জয় হইয়াছিল।

৩. দ্বিতীয় দিনে ঢাকার সাহেব দুইজনকে ছুঁড়িয়া খেলিবার, ও প্রথম দিনের মধ্যে ষোলআনা পরিত্যাগ করিয়া সুধু দ্বিতীয় দিনের দৌড় দেখিয়া জয় পরাজয় স্থির করার কথা হয়।

৪. দ্বিতীয় দিনে ৪টা দৌড় বেশি করিয়া প্রেসিডেন্সী ক্লব জিতিলেন। ঐ দিন প্রেসিডেন্সির কতটা ভাল খেলুড়ে খেলিতে পান নাই, নচেৎ ঢাকার বিলক্ষণ হার হইত।

একটী একটী করিয়া সহযোগীর এই কয়েকটী কথার বিচার করিব।

১. অধ্যাপকগণের খেলিবার কথাছিল না একি সহযোগীর কল্পনা? আমরা ঢাকা কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণের নিকট শুনিয়াছি অধ্যাপকগণ খেলিবার জন্যই কলিকাতা গিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহাদের যাইবার কোন প্রয়োজন ছিলনা। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক।

ক. ঢাকা কলেজের কাপ্তান বাবু সারদা রঞ্জন রায়ের নিকট কোন অধ্যাপক খেলিতে পারিবেন না এই মর্ম্মের কলিকাতা হইতে কেহ কোন চিঠী লিখেন নাই। অথচ কোন খেলুড়েকে ছাড়িয়া বা লইয়া খেলিবার বন্দোবস্ত কাপ্তেনের সহিতই করিতে হয়।

খ. ঢাকায় যখন ১১ জন ক্রীড়ক নির্ব্বাচিত হন তখন ক্লবের প্রেসিডেন্ট বুথ সাহেব সুধু ৯ জন বাংগালীকে প্রস্তত রাখিতে বলেন, কিন্তু সারদা বাবু পীড়ার আশঙ্কা দেখাইয়া আরও দুই জন লোক সংগে নেন। বুথ সাহেবের খেলিবার মতলব না থাকিলে শুধু ৯ জনকে প্রস্তত থাকিতে বলিবেন কেন?

গ. সারদা বাবু উভয় দিন খেলিয়াছিলেন অথচ তিনি একজন অধ্যাপক জানিয়াও তাঁহার খেলাতে কেহ আপত্তি করে নাই।

ঘ. ঢাকার ক্রীড়কগণ কলিকাতায় যাইয়া শুনিলেন, বুথ ও টেপার যাহাতে না খেলিতে পান রো সাহেব সে চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত সংবাদ জানিবার জন্য প্রথম খেলার দিবস প্রাতে সারদা বাবু বুথ সাহবের সহিত দেখা করেন। সারদা বাবুর কথার উত্তরে বুথ সাহেব বলেন "What has Mr. Rowe to do with me? I shall make my own arrangements" ঢাকার ভাল বোলারটীর জ্বর হইয়াছে শুনিয়া বুথ বলেন "Doesn't meter. Mr. Tepper will bowl them all out" সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি এসকল কথা হইতে অধ্যাপকগণের ফেলিবার কথা ছিল না, এরূপ বোধ হয় কি?

ঘ. চিহ্নিত কথাগুলি আমরা সারদা বাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছি সুতরাং ঐ সকলে কোন ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

২. বুথ ও টেপার সাহেব বেশী দৌড় করিয়া ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের দৌড় ছাড়িয়া দিলে ও ঢাকার ৭৬ এবং প্রেসিডেন্সির ৪৯ দৌড় হয়। অথচ সহযোগী অম্লান মুখে বলিতেছেন, বুথ ও টেপার বেশী দৌড় করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথম দিন ঢাকার জয় হইয়াছিল। ধন্য সহযোগীর সত্য প্রিয়তা। অথবা শাস্ত্রের কথা ফলিতেছে, কাল ধর্ম্ম কীর্ত্তনে লিখিত আছে সত্য গোপন এ সময়ের ধর্ম্ম।

৩. সহযোগীর ৩ সংখ্যক মতগুলি সম্পূর্ণ অলীক। দ্বিতীয় দিনে প্রেসিডেন্সির ক্রীড়কগণ প্রথম দিনের দৌড় বহাল রাখিয়া বাট ধরিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রো ও হুইলার সাহেব এবং অপর কয়েকটী প্রেসিডেন্সির ক্রীড়ক একবাক্যে স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় দিন হাজার ভাল খেলিলে ও পূর্ব্ব দিনের ক্ষতিপূরণ প্রেসিডেন্সির পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তখন সারদা বাবু রো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন —

"তবে কি আপনারা স্বীকার করিতেছেন যে Dacca College vs Presidency College পূর্ব্ব দিনের ক্রীড়া দৃষ্টেই ঢাকার স্বপক্ষে নিষ্পত্তি হইল?"

রো সাহেব তাহাই স্বীকার করেন।

সারদা বাবু পুনরায় বলেন " তাহা হইলে আমরা যে উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে আসিয়াছিলাম তাহা "সিদ্ধ" হইয়াছে এক্ষণে আর খেলা নিষ্প্রয়োজন। তৎপর সেদিনকার জন্য উভয় দলে Scratch match (আপোশ খেলা) খেলিবার প্রস্তাব হয়। বুথ ও পেটার খেলিতে অসম্মত হন।

এক্ষণে দ্বিতীয় দিনের খেলা লইয়া হার জিত ধরা হইল, সহযোগীর এই উক্তি কতদূর সত্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় দিনের খেলার যথা সম্ভব প্রতিযোগিতার ভাব দূরে রাখিবার জন্য এমনও প্রস্তাব হইয়াছিল যে, উভয় দল হইতে কিছু কিছু নিয়া নতুন দুইটী দলে গড়িয়া খেলা হউক। টেপার সাহেব সময় যাইতেছে বলিয়া তাড়াতাড়ি না করিলে তাহাই করিত।

৪. দ্বিতীয় দিনে প্রেসিডেন্সির কতকটা ভাল খেলুড়ে খেলিতে পান নাই সত্য। এই ঘটনা হইতে সহযোগী বিস্তৃত বাধাপ্রোল্লঙ্ঘন করিয়া একসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে গিয়া পঁহুছিয়াছেন যে, উহারা খেলিতে পাইলে প্রেসিডেন্সির বিস্তর নম্বর বেশি হইত। সহযোগীকে অনুরোধ করি, ঐ সকল ব্যক্তি পূর্ব্বদিনের খেলার ২/১ দৌড় করিয়া একজন জ্বরভোগ সাগুখেকো বাঙ্গালীর বলে আউট হইলেন কেন? তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।

দুঃখের বিষয়, প্রেসিডেন্সির পক্ষ সূক্ষ্ম লক্ষ্য করিলে পরই সহযোগীর চক্ষে পক্ষপাতের পরদা পড়িল। ঢাকার দিক তিনি আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, ঢাকার সর্ব্বপ্রধান Bowler ও সর্ব্বপ্রধান Hard hitter জ্বরে পড়িয়ো একেবারে অকর্ম্মন্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন না যে দ্বিতীয় দিনে ঢাকার পক্ষের Back stop টীর হাতে চোট লাগাতে বাই নম্বর বেশি হইতেছে দেখিয়া বুথ সাহেব একজন নিরীহ প্রকৃতির লোককে বল করিতে নিযুক্ত করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, যেসকল ব্যক্তিকে আউট না করা পূর্ব্বদিন প্রেসিডেন্সির পক্ষে দায় হইয়া উঠিয়াছিল ঢাকার দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরদিন Runout হইয়া গেলেন। হরি! হরি! পরিশেষে এসকল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও যখন টেলিগ্রাফ বোর্ডে ঢাকার পক্ষে ১০৩ দৌড় উঠিয়া পড়িল তখন umpire সাহেবের চক্ষু ও মন অন্যত্র থাকাতে তিনি ঢাকার একটা ভাল খেলুড়েকে অকারণ আউট বলিয়া বসিলেন, দর্শক মাত্রেই সেটী দেখিয়া umpire কে ধিক্কার দিতে লাগিল, আমাদের সহযোগী তাহা দেখিলেন না। সহযোগীদিগকে উপসংহারে বলিয়া রাখি, যে প্রেসিডেন্সির ভাল খেলুড়ে কয়টীই আশৈশব ঢাকা ক্রিকেট ক্লবে শিক্ষিত প্রেসিডেন্সি ক্লব ক্রীড়ার পটতা দেখাইতে পারিলেও তাহা ঢাকা ক্লবেরই গৌরব ঘোষণা করিত। অধিক কি ঢাকা ক্লবে যাঁহারা শিক্ষিত হন নাই, তাহাদের পক্ষে ঢাকা ক্লবকে পরাজয় করা সহজ নহে। সম্প্রতি এখানে "পূর্ব্ববঙ্গ ক্রিকেট ক্লব" নামে একটী ক্লব হইতেছে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি পশ্চিম ও দক্ষিণ সমবেত হইয়া আগামী বৎসর ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করুন, তবেই পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা ক্রিকেট খেলার নিজহীনতা বুঝিতে পারিবেন।

এস্থলে আমরা শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র দাসকে ঢাকা ক্লবের জন্য তাঁহার প্রচুর ও অকাতর অর্থব্যয় হেতু ধন্যবাদ দিয়া অনুরোধ করিতেছি। তিনি যেন এই নবজাত পূর্ব্ববঙ্গ ক্রিকেট ক্লবের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহারই প্রথিত বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া এই ক্লবের মেম্বরগণ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন।[১৪৭]

৯ জানুয়ারি, ১৮৮৭

## সংবাদাবলী

গত বুধবার ঢাকা পুরান পল্টন ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ ছাত্রদিগের মধ্যে ক্রিকেট ক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। উহাতে ঢাকা কলেজের ২১ দৌড় হইয়াছিল। সুতরাং, ঢাকা কলেজের সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ হইয়াছে।

১৬ জানুয়ারি, ১৮৮৭

## বিজ্ঞাপন

নবাব আছানউল্লা খাঁ বাহাদুর তাঁহার ইংরেজ এবং দেশীয় বন্ধুবর্গ ও ঢাকাস্থ জনসাধারণকে এই অভিপ্রায় জানাইতেছেন যে,'শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি, তাঁহার সাবাগ নামক বাগিচায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবেক, তজ্জন্য ঐদিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা মধ্যে উক্ত বাগিচার সকলের আগমন বাঞ্ছনীয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১

## [ পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের প্রতি ঘৃণা ]

সহচর পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের প্রতি কিরূপ ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাহা সহচরের পাঠক মাঝে মাঝে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন। গতবার পূর্ব্ববঙ্গ বিদ্বেষের আর একটি পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীহট্টের অধীন হবিগঞ্জে একটি পুলিশ কর্ম্মচারী সাহেব পুলিশ ইনস্পেক্টর দ্বারা অত্যাচরিত হইয়া তাহার প্রভু সাহেবকে সমানে থাবর মারিয়াছে, আর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকটি প্রথম শিক্ষককেও থাবর মারিয়াছেন, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া সহচর পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রতি ব্যঙ্গভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু সহযোগী এখনও জানেন যে, হবিগঞ্জ পূর্ব্ববঙ্গ নহে উহা আসাম অথবা প্রাচীন সূক্ষ্ম দেশ। তিনি পুণ্ড্র দেশে বাস করেন কি না?

## ১৮৮৮ সনের ৫ই মার্চ্চ তারিখ হইতে গত তিন বৎসর মধ্যে ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৮৮৮ সনের ৫ই মাচর্চ তারিখ হইতে গত তিন বৎসরের মধ্যে ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিসনারগণ যে যে কার্য্য করিয়াছেন, এ স্থলে তৎসমুদয়ের বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নহে মাত্র তাহারা যে যে অত্যাবশ্যকীয় ও নতুন কার্য্য করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল এবং তদ্দ্বারাই তাঁহারা ঢাকা শহরের করদাতাগণের সম্বন্ধে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কতদূর সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা প্রকাশ পাইবে।

১. মিউনিসিপল কমিসনারগণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে প্রধান অসুবিধা মিউনিসিপ্যালিটির নিতান্ত শোচনীয় আর্থিক অভাব ৪০০ হাজার টাকা ঋণ। কিন্তু হাউস ও প্রিভিট্যাক্স দরুন মাত্র ৩৩,০০০ হাজার টাকা পাওনা ছিল। এদিকে মিউনিসিপ্যালিটির নিকট যাহারা টাকা পাইবেন, তাহারা আদালতে নালিশ করিতে উদ্যত। পক্ষান্তরে মিউনিসিপ্যালিটি যাহাদের নিকট ট্যাক্স পাইবেন তাহারা

উক্ত ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে ১৪৮৭ খানা আপত্তির দরখাস্ত দিলেন। এই বিপদাপন্ন অবস্থায় কমিশনারগণ দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির স্বার্থের প্রতি সম্মুচিত দৃষ্টি রাখিয়া আপত্তির দরখাস্ত সকল যত শীঘ্র সম্ভব নিষ্পত্তি করিতে আরম্ভ করিলে, ইতিমধ্যে যাহারা মিউনিসিপ্যালটির নিকট টাকা পাইতেন তাহাদের টাকা পরিশোধের জন্য কিছু দিনের অবকাশ লইলেন, এবং কমিশনারগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ১ মাস কাল মধ্যেই ১৫১৪০ টাকা বাকি আদায় ১৬৪৩০ টাকা পরিমাণ দেনা পরিশোধ করিতে সক্ষম হন। বক্রিদেনা ১৮৮৮/৮৯ সনে পরিশোধ করা হয়। এসেসমেন্ট সাব কমিটি প্রথম বৎসর ১৪৮৭ খানা আপত্তির দরখাস্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

২. কমিশনারগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারিগণের নতুন কোন বন্দ্যোবস্ত করা অতি আবশ্যক। মিউনিসিপ্যালিটির একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলনা এবং কমিশনারগণ মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে একজন ইঞ্জিনিয়ার রাখা স্থির করিলেন এবং সেই পরিমাণ সেক্রেটারির বেতন হ্রাস করিলেন। বিভাগীয় কমিশনারের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর ১৮৮৮ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর এবং ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধীয় বিষয় কমিসনার গণের সভা উপস্থিত হইলে কমিসনার ২০০ টাকা বেতনে একজন ইঞ্জিনিয়ার সেক্রেটারি ও ১০০ টাকা বেতনে একজন এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত করা স্থির করেন। যথা সময়ে কমিসনারগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সেক্রেটারী এবং এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারির পদ অত্র বিভাগীয় কমিশনার সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। নিম্নলিখিত কারণে এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারির পদ উঠাইয়া দিয়া তাহাকে জলের কল বিভাগে নিযুক্ত করা হয়, তদ্দরুন মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়াছে।

৩. জলের কল সহরের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত করার প্রস্তাব ১৮৮১ সনে প্রথম উত্থাপিত হয় এবং অনেক লেখালেখী ও বিবেচনার পর ১৮৮৫/৮৬ সনে উক্ত কার্য্যে কত ব্যয় পড়িবেক, তাহার এক এষ্টিমেট প্রস্তত করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া উক্ত টাকা সংগ্রহ করিতে কমিটি যত্নবান হন। প্রথমতঃ কলের নিয়মিত মাসিক ব্যায়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গেল যে কয়লা প্রভৃতি অপরিমিতরূপ ব্যয়িত হইতেছে। রেল আফিসের লোকোফোরমেন মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবের সহিত পরামর্শ ক্রমে জানা গেল যে কলের কোন বিশেষ দোষ না থাকিলে কয়লার এত ব্যয় বাহুল্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ইতিমধ্যে যে নবাব বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে জলের কল সংস্থাপিত হয়। এবং যাহার প্রসাদে সহরবাসিগণ এই সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। তিনিই জলকষ্ট পাইতেছেন, এইটি কমিসনারগণ নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করিলেন। তদন্তে জানা গেল যে জলের কলের ইঞ্জিনিয়ার এ বিষয়ে এককালীন উদাসন এবং নবাব বাহাদুরের অসুবিধা নিবারণ বিষয়ে একবার নিশ্চেষ্ট। মিঃ মেকডলেডকে এই অসুবিধা নিবারণ করিতে বলিলেই তিনি উত্তর করিলেন যে কল আর অধিক জোরে চালান হইলে বিপদের আশঙ্কা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। অত্রাবস্থায় কল পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হইল। বিশেষতঃ ১৮৭৬/৭৭ সনে কলের কার্য্য আরম্ভ করার পর আর কল পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই এবং তিনি যে সকল মেরামতের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ করা হয়। কয়লার কিছু কম খরচ হইতে লাগিল বটে কিন্তু সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের মতে যে পরিমাণ কম হওয়া উচিত, সে পরিমাণে কম হয় নাই। এই সমস্ত এবং মিঃ মেকডোনেল্ডের কার্য্যের অন্যান্য দোষ

উল্লেখ করিয়া কমিশনারগনের নিকট রিপোর্ট করিলে তাহারা মিঃ মেকডোনালন্ডকে সম্পঙ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারিকে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তারক বাবু জলের কল আরও কিছু মেরামত করেন, এবং কয়লা কম খরচ দরুন মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয় বার্ষিক ২১,০০০ টাকা পরিমাণ হ্রাস হয়। মিঃ মেকডোনাল্ডকে কার্য্য হইতে অবসর দিয়া তারক বাবুকে বার্ষিক ১০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়া নিয়মে ১৫০–২০০ বেতনে নিযুক্ত করা হয় এবং তারক বাবুর কার্য্য সেক্রেটারির পরিদর্শন করার জন্য তাঁহাকে মাসিক ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি দেওয়া হয়। এইরূপে এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তনের দরুন মিউনিসিপ্যালিটির ১০০০ টাকা ব্যয় হ্রাস হয়।

এই প্রকার ব্যয় হ্রাস হওয়ায় গবর্ণমেন্ট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া সহরের অন্যান্য স্থানে জলের কল সংস্থাপন করার প্রস্তাব কমিসনারগণের নিকট সেই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং গবর্ণমেন্টও দয়া করিয়া বার্ষিক শতকরা ৪৷৷০ টাকা সুদে ৩০ বৎসরের ম্যাদে ১২৫০০০ টাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্জ্জ দেন।

অত্র স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে পাইপের ও পাইপ বসানোর আনুমানিক ব্যয় ৩২১৬৩ টাকা ধরা হয়, তৎস্থলে ২২০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ১৯৫১৯ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল তাহা ৪৭৬ টাকাতেই সম্পন্ন হইয়াছে। নূতন ইঞ্জিনিয়ার ও বয়লার আনার প্রস্তাব ছিল না। ৩১০০০ হাজার টাকা দ্বারা ঐ ইঞ্জিন ও বয়লার ক্রয় করা হইয়াছে। বক্রি যে টাকা থাকিবে, তাহা দ্বারা আরও জলের কলের বিস্তার করা যাইবে। সম্ভবত এই বৎসরেই জলের কল সম্বন্ধীয় সমস্তকার্য্য সম্পন্ন হইবে। ২০৪৬০ ফিট পরিমাণ রাস্তার জলের কল বৃদ্ধি করা হইয়াছে, শীঘ্রই আর একটি মাইল রাস্তায় পাইপ বসান হইবে। সেক্রেটারী এবং জলের কলের ইঞ্জিনিয়ারকে জেল ও পাগলা গারদখানায় কত পরিমাণ জল ব্যয় হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বলায় পরীক্ষাতে গিয়াছে, (৬০০০ গ্যালন জল) যাহা উক্ত দুই স্থানে দেওয়ার কথা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ জল উক্ত দুই স্থানে ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্দুরুন জেল হইতে ১৩২০ টাকার স্থলে ১৯৮ টাকা জলের ট্যাক্স আদায় হইতেছে। এবং পাগলা গারদ খানায় ১৮ টাকা স্থলে ১০০ টাকা করিয়া বিল করা হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। জলের ট্যাক্সের দরুন রেলওয়ে হইতে বার্ষিক ৩০০ টাকা পাওয়া যায়। পাইপ বসানোর খরচ এবং মাসিক ৪ টাকা কর দিলে নগরবাসীগণও নিজ নিজ বাটিতে জলের কল নিতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত কারণাধীন জলকর ২২০০ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৮৫ সনে কমিশনারগণ লোহার পোল মেরামত করার আবশ্যকতা বোধ করুন, ১৮৮৯ সনের বাজেটে মেরামত খরচ ধরা হইয়াছে ১৮৯০ সনে মেরামত শেষ হইয়াছে।

নথব্রুক হল, মিটফোর্ড হাসপাতাল জলের কলের দালান সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হইয়াছে।

বাৎসরিক প্রিটি ট্যাক্স ৩৪০০০ টাকা কিন্তু এতদ্দুরুন বাৎসরিক ৪৫০০০ টাকা খরচ হইয়া থাকে। আয় হইতে ব্যয় অধিক দেখিয়া কার্য্যের অসুবিধা না করিয়া আয় হইতে ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেক ময়লার গাড়ী একবার ময়লা নিত, এখন প্রত্যেক গাড়ী তিনবার না হইলেও অন্তত দুইবার ময়লা নিবে এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মেথরগণ

দ্বারা অধিকক্ষণ কাজ করার আবশ্যকতা হওয়ায় ১৮৯০ সনের জানুয়ারী মাসে এই সম্বন্ধে একটি প্লেন করিয়া মিটিং এ দেওয়া হয়। ময়লা নেওয়ার গাড়ীর আয়তন বৃদ্ধি করাতে পূর্ব্বে যে গাড়ী দ্বারা ২০ টাকা পরিমাণ পায়খানা পরিষ্কার হইত এখন সেইখানে ৩০ টাকা হয়। ইতিমধ্যেই একটি ময়লা ফেলিবার জায়গা খোলা হইয়াছে, অপরটিও শীঘ্র খোলা হইবে। গাড়ীর বলদ ও মেথর একস্থানে থাকিলে কার্য্যের সুবিধা হয় এই জন্যেও চেষ্টা করা হইতেছে। ময়লার গাড়ীর বলদ দ্বারা দিনে অন্য কোন কাজ করান না হয় ও ঐ সকল বদল পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এই বন্দোবস্তে এই বিভাগে ৭৫০০ টাকা ব্যয় লাঘব হইয়াছে। ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই বিভাগে ১৩ জন জমাদার ও তিনজন ওভারসিয়ার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে পায়খানার সংখ্যা অন্যুন ১০০০ হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে। ১১টি মেথরের যাতায়াতের রাস্তা খোলা হইয়াছে এবং কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক স্থান ক্রীত হইতে আরও রাস্তা খোলা হইবে। স্থান ক্রয়ের ব্যয় তের জুরিতে আমানত করা হইয়াছে। ১৮৮৮/৮৯ সনে ৭৪ জন মেথর ও মেথরানী আনা হয়। বলদ রাখার ঘর সূত্রাপুর হইতে উয়ারীতে নেওয়া হইয়াছে, মেথর গরু ও গাড়ীর জন্য ঘর প্রস্তুতের আনুমানিক এষ্টিমেট ধরা হইয়াছে।

৬. ড্রেন—সম্বন্ধে কমিশনারগণ বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। ড্রেনের জন্য বার্ষিক ৫০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। পাথরের সসারড্রেন ১৮৮৯ সনে খোলা হইয়াছে।

সেনিটারি কমিসনার বলিয়াছেন যে স্লুইস গেট দ্বারা এই শহরে ড্রেন করা অতিশয় কঠিন। তিনি পুরাতন গড় খনন করার পরামর্শ দেন। ড্রেন সম্বন্ধে এক সাবকমিটি গঠিত হয়, তাহারা যে রিপোর্ট দিয়াছেন কমিসনারগন তাহাই মঞ্জুর করিয়াছেন। ১নং ওয়ার্ডের ড্রেন প্রস্তত করা প্রথমে আরম্ভ করা সুস্থির হয়। সেক্রেটারিকে ব্যয়ের ইষ্টিমেট ও তৈয়ার হইতেছে।

গবর্ণমেন্টে কর্ত্তৃক যে সেনেটারি বোর্ড গঠিত হইয়াছে সেই বোর্ড কি প্রকারে এই সহরের ড্রেনের কার্য্য সুচাররুপে সম্পন্ন হইতে পারে ও সেই সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এই জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার এখানে পাঠাইবেন।

১৮৮৮/৮৯ সন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দুইমাইল পরিমাণ ড্রেন প্রস্তত হইয়াছে।

| | |
|---|---|
| ৯ ইঞ্চি মাটির সসার ড্রেন | ১৬২৯ ফুট |
| ৬ ,, | ৮৩৫ ,, |
| ৮ ইঞ্চি কনক্রিট ড্রেন | ২৪৬২ ,, |
| কনক্রিট ডিপ ড্রেন | ৪৬০০ ,, |
| মোট | ১২১৪৫ ফুট |

আরও কয়েকটি ড্রেন প্রস্তুত হইতেছে। শাঁখারীবাজারের ড্রেন তৈয়ার করার জন্য স্থান লওয়া হইয়াছে। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অনেক বাড়ীর জন্য ১ ড্রেন [ অস্পষ্ট ] করার জন্য করদাতাগণ হইতে অনেক টাকা আদায় করা হইয়াছে।

৭. রাস্তা ১৮৮৮/৮৯ সন হইতে রাস্তার কার্য্য মিউনিসিপালিটি নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং তাহাতে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়াছে। কন্ট্রাক্টরগণ হইতে মাল খরিদ করিয়া কুলি দ্বারা কার্য করান হয়। পূর্ব্বে সমুদায় কার্য্যই কন্ট্রাক্টরগণ করিতেন। পূর্ব্বলিখিত উপায়ে

৪০০ ফুট রাস্তা মেরামতের ব্যয় নিম্নে দেওয়া গেল। ঝামা ও কঙ্কর দ্বারা মেরামত কাঁরিতে পূর্ব্বে ১২ টাকা লাগিত এখন উক্ত স্থলে ৯ আনা, শুধু কঙ্কর ৭ আনা লাগিত, সেইস্থলে পাষ্টা রাবিসে ৪।।০ টাকা সেইস্থলে ২ মাত্র এখন লাগিয়া থাকে।

৮ আট মাইল কাচারাস্তা ও লেনপাকা করা হইয়াছে যথা —

| | |
|---|---|
| ৬৩ টানেল | ৪২১৬৪ ফিট |
| ৩টা রাস্তা | ৩৫৮০ ” |
| | ৪৫৭৫৪ ” |

১৮৮৮/৮৯ সন হইতে ১২ টিরোড ও লেন প্রস্থে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আরও ৭টি লেনের পরিসর বৃদ্ধি করার জন্যে যে স্থানের আবশ্যক তাহা নেওয়ার ব্যয় কালেক্টর সাহেবের নিকট আমানত করা হইয়াছে। শীঘ্রই আরও তিনটি লেনের পরিসর বৃদ্ধি করা হইবে।

৮. আলো

৩৫টি আলো বৃদ্ধি করা হইয়াছে আরও আলো বৃদ্ধির জন্য ১০০০ টাকা বাজেট দেওয়া গিয়াছে। সেই সকল আলো শীঘ্রই দেওয়া হইবে। কানপুর হইতে অত্যন্ত জ্যোতি বিশিষ্ট ৬টি আলো আনা হইয়াছে, ইহাতে আলো অত্যন্ত বেশি হয় কিন্তু তৈল কম লাগে।

৯. কি পরিমাণ ব্যয় সংক্ষেপ করা গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল —

| খরচের তালিকা ব্যয় সংক্ষেপে ১৮৮৭/৮৮. | | | ১৮৮৮/৮৯ |
|---|---|---|---|
| হেড আফিসের | ৫৯৯৬ | ৪৮৯৬ | ১১০০ |
| কর আদায় বিভাগ | ৫০৫৮ | ৪৫০০ | ৫৫৮ |
| | | ১৬৫৮ | |
| সরকারি বাগিচা | ৫৫৮ | ৩৭৩ | ১৪ |
| শ্মশান ঘাট ও গোরস্থান | | | ২১৬ |
| জলের কল | ৫২৬২ | ৪২৬৮ | ৯৯৪ |
| জলের কলের ময়লা | | | ২২০০ |
| শহরের ময়লা পরিষ্কার | | | ৭৫০০ |
| | | | ১৩০৮২ |

১৮৮৮

## ময়মনসিংহের দুর্দ্দশা

ময়মনসিংহের শিক্ষিত নামধারীরা ময়মনসিংহের সর্ব্বনাশ করিতেছেন নানারূপে। তাঁহারা অধিকাংশ ময়মনসিংহের টাকা লুঠিয়া নিয়া কলিকাতার বাবুগিরি করেন, ময়মনসিংহকে দরিদ্র করিয়া ধনী কলিকাতার ধন বৃদ্ধি করেন। ইহারা বিদেশী বস্ত্রছাড়া পড়েন না, জঙ্গল বাড়ীর কাপড় ঢাকাবাসী কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইলে এতদিনে গোলায় যাইত। ময়মনসিংহের শিক্ষিতদিগের সংবাদপত্রখানি কর্ত্তৃক ময়মনসিংহের কুৎসা কাহিনী প্রতি সপ্তাহে প্রচার

হইতেছে। ময়নসিংহবাসীরা যে নিতান্ত লম্পট, দুর্ব্বত্ত, দুরাত্ম, তাহাই সর্ব্বত্র প্রচার ময়মনসিংহবাসীকে সকলের নিকট ঘৃণাই করা তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে কলিকাতা প্রভৃতি দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রতি বৎসর ২০/২৫ হাজার রমণী দুর্ব্বৃত্তদিগের জন্য ঘরের বাহির হইয়া বেশ্যাবৃত্তি বা চাকরাণী বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র গুলজার করিতেছে, সেখানেও ময়মনসিংহের কুৎসা প্রতিমুখে ঘোষিত হইতেছে — ময়মনসিংহের শিক্ষিত অভিমানী হিতৈশীর প্রসাদাৎ। হিতৈষীর মহিমায় সপ্রমাণ হইয়াছে, ঘুষদাতা বা ঘুষগ্রাহী যে সমাজে দুর্লভ নহে সেই উকিল মোক্তার কয়জন ছাড়া ময়মনসিংহে জুরী হইবার উপযুক্ত লোক নাই। বলা বাহুল্য, ময়মনসিংহেরই একটি আইন ব্যবসায়ী, জুরীকে ঘুষ যাচনার অপরাধে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ এমনই শ্রেণীর কয়টি লোক ভিন্ন জুরী হওয়ার যোগ্য লোক ময়মনসিংহে নাই বলিয়া যিনি সমস্ত ময়মনসিংহবাসীর মুখে কালিচুন মাখিতেছেন, তিনি ময়মনসিংহের হিতৈষী। অথচ সেই ময়মনসিংহের অধিকাংশ উকিল ভিন্ন জিলার অধিবাসী। মহারাজ সূর্য্যকান্ত বাহাদুর নিজ অধিকারের উন্নতির নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয়ে জলের কল দিয়াছেন, কিন্তু সেই জল খাইতে যে টেক্সের প্রয়োজন, তত্রত শিক্ষিত ভায়ারা তাহাও চালাইতে আপত্তি করেন এমনই পরপ্রত্যাশী। শিক্ষিত মহাশয়েরা শিক্ষার বড় বড়াই করেন কিন্তু ঢাকাবাসীর ন্যায় নিজেদের ধনে স্কুল কলেজ চালাইতে অসমর্থ হইয়া নানা জনের নিকটে সর্ব্বদা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ফিরিতেছেন, এমনই নির্লজ্জ। আর শিক্ষার অনুরাগও যে নিতান্ত কৃত্রিম, তাহার প্রমাণ সেই শিক্ষিতদিগের ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির আয় ব্যয়েই গরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার নিমত্তি এই ঢাকার ডিঃ বোর্ড ব্যয় করেন, আয়ের শতকরা ৩০.৪ টাকা, কিন্তু ময়মনসিংহের শিক্ষিত মহাশয়দিগের ডিঃ বোর্ড ব্যয় করেন, শতকরা মাত্র ১৯.৩ টাকা। অথচ এই শিক্ষার ব্যয়ের নিমিত্ত গোবুর পাবন্ধ [ পাউণ্ড ] হইতে আদায় করেন বৎসরে ৪১৬৫৮ টাকা। খোয়াড়ে গোরুর পাবন্ধ করিয়া অত টাকা আদায় করাতে যে অত্যন্ত অত্যচার হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা ময়মনসিংহে খোয়াড়ের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এমন ময়মনসিংহের শিক্ষিত বাবুদিগের মুখ বন্ধ না করিলে ময়মনসিংহকে ভীষণ অত্যাচারে, মহাপাপে ও গ্লানিতে নিতান্ত অধঃপাতে যাইতে হইবে।

অধঃপতনের কালে লোকের কেমন দুর্বুদ্ধি হয়, তাহা বর্ত্তমান কালে এদেশের সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইলেও ময়মনসিংহে বিশেষ ভাবে পাইতেছে। দুর্জ্ঞেয় ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা সামান্য বুদ্ধির কার্য্য না হইলেও অর্থের লাভালাভ, মনে অপমান, ও নিন্দা প্রশংসা বুঝা অনেকের পক্ষেই সহজ, কিন্তু ময়মনসিংহবাসী ধনিগণ তাহাতেও যে উদাসীনতা দ্বারা ভবিষ্যতের ভীষণ অনিষ্টের প্রশ্রয় দিতেছেন, ইহা অবশ্যম্ভাবী অধঃপতের এক অত্যাশর্য্য দৃষ্টান্ত। সর্পকে দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করত ক্রোড় দেশে রক্ষা করার ভীষণতা অনেকে উপলব্ধি করেন বটে, কিন্তু ময়মনসিংহবাসী তদপেক্ষাও ভীষণ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। যাহা কর্ত্তৃক ময়মনসিংহের ধন, মান, শান্তি সমস্ত নষ্ট হইতেছে, ময়মনসিংহবাসী তাহাকেই আদর করিয়া পালিতেছেন, অথচ প্রকৃত হিতৈষীকে উপেক্ষা অযত্নে দূরে তাড়াইতেছেন। হিতৈষীর প্রতিপালন বা বলবর্দ্ধন করিয়া বরং তাহার কিছু পাওয়া থাকিলে তাহাতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করিতেছেন। উপরে যে কয়টী চিত্র প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা ছাড়া আরও একটি চিত্র নিম্নে আঁকিয়া আমাদের এই উক্তির স্বার্থকতা প্রদর্শন করিব।

অন্যান্য জেলায় দওরায় বিচার জন্য একটি জজকেও অধিকাংশ সময় খাটিতে হয়না, কিন্তু ময়মনসিংহে এখন তিনটি সেশন জজের নিকটে অনবরত দওরায় বিচার হইতেছে। এই তিন জজের নিকটে কত সহস্র ব্যক্তির বিচার চলিতেছে, তাহা ঠিক করা উঠিন, তবে এই বলা যায় যে ২/৩ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ দওরায় বিচার হইত, এখন তাহার প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পাঠক কি স্বীকার করিবেন যে, শাস্তি পাওয়ার লোভে দুব্বৃত্তের সংখ্যা সত্য সত্যই পূর্ব্বাপেক্ষা ৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে? এ বৃদ্ধির কারণ এই যে, ময়মনসিংহের হিতৈষীদিগের আত্যন্তিক চেষ্টায় গবর্ণমেন্ট বিমুগ্ধ হইয়া বিশেষ পুলিস নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বতন পুলিসকেও আসামী ধৃত করিবার জন্য কড়া হুকুম দিয়াছেন। তাঁহারাই ঝাকে ঝাকে আসামী ধরিয়া দওরায় চালান দিতেছেন। পুলিস যাহাদিগকে চালান দেন, তাহারা সকলেই দোষী কি না, তাহা কোন পাঠককেই বুঝাইতে চাহি না, আর আদালতে যাহাদের শাস্তি হয়, তাহারাও যে সকলে দোষী, বোধ হয় একথাও গ্রামের অবস্থাভিজ্ঞ কোন পাঠক স্বীকার করিবেন না। গ্রামবাসী পাঠক জানেন, অনেক ঘটনার প্রকৃত অপরাধী নিজের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য নিজে আত্মীয় ও অর্থাদি বাধ্য লোকসহ সাক্ষী সাজিয়া প্রকৃত সাক্ষীকে আসামী করে আদালতে সাক্ষীকে আসালী করিয়া মোকদ্দমা চালান হয়, আর প্রকৃত আসামী নিজে ও বাধ্য লোক দ্বারা তৎ বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, জুরী ও জজগণ এই মিথ্যা সাক্ষ্যকেই প্রকৃতমনে করিয়া সেই নিরপরাধ ব্যক্তিকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। এইরূপ মোকদ্দমার বাহুল্য, কদাপি কি বিবেচনা সম্পন্ন লোকের প্রিয় হইতে পারে? শাস্ত্রের কথা বলিয়া কাজ নাই, নব্যসমাজের আদর্শ ইংরাজি আইনের মূলসূত্রেও এই কথা আছে যে "শত জন অপরাধী বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইলেও যেন একটিও নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি না হয়।" কিন্তু ময়মনসিংহে যেরূপ আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দারা শত শত নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি হইতেছে না, কে বলিবে?

যে কালে ঠগী বা গামছা‍মোড়াগণকে ধরিবার জন্য গবর্ণমেন্ট গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন লোকের যে কি ভয়ানক অশান্তি হইয়াছিল, শিশুকালের কথা হইলেও তাহা এপর্যন্ত আমাদের স্মরণ আছে। যাহাকে ধরিলে কিছু লাভের সম্ভাবনা তাহাকেই ঠগী কর্ম্মচারীগণ ধৃত করিত মোকদ্দমার বহুব্যয় জানিয়া যে অমনি যথাসর্ব্বস্ব সেই কর্ম্মচারিগণের হাতে সমর্পণ করিত, যাহারা তাহা করিত না, তাহারা অমনি ফৌজদারীতে চালান হইত। ময়মনসিংহে সেইরূপ আরম্ভ হইয়াছে কি না, তাহা প্রকাশ করিলেও যে ২১১ ধারার অপরাধ হয়। কেমন ভয়ানক অশান্তি ময়মনসিংহবাসীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিবে? যে স্থানে দুর্ব্বৃত্তগণকে গবর্ণমেন্ট সাধারণ বন্দোবস্ত শাসন করিতে পারেন না, সেখানেই বিশেষ পুলিস নিয়োগের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থানুসারে দুর্ব্বৃত্তের তালিকা পড়িয়া ময়মনসিংহবাসীর সম্মান খুব বাড়িয়াছে। কাহার জন্য ময়মনসিংহবাসীকে এই কলঙ্কের ডালি মাথায় করিতে হইল? কাহার জন্য ময়মনসিংহের ৩৫ লক্ষ লোক সর্ব্বদা পুলিসের ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে কাহার জন্য কত শত নিরপরাধ ব্যক্তি জেলে যাইয়া ঘানি ঘুরাইতেছে বা মেথর সাজিয়া বিষ্টার ডালি মাথায় বহিতেছে, কেহ কি তাহাকে চিনিলেন না? অবশ্য তাহার ক্ষমতা খুব ; একটা তুচ্ছীকৃত লোক ৩৫ লক্ষ লোকের দণ্ড মুণ্ডের মান অপমানের, লাভ লোকসানের কর্ত্তা হইয়াছে, ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে।

আরও একটা কথা এ স্থানেই নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে বলিতে বাধ্য হইলাম। ময়মনসিংহের কোন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে চাহিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, হয়ত তজ্জন্য তাঁহার মনে কোন কষ্ট বা বিরাগ নাই। কিন্তু ময়মনসিংহের পরম হিতৈষীটি পূর্ব্ব হইতে এমনই কথা চালাইতেছেন, যাহাতে শিক্ষিত নাম ধারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বড়লোকদিগকে যিনি কদাপি কোন বিষয়ে নির্ব্বাচন করিবেন, বা নির্ব্বাচনের সমর্থন করিবেন, তাঁহাকেই নিতান্ত ঘৃণার পাত্র হইতে হইবে। সুতরাং কস্মিনকালেও কোন বড়লোক কোন বিষয়ে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না, হইলে ও তাঁহাদের দুগ্ধ পোষিতকালসর্পের দংশন ভয়ে কেহই তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন বা সমর্থন করিতে পারিবেন না। যে সূত্র ধরা হইয়াছে, তাহা ব্যবস্থাপক সভার অপেক্ষা বরং ডিঃ বোর্ট, মিউনিসিপাল বোর্ড প্রভৃতিতে বেশি খাটে, শিক্ষিতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না হয়, এমন স্থান একটী ও নাই, অতএব তাঁহাদের অনুগৃহীত সর্পের দংশন ভয়ে বড়লোকদিগকে সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আর বলিতে চাই না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধঃপতনের সময়ে যেরূপ হইবার তাহা অবশ্যই হইবে।

২২ এপ্রিল, ১৯০০

# দ্বিতীয় পর্ব

# সাময়িক পত্র

## মিত্র প্রকাশ

**১/১২, চৈত্র, ১২৭৭**

রাম বসবাস নাটক, মানবচরিত্রের বৈচিত্র [ কবিতা ], গীতাবলী, প্রেরিত পত্রাবলী [ কবিতা ], ভাবুক-বিলাপ : যাদবানন্দ রায়, মৃতপতির নিমিত্ত স্ত্রীর বিলাপ, সমালোচনা [ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সম্বরণ-বিজয় কাব্য ; হরিশচন্দ্র কর্তৃক হিন্দিভাষায় অনূদিত বিদ্যাসুন্দর নাটক, নরনারায়ণ রায় প্রণীত শ্রীবৎস চরিত, ফকির চাঁদ বসুর শিবাজী অভিনয় ]।

### উপসংহার

বিগত বর্ষের বৈশাখ মাসে এই সাহিত্যক পত্রের প্রথম প্রচার করা হয়, অদ্য ইহার (১২ খণ্ড) প্রথম পর্ব্ব সম্পূর্ণ হইল। ইহার সম্পাদক যেরূপ রুগ্নাবস্থায় এই পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা স্থানীয় গ্রাহক এবং পাঠকগণের অবিদিত নাই। বিদেশীয় গ্রাহক পাঠকগণ সম্যক্ না হউন কতক জ্ঞাত আছেন রুগ্নাবস্থার প্রকৃত কবির কবিত্বও লুপ্ত হয়—ভাবুকের ভাবনা সার হয়—রসিকের রসিকতা শুষ্ক হইয়া যায়। এ অবস্থায় যাঁহাদের রচনা-শক্তি সামান্য, তাঁহাদের যে বুদ্ধিশুদ্ধি কি দশা প্রাপ্ত হয়, সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। এতৎ পত্রের ১ম সংখ্যা প্রচারের পর অবধি বিগত মাঘ মাস পর্য্যন্ত এ হতভাগ্যকে যে প্রকার বিরাগ ভোগ করিতে হইয়াছে—যত প্রকার উপসর্গের উৎপাত সহ্য করিতে হইয়াছে, তত্তাবৎ সবিস্তার বর্ণন করিলে একখানী বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। আহা! সেই অবস্থা—সেই নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! উদারয়ের মুহুর্মুহু রেচন—অর্শরোগের ভয়ানক রক্তস্রাব—সোঁতের প্রবল স্রোত—জ্বরের দুর্ন্নিবার কম্প—অঙ্গগ্রহের দুর্ব্বিসহ বেদনা, যখন যুগৎ আক্রমণ করিত, তখন বোধ হইত, যেন কৃতান্ত কিঙ্করেরা আমারে পাশবদ্ধ করিয়া শমনালয়ে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে! কখন২ এরূপ জ্ঞান হইত, যেন কৃতান্ত আগারে নীত হইয়াছি। যখন নিতান্ত কষ্টসৃষ্টে ঈষৎনেত্রোন্মীলন করিয়া দেখিতাম, বৈদ্যবর নাড়ী ধরিয়া হতাশ ভঙ্গি করতঃ দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছেন—প্রাণতুল্য স্নেহকারী অগ্রজ ব্যগ্র হইয়া সজলনেত্রে তাঁহার মত শুনিবার আশায়ে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, স্নেহময়ী পুত্র-প্রাণা অনাথিনী বৃদ্ধা জননী শূন্যমনে, শূন্যজীবনে, নিপতিত প্রায় অশ্রুনীর সংবরণ করিয়া লিখিতের ন্যায় স্থিরদৃষ্টে রহিয়াছেন, তখন মনের অবস্থা যে কেমন হইত, তাহা এক্ষণে বর্ণনা করিয়া ব্যক্ত করা অসাধ্য। যদি আমাদিগের পাঠক এবং গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ কখন ঈদৃশী অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তিনিই তাৎকালিক মনের অনুভব করিতে পারিবেন ; অন্যের তাহা ভাবনার বিষয় নহে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন শত্রুকেও এরূপ ভীষণ রোগসঙ্কটে নিক্ষেপ না করেন।" ফলতঃ মাদৃশ রুগ্নব্যক্তির

আরোগ্য লাভ একপ্রকার পুনঃ জন্ম মানিতে হইবে। যিনি সেই মুমূর্ষু দশা হইতে আরোগ্য দান করিয়াছেন, যিনি দেহের এবং আত্মার একমাত্র স্বাস্থ্যদায়ক, সেই করুণাময় পরমেশ্বরের পদতলে কোটী২ প্রণিপাত করি। ইহলোক সম্বন্ধে, যাঁহারা সেই দুরবস্থার সময় নিঃস্বার্থ দয়া বিতবণ করিয়াছেন—অর্থ সাহায্য করিয়াছেন—সান্ত্বনা করিয়াছেন—আরোগ্য চেষ্টার শুশ্রূষা করিয়াছেন—ঔষধ দিয়াছেন—পথ্য দিয়াছেন—তত্ত্ব লইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট শত২বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহাদিগের গুণে অবশিষ্ট জীবন বন্ধু রহিলাম। সম্পদে অনেকেই আত্মীয়তা দেখায়, কিন্তু বিপদে যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে-বন্ধ হন তাহারাই প্রকৃত বান্ধব। প্রাণ দিলেও তাহাদের সেই বন্ধুতার পুরস্কার হইতে পারে না।

গ্রাহক মহোদয়গণ! আপনাদিগের নিকটেও এতৎপত্রসম্পাদক বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। কারণ আপনারা পিতৃ-দুঃখে দুঃখিত- মিত্রপ্রকাশকে সেই দুঃখেই সময় স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন—পালন করিয়াছেন। এস্থলে আমার সাহায্যকারী লেখক ভ্রাতা যশোর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র, মাহীগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু যাদবানন্দ রায় এবং ঢাকা কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইতেছি। ইঁহারা আমার পীড়ার সময় লিপি সাহায্য করিয়া মিত্র-প্রকাশকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

উপসংহার সময়ে মঙ্গলালয় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, এতৎপর্ব্বে সম্পাদকের যে সকল দুর্ঘটনা ও ত্রুটি ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে তিনি যেন তাহা আর না ঘটান-বাঞ্ছিতা বিষয়গুলির সম্পাদনে যেন সমধিক বলবিধান করেন।

**২/১, বৈশাখ, ১২৭৮**

## ঈশ্বর প্রেমিকের প্রার্থনা

হে নাথ!—হে প্রিয়তম!—হে জীবিতেশ্বর!
তুমিই আমার—আমি চিরদাস তব।
তোমাতে অর্পিত প্রাণ, মন, কলেবর,
তোমারে সেবিব, বেঁচে যতদিন রব।

প্রেমময়-মুখ তব হেরি হে যখন,
তাপিত-পরাণ মোর হয় সুশীতল;
নেত্রযুগ আনন্দাশ্রু করে বরষণ,
নিভে যায় হৃদয়ের যত দুখানল।
তব সহবাসে মোর যে আনন্দ হয়,
কোটী ব্রহ্মানন্দ তার কণামাত্র গণি;
তেমন আনন্দ আর কিছুতেই নয়,
তুমি মম একমাত্র হৃদয়ের মণি।

জীবন মরণে তুমি কর্ত্তা হে আমার,
মরি আমি ক্ষণমাত্র তোমার বিরহে,
কেহই পারে না মোরে বাঁচাইতে আর,
তোমার মিলনে প্রাণ দেহবাসে রহে।
তুমি একমাত্র মোর হৃদয় বান্ধব ;
তুমি একমাত্র আধি-ব্যাধির ঔষধ ;
তুমি একমাত্র মম জীবন-বল্লভ ;
তুমি একমাত্র মম বিপদ্-সম্পদ।

তোমার বলেই আমি সদা বলীয়ান,
তোমার আশ্রয়ে আমি সদা সুশীতল ;
তুমিই আমার কর সুখ-সন্বিধান ;
তুমিই সকল—মোর তুমিই সকল।

তোমাকে ভাবিলে মোর আত্মা শান্তি পায়,
তোমাকে স্মরিলে মোর জন্মে মহাসুখ ;
তোমাকে দেখিলে সেই ক্ষণে দূরে যায়
জগতের—হৃদয়ের যত কিছু দুঃখ।

জীবন-জীবন তুমি, নয়ন-নয়ন ;
সুহৃদ-সুহৃদ তুমি আমার 'আমার'
তুমি একমাত্র মম হৃদয়ের ধন,
'আমার' বলিতে নাই আমার হে আর !

তোমা ত্যজে চাই না হে লভিতে মুকতি,
তোমার সহিত যদি চিরবদ্ধ হই,
সেই মুক্তি আমার—সেই সে পরাগতি ;
সালোপ্য, সাযুজ্য, তৃণ তুল্য তোমা বই !

তোমার লাগিয়ে পারি ত্যজিতে জীবন,
তোমার লাগিয়ে পারি খেতে হলাহল,
তোমা ত্যজে বাঁচিতে বাঞ্ছি না একক্ষণ,
তোমা ত্যজে চিরজীবী হওয়াও বিফল।
তুমি মম ঈশ্বর, তুমিই মম স্বামী,
তুমি মম হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা, ত্রাতা, পাতা,
চিরদিন প্রেমাধীন তোমার হে আমি,
তব কাছে তুচ্ছ গণি হর, হরি, ধাতা।

হে নাথ !—হে প্রেমময়—চিরপ্রেমাধীনে
তিলমাত্র যেও না করিয়ে পরিহার,
দীননাথ, বঞ্চনা কোরো না দীনহীন ·
দোহাই—দোহাই নাথ !—দোহাই তোমার !

একদা সহস্র বাজ হানো শিরে—সব ;
সব—কর একদা সহস্র শরে ভেদ ;
তিলমাত্র তাহাতে কুণ্ঠিত নাহি হব,
সহিতে নারিব তবু তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ।

দুঃখ নাই—ভাসাও হে দুস্তর পাথারে,
ক্ষোভ নাই—জ্বালাও জ্বালিয়ে হুতাশন,
খেদ নাই—ক্ষত কর দেহ অসীধারে,
তথাপি যেও না নাথ, ত্যজে এ ক্ষণ।

কিছুই জগতে মম নাই শান্তিকর ;
কিছুই জগতে নাই, চিত্ততাপ-হার,
"* * * " একমাত্র সুখের আকর
তুমি—তার এক মাত্র হৃদয়বিহারী।

মহিরাবণাবধ কাব্য, নির্ব্বাসিতা সীতা (দ্বিতীয় ভাগ),

## নাটক বা রূপক

### উপকণিকা

নাটক কাহাকে বলে? বাঙ্গলা নাটকের মূল কি? কিরূপ নাটক অধুনা বাঙ্গলায় প্রচলিত এবং কি উপায়ে তাহার সংস্কার অথবা উন্নতি হইবে? নাট্যাভিনয় দর্শনে বিরূপ আমোদ হয়? এই আমোদ সদোষ, না নির্দ্দোষ? নাটকের উন্নতির সঙ্গে আর কোন২ বিভাগের উন্নতি হয়? এই সমুদায় প্রশ্নের পূরণ করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে প্রশ্ন সংখ্যা অধিক বোধ হয় না ; কিন্তু একটুকু অনুধাবন করিলে, এই কয়েকটী প্রশ্নের মধ্যগত শত২ প্রশ্ন দৃষ্টিগোচর হইবে। বিষয়টী নিতান্ত বিস্তৃত, এবং দুরূহ অথচ প্রবন্ধলেখকের শক্তি ও সময় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অল্পায়তন ; অতএব পাঠকগণ যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রস্তাব পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন, তদনুরূপ পরিতৃপ্তির সহিত পাঠ সমাপ্তি করিতে পারিবেন না। তবে, নাটক সহৃদয়-কাব্যমোদিগণের আলোচ্য বিষয়, এইটী প্রদর্শন করাই আমাদিগের প্রধান অভিলাষ।

কোন কষ্টসাধ্য-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে কি কি বিঘ্ন সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে এবং কি কি বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, পথিকের যেমন একবার তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া

দেখা উচিত ; দুরূহ বিষয়ের সমালোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সমালোচকেরও সেইরূপ সম্ভাবিত অন্তরায় সমুদয় একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা বিধেয়। অতর্কিত ক্ষুদ্রবিঘ্ন অপ্রস্তুত বলবান ব্যক্তিকে যেরূপ অভিভূত করিতে পারে, সম্ভাবিত দুস্তর প্রতিরোধ বদ্ধপরিকর দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও তদ্রূপ পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হয় না। এই বিশ্বাস বশতঃই আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব পর্য্যালোচনার কয়েকটী বিঘ্নের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

১ম। যেমন তীব্র আলোক এবং ঘোরতর অন্ধকার উভয়ই পরিষ্কার 'দৃষ্টির প্রতিরোধক, সেইরূপ কোন২ অংশে অতিরিক্ত সাহায্য এবং কোন২ ভাগে একবারে সাহায্যের অসদ্ভাবও পর্য্যালোচকের বিশদরূপে কোন বিষয় বুঝিবার বিষম প্রতিবন্ধক। নাটকের আলোচনায় এই উভয়বিধ অসুবিধাই আসিয়া আক্রমণ করে। নাটক রচনা সম্পর্কিত নিয়মাদির অনুসন্ধান করিলে সংস্কৃত পুস্তকের অতিরিক্ত সাহায্য পাওয়া যায়। এমন কি নাটক রচনার এত সূত্র আছে যে একটী ইতিবৃত্ত অলবলম্ব করিয়া প্রত্যেক সূত্রের এক একটী উদাহরণ রচনা করিলে এখানি বৃহৎ নাটক হইয়া উঠে। এমন অনেক অনাবশ্যক সূত্র আছে, যাহাদের বিভেদ হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু যখন নাটকের ইতিহাস অর্থাৎ কোন্ সময়ে নাটক ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয়, কোন্২ সময়ে নাটকের কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কোন্ নাটককার কোন্ সময়ে ও কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেন ইত্যাদি একান্ত আবশ্যকীয় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হওয়া যায় ; তখন কোন পুস্তক হইতে কিছু মাত্র সাহায্য পাওয়া যায় না। যে সমুদয় সাহায্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তাহাও কার্য্যকালে অন্তঃসারশূন্য অলীক গল্প বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতেরা অন্যান্য বিষয়ের তন্ন২ বিচারে যেরূপ পটু এবং জটিল বিভেদ সমুদয় উদ্ভাবনে যেরূপ সহিষ্ণু, ইতিহাসে আবার সেইরূপ অজ্ঞ এবং অসহিষ্ণু। পৃথিবীতে এমন কোন সভ্যজাতি নাই, যাঁহারা হিন্দুদিগের কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র দর্শনে চমৎকৃত না হন, পরন্তু এরূপ কোন জাতিও নাই, যাঁহারা হিন্দুগণের বিশৃঙ্খল ও কল্পনা পরিপূরিত ইতিহাস দর্শনে উপহাস না করেন।

২য়। আত্মাদর—বাঙ্গালা নাটকের মূল নির্ণয় করিতে এক বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহার নাম আত্মাদর। আমরা যাহা কিছু করিয়াছি তাহা নিজ অধ্যবসায় এবং চেষ্টায় করিয়াছি, অন্যের মুখাপেক্ষী হই নাই, একটী বলিবার বাসনা সকলেরই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক বাসনা মনুষ্যের স্বাধীনতার জ্ঞান হইতেই জন্মে এবং এই স্বাধীনতা জ্ঞানজনিত আত্মোৎকর্ষ বোধের নামই আত্মাদর। আত্মাদর সকল সময়েই দূষিত ও অহিতকর নহে। কিন্তু ন্যায় এবং সত্যের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপথগামী এবং দুর্দ্দম্য হইলেই আত্মাদর হইতে ভূরি২ অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। আত্মাদর কেবল ব্যক্তি বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, ইহাই বিস্তৃত হইতে২ জাতি বিশেষে পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ স্বীয় কার্য্যকলাপ দর্শনে আপনার প্রতি যে আদর জন্মে, তাহাকে যেমন আত্মাদর বলে, সেইরূপ স্বীয়জাতির কার্য্যকলাপ দর্শনে স্বজাতীয়গণের প্রতি যে আদর জন্মে তাহাকেও আত্মাদর বলা যাইতে পারে। এই বিস্তৃত আত্মাদর অর্থাৎ জাত্যাদরও ন্যায় ও সত্যের শাসন উল্লঙ্ঘন করিলে দূষিত ও অহিতকর হইয়া উঠে। আমরা যাহার কতক অংশ মাত্র আত্মাবলম্বনের উপর নির্ভর রাখিয়া সম্পাদন করিয়াছি ; কিন্তু অবশিষ্ট অংশ সম্পাদনের জন্য অন্য কোন জাতির সাহায্য লইয়াছি, এরূপ কোন কার্য্য কেবল আমরাই করিয়াছি অন্য কাহারও সাহায্যে সম্পাদন করি নাই বলিলে আমাদের

অনুচিত জাত্যাদর প্রকাশ পায়। বাঙ্গলা নাটকে ইংরেজী নাটকের অনেক সাহায্য আছে ; কিন্তু জাত্যাদর প্রবল আমরা ইংরেজী নাটকের সাহায্য অস্বীকার করিয়া কেবল সংস্কৃত নাটকই বাঙ্গলা নাটকের মূল বলি সন্দেহ নাই। অনেক প্রবন্ধ লেখক বাঙ্গালা নাটক পর্য্যালোচনার সময় জাত্যদর কর্ত্তৃক বিপথে নীত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা জাত্যাদরকেও একটী অন্তরায় বলিতে সাহসী হইলাম। এই স্থানে আমরা আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। যাহা আমাদের মনোনীত বিষয়, তাহা আমরা একরূপ প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বথা সযত্ন হই, ও তদুপযোগী প্রমাণও দর্শাই। একটী গল্প আছে যে, একজন ধর্ম্মযাজক এবং একজন যুবতী চন্দ্র লোকে মনুষ্য আছে এই বিষয় প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কতক্ষণ পরে, প্রেম-চিন্তায় অহরহ চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, যুবতী ধর্ম্মযাজককে বলিলেন "মহাশয়! দেখুন, চন্দ্রলোকে একজন নায়ক এবং একজন নায়িকা কর্ণে২ কি প্রেম প্রসঙ্গ করিতেছি।" ধর্ম্মযাজক বলিলেন "তাহা নয়, উপসনামন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে।" অতএব আত্মাদর যাহা মনে উদিত করে, তাহার অনুসারি যুক্তির অন্বেষণ করা নিতান্ত অনুচিত। স্থিরচিন্তা এবং অনুসন্ধানের পর ন্যায়ানুগত পথ অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩য়। বিদেশী-পক্ষপাত—বাঙ্গলা নাটক কিরূপ হওয়া উচিত এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা নাটকের উন্নতি হইবে, এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তৃতীয় অন্তরায় আসিয়া গতি রোধ করে। এই বিঘ্নের নাম বিদেশী-পক্ষপাত। সত্য বটে, যে জাতির শিল্পকৌশল দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, যে জাতির সাহিত্যের এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি দেখিলে আমরা কিছুই করিতেছি না বলিয়া শতবার আপনাদিগকে ধিক্কায় দিতে হয়, যে জাতির শাসনগুণে আমরা সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিতেছি, যে জাতির ভাষায় বুৎপন্ন হইলে আমরা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস জন্মে এবং সমাজেও সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হই, সেই জাতির পক্ষপাত একপ্রকার নৈসর্গিক বলিতে হইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই বিষয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে, অনুকরণ কখনই সুখাবহ উন্নতির কারণ নয়। আদর্শ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাতে কোন না কোন দোষ অবশ্যই থাকিবে এবং দোষভাগ অনুকরণ করা যতদূর সহজ গুণভাগের অনুকরণ তত সহজ নয়। আজি কালি অনেক ইংরেজীপক্ষপাতীর এইরূপ মত যে বাঙ্গলা নাটক যত ইংরেজী নাটকের অনুকরণ করিতে পারিবে ততই উন্নত হইবে। ইংরেজী নাটক ভিত্তিমূল না করিলে বাঙ্গলা নাটকের উন্নত নাই। এই মত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের মত এই যে বাঙ্গলা নাটকের বাঙ্গালী মূল রাখিয়া ইংরেজী আলবালে সেই মূল বেষ্টন করিলে বাঙ্গলা নাটকের উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। নতুবা ইংরেজী ক্ষেত্রে বাঙ্গালী নাটকের বীজ বপন করিলে তাহা পুষ্পিত হওয়া দূরে থাকুক অঙ্কুরিতও হইবে না।

এই কয়েকটী অন্তরায় অতিক্রম করিবার চেষ্টা সকল নাটকসমালোচকেরই উচিত। যাহা হউক অন্তরায় সম্পর্কে এতাবন্মাত্র বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। এখন নাটক কাহাকে বলে তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

সপত্নী কহল নাটক, সঙ্গীত চতুষ্টয়, সমালোচনা।

২/২, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮

রামবনবাস নাটক, কৌরব দূত-কাব্য, প্রহ্লাদ-নাটক (চতুর্থ অঙ্ক), বিলাপতরঙ্গিণী

## রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

অনুমানিক প্রায় ত্রিংশ বৎসর গত হইল, কৃষ্ণ নগরে নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মৃত গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সময়ে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি নামক একজন বরেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি জেলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগয়ানের সান্নিধ্যে বাঁড়ি বাঁকা গ্রামে বাঙ্গলা ১১৯৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাদুরি মহাশয় কৃষ্ণনগরে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রেই তথায় বাস। তিনি অতিশয় সূচতুর, সুরসিক ও উপস্থিতবক্তা ছিলেন, এবং তজ্জন্যই মহারাজের নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত "রসসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কবিতা রচনা বিষয়ে ইঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। যে ব্যক্তি যে সময়ে যে কোন প্রস্তাব করিতেন, ইনি তৎক্ষণাৎ কবিতা দ্বারা সেই প্রস্তাব পূরণ করিয়া দিতেন। দ্রুত রচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার রচনায় ছন্দঃপতন ভিন্নঅন্য কোন দোষ লক্ষিত হয় না, বরং উত্তম শব্দ বিন্যাস সুললিত ছন্দ ও মধুর স্বাভাবিক শব্দনরোগ দৃষ্ট হয়। রসসাগর মহাশয়কে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি এত শীঘ্র তাহার উত্তর দিতেন যে, প্রশ্নকারীর প্রশ্ন সমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি উত্তর আরম্ভ করিতেন। তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পারস্য ও উর্দ্দুতে বুৎপত্তি ছিল, এবং হিন্দি ও সংস্কৃতিতে পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার এই রচনাশক্তিকে অসাধারণ শক্তি বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যদিও ইঁহার রচনায় ছন্দমিলের কিছু কিছু দোষ দেখা যায় বটে, তথাচ আশু বর্ণনা ব্যাপারে অশেষ প্রকার প্রশংসা করিতে হইবে ; কারণ, এই শক্তি ঈশ্বরদত্ত, ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে ইহা কখনই লব্ধ হইতে পারে না। অপ্রত্যুত্তর প্রদান সময়ে প্রশ্নকারীরা যে পরিমাণে আনন্দানুভব করিয়াছিলেন,এক্ষণে তাহার কবিতা পাঠ করিয়া তদ্রূপ সুখানুভব হয় না বটে ; কিন্তু কাব্যানুরাগী সুরসিক পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যে অতিশয় তুষ্ট হইবেন, এবং এক বাক্যে কবির যশঃকীর্ত্তন করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পাঠকগণ অবশ্যই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যাক্তি প্রশ্ন করিবা মাত্রেই কাগজ কলম অবলম্বন না করিয়া বিনা চিন্তায় তখনই তাহা পূরণ করিতে পারিতেন, তিনি সামান্য-ব্যক্তি নন। এই মহৎ ব্যক্তি যদি কোন সভ্য-জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম, ধাম, বংশাবলি এবং জীবনচরিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তিনি ইংলন্ড নিবাসী বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা থিয়োডোর হুকের সহিত সংর্ব্বাংশে তুল্য হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎকালে আমাদের দেশে বিদ্যার তদ্রূপ গৌরব কিংবা কোন মহৎ লোকের জীবনচরিতাদ্দি লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না বলিয়াই এক্ষণে বহুযত্নেও তাঁহার বংশাদির বিবরণ এবং তিনি কোন্ স্থানে শিক্ষিত হন, ইহার কিছুমাত্র ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়না। ইনি বাঙ্গলা ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়ক্রমে বিগতজীবন হয়েন। তিনি যে সমুদয় কবিতা রচনা করিতেন, তাহা প্রণালী মত লিখিয়া রাখিতেন না। এজন্য কৃষ্ণনগর নিবাসী লোকদিগের যাহা অভ্যস্ত ছিল, তাহাই

নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইল। তাঁহার উপস্থিত পূরণের কয়েকটী কবিতা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

একদা শ্রীবন নামক কোন অট্টালিকার উপরে মহারাজ বাহাদুর চন্দ্রগ্রহণ দেখিবার মানসে রসসাগর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া উঠিয়াছিলেন। সে দিবস চন্দ্রের সর্ব্বগ্রাস হয় নাই, তাহা দেখিয়া মহারাজ রস–সাগরকে "খেতে খেতে খেলে না" এই প্রশ্ন করায় রসসাগর তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন ;—

খেদে কহে বিরহিনী ; মণিহারা যেন ফণী,
অভাগীর পক্ষে হিত কেহ ত করিলে না !
অবলার ভাগ্যফলে, পশুপতির কোপানলে,
মদনের এককালে, দহিয়ে দহিলে না !
সেতু বন্ধে নানাগিরি, উপাড়িয়া বাঁধে বারি,
হনুমান বলবান মলয়া ভাঙ্গিলে না।.
হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে, পূর্ণশশী মুখে পেয়ে
গ্রহণেতে গ্রাসিয়ে, "খেতে খেতে খেতে না !"

কোন সময় রসসাগর মহাশয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ডাক হরকরা ঘাটে আসিয়া মুকন্দ নামক ঘাটের মাজিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকায় উক্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন হঠাৎ রসসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "মুকুন্দ মুরারে !" রসসাগর তাঁহার প্রশ্ন শ্রবণান্তর তদ্দণ্ডে নিম্নলিখিত উত্তর করিয়াছিলেন ;—

পাপের পুলিন্দা বয়ে ভগ্ন হোলো পা রে !
নিয়মিত ঘন্টা মধ্যে যেতে হবে পারে।
লায়েতে নাহিক মাঝি ডাক রসনারে,
"গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে !"

কোন সময়ে রসসাগর মহাশয় বারাণসী তীর্থ দর্শনে গমন করেন। মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের খুড়া দিগ্বিজয় চন্দ্র রায় মহাশয় তৎকালে কাশী বাস করিতেন। রসসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে "ছিছি অমৃত পান করেছিলাম কেনে" এই প্রশ্ন করেন, তাহাতে তিনি অবিলম্বে নিম্নলিখিত উত্তর দেন।

জলে কিম্বা স্থলে মৃত্যু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কাণে,
মোলে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে,
দেবগণের আর্ত্তনাদ আত্ম অভিমানে ;
অবিমুক্ত বারাণসী মহিমা কে জানে ?
অমর মরিতে চাহে আসি কাশীস্থানে,
মোলে হতাম দেবের দেব আনন্দ কাননে।
অমৃত পান করেছিলাম কেনে !"

মহারাজ সতীশচন্দ্র রায়বাহাদুর ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার পিতামহ গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর পৌত্রের জন্ম সংবাদে পরমানন্দিত হইয়া রসসাগরকে "মহিদুর কর হাম নৃত্যু করি" এই প্রশ্ন করায় ; তিনি নিম্নলিখিত উত্তর দেন।

রাজধানী নৃপ--নন্দন-নন্দন
চন্দ্রবংশ অবতার হারি,
চৌদ্দ ভুবন জন নাচত গাওত
চৌখট যোগিনী তাল ধরি,
অপ্সর কিন্নর দশদিগধীশ্বর
তর তর শ্রীল গিরিশপুরী,
এতনক বলে মহী রাজ কহে
"মহি দূর কর হায় নৃত্য করি।"

এডুকেশন।

"একদা রাজা গিরিশচন্দ্র অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীর সহিত বিবাদের পর বহির্গত হইয়া সম্মুখে রসসাগরকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন "বল, বল, বল !" এই কয়টী শব্দ রাণী তিরস্কারের পর বলিয়াছিলেন। রসসাগর সবিশেষ কিছুই না জানিয়া তৎক্ষণাৎ কবিতা পূরণ করিলেন। দুঃখের বিষয় আমরা উক্ত কবিতার প্রথম দুই চরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না ; শেষ চরণ দুইটী এই ;—

"—পতি বাক্যে সতী চক্ষে জল ছল ছল।
বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল।।"

শ্রবণমাত্রে মহারাজ প্রীত হইয়া রসসাগরকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। একদা রাজা প্রশ্ন করিলেন, "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।" রসসাগর তৎক্ষণাৎ উক্ত কবিতা পূরণ করিলেন ;—

"মহারাজ রাজধানী নগর বাহির।
বারইয়ারি মা ফেটে হলেন চৌচীর।।
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।।"

বাস্তবিক সে সময়ে ঐ প্রকার কোন ঘটনা হইয়াছিল, রাজা তাহাই মনে করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এক সময়ে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমদিনী দিনে।" রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

"জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পলো মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে।।
আকাশেতে কাল নিশি উভয়ে না জানে।
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমনুদিনী দিনে।।"

কোন সময়ে শান্তিপুরে একজন হঠাৎ বড় মানুষ হইয়া উঠেন। তিনি একদা তুলা দান উপলক্ষ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত করেন। রসসাগরও সভাস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আকার দেখিলে, তাঁহাকে সুপণ্ডিত ও সুরসিক বলিয়া বোধ হইত না। তুলাকারী

ব্যক্তি তাঁহাকে অতি অল্প বিদায় দেন অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার অল্প বিদায় দেখিয়া বলিল, "ইনি রসসাগর" ইনিই রসসাগর সাবা (ই) স্।" অমনি রসসাগর আরম্ভ করিলেন ;-

"ধন্যরে বিধাতা তোরে, যারে যখন মাপা(ই)স্
রাজ্য ভেঙ্গে হাতীর বোঝা, গাধার পিঠে চাপা(ই)স্
তুলা করিতে মূলা দান, বেরিয়ে পলো কাপা(ই)স্।
ডল্‌তে ডল্‌তে মাকাটি বেকল, সাবা (ই) স্ সাব'(ই)স্"

কবিচরিত।

এডুকেশনের একজন পত্রপ্রেরক বর্ত্তমান সময়ের কয় জন দ্রুত রচকের বিষয়ে এই রূপ লিখেন ঃ—

রসসাগরের ন্যায় মাদরালী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মোহন কবিভূষণ ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং রাহুতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল, কাব্যরত্নাকর মহাশয়, ইঁহারাও বিখ্যাত উপস্থিত কবি। ইঁহাদিগকে যখন যে প্রশ্ন করা যায়, ইঁহারাও তদ্দণ্ডে তাহা সুন্দর রূপে পূরণ করিয়া দেন। আমার ইচ্ছা ছিল, ইঁহা সকলেরই কবিতা পূরণ আপনার ও মহাশয়ের পাঠববর্গের গোচরার্থে লিখিব ; কিন্তু সম্প্রতি আমার সে আশা পরিপূর্ণ হইল না। শ্রীযুক্ত রত্নলাল কাব্যরত্নাকর মহাশয়ের কবিতা পূরণ, যাহা আমরা একসময়ে লিখিয়া লইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই প্রেরণ করিলাম। সময়ান্তরে অন্য দুই মহোদয়েরও কবিতা পূরণ লিখিয়া আপনার নিকট পাঠাইব।

প্রশ্ন— 'কাকের সমান তথা কোকিলের ধ্বনি"

উঃ— বসন্ত সময়ে কোন বিরহিণী বালা।
সখীদের প্রতি কহে বিরহের জ্বালা॥
এঘোর বসন্তে সই যথা মম পতি।
সেথা বুঝি নাহি আছে মলয়ার গতি॥
ভ্রমর সেখানে নাই, নাই পিকবর।
যদি অলি থাকে তার নাই গুঞ্জস্বর॥
পিক যদি থাকে তব হেন অনুমান।
"কাকের সমান তথা কোকিলের ধ্বনি'॥[১]

প্রশ্ন— "ঈশ্বরকে অনেক যত্নে খুজে পান না।"

উঃ— নানা বিদ্যা গুণধাম, বিদিত ঈশ্বর নাম।
শাস্ত্র সুধা ভিন্ন তিনি অন্য কিছু খান না।
বদনে চর্ব্বিত বাণী, কর্ণ সম মহাদানী,
পর উপকার ভিন্ন অন্য কিছু চান না॥
বিধবা বিয়ের কার্য্য, বঙ্গেতে করিয়া ধার্য্য
কহিলেন সে কাজেতে, ধর্ম্ম ছেড়ে যান না।
সে বিয়া দিবার তরে, ফিরি প্রতি ঘরে ঘরে,
"ঈশ্বর অনেক যত্নে কন্যা খুঁজে পান না"॥[২]

প্রশ্ন— "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"
উঃ— বহু সন্ন্যাসীতে হয় বিনষ্ট গাজন।
বহু পরিবারে হয় দ্বন্দ্ব অনুক্ষণ॥
বহুলোক বাস যথা করে বহু দিন।
বহু মৃত্যু করে সদা লোক সংখ্যা হীন॥
বিনষ্ট বিনোদ বপু বহু যায় বিয়া।
"বিজ্ঞের বচন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"॥

প্রশ্ন— "সিংহের উপরে হাতী যাইছে কেমনে।"
উঃ— শরতে অম্বিকা সঙ্গে লয়ে গজানন।
সিংহ আরোহণে যান জনকভবন॥
পথ মধ্যে শিশুগণ খেলে কুতুহলে।
সিংহোপরি করি মুখে হেরিল সকলে॥
অল্পবুদ্ধি শিশুগণ ভাবে মনে মনে।
সিংহের উপরে হাতী যাইছে কেমনে॥"

শ্রীকাং চং দে :

## সারদার নীতি-শিক্ষা।

নববিবাহিতা কন্যা হৃদয়ের ধন,
সারদা, চলেছে নিজ শ্বশুর ভবন,
জননী তাহার. স্নেহ বিগলিত চিত,
কহে উপদেশ কিছু সময় উচিত।
"শ্বশুর আলয়ে বাছা, করিতেছ গতি,
সাবধানে শুন বালে ! আমার ভারতী।
মাতার মতন ভাবি শ্বাশুড়ী তোমার,
সেবন করিও সদা চরণ তাঁহার।
তদীয় আদেশ তুমি অনুগত-মনে,
পালন করিবে সদা পরমযতনে।
দেশাচার রীতি বড় উপযোগী নয়,
অসরল হোতে পারে তাঁহার হৃদয় !
অনর্থক রাগে করি স্নেহ পরিহার,
পারেন করিতে কটু বচন-প্রহার,
জানি তাহা সুধু তব মঙ্গলের তরে,
সহিও সতত বাছা ! সুধীর অন্তরে।
অনেক অবলা-মনে বিদ্যা-ধন নাই,
রিপুর নিবাস মাত্র দেখিবারে পাই।
তাদের অধীনে করা সময় যাপন,

খেদের বিষয় বটে খেদের কারণ।
কি করিবে বিধাতার বিচার-বেদন,
দূরিতে ঔষধ তার না করি লোকন।
বিনয় করিয়া তাঁর ফিরাইবে চিত
নত-মনে ; এই বালে ! বধূ-জন-রীত।
শ্বশুর, ভাসুরে হেরি পিতার মতন,
আদরে করিবে সদা তাঁদের যতন।
দেবর দেবজ্ঞ তুল্য সদা ভাবি মনে,
দেখিবে তাহার মুখ স্নেহের নয়নে।
না বুঝিতে পারি তাঁরা তোমার মদন,
জ্বালালে জ্বালাতে পারে কোপ-হুতাশন।
বিনয় বচন-বারি করি বরিষণ,
নিবেন্ তোমার হয় উচিত তখন।
অহো ! সেই ধীরতার যত গুণ আছে,
কহিতাম, কি করিব ?—কাল যায় পাছে !
তব গমনের বাছা,—বিলম্ব না সয়,
তবু গুটী দুই কথা বলি যাহা হয়।
ধীরতার পিঠে যদি বুদ্ধি পায় ঠাঁই,
জগত জিনিতে পারে—অনুমানে পাই।
কোপের কাদায় মাখি যদি কোন জন,
সম্মুখ হইয়া কহে কঠিন বচন।
ধুইয়া ধীরতা-জলে কলেবর তার,
করিবে আলাপ—ধরি নম্র ব্যবহার।
দেখ বালে ! সকলের এই মনে কয়,
বাসনার কাজ বন অবিলম্বে হয়।
সংসার কাঁটারে নব কত কাঁটা আছে,
কখন বা খোঁচা লেগে প্রাণ যায় পাছে।
তবু কি করিবে, বাছা, কারণের বশে,
বিলম্ব-কঠোর-কীট কাজে যদি পশে।
ধীরতা ধরিয়া তাহা সহে যেই জন,
সেই করে সে কাজের ফল দরশন।
দেখ বালে ! আছে তব দাস দাসীচর,
কোন কাজে যদি কভু আদেশিতে হয়।
তাই তারা ত্বরা যদি সমাপিতে নারে,
হানিবেকি তাহাদের বচন-প্রহারে ?
অনুচিত এ আচার শুন রে বাছানি !
বিচার করিবে করি কাজের 'বাছনি'।

আর দেখ তাহাদেরে মতি গতি নাই,
যদি থাকে অল্প আছে যেইরূপ চাই।
তাতেই তাদের দোষ হয় বহুতর,
কটু-বাণে দিবা রাতি বিঁধে কলেবর।
যদিও দেখেছি অল্প অদৃষ্টের ফলে,
জনমি ভারতে বধূ মগ্ন-দুখ-জলে।
তথাপি শুনেছি বহু কহিবারে পারি,
তব সঙ্গে বেশী কাল আলাপিতে নারি।
দেখ বালে, ভয় মন এই মনে হয়,
অকথ্য সে কথা তবু না কহিলে নয়।
মনোযোগ দেহ বাছা, মাতার-বচনে,
নিপতিত ঠাকুরাণী জরতার বনে।
ক্ষণ রাগ আদি কত পশু দুরাচার,
গরজি যেদনা তাঁরে দেয় বারবার।
তাই তিনি সদা মন সেবকের প্রতি,
কোপিত হয়েন যদি দেখেন কুগতি !

(ক্রমশঃ প্রকাশ।) অনুগত।
মাহিগঞ্জ। শ্রী—
সন ১২৭৮। ১৫ই শ্রাবণ।

২/৩, আষাঢ়, ১২৭৮

বঙ্গেশ রহস্য (ঐতিহাসিক উপন্যাস), বিলাপ-তরঙ্গ, পঞ্চমভক্ত-ঈশা, মানব-চরিত্রের বৈচিত্র (কাব্য)। মুক্ত কণ্ঠ—যুবা,

**বঙ্গ ললনা।**

"আহা একি অত্যাচার বঙ্গ বালা প্রতি।
সময় যাপিছে বৃথা কি হইবে গতি॥
কারাবাসে ক্ষীণকায় মলিনবদনা।
প্রকাশিতে মনোভাব না সরে রসনা॥
পুস্তক সহিত কভু নাহি পরিচয়।
গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত সবে সকল সময়॥
সুখভোগে মন নাহি থাকিবারে পারে।
চিন্তাযুত মনপাখী পিঞ্জর মাঝারে॥
যে ধর্ম্ম সামান্যলোকে বলিবে উত্তম।
মনোমাঝে বোধ সদা তাহা অনুপম॥
যে ধর্ম্ম বরিবে নীচজনে ভাল জানি

অনুসরে অনুক্ষণ তাই ভাল মানি॥
ভূষণ ভূষণ মাত্র অঙ্গ শোভা আশ।
অলঙ্কারে লাভ সর্ব্বনাশ॥
পতিকে সামান্য জনগণ সম জ্ঞান।
কটুবাক্যে সদা ভিন্ন করে দেহ প্রাণ॥
আবার আশ্চর্য্য আর লজ্জা হয় রোধ।
জলাঞ্জলি দিয়া তাহে না মানে প্রবোধ॥
চিকণ বসনে মন সততই ধায়।
অভাগা ভর্ত্তার দুঃখ পায় পায় পায়।
ধন না থাকিলে মন বুঝা বড় দায়
সূক্ষ্মবস্ত্র অলঙ্কার পাইব কোথায়?
আত্মদুখে বুক ফাটে উপায় বিহীন।
প্রণয়িনী অত্যাচার ভাবি চিন্তা লীন॥
কখন স্ত্রীজাতি প্রতি ঘৃণার উদয়।
প্রকাশিতে ভয় শুনে মন্দ পাছে কয়॥
ধিক যত বঙ্গ সিমন্তিনী ধিক্ ধিক্।
আকৃতি মধুর কিন্তু রাক্ষসী অধিক॥
বিবাহ দুঃখের মূল সুখলেশ নাই।
রমণী বিহীন সঙ্গ কোন স্থানে পাই।
বিবাহ অমৃত বৃক্ষে বিষফল ফলে।
না বুঝি আরোহে এতে অজ্ঞান সকলে॥
শান্তিদেবী পলাইয়া অন্য স্থানে যান।
বিবাদিনী সমাসীনা সহ অপমান॥
শক্তি নাই অর্থ নাই কুসংস্কারে রত।
ভাবি মন ভীত হয় নিরয় নিয়ত॥
যাহার জন্যেতে মোর এত কষ্ট ভোগ
মূহুর্তে মূহুর্ত্তে তাহে তার অনুযোগ॥
কেন বৃথা দোষে দিয়া নিন্দিনু রমণী
কেন নীচাশয়া মল বঙ্গ সিমন্তিনী?
স্বামীর সকল দোষ নিশ্চয় নিশ্চয়
নতুবা স্বামিনী কভু এরূপ কি হয়?
শিক্ষাদান সর্ব্বদা পতির প্রতি ভার।
ধর্ম্ম উপদেশ সঙ্গে প্রদান তাহার।
নীতিশিক্ষা জ্ঞানোন্নতি তাহারি তো কাজ
হায় কি হইবে!—বঙ্গ কদর্য্যসমাজ।
বাল্যকালে পিতা মাতা ভ্রাতা দয়াবান
শিক্ষা দিলে সমুন্নতা পুরুষ সমান।

যেমন কাঞ্চন যদি মলিন আগুণে
বিশুদ্ধ, সেরূপ পত্নী নিজ পতি গুণে ।
বিদ্যাঙ্কুর উৎপাদিত মনের ভিতরে
ভর্ত্তা-উপদেশ তাহা সম্বর্দ্ধিত করে।।
উর্ব্বরতা গুণে শীঘ্র মনোহর ফল।
লাভ করিবার আশা মানব সকল।
আপন কর্ত্তব্য তথা বুঝিতে পারিয়া
ঈশ্বর উদ্দেশ্য সাধে ঈশ্বর স্মরিয়া।
পতিই সর্ব্বস্ব তথা পতিই রতন
জগতে না রহে কেহ তাহার মতন।
স্বভাব ভকতি মনে হইবে প্রকাশ
মেঘাবৃত রজনীতে চাঁদের প্রকাশ ।
অসম্পন্নআত্মদশা বুঝিবারে পারি।
সর্ব্বদা সম্পন্ন চিত্ত পতিপদ স্মরি।
জ্ঞান মধু সদা পান জ্ঞান বিতরণ
সদয়া দয়ার সহ কমলা মতন।
তনয় তনয়াগণে শিক্ষা দানে রত
সর্ব্বদা সম্পন্ন সরস্বতী বেদী মত।
সহজে উন্নীত পথ হয় পরিষ্কার
ভূলোক দ্যুলোকে হয় দেবত্ব প্রচার।
ধরম মাধুর্য্য তদা বুঝিবারে পারে,
যাইতে সহজে ভবসিন্ধু-পরপারে।
ঈশ্বরেতে মন হয় সেবে ঈশ পদ
ঈশ ভিন্ন তুচ্ছ হয় সকল সম্পদ।
গৃহেতে বিবাদানল প্রবল না রয়
কদাচার লয় হয় রয় রয় রয়।
শান্তিদেবী বিরাজের গৃহ কাজ সারে।
সুনিয়মে সিমন্তিনী গৃহ কাজ সারে।
পরদুখ বিমোচনে নিয়োজিত কর
অজ্ঞানতিমির যথা নাশে দিবাকর।
পর দোষ নাহি দেখে আপন নয়নে
আত্মগুণ আনে নাকো ভ্রমেও আননে।
সামান্য সুখেতে মন নাহি থাকে রত
না হয় সুকাজে বালা কদাপি বিরত।
উন্নতি বাসনা মনে নিয়ত উদয়
মহেশ মহিমা ঘোষে সকল সময়।
কলিতে সীতার ভাব বুঝিবারে পারে

সতীত্ব মহিমা ব্যাপ্ত সকল সংসারে।
হায় রে এমন দিন হবে কোন্ দিন
সুখভোগে পাবে তৃপ্তি বঙ্গবাসী দীন।
পরমেশ ! একবার করি দয়া দান
বঙ্গের দুঃখের নিশি কর অবশান।
অহে বঙ্গবাসীগণ কেন অচেতন !
কেন বসি আছ সুধু মুদিয়া নয়ন।
কেন সদা কুকাজেতে চিন্তাপর মন,
কেন না উন্নতিচিন্তা কর অনুক্ষণ।
কেন বা গৃহেতে বাঁধি রাখিছ্ ললনা ?
এত দুর্ব্যভার কেন কারণ বল না ?
অশিক্ষিতা কেন সবে জ্ঞানবিবর্জিতা,
ধর্ম্ম সহ নহে কেন তারা পরিচিতা ?
কেন অল্পকালে বিয়ে দিয়ে দেও দুখ ?
কিমুখে বিধবা হলে দেখাও হে মুখ ?
কিরূপে বাঁধিয়া রাখ একাদশী দিনে,
মায়াহীন বধকর অন্নজল বিনে।
ভ্রূণহত্যা পাপসহ কেমন করিয়া ?
নিতান্ত পাষাণ দিয়া বেঁধেছ কি হিয়া ?
তনয়া. ভগিনীগণে হেন দশা করি,
অনায়াসে কেমনে রয়েছে ধৈর্য্য ধরি।
তোমাদের দোষে দেশ হল ছার খার,
কলঙ্ক রটিল বঙ্গললনার।
কবে হবে জ্ঞানবান, করিবে উন্নতি,
উন্নতি বিহীন ! সদা দেখি অধোগতি।
হে বাঙ্গালীগণ ভাঙ্গ মোহ ঘুম সবে,
এরূপ স্বভাব দেখি বিদেশী কি করে ?
আপন উন্নতি ভুলি থাক—চমৎকার !
শুনি বৃদ্ধে শ্রেষ্ঠ সবে, এ কি ব্যবহার !
স্বার্থপর নির্দ্দয় হইয়া সবে রই,
কহিতে সকলে পারি নিজে করি কই।
কবে বা অমৃত সম সুখ কবি পান,
কবে বা হইবে সবে দেবের সমান।
আমাদের আশা কবে হইবে পূরণ ,
কবে পাব হেন সুখ যেরূপ মনন ?
ভবিষ্যৎ গর্ভে তাহা অজ্ঞাত রয়েছে,
কেহ বলে এত দিনে অঙ্কুর হয়েছে।
কেহ বলে হস্ত পদ হইল গঠন,

কেহ বলে আয়তন হল সম্পূরণ।
কেহ বলে অল্প দিনে ভুমিষ্ঠ হইবে,
সেই সুখ যাহা সবে অতুল কহিবে।
আশা পথে চাহি আছি, সকল সময়,
পূর্ণ কর মনোরথ অহে দয়াময়।

প্রেরিত পদ্য, নূতন পুস্তক প্রাপ্তি

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে পুটিয়াবাসিনী, ধর্ম্মশীলা দয়াশীলা শ্রীযুক্ত রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়া আমাদিগের প্রচর্য্যমাণ রামায়ণ-মহাকাব্যের সাহায্যার্থ ২৫, পঞ্চবিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়া যৎপরোনাস্তি উপকৃত ও উৎসাহিত কবিয়াছেন। রাজ্ঞী মহানুভবার সৎকার্য্যে সাহায্যদান বঙ্গবিখ্যাত।

### মিত্র-প্রকাশের আকার পরিবর্ত্তন

এক্ষণ অবধি আমরা মিত্র-প্রকাশের ৪ ফর্ম্মা আকারে মাসে দুইবার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইলাম। ইহাতে প্রত্যেক সংখ্যায় স্থানের অল্পতা হইল বটে, বাস্তব গ্রাহকগণের কোন ক্ষতি হইতেছে না, বরং বহুপৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কণ-বিলম্ব বশতঃ মিত্র-প্রকাশ প্রচারের যে কাল গৌণ হইত, এতন্নিয়মে তাহার অপহার অবশ্য হইতে পারিবে। মূল্যাদির নিয়ম পূর্ব্ববৎ ; রহিল কেবল প্রত্যেক খণ্ডে মূল্য এক্ষণ হইতে।° চারি আনা হইল। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ৫, টাকা দিবেন, তাঁহারা ১২ খণ্ডের পরিবর্ত্তে নুতন আকারের ২৪ খণ্ড পাইবেন।

**২/৪, ১৫ জানুয়ারি ১৮৭২**

বঙ্গেশ রহস্য [ তৃতীয় অধ্যায় ], প্রণয়-পত্রাবলী [ কাব্য ], পেটুক পঞ্চানন [ ঐ ], প্রেরিত পদ্যমালা : যাদবানন্দ রায়, বংশজ বিলাপ [ কবিতা ], কৌতুক কণা, সমালোচন [ সামসূচি :]

**২/৫, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৭২**

হতভাগ্য শিক্ষক [ নাটক ] ; কোন হিতৈষিণী বঙ্গ কামিনী

### পুস্তক সমালোচনা

**রোগাতুরা বসন্তকুমারী**। রায়েরকাঠীর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু নরনারায়ণ রায় মহাশয়েরা সমধর্ম্মিণী শ্রীমতী বসন্তকুমারী পীড়িতাবস্থায় যে কয়টী কবিতা রচনা করেন, উক্ত নামে ঐ গুলি পুস্তকাকারে প্রচার করা হইয়াছে। ইনি বঙ্গীয় সমাজের অপরিচিতা নহেন। আমরা ইঁহার রচনা শক্তির সবিশেষ অবগত আছি। ইনি ইত্যগ্রে যে কবিতা মঞ্জরীর নামে এক পুস্তক প্রচার করেন, পাঠক বর্গের অনেকেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। ফলতঃ ইনি বঙ্গীয় ভদ্রাঙ্গনাকুলের একটী গনণীয়া কবিতা রচয়িত্রী। উপস্থিত পুস্তক পাঠে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, সুরচয়িত্রীর রোগ মুক্তিই এই আহ্লাদের প্রধানকারণ। আমরা কায়মন চিত্তে ঈশ্বরের

নিকট প্রার্থনা করি, ইনি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া নব২ রচনা মালায় প্রিয়পতির প্রমোদিবর্দ্ধনের সহিত বঙ্গীয় পাঠকগণের প্রমোদ বর্দ্ধন করিতে থাকুন। উপস্থিত পুস্তক হইতে নিম্নে একটী কবিতা তুলিয়া দেওয়া গেল, আমাদিগের পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা এই বিদূষীর রচনা পাঠ করেন নাই, তাঁহারা তৎপাঠে রচনাশক্তির পরিমাণ করিতে পারিবেন।

শুন হে স্বদেশবাসী স্বজন সকলে।
বসন্তকুমারি আজি অতি দুঃখে বলে॥
কলিকাতা চলিলাম রোগের জ্বালায়।
প্রসন্নমনেতে সবে করছে বিদায়॥
বাঁচিলে আসিব দেশে হরষিত মনে।
নতুন যাইতে হবে শমন ভবনে॥
বেঁচে যদি দেশে আসি দেখিব সবায়।
নহিলে জন্মের মত হইনু বিদায়!
শুন হে আমার সব অধীন সুজন।
পুত্রভাবে তোমাদিগে করেছি পালন॥
তোমরাও মাতৃভাব ভাবিয়ে আমায়।
কত যে করোছ সেবা বলিব কাহায়॥
বাঁচিলে কতই কব ফিরি স্বভবন।
নৈলে এই শেষ কথা কর হে পালন॥
আমা বিনে প্রাণেশের নাহি যায় প্রাণ।
যতনে সকলে হেন করিও বিধান॥
ঠাকুর কন্যার কথা যদি পড়ে মনে।
আশৈশব বাঁচিয়াছি যাঁহার যতনে॥
কত দুঃ খ হয় তাঁরে ভাবিয়ে এখন।
বলিব কাহারে হায়! ঝরিছে নয়ন ॥
পূজার প্রভাত হায় ! কুপ্রভাত হল।
নতুবা এমন কেন ঘটিব তা বল॥
দশহরা প্রাণহরা হইয়ে আমার।
বুঝি এসেছিল হায়! ধরায় এবার॥
সেই যে বিজয়া দিনে শুনেছি শয্যায়।
পদ বাড়াইতে আর পারিনি ধরায়॥
দেড় মাস হল গত ঔষধ সেবনে।
তবু না ছাড়িল রোগ এখনো এ জনে ॥
কত না করিল হায়! চিকিৎসকগণ।
কখন কাহার লাগি করে নি এমন॥
তথাচ হল না ফল কিছুই এখন।
নিশ্চয় এবার বুঝি যাইবে জীবন॥
কিভাবে যে দিবা নিশি করি আমি ক্ষয়।

যাই যাই করে প্রাণ অস্থির হৃদয়॥
যখন চাহিয়া দেখি প্রাণেশের মুখ।
ভাবিয়ে বিরহ ভাবী ফেটে বুক॥
ছেলে দুটী কন্যাটীতে 'মা' বলে যখন।
নিকটে আসিরে করে অশ্রু বরিষণ॥
সেকালে আমার মন করে যে কেমন।
জানে মাত্র সেই জন যে দিল জীবন॥
বৃদ্ধাকালে মাতা পিতা আমার মরণে।
থাকিতে না পারিবেন এভবভবনে॥
যখন দেখিতে আসে আশ্রিতসকলে।
কত দুঃখ ভেবে ভাসি নয়নের জলে॥
আমার আমার বলে সদা এ সকলে।
কত না করেছি দর্প হৃদয়কমলে॥
সখীভাবে যাহাদিগে ভাবিয়াছি মনে।
ভাবি তাহাদিগে ছাড়ি যাইব কেমনে॥
আবাস স্থানের প্রতি পড়িলে নয়ন।
বিষম দুঃখেতে যায় বিদরিয়া মন॥
যাক্ যাক্ ও কথায় কাজ নাই আর।
সময় হইলে রাখে হেন সাধ্য কার॥
জন্মিলে মরিতে যে হইবে নিশ্চয়।
সকলেই জানে তাহা নাহিক সংশয়॥
যে কাজ করিতে বিভু পাঠালেন ভবে।
কিছুই করিনি তার মজিয়ে বিভবে॥
এ কথা যখন আমি ভাবি মনে মনে।
অবিরত অশ্রুনীরে বাসি দুনয়নে॥
ভরসা আছে হে মাত্র ও রাঙ্গা চরণ।
অবলা বলিয়ে যদি করে হে তারণ॥
তাহলে হইতে পারে এ পাপ মোচন।
নহিলে উদ্ধার নাই নিশ্চয় বচন॥
এড়াইতে পারি যদি এবার শমনে।
সদাকাল চাই মাত্র তোমার চরণে॥
অসার সংসারে যেন নাহি মজে মন।
তব শ্রীচরণে বিভু এই নিবেদন॥
লিখতে লিখতে হাত লাগিল কাঁপিতে।
সেদিন ত আর নাই পারিনু লিখিতে॥
লিপিতে লিখিতে আঁখি হইল আঁধার।

না দেখি কলম, কালি, কি লিখিব আর ৷৷
ধন্য ধন্য রোগ তোরে বলিহারি যাই।
ইচ্ছা হয় মরি তোর লইয়ে বালাই ৷৷
বধ প্রাণে তুমি যার হৃদে কর বাস।
সাবাস ব্যাধি রে তোরে সাবাস সাবাস ৷৷
আমাকে ছাড়িয়া তুমি করহ গমন ।
এনিবেদন পদে এই নিবেদন ৷৷"

২/৬,১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২

## রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড মেও
## শোক কথা
### পদ্য

হায় রে ভারতরত্ন ! ভারতের নিধি !
ভারতের শিরোমণি রাজ্ঞী প্রতিনিধি ! !
দেশ ছাড়ি তরী চড়ি আসিয়া ভারতে।
হয়েছিলে হিতব্রতী দেশহিতব্রতে ৷৷
কেবল কল্যাণ কাম কামনা তোমার !
বিরাজিত ছিল সদা অন্তরে সবার ৷৷
যাতে ভারতের হিত তাতে ছিল মন।
হিত আশে দেশে দেশে করিতে ভ্রমণ ৷৷
লিবি সভা দরবারে অমিয় বচন।
আর কি ভারতী লোকে করিবে শ্রবণ?
আর না শুনিব তব অমৃত আলাপ।
আর না হেরিব তব অসীম প্রতাপ !
আর না হেরিব তব মধুর মুরতি।
শান্ত দান্ত ক্ষমাবন্ত ধর্মবন্ত মতি ! !
হায় হায় তব শোকে বহে অশ্রুধার।
কোথা গেল ফিরে কি হে আসিবে না আর?

সমুদ্র লঙ্ঘন করি ত্যজি নিজ দেশ।
এসেছিলে এদেশের ঘুচাইতে ক্লেশ ৷৷
তিন বর্ষ সমশ্রমে করিয়ে যতন।
কোরেছিল ভারতের শুভ অন্বেষণ ৷৷

শুভ ফল ফলবার অবসর কালে।
অকালে মরণ করে গরাসিল কালে ! !
হায় হায় কৃপাময় দয়ার সাগর !
স্মরিয়ে তোমারে আজি বিদরে অন্তর ! !
যেমন সুন্দর ক্লান্তি শন্তি নিকেতন।
তেমনি হৃদয় শান্তি শান্তি বিনোদন॥
রূপে গুণে দয়াধর্ম্মে জগত মোহন।
প্রকৃতিদ প্রিয়ম্বদ মানস রঞ্জন॥
তব শোকশেল হৃদে বিধেছে সবার।
কোথা গেলে করে কি হে আসিবে না আর?

ধনের প্রয়াসে নহে মানের প্রয়াসে।
এসেছিলে প্রিয়াসনে ভারত প্রবাসে॥
সকলের চিত্তরঞ্জি ভুঞ্জি মানা সুখ।
উজ্জ্বল করিয়াছিলে উজ্জ্বল শ্রীমুখ।
ধনের অভাব তব কি ছিল স্বদেশে;
রাজা রাজরাজেশ্বর ছিলে তুমি দেশে।
কিছুর অভাব নাই আহরিস্ ভবনে।
ভারতের হিত সুধু ভেবেছিলে মনে॥
সে হিতে করিয়াছিলে দেহ সমর্পণ।
সেই দেহ বিদারিল পাপিষ্ঠ যবন।
পাষণ্ড পামর করে হারালে জীবন॥
মহা শোকে শোকাকুল ভারতীয়গণ॥
কশায়ের করে করি আত্মা বিসর্জ্জন।
কোথা গেলে গুণময় ত্যজি পরিজন।
মায়াবতী জায়া তব লেডীমেও নারী।
অনিবার দুনয়নে ফেলিতেছে বারি॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে ছিল ভীষণ সময়।
দ্বিধা হয়ে গেছে তার কোমল হৃদয়॥
কেমনে তাঁহারে ফেলে হলে আগুসার।
কোথা গেলে ফিরে কি হে আসিবেনা আর?

যথা যথা করিয়াছ রাজ দরবার।
তথা তথা মনোমুগ্ধ করেছ সবার॥
বিমল কোমলচিত্ত সরল অটল।
হরেছ সবার মন করিয়া কৌশল॥

রচনা কৌশল জালে বাক্যের কৌশলে।
ভুলিয়াছে গলিয়াছে, বলিছে সকলে॥
সর্ব্বগুণ ধার তুমি সর্ব্ব গুণধার।
স্নেহময়ী জননীর প্রণয় আসার॥
শাসিতে মায়ের রাজ্য আসিবে কি আর?
জিজ্ঞাসিছে এই প্রশ্ন ভারত কুমার॥
ভেবে ছিলে উঠাইবে আয়কর কর।
বড় আশা ছিল মনে করিবে সত্বর॥
সব আশা বৃথা হলো বিহনে তোমার।
কোথা গেলে ফিরে কি হে আসিবে না আর?
কি কুক্ষণে এ ভারতে বাজিল কুচাক।
মাথা তুলে বাহিরিল ওয়াহাবি থাক্॥
পাযাণ্ড ধর্ম্মের গোঁড়া হিতাহিত হীন।
ধর্ম্মযুদ্ধে আগুয়ান সারা রাত্রি দিন॥
বাজারে ধর্ম্মের কাড়া, নগরে বাজারে।
করিল ঘোষণা জারী মজাতে রাজারে॥
মহম্মদে অবিশ্বাস বিশ্বে আছে যার।
ওহাবী, কাফের বোলে শির লবে তার॥
হাতে হাতে স্বর্গ লাভ বধিলে কাফের।
এই ত ওহাবী ধর্ম্ম অদৃষ্টের ফের॥
জানে না, ব্রিটিস সিংহ ভারত ভুপাল।
শাসিবে হাঁসিবে সবে করিবে কি হাল॥
ছদ্মবেশে প্রবেশিয়া হাই কোর্টাগারে।
দিবাভাগে নর্ম্মণের পেটে ছুরি মারে॥
দুরাচার আবদুল্লা পানির বর্ব্বর।
ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলি হল ভস্ম কলেবর॥
তথাচ এমন পাপে মতি অনিবার।
ভারতের শিরাঘাত করে দুরাচার॥
হবেই হবেই হবে হাতে হাতে ফল।
পুড়িবে ঘুঘুর বাসা, চূর্ণ হবে বল॥
আ মরি আরল মেয়ো গুণের আধার।
কোথা গেলে ফিরে কি হে আসিবে না আর?
সপ্তদশ গবর্ণর জেনেরল তুমি।
তব সমাগমে সুখী ছিল স্বর্ণভূমি॥
ডেলহাউসি বিনা কেহ আপন ইচ্ছায়।
মান নাই ব্রহ্মদেশে উদীচ্য সীমায়॥
কেন তুমি সে কুপথে করিলে গমন।
বিঘোরে বিদেশে গিয়ে হারালে জীবন॥

কি কুক্ষণে কুযাত্রার পশিলে রেঙ্গুণে।
তাগে বাগে পাছু লেগে গুপ্ত ছিল খুনে।
ছাড়িয়ে রেঙ্গুনধাম ত্যজি মুলমীন।
তারণী ছাড়িয়ে তুমি আসিলে যে দিন।
সুলুক সন্ধান তার আনিয়া বিশেষ।
গোয়েন্দা আনালে সব করিয়া নির্দেশ॥
কি কুক্ষণে এলে তুমি, পোটবেলয়ার।
কোথা গেলে ফিরে কি হে আসিবে না আর?

হরিয়ত গিরি শোভা করি দরশন।
করিতে আসিতে ছিলে তরি আরোহণ॥
প্রহরী বেষ্টিত তব রাজকলেবর!
কার সাধ্য স্পর্শ করে রাজরাজেশ্বর॥
কি বুদ্ধি কুবুদ্ধি তব উদিল অন্তরে।
নির্ভয়ে প্রহরীগণে রাখিল অন্তরে॥
শুভ অবসর পেয়ে পাষাণ্ড পামর।
লম্ফ দিয়ে বিদারিল কম কলেবর॥
হায় হায় মনে হলে ফেটে যায় বুক।
সহসা মুদিলে চক্ষু নীরবিল মুখ॥
হায় হায় লার্ড মেয়ো! হায় হায় হায়।
স্মরিতে তোমার নাম হৃদি ফেটে যায়॥
আজি হতে তব নাম শোকের সহিত।
উচ্চারিত হবে সুধু স্মরি সাধু হিত॥
কি কুক্ষণে গিয়েছিল পেটে বেলেয়ার।
কোথা গেলে ফিরে কি হে আসিবে না আর?

কটকে আসিতে বড় ছিল অভিলাষ।
অভিলাষে বিসম্বাদ মহা সর্ব্বনাশ!!
কোথা রাম রাজা হবে কোথা বনবাস-
জিঞ্জিরে কয়েদী হস্তে অসু হলো নাশ!!
পশু সম অসু আশু হানিল যবন।
সাধিতে দেশের হিত হারালে জীবন॥
কেন তুমি গিয়েছিলে পেটে বেলেয়ার।
হায় হায় এই খেলা লিপি বিধাতার॥
তরি ভাড়া করি গেলে মরিবার তরে।
জন্মশোধ এই খেদ রহিল অন্তরে॥

বঙ্গের শাসন কর্ত্তা শুভসজ্জা করি।
যাইছেন উড়িয্যায় আরোহিরে ভরি॥
কটকে করিবে তুমি মহা দরকার।
ফুরাইল লীলা খেলা, আসিবে না আর?
কত লোকে কত আশা কোরেছিল মনে।
কটকী হইবে সুখী তব আগমনে॥
কারো কারো আশা ছিল তোমার কৃপায়।
নবীন কলেজ এক বসিবে তথায়॥
কারো২ আশাছিল, প্রসাদে তোমার।
পড়িবে উড়িয্যাবালা লৌহবর্ত্ম হার॥
লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রযাত্রী বরষে বরষে।
পোয়াবটো পথ হেঁটে তীর্থধামে পশে॥
শ্রীপতির শ্রীমুখের দরশন আশে।
আধমরা হয়ে সবে শ্রীক্ষেত্রেতে আসে॥
তব আগমনে প্রভু তব কৃপা বলে।
রেল পথে মহা প্রভু হেরিবে সকলে॥
বড় আশা ছিল মনে সব হলো দূর।
যবনের করে ক্ষয় যেয়ো বাহাদুর॥
কি কুক্ষণে রাজধানী তজিলে সুমতি।
কেন মহামতি তব ঘটিল কুমতি॥
স্বর্ণময়ী রাজধানী করি অন্ধকার।
কোথা গেলে ফিরে কি হে আসিবে না আর?

শ্যামরাজ তব আশে আসিছেন ফিরে।
শুনিবেন শোকবজ্র ভগীরথী তীরে॥
উঠিবেন ভগ্নচিতে, হেরিতে তোমায়।
কে এসে আদরে তুষে তুলিবে তাঁহায়?
কে আর করিবে তাঁর রাজ সম্ভাষণ।
কে আর করিবে তাঁর চিত্তবিনোদন?
ভ্রাতা সহ শ্যামরাজ, আসিছেন ফিরে।
অতিথি হইতে তব প্রাসাদ মন্দিরে॥
কে করিবে মহা ভাগ অতিথি সৎকার।
অযশ হইবে বড় অযতনে তাঁর॥
কাঁদিবেন তব শোকে শ্যামের রাজন।
কাঁদিবে সমান স্বরে নগরীয়গণ॥
প্রতিধ্বনি উঠিবেক জলে আর স্থলে।
মহাশোকে শোকাকুল ভারতী সকলে॥

কাঁদিছে তোমার শোকে সাধ্বী কলিকাতা।
আঁধারে রয়েছে যেন হওয়া অনাথা॥
অসময়ে গুণময় ত্যজি রাজ্য পাট।
কোথা গেলে বসাইয়ে রোদনের হাট॥
কলিকাতা রাজধানী করি অন্ধকার।
কোথা গেলে ফিরে কি হে আসিবে না আর?

অভাগিনী লেডী মেও তব প্রাণেশ্বরী
তব শোকে দিশা হারা দিবস সর্ব্বরী॥
কে তাঁরে প্রবোধ দিবে মধুর বচনে।
কে তাঁরে তুষিবে আর সুধা বরিষণে।
কে তাঁরে বুঝাবে শোকে, শোকাকুল সবে।
তব গত প্রাণ যাঁর তাঁহার কি হবে?
বিধাতা ভারতপত্নী হাহাকার সার।
কি বোলে বুঝাবো লর্ড, লেডীরে তোমার॥
স্বদেশে যাবেন বোলে কোরেছেন পণ।
কে যাবে তাঁহার সনে করিবে যতন॥
অভাগিণী পতিহীনা বিধবা মহিষী।
হায় হায় সার তাঁর সারা দিবানিশি॥
রাজধানী অনাথিনী হায় হায় হায়।
লহমে লহমে মনে পড়িছে তোমার॥
কি কাল হইল কাল পোট বেলয়ার।
কেন গেলে মহামতি, আসেবে কি আর?

মৃতদেহ আসিতেছে সন্ধ্যাকালে কাল।
তাই শুনে সবাকার চিতে বিঁধ শাল॥
এদিনে শুদিনে যবে কু'দিন উদয়।
এদিন ভারতে সবে কাতর হৃদয়॥
যা দেখিতে যা শুনিতে ছিল না প্রয়াস।
অকস্মাৎ তা ঘটিল, একি সর্ব্বনাশ!!
ছিল না প্রয়াস যাতে ছিল না প্রয়াস।
বিধাতার খেলা একি লীলা সপ্রকাশ॥
কলিকাতা রাজধানী করি অন্ধকার।
কোথা গেলে ফিরে কিহে আসিবে না আর?
হাসিল দুর্ম্মতি মতি সাজি দল বল।
চাঁপদেড়ে পাতিনেড়ে কুচক্রীর দল॥

খাইবার পেসোয়ারি অলির নন্দন।
পাপ আত্মা সের আলি হানিল জীবন॥
ওহাবি কুটিল চক্রে নিমক হারাম।
মারিল মাথায় ছুরি পাপিষ্ঠ হারাম॥
জেহাদ ধর্ম্মের ছলে পাতি চক্র ফাঁদ।
নাশিল গ্রাসিল চক্রে ভারতের চাঁদ?
এ তুফানে হিন্দুস্থানে নাহি ভদ্র বোধ।
সাধিবে বধিবে শত্রু ভাবী জন্ম শোধ॥
ভারতের চূড়াপাড়ি গুপ্ত চক্র ভেদে।
খেলিছে ভোজের বাজি গুপ্ত দল বেঁধে॥
হবেই হবেই হবে কুচক্র প্রকাশ।
একদণ্ডে হয়ে যাবে চক্র বংশ নাশ॥
ওহাবি বংশের বংশ হবেই নিশ্চয়।
হবেই হবেই হবে নাহিক সংশয়॥
ধরো মারো নাশ করো, রেখনাকো শেয।
ওহাবি বংশের চক্র করহ নিঃশেষে॥
যথা পাও তথা মারো ভাঙো ঘুঘুবাসা।
জন্ম শোধ ফুরাইয়ে দাও দুষ্ট আশা॥
মার্সেল আইন জারি, কর কর কর।
ম'রো মারো ওহাবি ধর ধর ধর॥
মহম্মদে অবিশ্বাস কাফের বর্ব্বর।
কেটে ফেলো স্বর্গে হবে, ধর্ম্মের উত্তর॥
কাটো কাটো জেহাদের বংশ কর নাশ।
পোড়াও ঘুঘুর বাসা, শূন্য কর বাস॥
ওহাবি পাপিষ্ঠ দস্যু যে যেখানে আছে।
মারো২ ঝাড়ে বংশে যারে পাবে কাছে॥
ভারতের চূড়া ভাঙ্গে পাপাত্মা পামর।
স্বর্গ নামে হবে লাভ নরক দুর্ম্মর॥
হায় হায় লার্ড মেয়ো মহা মতিমান।
দুরাত্মা কশাই তব বিনাশিল প্রাণ॥
স্বর্গগুলি হবে তুমি প্রার্থনা আমার।
জঠর যন্ত্রণা কভু হবে নাকো আর॥ (প্রভাকর)

হতভাগ্য শিক্ষক, বঙ্গোরহস্য (পঞ্চম অধ্যায়), লঙ্কাদাহ [ঢাকা] : যাদবানন্দ রায়।

## বিজ্ঞাপন

অত্যন্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, মদনুজ হরিশ্চন্দ্র মিত্র এই "মিত্র প্রকাশ" পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া এক বৎসর কাল যথা নিয়মে প্রচার করিয়াছিল, পরে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ইহা রীতিমত প্রচার করিতে অসমর্থ হইয়া, বিগত ২০ শে চৈত্র সোমবার দিবা দ্বিতীয়

প্রহরের পর আমাকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া আমার একমাত্র অবলম্বন প্রাণাধিক হরিশ সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে। এইক্ষণ এই পত্রিকার সম্পাদন ভার অগত্যা আমার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এই কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে আমি কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইব তাহা এইক্ষণ কিছু বলিতে পারি না।

সম্পাদকীয় ব্রত যথানিয়মে পরিপালন করা অতীব কঠিন কর্ম্ম। অনেকেই এই মহান ব্রতে ব্রতী হইয়া স্বকীয় অক্ষমতা নিবন্ধনই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক অত্যল্প কাল অতীত হইতে না হইতেই বিরক্তি-বোধ করেন। কেহবা এই মঙ্গলময় পথের কিয়দ্দূর মাত্র অতিক্রম করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়েন ; কেহ বা এই আয়াস সাধ্য কঠিনতম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় গরীয়সী বুদ্ধিমত্তা ও অসামান্য বিদ্বত্ব প্রভাবে সিদ্ধকাম ও হইয়া থাকেন। আমরাও এই কঠিন ব্রত পালনে গৃহীতচেষ্ট হইলাম ইহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারিব কি না তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ।

সম্পাদকীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রায় সকলেই গ্রাহক এবং পাঠক গণের মনোরঞ্জনার্থ সচেষ্ট হইয়া থাকেন। হইবেন না কেন? পত্রিকার জীবন গ্রাহকগণের মনস্তৃপ্তির এবং অনুকম্পার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে বলিতে হইবে, গুনজ্ঞ গ্রাহকগণের আনুকূল্য ব্যতীত কোন সম্পাদকই পত্রিকা জীবিত রাখিতে সমর্থ নহেন। আমরাও যে এই পত্রিকার চির জীবন ও স্থির যৌবন সাধনার্থ সর্ব্বান্তঃ করণে গ্রাহকগণের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নযুক্ত হইবে ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য। যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহাতে অপরাধ কি? এক্ষণ সহৃদয় লেখকগণকে সবিনয়ে অনুরোধ করি যে, এই পত্রিকার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রবন্ধাদি প্রেরণ করেন। ভরসা করি তাহাতে তাঁহারা পরাঙ্মুখই হইবেন না।

পরিশেষে অনুগ্রাহক, গ্রাহকবর্গের নিকট আমরা এই নিবেদন তাঁহারা যেন মৎপ্রচারিত "মিত্রপ্রকাশ" পত্রগুলিন সামান্য মাসিকপত্র বোধে পাঠ করেন তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

**২/৬, ভাদ্র, ১২৭৮**

স্তোত্র, কবীশ্বরীর প্রতি, বারশত আটাত্তর সালের বিদায়, বারশত উনআশি সালের আগমন

**কবিবর ঁহরিশ্চন্দ্র মিত্রের কিঞ্চিৎ গুণাবলী বর্ণন।**

হরিষ বিষাদ করি হরিশ আমার।
অকালে কালের করে হলো আগুসার॥
বুক ফাটে হোলো যার মরণ স্মরণ।
কেমনে তাহার গুণ করিব বর্ণন॥
লেখনী করিলে করে নানা জ্বালা ঘটে!
স্বাভাবিক বুদ্ধি আর নাহি থাকে ঘটে॥
অনিবার শতধার দুনয়নে বয়।
বর্ণচয় দৃষ্ট নয়, সব শূন্যময়॥

ভাবোদয় হলে পুণ ভাবাভাব হয় !
কি লিখিতে কি লিখিব এই বড় ভয়॥
হায় হায় যদি তার না থাকিত গুণ !
তবে কি জ্বালিত এত শোকের আগুণ ?
যে দুখ ঘটেছে তাহা, যাবেনাকো মলে।
বুক চিরে দেখাতাম দেখাবার হোলে॥
তব তরে বহু নরে তোমায় যে জানে।
এখনও রত্নগর্ব্বা, বলি যারে মানে॥
গুণ গান লেখা হোক যেমন তেমন।
বোধহয় বঙ্গদেশ হইয়াছে বন॥
রাজা, প্রজা রোগী, ভোগী, সজ্ঞান, অজ্ঞান।
স্বজাতি, অপরজাতি, দীন, ধনবান॥
আত্মীয় হউক কিম্বা হোক অন্যপর।
সকলে করিতে তুমি সমান আদর॥
মিথ্যা করি গাও নাই কভু কারো যশ।
খোশামদে হও নাই কভু কার বশ॥
আশ্রিত জনের ছিলে সতত আশ্রয়।
উদার স্বভাব তোমার সকল সময়॥
যে দুখ ঘটেছে তাহা যাবেনাকো মলে।
বুক চিরে দেখাতাম দেখাবার হলে।

---

স্বরস্বতী সুতরূপে তুমি অবতার।
না পড়ে পণ্ডিত ছিলে একি চমৎকার॥
সকলেই বলিত যে তোমার হৃদয়।
হয়েছিল দৈবশক্তি দেবীর আলয়॥
নানারূপ ভাবফুলে দেবীর চরণ।
পুজিতে মনের সুখে মুদিয়ে নয়ন॥
বর্ণসূত্রে ভাব সব গাঁথিতে যখন।
অমনি বহিত বেগে লেখনি পবন॥
লেখনি সমীরে যত ভাবের সুবাস।
চারিদিগে একেবারে হইত প্রকাশ॥
গন্ধ পেয়ে আমোদিত হতো সর্ব্বজন।
আর কি পাইব মোরা তোমার মতন॥
যে দুখ ঘটেছে তাহা যাবেনাকো মলে।
বুক চিরে দেখাতাম দেখবার হোলে॥

যেখানে যখন তুমি করিতে গমন।
দেখিতে আসিত তথা কতশত জন॥
কেহবা বলিত ইনি হরিশ্চন্দ্র মিত্র।
কেহবা বলিত বাগ্‌দেবীর বড় পুত্র॥
যত কিছু লিখিতেছি নহে অসম্ভব।
কাছে থেকে দেখিয়াছি তোমার গৌরব॥
রচনায় প্রকাশ করেছ এত রস।
ভুলেছে পাঠকগণ গাইয়াছে যশ॥
সুখ্যাতি সৌরভ তব, গেছে দিগ্‌দশ্‌।
প্রকাশ করেছ তুমি কবিতার রস॥
বিনয়, প্রণয়, স্নেহ, দয়া শিষ্টাচার।
যথায় তথায় তুমি, করেছ প্রচার॥
যে দুখ ঘটেছে তাহা যাবেনাকো মলে।
বুক চিরে দেখাতাম দেখাবার হোলে॥

দুচরণ পদ্য লিখে আমরা সবাই।
মনে২ অহঙ্কার করিয়া বেড়াই॥
গুণির যে গুণ আছে, জানে তাহা গুণী।
সর্ব্বকাল সর্ব্বঠাই এই কথা শুনি॥
নিজে নাকি গুণী ছিলে গুণি গুণ তাই।
বর্ণনা করিতে কভু ত্রুটি কর নাই॥
বঙ্গদেশে যত কবি ছিল বর্ত্তমান।
করিয়াছ সকলের গুণের বাখান॥
তব রসায়ন হোত সুধা বরষণ।
সপ্ন সম সব যেন হোয়েছে এখন॥
চির-স্মরণীয় তুমি হয়েছ নিশ্চয়।
যে কীর্ত্তি রেখেছ তাহা ভুলিবার নয়॥
যে দুখ ঘটেছে তাহা যাবেনাকো মলে।
বুক চিরে দেখাতাম দেখাবার হোলে॥

মিত্রভাবে মিত্রের করেছ হিত কত।
কেবল যাতনা ব্যরে মনে পড়ে যত॥
বোধবোধ নাহি ছিল, মান অপমান।
আপনাকে করিতে, সামান্য নর জ্ঞান॥
প্রেম পাশে-বেঁধে ছিলে মিত্র সমুদয়।

তা না হোলে কেন তারা শোকে ডুবে রয়॥
যন্ত্রালয় শূন্যময়, শূন্য তবাসন।
কে আর করিবে করে লেখনী ধারণ॥
মনোগত যত দুঃখ কব আর কায়।
হতবুদ্ধি হইয়াছি হারায়ে তোমায়॥
শুভ আশা দূরে গেল কি হইল হায় !
লাগিল নিরাশা বহ্নি আশার বাসায়॥
যে দুখ ঘটেছে তাহা যাবে নাকো মলে।
বুকচিরে দেখাতাম দেখাবার হোলে

বিলাপ তরঙ্গিণী, বঙ্গবধূ, বঙ্গোরহস্য, কবিবর হরিশ্চন্দ্রের মিত্রের গীতাবলী,

## লর্ড মেওর মৃত্যু জন্য ভারত ভূমির আক্ষেপ

তনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুইলো* আমার।
রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, ধনে, মানে, অতি !
জগত বিখ্যাত নাম বহুল কুলের ধাম,
আজ কেন হেরি, তোর বিষন্ন বদন॥
কিহেতু বদন দেখি বেজার বেজার॥

১

হৃদয় মাঝারে তোরে ধরি অনুক্ষণ।
রেখেছি যতনে তবু পাইলে কিছুল !
অশ্রু পূর্ণ মুখখানি, নাহি সুমধুর বাণী,
হাসি রাশি ; হেরি মোর ফাটে হৃদিস্থল॥
কহলো শুনিয়া মোর জুড়াক জীবন॥

২

হায় ! কতজন বাঞ্ছে তোর সহবাস।
ঘুচাতে মনের দুঃখ হেরি তোর মুখ।
দিয়ে আলিঙ্গন দান, তোষ সভাকার প্রাণ ;
কৃপনতা নাহি তায় কর একটুক॥
আজ কেন বিপরীত একি সর্ব্বনাশ ?

কলিকাতা

৩

নয়ন আগারে স্রোত বহিছে সবার।
সহিতে না পারি তার, ফাটেলো হৃদয়।
কেতোরে করিল দ্বেষ, কহ শুনি সবিশেষ,
কেন হেন হীন-বেশ, প্রাণে নাহি সয়॥
মলয়ে অনল মরি একিঁ চমৎকার?

হাহাকার রবে কর্ণ হইল বধির।
থেকে থেকে কেন্দ্রে উঠিছে অন্তর।
বড় আদরের মেয়ে, নাহি কেহ তোর চেয়ে,
তোর এই দশা মম অতি ভয়ঙ্কর॥
এবার হেসে মাতঃ! মাকে কর স্থির॥

৫

কোথা প্রিয়সখি! সতি! প্রকৃতি! আমার।
সখির তনয়া বলে সাজাইতে যায়।
স্নেহ বশে অনুক্ষণ, আজকেন কুলক্ষণ,
দীনা হীনা ক্ষীণা, আশু বৈধব্যার প্রায়॥
ধরেছ মলিন কান্তি শান্তির আগার॥

৬

হইয়াছে কত শত শত মহামার।
মরেছে অসংখ্য লোক পড়েছে বাঞ্জনা।
ছিন্ন ভিন্ন করি কায়, তবু কভু তুমি তায়,
করনাই একতিল শোকের শোচনা॥
আজ কেন অকস্মাৎ এভাব তোমায়॥

৭

কোকিল কুস্বরে কেন নাহি গাও গান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে তান ধরি কুতূহলে।
সাজিয়ে কুসুম দলে, সৌধাবলী বনস্থলে,
কেননা বিতর সুখ দর্শক মণ্ডলে॥
ভাবুক হৃদয়ে করি সুবিচিত্র তাণ?

এতষে হয়েছে সখি! হেথা অত্যা
তবু তব ম্লানমুখ দেখিনি কখন।

তখন ও ভ্রমর গণ, করেছে সঙ্গীত স্বন্,
কুহু কুহু মুহুর্ম্মুহু বিহঙ্গ বাদন॥
নিরাপদে কি বিপদে নিরব এবার?

৯

অয়ে সখা সমীরণ! বল অধিনীরে।
তপ্ত তপনীয় স্পর্শ কিহেতু তোমার।
মলয় আলয়ে বাস, শীতল সুগন্ধি বাস,
বিতরণ করি তাপ জুড়াও সভার॥
আজ কেন বিপরীত দেখি দুঃখিনীরে॥

১০

চিনেছি চিনেছি আমি চিনেছি তোমায়।
বিরহিনী গণরিপু তুমি চিরদিন
পতিষেই নেই ঘরে, তেঁই অনাদর করে,
জ্বালাতে এসেছে মোরে পেয়ে একাকিনী॥
জ্বলন্ত অনল বুঝি অভিপ্রার?

১১

না না মিছামিছি কেন নিন্দি হে তোমায়।
না বুঝিয়া গন্ধাবহ! কি দোষ তোমার?
যদি তাই ছিল মন, কেন ত্যজি ফুল বন,
নিরমল পরিমল; হলে আগুসার॥
যাতে বিরহিণী জ্বলে অধিক জ্বালায়॥

১২

শক্র বলে মিত্র তব কৈনু তিরস্কার!
ক্ষম দোয ধরি পদে, এবার আমার।
অবলা সরলা অতি, অকৃতজ্ঞা হীনমতি,
না জানিয়া তত্ত্ব তেঁই গঞ্জিনু তোমায়॥
সম দুঃখ ভাগী তুমি বট হে আমার॥

১৩

কে দেখেছে সুর পুরী? কবির কল্পনা।
পশিয়া হৃদয়ে তার; অরূপ মাধুরী।
দেখেছে যে একবার, সেই মনে মানে হার,
সাহসে হৃদয়ে পুরি বলে সুরপুরী॥
কলিযুগে কলিকাতা কেবল ছলনা॥

১৪

আজ তার হেন দশা আ মরি ! আ মরি !
নাভিস্থলি বলি যার বিপুল গরব।
বাঙ্গালার রাজধানী, মানে মানে মহারাণী,
নিরবধি যাঁরে লোকে ; অতুল বিভব॥
প্রাণের কুমারী মম এরম্য নগরী॥

১৫

আয়ি মিত্রে ! শিব দাত্রে ! বিদ্যালয় স্থলি !
অবিরত পুত্রগণ দিতে শিক্ষা দান।
ধাত্রীর মতন ধরি, সযতনে অঙ্কোপরি,
আজ কেন দেখি তব বিরস বরান ?
মৌন হয়ে আছ যেন মনস্তাপে জ্বলি॥

১৬

কটু কি বলেছে তারা মনোদুঃখ তাই।
করিতেছ পরিতাপ বসে একাকিনী ?
দেখিয়া তোমার মুখ, হেদে খেদে ফাটে বুক,
ধৈরজ ধরিতে নারি কহ সে কাহিনী॥
কি হেতু এভাব তব দেখিবারে পাই ?

১৭

হায় ! কে করিল এত তব অপমান।
বল বল বল সখি ! করিয়ে প্রকাশ।
কাগজ কলম সই, ছড়িয়েছে থই থই,
কার এত উপজিল অকাল সন্ন্যাস ?
ত্যজিয়া তোমায় সবে করিল প্রস্থান ?

১৮

উত্তর না কর দান, কি হেতু স্বজনি !
বুঝিতে না পারি তব এ ভাব কি ভাব ?
এত কি করেছে পাপ, কে দিয়েছে ব্রহ্মশাপ,
কেন এত মনস্তাপ স্বভাবে অভাব ?
মূর্খের মতন মুখে নাহি বাক্য ধ্বনি॥

১৯

বুঝেছি বুঝেছি মম ভেঙ্গেছে কপাল ?
তাই হিতৈষিণী হয়ে নাহি বল কথা।

করেছি কি বিসম্বাদ, অসময়ে সাধ বাদ,
ভেবে পাইনে একমাত্র সম্বন্ধেতে সতা॥
তাই কি গো ! হিংসা করে ফুলিয়েছে গাল ?

২০

ছি ছি মাথা খেয়ে কেন নিন্দিনু তোমায় ?
চিরদিন চিন্তা কর তুমি মম হিত।
কিসে রবে মান কাম, আর্য্যবংশীয়ে নাম
অজ্ঞমতি সুতগণে যত্নের সহিত॥
করিছ সুশিক্ষা দান বিবিধ ভাষায়॥

২১

অয়ি গঙ্গে ! জগতের মুক্তি প্রদায়িনী।
পতিত পাবন তরে তব আগমন।
আজ কেন মন্দগতি, অজরে স্থবিরামতি,
নাহি সে তরঙ্গ মালা ; কল কল স্বন॥
কার তরে শোকাকুলা কহ তরঙ্গিণী॥

২২

পাতালেতে ভোগবতী স্বর্গে মনদাকিনী।
মর্ত্ত্যে ভাগীরথী নাম অগতির গতি।
যে তব পরশে জল, সেই পায় মোক্ষ স্থল,
করেছি কি পাপ পদে না হইল গতি॥
নিরবধি ধরি হৃদে আমি অভাগিনী ?

২৩

যবে ছিল অধিপতি হিন্দু রাজগণ।
কতই না সুখে কাল কাটায়েছি তায়।
যৌবনে যবনগণ, করি মোরে আক্রমণ,
যত না যাতনা দিল কি বলবি হায় !
আজিও শরীর কাঁপে হইলে স্মরণ॥

২৪

ছিল মাত্র যোগ্য পাত্র আকবর শাহ।
সুবিচারী সদাচারী প্রকৃতি সুধীর।
করিতেন সুশাসন, হইয়ে অনন্য মন,
সুখে ছিল সুতগণ সদা অভাগীয়॥
নাহি ছিল কোন কালে দুষ্টের প্রবাহ॥

২৫

তদন্তরে যত জন হইলা ভূপতি।
হায় সে লাজের কথা কহিব কেমনে।
না বুঝিত ভাল মন্দ, সদাই করিত দ্বন্দ্ব,
কে লইবে মম পানি কেড়ে অন্য জনে॥
পিতা পুত্রে সহোদরে সহোদরে সভি!

২৬

কথায় বলে যবনের যদি বাড়ে পদ।
মদে নাহি দেখে মর্ত্ত প্রমত্ত যবন।
তোষামোদের কাটেকাল, নাহি ভাবে পরকাল,
নাহি বুঝে নারি বই এমনি মদন॥
সদত বদনে বোল দে মদ? দে মদ?

২৭

ছিল না বিচার ন্যায় প্রজার পালন।
তস্কর দস্যুর বেড়ে গেল ঠাকুরালী।
দুর্ম্মদ যবন গণ, করি ধন বিলুণ্ঠন,
আর্য্য সুতগণে কৈল পথের কাঙ্গালী॥
হায়! তাহা নারী হয়ে দিব কি লিখন?

২৮

শোণিত প্রবাহে স্নান কৈনু কতবার।
প্রলয় সংগ্রামে তাহা দেখেছ জননি!
কি আর বলিব ভেঙ্গে, আপনি গিয়েছ ভেঙ্গে,
মম তরে হায়! যথা লভিতে যবনী॥
আপনা আপনি যত কৈল মহামার॥

২৯

পিতা হতে পুত্রে মোরে বলে ছেড়ে নিল।
সহোদর হতে প্রতি সহোদর গণ।
দুদিন চার দিন করে, বঞ্চি সবাকার ঘরে,
কত মত অত্যাচারে হইনু জ্বালাতন॥
কহিতে সে কথা এবে হৃদে হানে খিল॥

৩০

সবে ব্যঙ্গ করে বলে, শ্রীরাম শ্বশুড়ে।
কে দেখেছে হেন নীতি হেন রীতি কার?
পিতাকে করিয়া বন্দি, বিমাতার সহ সন্ধি,

বলে হরে নিল সিংহাসন অধিকার॥
নির্লজ্জ যবনচয়, এমনি মাশুড়ে॥

৩১

এইরূপ কত কথা শুনিতে অদ্ভুত।
করেতে অশক্ত হয়ে আর্য্য সুতগণ।
ভয়ে প্রবেশিলে বনে, আক্রমিয়া প্রাণপণে,
তির মেরে বধিয়াছে সবার জীবন॥
হায় যথা ব্যাধ ঘেরে বধে মৃগযূথ॥

৩২

একটী তনয়া ছিল পদ্মিনী আমার।
পদ্মিনী সমান রূপে গুণে মহীতলে।
পাপিষ্ঠ যবন তার, রূপ শুনি চমৎকার,
লভিতে বাছারে আক্রমিল দলে বলে॥
সোনার চিতোর করি দিবসে আঁধার॥

৩৩

হইল তুমুল যুদ্ধ ক্রমে বর্ষ দ্বয়।
মরিল অগণ্য সৈন্য কি কহিবে দাসী।
যবনের বানা নলে, জ্বেলে রজঃপুত বলে,
উদয় পুরিল ব্যান্ মাতা সর্ব্বনাশী॥
তবু না করিল ক্ষমা এমনি নির্দ্দয়॥

৩৪

পদ্মিনীর প্রাণপতি ভীম নরপতি।
আপনি সমরে পরে ত্যজিলা জীবন।
বধি অপ্রমিত অরি, পদ্মিনীরে পরিহরি,
হায়! তাহা কোন্ মুখে করিব বর্ণন?
দুবৃর্ত্ত যবন করে না দেখি বিরতি॥

৩৫

দেখিয়া পতির মৃত্যু সাহসে নন্দিনী।
রাখিতে নারীর ধর্ম্ম সতিত্ব রতন।
সহ সহচরী দল, জ্বেলে তীব্রতরানল,
ঘৃতকুম্ভ সম তনু কৈলা বিসর্জ্জন॥
আর কি দেখিব সেই সুধা স্বরূপিনী?

৩৬

স্বর্ণলঙ্কা সম পুরী হল ছার খার।
লুঠিল যবন ধন যে ছিল ভাণ্ডারে
পূতি গন্ধে ঝাকে ঝাক, আসিয়া জুটিল কাক,
শকুনি গৃধিনী, শিবা, কুক্কুর চীৎকারে॥
আজো কর্ণে তালি লেগে রয়েছে আমার॥

৩৭

নারী হইয়ে সইতে নারি এসব অত্যাচার।
উদাসিনী প্রায় দাসী ভেবে নিরূপায়।
দেখিয়া সুযোগ্য বর, নানা গুণে গুণাকর
প্রদানিনু বরমাল্য ব্রিটিশের পায়॥
তায় বিধি প্রতিবাদী হইল আবার॥

৩৮

হে ভগিনী লেডিমেও ! কহগো আমায়।
কোনবলী উম্মূলিল ভারতেন্দু বলে।
সিন্দুরের বিন্দু সম, ছিল ভালে নিরুপম,
মুছিয়ে ফেলিল তাহা কে,অভাগী বলে॥
কে আছে নিঠুর হেন পাষানের কায়॥

৩৯

দুরন্ত যবন নাকি করে গুণাঘাত
বধিছে নাথের প্রাণ, শুনিনু শ্রবনে।
বজ্রাঘাত প্রায়হেন, ফুটিল হৃদয়ে যেন,
শোকানলে দহে প্রাণ নাসরে বদনে॥
আণ্ডামান উপকূলে পেয়ে আকস্মাৎ॥

৪০

কি্রে যবন তোর সুকঠিন হিয়া।
কেমনে এমন অঙ্গে হানিলিরে ছুরি।
যেতনু অতনু ভরে, চলে যেতে ঢলে পড়ে,
কমল কোমলতর রূপের মাধুরি॥
কিবা সাধিলে বল তাহাকে বধিয়া ?

৪১

চুপে চুপে ব্যাঘ্রযথা পশিয়া গোদলে।
বধে রাখালের প্রাণ তুইরে তেমন !
পাইয়া সন্ধার ঘোর, ভাঙ্গিলি কপাল মোর,
প্রবেশিয়ে রক্ষিদলে, অরেয়ে শমন !
এইকি আছিল তোর মানস মহলে ?

৪২

অয়ি সন্ধ্যে ! জগতের সন্তাপ হারিণী !
ত্রিজগতে বলে তোমা ; কি দোষ আমার ?
কেন কাল হয়ে এলে, দুখিনীর মাথা খেলে,
নিকৃষ্ট যবন করে এই কি বিচার ?
চিরদিন হয়ে তুমি মম হিতৈষিণী ?

৪৩

উঠিছে হৃদয় মম দহিয়া দহিয়া।
শুনি এ বারতা দেবি ! বল কোথা যাই ?
কোথা গেলে হব শান্ত, পাব সেই প্রাণকান্ত,
যথা নাই দুরাচার যবন বালাই॥
দয়া করি দুঃখিনীরে কেহ গো আসিয়া ?

৪৪

কে দিল জিঘাংসা বীজ হৃদয়ে রোপিয়া।
রে পাপ যবন ! তোর দয়া মায়া নাই ?
বার বার অত্যাচার, কতরে সহিব আর,
ইচ্ছা হয় মাটি হয়ে মাটিতে মিশাই॥
মৃত্যুনাই তেঁই আজি আছিরে বাঁচিয়া॥

৪৫

ছিলেন দৈবর মম, অনারেবল চিফ।
প্রধান বিচার পতি ধর্ম্মাধিকরণে।
বিনাদোষে দুরাচার, হরিলি পরাণ তাঁর,
প্রভঞ্জন প্রায় হায় ? ছুরিক, দংশনে॥
নিবাইলে ভারতের উদ্দীপ্ত প্রদীপ॥

৪৬

অদ্যাপি সে শেল বুকে রয়েছে বিন্ধিয়া।
ব্রিটিশ সমাজে মুখ দেখাইতে নারি।
না ঘুচিতে সেই তাপ, তাপের উপর তাপ,
বলকোথা দেই ঝাপ সহিতে নাপারি॥
বাপ বাপ একি পাপ ঘেরিল আসিয়া ?

৪৭

হায় ! এবে কোথা যেয়ে এ জ্বালা জুরাই।
কে দিবে আশ্রয় মোরে জানিয়া রাক্ষসী।

কার কাছে মনোদুঃখ, খোলে কব পোড়ামুখ,
কে আছে জগতে মম এমন সাহসী॥
সমদুঃখ ভাগী হয়ে বেটে লবে তাই?

৪৮

কোথাহে ভারত কান্ত শ্রীমুখ মণ্ডল।
যাঁহার দর্শনে লালাইত জগজ্জন।
দেখা দিয়ে দুঃখিনীরে, বাঁচাও এ দুঃখনীরে,
ডুবিনু ডুবিনু নাথ! করহে তারণ?
চরণে শরণ দিয়ে যথা আখণ্ডন॥

৪৯

কি ভেবে এভাব তব বল? বল? বল?
কেনে এ দাসীর প্রিতি মলে উদাসীন?
কেনত্যজি এ সম্পদ, ভারত ইন্দ্রত্বপদ,
হইলে ভূতল্য শায়ী যাহে প্রতিদিন॥
শত শত নৃপাতির নমিত কুণ্ডল॥

৫০

তেহ অগ্রে দেবর গ্রে* গিয়েছে ছাড়িয়া।
ভাবিয়া তোমায় ভাবী নিঠুর বাসনা।
লক্ষণ সদৃশ হায়! কেন প্রাণ নাহি যায়,
তাহলেতো সইতে হতো না এ যাতনা॥
দেখিয়া তোমার মৃত্যু জীবিত থাকিয়া॥

৫১

আজো তাঁর গুণে কাঁদে যতেক বাঙ্গালী।
স্মরি অকপট স্নেহ সৌজন্য তাঁহার।
অভাগীর ভাগ্যমন্দ, তবসঙ্গে করে দ্বন্দ,
দেশে গেলা আধিপত্য ত্যজি বাঙ্গালার॥
কে আর করিবে দয়া দেখিয়ে কাঙ্গালী?

৫২

হে দেবর গ্রে!* কত আশা ছিল মনে।
তোমার প্রসাদে সুখ ভুঞ্জন অপার।
নিয়ে ইন্দ্র কন্যাবান, করি বিদ্যা অধ্যয়ন,

---

* লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সাহেব।
* ঐ —

সুশিক্ষিত হয়ে শতশত পরিবার॥
ভারতীয় চরিতার্থ সাধিব যতনে॥

৫৩

সে আশা নিরাশা করি তুমি গেলা ঘর
ভ্রাতার সহিত ক্রোধ করি অভিমানে।
এবে এসে বাহুবলে, দলিয়া অরাতি দলে,
রাখিবে কে মম মান যবনের স্থানে॥
পেসিয়া দস্যুর দল তস্কর নিকর?

৫৪

হায়! যাঁর গরবেতে ছিনু গরবিনী?
অনুক্ষণ; এবে সেই করে অনাথিনী?
একাকী করিলা গতি, মম ভাগ্যে এ দুর্গতি,
রাজর মহিষী হয়ে হৈনু ভিখারিনী॥
দুহিতা যীতার মত; নিরাপরাধিনী॥

৫৫

বাণবিদ্ধ শশী খসি পড়িল যেমন।
জুড়াইতে জ্বালা মরি! সাগরের জলে।
তেম্নি পেড়ে তীব্রাঘাত, নেমে দাড়াইলা নাথ,
পশিতে মায়ের কোলে হায়রে সবলে
যেমন বালক ধায় পাইলে বেদন॥

৫৬

হরিতে পরের ধন তস্কর যেমতি।
যতনে গোপনে করে ভিত্তির ছেদন।
তেমতি যবনাধম, করিলরে পরাক্রম,
হরিল নাথের প্রাণ হয়ে সংগোপন॥
প্রখর আঘাত পৃষ্ঠে করি দ্রুতগতি॥

৫৭

কার না হৃদয়ে শুনি উপজিল দুখ।
নিবাইতে তাপ দিলা সিন্ধু মাঝে ঝাপ।
অসময় দেখি তায়, সাগর ত্যজিল তায়,
উদর ডগের বলে না গণিল পাপ॥
রক্ষিতে মাহার্ঘ রত্ন হইল বিমুখ॥

৫৮

হায় ! কি নিঠুর বিধি ওরে তোর ?
সামান্য ব্যাধের শরে শার্দ্দুল যেমন।
অকস্মাৎ ত্যেজে প্রাণ, তথা ত্যজিলেন প্রাণ,
ভারত নৃসিংহ, সিংহ যে জন সদৃশ
সামান্য বন্দির করে প্রাণ নাথ মোর ॥

৫৯

কহিতে সহিতে নারি, নারী হয়ে হায়
যেই সূর্য্যে করে জগত প্রচার।
যাঁহার সন্তোষ তরে, পদ্মিনী প্রকাশের সরে,
বিমল সুগন্ধ বায়ু বহে অনিবার।
আজ সেই হীনবীর্য্য মক্ষিকার যায় ॥

৬০

অয়ি নাথ ! এসময়ে এসে একবার।
বস হে হৃদয় পাশে (ধর্ম্মাধিকরণে)।
রাজ চিহ্ন ধরি শিরে, রক্ষা কর অধীনীরে,
রাখহ বিমল যশ দলি শত্রুগণে ॥
ন্যায় অনুসারে করি পালন প্রজার ॥

৬১

বধিয়া অগণ্য অরি নিরবধি যায়।
যতনে রেখেছ পদে, অমূল্য ভাবিয়া।
আজ কেন হে প্রবীন, ভেবে অতি মূল্যহীন,
ত্যজিয়া চলিলে তারে ; বল কারে দিয়া ?
এত যতনের ধন হায় ! হায় ! হায় !

৬২

হে আর্য্যে ভারতেশ্বরী ! একটি রতন।
দিয়াছিল স্নেহ করে কিন্তু অভাগিনী।
নিজ কর্ম্ম দোষে তাহা, হারাইল আহা আহা
দাসী হয়ে হল পদে চির কলঙ্কনী ॥
দুর্বৃত্ত যবন করে করে অযতন ॥

৬৩

হে কালি ! করালী কাল কাক সংহারিণি !
চিরকাল রক্ষা কৈলা দানব দলিয়া।
দুর্ম্মতি মোসলমান, এবে করে অপমান,

মা হয়ে কেমনে তাহা আছ গো সহিয়া?
দেখিয়া বিপদ মম শ্রীপাদ তারিনী॥

৬৪

একবার এ দাসীরে দয়া দৃষ্টে চাও।
পতি শোকাতুরা তব দুঃখিনী তনয়া।
ধরি করে খর খাণ্ডা, কর গো হৃদয় ঠাণ্ডা,
শত্রুর শোণিতে স্নাতা করিয়া অভয়া॥
এই ভিক্ষা মাগে দাসী; মোর মাথা খাও?

৬৫

(পতি শবদৃষ্ট)

মরি! মরি! একি! দেখি চমৎকার।
যার করে করে সুধাময় বসুধায়।
সে বিধু খদ্যোত করে, পড়ে আছে ধরা পরে,
গাঢ় আলিঙ্গন যেন, লভিতে বিদায়॥
চিরবিরহিনী করে দাসীরে এবার॥

৬৬

ছেড়ে নাহি দিব নাথ! কভু হে তোমায়।
রাখিব হৃদয় পাশে যতনে বান্ধিয়া।
প্রেমডুরি দিয়া পদে যাবে কি আমায় বধে,
নিতান্ত অধিনী তব দুখিনী ইণ্ডিয়া॥
কেমনে ত্যাজিবে বল, বল করিতায়?

৬৭

না না ওকি লেডিমেও সনে করি বাদ।
ত্যজিয়া পর্য্যান্তিক, মানে শায়িত হেথায়।
এ তব উচিত নয়, ক্ষমা কর মহাশয়,
নতুবা স্বপত্নী বলে হিংসিবে আমায়॥

কেন নিরুত্তর হলে চেয়ে দেখ নাথ!
তোমার এ দশা হেরে প্রিয় পুত্রগণ।
ব্যাকুল হইয়া তায়, সংঘতি কুরঙ্গ প্রায়,
করিতেছে আর্ত্তনাদ প্রতি নিকেতন॥
অকাল কুজ্ঝটি যেন কৈল বজ্রঘাত॥

৬৯

শান্ত কর তাহাদের শোকাকুল চিত।
প্রদানিয়া বাক্যশুধা ; কে নহে কঠিন ?
করেছি কি পদে দোষ, তাই এত হল রোষ,
পিতা হয়ে কৃপণতা স্নেহে চিরদিন ?
সন্ততির প্রতি তব এ নহে উচিত ?

৭০

না হয় দাসীই যেন দোষী পদতলে।
কিন্তু তব প্রণয়িনী লেডিমেয়ো সতী।
জীবন যৌবন মন, না করিয়া সমর্পণ,
হল তব সহচরী, হয়ে তারে পতি॥
কি বলে রাখিয়া গেল এদূর অঞ্চলে ?

৭১

হের তার মুখকান্তি, হয়েছে মলিন।
হেমন্ত নলিনী সম, করি অনুমান।
হায় ! যেই বিধুমুখী, ছিল তব সুখে সুখী,
আজ তার দুখে দুখি নাহি কি বিধান॥
উচিত তোমার হওয়া বল হে স্বামিন্ !

৭২

ভেবেছিনু যত দিন রবে তব শব।
হৃদি পর্য্যতিকা পরি রাখি সযতনে।
সেবিব ও রাঙ্গা পাদ, দিদী তায় করি বাদ,
লভিয়া চলিলা তোমা ইংলন্ড ভবনে॥
কেমনে থাকিব সয়ে বিরহে বল্লভ ?

৭৩

অতএব তব পদে মম এ মিনতি।
অভাগীরে রেখো মনে যেয়ে নিত্য ধান।
পরনেশ পদতলে, বাস করি কুতূহলে,
নিবেদিও তাঁর ঠাঁই মম এদুর্গতি॥
যেমন অচিরে দাসী হয় পূর্ণ কাম ?***

৭৪

মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ } বশংবদ শ্রীজগজ্জচ্চন্দ্র বসু।

জনৈক ভাবুক পর্যটকদের উক্তি [ কবিতা ], দুটি, প্রাপ্তিস্বীকার

## মিত্রপ্রকাশ পত্রিকার গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন।

দৈব্য দুর্ঘটনা ও নানা কারণবশতঃ আমাদিগের প্রাচর্য্যমান মিত্রপ্রকাশ নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না। তজ্জন্য নিতান্ত কুণ্ঠিত থাকিতে হইয়াছে। এইক্ষণ যাহাতে রীতিমত প্রচার হইতে পারে তদর্থ বিশেষ যত্ন পাইব। আমরা ৩য় সংখ্যা মিত্রপ্রকাশে যে, মিত্রপ্রকাশকে ৪ ফর্ম্মা আকারে মাসে দুইবার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইয়াছিলাম, এই ক্ষণ তাহা রহিত করিয়া পূর্ব্বে নিয়মানুসারে মাসে২ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

পরন্তু এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, এই মিত্রপ্রকাশ প্রচারিত হইলে পর যে সকল গ্রাহকমহোদয়গণ পত্রিকা গ্রহণ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা এইক্ষণ আর উপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিবেন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য গ্রাহক দত্ত মূল্যই পত্রিকার জীবন।

শ্রীকালিদাস মিত্র

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে পুটিয়া বাসিনী ধর্ম্মশীলা, দয়াশীলা, শ্রীযুক্তরাণী শরৎ সুন্দরী দেবী মহোদয়া কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচিত প্রহ্লাদ নাটক, ও নির্ব্বাসিতাসীতা উপহার প্রাপ্ত হইয়া মৃত কবির সাহায্যার্থ ত্রিংশত মুদ্রা প্রদানে যৎপরোনাস্তি উপকৃত করিয়াছেন, তজ্জন্য রাজ্ঞী মহানুভাবার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

## বিজ্ঞাপন

আমাদিগের যন্ত্রে যে সংস্কৃত পত্রিকা প্রচারের প্রস্তাব ছিল তাহা বিগত মার্চ্চ মাস হইতে "সংস্কৃত সঞ্জিবনী" নামে পাক্ষিকরূপে প্রচারিত হইতেছে। আয়তন ৪ পেজী আকারে দুই ফর্ম্মা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহিত ৩ টাকা। আমাদিগের গ্রাহক মহোদয়গণ প্রতি বিজ্ঞাপ্য এই যে, তাঁহাদিগের সংস্কৃত গ্রহণেচ্ছা থাকিলে ত্বরায় জ্ঞাপন করেন।

•

## বিজ্ঞাপন

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচিত নানাবিষয়িণী কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া পুস্তকারে মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।

## বিজ্ঞাপন
## গীতাবলী

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচিত নানাবিষয়িণী গীত সকল সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।

## বিজ্ঞাপন

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্রের জীবনচরিত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াসবান হইলাম। যত শীঘ্র প্রচার হইতে পারে তদর্থ বিশেষ যত্ন পাইব।

ঢাকা বাবুবাজার<br>গিরিশ যন্ত্র } শ্রীদীনবন্ধু সেন।

## মিত্রপ্রকাশের মূল্য প্রাপ্তি
## সন ১২৭৮ সালের--

| | | |
|---|---|---|
| রাণী শরৎসুন্দী দেবী | ৫ | পুটিয়া |
| কৃষ্ণনাথ চন্দ | ৫ | শিরাজগঞ্জ |

১২৭৯ শালের---

| | | |
|---|---|---|
| রাণী শরৎসুন্দরী দেবী | ৫ | পুটিয়া |

### ২/৭ আশ্বিন, ১২৭৮

স্তোত্র, লঙ্কাধিপতি রাবণের প্রতি রক্ষোরাজ মহিসী মন্দোদরীর বিষয় উক্তি, হিতকথা, বিরল বন্ধু, মনোদূত, বঙ্গেশ-রহস্য, কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্রের রচিত গীতাবলী, বঙ্গবধূ, বর্ষাবর্ণন, আষাঢ়ী নিশীথ, বয়না শাসন, রসনা প্রাণের খেদ, হৃদয়ের প্রতি ভালবাসা, চিন্তা, প্রেম

**পতিপ্রেম চির-বিরহিনী কোন কুলীন ব্রাহ্মণপত্নী তাহার দুরদেশস্থ পতির নিকট পত্র লিখিতেছেন**

"কি বলিয়ে আমি তোমায় করি সম্বোধন?"
ও হে দূর দেশ জাত ব্রাহ্মণ তনয়
বসি দূরে এ বিরলে, ভাসি নয়নের জলে,
আজি এ দারুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসে হৃদয়,
কি বলিয়ে তায় আমি করিব সান্ত্বন?

সুর-বালাগ্লানি রূপে রমনী নিকরে
সদা তুমি কর কেলি, লইয়ে চৌপাশে,
যথা তারাগণ সঙ্গে, নিশানাথ নানারঙ্গে,
করে ক্রীড়া মনঃ সুখে সুদুর আকাশে ;
[illegible] পরে হায়, থাকে সরোবরে।

যদিও মজেছে চন্দ্র তারাবলী সনে
কুমুদিনী সতী তায় নহে বিষাদিতা,

পতির উদয়ে ধনী, উল্লাস মনেতে গণি,
অমনি সাদরে, আহা, হয়ে প্রফুল্লিতা,
বল নাথ এই ভিক্ষা—"থাকিবেন মনে"
আমিও তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি
এই অভাগীরে যেন ভুলনা কখন,
চাই যবে এসংসারে, আপনা না দেখি কারে,
হৃদয়ে ভাবিছি তাই তোমার চরণ;
সংসার সাগরে মোর চরণ তরি।

নিত্য নিত্য নব-রসে প্রণয়িণীদল
তোষিছে তোমার মনঃ মধুর আলাপে
কি সম্পর্ক মোর সনে, ক্ষণ নাহি ভাব মনে,
আমি কাটি সদা কান, হায় রে বিলাপে।
অভাগীর এ জনম নিষ্ফল কেবল।

থাক তুমি ভাগ্যবান পত্নী ধন জনে
কাটাই জীবন আমি বিধবার প্রায়
দেখ তুমি পুত্র-মুখ ভুলেছ সকল দুঃখ
আমি কভু শুনিব না; মা শব্দ ধরায়
বিলুপ্ত হইবে নাথ জীবনের সনে।
না জানে পুরুষ হায় অবলার মন
তাই তারা অনাদর করে অবলায়,
নির্দ্দয় পুরুষগণ, করে সদা জ্বালাতন,
অবলা তবুও, আহা, তার গুণ গায়
পতির চরণ ছাড়ি না টলে নয়ন।

ত্যজেছ আমারে তুমি মনে নাহি গণি,
অদৃষ্ট লঙ্ঘিয়া বল কেবা কোথা যায়;
বল শুনি একবার, ইচ্ছি যাহা শুনিবার,—
কোন দোষে নাথ তুমি ত্যজিলে আমায়?
ইহাই শুনিতে আমি ধরেছি লেখনী।

নাহি হেন কোন গুণয় দেহ-গঠনে
ভুলাই তোমার মনঃ কটাক্ষ সম্পাতে;
তাই যদি ভাবি দুখ, হয়ে মোরে পরাঙমুখ
ফেলিলে বিস্মৃতি হৃদে বিচ্ছেদ আঘাতে,
কারে দোষী আর, দোষ আপন প্রাক্তনে।

ধন-আশা তব নাথ, করিতে পূরণ
মোর ক্ষুদ্র ভাণ্ডারেতে নাহিক সম্বল

যদি এই ভাবি মনে, চির বিচ্ছেদের বনে
ত্যজিলে আমারে নাথ কি বলিব বল?
জানি আমি তুমি মম একমাত্র ধন

রূপ নাই শত বার নিন্দিব বিধিরে—
কেন সে কুরূপা করি সৃজিল আমায়,
নারী যদি ধন আসে, যায় তার স্বামী পাশে,
কিন্তু স্বামী ধন চেলে কার দ্বারে যায়?
এ উত্তর একবার দেও অভাগীরে।

ভ্রষ্টাবলি যদি তুমি ত্যজি থাক মোরে,
বিস্মরণ হও নাথ এ দারুণ কথা?
অসত্বীত্ব অপবাদে, এ পোড়া পরান কাঁদে
ছেদয়ে মরম, হৃদে পাই বড় ব্যথা
ফেলে দাও তাও ভাল সাগর বিঘোরে।

হায় রে কাগজে আর সরেনা লেখনী
নিস্তব্ধ হৃদয়ে ভাবি একথা অন্তরে,
সতী স্ত্রীর অপবাদ, হায় একি বিসংবাদ
একি লজ্জা! স্মরণেও কথা নাহি সরে,
ইচ্ছা হয় পশি গিয়ে বিদারি ধরণী।

কেন সাধে নাথ মোরে করিয়ে বরণ,
ফেলাইলে হেন রূপ অতল সাগরে?
এই বিষ যদি মনে, রেখেছিলে সংগোপনে,
কোন নাখায়ালে সেই বিবাহ বাসরে?
ঘুচে যেত সব জ্বালা জম্মের মতন।
ছিল যবে বাল্যকাল সুখের সময়,
সহি নাহি কোন জ্বালা, ভাবিনি কখন,
নির্ম্মল-হৃদয়—সরে, নৈরাশ-পবন-ভরে,
খেলে নাই আশা কভু মানসমোহন,
কাটায়েছি সমকাল হাস্য রস-ময়!

নাহি সে নির্ম্মল মন, কি বলিব হায়
বয়সের সঙ্গে তাহা হইয়াছে লয়,
শেষে সে নির্ম্মল সরে, রোপিনু আদর করে
প্রণয়-পঙ্কজ (কিন্তু প্রস্ফুটিত নয়)
ভুলিয়া, হায় রে, তার রূপের ছটায়,

উপস্থিত হইলাম ষোড়শ বৎসরে,
প্রকাশিল সে পঙ্কজ শতদল দলে,
কি জানি কাহার তরে, টলমল মধুভরে,
কোন মধুরকর যেন চুম্বে এ কমলে
এই ভাবি চিন্তা বড় হইল অন্তরে।

হেনকালে, দেখ নাথ, দৈব–পর–বশে,
হেরিলাম আমি তোমা অদূর প্রান্তরে,
গুণ গুণ রবে আসি, মিলিল আমাতে হাসি,
চুম্বিতে অধরের আহা দংশিলে অন্তরে।
ডুবাইয়া শতদলে অতল সরসে

কোথা সেই বাল্যকাল, যুবতী এখন
সহিলাম কত জ্বালা কে করে গণন?
মিলন–বিয়োগ দুখ, সংসারের কাল মুখ,
আর কিবা আছে জানি কপাল–লিখন।
এ জীবনে করিয়াছি দুঃখের তর্পণ।
শুন নাথ আর কিছু বলি চির তরে
জীবনের গতি কিছু স্থির কভু নয়,
পাব তব দরশন, এ আশা না করে মন।
এই মাত্র জানিবারে ব্যাকুল হৃদয়,
দাসী বলে স্থান মোরে দিবে কি অন্তরে?

দেও বা না দেও স্থান, কর বা কর নাম
জীবনের এই মোর শেষ সম্ভাষণ—
যদি কভু সাধি বাদ, করে থাকি অপরাধ
ক্ষম মোরে, এই মোর শেষে নিবেদন
লও নাথ দাসী, তোমা করিছে প্রণাম
(প্রাপ্ত।)

**কুলীন কুমারীর খেদ।**

হায় হায় হায়! খেদে প্রাণ যায়,
বলি কায় হায়! মনের দুঃখ।
কেন পোড়া প্রাণ নাহি বাহিরায়,
কেন এতক্ষণ ফাটে না বুক।

১

কেন পোড়া বিধি রমণী গড়িলি !
যদি গড়েছিলি কেনরে তায়,
পাপ ভরা এই বঙ্গে পাঠাইলি,
ছিল না কি স্থান আর ধরায়।

২

যদিবা বঙ্গেতে পাঠাইলি ধাতা,
কেন পাঠাইলি কুলীন ঘরে?
কি আর তোমায় কব মুণ্ড মাথা,
কহিতে বদনে কথা না সরে।

বটে সুদুর্ল্লভ মানব জনম
দ্বিজকুল-জন্ম দুর্ল্লভ অতি,
কুলীন ব্রাহ্মণ সব ****
আছে কে কোথায় এ বসুমতী?

৪

জন্ম জন্মান্তরে পুঞ্জ২ পাপ
পুঞ্জ২ আছে দুষ্কৃতি যার।
পুঞ্জ পুঞ্জ যার কর্ম্মের বিপাক,
কুলীনে কুমারী জনম তার !

৫

তার সম আর জনময় দুখিনী,
পাপিনী তাপিনী রমণী কুলে,
ধরেনা ধরেনা ধরেনা মেদিনী
বিধিও সৃজন করে না ভুলে

**বঙ্গীয় কুলীনাচার।**

একি ছার দেশীচার দুরাচারময়।
কুলীনের বহু বিয়ে ঘুচাবার নয়॥
প্রথমে করিয়ে তাঁরা জনম গ্রহণ।
বাল্যকাল খেলা করে করেন ক্ষেপণ॥

তার পরে যত হন বয়েসে প্রবীণ।
ততই বিয়ের ধুম বারে দিন দিন॥

কোথাও ঘটকসহ দেখা হলে পরে।
বলেন অমনি তারে অতি সমাদরে॥

ওগো মহাশয় কোথা করেন গমন।
আমি এক কথা বলি করুণ শ্রবন॥

বংশজের ঘর হবে দিতে থুতে ভাল।
কিছু হানি নাই যদি মেয়ে হয় কাল॥

এমন সম্বন্ধ এক করুন ত্বরায়।
বিয়ে হলে পাইবেন ঘট্‌কালি তায়॥

স্বকৃত ভঙ্গের বেটা বিষ্ণুর সন্তান।
আপনি জানেন আমি কি মত প্রধান॥

এই রূপে কূলাচার্য্য করিল গমন।
ক্রমশঃ করিল এক সম্বন্ধ ঘটন॥

সময় বুঝিয়া গিয়া কুলীন আলয়।
বিবাহের কথা তারে কহে সমুদয়॥

দিতে থুতে ভাল তারা চাটুতি চৈত্তল।
ছেলে পিলে নাই আর কন্যাটি কেবল॥

এত শুনি কুলীন হলেন হৃষ্টমন।
ত্বরা করে পত্র স্থির করিল তখন॥

শুভলগ্ন স্থির করে বিবাহ করিতে।
চলিলেন বুড়া বর কন্যার বাটীতে॥

বাসরের রাত্রি তথা করে অবস্থান।
পরদিন নিজালয়ে করেন প্রস্থান॥

ঘটকের কিছু দিয়ে করিয়া বিদায়।
বিবাহের চেষ্টা দেখিলেন পুনরায়॥

যাহা পান বিয়ে করে হাজার হাজার।
তাহাতেই চলে ডাইন হাতের ব্যাপার॥

গুরু যথা শিষ্যালয়ে বৎসরে বৎসরে।
আইসেন টাকা করি পাইবার তরে॥

সে রূপ জামাই বাবু শ্বশুর আলয়ে।
বৎসর বৎসর যান দাস সঙ্গে লয়ে॥

শ্বশুর তোষেন যদি বহু ধন দানে
তবে দুই চারি দিন থাকেন সেখানে॥

কিন্তু যদি শ্বশুর হয়েন অতি দীন।
সেই খানে আর না থাকেন একদিন॥

সরলা অবলাগণ জ্বালা সয় কত।
পতির বিরহনলে দহে অবিরত॥

কেহ থাকে আপন দুঃখের কথা ভুলে।
কুল কন্যা হয়ে কেহ কালী দেয় কুলে॥

তার পর গর্ব্ভ হয়ে হইলে সন্তান।
কুলীনের ছেলে বলে করে অভিমান॥

এই রূপে জন্ম লয়ে প্রধান কুলীন।
কুলীন না হয়ে হন কেবল কুলীন॥

আহারের নিয়ন্ত্রণ কভু হলে পরে।
টাকা পাইবার কথা তাড়াতাড়ি করে॥

টাকা কম হলে পরে রক্ষা নাহি আর।
তখনি চলেন ছেড়ে তাহার আগার॥

কুলমদে মত্ত রন সকল সময়।
পিতৃনাম জিজ্ঞাসিলে চক্ষু স্থির হয়॥

কুলীনের নিন্দা যদি করে কোন জন।
তবেই তাহার প্রতি ক্রোধ করে কন॥

তুই নীচ জাতি যায় খেলে তোর জল।
কেমনে আমার মান জানিবিরে বল॥

কথায় কথায় বল্লালের নাম লন।
এদিগেতো আছে কত রূপ ব্যবসায়।
এদের ব্যবসা হয় কেবল বিয়ায়॥

হইবে অনেক নারী স্বামী একজন।
কভু নয় ঈশ্বরের নিয়ম এমন॥

কুলীনেরা জানে না তো প্রণয় কেমন।
পশুর মতন তারা পশুর মতন॥

সতিনে সতিনে করে কলহ সদাই।
সুখ লেশ নাই তার সুখ লেশ নাই॥

সকলের ভালবাসা সমান না হয়।
কাজে কাজে কেহ দুঃখে কেহ সুখে রয়॥

যে প্রণয় সুধাময় সকল সময়।
ইহাদের পথে তাহা বিষ সম হয়॥

কখন হইলে কন্যা কুলীনের ঘরে।
তবে তার পিতা কেন্দে মরে একবারে॥

বলে কোথা হতে এলো এমন বালাই।
কেমনে বিবাহ দিব সদা ভাবি তাই॥

বিবাহেতে কত টাকা লাগিবে আমার।
এমেয়েতো মেয়ে নয় মস্তকের ভাব॥

সমঘর বিনা এরো বিবাহ না হয়।
অনূঢ়া হইয়া কন্যা চিরকাল রয়॥

সদা করে ব্যভিচার তাহারা সকল।
তাহাতে কি কুলে সুখে হয় হে উজ্জ্বল॥

কুলে কিছু খাট হয়ে যদি থাকে মান।
অপমানত হতে সেতো উত্তম বিধান॥

যে কুলীনে ব্যভিচার কথায় কথায়।
অকুলে ভাষায় তাহা কাজ নাই তায়॥

অজ্ঞান কুলীনদের প্রভুত্ব যেখানে।
কখন কি সুখ লেশ হয় সেই স্থানে॥

নারীদের অভিশাপ কুলীনের পাপ।
তাতেই হয়েছে এত ভারতের তাপ॥

কুলীনের বহু বিয়ে করিতে বারণ।
করিছেন কত চেষ্টা কত মহাজন॥

তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি রবে অনুক্ষণ।
সর্ব্বমুখে হবে তাঁর যশের কীর্ত্তন॥

করুণ হইয়া চেষ্টা করুন ইহার।
এরচেয়ে মহাকর্ম্ম, কিবা আছে তার॥

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)

**২/৮ কার্ত্তিক, ১২৭৮**
স্তোত্র

## "কবি।"

কোন গাঁজাখোর কহিয়াছিল "লোকে বলে রাজা হওয়া জন্মান্তরীণ বহু তপস্যার ফল সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। কিন্তু আমি দেখিতেছি, একটা পয়সা ব্যয় করিলেই মূহুর্ত্ত মধ্যে রাজ সুখ সম্ভোগ করা যায়। যখন গাঁজাতে দোম লাগাই, তখন আমিইবা কে এবং রাজা রামকৃষ্ণই বা কে?" আজি কালি তদ্রূপ যাঁহারা দুটি চরণ কবিতা লিখিতে পারেন, তাঁহারাই মনে করেন "আমরা কবি।" কেবল মনে করিয়াই যদি গাঁজাখোরের মত তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সেই কবিত্বশক্তি প্রকাশের জন্য এত ব্যস্ত যে, ছাই ভষ্ম কয়েকটি "মিল্‌তি পদ" (তৎসমুদায়কে আমরা কবিতা নাম দিয়া উহার অবমাননা করা বিবেচনা সিদ্ধ বোধ করি না) লিখিয়া প্রচার করেন, এবং লোকের বৃথা অর্থ ও সময় নাশ করিয়া প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা উক্ত লেখকদিগকে "কবি" নামে সম্মানিত করিবেন। উক্ত "ভারতীর বড় পুত্রেরা" যে কেবল লোকের অর্থনাশ করেন এরূপ নহে। প্রধানতম বিচারালয়ের অধিকাংশ নবউকীলের ন্যায় গাঁটের টাকা ভাঙ্গিয়া নাম জাঁকাতে চেষ্টা পান; কিন্তু লাভের মধ্যে ১০ টাকা ব্যয় করিয়া দশ পয়সা পাওয়াও সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এই "কবি" মহাশয়েরা কবিত্ব শক্তিকে যত সামান্য ও আয়াসলব্ধ মনে করেন ইহা তদ্রূপ নহে। আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইব কবিত্ব শক্তি কেমন সুদুর্লভা, কবি কিরূপ মহৎ ব্যক্তি, তাঁহার কার্য্য কি? এবং ক্ষমতা কত?

যাঁহারা মনে করেন ইচ্ছা হইলেই কবি হওয়া যায়, তাঁহাদের বিষম ভ্রম। চেষ্টা কি পরিশ্রম দ্বারা কবিত্ব শক্তি লাভ হয় না, ইহা সহজ দৈবশক্তি—ভাগ্যবান ব্যক্তিরা এই শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে "স্বর্গীয় জ্যোতি" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা যথার্থই ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ তাহার সন্দেহ নাই। তপন–লপন যেমন স্বয়ং ভানুকে আলোকিত করিয়া জগতের অন্ধকার হরণ করে, কবিত্ব শক্তি তেমনি কবির হৃদয় মন্দিরকে উজ্জ্বল করিয়া সমস্ত জগতকে আলোক মালায় ভূষিত করে। সূর্য্যালোক যেমন ধরণী হইতে রসাকর্ষণ পূর্ব্বক, তাহা ক্রমে বাষ্প মেঘ ও বৃষ্টিরূপে পরিণত করিয়া উদ্ভিজ্জাদিকে সতেজ ও পরিবর্দ্ধিত করে; কবিশক্তি তেমনি নিসর্গ হইতে ভাব সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত, শ্রেণীবদ্ধ ও সুসজ্জিত করিয়া মানবকুলকে বিমল আনন্দরসে আপ্লাবিত করে। সূর্য্যালোক যেমন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপর পতিত হইয়া, তত্তৎপদার্থের প্রকৃতি ও গুণানুসারে কখন পীত, কখন লোহিত, কখন হরিত প্রভৃতি নানারূপে বিভাসিত হয়; কবিশক্তি তেমনি পাত্র বিশেষে প্রতিফলিত হইয়া কখন শৃঙ্গার রসাত্মক কখন উপদেশগর্ভ, কখন ইষ্টার্থ বিশিষ্ট প্রভৃতি ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে এই দ্বিবিধ জ্যোতির সাদৃশ্য সত্ত্বেও ভানুরশ্মী কবিত্ব জ্যোতিঃ অপেক্ষা এক বিষয়ে নিকৃষ্ট। দিবাকরের কর যাহাতে পতিত হয়, তাহাকে আলোকিত করিয়া মানব–চক্ষের গোচরীভূত করে, কোথাও এনিয়মের অন্যথা নাই। কবিত্ব–জ্যোতিঃ তদ্রূপ নহে ইহা সকল পদার্থেই পতিত হয়, কিন্তু কোন পদার্থ ইহার প্রভাবে যার পর নাই প্রভাবশালী হয়, কোন পদার্থ ঘোরতমসাচ্ছন্ন হয়। অথচ এই অদ্ভুত জ্যোতির এমনি গুণ যে এই উভয়বিধ পদার্থই আমাদিগের নয়ন সমীপে জাজ্জল্যমান হইয়া প্রকাশ পায়। ঈদৃশ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির নামই কবি। অতএব যিনি

কবি বলিয়া আপনাকে মনে করেন, তিনি যেন একবার স্বীয় অন্তঃকরণের গূঢ়তম প্রদেশে দৃষ্টি করেন, এই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহাতে বিরাজ করে কি না? যিনি আপনার হৃদয়কে এই নরকুলাবাধ্য সর্ব্বজন বাঞ্ছনীয় বিমল জ্যোতিঃতে জ্যোতিষ্মান দেখিতে পান, তিনি যত্ন ও পরিশ্রম করুন, সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন। নতুবা কবি হওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এটা সহজ সম্পত্তি, যত্নায়ত্ত নহে। যাঁহার এই শক্তি মুকুলাকারে অপ্রকাশিত রহিয়াছে, যত্নের দ্বারা তিনি তাহা প্রস্ফুটিত করিতে সক্ষম, যাঁহার কবিত্ব-কুসুমের বৃন্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, তাঁহার পক্ষে কবি হওয়ার চেষ্টা কেবল—

"প্রাংশু লব্ধঃ ফলে মোহাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

ইংলণ্ডের কবিকুল চূড়ামণি[১] কহেন—

"উন্মাদ প্রেমিক কবি এই তিন জন,
অবশ্য অনেক অংশে সমতুল্য হন।
এত ভূত প্রেতগণ, দেখেন প্রথম জন,
তত প্রেত নরকে না ধরে।
দ্বিতীয় অপ্সরীজ্ঞান করে পিশাচীরে।
কিন্তু কবি শ্রেষ্ঠতম কল্পনার বলে,
করেন সৃজন নব স্বর্গ ধরাতলে।"

কবির দিব্য চক্ষু রস-মদে উন্মত্ত হইয়া স্বর্গমর্ত্ত্য, রসাতল ভুবনত্রয় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, কাল ত্রয়, যুগপৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পায়। কবি স্বীয় তেজিস্বসী-প্রতিভা বলে নিসর্গের প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক পদার্থে প্রবেশ করিতে সক্ষম। কবিত্ব শক্তিবিহীন হতভাগা ব্যক্তিরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে নিসর্গ নিহিত যে গূঢ় সম্পত্তি দর্শনে পরাঙ্মুখ ; তাহা হস্তামলকবৎ সব্বদা কবির করতলস্থিত। প্রকৃতি অন্যের নিকট পার্য্যমানে স্বীয় সম্পত্তি প্রদর্শনে সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা ও কৃপণ ; কবির নিকট নিসর্গ ভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বদা উদঘাটিত ; করিব "আবদার রক্ষা করিতেও প্রকৃতি সতী সেই অমূল্য রতন অকাতরে দান করেন। কবি প্রকৃতির গর্ভজাত প্রিয় সন্তান। কবি ভিন্ন কে সাহস করিয়া বলিতে পারে।

"আমি প্রকৃতির ধনে উত্তরাধিকারী;
এই ভূমণ্ডল মম—একমাত্র মম।"*

কবির মত মহীয়ান ব্যক্তি ধরাধামে কে আছে? ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করি আর কোন্ ব্যক্তি ত্রিলোকের সুখ সম্ভোগে সক্ষম? বলিতে কি কবির মত শ্রেষ্ঠ, সদাশয় উন্নতমনা ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। একজন কাব্যশাস্ত্র রসগ্রাহী প্রবীণ ব্যক্তি কহেন "যথার্থ কাব্য প্রিয় ব্যক্তি স্বীয় স্বাভাবিকী উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিচয়েব সহিত পদে দে সংগ্রাম না করিয়া হীনচেতা ও নীচাশয় হইতে পারে না।"* অপর এক স্থানে তিনি কহিয়াছেন কাব্য এক প্রকার ধর্ম্ম কবিগণ

১. সেক্সপীয়র
* গোল্ডস্মিথ
* বিচার্ডসন

সেই ধর্ম্মের যাজক। তাঁহারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির ঈশ্বরের কাছে আমাদিগকে লইয়া যান। এবং মনুষ্যকে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেন। "দ্বিতীয় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কহেন" আমি কখন কবিদিগকে লোভী বা নীচাশয় হইতে দেখি নাই। অনন্য সাধারণ চিত্ত প্রশস্ত্য কেবল কবিতেই দৃষ্ট হয়। এই গুণ কি স্বর্গের প্রতিরূপ নহে?*

কবি পার্থিব নশ্বর সুখের জন্য লালায়ীত নহেন। তিনি বিচিত্র হর্ম্ম্য, দেবভোগ্য খাদ্য, দুগ্ধ ফেন নিভ শয্যা, পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত, কানন, নদীতট, প্রভৃতিকে আপনার উৎকৃষ্ট আবাসরূপে নির্ব্বাচন করেন; বনজাত ফল মূল ও নির্ঝর নিসৃত বারি অধিক ভালবাসেন; পর্ব্বতের উপত্যকায় ভূরুহ গলিতে পত্র রচিত সয্যাতে শযন পূর্ব্বক অধিকতর তৃপ্তি বোধ করেন। সেই প্রদেশই তাঁহার প্রীতি প্রদ—

"যেখানে প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে।"

প্রকৃতি যেমন তাঁহার প্রতি প্রতিক্ষণ সদয়ী তিনিও প্রকৃতির প্রতি তদ্রূপ অনুরক্ত—তিনি স্নেহময়ী প্রকৃতিজননীর পরম মাতৃ-ভক্ত-পুত্র। তিনি দিবানিশি নিসর্গ গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন। সেই নৈসর্গিক ভাবরাশী সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্দারা স্বীয় চিত্রপটে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি চিত্র করেন। তদনন্তর ভাষা ভাণ্ডার অন্বেষণ পূর্ব্বক বিচিত্র বর্ণমালা লইযা সেই মূর্ত্তিটী লোক সমাজে প্রকাশ করেন। শুদ্ধ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি চিত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন না। তাহাকে নবরসে ও বিবিধালঙ্কারে ভূষিত করিয়া মনুজ নিচয়ের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করেন। তিনি যে সর্ব্বদা কেবল নূতন মূত্তি চিত্র করিয়াই অভিনত্বগুণে লোকের মন হরণ করিতে চেষ্টাপান এরূপ নহে। তিনি অতি পুরাতন নিয়ত লক্ষিত পদার্থ সকলে এরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করেন, যে তাহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্য। বয়লিউ কহিয়াছেন, "কেবল নূতন পদার্থ সৃষ্টি করা কবির কার্য্য নহে; যে সকল পদার্থ সচরাচর দেখা যায় যাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, তাহাতে মধুরত্ব মিশ্রিত করিয়া লোকের মন হরণ করাই কবির প্রধান কার্য্য।" কবির সৃষ্টি ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষাও অদ্ভূৎ।

বিরিঞ্চির সৃষ্টিতে একবিধ পদার্থ নিয়ত এক রূপ। কবির সৃষ্টি নিত্য নূতন। নৈসর্গিক অশ্বত্থ বৃক্ষ চিরদিনই একরূপ; কবি সেই বৃক্ষে রজত শাখা, কাঞ্চন পত্র, এবং মরকত ফল ধরাইতে পারেন। কবিতুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে নলিনী প্রস্ফূটিত করিতে পারেন; শীতকালে মলয়া নীল বহাইতে পারেন। কবির কল্পনা কাননে একত্রে ষড়ঋতু বিরাজ করে; কবি গজকুম্ভে মুক্তাব উৎপত্তি করিতে সক্ষমবিমানের রথ চালনায় সমর্থ। ইন্দ্রের অমরাবতী, বিষ্ণুর নন্দন কানন, শঙ্করের কৈলাস ধাম; বরুণের মাহেশ্বতী পুরী, অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান সৃজন করা কবির এক মুহুর্ত্তের কার্য্য। কবি কখনো আগ্নেয় গিরির অগ্নিময় গর্ভে প্রবেশ করিয়া দাহ্য পদার্থচয় দর্শন করেন, কখনো রত্নাকরের অতলস্পর্শ অম্বুরাশী ভেদ করিয়া মণিমুক্তা উত্তোলন করেন। কখন বিদ্যাধরী তূল্য রূপবতী কামিনীকে নরকনিবাসিনী পিশাচী করিতে পারেন, কখন কুরূপা কাফ্রি রমণীকে অপ্সরার রূপ লাবণ্যে ভূষিতা করিতে পারেন। কিছুই তাঁহার অসাধ্য নাই।

* ফেলথাস

দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় প্রজাপীড়ক নরপতিকে কে শান্ত, সদয়, প্রজারঞ্জক করে? কে রণ-বিমুখ ভীরু ব্যক্তিদিগকে সমরানলে প্রাণহুতি প্রদান করিতে আহব-ক্ষেত্রে প্রেরণ করে? কে সদ্য-মৃত উপযুক্ত পুত্র শোকাতুরা উন্মাদিনী জননী ও কান্ত-বিরহ-বিধুরা রমণীর অশ্রু বিমোচনে সক্ষম? কে একান্ত ব্যয়কুণ্ঠ ধন-পীশাচ কৃপণদিগকে দরিদ্রদিগের দারিদ্র দুঃখ দুরীকরণে প্রবৃত্তি দেয়? কে বিপদে মূহ্যমান সংসার বিরাগী আত্মহত্যা প্রাণোদিত হতভাগ্যদিগের মনে আশার সঞ্চার করিয়া মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত করে; কে ধর্ম্মপথ স্খলিত কলুষ-পঙ্ক নিমগ্ন ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের পথে আনয়ন করে? কে নাবিক দিগকে প্রচণ্ড লহরী মালাসঙ্কুল ভীষণ অর্ণব পার হইতে উপদেশ দেয়? কে ভিক্ষুকের কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সুখময় অনুভব করায়? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিব "কবি,—ঈদৃশী ক্ষমতা এজগতে আর কাহারও নাই। এজন্যই প্রাচীনবুধগণ কহিয়াছেন—

"নরত্বৎ দুর্ল্লভলোকে বিদ্যাতত্র সুদূর্লভা,
কবিত্বৎ দুর্লভংতত্র, শক্তিস্ত্রত্র সুদুর্লভা"

মন্দোদরীর প্রতি দশাননের উক্তি, নদীয়া রাজপাট [ঐতিহাসিক প্রবন্ধ], বঙ্গেশরহস্য, ইতিকথা, কর্ণবধ-বীররস, রৌদ্ররস : গৌরাঙ্গসুন্দর রায়, বন্ধু-বিলাস : যাদবানন্দ রায়, কৌতুক-কথা, জন্মাষ্টমী : এ, নো, ভবার্ণব, পুস্তক প্রাপ্তি।

## ২/৯, কার্ত্তিক, ১২৭৯

যথার্থ সুখ (গদ্য), নাটক ও নাটকের অভিনয় [প্রবন্ধ], শারদর্পণ, কালোচিত বর্ণন, সাতকড়ির জীবনরহস্য, সংকীর্ত্তন সঙ্গীত, শ্রমতির দশমদশা, ৭ম ভক্ত-প্রহ্লাদ, ৮ম ভক্ত-কংশ, ভবসম্বন্ধ :

### শোক-গীত

ভারতি! ভাসিয়ে আঁজি নয়নের জলে,
প্রিয়পুত্র হরিশের মরণ সংবাদ,
গাইয়া করুণ স্বরে, ঘোষ মাগো ঘরে ঘরে,
জানাও বঙ্গীয় জনে দারুণ বিষাদ।
দহুক সবার হিয়া আজি শোকানলে,

১

যে আলোকে পূর্ব্ববঙ্গ ছিল আলোকিত,
কাল-প্রভঞ্জন তাহা করিল নির্ব্বাণ।
বঙ্গগৃহ অন্ধকার, চতুর্দ্দিক হাহাকাব.
অসময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ভানু অস্তমিত!
কেননা কাঁদিবে শোকে বঙ্গের সন্তান?

২

হারায়েছে পূর্ব্ববঙ্গ সুত প্রিয়তম,
হারায়েছে বঙ্গবাসী গৌরব-আস্পদ।

শুধু-মিত্র পরিবার, বহে না এশোক ভার,
পেয়েছে সমস্ত বঙ্গ এশোক বিষম।
প্রতি বঙ্গ-পরিবারে ঘটেছে বিপদ !

৩

"মোদের হরিশ কবি" আহা এ গৌরব,
কে হরিল ? কেমন নিষ্ঠুর হিয়া তার ?
বঙ্গের গৌরব-রবি, উজ্জ্বল হরিশ ছবি,
ঢাকিল প্রলয়মেঘে কৃতান্ত-বাসর।
না ঘুচিবে এজলদ এজনমে আর।

৪

বাল্যাবধি ভক্তিভাবে করিয়া যতন,
কবিতা দেবীর পদ হরিশ পূজিল।
হকামাত্র সুবিস্তার, কবি-কীর্ত্তি-কলিকার,
সুরভি তাঁহার কেন বৃক্ষের ছেদন ?
কেন কহ দণ্ড ?—বঙ্গ কি দোষ করিল ?

৫

কাব্যরত্ন পর্য্যটক বঙ্গ-সুতগণ
যে কাব্য তরুর তলে লইত আশ্রয়।
বিনাশ কুঠার ঘায়, ছেদিল কৃতান্ত তার,
হায় হায় অকাস্মাৎ একি বিড়ম্বন !
আশ্রয়-বিহীন এবে কাব্য পান্থ-চয় !

৬

হরিশ ! সোদরোপম বান্ধব রতন !
পীড়াতে আকুল হয়ে সর্ব্বদা কাতরে,
মিত্রপ্রকাশের তরে, নিয়ত লিখিতে মোরে,
সাহায্য করিতে ক্রটি করিনি কখন।
তবে কেন ভাই আর না লেখ এখন ?

কি ভ্রম ! এ অভাগারে কে লিখিবে আর ?
ছেড়েছে প্রাণের মিত্র স্বপ্নের মতন।
ঘটিয়াছে পরমাদ, গিয়াছে সকল সাধ,
আর না পাইব সুধাপূর্ণ পত্র তাঁর !
সে সুখের যবনিকা হয়েছে পতন !

৮

হায় দুর্ভাগিনি ! মিত্র হরিশ জননি,
রত্নগর্ভা হয়েছিলে প্রসবি যে নিধি,
কাল চোর সে রতনে, হরিয়াছে সংগোপনে,
কেন না নাশিল সেই শূন্য রত্ন খনি ?
ধিক ধিক ধিক তোর একিরে কুবিধি ?

৯

কিবলি প্রবোধ মাতঃ দিবগো তোমায় ?
কাঁদ কাঁদ কাঁদ সদা প্রিয় পুত্রশোকে।
দ্রবি যদি আর্ত্তস্বরে, কাল তোমা মনে করে,
এশোক ভুলিতে মাত্র সেই সে উপায়।
মরে নাই পাবে পুত্র পুনঃ পরলোক !

১০

কবিকীর্ত্তি বলে মাতঃ তোমার হরিশ,
বঙ্গভূমে চিরদিন রহিবে জীবিত
কীর্ত্তির্য্যস্য সজীবস্তি" মিথ্যা নহে এভারতী,
স্মরিবে তাহার নাম বঙ্গ অহর্ণিশ।
বিভূপাশে এবে তাঁর আত্মা বিরাজিত।

১১

হরিশের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সহোদর,
অহে আর্য্য কালিদাস ! সম্বর বিলাপ।
এস ভ্রান্ত চেষ্টা করি, রক্ষিবারে যদি পারি,
মিত্রের "মিত্রপ্রকাশ" কীর্ত্তি মনোহর,
ভুলিব নিশ্চয় ইথে মিত্রের সন্তাপ।

১২

যশোহর। শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।
কৌতুক-কণা।

**২/১০, মাঘ, ১২১৯**

**স্তোত্র**

## অমিত্রাক্ষর কবিতা বা পদ্য

প্রায় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল কবিবর মধুসূদন দত্ত মহাশয় অমিত্রাক্ষর পদ্যে প্রথমে তদীয় তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রণয়ন করেন। তৎপর দত্ত বাবুর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

মেঘনাদ-বধ-কাব্য প্রচারিত হয়। ইতি পূর্ব্বেও তিনি নাটকের মধ্যে অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু মেঘনাদবধ প্রচারাবধিই অমিত্রাক্ষর পদ্যের উপরে লোকের দৃষ্টি পতিত হয়। ক্রমে অনুকরণে প্রয়াসবান হইয়া অনেককেই অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে প্রথমে ঢাকাস্থ কবিতা কুসুমাবলী নামক পত্রে তোটক ছন্দে একটী ঈশ্বর স্তোত্র প্রকাশিত হয়। তৎপর "তপতী-উদ্বাহ কাব্য" এবং "পার্থজ-বধ কাব্য" প্রভৃতিতে এই রীতি অবলম্বিত হয়। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ও "লীলাবতী" নাটকে উহা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেন। ইহারা অমিত্রাক্ষরের প্রকৃতির আভাস মাত্র পাইয়াই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ তত দূরও যান নাই। তাঁহারা অমিত্রাক্ষর কবিতাকে চতুর্দ্দশাক্ষরী গদ্য ভাবিয়া উহা অকুতুভয়ে গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। আমাদের এই বাক্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল "সুশীলা বীর সিংহ" নাটক। উহার অমিত্রাক্ষর কবিতাগুলি পাঠ করিলে সুরসিক মিত্রজ মহাশয়ের "পদ্য কি গদ্য, কেবল চৌদ্দয় জানা যায়" এই বক্তৃতাংশই পাঠকের মনে উদিত হয়। যাহোক, কোন গ্রন্থের সমালোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমরা তাহাতে বিরত হইলাম। আমরা এস্থলে এই মাত্র বলিতেছি যে, এখন অনেকেই দত্তজের অনুকরণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, অমিত্রাক্ষর কবিতা অনেকের নিকট আদরণীয়ও হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু দুই চারিটী লোক ভিন্ন যে অমিত্রাক্ষর পদ্যের প্রকৃতি কেহ বুঝিয়াছেন, অধিকাংশ কবিতা দেখিয়াই আমাদের সে বিশ্বাস হয় না। প্রকৃতির কথা দূরে থাকুক, এখন পর্যন্ত "অমিত্রাক্ষর কি? বলিয়া ইংরেজি "ব্লাঙ্কভার্সের" অর্থ প্রকাশ করিতে হইবে, নির্ণীত হইল না। কেহ ইহাকে "অমিত্রাক্ষর কাব্য" ও কেহ বা "অমিত্রাক্ষর ছন্দ" নাম দিয়াছেন। কিন্তু ইহার একটী দ্বারাও উপরুক্ত ইংরেজী শব্দের অর্থ হয় না। অতএব আমরা ইহাকে "অমিত্রাক্ষর কবিতা" বা "অমিত্রাক্ষর পদ্য" নামে অভিহিত করিলাম। ইহাতে ইংরেজী শব্দের ভাব সম্যক্ প্রকাশ যদি নাও হইয়া থাকে, তথাপি "কাব্য" বা "ছন্দ" বলাতে যে দোষ স্পর্শে, তাহা ইহাতে নাই।

অমিত্রাক্ষরের প্রকৃতি প্রদর্শনই এই প্রস্তাবের মোক্ষ উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে আমরা যদি কয়েকটী কথা বলি, আর তাহাতে যদি কিছু নূতনত্ব থাকে তবে ভরসা করি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পাঠকেরা দোষ দিবেন না। মেঘনাদ বধের টীকা-কার কহিয়াছেন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রণালী উদ্ভাবনের যশঃ (মাইকেল ভিন্ন) আর কাহারই নয়।" এবং কেহ২ এরূপও বলিয়াছেন "মাইকেলই প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" কিন্তু আমরা যদি অমিত্রাক্ষর পদ্যের উদ্ভাবন যশঃ দত্ত বাবুকে সম্যক্ প্রদান না করি, বোধ করি তাহাতে কেহ আমাদিগকে মাইকেল বিদ্বেষী বলিবেন না। আমরা বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদিগের পদাবলীতে অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনার স্পষ্ট প্রয়াস দেখিতে পাই।

"নাহি উঠল তীরে,
রাই কমল মুখী,
সমুখে হেরল বরকান।
গুরুজন সঙ্গে,
লাজে নত মুখী ধনী,

কৈছনে হেরব বয়ান॥"
বিদ্যাপতি।
"কেবানিরমিল,

প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।"
চণ্ডীদাস।

"সেইযে অঙ্গেতে যোল
শৃঙ্গার যে শোভয়ে
তাহার শুনহ যোলনাম"
কৃষ্ণদাস।

আমরা যে তিনটী কবিতাংশ উদ্ধৃত করিলাম, বোধহয় তদ্বারাই আদি বাঙ্গলা কবিদিগের অমিত্রাক্ষর-পদ্য কাব্য রচনার প্রয়াস স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। এরূপ প্রয়াস তাঁহাদের স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং উক্ত ভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতাই অধিকাংশ। তবে যে অল্পমাত্র মিত্রাক্ষরের গন্ধ রাখিয়াছেন, সে তাঁহাদের দোষ নহে। যে দেশের লোকে সামান্য কথাতে মিলতি বলে, সেদেশে বিশুদ্ধ অমিত্রাক্ষর পদ্যকে ভালবাসিত? অতএব আদি কবিরা মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। — অর্থাৎ সমুদয় কবিতাগুলিকে মিত্রামিত্র উভয় অক্ষরাত্মক করিয়া রচনা করিয়াছেন। দত্তকবি সেই অস্পষ্ট ছাঁচ পাইয়া যে তাহা হইতে এরূপ চমৎকার ছবি তুলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট কারিগরি প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি পথ প্রদর্শক, তাঁহার আবিষ্কৃত পথ কন্টকময় হইলেও তিনিই যথার্থ প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র। যিনি পথ নিষ্কণ্টক ও প্রশস্ত করিয়াছেন তিনিও ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আবিষ্কর্ত্তার যশঃ বা প্রশংসা তাঁহাকে প্রদান করা যায় না। অতঃপর আমরা মোক্ষ উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনেকে মনে করেন অমিত্রাক্ষর-পদ্যে মিল নাই, সুতরাং উহা রচনা করাতে কোন কষ্ট নাই। এমন কি যখন মেঘনাদ বধকাব্য প্রথম প্রচারিত হইল, তখন অনেকে উহাকে কবিতা বলিয়াই গ্রাহ্য করেন নাই। কেহ কেহ বিদ্রূপচ্ছলে পত্রিকা বিশেষে চৌদ্দঅক্ষরী গদ্য লিখিয়া দেখাইয়াছিলেন, অমিত্রাক্ষর-পদ্য আর গদ্যেতে প্রভেদ নাই। প্রথম ভ্রমটী অনেকের নাই বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রমটী এখনও কাহার কাহার যায়নাই। অতএব আমরা প্রথমে এই ভ্রম নিরসনে প্রবৃত্ত হইলাম।

গদ্য হইতে পদ্যের ভাষা ও গ্রন্থন-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং অক্ষর সমান হইলে যে গদ্য পদ্য এক হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উভয়বিধ প্রার্থক্য প্রদর্শন করিতেছি।

গদ্যে যথা— কোথারাম রাজপদাভিষিক্ত হবেন
কোথা কৈকেয়ীর চক্রে বনে চলিলেন।

পদ্যে যথা— কোথারাম রাজপদে হবেন স্থাপতি
কোথা কৈকেয়ীর চক্রে চলিলেন বনে।

"রাজপদাভিষিক্ত" পদ গদ্যে সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু পদ্যে তাহা ব্যবহার করা কোনক্রমে সম্ভবে না। অতএব একভাষা উভয়ে খাটিলনা। দ্বিতীয় চরণে ভাষা একই আছে, কেবল গ্রন্থন-প্রণালী অনুসারে একটী গদ্য, আর একটী পদ্য হইল। সুতরাং অমিত্রাক্ষর পদ্য ও গদ্য যে একবস্তু নয় তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইল।

যদি কবিতা-রচনা সহজ-সাধ্য না হয়, তবে অমিত্রাক্ষর-পদ্য রচনাও সহজ নহে। কারণ কবিতা মিত্রাক্ষরই হউক বা অমিত্রাক্ষরই হউক যতি-বিভাগই উহার প্রাণ। মিত্রাক্ষরের যতি বিভাগে যত কষ্ট, মিল দেওয়া কোন ভাষাতেই ততকষ্ট নয়। বাঙ্গলা কবিতায় আরো কম—বাঙ্গালীর পক্ষে তদপেক্ষাও কম কষ্ট। বাঙ্গালীদের সামান্য কথায় মিল, যেমন "খেয়ে দেয়ে" "হেটে খেটে" ইত্যাদি। মেয়েরা যে সকল প্রবাদ বলে তাতে মিল। যখন যতি-বিভাগই কবিতারচনার কষ্ট-সাধ্য অংশ তখন উভয় বিধ কবিতাই তুল্য। ফলতঃ মিলতি ব্যতীত মিত্রাক্ষর কবিতায় যে যে উপকরণ আবশ্যক অমিত্রাক্ষরেও ঠিক তাহাই চাই। বরং এক বিষয়ে অমিত্রাক্ষর-কবিতা রচনাই অধিকতর কষ্টকর। মিত্রাক্ষরে শেষে মিল থাকাতে কোন কোন স্থলে যতি ভঙ্গ দোষ ও তত কানে লাগেনা ; কিন্তু অমিত্রাক্ষরের যতি বঙ্গ ঘটিলে সে আর পদ্য রহিলনা। —গদ্য হইয়া গেল।

মিত্রাক্ষরকে মাইকেল কবিতাদেবীর পদের "বড়ি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহা যথার্থই শৃঙ্খল তাহার সন্দেহ নাই। যে ভাবটী প্রকাশ করিতে বিংশতি বর্ণ লাগিবে, তাহার মিলের অনুরোধে চতুর্দ্দশ অক্ষরেই সমাপ্ত করিতে হইবে। ইহাতে সময়ে২ উপকার হয় বটে, কিন্তু অধিক সময়েই কবিকে ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। অভ্যাস বশতঃ ভাব সম্যক প্রকাশে ক্ষমতা জন্মিলেও মিলের অনুরোধে কবিকে যে একটুক ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা মেঘনাদ-বধ হইতে দুটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—স্বরীশ্বরী পৌলমী মেঘনাদের বিনাশার্থ ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

"দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে,
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণী।"

প্রথম চরণ অব্যাহত রাখিয়া মিত্রাক্ষর করিতে হইলে, এইরূপ, করিতে হইবে।

"দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, হরবরাঙ্গনে।"

এই পরিবর্ত্তন সামান্য চক্ষে দেখিলে, একটী বিশেষণের স্থানে আর একটী বিশেষণ হইয়াছে মাত্র, সুতরাং তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই এইরূপ বোধ হইতে পারে ; কিন্তু ঐ বিশেষণটীর পরিবর্ত্তনেই ঐ দুইটী চরণ শোভা হীন হইয়াছে। প্রথমে "কলঙ্ক" ও "শশাঙ্ক" শব্দের অনুপ্রাসে যে একটুক মিষ্টতা ছিল তাহা দূর হইল। কিন্তু এ ত্রুটীও সামান্য। মেঘনাদ কর্ত্তৃক স্বামীর পরাজয় হওয়াতে যে শচী আপনাকে কলঙ্কিতা বোধ করিতেছিলেন, সেই কলঙ্ক অপনয়নের জন্য ভগবতীকে প্রার্থনা করিতেছেন। সুতরাং ভগবতী যে কলঙ্কনাশিনী একথা বলা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব "শশাঙ্ক ধারিণী" বিশেষণটী ব্যবহার দ্বারা দুইটী ভাব ব্যক্ত হইতেছে। প্রথমতঃ কলঙ্কী শশাঙ্ককে স্বীয় ললাটে আশ্রয় দান পূর্ব্বক, তুমি যে কলঙ্কিত ব্যক্তিদের একমাত্র শরণ্য, এই জানাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ তুমি আশ্রয় দিয়াছ বলিয়া

চন্দ্রের কলঙ্কী নাম দূর হইয়াছে, সুতরাং এ কলঙ্কিনীর কলঙ্ক নাশ তোমারই কার্য্য। কিন্তু "হরবরাঙ্গনে" বিশেষণটী মিলের পোষক ভিন্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক। আবার যদি দ্বিতীয় চরণটী অব্যাহত রাখিতে হয় তবে, এইরূপ করিতে হইবে।

"দেহ সীতানাথে পুনঃ জনক-নন্দিনী।"

"বৈদেহী" ও "বৈদেহী-রঞ্জনে" যে চমৎকারিত্ব; অর্থের ব্যাঘাত না হইলেও কি "জনক-নন্দিনী" ও "সীতানাথে" সেই সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে?

ভাবই কাব্যের প্রাণ। কিন্তু মিলের দিকে মন থাকাতে, ভাবের প্রতি লেখক সম্যক্ দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। মিত্রাক্ষরের এই একটী মহৎ দোষ। এই সকল কারণে অমিত্রাক্ষরের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য লেখককে যতি-বিভাগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জল স্রোতের ন্যায় যখন কবিতা সমানভাবে চলিয়া যাইবে, তখনই জানা গেল, যতি-বিভাগে দোষ স্পর্শে নাই। লেখকের কর্ণই তাহা বলিয়া দিবে। সুতরাং মিলান্বেষণের ন্যায় তত প্রয়াস পাইতে হইবে না। সম-অক্ষরাত্মক শব্দের পর সম-অক্ষরাত্মক শব্দ; এবং তদ্বিপরীত স্থলে অর্থাৎ বিষম-বর্ণাত্মক শব্দের পর বিষম-বর্ণাত্মক শব্দ ব্যবহার করিলেই যদি সুসঙ্গত হয়। অনেকে বলেন অমিত্রাক্ষরে এই নিয়মের অন্যথা হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু এই নিয়মানুসারে চলিলে রচনা যেরূপ সরস হইবে, পক্ষান্তরে সেরূপ কখনই হয় না। আমরা মেঘনাদবধ হইতেই উভয় বিধ উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের কথা সত্য কি না পাঠক বিচার করিয়া দেখুন—

"কে তোরা, এ নিশাকালে, আইলি মরিতে
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি,
থর থরি রক্ষো নাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন, প্রভু রঘুকুল মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ। সৌমিত্রী কেশরী।
শত শত বীর আর,—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।"

"একদা, বিধুবদনে, রাঘরের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে, দূর গুল্ম পাশে,
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোরনাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!"

প্রথম কবিতাংশে কেবল যে আমাদের প্রাগ্বর্ণিত নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে এরূপ নহে। আরও একটী সৌন্দর্য্য আছে অর্থাৎ—

"আপনি জাগেন প্রভু রঘুকুলমণি
সহ মিত্র বিভীষণ "

এখানে পর পংক্তির মধ্যভাগে ভাব সমাপ্তি হইয়াছে। এস্থলে উপরের পঁক্তির সহিত ঐ পদাংশের যেরূপ যতি মিল আছে; "সহমিত্র বিভীষণ" অংশের সহিত পঁক্তির অবশিষ্টাংশের

অর্থাৎ "সৌমিত্রী কেশরী"র সহিত তেমনি যতি মিল আছে। এই রূপ যতি মিলই আমাদের মতে অমিত্রাক্ষর পদ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় কবিতাংশটীর স্থানে২ এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে বোধ হয় দোষ শূন্য হইত। যদি কেহ বলেন যেরূপ আছে তাহাতেও দোষ নাই, সেটী তাঁহাদের ভ্রম। আমাদের কথিত পরিবর্ত্তন এই—

"একদিন, বিধুমুখি, রাঘবের সাথে
কাননে ভ্রমিতেছিনু, দূর গুল্ম পাশে
হরিণী চরিতে ছিল। —ইত্যাদি।"

মাত্রার হ্রস্বতা দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

মেঘনাদ-বধ সমালোচক দত্ত বাবুর ভাষার কাঠিন্য পোষকতা পক্ষে বোধ হয় কহিয়াছেন সে, অমিত্রাক্ষর, পদ্যে কঠিন বা ওজঃশালী ভাষা ব্যবহার না করিলে চলে না। কিন্তু আমরা সে কথা স্বীকার করি না। ভাষা কবিতাদেবীর শরীর, ভাব তাঁহার প্রাণ। একজন তেজস্বী ব্যক্তির শরীর যেরূপ হওয়া চাই ললনার শরীর তদ্রূপ হইলে শোভা পাইবে কেন? ফলতঃ ভাবটীর প্রকৃতি যেরূপ ভাষাও তদ্রূপ চাই, মেঘনাদক বীর-রসাত্মক কাব্য রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ভাষা কাঠিন্য দোষণীর হয় নাই। কিন্তু তিনি যদি শৃঙ্গারসাত্মক কাব্যে ঐ রূপ ভাষা ব্যবহার কবিতেন, তবে কি কেহ তাহা পাঠ করিত? সরল ভাষায় যে মিষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য হইতে পারে, অমৃত বাজার পত্রিকার "হানিফ গাজি" প্রভৃতি বিবিধই তাহার প্রমাণ স্থল। অধিক কথায় কাজ কি? বীরাঙ্গনা পাঠকেরা ও পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অসারতা বুঝিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা রহস্য, বিলাপ তরঙ্গিনী, ১০ম ভক্ত দ্রৌপদী, উপাখ্যান [প্রবন্ধ]

## গ্রাম্যগীতি--বেলাড্

প্রত্যেক দেশের ভিক্ষুক, কৃষক, নাবিক, ও রাখালেরা যে সকল গীত গাইয়া থাকে তাহার নাম গ্রাম্যগীতি। এই সকল সঙ্গীত প্রায়শঃ নিরক্ষর অজ্ঞ অথচ স্বভাব-কবি বিরচিত। ইহাতে রচনা-পারিপাট্য তাদৃশ নাই; রাগ রাগিণী ও তালও ষৎসামান্য। কিন্তু এই গ্রাম্য রচনার মধ্যে মধ্যে সুন্দর ভাব ও বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তির আভাস পাওয়া যায়। পাঠক, যখন আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নৌকাযোগে মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন, তখন মলিন-বসন পরা কৃষকদিগকে এক হাটু জলে দাঁড়াইয়া ধান কাটিতে২ যে সামান্য গান করিতে শুনিয়াছেন, তাহাতে কি মন হরণ করে নাই? তখন কি কিঞ্চিৎ কাল নৌকা থামাইয়া সেই গ্রাম্য সঙ্গীত শুনিতে সাধ হয় নাই? আবার যখন চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে পদব্রজে দিবা-দ্বিপ্রহরের সময় গমন করিয়াছেন, তখন কি মাঠের প্রান্তস্থিত বৃক্ষতলে ছোট ছোট রাখালদিগের সমস্বরে গান শুনিয়া দণ্ডায়মান মন নাই? সেই ছেঁড়া নেকড়া পরিধান, গায় এক বুরূল পুরু ধুলা, মাথায় তালপাতার ছাতা, হাতে পাঁচন নড়ি, রাখালদিগের স্বাভাবিক স্বর শুনিয়া—সেই গ্রাম্য প্রেমের গ্রাম্য গীত শুনিয়া কি ক্ষণেক কালের জন্য পথ ক্লেশ বিস্মৃত হন নাই? পনুশ্চ যখন ভাঁটি নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মাঝি মাল্লার মনের সুখে উচ্চৈঃস্বরে "ভাটি নৌকা বেয়ে যাও, গাঙ্গের কুলে রেঁধে খাও" বলিয়া গান করিতে২ চলিয়াছে, তার প্রতি কি কান পাতিয়া থাকেন নাই? এবং ফকিরেরা যখন "ইয়ত আষাঢ় রে মাসে গগনে ঘন ডাক" ইত্যাদি গীতি সারিন্দার সঙ্গে গাইয়াছেন তখন কি

পাঠক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই "বারমেসে" শুনিতে বাড়ীর বাহির আসেন নাই? আমরা যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহাই এরূপ মন আকর্যণের কারণ। অন্যান্য দেশে এই সকল গ্রাম্য-গীতি নানা মাসিক পত্রাদিতে প্রথম সংগৃহীত হয়, পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া নানাদেশ ব্যাপক হয়। বঙ্গসমাজে এই সকল গীত বহুল পরিমাণে আছে, কিন্তু বোধহয় অনেকেই ইহার একটীও আদ্যোপান্ত জানেন না, অথচ সময়ে সময়ে অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই এই সকল স্বভাব-সঙ্গীত সংগ্রহে যত্নবান হন নাই। এই কারণে আমরা গ্রাম্য গীতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বোধ হয়, পাঠকবর্গকে মধ্যের ইহার এক একটী উপহার দিতে পারিব। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই আদি রস ঘটিত, অন্যান্য রসাত্মক গীতির সংখ্যা অত্যল্প। যাহৌক. আমরা প্রথম প্রকৃতির গীতিগুলির যে যে স্থল নিতান্ত অশ্লীল, তাহা পরিত্যাগ. বা পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমরা গ্রাম্য গীতি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম।

নিম্নলিখিত গীতিটী বিখ্যাত "তিতুমিরের লাড়াইর" পর, একজন কৃষক রচনা করে। ইহা পাঠ করিয়া, পাঠকেরা সন্তুষ্ট হন কি না জানিতে চাই। কিন্তু আমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, আমরা ক্রমে এই সকল গীতি সংগ্রহ করিতে পারিলে একদিন না একদিন সকল পাঠকের মন আকর্যণ করিতে পারিব।

১ম। গীতি।

"নারকেলবেড়ে তিতুমির বুজরগি করিল।
যত নেড়ে হৈল চেলা, বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
পাড় পেগম্বর মুরশিদ মোল্লা,
একত্র জুটিল॥
বড়ই বড়াই ভাইরে কল্য তিতুমির।
"গোলাগুলি খা ডালেঙ্গে" হইল জাহির।
কোম্পানির হুকুম ভারি, সিপাইতে কেল্লা ঘিরি,
কামানের ঘায় কেল্লা গেল,
ধরা পলো তিতুমির।
পালে পালে মারা পলো আর কত ফকির॥
তখন থানায় থনায় ফকির ধরার গেল পরোয়ানা।
ঘরে২ ফকির ভাইদের ভিক্ষা হৈল মানা।
কত কাছাখোলা নেড়ে, কাছা এটে দিল ফিরে,
গেরেস্ত হইল আবার ফকির বার আনা।
যার হায় হায় রে. হুক্কুক উঠল দাড়ি থাকলে.
ফাটকেতে যাবে।
তখন মাথা কুটে চাচী মরে.
চাচারা সব ভাবে॥
ফকিরনী উঠিয়া বলে উঠরে ফকির ঝাট।
নাপিত বাড়ী যেয়ে মিঞাগির লম্বা দাড়ি ছাট॥

তোবা খেচে কাছা দিয়ে,
গেরস্থালি কর আবার।
কোম্পানির হুকুম ভারি, দেশে রাকবে না দাড়ি,
জানবাচ্চার হাজ্রিদেরে,
গেড়ে ফেলাবে॥
মরি হায়, হায় ; হায় মরি হায়রে হায়।
জানাবাচ্চার হাজ্রিদেরে
গেড়ে ফেলাবে॥"

প্রাপ্ত [কবিতা], প্রেরিত পত্র, কৌতুক কথা

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবানন্দ রায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, মৎপ্রণীত "সীতানির্ব্বাসন" কাব্য নামক পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ১০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

জেলা ময়মনসিংহের অধীন সুসঙ্গদুর্গাপুরের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর মহোদয় "তূর্য্যতরঙ্গিনী" অর্থাৎ সেতার বাদ্য শিক্ষার একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহার একটী (গত) পাঠকগণের দৃষ্টার্থ প্রকাশ করিলাম।

**২/১১, ফাল্গুন, ১২৭৯**

অযোধ্যাকান্ত : হরিশ্চন্দ্র মিত্র, সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে [প্রবন্ধ], ভারত নলিনী, ভাবুক-বিলাপ, উযাঃহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, হেমন্তে কোন এক ভাবুক : দীনবন্ধু দাস, কৌতুক-কথা

## ২য় গ্রাম্যগীতি--বেলাড়

(গত প্রকাশিতের পর।)

নিম্নলিখিত গীতিটি পাঠ করিতে তত সরস হইবেনা। কিন্তু গাইতে শুনিলে চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়। ইহার ইতিহাসটিও অত্যন্ত শোচনীয়। নবাবগঞ্জ ষ্টেসনের অন্তর্গত দোহার গ্রামে জকি চৌধুরী নামে এক প্রসিদ্ধ ধনী মুসলমান ছিলেন। কুদরতুল্লা চৌধুরী তাঁহার একমাত্র পুত্র। ইহাকে সাধারণতঃ সকলে কোকামিঞা বলিয়া ডাকিত। কোকামিঞা যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। পরনারী হরণ পরস্বাপহরণ প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া তাহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিল। অধর্ম্মের জয় কতকাল? একদা কোকামিয়া চাচা সম্পর্কীয় জয়পাড়া গ্রামের কোন এক মিয়াকে কয়েদ করিয়া আনেন। উক্ত মিঞা কোন ক্রমে পলায়ন পূর্ব্বক, থানায় এজাহার দিয়া কোকামিয়াকে ধরাইয়া দেন। আজ ১০/১২ বৎসর হইল কোকামিঞা ফাটকে আছেন। তিনি যে কারা মুক্ত হইতে পারেন, এমন সম্ভাবনা বিরল। কথিত আছে যে নিম্নলিখিত গীতিটী কোকামিঞা স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং রচনাদৃষ্টে অতি ইতর লোকের রচনা বলিয়াই অনুমান হয়।

"সুখ নাইরে সুখ প্রাণের বৈরি,
সোণার অঙ্গে লোহার বেড়ি
জিলায় জিলায় ঘুরি॥
আমার সুখ নাই রে॥ ধ্রুং॥
ভাঙ্গ খেলেন ধুতুরা খেলেন, আরো খেলেন গাঁজা।
আমারে ফাটকে দিয়া চাচায় হৈল রাজা॥
আগে যদি জান্তেম চাচা তুমি দিবে সাক্ষি।
তরালে উড়াতেম গর্দ্দান নেছুড়া গঞ্জের বাটী॥
নাও কল্যেম ঘোড়া কল্যেম আরো কল্যেম গাড়ী।
কোন অভাগির ছেলে মেরে ফাটক খেটে মরি॥
পালে কিন্‌লেম বড় বলদ আরো দুধাল গাই।
বাড়ীতে থুইয়ে এলেম শিশু দুটী ভাই॥
বাড়ী কল্যেম ঘর কল্যেম না কল্যেম বসতি।
বিয়ে করে থুয়ে এলেম অবলা যুবতী॥
জলে কাঁদে পানীকাক ডেঙ্গায় কাঁদে শুক।
কোকামিঞার বিছানায় কাঁদে দোনালে বন্দুক॥
পড়ে কাঁদে হংস পাখী উড়ে কাঁদে টিয়া।
কোকামিঞার মায় কাঁদে শাণে পাছাড় খাইয়া॥
পাড়া কাঁদে পরশি কাঁদে বিলাপ করিয়ে।
কোকামিঞার বোনে কাঁদে চোখে রুমাল দিয়ে॥
মায়ে কাঁদে বাপু বাপু বোনে কাঁদে ভাই।
ঘরের রমণী কাঁদে আর লক্ষ্য নাই॥
কোকামিয়ার মায় কাঁদে হাতে লয়ে খৈ।
তোমরা সবে বাড়ী এলে আমার কোকা রলো কৈ?
আমার সুখ নাইরে॥

**২/১২, চৈত্র, ১২৭৯**

লঙ্কেশ বিজয় নাটক; বাঙ্গলা-ভাষার কি না বাপ আছে? [প্রবন্ধ], বাঙ্গলা রহস্য, বিলাপ তরঙ্গিনী, সুখান্বেষণা, ঋতুবর্ণনা; .. বসু, শীত : দীনবন্ধু দাস, বড়দিন, যৌতুক কথা

## নূতন পুস্তক প্রাপ্তি।

সেরপুরের বিবরণ। —ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী সেরপুর পরগণার অন্যতর ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় ইহার প্রণয়ন কর্ত্তা। এই পুস্তকখানি কলিকাতা স্কুল বুক যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা দর্শন করিয়া আমরা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এক আমাদিগের এতৎদ্দেশীয় আঢ্য জমিদার তনয়দিগের সুখ সেব্য বিলাশাদীর পরিবর্ত্তে শ্রম সাধ্য পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠীত ভূমিখণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহে এদেশীয় লোকের সুদৃঢ়ানুরাগ। বাবু হরচন্দ্র চৌধুরীতে এতদুভয়

গুণেরই সমাবেশ দেখিয়া আমাদিগের ন্যায় সকলেই সবিশেষ পরিতুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ হরচন্দ্র বাবু একজন অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী অধ্যবসায়শীল। এবং স্বদেশানুরাগী এই পুস্তক দ্বারা ইহার বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। সেরপুর পরগণার বিবরণ সংগ্রহার্থ যেরূপ অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন, হরচন্দ্র বাবু তাহাতে ত্রুটি করেন নাই, এ কারণ তিনি যথার্থ পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, গূঢ় বৃতান্ত সকল অবগত হইবার নিমিত্ত থাক বস্তু প্রভৃতির নক্‌সা এবং মোকদ্দমা ঘটিত কাগজপত্র সকল এত সংগ্রহ করা হইয়াছে যে, তাহার অবধি নাই, অবিরক্তি চিত্তে এরূপ কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকা সামান্য অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে, এই পুস্তকখানি সেরপুর বিবরণের প্রথম ভাগ মাত্র। ইহাতে সেরপুর পরগণার উত্তর সীমা গোয়াল পাড়া জেলার অন্তর্গত কড়ুই বাড়ী পরগণা ও পার পর্ব্বত প্রদেশ, পূর্ব্ব সীমানা ময়মনসিংহ জিলা সুসঙ্গ পরগণা, দক্ষিণ সীমা সুসঙ্গ আলাপসিংহ ও পুখরিয়া পরগণা এবং পশ্চিম সীমা পুখরিয়া ও রঙ্গপুর জিলার অধীন পাতি-আল্‌দহ পরগণা। এই পরগণার পরিমাণ ফল ৭৮৯২ বর্গমাইল, ইহাতে ৭৪৫ মৌজাও ন্যুনাধিক ১২৫০০০ লোক আছে উপপর্ব্বত ভিন্ন সমস্ত পরগণা সামান্যত। সমতলঃ তন্মধ্যে উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভাগ সবিশেষ উচ্চ, আর পূর্ব্ব দক্ষিণও পাহারের অধস্থল ভূভাগ নিম্ন, এই পরগণার পশ্চিমভাগ ও দক্ষিণভাগের কিয়দংশে ব্রহ্মপুত্র নদের চড়া ও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরগণায় বিস্তর নদ-নদী আছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ ক্ষুদ্র শ্রোতাহীন ও শুষ্ককার নদ নদীর ভিন্ন ইহাতে অনেকগুলি বিল আছে, এই পরগণা পর্ব্বত সন্নিহিত এবং সমুদ্র জলসীমা হইতে ন্যূনাধিক ৭০ ফুট উচ্চ বলিয়া এস্থানে দূর্ব্বিষহ শীতের অনুভব হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয়মাস পূর্ব্ব ও দক্ষিণাদিগের আর্দ্র বায়ু কার্ত্তিকাদি চারিমাস উত্তরদিগের বায়ু এবং ফাল্গুন চৈত্র দুইমাস পশ্চিমদিগের বায়ু বহে সচরাচর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে ঝড় হয়। জল কিছু ভারি, কোন কোন নদীর জল লঘু এখানে কার্ত্তিক অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ মাস শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে। জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ভয়ানক গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। এখানে শীতকালে পীড়া হয় না ; কিন্তু গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পাড়ার অত্যান্তিক প্রাদুর্ভাব হয়। গলগণ্ড, বসন্ত, বাতব্যাধি, দদ্রু, প্রভৃতি রোগই অধিক হয়, এই পরগণার আবাদি ভূমির পরিমাণ চারি আনা হইবে। এখানে ধান্যসর্ষপ, কৃষ্টতিল, অড়র, খেসারি, মসুর, কলাই, তামাক, পাট, কার্পাস প্রভৃতি অধিক পরিমাণে জন্মে, এই পরগণার তিরোভাগে পর্ব্বতশ্রেণী এবং মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার নদ নদী থাকাতে ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতি সুন্দর এখানে পাঁচ আনা হিন্দু সাত আনা মুসলমান এ-চারি আনা পাহারিয়া ও অসভ্য জাতির বাস।

এই পুস্তকখানি সেরপুর বিবরণের প্রথমখণ্ড মাত্র। ইহাতে কেবল সেরপুর পরগণার ভূবৃত্তান্ত এবং কোন২ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অপর খণ্ডে সবিস্তার ঐতিহাসিক প্রকাশিত হইবে। হরচন্দ্র বাবুর যেরূপ উৎসাহ অনুরাগ শ্রমশীলতা এবং অধ্যবসার লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে ভরসা করা যাইতে পারে ভবিষ্যৎ তাহার অভিলাষ সম্যকরূপেই সুসম্পাদিত হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও মহা কবি কালীদাসের জীবনচরিত প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামীতে আলোচ্য।

## উপসংহার

এতৎ পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র যেরূপ রুগ্ন অবস্থায় এই পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা স্থানীয় ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের অবিদিত নহে। দুর্ভাগ্য ক্রমে মদনুজ বিগত চৈত্র মাসে লোকান্তর গমন করিলে পর এতৎ পত্র প্রচারের ভার এ হতভাগ্যকে বহন করিতে হইয়াছে, কিন্তু এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়া প্রকৃত কবির–কবিত্ব লুপ্ত হয়—ভাবুকের ভাবনা সার হয়—রসিকের রসিকতা শুষ্ক হইয়া যায়, এ অবস্থায় যাঁহাদের রচনাশক্তি সামান্য, তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কি দশা প্রাপ্ত হয় তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। যদি আমাদিগের পাঠক এবং গ্রাহক গণের মধ্যে কেহ কখন ঈদৃশী অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তিনিই মনের ভাব অনুভব করিতে পারেন। অন্যের তাহা ভাবনার বিষয় নহে, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন শত্রুকেও এরূপ ভীষণ শোচণীয় অবস্থায় পাতিত না করেন। ইহলোক সম্বন্ধে যাঁহারা এই দুরবস্থার সময় নিস্বার্থ দয়া বিতরণ করিয়াছেন—অর্থ সাহায্য করিয়াছেন—সান্ত্বনা করিয়াছেন—তত্ত্ব লইয়াছেন—তাঁহাদিগের নিকট শত২ বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, তাঁহাদিগের গুণে অবশিষ্ট জীবন আবদ্ধ রহিলাম। বাধ্য রহিলাম। বিপদে যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে বন্ধু হন তাঁহারাই প্রকৃত বান্ধব, প্রাণ দিলেও তাঁহাদের সেই বন্ধুতার পুরস্কার হইতে পারে না।

গ্রাহক মহোদয়গণ। আপনাদের নিকটেও এতৎ পত্র সম্পাদক বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে, কারণ আপনারা পিতৃ দুঃখে দুঃখিত মিত্রপ্রকাশকে এই দুঃখের সময় স্নেহের সহিত,—অনুগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন,—পালন করিয়াছেন। এইক্ষণও যেন সেইরূপ অনুগ্রহ অব্যাহত থাকে।

এস্থলে এতৎ পত্রের সাহায্যকারী লেখক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মাহিগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু যাদবানন্দ রায়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইতেছি, ইহারা আমার এই শোচনীয় অবস্থার সময় লিপি সাহায্য করিয়া মিত্রপ্রকাশকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

উপসংহার সময়ে মঙ্গলালয় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে সকল দৈব দুর্ঘটনার এতৎ পত্র প্রচারের ত্রুটী ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে তিনি যেন তাহা আর না ঘটান বাঞ্ছিত বিষয় সম্পাদনে যেন সমর্থ হই।

## কবিতা আলোচনার আবশ্যকতা

বর্ত্তমান সময়ে অনেককেই কবিতার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের নিকট কবিতা পাঠের তুল্য অকিঞ্চিৎকর ও অফলোপধায়ক কার্য্য আর কিছুই নাই। তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে অথবা কোন প্রকার অলীক প্রমোদতরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দেওয়াও বরং শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, তথাপি কবিতা কমলের বিমলমকরন্দ পানে সার্দ্ধ পল ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। যদি কখন অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্বিরুদ্ধ মতানুসারী হইতে দেখেন. তবে তাহাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বিবেচনা করিয়া তদীয় প্রবৃত্তি শ্রোত রুদ্ধ করণে নানাবিধ যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ এরূপ ব্যক্ত করেন যে "একমাত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমালোচনাই মনুষ্যের পক্ষে মহোপকারিণী। বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমালোচনায় বুদ্ধির পরিপাক এবং চিত্তের সমুন্নতি হইয়া জগতের অংশের কল্যাণ সাধন হইতে পারে। সুতরাং মানব মাত্রের তা হাতেই

অনুরাগী হওয়া কর্ত্তব্য নিষ্ফল কবিতার প্রমোদে অনুরক্ত হইয়া বৃথা সময়াতিপাত করা উচিত নহে।"

এতদ্রূপ বক্তৃগণের বিবেক শক্তি যে এককালেই ভ্রম পরিশূন্য, আমরা তাহাতে নিঃসংশয়ে অঙ্গীকৃত হইতে পারি না। জগদীশ্বর মনুষ্যের মনে যেরূপ মহীয়সী বুদ্ধিবৃর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ দয়া, ধর্ম্ম, শোভানুভাবকতা প্রভৃতি কতকগুলি সৎপ্রবৃত্তিরও বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্য তৎসমুদায়েরই উন্নতি সাধন করিয়া সর্ব্ব প্রকার বিমলানন্দ সম্ভোগে সমর্থ হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমালোচনায় এই মহান অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি, বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনায় বুদ্ধি বৃত্তির ও সাংসারিক কার্য্যকলাপের মহোন্নতি সাধন হয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহাতে অন্যান্য বৃত্তি নিকরের পরিতৃপ্ত ও উপচীয়মানতা কদাচ সম্ভাব্য নহে। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্নতা সম্পাদনার্থ বিজ্ঞান বিদ্যায় যেরূপ আবশ্যক, অন্তঃকরণের ঔৎকর্ষ বর্দ্ধনার্থ সদ্ভাব ভূষণা কবিতা কলাপের চর্চ্চাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। অভ্রান্ত বিজ্ঞান বিদ্যার যেরূপ ব্যোম-বিহারী অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি তথা আকৃতি প্রকৃতির পরিজ্ঞান হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে উত্থিত হইতে থাকে, বিশুদ্ধ কবিতা পাঠে সেই প্রকার তাহাদের অনির্ব্বচনীয় নির্ধৃত সৌন্দর্য্য হৃদগত হইয়া মানসিক ঔদার্য্যের ক্রমোন্নতি সাধন হয়। এই নিমিত্তই বিধাতৃ পরমপুরুষ মনুষ্য মনকে অদ্ভুত কবিত্ব ব্যক্তি সম্পন্ন এবং বিশ্বকে তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাঁহারা কবিতার উপকারিত্বে সন্দেহ করেন, তাঁহারা কুসংস্কার পরিবর্জ্জিত এবং পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়া একবার জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করুন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন, এক কবিতা দ্বারা জগতের কত মহোপকার সাধন হইতে পারে। বিশুদ্ধ কবিতাকমল প্রসেকে প্রজ্জ্বলিত বহ্নি-কল্প কুপ্রবৃত্তির প্রশমন হইয়া সৎপ্রবৃত্তির অঙ্কুর নিচয় উত্তরোত্তর সতেজ হইয়া উঠে। কবিতা মনুষ্যের নিরয়তুল্য অন্তঃকরণ স্বর্গোপম পবিত্র ধাম করিতে সমর্থিনী। কবিতা জনসমাজের আবহমান কুরীতি পরম্পরা পরিবর্ত্ত করিয়া অশেষবিধ কল্যাণময়ী সুরীতি সংস্থাপন করিতে পারে। কবিতা দুর্দ্দান্ত স্বেচ্ছাচার ভূপালদিগকে সুধীর সচীবের ন্যায় সুপরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক সৎপথে আনয়ন এবং তদীয় দারুণ স্বেচ্ছাচারিত্ব হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষমা। কবিতাপরাধীন ভীরু প্রকৃতি মনুষ্যদিগকে অক্ষয় বীরকীর্ত্তি এবং স্বাধীনত্ব রূপ অমূল্য রত্ন লাভে অধিকারী করিতে পারে। এই কবিতাদেবীর উপাসনায় সিদ্ধকাম হইয়া কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, সেক্সপিয়ার, মিল্‌টন, হোমর, হাফেজ, তুলসীদাস, প্রভৃতি কবিকদম্ব জগতে অমরত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাদেবীর কৃপাতে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, আলেক্‌জণ্ডর প্রভৃতি অলৌকিক শৌর্য্য-বির্য্য-দয়া দাক্ষিণ্য সমন্বিত কত কত রাজগণ মানব মনে অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছেন। এইরূপ কবিতা জনসমাজের যেরূপ মহোপকারিণী, তদ্রূপ বিমল আনন্দ দায়িণী কবিতার উদারভাব রত্নাকরে নিমগ্ন হইলে যে কিরূপ স্বর্গীয় সুখরত্ন লব্ধ হয়, তাহা অনির্ব্বাচ্য। কবিতারূপ চিরপ্রফুল্ল অরবিন্দ যে কি অনুপম সুধারস পূর্ণ, তাহা তৎপ্রেমিক মধুব্রতেরাই জানিতে পারেন ; অন্যের জ্ঞাত হইবার সাধ্য নাই।

যিনি কখন কাব্য পাঠে কবিরমনঃ সম্ভূত কোন রসার্দ্র সুগম্ভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, তিনিই জানেন কবিতা কিরূপ আনন্দদায়িনী। যিনি কখন

কাব্যদর্পণে পূর্ব্বদৃষ্ট, অথচ বিস্মৃত প্রায় কোন সুরম্য শোভনতম পদার্থ বিশেষ প্রতিবিম্বিত দৃষ্টি করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, তিনিই জানেন কবিতা কিরূপ আনন্দদায়িণী। যিতি কাব্যপাঠে প্রাকৃতিক পদার্থ পুঞ্জে মানসোল্লাসিনী সৌন্দর্য্যচ্ছটার অনুপম মাধুরী অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জানেন কবিতা কিরূপ আনন্দ দায়িণী। যিনি কাব্য বিশেষে প্রভাত মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, তথা গ্রীষ্ম বসন্তাদি যড় ঋতুর অবিকল প্রতিকৃতি চিত্রিত দেখিতে পাইয়াছেন, তিনিই জানেন কবিতা কিরূপ আনন্দ দায়িণী। যিনি কাব্যসিন্ধু মন্থনে অমূল্য ধর্ম্মনীতি রত্নাবলী সংগ্রহ করত স্বকীয় হৃৎকণ্ঠ শোভমান করিতে পারিয়াছেন তিনিই জানেন কবিতা কিরূপ আনন্দ দায়িণী। যিনি কাব্যপাঠ করিতে করিতে সেই প্রেমময় পরম বন্ধুর পবিত্র প্রণায় পীযুষার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি জানেন কবিতা কিরূপ আনন্দদায়িণী। ফলতঃ কবিতার সুখোৎপাদিনী শক্তি বিচিত্র। যখন কোন ব্যাক্তি স্বকীয় একমাত্র প্রাণ প্রতিম তনয়ের বিয়োগ বেদনায় অভিভূত হয়, এবং যখন এই সংসারাশ্রমে তাহার নিকট দুঃখের আলয় স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, যখন জগত সংসারে একাধিপত্য প্রাপ্তির সুখময়ী বার্ত্তা ও তাহার মনস্তাপ হরণ করিতে পারে না। মনোমোহিনী কবিতা তৎকালে তা অন্তঃকরণে সুখ সঞ্চার ও বিষণ্ন বদন মণ্ডলে হাস্যছটা প্রকাশ করিতে পারে। কবিতার আর একটী চমৎকারিণী শক্তি এই যে, কোন প্রকার শোকদুঃখের কারণ বর্ত্তমান নাই, অথচ কবিতা পাঠে অন্তঃকরণে প্রগাঢ় শোক দুঃখের আবির্ভাব হয়, নয়নযুগল হইতে মুহুর্ম্মুহু অশ্রুপাত হইতে থাকে। কোন ভয়ের কারণ বর্ত্তমান নাই, অথচ কবিতা পাঠে মনো মধ্যে প্রগাঢ় ভয়-সঞ্চার হয়। কোন প্রকার ঘৃণার বর্ত্তমান নাই অথচ কবিতা পাঠে অন্তঃকরণে নিতান্ত ঘৃণোদয় হইতে থাকে। এইরূপে কবিতার উপকারিতা ও গুণ ব্যাখ্যা করিলে গ্রন্থ প্রমাণ হইয়া উঠে ; অতএব বাহুল্য ভয়ে আমরা লেখনীকে এস্থলেই বিশ্রাম দিলাম। যে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতেই কবিতা বিদ্বেষী জনগণের হৃদি মিশ্রিত ভ্রমের কথঞ্চিৎ নিরসন হইতে পারে।

কিন্তু কবিতা পাঠ প্রলভনীয় সমুদায় ফলবত্তা প্রলাভ করা যাইতে পারে, বঙ্গভাযায় এতদ্রূপ বিশুদ্ধ কাব্যের সংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষদূষিত তৎপাঠে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত প্রভূত অপকারেরই সম্ভাবনা। অতএব অধুনা দেশমধ্যে অভিনব বিশুদ্ধকাব্য কলা বিভাষিত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এই বাঞ্ছিত বিষয়ের সুসিদ্ধি সম্পাদনে আধুনিক বহুল মার্জ্জিত বুদ্ধি কোবিদগণ লেখনী ধারণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের পত্রিকাও তাঁহাদিগের সহকারিত সাধনোদ্দেশে বিকশিত হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার ঔৎকর্য সাধন এবং বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্যে। যদ্যপি আমরা এই মহান অভিপ্রায় সাধনক্ষম গুণ গ্রাম পরিবৃত না হই ; কিন্তু প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততাবলম্বন করিলে যে এক কালেই অকৃত কার্য্য হইব তাহাও নহে, অবশ্য উদ্দেশ্যের কথঞ্চিৎ সাফল্য হইতে পারে।

এক্ষণে আমরা সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ সমীপে, অতি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, "মনুষ্যমাত্রই ভ্রম-প্রমাদ জড়িত" এই বাক্যটি স্মৃতিপথারূঢ় রাখিয়া আপনারা আমাদের উত্তরকাল সম্ভাব্য ভ্রমপুঞ্জ পরিহার করিবেন।

# সেবক

**৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩০৩**

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, মৃত্যু, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রহ্মরমণীর পবিত্র বসন্তোৎসব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন, তিন ব্রহ্মসমাজে মৈত্রীস্থাপন,

## সংবাদ

উৎসব ! — ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপনের ৪৩ম ও ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ৪র্থ বাৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীমতে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৩ শে পৌষ—মন্দিরে প্রবেশের তারিখ। রাত্রিতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় আচার্য্যের কাজ করেন।

২৪ শে পৌষ—রাত্রিতে উপাসনা। শ্রীমতি সুশীলা বসু আচার্য্যের কাজ করেন।

২৫শে পৌষ—মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ। রাত্রিতে উপাসনা। বাবু বরদাকান্ত বসু বি, এ আচার্য্যের কাজ করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই— এই ইট কাঠ চুনের মন্দিরের পশ্চাতে ব্রাহ্ম সমাজরূপ জীবন্ত মন্দির চাই, তদভাবে কোনও কাজ হইবে না। এই জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মকে একদিকে উৎকট কর্ত্তৃত্বস্পৃহা অপরদিকে অতিরিক্ত বিনয় (যেজন্য কোনও কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা ও সহায় হয় না) পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় বিধাতার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে চালিত হইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

২৬শে পৌষ—ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের তারিখ। প্রাতে ও রাত্রিতে উপাসনা হয়। দুই বেলাই শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় আচার্য্যর কাজ করেন। প্রাতের উপদেশের মর্ম্ম এই যে "সকল মানুষই ধনী হইতে চায়, সুখী হইতে চায়। আমারও ধনী হইতে এবং সুখী হইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু প্রাণারামকে ভিন্ন আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার নয়। তিনিই আমাদের স্বসর্ব্বস্ব, তাঁহাকেই সমগ্র হৃদয় সহিত খুঁজিতে হইবে"। রাত্রির উপদেশের মর্ম্ম এই—"আমরা সর্ব্বদা ঘুমাইয়া থাকি কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলেন। কাযেই আমাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। সকল অবস্থায় তিনিই আমাদের রয়েছেন, ইহা আশার কথা।"

মাঘোৎসব।—ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তষষ্ঠীতম মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

৬ই মাঘ—রাত্রিতে—উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস। "আমার অনন্ত ক্ষুধা" বিষয়ে উপদেশ হয়।

৭ই মাঘ—রাত্রিতে—উপাসনা—। আচার্য্য—বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

৮ই মাঘ—প্রাতে—উপাসনা। শ্রীমতী সুশীলা বসু উপাসনার কাজ করেন।, রাত্রিতে—"ধর্ম্ম প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা বাবু বরদাকান্ত বসু বি, এ। বক্তৃতার সার কথা এই—"সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মের শিক্ষা এই পাপী পবিত্রাণের জন্য চেষ্টা করিলে, প্রভু পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার কৃপালাভ করিয়া পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু যে সকল পাপী তাঁহার শরণাপন্ন হয় না তাহাদের আর উদ্ধার হয় না। আর নবীন ধর্ম্মের, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শিক্ষা এই—পরমেশ্বরের প্রেম সকল পাপীর জন্যই আছে। যে চায় সে ত পাবেই যে না চায় সেও পাইবে। প্রত্যেক পাপীকে তিনি স্বয়ং উদ্ধার করিবেন, কেহই চিরকাল তরে পাপে পড়িয়া থাকিবে না।"

৯ই মাঘ—ছাত্রসমাজের উৎসব। প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। "জীবনের প্রধান লক্ষ্য" বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাহ্ন ২ ঘটিকা হইতে, প্রার্থনা, পাঠ, আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি। রাত্রিতে—ছাত্রসম্মিলন। প্রথম শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস একটী প্রার্থনা করেন এবং ছাত্রদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া কিছু উপদেশ প্রদান করেন। বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু এম. এ "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" হইতে "যুবৈব ধর্ম্মশীল : স্যাৎ" উপদেশটী পাঠ করেন। বাবু হরানন্দ গুপ্ত একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। শেষে বাবু বরদাকান্ত বসু ছাত্রদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া এদিনের কার্য্য শেষ করেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হয়।

১০ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস। তাঁহার উপদেশের ধর্ম্ম এই—"পরব্রহ্মের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই প্রাণে শান্তি পাওয়া যায় না এবং ধর্ম্মজীবন অগ্রসর হওয়া যায় না। এই কৃপা লাভের প্রধান অন্তরায় অহঙ্কার। প্রাণে অতি সামান্য অহঙ্কার লুক্কায়িত থাকিলেও এই কৃপা ধারণ করা যায় না"। অপরাহ্নে—রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব—বালকবালিকা সম্মিলন। বাবু হরকান্ত বসু বি, এ একটী প্রার্থনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর বাবু বরদাকান্ত বসু কিছু উপদেশ প্রদান করেন। বালক বালিকারা সঙ্গীত করে উপদেশের মর্ম্মানুযায়ী একটী সঙ্গীত ছিল। শেষে বালক বালিকাদিগকে মিঠাই ও কমলালেবু দেওয়া হয়। রাত্রিতে—উপাসনা। আচার্য্য—বাবু বরদাকান্ত বসু। পরদিনের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ প্রদান করেন।

১১ই মাঘ—উৎসবের প্রধান দিন। রাত্রি ৪$\frac{১}{২}$ টা। ৫টা হইতে অনেকে মন্দিরে মিলিত হইয়া সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। তৎপর উপাসনা। আচার্য্য—বাবু বরদাকান্ত বসু। ব্রাহ্মধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধন এক দিকে অতি সহজ করিলেও অপর দিকে যে অতি কঠিন করিয়াছে, ধর্ম্মজীবনের বস্তু বলিয়া প্রতিব্রাহ্মের জীবন গঠনে যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে সে বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাহ্নে—প্রথম উপাসনা। আচার্য্য—বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তৎপর ধ্যান ও সঙ্গীত, এইভাবে অনেক সময় কাটান হয়। ইহাতে যোগ উপলব্ধি করিবার বিশেষ সাহায্য হয়। তৎপর পাঠ, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। রাত্রিতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস। এই নবধর্ম্মের তেজ যে সকল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ইহা যে কালে সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে, সমস্ত ধর্ম্ম ইহাতে নিমজ্জিত হইবে, এবং প্রথমই ইহার শরণাপন্ন হওয়া যে সকলের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে উপদেশ হয়।

১২ই মাঘ—ভগিণীসমাজের উৎসব। অদ্যকার কার্য্যেও সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অন্নদাসুন্দরী বিশ্বাস উপাসনার কাজ করেন। তৎপর কিছু

সময় সঙ্গীতাদি হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরী চন্দ ও শ্রীযুক্ত মোক্ষদাসুন্দরী রক্ষিত প্রার্থনা করেন। তৎপর সৎগ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠ এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত। রাত্রিতে উপাসনা—শ্রীমতী সুশীলা বসু উপাসনার কাজ করেন। "ব্রাহ্মরমণীর পবিত্র বসন্তোৎসব" বিষয়ে একটী উপদেশ পাঠ করেন। পূর্ব্বনির্দ্ধারণ মতে আজই উৎসব শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এবারকার উৎসব বিশেষ ভাল হওয়াতে এবং মঙ্গলময় প্রণারামের করুণা বিশেষভাবে বর্ষিত হওয়াতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পরদিবস রাত্রিতে মিলিত হওয়া স্থির হয়।

১৩ই মাঘ—রাত্রিতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস ও বাবু বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলময়ের কৃপার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তৎপর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট তাঁহার কৃপা বিষয়ে নিজ নিজ জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করেন। শেষে উৎসবের ভাব স্থায়ী হওয়ার জন্য প্রার্থনা হয়।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ হইতে মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসরই দরিদ্র দিগকে চাউল পয়সা প্রভৃতি দান করা হয়। এবার উক্ত কার্য্য বিগত ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার দিন সম্পন্ন হইয়াছে। এবৎসর লোক অনেক বেশী হইয়াছিল। এজন্য ৫৪ টাকার কিছু বেশী ব্যয় হইয়াছে। অন্ধ এবং আতুরদিগকে বস্ত্র ও পয়সা প্রদান করা হইয়াছে। স্থানীয় ভদ্র মণ্ডলীর সাহায্যেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। তজ্জন্য ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

বেভারেণ্ড জেম্স্ হারউড।—ব্রিটিস এবং ফরেন্ ইউনিটেরিয়ান সভার প্রতিনিধি রেভা: শ্রীযুক্ত জেম্স্ হারউড্ বি, এ, বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ আগমণ করেন। উভয় সমাজস্থ ব্রাহ্মগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। ৬..ঘটিকার সময় সূর্য্যকান্ত হলে "ধর্ম্মনীতি ও বিজ্ঞান" বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় শিক্ষিত এবং পদস্থ ভদ্র লোক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মিউনিসিপালিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই বিশেষ প্রীতি হইয়াছেন। তৎপর স্টেসনে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে নিয়া এক আলোচনা সভা হয়। উভয় সমাজ মিলে মিশে যাহাতে কায করেন সে বিষয়ে আলোচনা হয়। শেষে তিনি একটী প্রার্থনা করেন। রাত্রির গাড়ীতে তিনি ঢাকা চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আলাপে সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। এরূপ সম্মিলন বড়ই উপকারী দুঃখের বিষয় তিনি আরও কিছু সময় এখানে থাকিতে পারিলেন না।

শ্রাদ্ধ।—বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কাওরাদি ব্রহ্মমন্দিরে তত্রত্য পরলোকগত ব্রাহ্ম ভ্রাতা বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রার্থনা করেন। পরলোকগত ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্রের জীবন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যে দিন হইতে তিনি জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ব্রহ্মোপাসনা করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের জ্যোতি: বিকীর্ণ হইতে থাকে। তিনি ভৃত্যের ন্যায় সকলের সেবা করিতেছেন, উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। অসময়ে এই উৎসাহশীল. ধর্ম্মানুরাগী যুবক পরলোক গমন করাতে কাওরাদির ধর্ম্মম গুলী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তি সুধাদানে পরিতৃপ্ত করুন।

**৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩০৩**

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, ব্রাহ্মকৃপা, ব্রাহ্মযোগ, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রহ্ম ও জগৎ,
পূঃবাঃ ব্রাঃসম্মিলনীর ৭ম বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম যান্মাষিক কার্য্য বিবরণ।

ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া সেই নিয়োজিত কার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন প্রেরিত-পুরুষ কি না এবং কি কার্য্য সম্পাদনে তিনি বিধাতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন তাহার বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু যখনই স্বীকৃত হইল যে তিনি প্রেরিত এবং কার্য্য বিশেষ জন্য তিনি নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তখনই স্বীকার করিতে হইবে যে সেই কার্য্য তাঁহাদ্বারা বিধাতা নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন করাইয়া লইয়াছেন।

শ্রী বি. রায়।

**পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর ৭ম বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১ম কার্য্য বিবরণ**

**পূর্ব্ববাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও প্রচার-ফাণ্ড।**—প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত সম্মিলনী মাসিক অন্যূন ১৭ টাকা আদায় করিতে সচেষ্ট হইবেন। তাহা আদায় না হইলে তাহার অকুলন ভাগ বাবু মথুরানাথ গুহ পূরণ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মথুরা বাবুর সহিত এবৎসর আমাদিগের উপরোক্ত বন্দোবস্ত হওয়াতে প্রচারফাণ্ডের চাঁদাদাতাগণের নিকট হইতে যথা সময়ে চাঁদা না পাওয়াতেও প্রচারকের ব্যয় মাসে মাসে চালাইবার জন্য আমাদিগকে এখন ঠেকিতে হইতেছে না। এবং বৎসর পূর্ণ হইলেও অকুলন টাকার জন্য ঠেকিতে হইবে না। কিন্তু মথুরা বাবুকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

গতবৎসর প্রচার ফাণ্ডের মাসিক চাঁদা ২১৸৹ আনা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল কিন্তু এবৎসর বহু চেষ্টা করিয়াও ১২৸৶ টাকার বেশি স্বাক্ষর পাওয়া যায় নাই।

আমরা আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে সন্দ্বীপের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র রায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একাকী দ্বিতীয় একজন প্রচারকের জন্য এক বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক ১৭ টাকা ব্যয় বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং বর্ত্তমান প্রচারকের জন্য তিনি ২০ টাকা এ বৎসরের জন্য অগ্রিম দান করিয়াছেন।

গত ৭ম বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সম্মিলনীর প্রচারকের পদে পুনঃ মনোনীত হয়। তিনি উক্ত বার্ষিক সভার পর কলিকাতায় গমন করিয়া ১০ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত তথায় বিশ্রাম করেন। পরে ১২ই অগ্রহায়ণ ঢাকায় আসিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রহায়ণ মাসের উৎসব উপলক্ষে ২৫শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ঢাকায় অবস্থিতি করেন ও উৎসবের কার্য্যে সাহায্য করেন। ইহা ভিন্ন বরিবারে মন্দিরে প্রাতঃকালের উপাসনাও করিয়াছেন। ২৭শে অগ্রহায়ণ হইতে ১১ই পৌষ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ, বজ্রযোগিনী, পঞ্চসার, বেত্কা, ছাতিয়ানতলী, আবিরপাড়া ইত্যাদি স্থানে উপাসনা, আলোচনা, উপদেশ এবং সঙ্গীতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ১২ই পৌষ হইতে ৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। পরে ৬ই ফাল্গুন ঢাকায় প্রত্যাগত হন। ঢাকা হইতে কাওরাদী গমন করেন। তথাকার মন্দিরে রবিবার সন্ধ্যাকালে উপাসনা করেন এবং প্রায় প্রতিদিন সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। একজন ব্রাহ্মবন্ধু পরলোক গমন করায় তাহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা করেন।

কাওরাদী হইতে নারায়ণগঞ্জের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে গমন করেন। তথায় একদিন অবস্থিতি করিয়া উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপর নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত এবং কাওরাদীস্থ কএকজন ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত একযোগে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারার্থ কাছার অঞ্চলাভিমুখে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয়কে সম্মিলনীর প্রচারকের পদে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। ভুবন বাবু প্রচারার্থে বৈশাখ মাসের মধ্য কি শেষ ভাগে আসিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

**অনাথ-ব্রাহ্ম-পরিবার-সংস্থান-ধনভাণ্ডার।**—কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত এই ভাণ্ডারে ১৭০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব স্বাক্ষরিত চাঁদা আদায় ৬৬ 'নগদ চাঁদা আদায় ১০৪, পূর্ব্ব তহবিল ২৩৫...সর্ব্বশুদ্ধ কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু লাহা মহাশয়ের হস্তে গচ্ছিত আছে। আদায়ের পরিমাণ গড়ে মাসিক ৩৪ টাকা। সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া অবশিষ্ট স্বাক্ষরিত চাঁদা আদায় করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ভাণ্ডারের উন্নতি কল্পে রীতিমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ ইহাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের একটী গুরুতর অভাব অপনোদিত হইবে আশা করা যায়। সর্ব্বস্থলের ব্রাহ্মগণই যখন এই ভাণ্ডারের সাহায্য পাইতে পারিবেন তখন সকল স্থল হইতে অর্থসংগৃহীত করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু সকলস্থলে এজন্য আশানুরূপ চেষ্টা করা হইতেছে না। ইতিমধ্যেই কলিকাতা হইতে কোন এক বন্ধু সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। ট্রষ্টডিডের নিয়ামানুসারে ভাণ্ডারের মূলধন ব্যয়িত হইতে পারিবে না, সুদ হইতেই সাহায্য প্রদত্ত হইবে। এপর্য্যন্ত যে সুদ পাওয়া যাইতেছে তদ্দরা কাহাকেও রীতিমত সাহায্য করা যাইতে পারে না বলিয়াই কমিটি দুঃখের সহিত উক্ত বন্ধুর আবেদন অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কমিটী আশা করেন যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাই এতদর্থে কিঞ্চিৎ ২ দান করিয়া ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি করিবেন। প্রত্যেক পারিবারিক অনুষ্ঠানে কিঞ্চৎ ২ অর্থ এতজ্জন্য রাখিয়া দিলে প্রতি বর্ষে বিলক্ষণ অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।

**ব্যয়-সঙ্কুলন-ধন-ভাণ্ডার।**—এ ফাণ্ডে মাসিক চাঁদার স্বাক্ষর পাওয়া যায় না। গত ৭ম বার্ষিক সভার ব্যয় বিশেষ চাঁদাদ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ঐ সময়ে বিশেষ চাঁদা ৬৬ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬২ টাকা আদায় হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা কয়টীও আদায়ের সম্ভাবনা আছে। গত বার্ষিক সভায় ৬৪৷৷০ ব্যয় হইয়াছে। আমরা দাতাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

**সেবক।** —গত বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় সেবকের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডি. এস্. সি মহাশয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত নবকুমার সমদ্দার মহাশয় সহকারী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেনেজার নিযুক্ত হন। গত কার্ত্তিক মাস হইতেই উপরোক্ত মহাশয়দিগের দ্বারা সেবক প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সেবকের যে গ্রাহক আছে তাঁহারা যদি সকলে স্ব স্ব দেয় মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ করিয়া দেন তাহা হইলেই সেবক চলিতে পারে। কিন্তু কিছুকাল যাবত বিশেষ চেষ্টা করা গিয়াছে তথাপি সেবকের বাকি মূল্য আদায় হইতেছে না। এজন্য ইহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে এবং ইহা প্রকাশেরও ফাণ্ড নাই। ভবিষ্যতে সেবককে অঋণী এবং

অন্যের গলগ্রহ না করিবার জন্য ভেলিউ পেএবল প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়। যাঁহারা সেবককে আপনার কাগজ মনে করেন তাঁহাদের নিকটও উপযুক্ত সতর্কতা নিয়া পত্রিকা প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্দ্ধেকের বেশী গ্রাহক পত্রিকা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা, সামাজিক আচার ব্যবহার, ব্রাহ্ম বিবাহ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে গত বার্ষিক সভা যে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার কোন কোন বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হাত দিয়াছেন এবং কোন ২ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত একবারেই হাত দিতে পারেন নাই। যে যে বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হাত দিয়াছেন ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধেও সভার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার আশা দেখা যাইতেছে না, কারণ মফঃস্বলস্থ বন্ধুদিগের নিকট যে সকল পত্রাদি লেখা গিয়াছে তাহার উত্তর অদ্য পর্য্যন্তও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তগত হইল না। মোট কথা ঢাকায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যে কয়জন সভ্য তাহারা এবং সম্মিলনী প্রচারক ভিন্ন আর সকলকেই সম্মিলনী সম্বন্ধে উদাসীন দেখা যায়। আমরা আশা করি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মফঃস্বলস্থ সভ্যগণ আমাদিগকে সম্মিলনীর মফঃসলস্থ বন্ধুদিগকে জাগ্রত রাখা সম্বন্ধে সহায়তা করিবেন।

## সপ্তম বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ষান্মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব
## [১৩০৩ সনের ফাল্গুন পর্য্যন্ত]

| আয় | | | ব্যয় |
|---|---|---|---|
| সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন | ৬২ [illegible] | সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন | ৬৪,৫ |
| অনাথ ব্রাহ্মপরিবার ধনভাণ্ডার | ১৭০, | অনাথ ধনভাণ্ডার, কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত | |
| প্রচার ফাণ্ড | ৯৮ [illegible] | | ১৭, |
| ব্যয় সংকুলান ধনভাণ্ডার | ৯, | প্রচার | ১০৬ |
| শশীবাবুর বিশেষ চাঁদা | ৪, | ক্ষুদ্রবায় | ৭/৫ |
| কাশীবাবু | ২৭৷৷০ | কাশীবাবু | ১৭ |
| বাবু মথুরানাথ গুহ | ৫০ | মোট আয় | ৬৬৪ [illegible] |
| গতসনের নগদ তহবিল | ২২ [অস্পষ্ট] | হস্তে স্থিত | ৫৭ [illegible] |
| মোট আয় | ৪২২.১৫ | মোট | ৪২২ ১৫ |

## সংবাদ

**ময়মনসিংহ ছাত্রসমাজ**।—এই ছাত্র সমাজে প্রতি রবিবার প্রাতে উপাসনা এবং মাসে দুই দিন আলোচনা আর দুই দিন পাঠ, ব্যাখ্যা, উপদেশ, বক্তৃতা প্রভৃতি হইয়া আসিতেছে। বিগত ৮ই চৈত্র তারিখ রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী অবলম্বনে এক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। অনেক ছাত্র বেশ উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগ দিতেছে। আশা করা যায় প্রভুর কৃপায় ছাত্রমণ্ডলীর কিছু উপকার হইবে।

বিগত ৩রা এপ্রিল (২২শে চৈত্র) শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ্র ছাত্রসমাজে "ধর্ম্ম ও নীতি" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অনেক ছাত্র বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল।

**নূতন প্রচারক নিয়োগ**—আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সম্মিলনীর পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত ডঃ বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, যদি দ্বিতীয় আর একজন প্রচারক পাওয়া যায় তবে, তিনি এক বৎসরকাল তাঁহার খরচ বাবত মাসিক ১৭ টাকা প্রদান করিবেন। পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় অল্প দিন হলো, সম্মিলনীর দ্বিতীয় প্রচারকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই পূর্ব্ব বঙ্গে আগমন করিবেন।

**উৎসব**।—নিম্নলিখিত প্রণালীতে নারায়ণগঞ্জের ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা—৭টা উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল (পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর প্রচারক)। ১৬ই শুক্রবার, সন্ধ্যা—সঙ্গীত ও উপাসনা। (আচার্য্য বাবু কুঞ্জবিহারী গুহ কলিকাতা সাধন আশ্রম)। ১৭ই শনিবার, অপরাহ্ন—বাহিরে প্রচার। (বক্তা বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং বাবু অমৃতলাল গুপ্ত)। ১৮ই রবিবার, প্রাতে—উপাসনা। (আচার্য্য বাবু অমৃতলাল গুপ্ত, কলিকাতা সাধন আশ্রম)। সন্ধ্যা—বক্তৃতা। (বক্তা বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল)। ১৯শে সোমবার, সন্ধ্যা—পারিবারিক উপাসনা। (আচার্য্য বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল)। ২০ শে মঙ্গলবার, সন্ধ্যা—পারিবারিক উপাসনা, সাধুচরিত বর্ণন ও সঙ্গীত। (বক্তা বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল)। ২১শে বুধবার, সন্ধ্যা—পারিবারিক উপাসনা। (আচার্য্য নববিধান সমাজের প্রচারক)। ২২শে বৃহস্পতিবার প্রাতে—কীর্ত্তন ও উপাসনা। (আচার্য্য নববিধান সমাজের প্রচারক)। অপরাহ্নে—৫টা হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা। ৭টায় উপাসনা। (আচার্য্য বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল)। ২৩শে শুক্রবার, প্রাতে—উষা কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। (আচার্য্য বাবু অভয়াচরণ দাস, নারায়ণগঞ্জ)। অপরাহ্ন—৫$\frac{1}{2}$ হইতে কীর্ত্তন, তৎপর বক্তৃতা। (বক্তা বাবু শরচ্চন্দ্র বসু বি এল. ঢাকা) ২৪শে শনিবার, প্রাতে—উষাকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। (আচার্য্য বাবু কামিনী কুমার ঘোষ, ঢাকা)। অপরাহ্নে—নগর কীর্ত্তন,

তৎপর বক্তৃতা। (বক্তা বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়—ঢাকা নববিধানসমাজের আচার্য্য)। ২৫শে রবিবার প্রাতে—উপাসনা। (আচার্য্য নববিধান সমাজের প্রচারক)। মধ্যাহ্নে—১ ১/২ হইতে সংক্ষিপ্ত মাধ্যাহ্নিক উপাসনা। ২ ১/২ হইতে পাঠ ব্যাখ্যা, উপদেশ, (বক্তা, ডাং পি, চাটার্জ্জি)। ৫ ১/২ কীর্ত্তন। ৭টা হইতে উপাসনা। (আচার্য্য বাবু ভুবন মোহন সেস, বি, এ. ঢাকা)।

**প্রচার বিবরণ**।—সম্মিলনী সম্মানিত প্রচারক শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল কাছার অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ঢাকাতে প্রতিগমন করিয়াছেন। এই প্রচারক দলে ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র আচার্য্য প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা অতি সংক্ষেপে ইহাদের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

প্রচারক দল গত ৬ই মার্চ্চ ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ হইতে কাছার অভিমুখে গমন করেন। ৯ই মার্চ্চ কাছারে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র দাস আসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ইহাদিগকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেন। তথায় ইহারা বাসায় বাসায় উপাসনা করিয়াছেন, "মানব জীবনের লক্ষ্য" এবং "মানব জীবনে ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতি" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা এবং সময় সময় ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছেন।

অনেক দিন হইতে কাছার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত খড়ের গৃহে উপাসনা হইতেছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের বিশেষ উদ্যোগে ১৪ই মার্চ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। দুইজন ধর্ম্মপিপাসু বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া অনেক দিন হইতেই প্রস্তুত হইতে ছিলেন। ইহাদের একজন শ্রীযুক্ত সারদাচরণ নন্দী। ইনি ডেপুটী কমিশনারের আদেশে উচ্চ শ্রেণীর আমলার কাজ করেন এবং অপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভদ্র। ইনি গবর্ণমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। উভয়ের নিবাসই কুমিল্লা। ভিত্তি স্থাপনের উপলক্ষে যে উৎসব হইবে, সেই দিন রাত্রিকালীন উপাসনার পরে দীক্ষা কার্য্য সম্পাদন হওয়া স্থির হয়। হিন্দু সমাজের দুই জন শিক্ষিত উচ্চবংশের লোক প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এই কথা সহরে প্রচারিত হওয়াতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। নগেন্দ্র বাবুকে লইয়া অত্যন্ত গোলমাল আরম্ভ হইল, কেন না তাঁহার আত্মীয় কেহ কেহ কাছারে বাস করেন। কিন্তু আত্মীয়গণের অশ্রুজল ভয় প্রদর্শন তিরস্কার প্রভৃতি কিছুতেই দীক্ষার্থী বিচলিত হইলেন না ; স্থিরভাবে দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

১৪ই মার্চ্চ রবিবার প্রাতে উপাসনা হয়, কাশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় প্রার্থনা করিয়া মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম, এবং মন্দির নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য, এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া একখানা সাময়িক সংবাদ পত্রসহ একটী বোতলের ভিতরে রাখিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া ভিত্তি স্থানে গাঁথিয়া দেওয়া হইল। এই কার্য্যে স্থানীয় অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত তত্ত্বকৌমুদী হইতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সন্ধ্যাকালে সংগীত সংকীর্ত্তনের পর উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনান্তে সাদরা বাবু দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় আচার্য্যের কাজ করেন। নগেন্দ্র বাবু আত্মীয়গণের উৎপীড়নে সেদিন দীক্ষিত হইতে পারিলেন না।

সহরের লোক এক দিকে, নগেন্দ্র বাবু একা এক দিকে। তাঁহার আত্মীয়গণ বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তুমি দীক্ষিত হইবে, হও ; তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে আমাদের একটী অনুরোধ এই যে, এখানে হইও না। কলিকাতা গিয়া দীক্ষিত হও।" এ সকল কৃপার নগেন্দ্র বাবুর উত্তরের মর্ম্ম এই,—দুইটী কারণে এখানেই দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য, প্রথমতঃ ভগবান আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, যদি আমি তাঁহার আদেশ পালন না করি তবে পতিত হইব। দ্বিতীয় এই জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতাময় কাছারে আর কেহই এপর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই, সুতরাং আমাকে এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। আমি যে স্থানে বাস করি, সে স্থানে হিন্দু সমাজের দুর্গ স্বরূপ, আমি যদি দীক্ষা গ্রহণ করি তবে সকলে দেখিতে পাইবে, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্গের মতো কিরূপে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়নিশান উড্ডীয়মান হইতেছে। তিনি দীক্ষা গ্রহণের জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

১৬ই মার্চ্চ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইল, কাশী বাবু আর্চায্যের কাজ করিলেন, এই শুভ মুহূর্ত্তে নগেন্দ্র বাবু দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আমরা এই দীক্ষিতদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণ কামনায় ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি, সারদা বাবু দীক্ষিত হইবেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার কুমিল্লাস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ এক দিন বিশেষ উপাসনা করিয়াছেন।

প্রচারকদল কাছারের কার্য্য সম্পাদন করিয়া ২৫ মার্চ্চ তথা হইতে করিমগঞ্জ গমন করেন। এই স্থানে আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু, শরচ্চন্দ্র মজুমদার আসিষ্টান্ট কমিশনার বাস করেন। ইঁহারা তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করেন। করিমগঞ্জে প্রথমত একটী বক্তৃতা হয়, তৎপর স্থানীয় লোকের আগ্রহে আর একটী বক্তৃতা হয়। সকলেই বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারাই যে আমাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ হইতে পারে, একথা অনেকই স্বীকার করিয়াছেন।

প্রচারক দল তথা হইতে ফেঞ্চুগঞ্জ গমন করেন, সেখানে উপাসনা ও উপদেশ হয়। তৎপর বিখ্যাত বিতলঙ্গের আখড়া দর্শন করিতে ইহারা বিতলঙ্গ গমন করেন। এই আখড়া একেশ্বরবাদী রামকৃষ্ণ দাস দ্বারা স্থাপিত। তিনি পরব্রহ্ম নাম সাধন করিয়াছিলেন। বিতলঙ্গ হইতে রওনা হইয়া ইহারা ৫ই এপ্রিল ঢাকাতে উপনীত হইয়াছেন।

### ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩০৪

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, পাপ, রামমোহান রায়ও সেমিনারি বাঁকিপুর,

## সংবাদ

**ব্রাহ্মছাত্রের পুনঃ প্রবেশলাভ**--কিছুদিন পূর্ব্বে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজবোর্ডিংএ এরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণ সেখানে থাকিবার অধিকার পাইত না। বলা বাহুল্য, হিন্দুদিগের আপত্তি অনুসারেই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এই নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি এই প্রথা রহিত হইয়াছে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সেনের একটী পুত্র শিবপুর কলেজবোর্ডিংএ থাকিবার অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এজন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

**সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনের প্রস্তাব**—এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে কলিকাতায় ব্রাহ্মসাধারণের নিকট বক্তৃতা করেন। তৎপর সেই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কোন কোন বিষয়ে নূতন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে গঠন করিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যুদনাথ চত্রবর্ত্তী, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সকল গুলিই আমরা পাঠ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদের বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, কিরূপে সমাজের কল্যাণসাধন হইতে পারে, গঠনপ্রণালী কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে আরও মঙ্গল হয়, তাহা অতি ধীরভাবে চিন্তা ও আলোচনা করা উচিত। হঠাৎ কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে হয় না। আর এসকল বিষয় সম্বন্ধে পরস্পর নিশ্চয়ই মতভেদ হইবে, তাহা যেন মনোবাদে না দাঁড়ায়, এই আমাদের প্রার্থনা।

**অধ্যবসায়ের ফল।**—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নাম আজ কাল অনেকেই অবগত আছেন। ইনি এখানে সামান্য ইংরাজি লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া শিক্ষকতা করিতেছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইহার প্রথম হইতেই অনুরাগ ছিল। কোন মাসিক পত্রিকাতে ইনি এখনও প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। সামান্য শিক্ষকতা করিয়া দু এক খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখেন, তাহাতে কিছু আয় হয়। অতিমিতব্যয়িতাগুণে তিনি সামান্য আয হইতে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু টাকা হইলে বিলাত চলিয়া যান। সেখানে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। অধ্যবসায়ের সুফল ফলিয়াছে। তিনি স্বীয় শোণিত বিনিময়ে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন , তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বেরেষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দৃঢ়তার অধ্যবসায় এবং কৃপণতাদোষপরিশূন্য মিতব্যয়িতাগুণেই ইনি এই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। পরমেশ্বর ইহার কল্যাণ সাধন করুন।

**হিতবাদী সম্পাদকের কারামুক্তি**—শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলী উপলক্ষে অনেক কারাবাসী মুক্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হিতবাদী সম্পাদককে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিবার জন্য মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এবং বেঙ্গলী সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গেশ্বর ছোটলাটকে অনুরোধ করেন। কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ছোটলাটের একজন সহকারী প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, মহারাণী ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলীতে অনেক লোক মুক্তিলাভ করিবে বটে ; কিন্তু যে ব্যক্তি কুলবালা সম্বন্ধে মিথ্যাকলঙ্ক রটনা করিয়াছে, এরূপ লোকের মুক্তিদান হইতে পারে না। তৎপর কর্ত্তৃপক্ষ বিশেযভাবে অনুরুদ্ধ হন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মত গ্রহণ করা হয়। তিনি হিতবাদী সম্পাদককে ক্ষমা করিবার জন্যই মত প্রকাশ করেন। ইহার পরে হিতবাদীসম্পাদক কারামুক্ত হইয়াছেন। আশা করি, সম্পাদক এখন হইতে সুপথে পরিচালিত হইবেন। মহিলাদিগকে জননী ও ভগিনী স্তানে সম্মান ও ভক্তি করিয়া কৃতার্থ হইবেন, ঈশ্বর তাঁহাকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

**ভূমিকম্পে ক্ষতি**—বিগত ১২ই জুনের ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। ব্রহ্মমন্দিরটা এরূপভাবে ফাটিয়া গিয়াছে যে, উহা সংস্কারের অযোগ্য

হইয়াছে। মন্দিরের জন্য এখনও সাত আট শত টাকা ধার রহিয়াছে। এই অবস্থায় ব্রহ্মমন্দির যে কি উপায়ে পুনর্নির্ম্মিত হইবে তাহা মঙ্গলময় বিধাতাই জানেন। সম্প্রতি সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য চলিতেছে।

**শোকসংবাদ**--আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহের পুত্র শ্রীমান হেমচন্দ্র গুহ হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ঢাকা নগরে পরলোক গমন করিয়াছেন! সে এই বারই বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তাহার আত্মীয় আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ লিখিয়াছেন, "হেমের দ্বারা আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত হইবে, এরূপ আশা ছিল। আমাদের পরিবারে অনেক ভাল ভাল ছেলে আছে : কিন্তু হেমের মত উৎসাহী, ধর্ম্মশীল যুবক আর আমাদের পরিবারে নাই।" * * "হেম এই অল্প বয়সে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিয়াও সুপুরুষের ন্যায় ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাহার জীবনে ধর্ম্মবলের দৃষ্টান্ত বেশ পাওয়া গিয়াছে।" ঈশ্বর তাহার শোকদগ্ধ পিতামাতার প্রাণে শান্তি দান করুন।

এবার ভূমিকম্পে খাসিয়া পাহাড়ের একজন তদ্দেশীয় প্রচারকভ্রাতা এবং সিলঙ্গের আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর একটা বালিকাকন্যা ঘর চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমরা এজন্য হৃদয়ের অভিবেদনা প্রকাশ করিতেছি। পরমেশ্বর তাহাদের আত্মাকে পুণ্য ক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং আত্মীয়দিগের প্রাণে শান্তি দান করুন।

**পূর্ব্ববঙ্গ ব্রহ্মমন্দির সংস্কার**--ভূমিকম্পে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির স্থানে স্থানে ধসিয়া পড়িয়াছে এবং অনেক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। মন্দির সংস্কারকার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট যে সকল চাঁদার টাকা বাকী পড়িয়াছে, সম্প্রতি তাহাই আদায় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। আশা করি, চাঁদাদাতাগণ অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেয় বাকী চাঁদার টাকা সত্বর প্রদান করিয়া উপকৃত করিবেন। এই অর্থেও মন্দিরসংস্কার ব্যয় সঙ্কুলন হইবে না বলিয়া বিশেষ দানই সংগৃহীত হইতেছে।

**বিবাহ**--সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ নেউগীর পুত্র শ্রীমান অমলাপ্রসাদ নেউগীর সহিত, ঢাকা নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী সুখদাসুন্দরীর শুভ বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মপদ্ধতি মত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহ ও আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। ঈশ্বর নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

**প্রচার**--সম্মিলনীর প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল ১লা জুন কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা গমন করেন। তৎপর ১৫ই জুন কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নিম্নলিখিত স্থানে নিম্নলিখিতরূপে তিনি প্রচার কার্য্য করিয়াছেন।

**কুষ্টিয়া**--ব্রাহ্মগণের গৃহে পারিবারিক উপাসনা, আলোচনা, সংগীত করেন। দুই রবিবার সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। জুবিলী উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং মহারাণী ভারতেশ্বরীর জীবন অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন।

**জগন্নাথপুর**--শ্রীযুক্ত বাবু বিপনবিহারী রায়ের জমিদারী কাছারী বাটিতে উপাসনা, আলোচনা করেন। প্রতি দিন কোন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে উপাসনা করেন। স্থানীয় স্কুল গৃহে এক

সভা হয়, সেই সভাতে "প্রকৃত ধর্ম্ম ক?" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মাধব মণ্ডলের গৃহপ্রাঙ্গণে এক সভা হয়, তাহাতে "ঈশ্বর মঙ্গলময় দেবতা" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। গগনচন্দ্র কর্ম্মকারের গৃহপ্রাঙ্গণে এক সভা হয়, সেখানে "চৈতন্যধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদিগের এক সভা হয় সেই সভাতে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এবং একদিন ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন।

**আজুদিয়া**—এই গ্রামের ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র আচার্য্যের গৃহে উপাসনা করেন।

**আমলাবাড়ী**--এইগ্রামের উৎসব দত্তের গৃহপ্রাঙ্গণে একসভা হয়, তাহাতে হৃদয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

**বড়ইচরা**--এই গ্রামের শম্ভুচন্দ্র বিশ্বাসের বাটীতে এক সভা হয়। এই সভাতে "স্বীয় বিবেক ও বিশ্বাস অনুসারে চলিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হয়। এসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

**খোক্শা**--শ্রীযুত রামচরণ বিশ্বাসের গৃহে স্থানীয় অনেকে সমবেত হন। এখানে প্রকৃত বিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সেখান হইতে তিনি খলিলপুর গমন করেন।

**মহিলা সম্মিলনী**--প্রতি শনিবার ঢাকা ওয়ারীতে ব্রাহ্মমহিলাগণ সমবেত হইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদি করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং উপদেশাদি প্রদান করেন।

উৎসব—ময়মনসিংহ ভগিনীসমাজের ৫ম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৯শে আষাঢ়—প্রাতে ও রাত্রিতে উপাসনা। শ্রীমতী বসন্তকুমারী চত্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রিতে শ্রীমতী সুশীলা বসু "ব্রহ্মবাণী" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৩০শে আষাঢ়—প্রাতে ও রাত্রিতে উপাসনা। শ্রীমতী সুশীলা বসু ও শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী বিশ্বাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে প্রার্থনা ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ হয়। শ্রীমতী বামাসুন্দরী চন্দ প্রার্থনা করেন।

**স্ত্রীশিক্ষার জন্য দান**--ঢাকার ইডেন ফিমেল স্কুলের সম্পাদক আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে উক্ত স্কুলের জন্য সম্প্রতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন। এজন্য দাতাগণ সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। ভাওয়ালের মহারাজা ৩০০, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র দাস ঢাকা ১০০, শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ দাস ঐ ২৫ এবং শ্রীযুক্ত বাবু রূপলাল দাস ঐ ২০।

**৫ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩০৪**

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, পুনরাবর্ত্তন বিবেকের সার্ব্বভৌমিকত্ব, সম্পাদকীয় মন্তব্য,

## সংবাদ।

**সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন**--এবার পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন বরিশালে হইবে। ষ্টাণ্ডিং কমিটিতে ইহা ঠিক হইয়া গিয়াছে।

**নিমন্ত্রণ**––আমরা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর সম্পাদক–প্রকাশিত নিম্নলিখিত মর্ম্মের পত্রখানি সাদরে মুদ্রিত করিতেছি : —

আগামী ৭, ৮, ও ৯ অক্টোবর অর্থাৎ ২২, ২৩, ও ২৪ শে আশ্বিন বৃহস্পতি শুক্র ও শনি এই তিন দিবস বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ–মন্দিরে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর ৯ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এবার বরিশালে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইবার জন্য তথাকার বন্ধুগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। নিবেদন—ইতি।

## আলোচ্য বিষয়

১. পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।
২. ব্রাহ্মধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা।
৩. অনাথ ব্রাহ্মপরিবার–সংস্থান–ধনভাণ্ডার।
৪. "সেবক"–প্রচলন।
৫. বিবিধ।

নিবেদক
শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক

**ছাত্রসমাজের উৎসব**—ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ছাত্রসমাজের বার্ষিক উৎসব এবার নিম্নলিখিত প্রণালীমত সম্পন্ন হইয়াছে। ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে উৎসবের উদ্বোধন হয়, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর বক্তৃতা হয়। বক্তা শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, বক্তৃতার বিষয় "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ কি?" ১২ই তারিখ উৎসরের বিশেষ দিন। অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন, সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী উপাসনা করেন।

## বিবিধ

গত ভাদ্রমাসে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সম্মিলনীর প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল টাঙ্গাইল অঞ্চলে গিয়া বর্ষাকালে প্রচার করিবেন, এরূপ প্রস্তাব ছিল ; কিন্তু 'সেবক' প্রচলন, পূর্ব্ববাঙ্গলা ছাত্রসমাজের বার্ষিক উৎসব এবং চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, টাঙ্গাইল গমন করিতে পারেন নাই।

## উদ্ধৃত।

চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল তথায় গমন করিয়াছেন। মন্দির

প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় বিশেষ উৎসব হইবে। উৎসবের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইলে, প্রকাশ করা যাইবে।

ঢাকা নগরে যাদবচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, বিশ্বাম্ভর দায়, গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের বাটীতে ১৭৬৮ শকের ২২ শে অগ্রহায়ণ রবিবার এক সভা করেন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশ্যভাবে স্থাপনের পরামর্শ হয়। কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে সময় সময় বিনা মূল্যে পুস্তক ও পত্রিকা ঢাকায় প্রেরিত হইতে থাকে। শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা গমন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দেন। প্রথম প্রথম যাদবচন্দ্র বসুর গৃহে গোপনে ব্রাহ্মসমাজ হইতে, তৎপর উদয়চন্দ্র আঢ্যের গৃহে কতক প্রকাশ্য সভা হইতে লাগিল। ১৭৬৮ শকের ১লা চৈত্র হইতে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ হইতে লাগিল। শনিবার সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইত। রামকুমার বেদপঞ্চানন উপাচার্য্য ছিলেন। বেদপঞ্চানন ভিতরে বাহিরে এক ছিলেন না। সে জন্য তাহাকে না রাখিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার নিকট লেখা হয়। সভা কৃষ্ণকমল গোস্বামীকে উপাচার্য্য করিয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে চাঁদা দিতেন।

(১৭৬৯ শকের ৪৫ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী)

১৭৭৬ শকে শ্রাবণমাস কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। গোবিন্দচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র রায় ; দ্বারকানাথ সেন, অমৃত লাল গুপ্ত ইহাদের যত্নে সমাজ স্থাপিত হয়।

(১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনীর ফাইল)

১৭৮৫ শকে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাগ আঁচড়া গমন করিয়া ২৩টী পরিবারকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

(ঐ শকের তত্ত্ববোধিনীর ফাইল)

**৫ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, ১৩০৪**

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, অহঙ্কার ভয়ানক শত্রু, কেন আমরা সম্মানিত হইতে পারি না, প্রাণ স্বরূপ, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সম্মিলনী, ব্রাহ্ম সমাজে দরিদ্রতা,

•

**সংবাদ।**

**সম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন**--মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন বরিশাল নগরে অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। বরিশালস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণের যত্নে এবং আগ্রহ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। সম্মিলনীকে যে তাঁহারা প্রাণের সহিত ভালবাসেন, সম্মিলনীর উন্নতিকল্পে যে তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ আছে, তাহা এবার বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সমবেত হইবেন, এই আশায় তাঁহারা কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে অতিথি সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। যাহাতে অতি সুন্দররূপে নবাগত ব্রাহ্মগণের পরিচর্য্যা হইতে পারে, তাহার আয়োজন করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অল্প কয়েক জন মাত্র ব্রাহ্ম উপস্থিত হন। সম্মিলনীর জনৈক

হিতৈষী বন্ধুকে উপস্থিত হইবার জন্য টেলিগ্রাফ করেন ; কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেননা, জনৈক প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। এরূপ আগ্রহ ও যত্ন আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাইনা।

গত ৭ই অক্টোবর হইতে ৯ই অক্টোবর ; তিন দিন সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে আমাদের প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। সম্মিলনীর কার্য্য শেষ হইলে স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণের একটী সম্মিলন হয়। ঐ সম্মিলন স্থলে স্কুলের বালক বালিকাগণ কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃবর্ণকে মোহিত করেন। তৎপর প্রীতি ভোজন হয়। আমরা এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি যে, বরিশালের ব্রাহ্মিকাগণ সম্মিলনীতে প্রতিদিন অতি আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। বাস্তবিক বরিশাল ব্রাহ্মগণ সকল বিষয়েই সজীবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

**প্রচারক নিয়োগ**--এবার শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় সম্মিলনীর নিয়মিত প্রচারক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে সম্মিলনীর সাময়িক প্রচারক পদে মনোনীত করিয়াছেন। ইহারা অবকাশ সময়ে স্থানে স্থানে লইয়া যাইয়া প্রচার করিবেন। শ্রীযুক্ত গুরু দয়াল সিংহ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীমতী সুশীলা বসু, শ্রীযুক্ত ডা. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালী নারায়ণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র গাঙ্গলী এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস।

**ব্রহ্মোৎসব**—মাণিকদহের শারদীয় উৎসব অতি সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ও ঢাকা হইতে বন্ধুগণ সমবেত হন। চারি দিন ব্যাপী উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আদিনাথ চাট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। মাণিকদহ স্কুলের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে এক মহতিসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীকান্ত দাস বি. এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে ছাত্রগণ আবৃত্তি করে, এবং দধিচীর তনুত্যাগ বিষয়ে অভিনয় করে। অভিনয় ও বাঙ্গলা আবৃতি বেশ হইয়াছিল। উৎসবে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয় সাধারণ ও ভদ্র বহুলোককে পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন।

**প্রচার**--সম্মিলনীর প্রচারক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় বরিশালের অন্তর্গত বাটাজোড়, শোলক, উজিরপুর, পিরোজন, রায়ের কাটী ও রাণীপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া সঙ্গীত, উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ২২ শে কার্ত্তিক বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনাতে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

**বিবাহ**।—গত ২৬শে আশ্বিন ঢাকানগরীতে একটী ব্রাহ্মবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্র চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন খাস্তগিরি। পাত্রী ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত

ঘোষের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সৌরনলিনী। ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ও আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। পরমেশ্বর এই নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

**মৃত্যুসংবাদ।** — বিগত ১৪ই আশ্বিন আমাদের কুমিল্লাস্থ ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দীর তৃতীয় কন্যা কালীগুচ্ছ গ্রামে পরলোক গমন করিয়াছে এবং ৮ই কার্ত্তিক ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা সুনীতিবালার মৃত্যু হইয়াছে। পরমেশ্বর শিশুদিগকে পরলোক শান্তিক্রোড়ে স্থান দান এবং তাঁহাদের আত্মীয়দিগের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

**রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।**-- গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিনে চট্টগ্রাম ন্যাসনেলস্কুলে এক সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবন্ধু সেন সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দত্ত, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজেও ঐদিন বিশেষ উপাসনা হয়।

অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধন ভাণ্ডার। — নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনাথ ধনভাণ্ডারের চাঁদা সংগ্রহ জন্য মনোনীত এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। সকলে উক্ত ফণ্ডের টাকা কড়ি এজেন্টদিগের নিকটে দিবেন অথবা সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারীর নামে ঢাকা ঠিকানাতে পাঠাইবেন। এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল সিংহ ত্রিপুরা, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীমতি সুমীলা বসু ময়মনসিংহ। শ্রীযুক্ত গিরীচন্দ্র মজুমদার, ডা. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত ঢাকা, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বামন চন্দ্র গাঙ্গলী এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বরিশাল।

### বিজ্ঞাপন

অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থাপন ধনভাণ্ডারের টাকা কড়ি ভিন্ন, অন্যান্য সমুদয় টাকা কড়ি (সেবকের মূল্য, প্রচার ফণ্ডের সাহায্য, প্রচারকদিগের পাথেয় বাবত এবং এককালীন দান) ইত্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ— পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী, ঢাকা।

## পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী

বিগত ২২শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার হইতে ২৪শে আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত তিন দিন সম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন বরিশাল নগরে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবার কেবল বর্ত্তমান বৎসরের কর্ম্মচারিগণের তালিকা এবং সপ্তম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হইল। অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

বিগত অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ

অডিটার। সম্মিলনী কোষাধ্যক্ষের ভার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল সেবক পত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী অনাথ-ধন-ভাণ্ডারের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু লাহা উক্ত ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সম্মিলনীর প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। কাশী বাবু ১৭ এবং বরদা বাবু ১৫ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবেন।

## সপ্তমবার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময় বিধাতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী সপ্তমবর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। সম্মিলনী বিগত বর্ষে পরমেশ্বরের যে সকল আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য সেই বিধাতাপুরুষকে সর্ব্বাগ্রে আমাদের হৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

**সম্মিলনীর উদ্দেশ্য**--পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ববঙ্গের কোন কেন্দ্রস্থলে সম্মিলনী হইয়া যাহাতে পরস্পরের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে পারেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে গুরুতর বিষয় সকলের সমালোচনা করিয়া যাহাতে সম্মিলনীর নির্দ্ধারণ সমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্য ৭ বৎসর কাল সম্মিলনী এই উদ্দেশ্য যথাসাধ্য সংসিদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।

**সম্মিলনীর কর্ম্মচারী প্রভৃতি**--কার্য্যবির্ব্বাহক ও স্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের নাম সম্মিলনীর সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণে ৪র্থ খণ্ড সেবকের ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনঃ মুদ্রণ অনাবশ্যক।

**প্রচার**--গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় আর এক বৎসরের জন্য সম্মিলনীর প্রচারক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গদেশ ও আসামের অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থান সমূহে পরিভ্রমণ করিয়া সঙ্গীত, আলোচনা, উপাসনা এবং বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

**ঢাকা**--কাওরাদি, মদনগঞ্জ, সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা এবং বিক্রমপুর অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ, পঞ্চসার, বজ্রযোগিনী, বেত্‌কা, ছাতিয়ানতলী, আবিরপাড়া এবং সোনারঙ্গ।

**কাছাড়**--বারনাডপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিতলঙ্গ, করিমগঞ্জ, এবং কাছাড় নদীয়া--- জগন্নাথপুর, আজুদিয়াম, আমলা বাড়ী, বড়ইচরা, খোক্‌সা এবং কুষ্ঠিয়া।

**পাবনা**--খলিলপুর, কালিকাপুর, মুরারীপুর, সাগরকান্দি, চর ভবানীপুর চট্টগ্রাম এবং মাণিকদহ। ইহা ভিন্ন তিনি 'সেবক' পত্রিকা পরিচালনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ও এবার সম্মিলনীর সাময়িক প্রচারক রূপে কাছাড় অঞ্চলে গিয়া প্রচারাদি করিয়া আসিয়াছেন। কাশী বাবু এবং তিনি একত্রেই সে সকল স্থানে গিয়াছিলেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কাছাড়ে দুইজন হিন্দু যুবক আমাদের প্রচারক মহাশয়দিগের নিকট এবার ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

এ বৎসরের প্রথম ভাগেই ডাঃ ভি রায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহকসভাকে জানাইয়াছিলেন যে, যদি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বিতীয় একজন প্রচারক নিযুক্ত করেন তবে তিনি ঐ প্রচারকের বৃত্তিস্বরূপ মাসিক ১৭ টাকা করিয়া দিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দিনাজপুরস্থ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয়কে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। নানা কারণে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং উক্ত পদ উপযুক্ত লোক অভাবে শূন্য রহিয়াছে। এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা প্রচার কার্য্য ভালই হইয়াছে। সম্মিলনীর প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল নানাস্থানে দক্ষতা ও উৎসাহের সমিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের সকলের ধন্য বাদের পাত্র।

এবৎসর সম্মিলনীর উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ গুহ মহাশয় প্রচার কাণ্ডের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথা ছিল, একজন প্রচারকের জন্য এই বৎসর ১৭ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক যে ব্যয় পড়িবে, তাহা চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত না হইলে তিনি পূর্ণ করিয়া দিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা স্বয়ং চাঁদা তুলিবার ভার গ্রহণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বৎসরের প্রথমভাগেই প্রচারকের ব্যয় যথাসময়ে নির্ব্বাহার্থে মথুর বাবুর নিকট হইতে ৫০ টাকা অগ্রিহ গচ্ছিত স্বরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে এই টাকা প্রাপ্ত হওয়াতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ সুবিধা বোধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে বহু চেষ্টা করিয়াও যথোপযুক্ত চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই এবং প্রতিশ্রুত টাকাও যথোপযুক্ত রূপে আদায় হয় নাই। এই জন্য মথুর বাবুকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় দেখিয়া কার্য্যনির্ব্বাহসভা তাঁহার নিকট হইতে বর্ত্তমান বর্ষের চাঁদা ১২ টাকা ভিন্ন ক্ষতির টাকা গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। আগামী বৎসরের জন্য ডাঃ ভি রায় এক জন প্রচারকের বৃত্তিস্বরূপ মাসিক ১৭ টাকা এবং শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ গুহ গত বৎসরের প্রদত্ত ৫০ টাকা এবং এবৎসরে আরও ৫০ টাকা একুন ১০০ টাকা গচ্ছিত রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মথুরা বাবুর এই প্রতিশ্রুতির ৫০ টাকা পরে দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এই জন্য শ্রীযুক্ত ডাঃ ভি, রায় এবং শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ মহাশয়কে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান-ধনভাণ্ডার—এই ধনভাণ্ডারে পূর্ব্ব তহবিলে ২৩৫০ টাকা ছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ২৫০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এখন মোট ৪৮৫০ টাকা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু লাহার নিকট গচ্ছিত আছে। ভাণ্ডারের ট্রাষ্টডিডের নিয়মানুসারে মূলধন ব্যয়িত হইতে পারিবেনা, সুতরাং এবৎসর কেহ সাহায্য প্রার্থনা করাতেও তাঁহাকে প্রদত্ত হয় নাই। অন্ততঃ দশহাজার টাকা সংগৃহীত না হইলে দান কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবেনা। এই ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় ভাণ্ডারের উন্নতি করে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতেছেন, সেই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

'সেবক'—গত বৎসর কিছুকাল এই পত্রিকা শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। তিনি গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী, গবর্ণমেন্ট হইতে অনুমতি না পাওয়াতে অগত্যা সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবকুমার সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত ঘোষাল মহাশয়ের সাহায্যে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমরা এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সেবকের আয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে যথা সময়ে টাকা আদায় করিবার জন্য ভিঃ পিঃ পোষ্টে সেবক প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক গ্রাহক মূল্য

না দিয়া সেবক ছারিয়া দিয়াছেন। সম্মিলনীর বিশেষ সাহায্যকারী শ্রীযুক্ত ডাঃ ভি, রায় মহাশয় পূর্ব্ববৎ এবারেও সেবকের আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন, 'সেবক' ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এই পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়া থাকে, পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের আর একখানিও পত্রিকা নাই। 'সেবক' প্রকাশের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করেন। আমরা আশা করি, সম্মিলনীর হিতৈষী বন্ধুগণ সকলে সেবকের আর্থিক অভাব দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। সেবকের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেবক প্রকাশের জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, আমরা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

**৫ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩০৪**
প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, কয়েকটী কথা, মানবজীবন মঙ্গলময়ের বিধাতৃত্ব,

**অষ্টমবার্ষিক--কার্য্যবিবরণ।**
**( পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অষ্টমবার্ষিক কার্য্যবিবরণ )**
**প্রারম্ভিক অধিবেশন।**

২২শে আশ্বিন (১৩০৪) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অষ্টমবার্ষিক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন। তিনি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন।

ক্রমে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয় সকল সম্বন্ধে সম্মিলনীর সম্মুখে বিধিবদ্ধ প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত "বিষয়-কমিটী" সকল গঠিত হয়।

১. পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়-কমিটী—সভ্য, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু, শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২. অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান-ধনভাণ্ডার বিষয়-কমিটী—সভ্য, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৩. 'সেবক'-প্রচলন বিষয়-কমিটী—সভ্য, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তকাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার দাস।

৪. ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের বিশুদ্ধতা বিষয়-কমিটী—সভ্য, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস।

৫. 'বিবিধ' বিষয়-কমিটী—সভ্য, 'শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়।

এই সকল কমিটীর সভ্যগণ প্রত্যেক কমিটীতেই তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইলেন।

## প্রথম অধিবেশন

(২২শে আশ্বিন, ১৩০৪)

১. শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে, সম্পাদক মহাশয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আগত পত্রসমূহ পাঠ করেন।

*পত্রলেখকগণের নাম—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ঢাকা, শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত* কাওরাদী।

তৎপর সম্পাদক, সপ্তমবার্ষিক রিপোর্ট ও সহকারী সম্পাদক, আয় ব্যয়ের বিবরণ পাঠ করেন।

রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব (হিসাব আডিট-সাপেক্ষ) সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

## প্রচারকনিয়োগ

১. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "আগমী বৎসরের জন্য সম্মিলনীর পক্ষ হইতে দুই জন প্রচারক নিযুক্ত করা হউক।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, সাধারণের চাঁদাদ্বারা সম্মিলনীর একজন প্রচারকের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। সম্মিলনীর হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত ডাঃ ভিঃ রায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি একজন প্রচারকের ব্যয়ভার এক বৎসরের জন্য মাসিক ১৭ টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত আছেন। অতএব ঐ ১৭ টাকা বৃত্তি দিয়া আর একজন প্রচারক নিযুক্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

২. শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন প্রস্তাব করেন, "শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় মহাশয়দ্বয়কে মাসিক যথাক্রমে ১৭ ও ১৫ টাকা বৃত্তিতে আগামী বৎসরের জন্য সম্মিলনীর প্রচারকপদে নিযুক্ত করা হউক। এবং কাশী বাবুর নিয়োগসম্বন্ধে কলিকাতা সাধনাশাস্ত্রের অধ্যক্ষমহাশয়ের ও বরদাবাবুর সম্বন্ধে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্মতিগ্রহণ করা হউক।" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "প্রচারক মহাশয়গণ স্থানে স্থানে গমন কালে সম্মিলনীর নির্দ্ধারিত প্রস্তাব সকল কার্য্যে পরিণত হইতেছে কিনা, ইহার বিশেষ তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যাহাতে ঐ সকল নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

## পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন "সম্মিলনীর প্রচারকগণ, গ্রামে গ্রামে যাহাতে সরল ও সহজ প্রণালীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, সহরে, বিদ্বানসমাজে অনেকস্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইয়াছে ; কিন্তু মফঃস্বলের লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব জানে না। তাহারা ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানে কি প্রভেদ, তাহাও বুঝে না। তাহাদের মধ্যে অতি সরল ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলে বিশেষ উপকার হইবে। বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক সরল সঙ্গীত, সহজ সহজ কথায় ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করিলে তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই ; —

আমি পল্লীগ্রামে বাস করি। প্রচারকগণ অনেক সময়ই গ্রামে যান না, সহরে ভ্রমণ করেন। পল্লীগ্রামে প্রচার করিলে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আমি আশা করি।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস এই মর্ম্মে বলেন, —সহরে প্রচারকগণ গমন করিলে তাঁহাদের পাথেয় খরচ ইত্যাদি বাবতে সম্মিলনীকে চিন্তা করিতে হয় না ; কিন্তু মফঃস্বলে প্রচারক পাঠাইলে তাঁহাদের খরচের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। সম্মিলনী সেই অর্থ কোথায় পাইবেন ?

ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রচারকদিগের পাথেয় ব্যয় সম্মিলনীই বহন করেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল এই মর্ম্মে বলনে —

মনোমোহন বাবু ; প্রভৃতি যাহা বলিতেছেন, বর্ত্তমান বর্ষে সেইরূপই কার্য্য হইয়াছে। আমি অনেক পল্লীগ্রামে গিয়া সরল সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার করিয়াছি। সকল স্থানেই লোকে আগ্রহ পূর্ব্বক শুনিয়াছে। এইভাবে প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ইহাতে যে অর্থের প্রয়োজন, সম্মিলনী তাহা দিতে অসমর্থ। সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেক স্থানে গমন করিতে পারা যায় না।

অনেক আলোচনার পরে অধিকাংশের মতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস প্রস্তাব করেন, "অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রচারকগণ মুখে যাহা বলেন, জীবনে তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন না, ইহাতে প্রচার কার্য্যের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়, অতএব আমার এই অনুরোধ যে, আমাদের প্রচারকগণ জীবনে যাহা সাধন করিয়াছেন বা সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সুধু যেন সেই বিষয় সম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করেন।"

একটী প্রস্তাবরূপে গৃহীত হইল না। অধিকাংশের মতে অনুরোধস্বরূপ গৃহীত হইল।

২. শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "আমি প্রস্তাব করি, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সাময়িক প্রচারকদল গঠিত হউক। ইঁহারা অবকাশ সময়ে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে স্থানে স্থানে যাইয়া প্রচার করিবেন। শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল সিংহ কুমিল্লা ; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীমতী সুশীলা বসু ময়মনসিংহ ; ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত ঢাকা ; শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র গাঙ্গলী, সত্যানন্দ দাস বরিশাল।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

## দ্বিতীয় অধিবেশন।

(২৩শে আশ্বিন ১৩০৪)

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান-ধনভাণ্ডার।

১. ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী এই ভাণ্ডারের সম্পাদক নিযুক্ত হউন।"

শ্রীযুক্ত নিশীকান্ত বসু অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২. শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন, নানা স্থানে ব্রাহ্মগণের পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবং অন্যান্য প্রকারে দান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে ধনভাণ্ডারের এজেন্ট নিযুক্ত করা হউক ; — শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস বরিশাল ; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু ময়মনসিংহ ; ডাঃ পি, এম গুপ্ত ফরিদপুর ; শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল সিংহ কুমিল্লা ; শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ নোয়াখালী ; শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম ; ডাঃ পি কে রায়, শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়, কলিকাতা ; শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী ঢাকা।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩. শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস প্রস্তাব করেন, "এই ধনভাণ্ডারের সাহায্যের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করা হউক।"

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু বলেন,—"এ বিষয়ের জন্য বিদেশে ভিক্ষা করা ভাল বোধ হয় না।" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এই মর্ম্মে বলেন,—এদেশে বিশেষরূপে দান সংগৃহীত হইলে বিদেশে ভিক্ষা করা যাইতে পারে। ধনভাণ্ডারের অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে, এমত স্থলে বিদেশে দান প্রার্থনা করা ঠিক নহে। অতএব এ বৎসরের জন্য এ বিষয় স্থগিত থাকুক।

ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই মর্ম্মে বলেন ; —আমরা ইউনিটেরিয়ান দিগের নিকটে আমাদের অভাব ব্যক্ত করিব, ইহাতে লজ্জা কি? তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সংপ্রতি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্রাহ্মদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা কতক টাকা পাঠাইয়াছেন। বিশেষ আমরা প্রথমেই আবেদন পত্র পাঠাইবনা। আমাদের যে সকল বন্ধু সে অঞ্চলে আছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট পরামর্শ চাহিব, তাঁহারা বলিলে আবেদন পত্র পাঠান যাইবে।

শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার এই মর্ম্মে বলেন,—এসম্বন্ধে সকল ব্রাহ্মসমাজের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, এইরূপ হীন হইয়া ইংলণ্ডে ভিক্ষার্থী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তৃতীয়, ইউনিটেরিয়ানদের পক্ষে যতই সহানুভূতি থাকুক, তাঁহাদের ও ব্রাহ্মসমাজের গঠনে বিশেষ পার্থক্য আছে। টাকা কড়ির আদান প্রদানদ্বারা আনুগত্য জন্মে। তাঁহাদের সাহায্য এইরূপভাবে গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের আনুগত্য জন্মিবে। এরূপ হইলে হয়ত ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের হাতের যন্ত্র হইয়া পড়িবে। অতএব হীরালাল বাবু নিম্নলিখিতভাবে সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"এইরূপ টাকা চাওয়া উচিত কি না, তজ্জন্য সকল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের মত জানা হউক।"

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। তৎপর প্রস্তাবক হরিচরণ বাবু নিম্ন লিখিতরূপে আসল প্রস্তাবটা সংশোধন করিলেন।

"সম্মিলনীর সম্পাদক তাঁহার কোন ইউনিটেরিয়ান বন্ধুকে পত্র লিখিয়া জানিবেন যে, ইউনিটেরিয়ান্‌দিগের নিকট হইতে এই ভাণ্ডারের সাহায্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য কি না এবং প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হইবার আশা আছে কিনা?"

অধিকাংশের মতে উক্ত সংশোধিত পূর্ব্বপ্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

৪. শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু প্রস্তাব করেন,—"শ্রীযুক্ত জগবন্ধু লাহাকে ধনভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হউক।"

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন "শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই ফণ্ডের ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হউক।"

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় অনুমোদন করেন।. সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

## সেবক পত্রিকা।

১. শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন "আগামী বৎসরেও 'সেবক' পূর্ব্বৎ পরিচালিত হউক।"

শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র গাঙ্গলী এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল!

২. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের অর্থাৎ সেবকের ষষ্ঠখণ্ড প্রথম সংখ্যা উপযুক্ত সতর্কতা লইয়া এক বৎসরের অগ্রিম মূল্যের জন্য গ্রাহকগণের নিকট ভিঃ পিঃ বুক পোষ্টে প্রেরণ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস অনুমোদন করেন। প্রস্তাব। সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

৩. শ্রীযুক্ত নিশীকান্ত বসু প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষালকে সেবকের সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক।"

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪. শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেবকের সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হউক।"

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫. শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে আগামী বৎসরে সেবকে নিয়মিতরূপে (দুইমাসে অন্তত একটী প্রবন্ধ) পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক ; —শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সত্যানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বরদাপ্রসন্ন ; রায় প্রসন্নকুমার দাস, শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস বরিশাল ; শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার বহরমপুর ; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীমতী বসু ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ; শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫. শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন, "সম্মিলনীর সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে অবস্থানুসারে এক একখানি 'সেবক' রাখিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখুন।"

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

## তৃতীয় অধিবেশন

(২৫শে আশ্বিন ১৩০৪)

### বিবিধ।

সম্পাদক সভাপতির আদেশে, সম্মিলনীর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিস এবং ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করেন এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য অগ্রেই 'বিবিধ' বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সভার অনুমতি গ্রহণ করেন।

১. শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রস্তাব করেন, "রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২. শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস প্রস্তাব করেন, "নিরুপায় নবাগত ব্রাহ্মযুবকগণের শিক্ষা ও সংস্থানের জন্য একটী ধনভাণ্ডার খোলা হউক।"

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের যুবক যুবতী এবং নিরুপায় নবাগত ব্রাহ্মযুবকগণের শিক্ষা ও সংস্থানের জন্য একটী ধনভাণ্ডার খোলা হউক।"

এই সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়ায় আসল প্রস্তাবটা অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

৩. শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায় প্রস্তাব করেন, "নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া আগামী বৎসরের জন্য সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহকসভা গঠিত হউক সভ্যগণের মধ্যে চারিজন থাকিলেই কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাগণ এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া আগামী বর্ষের জন্য ষ্টাণ্ডিংকমিটি গঠিত হউক ;—শ্রীযুক্ত আলোকচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাখালকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু লাহা, ঢাকা ; শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মিত্র, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ গুপ্ত, কলিকাতা ; শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, টাঙ্গাইল ; গুরুদয়াল সিংহ কুমিল্লা ; শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস, বরিশাল ; শ্রীযুক্ত ডাঃ বিপিনচন্দ্র রায়, শ্রীরামপুর ; শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ, নোয়াখালী ; শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, চট্টগ্রাম ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নলধা ; শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ মজুমদার, নওগা ; শ্রীযুক্ত গোবিন্দচদ্র দত্ত, ফরিদপুর ; শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার, বহরমপুর ; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়, মাণিকদহ ; শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস, শিলচর ; শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ, নারায়ণগঞ্জ ; শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় প্রচারক।

এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫. শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের জন্য ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্মিলনীর সম্পাদক নিযুক্ত হউন।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬. শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ, সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হউন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৭. শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদককে, সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হউক।"

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস অনুমোদন করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

৮. শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রস্তাব করেন, "আগামী বৎসরের জন্য রজনীকান্ত ঘোষ অডিটার নিযুক্ত হউন।"

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চত্রবর্ত্তী অনুমোদন করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

৯. শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার প্রস্তাব করেন, "সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সাহায্যার্থে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

১০. শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস প্রস্তাব করেন, "পূর্ব্ববাঙ্গলার প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১১. শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন, "শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক যে, সেবক পত্রিকা পরিচালনের জন্য তাঁহার নিকট সম্মিলনী যে কিছু টাকা ঋণী আছেন, তাহার দাবী পরিত্যাগ করিয়া তিনি সম্মিলনীকে উপকৃত করুন।"

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১২. শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস প্রস্তাব করেন, "সম্মিলনী মনে করেন যে, অবস্থা উপযোগী সংস্থানের উপায় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্মের বিবাহ করা অন্যায় এবং এইরূপ বিবাহে ব্রাহ্মসাধারণের বিশেষত প্রচারক ও আচার্য্যগণের অনুষ্ঠান কিম্বা উপস্থিতিদ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করা অন্যায়।"

শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস অনুমোদন করেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্মিলনী সম্পাদকস্বরূপ বলেন যে, এসম্বন্ধে সম্মিলনীর একটী নির্দ্ধারণ আছে, সুতরাং পুনরায় এ বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না।

অনেক আলোচনার পরে অধিকাংশের মতে মূল প্রস্তাব এইরূপ সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইল; —

"সম্মিলনী মনে করেন যে, অবস্থা উপযোগী সংস্থানের উপায় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্মের বিবাহ করা অন্যায়।"

১৩. শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন, "সম্মিলনীর বিগত বর্ষের কর্ম্মচারিগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত কাজ কর্ম্ম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।"

শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস অনুমোদন করেন।

সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

**ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের বিশুদ্ধতা**

১. শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের বিজ্ঞাপিত আর একটী আলোচ্যবিষয় আছে। সেইটী এই, "ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের বিশুদ্ধতা।" বিষয়টী যেরূপ গুরুতর, অল্প সময়ে ইহার সম্যক আলোচনা হওয়া অসম্ভব, এইজন্যে আমি প্রস্তাব করি, এ বিষয়টী আগামী বৎসর সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে আলোচিত হইবার জন্য স্থগিত থাকুক।"

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী অনুমোদন করেন। অধিকাংশের মতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপর সভাপতি ও অন্যান্যকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক ভঙ্গ হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবার সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, ঢাকা ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, নলধা ; শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু, জয়শঙ্কর রায়, বিহারীলাল গুপ্ত, কলিকাতা ; শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন, লাকসাম ; শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নাথ কাওরাদি ; শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র, ফরিদপুর ; শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, পিরোজপুর ; শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, বিহারীলাল রায় চৌধুরী, চন্দ্রনাথ দাস, আনন্দমোহন দত্ত, হীরালাল হালদার, বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু, নিবারণচন্দ্র দাস, শরচ্চন্দ্র হালদার, বামনচন্দ্র গাঙ্গলী, প্রসন্নকুমার দাস, বিনয়ভূষণ গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সত্যানন্দ দাস, হরিচরণ দাস, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শরৎকুমার সেন, বরদাপ্রসন্ন রায়, ললিতকুমার বসু, রাজকুমার ঘোষ, প্রিয়নাথ দাস, অন্নদাচরণ সেন মনোমোহন দত্ত, মন্মথমোহন দাস, নিশিকান্ত বসু, মতিলাল সরকার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, এবং শ্রীমতী মুক্তকেশী গুপ্ত, প্রসন্নময়ী দাস, বসন্তকুমারী দত্ত, স্বর্ণময়ী বসু, সুরমা দাস, সুবালা হালদার, সরলা বিশ্বাস, প্রমদা চক্রবর্ত্তী, ইন্দুনিভা রায়, নৃত্যময়ী সেন, কুসুমকুমারী দাস, কাদম্বিনী গুপ্ত, চারুবালা সরকার, কুমুদিনী দাস, বিরাজমোহিনী গাঙ্গলাঁ, হিমাদ্রীবালা ঘোষ, অন্নদাসুন্দরী দাস, জগৎলক্ষ্মী সেন, শরৎসুন্দরী রায়, রামদুর্গা সরকার, বামাসুন্দরী সরকার, শ্রীমতী সুকুমারী দাস, স্নেহলতা দাস, অবলা দত্ত।

সংবাদ।

**প্রচার**--সম্মিলনীর প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল সম্প্রতি ঢাকাতে অবস্থিতি করিতেছেন। এখানে এক রবিবার প্রাতে এবং এক রবিবার সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শেষোক্ত উপাসনাতে "আমাদের ধর্ম্মে অধিকারিভেদ নাই" এ বিষয়ে উপদেশ দান করেন। ছাত্রসমাজে একদিন "কোন পথে যাই?" এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

**সঙ্গে স্কুল স্থাপন**—সম্প্রতি ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে একটী সঙ্গেস্কুল খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। আমরা আশা করি, যাহাতে সকল স্থানে সঙ্গেস্কুল স্থাপিত হয়, তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মগণ বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

**ভ্রম সংশোধন**--গত বারের সেবকে অনাথব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান ধন ভাণ্ডারের এজেন্টদিগের যে নামের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম হইবে। শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, সুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত, ললিতমোহন দাস বরিশাল ; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, বরদাকান্ত বসু, ময়মনসিংহ ; ডাঃ পি. এম গুপ্ত, ফরিদপুর ; শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল সিংহ, কুমিল্লা ; শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, চট্টগ্রাম ; শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়, ডাঃ পি, কে রায়, কলিকাতা ; শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী, ঢাকা।

সম্পাদকের দূরস্থিতিনিবন্ধন ও নানা কারণে গত বারের সেবকে প্রুফ দেখিতেও অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে।

### বিজ্ঞাপন।

অনাথব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান-ধনভাণ্ডারের টাকা কড়ি ভিন্ন, অন্যান্য সমুদয় টাকা কড়ি (সেবকের মূল্য, প্রচার ফণ্ডের সাহায্য, প্রচারকদিগের পাথেয়বাবত এবং এককালীন দান ইত্যাদি) আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ —

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী, ঢাকা।

সেবকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। গ্রাহকদিগের অগ্রিম মূল্যের উপরেই সেবকের জীবন নির্ভর করিতেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিয়মিত সময়ে অনেকের নিকট হইতেই মূল্য পাওয়া যায় না। গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন যে, অতি শীঘ্র যষ্ঠখণ্ডের অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। একান্তপক্ষে পৌষ মাসের মধ্যে মূল্য না পাইলে সেবক মাঘ মাসে ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইবে, সম্মিলনীর অষ্টমবার্ষিক অধিবেশনে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যানেজার 'সেবক'।

# কৌমুদী

## বিজ্ঞাপন

### আত্ম-কথা

আজ জগৎপাপিতা জগদীশ্বরকে নমস্কার করিয়া আমাদিগের প্রিয় পাঠকবর্গকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রথমখণ্ডে কৌমুদী সমাপ্ত করিলাম। কৌমুদী উদ্যম-জীবনের যাদৃশ্য বিঘ্ন-সঙ্কুল বিপদ মালায় বিজড়িত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার জীবন প্রবাহ যে এতদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে সমর্থ হইবে, তদ্বিষয়ে আশা করিতে গিয়া পদে পদেই বিবিধ জঞ্জাল পূর্ণ ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শন করিয়াছি। অধুনা ঈশ্বর প্রসাদাৎ কৌমুদী সমস্ত বিপদ বিমোচিত— মেঘমুক্ত শারদকৌমুদীবৎ সমুৎফুল্ল !

যে মহাত্মার অকৃত্রিম অনুরাগে কৌমুদী নানাবিধ বিঘ্ন অপসারিত করিয়া প্রথম বর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বিতীয় বর্ষে পদ র্পণ করিতে সমর্থা হইতেছে, অদ্য আমরা সেই উদারহৃদয় বিদ্যানুরাগী মহাত্মা শ্রীযুক্ত মহারাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের শ্রীকর কমলে হৃদয় কবাট উন্মোচিত পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা ভাণ্ডার উপহার প্রদান করিলাম।

কৌমুদীর দ্বিতীয় খণ্ড অচিরকাল মধ্যেই যথানিয়মে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। যে সকল গ্রাহক কৌমুদী গ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহারা এই সময়েই আপন অসম্মতি জ্ঞাত করাইবেন, নচেৎ তাঁহাদিগের নিকট নিয়মিতরূপে কৌমুদী প্রেরিত হইবে, এবং তাহার মূল্যের নিমিত্ত তাঁহারা দায়ী হইবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর
কৌমুদী সম্পাদক এবং প্রকাশক

### সূচীপত্র

সঙ্গীত



**১ম খণ্ড, বৈশাখ, ১ম সংখ্যা ....**

## কৌমুদী

চির অমা তমাচ্ছন্ন বঙ্গ-পর্ণালয়ে
কুটিরে কৌমুদী? একি স্বপন-বিভ্রম!!
কালের কালিমা-মেখে আচ্ছাদিত হয়ে

কুমুদ রঞ্জন যথা ব্যথিত মরম !
তথা সে জ্বলদ-জান করি বিদারণ
হতে কি পারিবে ক্ষীণা কৌমুদী স্ফুরণ ?

২

"কৌমুদী"?

কেন রে কল্পনা মুখে আনিলি এ নাম ?
বঙ্গের অদৃষ্টে যাহা সুচির মুদিত,
সে বিভা বিকাশি সিদ্ধ হবে মনস্কাম,
এভ্রান্তি কিহেতু তোরে করিল মোহিত !
মন্দার ! — নন্দন-গর্ব্ব-ত্রিদিব-বিলাস !
ভূতলে বিকাশে কেন বিফল প্রয়াস ?

৩

অথবা যাদের হায় কষ্টের জীবন !
কেন তাহাদের পাশে কৌমুদী তরল ?
বিদ্ধামৃগে শুনাইয়ে বাঁশরী নিক্কণ
দগধ হৃদয়ে কেন ঢালিলি গরল ?
শোক দুঃখ অভিনেতৃ যথা রঙ্গালয়ে
কিফল কৌমুদী তথা প্রস্ফুরিত হয়ে ?

৪

দুর্ভিক্ষে আকুল যারা অন্ন-শূন্য গৃহ ;
মুষ্টিভিক্ষা বিনিময়ে হৃদয়-নন্দন
বেচিতে করেছে ত্যাগ দয়া মায়া স্নেহ !
অন্তরের প্রতিগ্রন্থি হ'তেছে ছেদন,
হুতাশ বাতাস যোগে সতত যথায়
কি কাজ কৌমুদী আর ফুটিয়ে তথায় ?

৫

কিম্বা যথা বিচ্ছেদের বৃশ্চিক দংশনে
কামিনী-কোমল হৃদি সদা জ্বালাতন ;
বসিয়ে বিষাদ-মুখী, পর্ণ-নিকেতনে,
দাসত্ব বিলাসী বঙ্গ ভর্ত্তার কারণ
আঁধারে নীরবে অশ্রু করিছে বর্ষণ !
কে করিবে কৌমুদীরে সেখানে যতন ?

৬

পাগলিনি কল্পনে ? কেন তবে আর,
'কৌমুদী' স্বর্গীয় নাম আনিলি বদনে ?

কেন উন্মাদিত চিত করিলি আমার
না চালি মানস কিবা চারু প্ররোচন !
ঘুচাইয়া ঘন ঘটা কৌমুদী স্ফুরিত
করিতে পাগল চিত কেন প্রধাবিত ?

৭

আশার কুহকী-মন্ত্রে কল্পনার মুখে
"কৌমুদী" —
মধুর এ নাম কেন হইল ধ্বনিত ?
সে স্বরে আপনা ভুলি, না জানি কি সুখে
'কৌমুদী !' বলিয়ে আজি চিত বিমোহিত !
এস তবে ক্ষীণতর কর বিকীরণে
ফুটলো কৌমুদী দীনা বঙ্গের গগনে !

হৃদয়-চিত্র।

১

কল্পনে আমার !
বিধৃত রজত ধারা, পড়িছে ঢলিয়া অই
প্রকৃতির ঘুমন্ত মরমে ; —
উষার কণক আভা ঢলে যথা নলিনী কাননে।
মরমে মরমে অই, পশেছে ত্রিদিব ধারা,
জ্বলন্ত অনল গেছে মিশা'য়ে কোথায়
সুখের স্বপনে হাসে প্রকৃতির ঘুমন্ত বদন।
নবীন-প্রমোদ মাতি, শর্ব্বরী ; —স্বরগ বালা
জ্বেলেছে মরমে অই স্বভাবের শীতল প্রদীপ
শীতলিছে জ্বলন্ত মরম।
পড়েছে দীপের ভাতি, শ্বেত জলদের গায়
সাজাইয়া থরে থরে সুধার ঝরণা ! —
প্রমদা প্রকৃতি যেন, তুলিয়াছে ছায়া যন্ত্রে
সরলা বালার অই হৃদয়ের ছায়া।
কুসুম কবরী শিরে সাজাইয়া মুক্তা বিন্দু
জ্যোছনা-সাগরে ভাসি, খেলিছে বল্লরী,
কিবা জীবন্ত মাধুরী।

২

আয় না লো অই মতে কল্পনা কুমারি !
স্বর্গের একটা ধারা চালনা মরমে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, জ্বলিয়া শীতল দীপ
দাওনা ভাসায়ে হৃদি নিসর্গ-সাগরে
শান্তির-কুসুম--শয্যা চিরানন্দ যথায় বিহরে।

৩

দেখনা কল্পনা !
কি যেন দারুণ কাণ্ড হইয়েছে হৃদয়ে !
ছিঁড়িয়ে মরম-গ্রন্থি ঝরিয়া পড়েছে যেন,
প্রাণের পরাণ হ'তে চারুতর ফুল !

৩-ক

থাকিয়া থাকিয়া যেন, কাঁদিয়া ছুটিছে বেগে
মরমের স্তরে স্তরে শ্মশানের শ্বাস !
তরল শোণিত-বিন্দু হইয়া উদাস,
হৃদয় সাম্রাজ্য হ'তে শূন্যেতে মিশায় !

৩-খ

কি যেন গিয়েছে চলি, হৃদয় রয়েছে শূন্য
বিজয়া দশমী দিনে গৌড়ে গেহ যথা।
সমস্ত সংসার ছায়া, ঢালিলাম এ হৃদয়ে
তুবও ত এ হৃদয় পূরিল না বালা !
নিসর্গ-হৃদয় মাঝে, মিসালেম এ হৃদয়
তবুও ত এ হৃদয় পূরিল না বালা !
নীরব নিশীতে বসি, ঢালিনু জ্যোছনা ধারা
তবুও ত এহৃদয় পূরিল না বালা !
উষার মুরতি খানি, রাখিনু হৃদয় মাঝে
তবুও ত এহৃদয়ে পূরিল না বালা !
সন্ধ্যার কাঞ্চন ছায়া, বিধিনু হৃদয়-তলে
তবুওত এ হৃদয় পূরিল না বালা !
কল্পনে তোমার সাথে, ভ্রমিলাম কত দেশ
তবুওত এ হৃদয় পূরিল না বালা !

# টীকা

১. পত্র–পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ বিষয়ে একটি তদন্ত করেছিলেন। ঢাকার কমিশনার জানিয়েছিলেন, প্রত্যেক পতিতা মেয়ে চায়, বৃদ্ধকালের অবলম্বন হিসেবে। যাদের মেয়ে নেই তারা মেয়ে সংগ্রহ করে। রীতিটি খুব সাধারণ এবং তা বন্ধ করার তেমন কোন উপায় নেই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখনে, *Proceeding of the Government of India*, Home Public 1870. শিশু পতিতাবৃত্তি নিয়েও তদন্ত হয়েছিল এবং বাংলা সরকারের এ বিষয়ে মতামত ছিল মোটামুটি এরকম—

"The majority of these officers are opposed to any interference on the part of government in the matter. The Bengal Government writes as follows-- kidnapping is not carried on in the lower provinces to such an extent as to call for special legislation on a very thorny subject.

The sale and purchase of girls for the purpose of prostitution are more prevalent in Behar and Orissa than in Bengal proper, where the prostitute class is recruited chiefly from Hindoo widows. This predominance of Hindoo widows among the prostitutes of Bengal is prominently noticed re-marriage of widows in the Hinoo community of the lower provinces."

*Proceeding of the Government of India*, Home judicial, 1873.

২. ১৮১৭ সালের ৩০ এপ্রিল মাসিকপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'*। ১৮২০ সালের জুন মাসে শুরু হয় এর কোয়ার্টার্লি সিরিজ। সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয় ১৮৩৬ সালে।

১৮৮৩ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। ঐ বছরই *স্টেটসম্যান* পত্রিকার ওভারসীজ এডিশন অন্তর্গত হয়ে যায় *ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া*–র। কিছুদিন পর *ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া* অন্তর্গত হয়ে যায় *স্টেটসম্যান*–এর। এবং এর নতুন নাম হয় *দি স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া*। পরে *স্টেটসম্যান* থেকে *ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া* নামটি বাদ যায়। *ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়ার* যারা সম্পাদক ছিলেন তাঁরা হলেন—উইলিয়াম কেরি, জোসুয়া মার্শম্যান, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, মেরি ডিথ টাউনসেন্ড, হেনরী মিড, ড. জর্জ স্মিথ ও জেম্‌স রাউটলেজ। সম্পাদকবৃন্দের নাম দেখেই বোঝা যায় যে, পত্রিকাটি ছিল মিশনারীদের এক ধরনের মুখপত্র। *ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া* ও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর জন্য দেখুন--

Benoy Ghose, *Selections from English Periodicals of the 19th century Bengal*, vol III, IV, V, VI, Calcutta, 1980, 1974, 1980, 1981.

৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন এ প্রসঙ্গে—"পীড়িত কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হইলে তাহাকে গঙ্গাতীরে নিয়া রাখা হইত। কোন কোন স্থলে মৃতপ্রায় ব্যক্তির দেহের নিম্নভাগ গঙ্গার জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল যে, গঙ্গাতীরে মৃত্যু হইলে, বিশেষতঃ গঙ্গাজলের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে, মৃত ব্যক্তির পুণ্য ও আত্মার

সদ্‌গতি হয়। শিক্ষিত হিন্দুরা এই প্রথার তীব্র নিন্দা করিলেও আইন বা সরকারী হুকুমে ইহা রহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। গভর্ণমেন্ট তদনুযায়ী ইহা বন্ধ না করিয়া আদেশ দিলেন যে কোন মৃত্যুপথযাত্রীকে গঙ্গাতীরে নিবার পূর্বে পুলিশকে জানাইতে হইবে যে রোগীর বাঁচিবার আর কোনো আশাই নাই। রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা এই মর্মে পত্র দিবেন এবং সম্ভব হইলে এই মর্মে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটও দাখিল করিবেন।" রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২৯৬।

৪. আনুমানিক ১৫৪৭ খৃঃ কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমানের দামুন্যায় জন্মগ্রহণ করেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ষোড়শ শতকের সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের জন্য গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ।

৫. হাওড়ায় ১৭১২ সালে ভারতচন্দ্র রায়ের জন্ম। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে নিজের রাজসভায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র রচনা করেন *অন্নদামঙ্গল*। এই কাব্য রচনা করে তিনি রায়গুণাকর উপাধি পান। এ ছাড়া তাঁর রচিত আরেকটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *বিদ্যাসুন্দর*। ১৭৬০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

৬. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন বিক্রমপুরের তারপাশায় এক কুলীন পরিবারে। তিনি নিজেই আটবার বিয়ে করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যৌবনে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রচার শুরু করেছিলেন। পণপ্রথা, বহুবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে পূর্ববঙ্গে ছিলেন তিনি অন্যতম সংগঠক। এ পরিপ্রেক্ষিতে *বল্লাল সংশোধনী* নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত', নরেশচন্দ্র জানা প্রমুখ সম্পাদিত, *আত্মকথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা।

৭. ঢাকার হিন্দুধর্ম্মরক্ষিনী সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৬৫ সালে, হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি। পত্রিকাটি কতদিন পর্যন্ত টিকেছিল তা জানা যায় নি, তবে সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদসাময়িকপত্র*, ঢাকা, ১৯৮৫।

৮. তারানাথ তর্কবাচস্পতির (১৮০৬-১৮৮৫) জন্ম বর্ধমানে। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। হিন্দুধর্মের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে সমর্থনও করেছেন। কিন্তু বহুবিবাহ নিরোধক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের বিরোধীতা করেছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা, যেমন, *বহু বিবাহবাদ*, *বিধবা বিবাহ খণ্ডন* প্রভৃতি।

৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ৩ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৪, ১৩৬১।

১০. বাংলায় বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। জন্ম হাওড়ায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. হন ১৮৬৩ সালে। ভারতবর্ষের তিনি দ্বিতীয় এম. ডি.। প্রথম জীবনে তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন, পরে বিশ্বাসী হন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়। বাংলায় বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের জন্য ১৮৭৬ সালে স্থাপন করেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'-এর যাকে এখানে বিজ্ঞানসভা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরলোক গমন করেন ১৯০৪ সালে।

১১. ইংরেজ কবি জন মিল্টন (১৬০৬-৭৪)। বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *প্যারাডাইস লস্ট*।

১২. বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)।

১৩. ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮৫৬-৭৩)। পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'অন লিবার্টি' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে।

১৪. ইংল্যাণ্ডের রাজা চার্লসের সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বাধলে পরে তা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। অলিভার ক্রময়েল (১৫৯৯-১৬৫৮) পার্লামেন্টের পক্ষে সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। রাজা চার্লস যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। 'লর্ড প্রটেক্টর অফ দি কমনওয়েলথ অফ ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড' উপাধি ধারণ করে পাঁচবছর তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

১৫. থমাস ব্যবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) ভারতের ইতিহাসে খ্যাত শিক্ষা সংস্কারের জন্য। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত যখন তিনি সুপ্রিম কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য ছিলেন তখন তিনি পিনাল কোড ও শিক্ষা সংস্কারের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন যা বিতর্কিত। তাঁর শিক্ষানীতির মূল কথা ছিল ভারতে এমন এক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গড়ে তুলতে হবে "Who may interpret between us and the millions who we govern--a class of persons, Indian in colour and blood, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."

১৬. অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় মাসিক *নবজীবন* প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে ১২৯১ সনে।

১৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় মাসিক *প্রচার* প্রকাশিত হয় ১২৯১ সনে। টিকে ছিলো ১২৯৫ সন পর্যন্ত।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৪।

১৮. জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদনায় ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *বঙ্গবাসী*। *ঐ*।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া, বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৮-১৮৯৪) নিয়ে যত লেখা হয়েছে আর কোন সাহিত্যিককে নিয়ে বোধহয় ততো লেখা হয়নি। তাঁর ওপর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থটির রচয়িতা পূর্ণেন্দু পত্রী। বইয়ের নাম *বঙ্কিমযুগ*, কলকাতা, ১৯৯৭।

২০. ইংরেজ কবি এডমুণ্ড স্পেনসার (১৫৫২-৯৯)। *দি ফেয়ারি কুইন* তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

২১. বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা স্যার ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২)।

২২. গত শতকের ষাট এবং সত্তর শতকে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অবিসংবাদী নেতা। শুধু তাই নয়, 'অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্বদেশ প্রীতির জন্য দেশজোড়া খ্যাতি' ছিল তাঁর। ১৮৫৬ সালে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ব্রাহ্ম সমাজে। ১৮৬১ সালে প্রকাশ করেছিলেন *ইণ্ডিয়ান মিরর* ও *সানডে মিরর*। হিন্দু ধর্মের নানাবিধ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারকাজ চালানোর জন্য কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের বিরোধ বাঁধে যার ফলে ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগ করার পক্ষে আন্দোলন করে সফল হয়েছিলেন। ১৮৭২ সালে তাঁর উদ্যোগেই 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু, ১৮৭৮ সালে তাঁর প্রচারিত নীতি ত্যাগ করে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নাবালিকা কন্যাকে কুচবিহারের যুবরাজের সঙ্গে। ফলে, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করে গঠন করেন 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। এ ঘটনার পর থেকেই সর্বক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র তাঁর প্রভাব হারাতে থাকেন। পূর্ববঙ্গে কেশবচন্দ্রের কর্মকাণ্ড বা যোগাযোগের জন্য দেখুন, বঙ্কবিহারী কর, *ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৫১। আর

কেশবচন্দ্রের ধারাবাহিক জীবনী ও কর্মের বিবরণের জন্য দেখুন, গৌরগোবিন্দ রায়, *আচার্য্য কেশবচন্দ্র*, কলকাতা।

২৩. লর্ড জর্জ ফ্রেডারিক স্যামুয়েল রবিনসন রিপন (১৮২৭-১৯০৯) ১৮৮০-৮৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। গ্ল্যাডস্টোনীয় উদারনীতিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। এ কারণে, ভারতবাসীদের কাছে রিপন ছিলেন জনপ্রিয়। 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' তিনি বাতিল করেছিলেন, স্থাপন করেছিলেন স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি। বিচার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের জন্য ইলবার্ট বিলের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। এ বিলের কারণে ইংরেজদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠলেও ভারতীয়দের কাছে হয়ে উঠেছিলেন আরো প্রিয়। গভর্ণর জেনারেলের পদে পদত্যাগ করে চলে যাবার সময় ভারতীয়রা তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছিলো।

২৪. পুরো নাম স্যার কোর্টনি পার্সিগ্রাইম ইলবার্ট। পেশায় ব্যরিস্টার। ১৮৮২ সালে ভারতের ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আইন সদস্য হিসেবে যোগ দেন। আইন সদস্য হিসেবেই তিনি 'ইলবার্ট বিল' উত্থাপন করেছিলেন। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

২৫. স্যার অ্যাশলি ইডেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৫২ সালে। চাকুরি জীবন শুরু করেছিলেন তিনি রাজশাহীর সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর হিসেবে। বাংলার লে: গভর্ণর হয়েছিলেন ১৮৭৭ সালে এবং ঐ পদে ছিলেন ১৮৮২ পর্যন্ত। তাঁর আমলের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে আছে, বেঙ্গল লাইসেন্স অ্যাক্ট (১৮৭৮) এবং ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮) পাশ, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ হিসেবে বাংলার সিভিল সার্ভিস বিভক্তিকরণ, 'রেন্ট ল কমিশন' গঠন ও কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন। ১৮৮৭ সালে, লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হলে ভারতের একসময়ের ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক মন্তব্য করেছিলেন—

'The Indian Civil Service has been rich in able administrators, but I do not think that any Indian gentlemen will hesitate to agree with me that we have seen of late years no abler administrator than sir Ashley Eden...Sir Ashley Eden was distinguished for quickness of perceptions, for sound judgement, for firmness in carrying out his views, and for his power of securing the confidence of those who served under him.' বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, C. E. Buckland, *Bengal under the lieutenant Governors*, New Delhi (Reprint), 19, pp 687-757.

২৬. স্যার স্টুয়ার্ট বেইলি ১৮৫৬ সালে চব্বিশ পরগণার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ১৮৭৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন অস্থায়ী ছোটলাট। স্থায়ীভাবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন ১৮৮৭ সালে। ১৮৯০ পর্যন্ত ছিলেন ঐ দায়িত্বে। *ঐ*, পৃ. ৮৩৭-৮৮৫।

২৭. সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সিভিলিয়ান—এই তিন পরিচয়েই রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ছিলেন বিখ্যাত। ১৮৭১ সালে আই সি এস হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন চাকুরিতে। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৮৩) এবং প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার। কিন্তু তিনি যখন অনুভব করলেন যে, ভারতীয় হিসেবে তিনি আর উচ্চপদে যেতে পারবেন না তখন পদত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন লণ্ডন। তাঁর বিখ্যাত

গবেষণা গ্রন্থ *Economic History of India*। বাংলা উপন্যাসের মধ্যে বিখ্যাত *মহারাষ্ট্র জীবন বৃত্তান্ত*।

২৮. *বান্ধব* সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিক্রমপুরের ভরাকরে (১৮৪৩)। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেন। বক্তা হিসেবে ছিল তাঁর অসাধারণ খ্যাতি। পূর্ববঙ্গের প্রধান সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত হতেন। ১৮৭৭ সালে ভাওয়াল জমিদারীর ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৮৯৭ সালের রায় বাহাদুর ও ১৯০৯ সালে সিআইই উপাধি দিয়েছিল। পণ্ডিতরা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর উপাধি। বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে বিখ্যাত *প্রভাত চিন্তা* [ ১৮৭৭ ], *নিভৃত চিন্তা* [ ১৮৮৩ ], *নিশীথ চিন্তা* [ ১৮৯৬ ] প্রভৃতি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালীপ্রসন্ন ঘোষ* (সাহিত্য সাধক চরিতামালা), কলকাতা, ১৩৬৫। মুনতাসীর মামুন, *কালীপ্রসন্ন ঘোষ*, ঢাকা, ১৯৮৮।

২৯. ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় এলে কলকাতার অনুকরণে ঢাকায় স্থাপিত হয় 'সঙ্গত সভা'। সভার উদ্দেশ্য ছিল—'চরিত্রের উন্নতি সাধন ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ' করার।

আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ১৩০-১৩২।

৩০. যে সব ছাত্র উৎসাহী ছিল ব্রাহ্মধর্মে তাদের জন্য ১৮৬৩ সালে ব্রাহ্মরা ঢাকায় একটি স্কুল খুলেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল'।

৩১. নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে।

৩২. ঢাকা কলেজকে বোঝানো হচ্ছে। পূর্ববঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল এই কলেজ। ১৮৩৫ সালে ঢাকার নাগরিকদের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ১৮৪১ সালে যুক্ত হয়েছিলো জুনিয়র ও সিনিয়র কলেজিয়েট সেকশন। এর নামকরণ করা হয়েছিলো ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ। পরবর্তীতে তা পরিচিত হয়ে ওঠে ঢাকা কলেজ নামে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৬। Sharifuddin Ahmed, *Dacca*, London.

৩৩. পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সংগঠক বঙ্গচন্দ্র রায় [ ১৮৩৯-১৯২২ ] জন্মেছিলেন ঢাকার পাঁচগায়ে। পড়াশোনা করেছিলেন কিশোরগঞ্জের বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল এবং ঢাকা কলেজে। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন ঢাকার পোগজ স্কুলে কিন্তু পরে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের কাজে। ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি সমর্থন করেছিলেন 'নববিধান সমাজ'কে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বঙ্গচন্দ্র রায়, *আমার ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য* [ প্রকাশকাল ও স্থান জানা যায় নি ]।

৩৪. কালীনারায়ণ রায় ছিলেন 'ঈস্ট' পত্রিকার সম্পাদক।

৩৫. ১৮৭১ সালে, ঢাকার ব্রাহ্মদের উদ্যোগে ইংরেজি এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়। অল্প কিছুদিন পর তিনি ঢাকা ত্যাগ করলে এর ভার অর্পিত হয়েছিল তৎকালীন ঢাকার একজন প্রধান ব্রাহ্মকর্মী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। 'ঈস্ট' কতোদিন টিকেছিল জানা যায় নি। তবে এটুকু জানা যায় যে, ১৮৭৫ সালেও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল।

দেখুন মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ–সাময়িকপত্র*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫।

৩৬. ব্রজসুন্দর মিত্রের [ ১২২৭–১২৮২ বাংলা সন ] জন্ম ঢাকার সিমুলিয়ায়। ১৮৪০ সালে, ঢাকার কমিশনার অফিসে কেরানীর কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ডেপুটি কালেক্টর ও আবগারি কালেক্টর হয়েছিলেন ১৮৪৩ ও ১৮৪৫ সালে। ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, হেমলতা সরকার, *স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের আংশিক চিত্র*, কলকাতা, ১৯১৫।

৩৭. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম [ ১৮৪৫–১৯০৫ ] ঢাকার পশ্চিম পাড়ায়। ১৮৬৯ তিনি ব্রাহ্মমত গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকার বিভিন্ন সভাসমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ইডেন স্কুলের একজন প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ যে ক'জনের কারণে বিস্তৃত হয়েছিলো তিনি তার মধ্যে অন্যতম। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, [ লেখকের নাম নেই ], *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৯২২।

৩৮. ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা। জন্ম ১৮৩০ সালে ঢাকায়। ১৮৬৯ সালে গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্মমত। তাঁর পুত্র স্যার কে.জি. গুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত আই. সি. এস. অফিসার।

৩৯. কৈলাশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের নির্বাহী পরিষদের সভ্য, সম্পাদক, ট্রাস্টিরূপে তিনি বহুবছর নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজের সেবা করেছিলেন। পরলোকগমন করেছিলেন ১২৯১ সালে।

৪০. প্রসন্নকুমার রায় [ ১৮৩৯–১৯৩২ ] পরিচিত ছিলেন ডাক্তার পি.কে. রায় হিসেবেও। জন্ম, ঢাকার শুভড্যায়। ব্রাহ্মদের সঙ্গে আহার করার কারণে তাঁকে জাতিচ্যুত করা হয়। কিন্তু 'সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষার বিমল আনন্দে সকল দুঃখ ক্লেশ ও উৎপীড়ন অনায়াসে বহন করেন।' প্রেসিডেন্সী কলেজের ছিলেন প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও সভাপতি ছিলেন কিছুদিন। ছিলেন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রাস্টি। বঙ্কবিহারী কর, *পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৫১।

৪১. পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রাস্টি।

৪২. রজনীকান্ত ঘোষ ১২৯১, ১২৯৩ থেকে ১৩০৯ সন পর্যন্ত ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

৪৩. পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রাস্টি।

৪৪. *ঐ*।

৪৫. কৃষ্ণকুমার মিত্রের (১৮৫২–১৯৩৬) জন্ম ময়মনসিংহে। তিনি ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্মী। বিয়ে করেছিলেন রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীকে। ১৮৭৯ সালে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার সিটি স্কুলে। ১৯০৮ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন সিটি কলেজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবেও ছিলেন খ্যাতিমান। বিখ্যাত 'সঞ্জিবনী' (১৮৮৩)–এর ছিলেন তিনি সম্পাদক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত*, কলকাতা, ১৯৭৪।

৪৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮০৯) মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। পত্রিকার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও সংকলনের জন্য দেখুন, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৩।

৪৭. পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর (১৮৪১-১৮৯৯) অবদান অনস্বীকার্য। কলেজে পড়ার সময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি। কলেজ ছাড়ার পর সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সমাজের কাজে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুটি গানের তিনিই রচয়িতা। ১২৯৩ সনে আবার উপবীত গ্রহণ করে ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকার গেণ্ডারিয়ায়। মৃত্যু নীলাচলে। দেখুন, জগবন্ধু মিত্র, *প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী*, কলকাতা, ১৯১৪।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, *ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়*, কলকাতা, ৫৬ ব্রাহ্ম সংবর্ত।

৪৮. দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ১৮৫৮ সালে চাংড়িপোতা গ্রাম থেকে সাপ্তাহিক *সোমপ্রকাশ* প্রকাশ বাংলা সাময়িকপত্র জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিদ্যাসাগর ছিলেন পত্রিকার পরিকল্পক। *সোমপ্রকাশ* পরবর্তীকালে অনেক বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশে প্রভাবান্বিত করেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সোমপ্রকাশ* ও তার সম্পাদক দ্বারকানাথ সম্পর্কে লিখেছেন—'সোমপ্রকাশ দ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি। তিনি বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কার নীতির বাহন করিয়া বাংলাদেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম ধর্ম—কুৎসিত দলাদলি ও পরস্পর কর্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জন করিয়াছিলেন। শুভশুচিতামণ্ডিত হইয়া তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' অচিরাৎ বাংলাদেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।' বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*। চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৬।

৪৯. ১৮৮৮ সালে *গৌরব* প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। সম্পাদক ছিলেন অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্তী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র*, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫০. বাখরগঞ্জের জেলা জজ ডব্লিউ, এন, গ্যারেটের উদ্যোগে ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর বরিশাল ইংরেজি স্কুল চালু হয়। জেলা স্কুলে তা পরিণত হয় ১৮৫৩ সালে। দেখুন, মেজর জেনারেল (অবঃ) এম, এ, লতিফ সম্পাদিত, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বাখরগঞ্জ*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৯৪।

৫১. আর্মেনী ব্যবসায়ী, জমিদার ও ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক নিকি পোগজ ১৮৪৮ সালের ১২ জুন স্থাপন করেছিলেন পোগজ স্কুল। তখন এর নাম ছিল 'পোগজ অ্যাংলো ভার্নাকুল্যব স্কুল এ্যাট ঢাকা'। ১৮৭০ সালে পোগজের মৃত্যুব পব সবজীবাগানের জমিদার মোহিনীমোহন দাস পোগজ স্কুলের দুই তৃতীয়াংশ কিনে এর মালিক হয়েছিলেন। ঐ সময় [ আনুমানিক ] বর্তমান স্থানে স্কুলটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতিব নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৩।

৫২. ১৮৩৫ সালে, ঢাকার নাগবিকদের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি ইংরেজি স্কুল যা এখন পরিচিত কলেজিয়েট স্কুল নামে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

৫৩. পোগজ স্কুলের (১৮৪৮) প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত নিকি পোগজই ছিলেন হেডমাস্টার। এরপর কিছুদিন দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী চার্লস পোট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *ঐ*।

৫৪. কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্কুল পরিদর্শক এবং তৎকালীন ঢাকার একজন প্রভাবশালী নাগরিক।

৫৫. উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকার একজন অগ্রগণ্য নাগরিক ছিলেন দীননাথ সেন। পূর্ববঙ্গে স্কুল পরিদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

দীননাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকার দাসরায়, ১৮৩৯ সালে। পড়াশোনা করেছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুলে, পরে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন [ বঙ্কিমচন্দ্রও সেবার ছিলেন পরীক্ষার্থী ] কিন্তু কৃতকার্য হন নি। ফলে, শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। এর কিছুদিন পর নিযুক্ত হয়েছিলেন নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক; পূর্ববাংলার স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন শেষ অবধি।

যৌবনেই দীননাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ তথা পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও ঢাকার পটুয়াখালিতে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনে পালন করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। একসময় সম্পাদনা করেছেন *ঢাকা প্রকাশ*। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়সে অবশ্য তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। পরলোক গমন করেন তিনি ১৮৯৮ সালে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আদিনাথ সেন, *দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।

৫৬. নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে।

৫৬.খ ১৮৩৭ সালে সিসিল বিডন সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন পাটনায় সহকারী হিসেবে। ১৮৬২ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন বাংলার লে. গভর্ণর এবং ঐ পদে ছিলেন ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাব অর্ডিনেট জুডিসিয়াল সার্ভিস পুনর্গঠন, কলকাতায় হাইকোর্ট স্থাপন, বিভিন্ন অঞ্চলে নর্মাল স্কুল স্থাপন (১৮৬৪), মফস্বল পৌর আইন পাশ, সুন্দরবন আবাদ প্রভৃতি। বেঙ্গল লাইব্রেরি ও 'রিপোর্ট অন নেটিভ পেপার্স'-এরও সূত্রপাত করেছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—'Though fully aware how much more might have been done in vindicating Sir Cecil from many of the reproaches cast on him, enough has in our opinion been said to show that Sir Cecils administration as on the whole not been unworthy of the respect and gratitude, both of his countrymen and of the people over whom he ruled, and we feel that for one most grievous and total error of Judgement, a career of 30 years industry, usefulness, and ability and guided successfully, by a noble and philonthropic desire to promote the best interst of the country, should not be lost sight of and forgotten. We are told that there will be never again be a civilian Lieutenant Governor of Bengal.'

C.E. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governor*, New Delhi (reprint) 19. pp 272-397.

৫৭. ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে, ঢাকার প্রভাবশালী উকিল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল 'হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা'। কাশীকান্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন ব্রাহ্মদের প্রতি কারণ, তার দু'পুত্র হয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্ম। এই সভা গঠনে কাশীকান্তকে সহায়তা করেছিলেন জমিদার দীননাথ মুন্সী (ভাওয়াল), জগবন্ধু বসু (বৈকুণ্ঠপুর),

তারাপ্রসাদ রায় প্রমুখ। এই সভা থেকে প্রকাশিত হতো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা *হিন্দু হিতৈষিণী*। দেখুন, *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়,* কলকাতা, ১৯২২, পৃ. ১২।

৫৮ লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভাতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল। তাঁর সময় ভারতবর্ষের প্রথম আদমশুমারী করা হয়েছিল (১৮৭০)। দেশের সংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপ তিনিই সংগঠন করেছিলেন এবং আলাদাভাবে প্রশাসনে বাণিজ্য ও কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শনকালে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন ১৮৭২ সালে।

৫৯. ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। 'সেন মহাশয় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং অনেক সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও নানা বিষয় লইয়া তর্ক করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, 'ওহে বাঙ্গালকে খোঁচা দিও না, বাঙ্গাল ক্ষেপিলে সহজে শান্ত হইবে না।' ...ঢাকায় আসিয়া সেন মহাশয় দীন বাবুর সঙ্গে একত্র ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ব্রতী হন। সময় সময় তাঁহাকে আচার্য্যের কাজও করিতে হইত।' রামপ্রসাদ বিয়ে করেছিলেন পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের আরেকজন কর্মী কালীনারায়ণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমন্তশশীকে। সঙ্গীতজ্ঞ অতুল প্রসাদ সেন তাঁর পুত্র। ঢাকা থেকে দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন রাম প্রসাদ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।'

দেখুন, বঙ্কবিহারী কর, *পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা ; এবং মানসী মুখোপাধ্যায়, *অতুল প্রসাদ,* কলকাতা, ১৯৭১।

৬০. বাংলাদেশের শিক্ষা–সংস্কৃতি প্রসারে যেসব ইংরেজ মিশনারী অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রেভারেন্ড জেমস লং অন্যতম। ১৮৪০ সালে, তিনি এসেছিলেন কলকাতায় এবং শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন নিজেকে। বাংলা মুদ্রণের আদি ইতিহাস জানতে হলে জেমস লং কৃত তালিকার স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। তালিকাগুলি হলো—

*Returns Relating to Native Printing Presses and Publication in Bengal 1853-54 ; A Return of the Names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature ; A Descriptive Catalogue of Bengali Works* ইত্যাদি। তিনখণ্ডে সংগৃহীত *প্রবাদমালা*-র সংকলন তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। ১৮৬১ সালে দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* ইংরেজি অনুবাদ করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে সেই সময় গান বাঁধা হয়েছিলো—'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে ছারখার/অকালে হরিশ ম'ল, লং–এর হল কারাগার।'

জেমস লং ও বাংলা মুদ্রণ শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য দেখুন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা,* কলকাতা, ১৯৮১।

৬১. 'জনসাধারণ সভা' সাংগঠনিক রূপ লাভ করেছিল ১৮৭২ সালে। এ সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জমিদার এবং পেশাজীবী যাদের মধ্যে উকিলরাই ছিলেন প্রধান। জনসাধারণ সভার উদ্দেশ্য ছিল—"এই প্রদেশের দুরবস্থা সংশোধন, অভাব মোচন এবং সর্বপ্রকার হিত সাধনের চেষ্টা করা।" সভ্যপদ উন্মুক্ত ছিল "বঙ্গদেশবাসী প্রাপ্ত বয়স্ক" ব্যক্তিদের জন্য। বার্ষিক চাঁদা ছিল আট আনা। আর নিয়ম করা হয়েছিল প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে কার্য নির্বাহক সভা হবে এবং বৈশখে সাধারণ সভা। এর কিছুদিন পর হয়ত সভা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। কারণ, ১৯০১ এর সেপ্টেম্বর মাসে দেখি এ সভা আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল।

১৮৭২ সালের জনসাধারণ সভার উদ্দেশ্য ছিল বা লক্ষ্য দেখে মনে হয়, উদ্যোক্তারা একটি গণসংগঠন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এ সভা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববাংলার সভাসমিতি*, ঢাকা, ১৯৮৪।

৬২. ডা. জেমস ওয়াইজের পুরো নাম জেমস ফওন্‌স নর্টন ওয়াইজ। গত শতকের ষাটের দশকে ছিলেন তিনি ঢাকার সিভিল সার্জন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম *নোটস অন দি রেসেস, কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রেডস অব ইস্টার্ণ বেঙ্গল* যার এগার কপি মাত্র মুদ্রিত হয়েছিল। সম্প্রতি এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন, জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, (মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৯৭।

৬৩. রবার্ট মিটফোর্ড ছিলেন ঢাকার প্রথম কালেক্টর এবং ১৮২০ সালের শেষ প্রাদেশিক কোর্ট অফ আপিলের বিচারক। তাঁর সম্পত্তি তিনি দান করে যান ঢাকাবাসীর উপকরার্থে। মিটফোর্ড ও মিটফোর্ড হাসপাতালের বিস্তারিত বিবরণেরও জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৪. ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত আর্ল অফ নর্থব্রুক ছিলেন ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল। তিনি ছিলেন গ্ল্যাডস্টোনের উদারনীতির অনুসারী। ভারতে তাঁর নীতি ছিল— 'To take off taxes, to stop unnecessary legislation and to give the land rest.' এবং এ নীতি তিনি কিছুটা কার্যকরও করতে পেরেছিলেন।

৬৫. ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করেন মেট্রোপলিটান কলেজ। অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল—'দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।'

৬৬. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জন্ম কলকাতায় ১৮০১ সালে। সমসাময়িককালে অন্যতম বাঙালি ধনী হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। মননে রক্ষণশীল হলেও শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিলেন, সমাজ সংস্কারেও আগ্রহ ছিল। ১৮৬৭ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা। ১৮৩১ সালে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'রিফর্মার' ও 'অনুবাদক'। বাঙালির প্রথম নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার' ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খৃস্টান মিশনারীদের প্রভাব আজীবন প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও তাঁর পুত্র, প্রথম ভারতীয় ব্যরিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহনের মেয়েকে বিয়ে করেন। প্রসন্নকুমার অবশ্য পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন তিন লক্ষ টাকা যা দিয়ে প্রবর্তন করা হয় '*টেগোর ল*' প্রফেসর পদের। পরলোকগমন করেন ১৮৬৮ সালে।

৬৭. ঢাকার কাশুজে নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবদুল গণি (১৮৩০–১৯৯৬), ঢাকাবাসীর কাছে যিনি পরিচিত ছিলেন গণিমিঞা নামে। পূর্ববঙ্গে ছিল তাঁর বিস্তৃত জমিদারী। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিলেন পূর্ববঙ্গে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তিনি সহায়তা করেছিলেন ইংরেজদের। দাতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল, ঢাকা শহর উন্নয়নে দান করেছেন। ইংরেজ অনুগত আবদুল গণিকে তৎকালীন সরকার ১৮৬৭ সালে মনোনীত করেছিল আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে। ১৮৭৫ সালে লাভ করেছিলেন কে.সি.এস. আই উপাধি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৮. নবাব আবদুল গণির ছেলে আহসানউল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১) দানশীলতার জন্যও ছিলেন খ্যাত। দু'বার মনোনীত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে। ঢাকা শহর উন্নয়নে তিনি প্রচুর দান করেছিলেন। *ঐ*।

৬৯. ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ছিল ঢাকা শহরের থিয়েটার চর্চা এবং বিভিন্ন সভাসমিতির কেন্দ্র। জগন্নাথ কলেজ সংলগ্ন ছিল এই সভাগৃহ। খুব সম্ভব উনিশ শতকের ষাটের দশকে এটি স্থাপিত হয়েছিল সাধারণের চাঁদায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৮৫।

৭০. গঙ্গাচরণ সরকারের (১৮২৩-১৮৮৮) জন্ম হুগলীতে। সেরেস্তাদার হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৮৪৬ সালে, কালক্রমে উন্নীত হয়েছিলেন জজপদে। সাহিত্যচর্চাও করতেন। বিচারক হিসেবে ঢাকায় কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার সরকার তাঁর পুত্র।

৭১. লর্ড জর্জ ফ্রেডরিক স্যামুয়েল রবিনসন রিপন [ ১৮২৭-১৯০৯ ] ১৮৮০-৮৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। গ্ল্যাডস্টোনীয় উদারনীতিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। এ কারণে, ভারতবাসীদের কাছে রিপন ছিলেন জনপ্রিয়। 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' তিনি বাতিল করেছিলেন, স্থাপন করেছিলেন স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি। বিচার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের জন্য ইলবার্ট বিলের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। এ বিলের কারণে ইংরেজদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠলেও ভারতীয়দের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আরো প্রিয়। গভর্ণর জেনারেলের পদে পদত্যাগ করে চলে যাবার সময় ভারতবাসীরা তাঁকে যেভাবে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আর কোনো ভাইসরয়কে তারা তা জানিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ।

৭২. বাংলা মুদ্রণ ও গদ্য রচনার ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। জন্ম ইংলণ্ডে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন ১৭৯৩ সালে। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। এখানেই পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় নির্মিত হয় বাংলা টাইপ। ১৮০১ সালে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ত্রিশ বছর সেখানে তিনি অধ্যাপনা করেন। পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটানোর জন্য নিজেই পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু করেন। এ ছাড়া ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল। রচনা করেছেন প্রায় ৫০টি বই।

৭৩. আলেকজান্ডার ডাফের জন্ম স্কটল্যান্ডে, ১৮০৬ সালে। ১৮৩০ সালে কলকাতায় আসেন মিশনারী হিসেবে। ধর্মপ্রচার ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে কাজ করেন। ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন' যা পরে পরিণত হয় স্কটিশ চার্চ কলেজে। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিশন' যা এখন ডাফ কলেজ নামে পরিচিত। কলকাতার বাইরেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কয়েকটি বিদ্যালয়। ১৮৪৫-৪৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন বেথুন সোসাইটির সভাপতি। পরলোকগমন করেন ১৮৭৮ সালে। আলোক রায়, *আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন*, কলকাতা, ১৯৮০।

৭৪. প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ এবং ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাত হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) কোম্পানীর মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন ১৮০৮ সালে। ধাতুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় কোম্পানী পরে তাঁকে নিয়োগ করে কলকাতা টাকশালের গুরুত্বপূর্ণ পদে (১৮১৬-১৮৩২)।

কোলব্রুকের সহায়তায় উইলসন সংস্কৃত শিখেছিলেন এবং আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন প্রাচ্যবিদ্যায়। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ছিল সে সময় প্রাচ্যবিদ্যা কেন্দ্র। উইলসন স্বাভাবিকভাবেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং দীর্ঘ বাইশ বছর ছিলেন এর সম্পাদক (১৮১১-৩৩)। লর্ড মেকলে ভারতীয়দের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার যে প্রস্তাব রেখেছিলেন উইলসন ছিলেন তার বিরোধী। কলকাতার হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ এবং কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সম্পাদকরূপে প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

১৮৩৩ সালে উইলসন ফিরে গিয়েছিলেন বৃটেনে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার 'বোডেন অধ্যাপক' নিযুক্ত হয়েছিলেন। উইলসনের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *এ ডিকশনারি ইন সানসক্রিট অ্যাণ্ড ইংলিশ*, *গ্লসারি অফ ইণ্ডিয়ান টার্মস* ইত্যাদি।

৭৫. লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেডিস বেন্টিংক ছিলেন বাংলার শেষ গভর্ণর জেনারেল (১৮২৩-৩৫) ও ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ভারতবর্ষে সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য তাঁর শাসনামল উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়দের নিম্নপদে বহাল রাখার কর্ণওয়ালিসের নীতি তিনি বাতিল করেছিলেন (যেমন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে ভারতীয়দের নিযুক্তি), প্রাদেশিক কোর্ট বিলুপ্ত করেছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন বিভাগীয় কমিশনারের পদ। ১৮২৯ সালে লুপ্ত করেছিলেন সতীদাহ প্রথা, দমন করেছিলেন ঠগী। সরকারি স্কুলসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন গভর্ণর জেনারেলের পদ থেকে।

৭৬. ভাইকাউন্ট হেনরী হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত। গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নিযুক্তি পাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৯ বছর। ভারতে তিনি রেল প্রবর্তনের প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপের মতো প্রথাগুলিকে দমন করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছিলেন। প্রথম শিখযুদ্ধে (১৮৪৫-৪৬) সাফল্যের জন্য তিনি ভাইকাউন্ট উপাধি পান। পরবর্তীকালে, দেশে ফেরার পর হার্ডিঞ্জ বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রধানও হয়েছিলেন।

৭৭. ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। তাঁর শাসনকালও খ্যাত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। যুদ্ধ ও তাঁর উদ্ভাবিত 'স্বত্ববিলোপ' নীতির মাধ্যমে তিনি বিস্তার করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এ নীতিতে বলা হয়েছিল ভারতে বৃটিশ সৃষ্ট রাজ্যগুলির রাজারা উত্তরাধিকারীহীন হিসেবে পরলোক গমন করলে সে রাজ্য কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে দত্তক পুত্রের অধিকার স্বীকার করে নেয়া হবে না। তবে ডালহৌসী আভ্যন্তরীন উন্নতির জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বাংলার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন একজন লেফটেনান্ট গভর্ণরের হাতে (১৮৫৪)। গঠন করেছিলেন গণপূর্ত বিভাগ, স্থাপন করেছিলেন রেল, টেলিগ্রাফ এবং উন্নত করেছিলেন ডাক বিভাগ। কলকাতা, বোম্বে মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, উডের ডেসপ্যাচ কার্যকর করা শুরু করেছিলেন।

৭৮. ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত স্যার চার্লস উড ছিলেন বোর্ড অফ কন্‌ট্রোলের সভাপতি। এ পদে থাকার সময় ১৮৫৪ সালে তিনি ভারতের শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে দলিল দাখিল করেন তাই বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপ্যাচ নামে। উডের এই ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষানীতিতে শৃংখলা এনে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এর বৈশিষ্ট্য

হলো—শিক্ষা দান, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান, শিক্ষার বিভিন্ন স্তর—প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

৭৯. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। জেমস উইলিয়াম কোলভিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Niharranjan Ray and Pratul Chandra Gupta (eds) *Hundred years of the university of Calcutta,* Calcutta, 1956.

৮০. থমাস ব্যাবিংটন মেকলে [ ১৮৮০-১৮৫৯ ] ছিলেন অভিজাত ইংরেজ পরিবারের সন্তান। চারখণ্ডে *হিস্ট্রি অফ ইংল্যাণ্ড* (প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ ও ১৮৫৫ সালে ] গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতের ইতিহাসে তিনি খ্যাত শিক্ষা সংস্কারের জন্য। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত যখন তিনি সুপ্রিম কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য ছিলেন তখন তিনি 'পিনাল কোড' ও শিক্ষা সংস্কারের নীতি মালা প্রণয়ন করেছিলেন যা বিতর্কিত।

৮১. সারদাচরণ মিত্রের (১৮৪৮-১৯১৭) জন্ম হুগলীতে। ১৯০২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সাহিত্যচর্চা করার জন্য ১৯০৮ সালে সেই পদ ত্যাগ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলি সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিলেন যুক্ত। টেক্সট বুক সোসাইটির সভ্য ছিলেন ১৮৮৪ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত।

৮২. বিপিনবিহিনী গুপ্তের (১৮৭৫-১৯৩৬) জন্ম কলকাতায়। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *পুরাতন প্রসঙ্গ* ও *বিবিধ প্রসঙ্গ*।

৮৩. জগন্নাথ কলেজের যাত্রা ১৮৫৮ সালে ঢাকায় স্থাপিত ব্রাহ্ম স্কুল থেকে। ১৮৮৪ সালে কলেজ হিসেবে জগন্নাথ কলেজের কাজ শুরু হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী,* ঢাকা, ১৯৯৩।

৮৪. ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর পুত্র সলিমুল্লাহ। জন্ম ঢাকায়, ১৮৬৬ সালে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন দু'বছর (১৮৯৩-৯৫)। ১৯০১ সালে আহসান উল্লাহর মৃত্যু হলে পরিবার প্রধান বা নবাব হন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয় তাঁর বাগানবাড়ি শাহবাগে। আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সরকারপক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ১৯১৫ সালে কলকাতায় পরলোক গমন করেন। দেখুন, মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ,* ঢাকা, ১৯৮৬।

৮৫. আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯৬৫) ছিলেন ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের একজন প্রভাবশালী নাগরিক। তিনি ছিলেন জমিদার ও ঢাকার একজন প্রধান ও প্রভাবশালী আইনজীবী। এ প্রভাব তিনি আরো বিস্তৃত করেছিলেন সমাজ সেবা ও রাজনীতির মাধ্যমে। ঢাকা পৌরসভায় নির্বাচন প্রথা শুরু হলে আনন্দচন্দ্র তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলন ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান। ঢাকা পৌরসভার তিনিই প্রথম নির্বাচিত বাঙালি চেয়ারম্যান।

৮৬. বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া,* ঢাকা, ১৯৯৯।

৮৭. ১৮৬৪ সালে ঢাকা প্রকাশে বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (১৪ জুলাই, ১৮৬৪)। কিন্তু ঠিক কত সালে তা প্রকাশিত হয়েছে জানা যায় নি।

৮৮. বাংলার প্রথম ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায় ১১ মে, ১৮৬৩ সালে, ষোলজন ছাত্রী নিয়ে।

৮৯. এ প্রস্তাবের ছয় বছর পর ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে ১৮৭৫ সালে চালু করা হয়েছিল মেডিক্যাল স্কুল। স্কুলের বিল্ডিং তৈরি করার জন্য ঢাকাবাসী দান করেছিলেন চৌষট্টি হাজার টাকা এবং সে ইমারত নির্মিত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। এই স্কুলে শিক্ষা দেয়া হতো বাংলায় এবং আমাদের কাছে এখন আশ্চর্য্য ঠেকলেও সত্যি যে, এ স্কুলের কয়েকজন মেডিক্যাল ছাত্রদের জন্য বাংলায় বই লিখেছিলেন।

৯০. কলকাতার বামা বোধিনী সভার অনুকরণে, প্রধানত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৭০ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা।'

৯১. ১৮৭৪ সালে ভারত সরকার মহসীন ফান্ডের সাহায্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহীতে স্থাপন করেছিলেন তিনটি মাদ্রাসা। ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ বা তত্ত্বধায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ওবায়দুল্লাহ আল ওবেয়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩৪–১৮৮৫)। তৎকালীন ঢাকা তো বটেই ভারতীয় মুসলিম সমাজেও সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন ওবেয়দী। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর নাতি।

৯২. সারস্বত সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন জনৈক শ্রীনাথ। সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রসার। 'সারস্বতপত্র' ছিল এর মুখপত্র। ১৮৯৮ সালে এই সমিতি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভাসমিতি*, ঢাকা ১৯৮৪।

৯৩. ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে জমিদার–কৃষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল তা উল্লেখ করেছেন কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত—

'Under Act X of 1859, which conferred occupancy rights on large number of ryots, the rents of their particular class of cultivators could be enhanced on three grounds, if the productive capacity or value of land had incresed without otherwise than by the agency of the ryot. Third, if the quality of land held by the ryot. Proved on measurement greater than that for which rent had been previously paid. The Act of 1859 thus placed great obstaeles in the way of the Zamindar who sued for an enhancement of his rent.' [ এরপর রাধারমণ মুখোপাধ্যায়ের মতামত উদ্ধৃত করেছেন ] 'Under the new law, the court demanded from him the proof that the value of the produce had increased in the same proportion in which he asked that his rent should be enhanced. Thus in many cases the zamindar could not secure the enhancement that was legitimately due to him...' since then, following the abolition of the legal distinction between the khodkhast of resident ryots and paikasht, many ryots belonging to the former category lost their special purpose nonoccupancy tenants if they failed to prove twelve years continuous cultivation of a particular piece of land as required under new law. On the other hand many paikasht tenants earned

the occupancy status by 12 years continuous cultivation of a piece of land. This phenomenon was quite common in all the disrricts...where the rent Act X of 1859 operated.'

Kalyan Kumar Sen-Gupta, *Pabna Disturbances and Politics of Rent*, New Delhi, 1977, pp 14-15.

৯৪. পূর্ববঙ্গের প্রধান নীলকর। ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে ওয়াইজঘাট নামকরণ হয়েছে তাঁর নামানুসারে।

৯৫. ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবর্তন করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ব সংক্রান্ত এই আইনের মূল কথা ছিল ভূমির ওপর জমিদারদের নিরংকুশ মালিকানা স্বীকার। শর্ত ছিল শুধু, জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদান করবেন। এ ভূমি-ব্যবস্থা বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে। তবে বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণের জন্য দেখুন— Ranjit guha, *A Rule of Property for Bengal*, Calcutta, 1982. Serajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal*, Dacca, 1979.

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ*, ঢাকা, ১৯৭৬, বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, ঢাকা।

৯৬. লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৩৮-১৮০৫) ১৭৮১ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ইয়র্কটাউনের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর আত্মসমর্পণে লুপ্ত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্যের সাম্রাজ্য। ১৭৮৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। ১৭৯৩ পর্যন্ত ছিলেন এ পদে। ১৮০৫ সালে পুনর্বার তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল গভর্ণর জেনারেল হিসেবে। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ভূমিকা ছিল তাঁর। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্কারগুলি ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারী যার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্যতম।

৯৭. রেন্ট বিলের পটভূমিকা সম্পর্কে বাংলার লে. গভর্ণর অ্যাশলে ইডেন (১৮৭৭-৮২) মন্তব্য করেছিলেন—

'In view of the loud and constant complaints put forward by the Zamindars as to the difficulty under the present law of collecting even undisputed rents, the Lt. Governor was anxious to provied them at an early date with a resonably summary procedure to enable them to overcome the passive resistance of their ryots, provided that the ryots tenure was at the same time so protected and strengthened as to obviate any fear of their being made to suffer unduly in the process. It is found, however almost impossible to frame a procedure which shall be perfecly fair to both parties and yet afford such special facilities to the Zamindar as he seeks to secure.'

এ জন্য গঠিত হয়েছিল রেন্ট ল কমিশন যার সভাপতি ছিলেন এইচ. ড্যাম্পিয়ার। সদস্য ছিলেন, বিচারপতি ও' কিলনেলি, এইচ. এল হ্যারিসন ও ব্রজেন্দ্রকুমার শীল। বর্ধমানের ডিসট্রিক্ট জজ সি.ডি. ফিল্ড ছিলেন কমিশনের 'স্পেশাল অফিসার'। কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১৩৮।

৯৮. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ মিলে ১৮৭৬ সালে কলকাতায় গঠন করেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান এসোসিশেন' বা 'ভারতবর্ষীয় সভা'। শুরু থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত আনন্দমোহন ছিলেন এর সম্পাদক। ভারতের রাজনীতি বিষয়ে মতামত সংগঠন করাই ছিল সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।

৯৯. ১৮৩৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া (১৮১৯–১৯০১) তাঁর চাচা চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যুর পর গ্রেট–বৃটেনের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন এবং দীর্ঘ চৌষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক রাণী হওয়া সত্ত্বেও তিনি জোরালোভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। ১৮৪০ সালে বিয়ে করেছিলেন স্যাক্সকোবার্গ গোথার রাজকুমার আলবার্ট কে (১৮১৯–৬১)। ১৮৭৭ সালে ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করা হতো।

১০০. ১৮৪৩ সালে সিভিলিয়ান হিসেবে রোহিলা খণ্ডে জর্জ ক্যাম্পবেল শুরু করেছিলেন কর্মজীবন। বাংলা লেঃ গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮৭১ সালে এবং সে পদে ছিলেন ১৮৭৪ পর্যন্ত। তাঁর পূর্বসূরিরা ছিলেন বাংলা ক্যাডারের সুতরাং বাংলা সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল। ক্যাম্পবেল ছিলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ক্যাডারের। ১৮৭১ সালে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন প্রাদেশিক রোড সেসের। প্রথম আদমশুমারীও হয়েছিল তাঁর আমলে। ক্যাম্পবেল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল এ বলে যে, 'As a statesman, Sir G. Campbell stands foremost among the lieutenant Governors and it is unpleasant to add that he was the least popular. Perhaps he was too earnest, & saw too far into the future for ordinary men. Perhaps he fell back too campletely on 'first principles' disregarded existing facts.'

১০১. ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মহামেডান লিটারেরি সোসাইটির। ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিন এ ব্যাপারে আবদুল লতিফকে উৎসাহিত করেছিলেন। আবদুল লতিফ তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'Being fully aware of the prejudice and exclussiveness of the Mahomedan community and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in western learning and progress, and to give them an oppurtunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and Hindoo society. I founded the Mahomedan Literary society in April, 1863.' *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা–চেতনার ধারা*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩।

১০২. ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত লিটন ছিলেন ভারতবর্ষের ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেল। তাঁর শাসনকাল সমসাময়িক কালেই নিন্দিত হয়েছিল বিভিন্ন কারণে। ভারতবর্ষ যখন দুর্ভিক্ষের কবলে তখন জাঁকজমকের সঙ্গে তিনি আয়োজন করেছিলেন দিল্লী দরবারের। আমদানীকৃত সূতীবস্ত্রের ওপর শুল্ক তিনি রহিত করে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প প্রসারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন। সংবাদপত্র দমনের জন্য জারী করেছিলেন ১৮৭৮ সালে 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধও শুরু করেছিলেন তিনি যাতে সফল হন নি। কিন্তু, এই যুদ্ধের পুরো ভার ভারতীয়দের বহন করতে হয়েছিল।

১০৩. আবদুল লতিফ [ খান বাহাদুর, নবাব, সি.আই.ই. ১৮২৮-১৮৯৩ ] জন্মেছিলেন ফরিদপুরে। ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজ সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নতির পথ প্রশস্ত করার ব্যাপারে অবদান রেখেছেন। কর্মজীবনের শুরুতে কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেছিলেন কিছুদিন তারপর যোগ দিয়েছিলেন সরকারী চাকুরীতে। খুলনার কালোরেয়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন ১৮৫৩ সালে প্রথম তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধাচরণ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বিভিন্ন পদে কাজ করার পর অবসর গ্রহণের আগে তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে 'সর্ব্বোচ্চ পদ ও বেতনের' অধিকারী হয়েছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন ১৮৬৩ সালে। মুসলমানদের শিক্ষা প্রসার ও উন্নতির জন্য ঐ বছরই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Md. Mohar Ali (ed.), *Nawab Abdul Latif Khan Bahadur, Autobiography and other writings.* Chittagong, 1968.

১০৪. মার্কুইস রিচার্ড কোলি ওয়েলেসি ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। তাঁর সময়ে, ভারতে কোম্পানীর শাসন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য নতুন এক নীতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন যা পরিচিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' হিসেবে। এ নীতি অনুযায়ী যেসব দেশী রাজ্য ইংরেজদের মিত্র হিসেবে স্বীকার করে নেবে সে সব রাজ্যকে কোম্পানী অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবে। এ জন্য কোম্পানীর সেনাবাহিনী থাকবে সে রাজ্যে। মিত্র রাজারা কোম্পানীর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে কোনো সন্ধি বা কূটনৈতিক আলোচনায় উপনীত হতে পারবে না। বিনিময়ে, সে রাজ্যে অবস্থানরত কোম্পানীর ফৌজদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যের একটি অঞ্চল কোম্পানীকে।

হায়দ্রাবাদের নিজাম এ নীতি প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর এতে যোগ দিয়েছিলেন মহিশূর, রাজপুতানা ও মধ্যভারতের রাজারা, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, গাইকোয়ার প্রমুখ। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম। সাত বছরের মধ্যে ওয়েলেসলী প্রায় সমগ্র ভারত নিজের করায়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

১০৬. আর্ল মিন্টো (১৭৫১-১৮১৭) ১৮০৭-১৮১৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভারতের গবর্ণর জেনারেল। তিনি দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ গ্রহণ না করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং সে কারণে তাঁকে বড় কোনো যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয় নি।

১০৭. আর্ল অফ ময়রা, মার্কুইস অফ হেস্টিংস বা ফ্রানসিস রওডন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮) ছিলেন বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল। কোম্পানীর কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৭৫০ সালে। বিভিন্ন পদ ঘুরে ১৭৭২ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হলে এ পদের উপাধি হয়েছিল গভর্ণর জেনারেল অব ফোর্ট উইলিয়াম ইন লণ্ডন। দ্বৈত শাসনের বিলোপ ঘটিয়ে কলকাতায় তিনি স্থাপন করেছিলেন বোর্ড অব রেভেনিউ। জমির রাজস্বের ক্ষেত্রে করেছিলেন পাঁচশালা বন্দোবস্ত। কোম্পানীর প্রশাসনিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তিনি। বিচারকার্যের জন্য গঠন করেছিলেন সদর দিওয়ানী ও সদর নিযামত আদালত। ভারতে কোম্পানীর শাসনের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। তবে, তাঁর শাসনামল নিন্দিত নন্দকুমারের ফাঁসি, বেনারসের রাজা চৈৎ সিং, অযোদ্ধার বেগমদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণের জন্য। ১৭৮৫ সালে পদত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ড। তাঁকে সেখানে কুড়িটি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সাতবছর বিচারের পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন।

১০৮. লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেনডিস বেন্টিংক ছিলেন বাংলার শেষ গভর্ণর জেনারেল (১৮২৮–১৮৩৫) ও ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ভারতবর্ষে সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য তাঁর শাসনামল উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়দের নিম্নপদে বহাল রাখার কর্ণওয়ালিসের নীতি তিনি বাতিল করেছিলেন। ১৮২৯ সালে লুপ্ত করেছিলেন সতীদাহ প্রথা, দমন করেছিলেন ঠগী। সরকারি স্কুলসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালু ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

১০৯. আর্ল ক্যানিঙ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। তাঁর সময়কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। ১৮৫৯ সালে 'রেন্ট অ্যাক্ট' পাশ করে রায়তদের খানিকটা সুবিধা দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় প্রশাসন ও আইনের ক্ষেত্রেও তিনি অবদান বেখেছিলেন উল্লেখযোগ্য কিছু সংস্কার করে।

১১০. রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫–১৭৭৪) বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন পত্তন করেছিলেন। কোম্পানীর রাইটার হিসেবে তিনি ভারতবর্ষে আসেন, তারপর সোনাবাহিনীতে যোগ দেন। কর্ণাটকের চান্দা সাহেবকে ১৭৫০ সালে পরাজিত করার পর তিনি কোম্পানীর কর্মকর্তাদের নজরে আসেন।

১৭৫৭ সালে ক্লাইভ ও ওয়াটসন সিরাজউদদৌলার অধিকার থেকে কলকাতা দখল করে নেন এবং জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদদৌলাকে পরাজিত করে বাংলায় কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৭৬০ সালে ফিরে যান ইংল্যাণ্ডে। লাভ করেন লর্ড উপাধি। কোম্পানীর পরিচালকরা ১৭৬৫ সালে আবার তাঁকে বাংলার গভর্ণর ও সেনাধ্যক্ষ করে পাঠান। ১৭৬৭ সালে অবসর নিয়ে ফিরে যান। স্বদেশে তাঁকে বিভিন্ন অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে অবৈধভাবে তিনি ২৩৪,০০০ পাউণ্ড অর্জন করেছেন। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন। দেখুন, Percival Spear, *Master of Bengal, Clive and His India,* London, 1975.

১১১. বাংলার জমিদাররা ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসেসিয়েশন। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব ও সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের মানোন্নয়ন, বৃটেন ও ভারতের স্বার্থ সমুন্নত রাখা, সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়ন ছিল সমিতির লক্ষ্য।

১১২. ম্যাক্সমুলারের মতে, জীবিত থাকাকালীন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদ। জন্ম ১৮২৪ সালে কলকাতায়। বিভিন্ন ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৮৪৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যুক্ত হন এবং ১৮৮৫ সালে প্রথম ভারতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৮৫১ সালে প্রকাশ করেন মাসিক *বিবিধার্থ সংগ্রহ*। সাতবছর পত্রিকাটি চলেছিল। ১৯৬৩ সাল থেকে চারবছর পর্যন্ত সম্পাদনা করেন মাসিক *রহস্য সন্দর্ভ*। *হিন্দু-প্যাট্রিয়ট* কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসেসিয়েশন, টেক্সটবুক সোসাইটি, দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশন (১৮৮৬) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনিই শুরু করেছিলেন ইতিহাস চর্চা। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—*Antiquities of Orissa, Nepallese Buddhist Literature*

ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকেই প্রথম সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী (১৮৭৬) প্রদান করে। সরকার দিয়েছিলেন রায় বাহাদুর (১৮৭৭), সি আই ই (১৮৭৮) ও রাজা (১৮৮৮)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটা সভা। তিনি কেবল মননশীল লেখকই ছিলেন না...তাঁহার মূর্তিতে মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ হইত। অথচ যোদ্ধবেশে তাঁর রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান—কখনো পরাভূত হইতে জানিতেন না।' রাজেন্দ্রলাল পরলোক গমন করেন ১৮৯১ সালে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আলোক রায়, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, কলকাতা ১৯৬৯।

১১৩. নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের জন্ম (১৮২২-১৯০৩) কলকাতার শোভাবাজারের রাজপরিবারে। ১৮৭৭ সালে তাঁকে 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি দেয়া হয়।

১১৪. কৃষ্ণদাস পালের জন্ম কলকাতার কাঁসরি পাড়ায়। ১৮৩৮ সালে। বাগ্মী এবং সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৮৬১ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন সেই পদে। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' সহ-সম্পাদক এবং পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক' সভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন ১৮৮৩ সালে।

বাকল্যাণ্ড লিখেছেন, বাংলার লেঃ গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল মন্তব্য করেছিলেন কৃষ্ণদাস পাল সম্পর্কে এই বলে যে তাঁর জানা মতে, ভারতীয়দের মধ্যে 'best informed' কৃষ্ণদাস ছাড়া কেউ নেই—

'...his assistance in legistation was really valuable ; and in Public affairs he had more force of character than any Native of Bengal. He belong to a caste below that Brahmin, and was the editor of *Hindu Patriot* newspaper, published in English. This paper was the organ of the Bengal Zamindars and was in the main sustained by them but it had large circulation otherwise both among Eoropeans and Natives, being conducted with independence, loyality and learning.' পরলোকগমন করেন ১৮৮৪ সালে। দেখুন, C.E. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, vol. II, New Delhi, 1976, pp 1057-1059.

১১৫. মহারাজ বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জন্ম (১৮৩১-১৯০৮) কলকাতার পাথুরিয়াঘাটের জমিদার পরিবারে। তৎকালীন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেব সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১১৬. ইনি পাটনার নবাব আমীর আলী।

১১৭. রাজা দিগম্বর মিত্রের জন্ম (১৮১৭-১৮৭৯) হুগলীতে। ব্যবসা করে ধন-সম্পদের মালিক হন, তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন তিনবার। ১৮৭৪ সালে মনোনীত হয়েছিলেন কলকাতার প্রথম বাঙালি শেরিফ হিসেবে।

১১৮. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) বাংলায় আবেদন নিবেদনের যে রাজনীতি তার সূত্রপাত করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আই. সি. এস হয়ে ১৮৭১ সালে সিলেটে যোগ দিয়েছিলেন সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। ১৮৭৩ সালে সামান্য প্রশাসনিক ত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে করা হয়েছিল চাকুরিচ্যুত। এরপর তিনি অধ্যাপনা শুরু করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রিপন কলেজের। সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের

একজন প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৯ সালে *বেঙ্গলী* নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেছিলেন এবং এ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য (১৮৮৮৩) আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন। 'ব্রিটিশ সরকারী আদালতে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম রাজনৈতিক কারাদণ্ড ভোগ করেন।' এ ঘটনাই তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিল।

অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। ছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন নেতা। এতোসব সত্ত্বেও ব্রিটিশের ন্যায় নীতির প্রতি আস্থা কখনও তার যায় নি। এসব স্ববিরোধিতার কারণে, রাজনীতিতে তিনি আর বেশী এগুতে পারেন নি। তবে, বলা যেতে পারে, বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি অবদান রেখেছিলেন। বিধানচন্দ্রের কাছে এক নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন রাজনীতি থেকে। তাঁর আত্মজীবনী 'এ নেশন ইন মেকিং', ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি বিশেষ মূল্যবান দলিল। দেখুন, Surendranth Banerjea, *A Nation in Making*, Calcutta, 1925.

১১৯. ১৮৮২ সালের ৩০ জানুয়ারি বিহারীলালগুপ্ত নামে এক আই সি এস অফিসার বাংলা সরকারের কাছে এক নোটে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, প্রশাসনের অংশগ্রহণের অধিকার যদি ভারতীয়দের থাকে তা'হলে লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পর পাশকৃত ১৮৭২ সালের আইন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ইউরোপীয়দের ওপর ভারতীয় প্রশাসকদের কর্তৃত্ব না দেয়া অযৌক্তিক।

সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করার পর, বর্ণের ভিত্তিতে বিচারের নীতিমালা বিলুপ্ত করার জন্য পরিষদে ২.২.১৮৮৩ সালে সার কোর্টনি ইলবার্ট বিলটি উত্থাপন করেছিলেন যা পরিচিত ইলবার্ট বিল নামে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ মালিকানাধীন ইংরেজি পত্রিকা ও বাঙালি মালিকানাধীন বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে তুমুল বাক্যযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, ইলবার্ট বিল পাশ হওয়ার পর এ দেশীয়দের ক্ষোভ সংহত ও সংগঠিতভাবে একটি লক্ষ্যে অগ্রসর হয় যার পিছে ছিল আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। ইলবার্ট বিলের সময় ইংরেজদের আন্দোলন, মধ্যবিত্ত বাঙালিকে নাড়া দিয়ে তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল আত্মমর্যাদার প্রশ্নটি। কারণ, ইংরেজরা যেভাবে এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণবাদী মুখোশ উন্মোচিত করেছিল তার তুলনা বিরল। ইলবার্ট আইন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বাকল্যাণ্ডের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১২০. গুজরাটের পার্সি কবি বেহরামজি মেরওয়ানজি মালাবারি। আগস্ট ১৮৮৪ সালে বিয়ের বয়স বৃদ্ধির জন্য তিনি লর্ড রিপনের কাছে 'নোটস অব ইনফ্যান্ট ম্যারেজ অ্যাণ্ড অন ফোর্সড উইডোহুড' নামে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই আবেদন ইংল্যাণ্ড ও ভারতে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৯৭।

১২১. ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭) বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। পার্সি সম্প্রদায়ের ধনী বণিক নওরোজীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে লিবারেল পার্টির পক্ষে তিনি প্রথম ভারতীয় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৯০৬ সালে।

১২২. স্যার অগাস্টাস বিভার্স থমসন ১৮৫১ সালে বাঁকুড়ার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। বাংলার লে: গবর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮৮২ সালে। এ পদে ছিলেন ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত। তাঁর আমল ছিল ঘটনাবহুল। ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাঁর আমলে। 'লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট বিল' এবং 'মিউনিসিপাল বিল' ও 'বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট এইটিন এইটি লাইভ' তাঁর আমলে পাশ হয়েছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজে মহিলাদের ভর্তি নিয়ে বিতর্ক হলে তিনি মেডিকেলে মহিলাদের ভর্তির পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন বাকল্যাণ্ডের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১২৩. উইলিয়াম ইওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন (১৮০–৯৪) প্রায় অর্ধশতাব্দী ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। চারবার তিনি গ্রেট বৃটেনের মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

১২৪ শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, ১৮৪৪ সালে। ছাত্রজীবনে প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন এবং পিএইচ. ডি ও লাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য (১৮৯০–৯৩)। হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলন (১৮৮৮–১৯০৪)। 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন ১৯০৪ সালে। বেশ কটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৃত্যু ১৯১৮ সালে।

১২৫. গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত (বৈশাখ, ১২৮৬) সাপ্তাহিক। ১২৯৩ সালে একীভূত হয়ে যায় সাধারণীর সঙ্গে।

১২৬. অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিকী। ১২৮০ সনে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত।

১২৭. প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

১২৮. খুব সম্ভব হরিশ্চন্দ্র মিত্রের মাসিক *মিত্রপ্রকাশ*-এর বিজ্ঞাপন।

১২৯. ঈশ্বরচন্দ্র করের সম্পাদনায় প্রকাশিত বরিশালের প্রথম সংবাদপত্র। প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৬ সনে।

দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫।

১৩০. *মিত্র প্রকাশ*-এর সংকলনের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের জীবন ও কর্মের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *হরিশ্চন্দ্র মিত্র*, ঢাকা, ১৯।

১৩১. হিন্দু প্যাট্রিয়টের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, অনেকের ধারণা হিন্দু প্যাট্রিয়টের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। আসলে, ১৮৫৩ সালে পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেছিলেন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। ঐ বছরই হরিশ্চন্দ্র পত্রিকাটির মালিকানা লাভ করেছিলেন এবং শুরু করেছিলেন সম্পাদন। নীল বিদ্রোহের সময় তীব্র ভাষায় নীলকরদের বিরোধিতার জন্য *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Benoy Ghose, *Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal*, vol. VI, Calcutta, 1981

১৩৩. ১৮৭০ সালে বঙ্গচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক *বঙ্গবন্ধু*। নানা ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু টিকে ছিল ১৯০৭ সাল পর্যন্ত। দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড।

১৩৪. পণ্ডিত হরকুমার রায়ের সম্পাদনায় পাক্ষিক এই পত্রিকাটি বের হয় বরিশাল থেকে। ঐ।

১৩৫. কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় ১৮৭১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *শুভসাধনী*। ঐ

১৩৬. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই মাসিক পত্রটি। টিকেছিল দু'বছর। ঐ।

১৩৭. ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই সাপ্তাহিকীটি। ঐ।

১৩৮. ১৮৭৫ সালে এই পয়সার এই সাপ্তাহিক পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ।

১৩৯. নাগ্নারের জমিদার অম্বিকাচরণ রায়ের সম্পাদনায় ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *ভারত সুহৃদ*। ঐ

১৪০. ১৮৮০ সালে মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল এই মাসিকপত্রটি।

১৪১. বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৮০ সনে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *সহচর*, কলকাতা থেকে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র*, ২য় খণ্ড, কলকাতা। ১৩৮৪, পৃ. ১১।

*ভারত মিহির* প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে ১৮৭৫ সালে। ব্রাহ্মরা ছিলেন পত্রিকাটির উদ্যোক্তা। মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*।

১৪৩. ১৮৫৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *এডুকেশন গেজেট*। ১৮৬৮ সালে সরকার ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে এর সম্পাদক নিযুক্ত করে স্বত্ব দান করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ১৪২–৪৬।

১৪৪. ঢাকা থেকে হরিহর নন্দীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'মাসিক বিদ্রুপপত্র ও সমালোচক', *সদানন্দ*, ১৮৮১ সালে। মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*।

১৪৫. বঙ্কুবিহারী খাঁর সম্পাদনায় রাজশাহীর তাহিরপুর দাতব্য কৃষিকার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিকপত্রটি। ঐ।

১৪৬. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৮৮৫)। ঐ।

১৪৭. ঢাকার ক্রিকেট সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার টুকিটাকি*, ঢাকা, ১৯৯৮।

# শব্দসূচি

# শব্দসূচি